মার্কস এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

ভলিউম-৪

খণ্ড -১০, ১১, ১২

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

কার্ল মার্কস
ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

খণ্ড

১০

প্রগতি প্রকাশন

মস্কো

সম্পাদনা: প্রফুল্ল রায়

К. Маркс и Ф. Энгельс

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В XII ТОМАХ

Том 10

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

$\text{МЭ}\frac{10101\text{-}620}{014(01)\text{-}82}545\text{-}82$

0101010000

সূচি

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র (১)

১৮৯২ সালের ইংরেজি সংস্করণের বিশেষ ভূমিকা

বর্তমানের এই ছোট পুস্তিকাটি মূলত একটি বৃহত্তর রচনার অংশ। ১৮৭৫ সালের কাছাকাছি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত, কিন্তু অবৈতনিক অধ্যাপক (privatdocent) হয়ে. ড্যুরিং সহসা এবং খানিকটা সরবে সমাজতন্ত্রে তাঁর দীক্ষাগ্রহণের কথা ঘোষণা করেন ও জার্মান জনসাধারণের কাছে একটা বিস্তারিত সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বই শুধু নয়, সমাজ পুনর্গঠনের গোটা একটা ব্যবহারিক ছকও হাজির করেন। বলাই বাহুল্য, উনি তাঁর পূর্ববর্তীদের সঙ্গে কলহ করেছেন; সর্বোপরি তাঁর পুরো ঝাল ঝেড়ে সম্মানিত করেছেন মার্কসকে।

ঘটনাটা ঘটে প্রায় সেই সময় যখন জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টির দুটি অংশ, আইজেনাখপন্থী ও লাসালপন্থীরা (২) সবে মিলিত হয়েছে এবং তাতে করে পার্টি প্রভূত শক্তি বৃদ্ধি করেছে তাই নয়, অধিকন্তু এই সমগ্র শক্তিটা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে নিয়োগের ক্ষমতাও অর্জন করেছে। জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টি দ্রুত একটা শক্তি হয়ে উঠছিল। কিন্তু শক্তি হয়ে ওঠার প্রথম শর্তই ছিল, এই নবার্জিত ঐক্যকে বিপন্ন করা চলবে না। ডঃ ড্যুরিং কিন্তু প্রকাশ্যেই তাঁর চারিপাশে একটি জোট পাকাতে শুরু করেন, একটি ভবিষ্যৎ পৃথক পার্টির তা বীজ। সুতরাং প্রয়োজন হয় দ্বন্দ্বাহবান গ্রহণ করে লড়ে যাওয়া, চাই বা না চাই।

কাজটা অতি দুষ্কর না হলেও স্পষ্টতই এক দীর্ঘ ঝামেলার ব্যাপার। একথা সুবিদিত যে, আমরা জার্মানরা হলাম সাংঘাতিক রকমের গুরুভার Gründlichkeit-এর ভক্ত—তাকে র‍্যাডিকেল প্রগাঢ়ত্ব অথবা প্রগাঢ় র‍্যাডিকেলত্ব যা খুশি বলুন। আমাদের কেউ যখন তাঁর বিবেচনানুসারে যা

নতুন মনে হচ্ছে এমন একটি মতবাদ বিবৃত করতে চান, তখন সর্বাগ্রে সেটিকে একটি সর্বাঙ্গীণ তন্ত্রে পরিপ্রসারিত করতে হবে তাঁকে। তাঁর প্রমাণ করে দিতে হবে যে, ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম সূত্রটি থেকে বিশ্বের মৌলিক নিয়মগুলি সবই আর কিছুই না, অনাদি কাল থেকে শুধু এই নবাবিষ্কৃত পরমোৎকৃষ্ট তত্ত্বটিতে পেঁাছনোর জন্যই বিদ্যমান। এবং এদিক থেকে ডঃ ড্যুরিং রীতিমতো জাতীয় মানোত্তীর্ণ। একছিটে কম নয়, একেবারে সুসম্পূর্ণ একটা 'দর্শনতন্ত্র'—মনোজাগতিক, নৈতিক, প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক দর্শন; সুসম্পূর্ণ একটা 'অর্থশাস্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ব্যবস্থা'; এবং পরিশেষে 'অর্থশাস্ত্রের বিচারমূলক ইতিহাস'—অক্টাভো সাইজের তিনটি মোটা মোটা খণ্ড, ওজন ও বিষয়বস্তুর গুরুভার, সাধারণভাবে পূর্বতন সমস্ত দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদদের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে মার্কসের বিরুদ্ধে তিন অক্ষৌহিণী যুক্তি, মোটকথা একটা পরিপূর্ণ 'বিজ্ঞান বিপ্লবের' প্রচেষ্টা, এরই মোকাবিলা আমাকে করতে হত। আলোচনা করতে হত সম্ভাব্য সবকিছু প্রসঙ্গে: স্থান কালের ধারণা থেকে দ্বিধাতুমান (৩) পর্যন্ত; বস্তু ও গতির চিরন্তনতা থেকে শুরু করে নৈতিক ভাবনার মরণশীল প্রকৃতি; ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন থেকে ভবিষ্যৎ সমাজে তরুণদের শিক্ষা—সব। যাই হোক, আমার প্রতিপক্ষের প্রণালীবদ্ধ সর্বাঙ্গীণতার ফলে এই অতি বিভিন্ন সব প্রসঙ্গে মার্কস ও আমার যা মতামত সেগুলিকে ড্যুরিং-এর বিপরীতে, এবং এযাবৎ যা করা হয়েছে তার চেয়ে আরো সুসংবদ্ধ আকারে একটা সুযোগ পাওয়া গেল। অন্যথায় অকৃতার্থ এ কর্তব্যগ্রহণে সেই ছিল আমার প্রধান কারণ।

আমার জবাব প্রথমে প্রকাশিত হয় সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রধান মুখপত্র লাইপজিগ *Vorwärts* (৪) পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ হিশেবে এবং পরে 'Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft' ('শ্রী ইয়ে. ড্যুরিং-এর বিজ্ঞান বিপ্লব') নামক পুস্তকাকারে, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় জুরিখে ১৮৮৬ সালে।

সুহৃদ্বর এবং অধুনা ফরাসী প্রতিনিধি-সভায় লিল্ প্রতিনিধি পল লাফার্গের অনুরোধে এ বইয়ের তিনটি পরিচ্ছেদ একটি পুস্তিকাকারে সাজিয়ে দিই। তিনি তা অনুবাদ করে ১৮৮০ সালে 'Socialisme utopique et

Socialisme scientifique' ('ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র') নামে প্রকাশ করেন। এই ফরাসী পাঠের উপর ভিত্তি করে একটি পোলীয় ও একটি স্পেনীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ সালে আমাদের জার্মান বন্ধুরা পুস্তিকাটিকে মূল ভাষায় প্রকাশ করেন। পরে এই জার্মান পাঠ থেকে ইতালীয়, রুশ, ডেনিশ, ওলন্দাজ, রুমানীয় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাই বর্তমান ইংরেজি সংস্করণটি ধরলে পুস্তিকাটি দশটি ভাষায় প্রচারিত। আর কোনো সমাজতান্ত্রিক পুস্তক, এমনকি আমাদের ১৮৪৮ সালের 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' বা মার্কসের 'পুঁজি' বইটিও এত ঘনঘন অনুবাদ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। জার্মানিতে এ বইটির চারটি সংস্করণের উত্তীর্ণ হয়েছে, সর্বসমেত ২০,০০০ কপি।

'মার্ক' (৫), এই সংযোজনী লেখা হয়েছিল জার্মানিতে ভূমিসম্পত্তির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা প্রাথমিক জ্ঞান জার্মান সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। এটা তখন আরো বেশি প্রয়োজনীয় কারণ সে পার্টিতে শহুরে মজুরদের অঙ্গীভবন তখন বেশ সম্পূর্ণতার দিকে, পালা এসেছে ক্ষেতমজুর ও চাষীদের। অনুবাদে এ সংযোজনী রেখে দেওয়া হয়েছে, কেননা সমস্ত টিউটোনিক জাতির পক্ষে যা একই সেই ভূমি-ব্যবস্থার আদি ধরনটা এবং তার অবক্ষয়ের ইতিহাস জার্মানির চেয়েও ইংলন্ডে কম সুবিদিত। লেখাটি মূলে যা ছিল তাই রেখে দিয়েছি, মাক্সিম কভালেভ্স্কি সম্প্রতি যে প্রকল্প দিয়েছেন তার কথা উল্লেখ করা হয় নি; এই প্রকল্প অনুসারে মার্ক-এর সভ্যদের মধ্যে আবাদী ও চারণভূমির ভাগাভাগি হয়ে যাবার আগে এগুলির চাষ হত যৌথ হিশেবে বেশ কয়েক পুরুষের এক একটি বৃহৎ পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক গোষ্ঠী দ্বারা (অদ্যাবধি বর্তমান দক্ষিণ স্লাভোনীয় জাদ্রুগা তার দৃষ্টান্ত), ভাগাভাগি হয় পরে, যখন গোষ্ঠী বৃদ্ধি পেয়ে যৌথ হিশেবে পরিচালনার পক্ষে বড়ো বেশি বৃহৎ হয়ে দাঁড়ায়। কভালেভ্স্কির বক্তব্য হয়ত ঠিকই, কিন্তু বিষয়টা এখনো sub judice*।

* Sub judice — বিচারসাপেক্ষ। — সম্পাঃ

এ বইয়ে ব্যবহৃত অর্থনৈতিক পরিভাষার মধ্যে যেগুলি নতুন সেগুলি মার্কসের 'পুঁজি' বইটির ইংরেজি সংস্করণ অনুযায়ী। সেই অর্থনৈতিক পর্যায়কে আমরা 'পণ্যোৎপাদন' বলছি যেখানে সামগ্রী উৎপাদন করা হচ্ছে কেবল উৎপাদকের ভোগের জন্য শুধু নয়, বিনিময়ের জন্যও; অর্থাৎ ব্যবহার-মূল্য হিশেবে নয়, **পণ্য হিশেবে**। বিনিময়ের জন্য উৎপাদনের প্রথম সূত্রপাত থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত এই পর্যায়টা প্রসারিত; তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে কেবলমাত্র পুঁজিবাদী উৎপাদনেই, অর্থাৎ সেই অবস্থায়, যখন উৎপাদন-উপায়ের মালিক পুঁজিপতি মজুরি দিয়ে নিয়োগ করে শ্রমিকদের, শ্রমশক্তি ছাড়া যারা উৎপাদনের সর্ববিধ উপায় থেকে বঞ্চিত তাদের, এবং সামগ্রীর বিক্রয়-মূল্য থেকে তার উৎপাদনী ব্যয়ের ওপর যেটা উদ্বৃত্ত হয় সেটি পকেটস্থ করে। মধ্য যুগ থেকে শুরু করে শিল্পোৎপাদনের ইতিহাসকে আমরা তিনটি পর্বে ভাগ করি: ১) হস্তশিল্প, ক্ষুদে ক্ষুদে ওস্তাদ কারুশিল্পী ও জনকয়েক ঠিকা মজুর ও সাকরেদ, প্রত্যেক শ্রমিক সেখানে পুরো সামগ্রীটাই তৈরি করে; ২) হস্তশিল্প কারখানা (manufacture), যেখানে অধিকতর সংখ্যক শ্রমিক একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে একত্র হয়ে সম্পূর্ণ সামগ্রীটা উৎপাদন করে শ্রমবিভাগ নীতিতে, প্রত্যেক শ্রমিক করে শুধু এক একটা আংশিক কাজ যাতে সামগ্রীটা সম্পূর্ণ হয় শুধু পর পর সবার হাত ফেরতা হয়ে যাবার পর; ৩) আধুনিক যন্ত্রশিল্প, যেখানে মাল তৈরি হয় শক্তি-চালিত যন্ত্র দ্বারা আর শ্রমিকের কাজ শুধু যন্ত্রের ক্রিয়ার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ।

আমি বেশ জানি যে, এ বইয়ের বিষয়বস্তুতে ব্রিটিশ পাঠক সাধারণের একটা বড়ো অংশের আপত্তি হবে। কিন্তু আমরা, মূল ইউরোপ ভূখণ্ডের অধিবাসীরা যদি ব্রিটিশ 'শালীনতা' রূপ কুসংস্কারের বিন্দুমাত্র ধারও ধারতাম, তাহলে আমাদের অবস্থা যা আছে তা আরো শোচনীয় হত। আমরা যাকে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' বলি, এ বইয়ে তাকেই সমর্থন করা হয়েছে আর 'বস্তুবাদ' শব্দটাই ব্রিটিশ পাঠকদের বিপুল অধিকাংশের কানে বড়ো বেঁধে। 'অজ্ঞেয়বাদ' (৬) তবু সহনীয়, কিন্তু বস্তুবাদ একেবারেই অমার্জনীয়।

অথচ সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে আধুনিক সমস্ত বস্তুবাদেরই আদি ভূমি হল ইংলণ্ড।

'বস্তুবাদ গ্রেট ব্রিটেনের আত্মজ সন্তান। ব্রিটিশ স্কলাস্টিক (৭) দুন্স স্কোট তো আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন: বস্তুর পক্ষে ভাবনা কি অসম্ভব?

'এই অঘটন-ঘটনের জন্য তিনি আশ্রয় নেন ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তায় অর্থাৎ তিনি ধর্মতত্ত্বকে (৮) লাগান বস্তুবাদের প্রচারে। তদুপরি তিনি ছিলেন নামবাদী (৯)। নামবাদ, বস্তুবাদের প্রাথমিক এই রূপ প্রধানত দেখা যায় ইংরেজ বস্তুবাদীদের মধ্যে।

'ইংরেজি বস্তুবাদের আসল জনক হলেন বেকন। তাঁর কাছে প্রকৃতিবিজ্ঞানই হল একমাত্র সত্য দর্শন এবং ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করা পদার্থবিদ্যা হল প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রধান ভাগ। আনাক্সেইগরস এবং তাঁর homoioméreia (১০), ডিমোক্রিটস এবং তাঁর পরমাণুর কথা তিনি প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন তাঁর প্রামাণ্য হিশেবে। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয় অভ্রান্ত ও সর্বজ্ঞানের উৎস। সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তি অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়-দত্ত তথ্যকে যুক্তিসম্মত প্রণালীতে বিচার করাই হল বিজ্ঞানের কাজ। অনুমান, বিশ্লেষণ, তুলনা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা হল এই ধরনের যুক্তিসম্মত প্রণালীর প্রধান অঙ্গ। বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হল গতি, যান্ত্রিক ও গাণিতিক গতিই শুধু নয়, প্রধানত একটা আবেগ (impulse), একটা সজীব প্রেরণা, একটা টান, অথবা ইয়াকব ব্যেমে-র কথা অনুসারে—বস্তুর একটা বেদনা (Qual*)।

'বস্তুবাদের প্রথম স্রষ্টা বেকনের মধ্যে একটা সর্বাঙ্গীণ বিকাশের বীজ তখনো অন্তর্নিহিত। একদিকে ইন্দ্রিয়গত কাব্যময় ঝলকে পরিবৃত বস্তু যেন মানবের সমগ্র সত্তাকে আকৃষ্ট করছে মোহিনী হাসি হেসে। অন্যদিকে সূত্রোক্তি রূপে নিবদ্ধ মতবাদ ধর্মতত্ত্ব থেকে আমদানি করা অসঙ্গতিতে পল্লবিত।

---

* Qual — দার্শনিক কথার খেলা। Qual কথার আক্ষরিক অর্থ যন্ত্রণা, একটা বেদনা যা কোনো ধরনের কর্মে ঠেলে দেয়। এই জার্মান শব্দটির মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদী ব্যোমে ল্যাটিন qualitas-এর (গুণ) কিছুটা অর্থও আরোপ করেছেন। বাইরে থেকে দেওয়া যন্ত্রণার বিপরীতে তাঁর Qual হল বেদনার্ত বস্তু, সম্পর্ক বা ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ থেকে উদ্ভূত ও সঙ্গে সঙ্গে সেই বিকাশকে অগ্রসর করার মতো এক সক্রিয় কারিকা। (ইংরেজি সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।) — সম্পাঃ

'পরবর্তী বিকাশে বস্তুবাদ হয়ে ওঠে একপেশে। বেকনীয় বস্তুবাদকে যিনি গুছিয়ে তোলেন তিনি হব্‌স। ইন্দ্রিয়ভিত্তিক জ্ঞান তার কাব্য-মায়া হারিয়ে গাণিতিকের বিমূর্ত অভিজ্ঞতার করায়ত্ত হল; বিজ্ঞানের রাণী বলে ঘোষণা করা হল জ্যামিতিকে। বস্তুবাদ আশ্রয় নিল মানবদ্বেষে। প্রতিদ্বন্দ্বী মানবদ্বেষী দেহহীন অধ্যাত্মবাদকে যদি তারই স্বভূমিতে পরাস্ত করতে হয়, তাহলে বস্তুবাদকেও তার দেহ দমন করে যোগী হতে হয়। এইভাবে ইন্দ্রিয়গত সত্তা থেকে তা পরিণত হল বুদ্ধিগত সত্তায়; কিন্তু এ ভাবেও, বুদ্ধির যা বৈশিষ্ট্য সেই অনুসারে, ফলাফলের তোয়াক্কা না করে সবকটি সঙ্গতিকেই তা বিকশিত করে তোলে।

'বেকনের অনুবর্তক হব্‌স এই যুক্তি দেন: সমস্ত মানবিক জ্ঞান যদি পাই ইন্দ্রিয় থেকে তাহলে আমাদের ধ্যান-ধারণা ও ভাবনাগুলি বাস্তব জগতের ইন্দ্রিয়গত রূপ বর্জিত ছায়ামূর্তি ছাড়া কিছু নয়। দর্শন শুধু এই ছায়ামূর্তিদের নামকরণ করতে পারে। একই নাম প্রযুক্ত হতে পারে একাধিক ছায়ামূর্তিতে। এমনকি নামেরও নাম থাকতে পারে। স্ববিরোধ হবে যদি আমরা একদিকে বলি যে, সমস্ত ধারণার উদ্ভব ইন্দ্রিয়ের জগৎ থেকে এবং অন্যদিকে বলি, সেকথাটার অতিরিক্ত কিছু, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরিজ্ঞাত যে সত্তাগুলি সকলেই এক একটি একক, সেগুলি ছাড়াও একক নয়, সাধারণ চরিত্রের সত্তা বর্তমান। দেহহীন বস্তুর মতোই দেহহীন সত্তাও আজগুবি। দেহ, বস্তু, সত্তা হল একই বাস্তবের বিভিন্ন নাম। **চিন্তাশীল বস্তু থেকে চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব।** জগতে যে পরিবর্তন চলেছে তা সবের অধঃস্তর হল এই বস্তু। অসীম কথাটা অর্থহীন যদি না বলা হয় যে, অবিরাম যোগ দিয়ে যাবার ক্ষমতা আমাদের মনঃশক্তির আছে। কেবল বস্তুময় জগৎই আমাদের অনুভবগম্য, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানা আমাদের সম্ভব নয়। একমাত্র আমার নিজস্ব অস্তিত্বই নিশ্চিত। মানবিক প্রতিটি আবেগই হল একটা যান্ত্রিক গতি যার একটা শুরু ও একটা শেষ আছে। যাকে আমরা কল্যাণ বলি তা হল চিত্তাবেগের (impulse) লক্ষ্য। প্রকৃতির মতো মানুষও একই নিয়মের অধীন। ক্ষমতা ও মুক্তি একই কথা।

'হব্‌স বেকনকে গুছিয়ে তুলেছেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের জগৎ থেকে সমস্ত

মানবিক জ্ঞানের উদ্ভব, বেকনের এই মূলনীতির কোনো প্রমাণ দাখিল করেন নি। সে প্রমাণ দেন লক্ তাঁর 'মানবিক বোধ বিষয়ে নিবন্ধ'-এ।

'বেকনীয় বস্তুবাদের আস্তিক্যবাদী (১১) কুসংস্কার চূর্ণ করেছিলেন হব্‌স। লকের ইন্দ্রিয়বাদের (১২) মধ্যে যে ধর্মতত্ত্বের ঝোঁক তখনো থেকে গিয়েছিল তাকে একইভাবে চূর্ণ করেন কলিন্স, ডডওয়েল, কাউয়ার্ড, হার্টলি, প্রিস্ট্‌লি, ইত্যাদি। অন্তত ব্যবহারিক বস্তুবাদীদের পক্ষে ধর্ম থেকে অব্যাহতি পাবার সহজ পদ্ধতি হল ডীইজম (১৩)।'*

আধুনিক বস্তুবাদের ব্রিটিশ উৎস বিষয়ে এই হল মার্কসের লেখা। ইংরেজদের পূর্বপুরুষদের মার্কস যে প্রশংসা করেছিলেন সেটা যদি আজকাল তাদের তেমন রুচিকর না লাগে তবে আক্ষেপেরই কথা। কিন্তু অস্বীকার করার জো নেই যে, বেকন, হব্‌স ও লক্‌ই হলেন ফরাসী বস্তুবাদীদের সেই চমৎকার ধারাটির জনক যা, ফরাসীদের ওপর ইংরেজ ও জার্মানরা স্থল ও নৌযুদ্ধে যত জয়লাভই করুক না কেন, অষ্টাদশ শতাব্দীকে পরিণত করেছে প্রধানত এক ফরাসী শতাব্দীতে এবং সেটা পরিণামের সেই ফরাসী বিপ্লবেরও আগে যার ফলশ্রুতিতে ইংলন্ড ও জার্মানির আমরা, বাইরের লোকেরা, এখনো অভ্যস্ত হবার জন্য চেষ্টিত।

একথা অনস্বীকার্য। এ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিদগ্ধ যে বিদেশীরা ইংলন্ডে এসে বাসা পাততেন, তাঁদের প্রত্যেককেই যে জিনিসটা অবাক করেছে সেটাকে তাঁরা 'ভদ্র' ইংরেজ মধ্য শ্রেণীর ধর্মীয় গোঁড়ামি ও নির্বুদ্ধিতা বলে গণ্য করতে তখন বাধ্য হতেন। আমরা সেসময় সকলেই ছিলাম হয় বস্তুবাদী নয় অন্তত‌পক্ষে অতি অগ্রণী স্বাধীন-চিন্তক, এবং ইংলন্ডের প্রায় সমস্ত শিক্ষিত লোকেই যে যতোরকম অসম্ভাব্য অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করবেন, বাকল্যান্ড ও মানটেলের মতো ভূতাত্ত্বিকরাও তাঁদের বিজ্ঞানের

---

* Marx und Engels, 'Die heilige Familie', Frankfurt a. M., 1845, S. 201-204. (এঙ্গেলসের টীকা।)

মার্কস ও এঙ্গেলসের এই বইটির পুরো নাম: 'Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer und Konsorten' ('পবিত্র পরিবার বা বিচারমূলক সমালোচনার সমালোচনা। ব্রুনো বাউয়ের কোম্পানির বিরুদ্ধে')। — সম্পাঃ

তথ্যকে বিকৃত করে বাইবেলের বিশ্বসৃষ্টির অতিকথার সঙ্গে খুব বেশি সংঘর্ষের মধ্যে যেতে চাইবেন না, তা আমাদের কাছে অকল্পনীয় লেগেছিল। অন্যপক্ষে, ধর্মীয় প্রসঙ্গে যাঁরা স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগে সাহসী এমন লোকের সন্ধান পেতে হলে যেতে হত অবিদ্বানদের মধ্যে, তখন যাদের বলা হত 'মহা অধৌত' সেই তাদের মধ্যে, শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ করে ওয়েনপন্থী সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে।

কিন্তু অতঃপর ইংলন্ড 'সুসভ্য' হয়েছে। ১৮৫১ সালের প্রদর্শনী (১৪) থেকে দ্বীপবদ্ধ ইংরেজি বিচ্ছিন্নতার অন্ত্যেষ্টি ঘণ্টা বাজে। ধীরে ধীরে ইংলন্ডের আন্তর্জাতীয়করণ হয়েছে খাদ্যে, আচার-আচরণে, ভাবনায়; এতটা পরিমাণে হয়েছে যে ইচ্ছে হয় ইউরোপ ভূখণ্ডের অন্যান্য অভ্যাস এখানে যেমন চালু হয়েছে তেমনি কিছু ইংরেজি আচার-ব্যবহারও ইউরোপ ভূখণ্ডে সমান চালু হোক। যাই হোক, স্যালাড-তেলের প্রবর্তন ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে (১৮৫১ সালের আগে তা কেবল অভিজাতদের কাছেই সুবিদিত ছিল) ধর্ম বিষয়ে ইউরোপীয় ভূখণ্ডসুলভ সংশয়বাদেরও একটা মারাত্মক প্রসার ঘটেছে; এবং তা এতদূর গড়িয়েছে যে, ইংলন্ডের রাষ্ট্রীয় চার্চের (১৫) মতো ঠিক অতোটা 'আসল জিনিস' বলে এখনো গণ্য না হলেও অজ্ঞেয়বাদ শালীনতার দিক থেকে প্রায় ব্যাপটিস্ট (১৬) মতবাদের সমতুল্য এবং নিশ্চিতই 'স্যালভেশন আর্মির' (১৭) চেয়ে উচ্চে। না ভেবে পারি না যে, এই অবস্থায় নাস্তিকতার এ প্রসারে যাঁরা আন্তরিকভাবেই ক্ষুব্ধ ও তার নিন্দক, তাঁরা এই জেনে সান্ত্বনা পেতে পারেন যে, এই সব 'হালফিল চালু ধারণাগুলো' বিদেশ থেকে আমদানি নয়, দৈনন্দিন ব্যবহারের বহু সামগ্রীর মতো 'মেড-ইন-জার্মানি' নয়, বরং নিঃসন্দেহেই তা সাবেকী বিলাতী, এবং উত্তরপুরুষেরা এখন যতটা সাহস করে না দু'শ' বছর আগে তার চেয়েও অনেক দূর এগিয়েছিলেন তাঁদের ব্রিটিশ আদিপুরুষেরা।

বস্তুতপক্ষে, ল্যাংকাশায়ারের একটা কথা ব্যবহার করলে অজ্ঞেয়বাদ 'সসঙ্কোচ' বস্তুবাদ ছাড়া আর কী? প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞেয়বাদীর ধারণা আগাগোড়া বস্তুবাদী। সমগ্র প্রাকৃতিক জগৎ নিয়মে শাসিত, বাইরে থেকে তার ক্রিয়ায় কোনো হস্তক্ষেপের কথা একেবারে ওঠে না। কিন্তু, অজ্ঞেয়বাদী যোগ করে, জ্ঞাত বিশ্বের অতিরিক্ত কোনো পরম সত্তার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন অথবা

খন্ডনের কোনো উপায় আমাদের নেই। এ কথা হয়ত বা খাটত সেকালে যখন সেই মহান জ্যোতির্বিজ্ঞানীর 'Mécanique céleste'* গ্রন্থে স্রষ্টার উল্লেখ নেই কেন, নেপোলিয়নের এই প্রশ্নে লাপ্লাস সগর্বে জবাব দেন: 'Je n'avais pas besoin de cette hypothèse'**। কিন্তু বর্তমানে, বিশ্বের বিবর্তনী ধারণায় স্রষ্টা বা নিয়ন্তার কোনো স্থানই নেই; বিদ্যমান সমগ্র বিশ্ব থেকে বহির্ভূত এক পরম সত্তার কথা বলা স্ববিরোধসূচক, এবং আমার মনে হয়, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রতি একটা অকারণ অপমান।

অপিচ, আমাদের অজ্ঞেয়বাদী মানেন যে, জ্ঞানের ভিত্তি হল ইন্দ্রিয়-দত্ত সংবাদ। কিন্তু তিনি যোগ করেন, ইন্দ্রিয়ের মারফত যে বস্তুর বোধ হচ্ছে তার সঠিক প্রতিচ্ছবিই যে ইন্দ্রিয় আমাদের দিয়েছে তা জানলাম কী করে? অতঃপর তিনি আমাদের জানিয়ে দেন, বস্তু বা তার গুণের কথা তিনি যখন বলেন তখন তিনি আসলে এসব বস্তু বা গুণের কথা বলছেন না, নিশ্চিত করে তার কিছু জানা সম্ভব নয়, স্বীয় ইন্দ্রিয়ের ওপর তারা যে ছাপ ফেলেছে শুধু তারই কথা বলছেন। এধরনের কথাকে কেবল যুক্তি বিস্তার করে হারানো বোধ হয় সত্যিই শক্ত। কিন্তু যুক্তি বিস্তারের আগে হল ক্রিয়া। 'In Anfang war dieThat'.*** এবং মানবিক অতিবুদ্ধি এ সমস্যা আবিষ্কার করার আগেই মানবিক কর্মে তার সমাধান হয়ে গেছে। পুডিং-এর যাচাই তার ভক্ষণে। এই সব বস্তুর অনুভূত গুণাগুণ অনুসারে বস্তুটা আমাদের নিজেদের কাজে লাগালেই আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলির সঠিকতা বা বেঠিকতার একটা নির্ভুল যাচাই হয়ে যায়। আমাদের এই অনুভূতিগুলি যদি ভুল হত, তাহলে সে বস্তুর ব্যবহারোপযোগিতা সম্পর্কে আমাদের হিসাবও ভুল হতে বাধ্য এবং সব চেষ্টা বিফল হত। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যে সিদ্ধ করতে যদি আমরা সক্ষম হই, যদি দেখা যায় যে, বস্তুটা সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা তার সঙ্গে সে বস্তু মিলছে, তাকে যে উদ্দেশ্যে লাগাতে

---

* P. S. Laplace, 'Traité de mécanique céleste', Vol. I-V. Paris, 1799-1825. — সম্পাঃ

** 'এ প্রকল্পের কোনো আবশ্যক আমার ছিল না।' — সম্পাঃ

*** 'আদিতে ছিল কর্ম।' — গ্যেটের 'ফাউস্ট' থেকে। — সম্পাঃ

চাইছি তা হাসিল হচ্ছে, তাহলেই পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে যায় যে, সে বস্তু এবং তার গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি **ততটা পর্যন্ত** মিলে যাচ্ছে আমাদের বহিঃস্থিত বাস্তবের সঙ্গে। যদি বা বিফলতার সম্মুখীন হই, তাহলে সে বিফলতার কারণ বার করতে সাধারণত দেরি হয় না; দেখা যায়, যে অনুভূতির ভিত্তিতে আমরা কাজ করেছি সেটা হয় অসম্পূর্ণ ও ভাসাভাসা, নয় অন্যান্য অনুভূতির ফলাফলের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত যা আবশ্যক নয়— একে আমরা বলি যুক্তির ত্রুটি। ইন্দ্রিয়গুলিকে ঠিকমতো পরিশীলিত ও ব্যবহৃত করতে, এবং সঠিকভাবে গৃহীত ও সঠিকভাবে ব্যবহৃত অনুভূতি দ্বারা নির্দিষ্ট আওতার মধ্যে কর্মকে সীমাবদ্ধ রাখতে যতক্ষণ আমরা সচেষ্ট, ততক্ষণ পর্যন্ত দেখা যাবে যে, আমাদের কর্মের ফলাফল থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে অনুভূত বস্তুর বিষয়গত প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের অনুভূতির মিল রয়েছে। এযাবৎ একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় নি যাতে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, বৈজ্ঞানিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি দ্বারা আমাদের মনে বহির্জগৎ সম্পর্কে যে ধারণা উপজিত হচ্ছে তা তৎপ্রকৃতিগতভাবেই বাস্তব থেকে বিভিন্ন, কিংবা বহির্জগৎ ও সে বিষয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত গরমিল বর্তমান।

কিন্তু তখন আসেন নয়া-কাণ্টপন্থী অজ্ঞেয়বাদীরা এবং বলেন: হাঁ, একটা বস্তুর গুণাগুণ বোধ আমাদের সঠিক হতে পারে কিন্তু কোনো ইন্দ্রিয়গত বা মনোগত প্রকরণেই প্রকৃত-বস্তুটাকে (thing-in-itself) আমরা ধরতে পারি না। এই 'প্রকৃত-বস্তু' আমাদের জ্ঞানসীমার বাইরে। এর উত্তরে হেগেল বহু পূর্বেই বলেছিলেন: একটা বস্তুর সমস্ত গুণই যদি জানা যায় তাহলে আসল বস্তুটাকেই জানা হল; বাকি যা রইল সেটা এই সত্য ছাড়া কিছুই নয় যে, বস্তুটা আমাদের বাইরে বর্তমান; এবং ইন্দ্রিয় মারফত এই সত্যটি শেখা হলেই 'প্রকৃত-বস্তুটির', কাণ্টের বিখ্যাত অজ্ঞেয় Ding an sich-এর চূড়ান্ত অবশেষটিও জানা হয়ে যায়। এর সঙ্গে যোগ দেওয়া যেতে পারে যে, কাণ্টের কালে প্রাকৃতিক বস্তু বিষয়ে আমাদের জ্ঞান ছিল এতই টুকরো টুকরো যে, প্রত্যেকটা বস্তুর যেটুকু আমরা জানতাম তার পরেও একটা রহস্যময় 'প্রকৃত-বস্তুর' সন্দেহ তার স্বাভাবিক। কিন্তু একের পর এক এই সব অধরা বস্তুগুলোকে ধরা হয়েছে, বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং আরো বড়ো কথা,

পুনরুৎপন্ন করা হয়েছে বিজ্ঞানের অতিকায় প্রগতির কল্যাণে; আর যেটাকে আমরা উৎপন্ন করতে পারি সেটাকে নিশ্চয় অজ্ঞেয় বলে গণ্য করা যায় না। এ শতকের প্রথমার্ধে জৈব বস্তুগুলি ছিল রসায়নের কাছে এই ধরনের রহস্য-বস্তু; এখন জৈব প্রক্রিয়া ব্যতিরেকেই রাসায়নিক মৌলিক উপাদান থেকে একের পর এক তাদের বানাতে আমরা শিখেছি। আধুনিক রসায়নবিদরা ঘোষণা করেন, যে-বস্তুই হোক না কেন তার রাসায়নিক সংবিন্যাস জানতে পারলেই মৌলিক উপাদান থেকে তাকে তৈরি করা যায়। উচ্চ পর্যায়ের জৈব বস্তুর, এ্যালবুমিন-বস্তুর সংবিন্যাস এখনো আমরা জানতে পারি নি; কিন্তু কয়েক শতাব্দীর পরেও তার জ্ঞান অর্জিত হবে না এবং তার সাহায্যে কৃত্রিম এ্যালবুমিন তৈরি করতে পারব না, এর কোনো যুক্তি নেই। যদি তা পারি, তাহলে সেই সঙ্গে জৈব জীবনও আমরা সৃষ্টি করতে পারব, কেননা এ্যালবুমিন-বস্তুর অস্তিত্বের স্বাভাবিক ধরন হল জীবন—তার নিম্নতম থেকে উচ্চতম রূপ পর্যন্ত।

এই সব আনুষ্ঠানিক মানসিক কুণ্ঠা পেশ করার পরেই কিন্তু আমাদের অজ্ঞেয়বাদীর কথা ও কাজ একেবারে এক ঝানু বস্তুবাদীর মতো, যা তাঁর আসল স্বরূপ। অজ্ঞেয়বাদী হয়ত বলবেন: **আমরা** যতটা জেনেছি তাতে পদার্থ ও গতিকে, অথবা বর্তমানে তার যা নাম তেজকে (energy) সৃষ্টিও করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না, কিন্তু কোনো না কোনো সময়ে যে তার সৃষ্টি হয় নি এমন প্রমাণ আমাদের নেই। কিন্তু কোনো একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাঁর এই স্বীকৃতি তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে গেলেই তিনি বাদীর বক্তব্যাধিকার খারিজ করে দেবেন। In abstracto (বিমূর্ত ক্ষেত্রে) অধ্যাত্মবাদ (১৮) মানলেও in concreto (প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে) তা তিনি মোটেই মানতে রাজী নন। বলবেন: যতদূর আমরা জানি ও জানতে পারি তাতে বিশ্বের কোনো স্রষ্টা বা নিয়ন্তা নেই; আমাদের সঙ্গে যতটা সম্পর্ক তাতে পদার্থ বা তেজ সৃষ্টিও করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না; আমাদের ক্ষেত্রে ভাবনা হল তেজের একটা ধরন, মস্তিষ্কের একটা ক্রিয়া; যা কিছু আমরা জানি তা এই যে, বাস্তব জগৎ অমোঘ নিয়ম দ্বারা শাসিত, ইত্যাদি। অর্থাৎ, যে ক্ষেত্রে তিনি বৈজ্ঞানিক মানুষ, যে ক্ষেত্রে তিনি কোনো কিছু **জানেন,** সে ক্ষেত্রে তিনি বস্তুবাদী; কিন্তু তাঁর বিজ্ঞানের বাইরে যে বিষয়ে তিনি কিছুই

জানেন না, সে অজ্ঞতাকে তিনি গ্রীকে অনুবাদ করে বলেন agnosticism বা অজ্ঞেয়বাদ।

যাই হোক, একটা জিনিস মনে হয় পরিষ্কার: আমি যদি অজ্ঞেয়বাদী হতাম, তাহলেও এই ছোট বইখানিতে ইতিহাসের যে ধারণা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেটাকে 'ঐতিহাসিক অজ্ঞেয়বাদ' বলে বর্ণনা করা যে যেত না তা স্পষ্ট। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা হাসাহাসি করতেন, অজ্ঞেয়বাদীরা সরোষে প্রশ্ন করতেন, আমি কি তাঁদের নিয়ে তামাসা শুরু করেছি? তাই আশা করি ব্রিটিশ শালীনতাবোধও অতিমাত্রায় স্তম্ভিত হবে না যদি ইংরেজি তথা অপরাপর বহু ভাষায় 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' কথাটি আমি ব্যবহার করি ইতিহাস ধারার এমন একটা ধারণা বোঝাবার জন্য, যাতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার মূল কারণ ও মহতী চালিকা-শক্তির সন্ধান করা হয় সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে, উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির পরিবর্তনের মধ্যে, তৎকারণে বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের বিভাগের মধ্যে এবং এই সব শ্রেণীর পারস্পরিক সংগ্রামের মধ্যে।

এ প্রশ্রয় বোধ হয় আরো পাওয়া সম্ভব যদি দেখানো যায় যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ব্রিটিশ শালীনতার পক্ষেও সুবিধাজনক হতে পারে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে ইংলণ্ডে বসবাস করতে গিয়ে বিদগ্ধ বিদেশীদের যেটা বিস্মিত করত সেটাকে তাঁরা ইংরেজ শালীন মধ্য শ্রেণীর ধর্মীয় গোঁড়ামি আর নির্বুদ্ধিতা বলে গণ্য করতে বাধ্য হতেন। আমি এবার প্রমাণ করতে চাই যে, বিদগ্ধ বিদেশীর কাছে সেসময় শালীন ইংরেজ মধ্য শ্রেণী ঠিক যতটা নির্বোধ বলে মনে হত ততটা নির্বোধ তারা ছিল না। তাদের ধর্মীয় প্রবণতার ব্যাখ্যা আছে।

ইউরোপ যখন মধ্য যুগ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন শহরের উদীয়মান মধ্য শ্রেণী ছিল তার বিপ্লবী অংশ। মধ্যযুগীয় সামন্ত সংগঠনের মধ্যে তারা একটা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠা অর্জন করে নিয়েছিল, কিন্তু সে প্রতিষ্ঠাও তার বর্ধমান ক্ষমতার তুলনায় অতি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে; মধ্য শ্রেণীর, **বুর্জোয়ার** বিকাশের সঙ্গে সামন্ত ব্যবস্থার সংরক্ষণ খাপ খাচ্ছিল না; সুতরাং সামন্ত ব্যবস্থার পতন হতে হল।

কিন্তু সামন্ততন্ত্রের বিরাট আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ছিল রোমক ক্যাথলিক চার্চ। অভ্যন্তরীণ যুদ্ধাদি সত্ত্বেও তা সমগ্র সামন্ততান্ত্রিক প্রতীচ্য ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করে এক বিরাট রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং তা ছিল যেমন ধর্মগত বিভেদ-দীর্ণ গ্রীক দেশগুলির বিরোধী, তেমনি মুসলিম দেশগুলির বিরোধী। সামন্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে এ চার্চ স্বর্গীয় আশীর্বাণীর জ্যোতির্ভূষিত করে। সামন্ত কায়দায় এ চার্চ নিজের সোপানতন্ত্র গড়ে তোলে এবং শেষত, এ চার্চ নিজেই ছিল প্রবলতম এক সামন্ত অধিপতি, ক্যাথলিক জগতের পুরো এক তৃতীয়াংশ জমি ছিল এর দখলে। দেশে দেশে এবং সবিস্তারে অনৈশ্বরিক সামন্ততন্ত্রকে সফলভাবে আক্রমণ করার আগে তার এই পবিত্র কেন্দ্রীয় সংগঠনটিকে ধ্বংস করার দরকার ছিল।

তাছাড়া মধ্য শ্রেণীর অভ্যুদয়ের সমান্তরালে শুরু হয় বিজ্ঞানের বিপুল পুনরুজ্জীবন; ফের শুরু হয় জ্যোতির্বিজ্ঞান, বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরবৃত্তের চর্চা। শিল্পোৎপাদন বিকাশের জন্য বুর্জোয়ার দরকার ছিল একটা বিজ্ঞান, যা প্রাকৃতিক বস্তুর দৈহিক গুণাগুণ এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ক্রিয়া-পদ্ধতি নিরূপিত করবে। এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান হয়ে ছিল গির্জার বিনীত সেবাদাসী, ধর্মবিশ্বাসের আরোপিত সীমা তাকে লঙ্ঘন করতে দেওয়া হত না, সেই কারণে তা আদৌ বিজ্ঞানই ছিল না। বিজ্ঞান বিদ্রোহ করল গির্জার বিরুদ্ধে; বিজ্ঞান ছাড়া বুর্জোয়ার চলছিল না, তাই সে বিদ্রোহে যোগ দিতে হল তাকে।

প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সঙ্গে উদীয়মান মধ্য শ্রেণী যে কারণে সংঘাতে আসতে বাধ্য, তার শুধু দুটি ক্ষেত্র এই যে ছুঁয়ে গেলাম। তা সত্ত্বেও এটা দেখানোর পক্ষে তা যথেষ্ট যে, প্রথমত, ক্যাথলিক চার্চের দাবির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর; এবং দ্বিতীয়ত, সেসময় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিটি সংগ্রামকেই নিতে হত ধর্মীয় ছদ্মবেশ, পরিচালিত করতে হত সর্বাগ্রে চার্চের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ও শহরের ব্যবসায়ীরা কলরবের সূত্রপাত করলেও প্রবল সাড়া পাওয়া নিশ্চিত ছিল এবং পাওয়া যায় ব্যাপক গ্রামবাসীদের মধ্যে, চাষীদের মধ্যে—আধ্যাত্মিক ও ইহজাগতিক সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে যাদের সংগ্রাম করতে হত নিতান্ত প্রাণধারণের জন্যই।

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় বুর্জোয়ার দীর্ঘ সংগ্রাম পরিণতি পায় তিনটি বড়ো বড়ো নির্ধারক লড়াইয়ের মধ্যে।

প্রথমটিকে বলা হয় জার্মানির প্রটেস্টান্ট ধর্ম-সংস্কার (১৯)। চার্চের বিরুদ্ধে লুথার যে রণধ্বনি তোলেন তাতে সাড়া দেয় দুটি রাজনৈতিক চরিত্রের অভ্যুত্থান: প্রথমে ফ্রান্ট্স ফন জিকিঙ্গেনের নেতৃত্বে নিম্ন অভিজাতদের অভ্যুত্থান (১৫২৩), পরে—১৫২৫ সালের বিরাট কৃষকযুদ্ধ। দুটিই পরাজিত হয় প্রধানত যে-দলগুলির সবচেয়ে বেশি স্বার্থ, শহরের সেই বার্গারদের (সামন্ত অধিকার বহির্ভূত নাগরিক) অনিশ্চিতমতির ফলে, এ অনিশ্চিতমতির কারণ নিয়ে আলোচনা এখানে সম্ভব হচ্ছে না। সেই সময় থেকে স্থানীয় রাজন্য আর কেন্দ্রীয় শক্তির মধ্যে লড়াইয়ে সে সংগ্রামের অধঃপতন ঘটে এবং তার পরিণাম, ইউরোপের রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় জাতিগুলির ভেতর থেকে দুশ' বছরের জন্য জার্মানির মুছে যাওয়া। লুথারীয় রিফর্মেশন থেকে সৃষ্টি হল এক নতুন ধর্মমত, স্বৈরশক্তি রাজতন্ত্রেরই উপযোগী একটা ধর্ম। উত্তর-পূর্ব জার্মানির কৃষকেরা লুথারবাদ গ্রহণ করতে না করতেই স্বাধীন লোক থেকে তারা পরিণত হল ভূমিদাসে।

কিন্তু লুথার যেখানে পারেন নি, সেখানে জিতলেন কালভাঁ। কালভাঁ-র ধর্মমত ছিল তাঁর কালের সবচেয়ে সাহসী বুর্জোয়াদের উপযোগী। প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিক জগতে সাফল্য অসাফল্য মানুষের কর্ম বা বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার সাধ্যাতীত পরিস্থিতির ওপর, এই ঘটনাটার এক ধর্মীয় অভিব্যক্তি হল তাঁর ঐশ্বরিক নির্বন্ধ (predestination) মতবাদ। নির্ধারিত হচ্ছে কারো সংকল্পে নয়, কারো কর্মে নয়, উচ্চতর অজানা অর্থনৈতিক শক্তির কৃপায়; এটা সবিশেষ সত্য ছিল অর্থনৈতিক বিপ্লবের সেই এক যুগে যখন সমস্ত পুরনো বাণিজ্য পথ ও কেন্দ্রের জায়গায় আসছে নতুন পথ, নতুন কেন্দ্র, যখন ভারত ও আমেরিকা উন্মুক্ত হয়েছে দুনিয়ার কাছে, এবং যখন বিশ্বাসের পবিত্রতম অর্থনৈতিক প্রতীক, সোনা ও রুপোর দামও টলতে শুরু করেছে, ভেঙে পড়ছে। কালভাঁ-র গির্জা-গঠনতন্ত্র পুরোপুরি গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক। এবং ঈশ্বরের রাজত্ব যেখানে প্রজাতান্ত্রিক করে দেওয়া হয়েছে সেখানে ইহজগতের রাজত্ব কি থাকতে পারে রাজরাজড়া, বিশপ আর সামন্ত-প্রভুর অধীনে? জার্মান লুথারবাদ যে

ক্ষেত্রে রাজন্যদের হাতে বশংবদ হাতিয়ার হয়ে রইল, সে ক্ষেত্রে কালভাঁবাদ হল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠা করল একটি প্রজাতন্ত্র এবং ইংলণ্ডে সর্বোপরি স্কট্‌ল্যাণ্ডে গড়ে তুলল সক্রিয় প্রজাতান্ত্রিক পার্টি।

কালভাঁবাদের মধ্যে দ্বিতীয় মহান বুর্জোয়া অভ্যুত্থান পেল তার তৈরি সংগ্রামী মতবাদ। এ অভ্যুত্থান ঘটে ইংলণ্ডে। শহরের মধ্য শ্রেণী তাকে শুরু করে আর গ্রামাঞ্চলের মধ্য কৃষকরা (yeomanry) তা লড়ে শেষ করে। মজার ব্যাপার এই যে মহান তিনটি বুর্জোয়া অভ্যুত্থানেই লড়াইয়ের সৈন্যবাহিনী জোগায় কৃষকসম্প্রদায়, অথচ জয়লাভ হবার পরেই সে জয়লাভের অর্থনৈতিক ফলাফলে অতিনিশ্চিত যারা ধ্বংস হতে বাধ্য তারা হল এই কৃষকেরাই। ক্রমওয়েলের একশ' বছর পরে ইংলণ্ডের মধ্য কৃষককুল প্রায় অদৃশ্য হয়। মোটের ওপর মধ্য কৃষককুল ও শহরের প্লেবিয়ান অংশ না থাকলে একা বুর্জোয়ারা কখনোই চরম পরিণতি পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেত না এবং প্রাণদণ্ডের মঞ্চে কখনোই এনে দাঁড় করাত না প্রথম চার্লসকে। বুর্জোয়ার যে সমস্ত বিজয় তখন অর্জনযোগ্য হয়ে উঠেছে শুধু সেইগুলো লাভ করতে হলেও বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় আরো বহুদূর পর্যন্ত — ঠিক ১৭৯৩ সালের ফ্রান্স এবং ১৮৪৮ সালের জার্মানির মতো। বস্তুত এ যেন বুর্জোয়া সমাজের বিবর্তনের একটা নিয়ম বলেই মনে হয়।

বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের এই আধিক্যের পর অবশ্যই আসে অনিবার্য প্রতিক্রিয়া এবং যে সীমা পর্যন্ত সে প্রতিক্রিয়ার বজায় থাকা সম্ভব তাও সে ছাড়িয়ে যায়। একাদিক্রমে এদিক-ওদিক দোলার পর অবশেষে পাওয়া গেল নতুন ভারকেন্দ্র এবং তা থেকে শুরু হল একটা নতুন সূচনা। ইংলণ্ডের ইতিহাসের যে সমারোহী যুগটা ভদ্রসম্প্রদায়ের কাছে 'মহা বিদ্রোহ' নামে পরিচিত সেই যুগ ও তার পরবর্তী সংগ্রামগুলির অবসান হয় অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ এক ঘটনায়, উদারনৈতিক ঐতিহাসিকেরা যার নাম দিয়েছেন 'গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লব' (২০)।

নতুন সূচনাটি হল উদীয়মান মধ্য শ্রেণী ও ভূতপূর্ব সামন্ত-জমিদারদের মধ্যে আপস। এখনকার মতোই এ জমিদারদের অভিজাত বলা হলেও বহু আগে থেকেই তারা সেই পথ নিয়েছিল যাতে তারা হয়ে ওঠে বহু পরবর্তী যুগের ফ্রান্সের লুই ফিলিপের মতো 'রাজ্যের প্রথম বুর্জোয়া'। ইংলণ্ডের

পক্ষে সৌভাগ্যবশত সাদা ও লাল গোলাপের যুদ্ধের (২১) সময় বনেদী সামন্ত-ব্যারনেরা পরস্পরকে খতম করে। তাদের উত্তরাধিকারীরা অধিকাংশই প্রাচীন বংশোদ্ভূত হলেও প্রত্যক্ষ বংশধারা থেকে এতই দূরে যে, তারা একটা নতুন সম্প্রদায় হয়ে ওঠে, তাদের অভ্যাস ও মনোবৃত্তি সামন্ততান্ত্রিকের চেয়ে অনেক বেশি বুর্জোয়া। টাকার দাম তারা বেশ বুঝত এবং অবিলম্বেই শত শত ক্ষুদে চাষীকে উচ্ছেদ করে সে জায়গায় ভেড়া রেখে তারা খাজনা বেশি তুলতে শুরু করে। অষ্টম হেনরি গির্জার জমির হরির লুট করে পাইকারি হারে নতুন নতুন বুর্জোয়া জমিদার সৃষ্টি করেন; অসংখ্য মহালের বাজেয়াপ্তি ও একেবারে ভুঁইফোঁড় বা অপেক্ষাকৃত-ভুঁইফোঁড়দের কাছে তা ফের বিলি, গোটা সপ্তদশ শতাব্দী ধরে যা চলে, তাতেও একই ফল হয়। সুতরাং, সপ্তম হেনরির সময় থেকে ইংরেজ 'অভিজাতরা' শিল্প উৎপাদনের বিকাশে বাধা দেবার বদলে উল্টে সরাসরি তাই থেকেই মুনাফা তোলার চেষ্টা করেছে; এবং চিরকালই বড়ো বড়ো জমিদারদের এমন একটা অংশ ছিল যারা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণে অর্থপতি ও শিল্পজীবী বুর্জোয়াদের মাতব্বরদের সঙ্গে সহযোগিতায় ইচ্ছুক। ১৬৮৯ সালের আপস তাই সহজেই সাধিত হয়। 'সম্পত্তি ও চাকুরির' রাজনৈতিক লুট রইল বড়ো বড়ো ভূস্বামী বংশের জন্য এই শর্তে যে, অর্থপতি, কারখানাজীবী ও বাণিজ্যিক মধ্য শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ যথেষ্ট দেখা হবে। আর এই সব অর্থনৈতিক স্বার্থই ছিল তখন দেশের সাধারণ পলিসি নির্দেশ করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী। খুঁটিনাটি ব্যাপারে ঝগড়া হয়ত হত, কিন্তু মোটের ওপর অভিজাত গোষ্ঠীতন্ত্র খুব ভালোই জানত যে, তার নিজস্ব অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অনিবার্যরূপে জড়িয়ে আছে শিল্পজীবী ও বাণিজ্যিক মধ্য শ্রেণীর উন্নতির সঙ্গে।

সেই সময় থেকে ইংলন্ডের শাসক শ্রেণীগুলির একটি বিনীত কিন্তু তথাপি স্বীকৃত অংশ হল বুর্জোয়ারা। অন্যান্য শাসক শ্রেণীর সঙ্গে এদেরও সমান স্বার্থ ছিল দেশের বিপুল মেহনতীজনকে বশে রাখা। বণিক বা কারখানা--মালিক নিজেই হল তার কেরানী, তার মজুর, তার বাড়ির চাকরবাকরদের কাছে প্রভু, বা কিছু আগে পর্যন্তও যা বলা হত, 'স্বভাবতই ঊর্ধ্বতন'। তাদের কাছ থেকে যথাসাধ্য বেশি ও যথাসাধ্য ভালো কাজ আদায়

করাই তার স্বার্থ; সে উদ্দেশ্যে ঠিকমতো বাধ্যতার শিক্ষায় তাদের তালিম দেওয়ার কথা। নিজেই সে ছিল ধর্মভীরু; ধর্মের পতাকা নিয়েই সে রাজা ও লর্ডদের বিরুদ্ধে লড়ে জিতেছে; স্বভাবতই অধস্তনদের মনের ওপর প্রভাব ফেলে, তাদেরকে ঈশ্বর প্রসাদে স্থাপিত প্রভুটির আদেশাধীন করে তোলার দিক থেকে এ ধর্ম যে সুবিধা দান করছে তা আবিষ্কার করতে তার দেরি হয় নি। সংক্ষেপে 'ছোট লোকদের', দেশের বিপুল উৎপাদক জনগণকে দাবিয়ে রাখার কাজে ইংরেজ বুর্জোয়াকে এবার অংশ নিতে হচ্ছে এবং সে উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত অন্যতম একটা উপায় হল ধর্মের প্রভাব।

আর একটা ঘটনাও ছিল যাতে বুর্জোয়াদের ধর্মীয় প্রবণতা বেড়েছে। সেটা হল ইংলন্ডে বস্তুবাদের উদয়। এই নতুন মতবাদ মধ্য শ্রেণীর ধর্মানুভূতিতেই শুধু ঘা দেয় নি; বুর্জোয়া সমেত বিপুল অশিক্ষিত জনগণের যাতে বেশ চলে যায় সেই ধর্মের বিপরীতে এ মতবাদ নিজেকে জাহির করল কেবল দর্শন বলে, যা বিশ্বের পণ্ডিত ও বিদগ্ধ জনেরই যোগ্য। হব্‌সের হাতে বস্তুবাদ মঞ্চে আসে রাজকীয় বিশেষাধিকার ও সর্বশক্তিমত্তার সমর্থক হিশেবে। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে তা আহ্বান করে সেই puer robustus sed malitiosus* অর্থাৎ জনগণকে দমন করতে। একইভাবে হব্‌সের পরবর্তীদের — বলিংব্রক, শ্যাফ্‌ট্‌সবেরি ইত্যাদির নতুন বস্তুবাদী deistic ধারাটা থেকে যায় একটা অভিজাত, esoteric** মতবাদ হিশেবে এবং সেইহেতু মধ্য শ্রেণীর কাছে তা ঘৃণ্য হয়, তার ধর্মীয় ধৃষ্টোক্তি ও বুর্জোয়া বিরোধী রাজনৈতিক যোগাযোগ উভয় কারণেই। এইভাবে, অভিজাতদের deism ও বস্তুবাদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল মধ্য শ্রেণীর প্রধান শক্তি যোগাতে থাকল সেই সব প্রটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়েরাই যারা রণপতাকা ও সংগ্রামী বাহিনী জুগিয়েছিল স্টুয়ার্টদের বিরুদ্ধে, 'মহান উদারনৈতিক পার্টির' মেরুদণ্ড আজো পর্যন্ত তারাই।

ইতিমধ্যে ইংলন্ড থেকে বস্তুবাদ চলে যায় ফ্রান্সে, সেখানে আর একটি বস্তুবাদী দার্শনিক ধারার, কার্থেজিয়ানদের (২২) একটি শাখার সংস্পর্শে সে আসে ও তার সঙ্গে মিশে যায়। ফ্রান্সেও প্রথম দিকে বস্তুবাদ থাকে একটা

* তাগড়াই কিন্তু হিংস্র ছোকরা। — সম্পাঃ

** মন্ত্রগুপ্ত, শুধু দীক্ষিতের অধিগম্য। — সম্পাঃ

একান্তভাবে অভিজাত মতবাদ হিশেবে। কিন্তু অচিরেই তার বিপ্লবী চরিত্র আত্মপ্রকাশ করল। ফরাসী বস্তুবাদীরা শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই সমালোচনা সীমাবদ্ধ রাখল না; তৎকালীন বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা কিছু সামনে পড়ল সবেতেই প্রসারিত করল তাদের সমালোচনা; তাদের মতবাদের সার্বজনীন প্রয়োগযোগ্যতার দাবি প্রমাণের জন্য সংক্ষিপ্ততম পন্থা অবলম্বন করে সাহসের সঙ্গে তা জ্ঞানের সবকটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করল এক অতিকায় রচনায়, 'Encyclopédie'-য় যা থেকে তাদের নাম। এইভাবে খোলাখুলি বস্তুবাদ বা deism, এই দুই ধারার কোনো না কোনো একটা রূপে বস্তুবাদ হয়ে দাঁড়াল ফ্রান্সের সমগ্র সংস্কৃতিবান যুবসমাজের মতবাদ; এতটা পরিমাণে হল যে, মহান বিপ্লব যখন শুরু হয় তখন ইংরেজ রাজতন্ত্রীদের সৃষ্ট মতবাদটা থেকেই এল ফরাসী প্রজাতন্ত্রী ও সন্ত্রাসবাদীদের তাত্ত্বিক ধ্বজা, এবং 'মানবিক ও নাগরিক অধিকার ঘোষণাপত্রের' (২৩) বয়ান।

মহান ফরাসী বিপ্লব হল বুর্জোয়াদের তৃতীয় অভ্যুত্থান, কিন্তু এই প্রথম বিপ্লব যা ধর্মের আলখাল্লাটা একেবারে ছুঁড়ে ফেলে এবং লড়াই চালায় অনাবরণ রাজনৈতিক ধারায়। এদিক থেকেও এটা প্রথম যে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের একপক্ষের, অর্থাৎ অভিজাতদের বিনাশ এবং অন্যপক্ষের, বুর্জোয়ার পরিপূর্ণ জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত সত্যি করেই সে লড়াই চালিয়ে যাওয়া হয়। ইংলন্ডে প্রাক্-বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর প্রতিষ্ঠানাদির ধারাবাহিকতা এবং জমিদার ও পুঁজিপতিদের মধ্যেকার আপসের প্রকাশ হয় আদালতী নজিরের ধারাবাহিকতায় এবং আইনের সামন্ততান্ত্রিক রূপগুলির ধর্মীয় সংরক্ষণে। ফ্রান্সে অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে একটা পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটায় বিপ্লব; সামন্ততন্ত্রের শেষ জেরটুকুও তা সাফ করে Code Civil-এর (২৪) মাধ্যমে আধুনিক পুঁজিবাদী পরিস্থিতির উপযোগী করে চমৎকার খাপ খাইয়ে নেয় প্রাচীন রোমক আইন-সংহিতাকে—মার্কস যাকে বলেছিলেন পণ্যোৎপাদন, সেই অর্থনৈতিক পর্যায়ের অনুসারী আইনী সম্পর্কের একটি প্রায় নিখুঁত প্রকাশ ছিল তাতে,—এমন চমৎকার খাপ খাইয়ে নেয় যে, এই ফরাসী বিপ্লবী বিধি-সংহিতাটি আজো পর্যন্ত অন্য সব দেশের সম্পত্তি-আইন সংস্কারের আদর্শস্বরূপ, ইংলন্ডও বাদ নয়। অবশ্য, ইংরেজি আইন যদিও পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রকাশ করে চলেছে সেই এক বর্বর

সামন্ততান্ত্রিক ভাষায় যার সঙ্গে উদ্দিষ্ট বস্তুর ততটাই সাদৃশ্য যতটা সাদৃশ্যে ইংরেজি বানানের সঙ্গে ইংরেজি উচ্চারণের — vous écrivez Londres et vous prononcez Constantinople* বলেছিলেন জনৈক ফরাসী — তবু একথা ভোলা ঠিক নয় যে, সেই একই ইংরেজি আইনই একমাত্র আইন যা প্রাচীন জার্মান ব্যক্তি-স্বাধীনতা, স্থানীয় স্বশাসন এবং আদালত ছাড়া অন্য সমস্ত হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তির সেরা অংশটিকে যুগে যুগে রক্ষা করে এসেছে এবং প্রেরণ করেছে আমেরিকা ও উপনিবেশে — নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের যুগে ইউরোপ ভূখন্ড থেকে এ জিনিসটা লোপ পায় এবং এখনো পর্যন্ত কোথাও তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় নি।

আমাদের ব্রিটিশ বুর্জোয়ার কথায় ফেরা যাক। ফরাসী বিপ্লবের ফলে তার একটা চমৎকার সুযোগ হল ইউরোপ ভূখন্ডের রাজতন্ত্রগুলির সাহায্যে ফরাসী নৌবাণিজ্য ধ্বংস, ফরাসী উপনিবেশ অধিকার এবং জলপথে ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ দাবিটাকেও চূর্ণ করার। ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ বুর্জোয়া যে লড়েছিল তার একটা কারণ এই। আর একটা কারণ, এ বিপ্লবের ধরণ-ধারণটা তার রুচিতে বড়ো বেশি বেধেছিল। তার 'জঘন্য' সন্ত্রাসটাই শুধু নয়, বুর্জোয়া শাসনকে চরমে নিয়ে যাবার চেষ্টাটাই। তাদের যে অভিজাতরা ব্রিটিশ বুর্জোয়াকে নিজেদের আদব-কায়দা শিখিয়ে তুলেছে, ফ্যাশন উদ্ভাবন করে দিয়েছে তার জন্য, যারা অফিসার যুগিয়েছে সেই সৈন্যবাহিনীতে, যা শৃঙ্খলা রক্ষা করেছে স্বদেশে, এবং সেই নৌবাহিনীতে, যা জয় করে দিয়েছে ঔপনিবেশিক সম্পত্তি এবং বিদেশের নতুন নতুন বাজার — তাদের বাদ দিয়ে ব্রিটিশ বুর্জোয়ার চলে কী করে? বুর্জোয়াদের একটা প্রগতিশীল সংখ্যালঘু অংশ অবশ্য ছিল, আপসের ফলে এ সংখ্যালঘুর স্বার্থ তত বেশি দেখা হচ্ছিল না। প্রধানত অপেক্ষাকৃত কম সম্পন্ন মধ্য শ্রেণীর তৈরি এই অংশটার সহানুভূতি ছিল বিপ্লবের প্রতি, কিন্তু পার্লামেণ্টে তার ক্ষমতা ছিল না।

এভাবে বস্তুবাদ যতই হয়ে ওঠে ফরাসী বিপ্লবের মতবাদ, ততই ধর্মভীরু ইংরেজ বুর্জোয়া আরো বেশি আঁকড়ে ধরে ধর্ম। জনগণের ধর্মচেতনা লোপ

---

* লেখেন লন্ডন কিন্তু উচ্চারণ করেন কনস্টানটিনোপল। — সম্পাঃ

পেলে তার ফল কী দাঁড়ায় তা কি প্যারিস সন্ত্রাসের কালে প্রমাণ হয় নি? বস্তুবাদ যতই ফ্রান্স থেকে আশেপাশের দেশে ছড়িয়ে শক্তি সঞ্চয় করছিল অনুরূপ মতধারা থেকে, বিশেষ করে জার্মান দর্শন থেকে, সাধারণভাবে স্বাধীন চিন্তা ও বস্তুবাদ যতই ইউরোপ ভূখণ্ডে বস্তুতপক্ষে বিদগ্ধ ব্যক্তির অনিবার্য গুণস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, ততই গোঁ ধরে ইংরেজ মধ্য শ্রেণী আঁকড়ে রইল তার বহুবিধ ধর্মবিশ্বাসকে। এসব ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে পারস্পরিক তফাৎ যতই থাকুক তাদের সবকটিই হল পরিষ্কার রকমের ধর্মীয়, খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস।

বিপ্লব যখন ফ্রান্সে বুর্জোয়ার রাজনৈতিক বিজয় নিশ্চিত করছিল, সেই সময় ইংলণ্ডে ওয়াট, আর্করাইট, কার্টরাইট প্রভৃতিরা সূচিত করেন এক শিল্প বিপ্লবের, অর্থনৈতিক শক্তির ভারকেন্দ্র তাতে পুরোপুরি সরে যায়। ভূমিজীবী অভিজাতদের চেয়ে বুর্জোয়ার সম্পদ বেড়ে উঠতে লাগল অতি দ্রুতগতিতে। খাস বুর্জোয়ার মধ্যেই অর্থপতি অভিজাত, ব্যাংকার প্রভৃতিদের ক্রমেই পেছনে ঠেলে এগিয়ে এল কারখানা-মালিকেরা। ১৬৮৯ সালের আপস এযাবৎ ক্রমশ বুর্জোয়ার অনুকূলে পরিবর্তিত হয়ে এলেও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পারস্পরিক অবস্থানের সঙ্গে তা আর খাপ খাচ্ছিল না। পক্ষগুলির চরিত্রেও বদল হয়েছে; ১৮৩০ সালের বুর্জোয়ারা আগের শতকের বুর্জোয়ার চেয়ে ভয়ানক পৃথক। অভিজাতদের হাতে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা তখনো থেকে গিয়েছিল এবং নতুন শিল্পজীবী বুর্জোয়ার দাবি-দাওয়া প্রতিরোধে যা ব্যবহৃত হচ্ছিল, তা নতুন অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হয়ে দাঁড়ায়। অভিজাতদের সঙ্গে একটা নতুন লড়াইয়ের প্রয়োজন পড়ল; তার পরিণতি হতে পারত কেবলমাত্র নতুন অর্থনৈতিক শক্তির জয়লাভে। প্রথমে, ১৮৩০ সালের ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে, সমস্ত প্রতিরোধ সত্ত্বেও সংসদ-সংস্কারের (২৫) কাজ সমাপ্ত হয়। এতে পার্লামেণ্টে বুর্জোয়ারা পেল একটা শক্তিশালী ও সর্বজনস্বীকৃত প্রতিষ্ঠা। তারপর শস্য আইন বরবাদ (২৬), এতে ভূমিজীবী অভিজাতদের ওপর বুর্জোয়ার, বিশেষ করে তার সবচেয়ে সক্রিয় অংশ — কারখানা-মালিকদের প্রাধান্য চিরকালের মতো নির্দিষ্ট হয়ে গেল। বুর্জোয়ার এই সবচেয়ে বড়ো জয়; একান্ত নিজের স্বার্থে অর্জিত বিজয় হিশেবে এই আবার কিন্তু তার শেষ বিজয়। পরে যা কিছু সে জিতেছে তা

ভাগ করে নিতে হয়েছে নতুন একটা সামাজিক শক্তির সঙ্গে, এ শক্তি ছিল প্রথমে তার সহায়, কিন্তু অচিরেই হয়ে দাঁড়াল তার প্রতিদ্বন্দ্বী।

শিল্প বিপ্লবে বৃহৎ কারখানা-মালিক পুঁজিপতিদের একটা শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল তাদের চেয়ে অনেক সংখ্যাবহুল কারখানা-কর্মীদের একটা শ্রেণী। যে অনুপাতে শিল্প বিপ্লব উৎপাদনের একটা শাখার পর আর একটা শাখা অধিকার করতে থাকে সেই অনুপাতে এ শ্রেণী ক্রমশ সংখ্যায় বেড়ে ওঠে এবং সেই অনুপাতেই হয়ে ওঠে শক্তিশালী। ১৮২৪ সালেই এ শক্তির প্রমাণ সে দেয়—শ্রমিকদের সমিতি গঠনের নিষেধ-আইন নাকচ করতে অনিচ্ছুক পার্লামেণ্টকে বাধ্য করে (২৭)। সংস্কার আন্দোলনের সময় শ্রমিকেরা ছিল সংস্কার-দলের (Reform party) র‍্যাডিকেল অংশ; ১৮৩২ সালের আইনে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করায় তারা জনগণের চার্টার বা সনদে (২৮) নিজেদের দাবি-দাওয়া নির্দিষ্ট করে শস্য আইনবিরোধী শক্তিশালী লীগের (২৯) বিপরীতে নিজেদের সংগঠিত করে এক স্বাধীন চার্টিস্ট পার্টিতে, আধুনিক কালে এ-ই প্রথম শ্রমিক পার্টি।

তারপর শুরু হয় ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চে ইউরোপ ভূখণ্ডের বিপ্লবগুলি। এতে শ্রমিকজন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা নেয় এবং, অন্তত প্যারিসে, তারা যেসব দাবি-দাওয়া উপস্থিত করে পুঁজিবাদী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা ছিল নিশ্চিতই অননুমোদনীয়। তারপর শুরু হয় সাধারণ প্রতিক্রিয়া। প্রথমে, ১৮৪৮ সালে ১০ এপ্রিল চার্টিস্টদের পরাজয় (৩০), তারপর সেই বছরেই জুনে প্যারিস শ্রমিকদের অভ্যুত্থান দমন, তারপর ইতালি, হাঙ্গেরি, দক্ষিণ জার্মানিতে ১৮৪৯ সালের বিপর্যয়, পরিশেষে ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর প্যারিসের ওপর লুই বোনাপার্টের জয় (৩১)। অন্তত কিছু কালের জন্য শ্রমিক দাবি-দাওয়ার জুজুটাকে দমন করা গেল, কিন্তু কী মূল্য দিয়ে! সাধারণ লোককে ধর্মভীরু করে রাখার প্রয়োজনীয়তা যদি ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা আগেই বুঝে থাকে, তবে এত সব অভিজ্ঞতার পর সে প্রয়োজনীয়তা তারা আরো কত বেশিই না টের পাচ্ছে! ইউরোপ ভূখণ্ডের ভাই-বন্ধুদের বিদ্রূপের পরোয়া না করে তারা নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বাইবেল প্রচারের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে চলেছে; নিজেদের স্বদেশী

ধর্মযন্ত্রে তুষ্ট না হয়ে তারা আবেদন জানিয়েছে ধর্মব্যবসার বৃহত্তম সংগঠক 'জোনাথান ভাইয়ের' (৩২) কাছে এবং আমেরিকা থেকে আমদানি করেছে রিভাইভ্যালিজ্‌ম্‌ (৩৩), মুডি, স্যাঙ্কি প্রভৃতিদের; এবং পরিশেষে 'স্যালভেশন আর্মির' বিপজ্জনক সাহায্যও গ্রহণ করেছে—এরা আদি খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ফিরিয়ে আনছে, সেরা অংশ হিশেবে আবেদন করছে গরিবদের কাছে, পুঁজিবাদের সঙ্গে লড়ছে ধর্মের মধ্য দিয়ে এবং এইভাবে আদি খ্রীষ্টীয় শ্রেণী-বৈরের একটা বীজ লালন করে তুলছে, যে সম্পন্ন লোকেরা আজ এর জন্য নগদ টাকা ধরে দিচ্ছে তাদের কাছে যা হয়ত একদিন মুশকিল বাধাবে।

মনে হয় এ যেন ঐতিহাসিক বিকাশের একটা নিয়ম যে, মধ্য যুগে সামন্ত-অভিজাতরা যেভাবে একান্তরূপে নিজেদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রেখেছিল, কোনো ইউরোপীয় দেশেই বুর্জোয়ারা সেভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা রাখতে পারবে না—অন্তত বেশ কিছু দিনের জন্য। এমনকি সামন্ততন্ত্র যেখানে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেই ফ্রান্সেও বুর্জোয়ারা সমগ্রভাবে সরকারের পুরো দখল পেয়েছে কেবল অতি স্বল্পকালের জন্য। ১৮৩০-১৮৪৮ সালে লুই ফিলিপের রাজত্বকালে বুর্জোয়াদের একটা ক্ষুদ্র অংশই রাজ্য চালায়; যোগ্যতার কড়া শর্তের ফলে তাদের বড়ো অংশটাই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে, ১৮৪৮-১৮৫১ সালের মধ্যে, সমগ্র বুর্জোয়াই শাসন চালায়, কিন্তু কেবল তিন বছরের জন্য; তাদের অক্ষমতায় এল দ্বিতীয় সাম্রাজ্য। মাত্র এখন, তৃতীয় প্রজাতন্ত্রেই বুর্জোয়ারা সমগ্রভাবে সরকারের কর্ণধার হয়ে আছে কুড়ি বছরেরও বেশি কাল, এবং ইতিমধ্যেই তাদের অবক্ষয়ের শুভলক্ষণ ফুটে উঠছে। বুর্জোয়াদের একটা স্থায়ী শাসন সম্ভব হয়েছে কেবল আমেরিকার মতো দেশে, যেখানে সামন্ততন্ত্র অজানা এবং সমাজ প্রথম থেকেই শুরু হয় বুর্জোয়া ভিত্তিতে। এবং এমনকি ফ্রান্স ও আমেরিকাতেও বুর্জোয়ার উত্তরাধিকারী শ্রমিক জনগণ ইতিমধ্যেই দ্বারে করাঘাত শুরু করেছে।

ইংলণ্ডে বুর্জোয়াদের কখনোই একক ক্ষমতা ছিল না। ১৮৩২ সালের বিজয়ের পরেও ভূমিজীবী অভিজাতদের হাতে রেখে দেওয়া হয় প্রধান প্রধান সরকারী পদের প্রায় পূর্ণ দখল। ধনী মধ্য শ্রেণী যে রূপ বিনয়ে

এটা মেনে নেয় তা আমার কাছে দুর্বোধ্য ছিল ততদিন পর্যন্ত যতদিন না উদারনীতিক বৃহৎ কারখানা-মালিক মিঃ ডবলিউ. এ. ফর্স্টার প্রকাশ্য ভাষণে ব্র্যাডফোর্ডের যুবসম্প্রদায়ের কাছে আবেদন করেন দুনিয়ায় চলতে হলে ফরাসী শিখতে হবে, এবং নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিশেবে তাঁকে যখন এমন একটা মহলে চলাফেরা করতে হত যেখানে ফরাসী ভাষা অন্তত ইংরেজি ভাষার মতোই জরুরী, তখন তাঁকে কী আহাম্মকই না লাগত। আসলে তখনকার ইংরেজ মধ্য শ্রেণী ছিল সাধারণত একেবারে অশিক্ষিত ভুঁইফোঁড়, অভিজাতদের তারা উচ্চতর সেই সব সরকারী পদ না দিয়ে পারত না যেখানে ব্যবসায়ী চতুরতায় পোক্ত একটা নিতান্ত গণ্ডিবদ্ধ সংকীর্ণতা ও গণ্ডিবদ্ধ অহমিকা ছাড়াও অন্য যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল।* এমনকি এখনো মধ্য শ্রেণীর শিক্ষা বিষয়ে সংবাদপত্রের অন্তহীন বিতর্ক থেকে দেখা যায়, ইংরেজ মধ্য শ্রেণী এখনো নিজেকে সেরা শিক্ষার

* এমনকি ব্যবসার ক্ষেত্রেও জাতীয় শোভিনিজমের অহমিকা এক অতি কুপরামর্শ। হাল আমল পর্যন্ত গড়পড়তা ইংরেজ কারখানা-মালিক মনে করত নিজ ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলা ইংরেজের পক্ষে মর্যাদাহানিকর, বিদেশের 'বেচারা ভূতেরা' ইংলণ্ডে বসতি স্থাপন করে তার হাত থেকেই মাল নিয়ে বিদেশে বিক্রি করার ঝামেলা নিচ্ছে, এতে তার আর কিছু নয় বরং খানিকটা গর্বই হত। এটা তার কখনো নজরে আসে নি যে, এই বিদেশীরা, প্রধানত জার্মানরা, এইভাবে ব্রিটিশ বৈদেশিক বাণিজ্যের আমদানি-রপ্তানির একটা বড়ো অংশের ওপর দখল পেয়েছে এবং ইংরেজদের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে প্রায় একমাত্র কেবল উপনিবেশে, চীনে, যুক্তরাষ্ট্রে ও দক্ষিণ আমেরিকায়। এও সে খেয়াল করে নি যে, এই জার্মানদের সঙ্গে বিদেশে অন্যান্য জার্মানরা ব্যবসা ক'রে ক্রমশ সারা দুনিয়ায় বাণিজ্যিক উপনিবেশের একটা পুরো জাল গড়ে তুলছে। কিন্তু জার্মানি যখন প্রায় চল্লিশ বছর আগে সত্যি করেই রপ্তানির জন্য মাল তৈরি করতে লাগল, তখন শস্য-চালানী দেশ থেকে প্রথম শ্রেণীর কারখানা-মালিক দেশরূপে অত অল্প সময়ের মধ্যে তার রূপান্তরে এই বাণিজ্যিক জালটা তার চমৎকার কাজে লেগেছিল। তারপর, প্রায় দশ বছর আগে, ব্রিটিশ কারখানা-মালিকরা ভয় পেয়ে তার রাষ্ট্রদূত ও কন্সালদের প্রশ্ন করে, কেন তাদের খরিদ্দাররা টিকছে না। সকলে একবাক্যে জবাব দেয়: ১) আপনারা খরিদ্দারদের ভাষা শেখেন না, ভাবেন তাদেরই উচিত আপনাদের ভাষায় কথা বলা; ২) খরিদ্দারদের চাহিদা অভ্যাস রুচি ইত্যাদির সঙ্গেও মানিয়ে চলতে চান না, আশা করেন আপনাদের ইংরেজি চাহিদা অভ্যাস রুচি অনুসারেই সে চলবে। (এঙ্গেলসের টীকা।)

যোগ্য বলে মনে করছে না, কিছু কম-সমের দিকেই তার চোখ। সুতরাং, শস্য আইন বাতিল করার পরেও এ যেন স্বাভাবিক যে, কবডেন, ব্রাইট, ফর্স্টার প্রভৃতি যে লোকেরা জিতল তারা দেশের সরকারী শাসনের অংশ থেকে বঞ্চিত রইল পরবর্তী কুড়ি বছর পর্যন্ত, যতদিন না নতুন একটা সংসদীয় সংস্কারে (৩৪) ক্যাবিনেটের দ্বার উন্মুক্ত হয় তাদের জন্য। ইংরেজ বুর্জোয়ারা আজো পর্যন্ত তাদের সামাজিক হীনতাবোধে এত বেশি আচ্ছন্ন যে, সমস্ত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তারা যোগ্যরূপে জাতির প্রতিনিধিত্বের জন্য স্বীয় খরচায় এবং জাতির খরচায় এক দল শোভাবর্ধক নিষ্কর্মার প্রতিপালন করে চলেছে; এবং নিজেদের দ্বারাই তৈরি করা এই নির্বাচিত ও সুবিধাভোগী মহলে নিজেদের কেউ যখন প্রবেশাধিকারের যোগ্য বিবেচিত হয়, তখন ভয়ানক সম্মানিত বোধ করে তারা।

সুতরাং, শিল্পজীবী ও বাণিজ্যিক মধ্য শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে ভূমিজীবী অভিজাতদের সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করতে পারার আগেই মঞ্চে আবির্ভূত হল আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী, শ্রমিক শ্রেণী। চার্টিস্ট আন্দোলন ও ইউরোপ ভূখণ্ডের বিপ্লবগুলির পরেকার প্রতিক্রিয়া, তথা ১৮৪৮-১৮৬৬ সালের ব্রিটিশ বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে (স্থূলভাবে বলা হয় একমাত্র অবাধ বাণিজ্যই তার কারণ, তার চেয়েও কিন্তু অনেক বড়ো কারণ রেলপথ, সামুদ্রিক পোত, ও সাধারণভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপুল বিস্তার) শ্রমিক শ্রেণীকে ফের উদারনৈতিক দলের অধীনে যেতে হয়—প্রাক্-চার্টিস্ট যুগের মতো তারা হয় এ দলের র‍্যাডিকেল অংশ। তাদের ভোটাধিকারের দাবি কিন্তু ক্রমশই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে; উদারনীতিকদের হুইগ নেতারা যে ক্ষেত্রে 'ভয় পায়' সে ক্ষেত্রে ডিজরেলি তাঁর শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ দিয়ে টোরিদের (৩৫) পক্ষে অনুকূল মুহূর্তটিকে ব্যবহার করে আসনের পুনর্বণ্টন সহ প্রবর্তন করান 'বরো'-গুলিতে ঘর-পিছু ভোট (household suffrage in the boroughs)। অতঃপর প্রবর্তিত হয় ব্যালট (৩৬); তারপর ১৮৮৪ সালে কাউন্টিগুলিতেও ঘর-পিছু ভোটাধিকারের প্রসার এবং আসনের আরো একটা নববণ্টন যাতে নির্বাচনী এলাকাগুলি কিছুটা সমান সমান হয়ে আসে। এই সব ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর নির্বাচনী ক্ষমতা এতটা বেড়ে যায় যে, অন্তত দেড়শ' থেকে দুইশ'টি নির্বাচনী এলাকায় এ শ্রেণীর লোকেরাই

এবার হয় অধিকাংশ ভোটদাতা। কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান শেখানোর একটা খাসা ইস্কুল হল পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থা; লর্ড জন ম্যানার্স ঠাট্টা করে যাদের বলেছিলেন 'আমাদের সাবেকি অভিজাত' তাদের দিকে মধ্য শ্রেণী যদি তাকায় সভয়সম্ভ্রমে, তাহলে শ্রমিক শ্রেণীও শ্রদ্ধা সম্মান করে তাকাত মধ্য শ্রেণীর দিকে, যাদের অভিহিত করা হত তাদের 'শ্রেয়তর' বলে। বস্তুতপক্ষে, বছর পনের আগে ব্রিটিশ মজুর ছিল আদর্শ মজুর, মনিবের প্রতিষ্ঠার প্রতি তার সশ্রদ্ধ সম্মান এবং নিজের জন্য অধিকার দাবি করতে তার সংযমী বিনয় দেখে আমাদের **ক্যাথিডার-সোশ্যালিস্ট** (৩৭) গোষ্ঠীর জার্মান অর্থনীতিবিদরা তাদের স্বদেশী মজুরদের দুরারোগ্য কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী প্রবণতার ক্ষেত্রে একটা সান্ত্বনা পেয়েছিল।

কিন্তু ইংরেজ মধ্য শ্রেণী ভালো ব্যবসায়ী বলে জার্মান অধ্যাপকদের চেয়ে দূরদর্শী। শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে তারা ক্ষমতা ভাগ করে যে নিয়েছিল তা অনিচ্ছা সহকারে। চার্টিস্ট আন্দোলনের বছরগুলিতে তারা শিখেছে সেই puer robustus sed malitiosus, অর্থাৎ জনগণের সামর্থ্য কেমন। সেই সময় থেকে জনগণের চার্টারের সেরা ভাগটা তারা যুক্তরাজ্যের সংবিধানে সন্নিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। এখনই সবচেয়ে বেশি করে জনগণকে শৃঙ্খলায় রাখতে হবে নৈতিক উপায়ে, এবং জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তারের কার্যকরী সমস্ত নৈতিক উপায়ের মধ্যে প্রথম ও প্রধান উপায় ছিল এবং রয়েই গেল ধর্ম। এই কারণেই স্কুল বোর্ডগুলিতে পাদ্রীদের সংখ্যাধিক্য, এই কারণে পুজোর্চনা (৩৮) থেকে 'স্যালভেশন আর্মি' পর্যন্ত সর্ববিধ পুনরুদয়বাদের (revivalism) সমর্থনে বুর্জোয়াদের ক্রমবর্ধমান আত্ম-করারোপ।

ইউরোপীয় ভূখণ্ডবাসী বুর্জোয়ার স্বাধীন চিন্তা ও ধর্মীয় শিথিলতার ওপর এবার জিত হল ব্রিটিশ শালীনতার। ফ্রান্স ও জার্মানির শ্রমিকেরা বিদ্রোহভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। সমাজতন্ত্রে তারা একেবারে সংক্রামিত এবং যে উপায়ে স্বীয় প্রাধান্য অর্জন করতে হবে, তার বৈধতা নিয়ে তারা, সঠিক কারণেই, বিশেষ ভাবিত ছিল না। এখানকার puer robustus দিন দিন বেশি malitiosus হয়ে উঠছে। বড়াই করে জ্বলন্ত চুরুটটা নিয়ে ডেকের ওপর আসার পর সমুদ্রপীড়ার প্রকোপে ছোকরা যাত্রী যেমন সেটিকে গোপনে ত্যাগ করে,

তেমনিভাবে শেষ পন্থা হিশেবে ফরাসী ও জার্মান বুর্জোয়ার পক্ষে তাদের স্বাধীন চিন্তা নিঃশব্দে পরিত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর রইল না; বাইরের ব্যবহারে একের পর এক ধার্মিক হয়ে উঠতে লাগল ঈশ্বরবিদ্বেষীরা, চার্চ এবং তার শাস্ত্রবচন ও অনুষ্ঠানাদির বিষয়ে কথা কইতে লাগল সম্মান করে, যেটুকু না করলে নয় সেসব মেনেও নিতে লাগল। ফরাসী বুর্জোয়ারা শুক্রবার শুক্রবার **হবিষ্যি** শুরু করল আর রবিবার রবিবার জার্মান বুর্জোয়ারা গির্জায় নির্দিষ্ট আসনটিতে বসে শুনতে লাগল দীর্ঘ প্রটেস্টাণ্ট সার্মন। বস্তুবাদ নিয়ে তারা বিপদে পড়েছে। 'Die Religion muss dem Volk erhalten werden' — 'ধর্মকে জীইয়ে রাখতে হবে জনগণের জন্য' — সমূহ সর্বনাশ থেকে সমাজের পরিত্রাণের এই হল একমাত্র ও সর্বশেষ উপায়। দুর্ভাগ্যবশত, চিরকালের মতো ধর্মকে চূর্ণ করার জন্য যথাসাধ্য করার আগে এটি তারা আবিষ্কার করতে পারে নি। এবার বিদ্রূপ করে ব্রিটিশ বুর্জোয়ার বলার পালা: 'আহাম্মকের দল, একথা তো দু'শ' বছর আগেই আমি তোমাদের বলতে পারতাম!'

আমার কিন্তু আশঙ্কা, ব্রিটিশদের ধর্মীয় নিরেটত্ব অথবা ইউরোপ ভূখণ্ডের বুর্জোয়াদের post festum* দীক্ষাগ্রহণ কিছুতেই বর্ধমান প্রলেতারীয় তরঙ্গকে ঠেকাতে পারবে না। ঐতিহ্যের একটা মস্ত পিছুটানের শক্তি আছে, ইতিহাসের সে vis inertiae**, কিন্তু নিতান্ত নিষ্ক্রিয় বলে তা ভেঙে পড়তে বাধ্য এবং এই কারণে পুঁজিবাদী সমাজের চিরস্থায়ী রক্ষাকবচ ধর্ম হবে না। আমাদের আইনী, দার্শনিক ও ধর্মীয় ধারণাগুলি যদি হয় একটা নির্দিষ্ট সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্কপাতের মোটামুটি সুদূর কতকগুলো শাখা, তাহলে এই সম্পর্কের আমূল পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া সহ্য করে এসব শাখা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে না। এবং অলৌকিক দৈব-প্রজ্ঞায় বিশ্বাস না করলে আমাদের মানতেই হবে যে, পতনোন্মুখ সমাজকে ঠেকা দিয়ে রাখার শক্তি কোনো ধর্মীয় প্রবচনের নেই।

বস্তুতপক্ষে ইংলণ্ডেও শ্রমিক শ্রেণী ফের সচল হয়ে উঠেছে। সন্দেহ নেই যে, তারা নানাবিধ ঐতিহ্যে শৃঙ্খলিত। বুর্জোয়া ঐতিহ্য, যথা এই

* পার্বণ পেরিয়ে যাবার পর, অর্থাৎ বিলম্বে। — সম্পাঃ

** জাড্যের শক্তি। — সম্পাঃ

ব্যাপক-প্রচলিত বিশ্বাস যে, শুধু রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক, মাত্র এই দুটি পার্টিই থাকা সম্ভব এবং শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্তি অর্জন করতে হবে মহান উদারনৈতিক পার্টির সাহায্যে ও তারই মাধ্যমে। শ্রমিকদের ঐতিহ্য, যা স্বাধীন সংগ্রামের প্রথম খসড়া প্রচেষ্টা থেকে তারা পেয়েছে, যথা যারা একটা নিয়মিত শিক্ষানবিশীর মধ্য দিয়ে আসে নি এমন সমস্ত আবেদনকারীকে সাবেকি বহু ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বাদ দিয়ে রাখা; তার অর্থ দাঁড়াবে এই সব ইউনিয়ন কর্তৃক নিজেদের হাতেই নিজেদের বেইমান বাহিনী গঠন করা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণী এগুচ্ছে, ভ্রাতৃপ্রতিম ক্যাথিডার-সোশ্যালিস্টদের কাছে এমনকি অধ্যাপক ব্রেনটানোকেও যা রিপোর্ট করতে হয়েছে সখেদে। এগুচ্ছে, ইংলন্ডের সবকিছুর মতোই, ধীরে ধীরে পা মেপে মেপে, কোথাও দ্বিধা, কোথাও মোটের ওপর অসফল অনিশ্চিত প্রচেষ্টায়; এগুচ্ছে মাঝে মাঝে 'সমাজতন্ত্র' এই নামটার প্রতি এক অতিসতর্ক অবিশ্বাস নিয়ে, সেই সঙ্গে ক্রমশই তার সারবস্তুটিকে আত্মসাৎ করছে সে; এবং এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিকদের একটার পর একটা স্তরে বিস্তৃত হচ্ছে। লন্ডন ইস্ট-এন্ডের (৩৯) অনিপুণ মজুরদের তন্দ্রা ঘুচিয়ে দিয়েছে এ আন্দোলন, এবং আমরা সকলেই জানি, প্রতিদানে এই নতুন শক্তিগুলি কী চমৎকার প্রেরণা জুগিয়েছে শ্রমিক শ্রেণীতে। আন্দোলনের গতি যদি কারো অধৈর্যের সমপর্যায়ে না উঠে থাকে তাহলে একথা যেন তাঁরা না ভোলেন যে, ইংরেজ চরিত্রের সেরা গুণগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে শ্রমিক শ্রেণীই, এবং একটা অগ্রসর পদক্ষেপ যদি ইংলন্ডে একবার অর্জিত হয় তাহলে পরে তা প্রায় কখনো মোছে না। সাবেকি চার্টিস্টদের ছেলেরা যদি পূর্বকথিত কারণে ঠিক বাপকা বেটা হয়ে উঠতে না পেরে থাকে, তবে নাতিরা পূর্বপুরুষদের মান রাখবে বলে আশা করা যায়।

কিন্তু ইউরোপীয় শ্রমিকদের বিজয় শুধু ইংলন্ডের ওপরেই নির্ভরশীল নয়। সে বিজয় অর্জিত হতে পারে অন্তত ইংলন্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির সহযোগে (৪০)। শেষোক্ত দুটি দেশেই শ্রমিক আন্দোলন ইংলন্ডের চেয়ে বেশ এগিয়ে। জার্মানিতে এমনকি তার সাফল্যের দিন এখন হিসাবের মধ্যেও ধরা যায়। গত পঁচিশ বছরে সেখানে তার যে অগ্রগতি ঘটেছে সেটা অতুলনীয়। ক্রমবর্ধমান গতিতে সে এগুচ্ছে। জার্মান মধ্য শ্রেণী যেখানে

রাজনৈতিক দক্ষতা, শৃঙ্খলা, সাহস, উদ্যোগ, অধ্যবসায়ে শোচনীয় অযোগ্যতা জাহির করেছে, জার্মান শ্রমিক শ্রেণী সে ক্ষেত্রে এই সবকটি যোগ্যতারই প্রভূত প্রমাণ দিয়েছে। প্রায় চারশ' বছর আগে ইউরোপীয় মধ্য শ্রেণীর প্রথম উৎসারের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল জার্মানি; অবস্থা এখন যা, তাতে ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের প্রথম মহান বিজয়ের মঞ্চও হবে জার্মানি, এ কি সম্ভাব্যতার বাইরে?

২০ এপ্রিল, ১৮৯২ **ফ. এঙ্গেলস**

এঙ্গেলসের 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' পুস্তকের ইংরেজি সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত; এ বই লণ্ডনে প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে, একই সঙ্গে ১৮৯২-১৮৯৩ সালের *Die Neue Zeit* পত্রিকায় জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়

ইংরেজী সংস্করণের পাঠ থেকে বাংলা অনুবাদ

ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র

১

একদিকে আজকের সমাজের ভেতরে মালিক ও অ-মালিক, পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-বৈর, এবং অন্যদিকে উৎপাদনে বিদ্যমান নৈরাজ্য — মূলত এরই স্বীকৃতির প্রত্যক্ষ পরিণতি হল আধুনিক সমাজতন্ত্র। কিন্তু তত্ত্বগত আকারে আধুনিক সমাজতন্ত্র কায়ালাভ করে উদিত হয় অষ্টাদশ শতকের মহান ফরাসী দার্শনিকদের বর্ণিত নীতির অধিকতর যুক্তিনিষ্ঠ সম্প্রসারণরূপে। বাস্তব অর্থনৈতিক ঘটনার যতই গভীরে তার মূল নিহিত থাক না কেন, প্রতিটি নতুন তত্ত্বের মতো আধুনিক সমাজতন্ত্রকেও প্রথমে হাতে পাওয়া পূর্বপ্রস্তুত বুদ্ধিমার্গীয় মালমশলার সঙ্গে সংযুক্ত হতে হয়েছিল।

ফরাসী দেশে যে মহাপুরুষেরা আসন্ন বিপ্লবের জন্য মানুষের মন তৈরি করে গেছেন তাঁরা নিজেরাও ছিলেন চরম বিপ্লবী। বাইরেকার কোনো প্রামাণিকতা তাঁরা স্বীকার করেন নি। ধর্ম, প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান — কঠোরতম সমালোচনার লক্ষ্য হয় সবকিছুই; যুক্তির বিচারবেদীর সম্মুখে সবকিছুকেই তার অস্তিত্বের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে নতুবা অন্তর্হিত হতে হবে। সবকিছুর একমাত্র মাপকাঠি হয় যুক্তি। হেগেল বলেন, সেসময় বিশ্ব দাঁড়িয়েছিল তার মাথার ওপর*; প্রথমত এই অর্থে যে, মনুষ্য-মস্তিষ্ক

* ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি এই: 'অধিকারের চিন্তা, অধিকারের ধারণা অবিলম্বেই স্বীকৃতি আদায় করে নিল, এর বিরুদ্ধে অন্যায়ের পুরাতন কাঠামো দাঁড়াতে পারল না। সুতরাং, এই অধিকার বোধের ওপর এবার একটা সংবিধানের প্রতিষ্ঠা হল, এখন থেকে সবকিছুরই ভিত্তি হবে তা। সূর্য যবে থেকে আছে আকাশে এবং তাকে ঘিরে ঘুরছে গ্রহ, ততদিনের মধ্যে এ দৃশ্য দেখা যায় নি যে, মানুষ দাঁড়াল তার মাথার

এবং মস্তিষ্কের চিন্তাপ্রসূত নীতিগুলিই দাবি করে নিজেদেরকেই সর্ববিধ মানবিক কর্ম ও সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি বলে; কিন্তু ক্রমশ এই ব্যাপকতর অর্থেও যে, যে-বাস্তবের সঙ্গে এই নীতির বিরোধ আছে সে-বাস্তবকে বস্তুতপক্ষে উল্টে দিতে হবে। তদানীন্তন সবধরনের সমাজ ও সরকারকে, প্রতিটি প্রাচীন ঐতিহ্যগত ধারণাকে অযৌক্তিক বলে নিক্ষেপ করা হয় আস্তাকুঁড়ে। বিশ্ব এযাবৎ কেবল কুসংস্কার দ্বারা চালিত হয়ে এসেছে; যাকিছু অতীত তা সবকিছুই কেবল অনুকম্পা ও ঘৃণার যোগ্য। এখন এই প্রথম দেখা দিল দিনের আলো, যুক্তির রাজত্ব; এখন থেকে কুসংস্কার, অবিচার, বিশেষাধিকার, নিপীড়নের জায়গা নেবে শাশ্বত সত্য, শাশ্বত অধিকার, প্রকৃতির ভিত্তি থেকে পাওয়া সাম্য এবং মানবের অলঙ্ঘনীয় অধিকার।

এখন আমরা জানি, যুক্তির এই রাজত্বটা বুর্জোয়ার আদর্শায়িত রাজ্য ছাড়া বেশি কিছু নয়; জানি যে, এই শাশ্বত অধিকার রূপায়িত হয়েছে বুর্জোয়া ন্যায়ে; সাম্য পরিণত হয়েছে আইনের চোখে বুর্জোয়া সমানাধিকারে; বুর্জোয়া সম্পত্তি ঘোষিত হয়েছে মানুষের একটি মৌলিক অধিকার হিশেবে; এবং যুক্তির শাসন, রুসোর 'সামাজিক চুক্তি' (৪২) বাস্তব হয়েছে এবং বাস্তব হওয়াই সম্ভব কেবল একটা গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র রূপে। অষ্টাদশ শতকের মহামনীষীদের পক্ষে পূর্বতনদের মতোই স্বীয় যুগের সীমা অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু সামন্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে বুর্জোয়ারা অবশিষ্ট সমাজের প্রতিনিধিত্ব দাবি করছিল তাদের বৈরের পাশাপাশি ছিল শোষক ও শোষিত, নিষ্কর্মা ধনী ও গরিব মজুরদের সাধারণ বৈর। এই পরিস্থিতি

ওপর অর্থাৎ ভাবনার ওপর এবং বাস্তবকে নির্মাণ করতে লাগল তার এই ভাবনা অনুযায়ী। আনাক্সেইগরস প্রথম বলেছিলেন, Nous অর্থাৎ যুক্তির শাসনাধীন দুনিয়া। কিন্তু এখন এই সর্বপ্রথম মানুষ এই স্বীকৃতিতে পেঁছিল যে, মানসিক বাস্তবতার শাসিত হওয়া উচিত ভাবনার দ্বারা। সে এক অপরূপ অরুণোদয়। **সমস্ত চিন্তক সত্তাই এই পবিত্র দিনটির উদ্‌যাপনে অংশ নেয়।** একটা অপূর্ব আবেগে তখন আন্দোলিত হয় মানুষ, **যুক্তির উদ্দীপনায় বিশ্ব ছেয়ে যায়**, এ যেন এল বিশ্বের সঙ্গে ঐশ্বরিক নীতির মিলনের দিন।' (হেগেল, 'ইতিহাসের দর্শন', ১৮৪০, ৫৩৫ পৃঃ)। — লোকান্তরিত অধ্যাপক হেগেল কর্তৃক এরূপ অন্তর্ঘাতী ও সাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক প্রচারের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইনটা (৪১) অবিলম্বে প্রযোজ্য নয় কি? (এঙ্গেলসের টীকা।)

ছিল বলেই বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা শুধু একটা বিশেষ শ্রেণী নয়, সমগ্র নিপীড়িত মানবের প্রতিনিধিরূপে নিজেদের জাহির করতে সমর্থ হয়। অপিচ। জন্ম থেকেই বুর্জোয়া তার বিপরীত (antithesis) দ্বারা ভারাক্রান্ত: মজুরি-খাটা শ্রমিক ছাড়া পুঁজিপতির অস্তিত্ব অসম্ভব, এবং গিল্ডের মধ্যযুগীয় বার্গার যে পরিমাণে আধুনিক বুর্জোয়ারূপে বিকশিত হয় সে পরিমাণেই গিল্ডের কর্মী (journeyman) এবং গিল্ডের বাইরেকার দিন-মজুরেরা পরিণত হয় প্রলেতারিয়েতে। এবং **অভিজাতদের সঙ্গে সংগ্রামে** বুর্জোয়ারা যুগপৎ সে-কালের বিভিন্ন মেহনতী শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব মোটের ওপর দাবি করতে পারলেও বড়ো বড়ো প্রত্যেকটা বুর্জোয়া আন্দোলনেই স্বাধীন বিস্ফোরণ ঘটেছে সেই শ্রেণীটির যারা বর্তমান প্রলেতারিয়েতের কমবেশি পরিণত পুরোধা। দৃষ্টান্ত: জার্মান রিফর্মেশন ও কৃষক যুদ্ধের কালে আনাব্যাপটিস্টরা (৪৩) ও টমাস ম্যুনৎসার, মহান ইংরেজ বিপ্লবে লেভেলাররা (৪৪), মহান ফরাসী বিপ্লবে বাব্যেফ। তখনো অপরিণত একটা শ্রেণীর এই সব বিপ্লবী অভ্যুত্থানের উপযোগী তাত্ত্বিক প্রতিজ্ঞাও ছিল; ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থার ইউটোপীয় ছবি (৪৫); অষ্টাদশ শতকে সত্যিকার কমিউনিস্টসুলভ তত্ত্ব (মরেলি ও মাব্লি)। সাম্যের দাবিটা আর শুধু রাজনৈতিক অধিকারে সীমাবদ্ধ রইল না, তা প্রসারিত হয়ে গেল ব্যক্তির সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রেও। শুধু শ্রেণীগত বিশেষাধিকার উচ্ছেদ নয়, শ্রেণীভেদেরই অবসান করতে হবে। জীবনের সবকিছু উপভোগ বর্জন করে যোগীসুলভ একধরনের স্পার্টান কমিউনিজম হল এই নতুন মতবাদের প্রথম রূপ। এর পর এলেন তিনজন মহান ইউটোপীয়: সাঁ-সিমোঁ, তাঁর কাছে প্রলেতারীয় আন্দোলনের পাশাপাশি মধ্য শ্রেণীর আন্দোলনেরও একটা তাৎপর্য ছিল; ফুরিয়ে; এবং ওয়েন—ইনি সেই দেশের লোক যেখানে পুঁজিবাদী উৎপাদন সবচেয়ে বিকশিত, তদুদ্ভূত বৈরের প্রভাবে ইনি ফরাসী বস্তুবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে প্রণালীবদ্ধ রূপে শ্রেণীভেদ দূর করার জন্য তাঁর প্রস্তাব প্রণয়ন করেন।

একটা কথা তিনজনের ক্ষেত্রেই সমান। ঐতিহাসিক বিকাশ ইতিমধ্যে যে প্রলেতারিয়েতের সৃষ্টি করেছে তাদের স্বার্থের প্রতিনিধি হয়ে এঁরা কেউ দেখা দেন নি। একটা বিশেষ শ্রেণীর মুক্তি দিয়ে শুরু না করে ফরাসী

জ্ঞানপ্রচারকদের (৪৬) মতো তাঁরা তৎক্ষণাৎ সমগ্র মানবেরই মুক্তি দাবি করেন। তাঁদের মতোই এঁরাও চান যুক্তি ও শাশ্বত ন্যায়ের রাজত্ব স্থাপন করতে, কিন্তু তাঁরা এই রাজত্বটা যেভাবে দেখেছেন সেটার সঙ্গে ফরাসী জ্ঞানপ্রচারকদের আসমান জমিন তফাৎ। কেননা ফরাসী জ্ঞানপ্রচারকদের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া জগৎটাও আমাদের এই তিন সংস্কারকের কাছে সমান অযৌক্তিক ও অন্যায্য এবং সেই কারণে, সামন্ততন্ত্র তথা সমাজের পূর্বতন স্তরগুলির মতোই সত্বর আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপনীয়। বিশুদ্ধ যুক্তি ও ন্যায় যদি এযাবৎ দুনিয়াকে শাসন না করে থাকে, তবে তার একমাত্র কারণ, মানুষ তা সঠিকভাবে বুঝতে পারে নি। দরকার ছিল শুধু এক প্রতিভাধর ব্যক্তির—এবার তার অভ্যুদয় ঘটেছে, সত্য তার করায়ত্ত। এখন যে তার অভ্যুদয় ঘটল, সত্য যে এখনই পরিষ্কার করে বোঝা গেল, সেটা ঐতিহাসিক বিকাশের গ্রন্থি বেয়ে আসা এক অনিবার্য ব্যাপার নয়, নিতান্তই এক শুভ দৈবঘটনা। পাঁচশ' বছর আগেও তার জন্ম হতে পারত এবং সেক্ষেত্রে মানব-সমাজকে পাঁচশ' বছরের ভ্রান্তি, সংঘর্ষ ও ক্লেশ ভুগতে হত না।

আমরা দেখেছি, বিপ্লবের পুরোগামী, অষ্টাদশ শতকের ফরাসী জ্ঞানপ্রচারকরা বিদ্যমান সবকিছুরই একমাত্র বিচারক বলে আবেদন করেন যুক্তির কাছে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে একটা যুক্তিসিদ্ধ সরকার, যুক্তিসিদ্ধ সমাজ; শাশ্বত যুক্তির যাকিছু পরিপন্থী তা সবকিছুকেই নির্মমভাবে বিলোপ করতে হবে। এও দেখেছি যে, আসলে যে অষ্টাদশ শতকের নাগরিক ঠিক সেই সময়টায় বুর্জোয়া হয়ে উঠছিল, তারই আদর্শায়িত বোধ ছাড়া এ শাশ্বত যুক্তি আর কিছুই নয়। ফরাসী বিপ্লবে এই যুক্তিসিদ্ধ সমাজ ও সরকার বাস্তব হয়। কিন্তু নতুন ব্যবস্থা আগেকার অবস্থার তুলনায় যথেষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ হলেও মোটেই পুরোপুরি যুক্তিসিদ্ধ হয়ে উঠল না। যুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ পতন হল। রুসোর 'সামাজিক চুক্তি' বাস্তব রূপ পেয়েছিল 'সন্ত্রাসের শাসনে' (৪৭)। নিজস্ব রাজনৈতিক সামর্থ্যে বুর্জোয়ারা বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিল, তারা এ থেকে নিস্তার খুঁজল প্রথমে ডিরেক্টরেটের (৪৮) দুর্নীতিপরায়ণতায় এবং শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়নীয় স্বৈরাচারের পক্ষপুটে। প্রতিশ্রুত শাশ্বত শান্তি পরিণত হল এক দিগ্বিজয়ের অবিরাম যুদ্ধে।

যুক্তিভিত্তিক সমাজের হালও এ থেকে ভালো হল না। এক সাধারণ সম্পন্নতা সৃষ্টি হয়ে ধনী দরিদ্রের বিরোধ মিটে যাবার বদলে তা তীব্রতর হয়ে উঠল গিল্ড প্রভৃতি সুবিধার অপসারণে — এগুলির ফলে এ বিরোধ খানিকটা চাপা ছিল,-- এবং গির্জার দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির বিলোপে। সামন্ততান্ত্রিক নিগড় থেকে 'সম্পত্তির স্বাধীনতা' অধুনা সত্যই অর্জিত হল এবং ক্ষুদে পুঁজিপতি ও ক্ষুদে কৃষক মালিকদের পক্ষে তা হয়ে দাঁড়াল বৃহৎ পুঁজিপতি ও জমিদারদের বিপুল প্রতিযোগিতায় নিষ্পিষ্ট হয়ে এই সব মহাপ্রভুদের নিকট নিজ নিজ ক্ষুদে সম্পত্তি বিক্রয়ের স্বাধীনতা এবং এইভাবে, ক্ষুদে পুঁজিপতি ও কৃষক মালিকদের দিক থেকে, তা হল 'সম্পত্তি **থেকে** স্বাধীনতা'। পুঁজিবাদী ভিত্তিতে শিল্পের বিকাশের ফলে মেহনতী জনগণের দারিদ্র্য ও ক্লেশই হল সমাজের অস্তিত্বের শর্ত। নগদ টাকা ক্রমশই হয়ে দাঁড়াল, কার্লাইলের বক্তব্য অনুসারে, মানুষে মানুষে একমাত্র সম্পর্ক (sole nexus)। বছরে বছরে বেড়ে উঠল অপরাধের সংখ্যা। আগে সামন্ত পাপাচার প্রকাশ্য দিবালোকে খোলাখুলিই বিহার করত, এখন তারা উৎপাটিত না হলেও অন্ততপক্ষে পেছনে সরে গিয়েছিল। তার জায়গায় এযাবৎ যা গোপনে অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে সেই বুর্জোয়া পাপ আরো সতেজে পল্লবিত হয়ে উঠতে লাগল। ব্যবসা ক্রমশই হয়ে দাঁড়াল প্রবঞ্চনা। বিপ্লবী সূত্রবাণীর (৪৯) 'ভ্রাতৃত্ব' বাস্তবে রূপায়িত হল প্রতিযোগিতা-সংগ্রামের বুজরুকি ও রেষারেষিতে। বলপ্রয়োগে নিপীড়নের জায়গায় এল দুর্নীতি, সমাজ চালাবার প্রথম কল-কাঠি হিশেবে তরবারির জায়গা নিল সোনা। প্রথম রাত্রির অধিকার সামন্ত ভূস্বামীদের হাত থেকে গেল বুর্জোয়া কারখানা-মালিকের কাছে। গণিকাবৃত্তির বৃদ্ধি ঘটল অভূতপূর্ব রকমের। বিবাহ ব্যাপারটাও আগের মতোই গণিকাবৃত্তির আইনত স্বীকৃত একটা আবরণ হয়েই রইল এবং তদুপরি, তার সঙ্গে যুক্ত হল একটা অঢেল ব্যভিচারের স্রোত। সংক্ষেপে, জ্ঞানপ্রচারকদের চমৎকার সব প্রতিশ্রুতির সঙ্গে তুলনা করলে 'যুক্তির বিজয়' থেকে উদ্ভূত সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি হল এক তীব্র নৈরাশ্যকর প্রহসন। অভাব ছিল শুধু সে নৈরাশ্যকে সূত্রবদ্ধ করার মতো মানুষের এবং তারা দেখা দিল শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে। ১৮০২ সালে বেরুল সাঁ-সিমোঁর 'জেনেভা পত্রাবলি', ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হল ফুরিয়ে-র প্রথম রচনা, যদিও

তাঁর তত্ত্বের বনিয়াদ গড়ে ওঠে ১৭৯৯ সালেই; ১৮০০ সালের ১ জানুয়ারি রবার্ট ওয়েন নিউ ল্যানার্কের (৫০) পরিচালনা গ্রহণ করলেন।

এসময়ে কিন্তু উৎপাদনের পুঁজিবাদী ধরন এবং সেই সঙ্গে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের বৈর তখনো অতি অসম্পূর্ণ বিকশিত। বৃহৎ শিল্প সদ্য ইংলন্ডে শুরু হয়েছে, ফ্রান্সে তা তখনো অজানা। কিন্তু বৃহৎ শিল্প একদিকে বাড়িয়ে তোলে এমন সব সংঘাত যাতে উৎপাদনের ধরনে একটা বিপ্লব, তার পুঁজিবাদী চরিত্রের বিলোপ অনিবার্য হয়ে পড়ে—আর এসব সংঘাত ঘটে কেবল তৎসৃষ্ট শ্রেণীগুলির মধ্যেই নয়, তৎসৃষ্ট উৎপাদন-শক্তি এবং বিনিময় রূপের মধ্যেও। এবং অন্যদিকে, এই অতিকায় উৎপাদন-শক্তির অভ্যন্তরেই তা বিকশিত করে তোলে এ সংঘাতগুলির অবসানের উপায়। সুতরাং, ১৮০০ সাল নাগাদ নতুন সমাজব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত সংঘাতগুলি যদি সদ্য আকার নিতে শুরু করে থাকে, তাহলে সে সংঘাত অবসানের উপায়ের ক্ষেত্রে একথা আরো বেশি প্রযোজ্য। 'সন্ত্রাসের শাসন' কালে প্যারিসের সর্বহারা জনগণ মুহূর্তের জন্য প্রভুত্ব পেয়েছিল এবং তার ফলে বুর্জোয়ার **বিপরীতেই** বুর্জোয়া বিপ্লবকে তারা বিজয়ী করে দিতে পারে। কিন্তু তাই করতে গিয়ে তারা শুধু এই প্রমাণ করে যে, তদানীন্তন অবস্থায় তাদের আধিপত্য টিকে থাকা ছিল কী অসম্ভব। এই সর্বহারা জনগণ থেকে নতুন একটা শ্রেণীর কোষ-কেন্দ্র রূপে তখন সেই প্রথম যারা বিবর্তিত হয়ে উঠেছে সেই প্রলেতারিয়েত তখনো স্বাধীন রাজনৈতিক কর্মে একেবারেই অক্ষম, তারা দেখা দিয়েছে একটা নিপীড়িত, দুঃখী সম্প্রদায় হিশেবে, আত্ম-সাহায্যে অক্ষম হওয়ায় এই সম্প্রদায়কে যদি সাহায্য পেতে হয় তবে সে সাহায্য আসতে পারে বড়ো জোর বাইরে থেকে, নতুবা উপর থেকে।

এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কবলিত হন সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারাও। পুঁজিবাদী উৎপাদনের অপরিণত অবস্থা ও অপরিণত শ্রেণী পরিস্থিতির সহগামী হল অপরিণত তত্ত্ব। অবিকশিত অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে যা তখনো সুপ্ত তেমন সব সামাজিক সমস্যার সমাধান ইউটোপীয়রা বার করতে চাইল মনুষ্য-মস্তিষ্ক থেকে। সমাজে অন্যায় ছাড়া আর কিছু নেই, তা দূরীকরণের দায় যুক্তির। সুতরাং, দরকার হল একটা নতুন ও আরো নিখুঁত সমাজব্যবস্থা আবিষ্কার ক'রে তা বাইরে থেকে প্রচারের জোরে এবং যে ক্ষেত্রে

সম্ভব সে ক্ষেত্রে আদর্শ পরীক্ষা চালিয়ে তা সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। এই নতুন সমাজব্যবস্থাগুলি ইউটোপীয় হতে বাধ্য; যতই সবিস্তারে তাদের পরিপূর্ণ করে রচনা করা হতে লাগল ততই বিশুদ্ধ উৎকল্পনায় ভেসে না গিয়ে তাদের উপায় রইল না।

এই কথাগুলো একবার প্রতিষ্ঠার পর প্রশ্নটার এই দিকটা নিয়ে আর কালক্ষেপের প্রয়োজন নেই—এ এখন সবই অতীতের বিষয়। এই যেসব উৎকল্পনায় আজ আমাদের মাত্র হাসি পায়, তার ওপর সগাম্ভীর্যে ঠোকর মেরে এরূপ 'পাগলামির' তুলনায় নিজেদের নিরাভরণ যুক্তির উৎকর্ষ নিয়ে উল্লাস করার কাজটা আমরা ছেড়ে দিতে পারি সাহিত্যিক চুনো পুঁটিদের। আমাদের কথা ধরলে, আমরা বরং সেই সব মহামহীয়ান ভাবনা ও ভাবনার বীজে আনন্দিত, যা তাঁদের উৎকল্পী আবরণ থেকে সর্বত্রই ফেটে বেরিয়েছে এবং যার প্রতি এই কূপমন্ডুকেরা অন্ধ।

সাঁ-সিমোঁ মহান ফরাসী বিপ্লবের সন্তান, এ বিপ্লব যখন শুরু হয় তখন তাঁর বয়স তিরিশও নয়। এ বিপ্লবে জয় হয় তৃতীয় সম্প্রদায়ের, অর্থাৎ সুবিধাভোগী **অলস** শ্রেণীগুলি, অভিজাত ও যাজকদের ওপর—জয় হয় উৎপাদন ও ব্যবসায় যারা **খাটছে** জাতির সেই বিপুল জনগণের। কিন্তু তৃতীয় সম্প্রদায়ের বিজয় অচিরেই আত্মপ্রকাশ করল এই সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র অংশের স্বীয় বিজয়রূপে, এ সম্প্রদায়ের সামাজিকভাবে সুবিধাভোগী অংশের অর্থাৎ সম্পত্তি-মালিক বুর্জোয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতালাভরূপে। বিপ্লবের ভেতর বুর্জোয়ারা নিশ্চিতই দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠেছিল—অভিজাতদের ও গির্জার যে জমি বাজেয়াপ্ত ক'রে পরে **বিক্রির** জন্য হাজির করা হয় তার ওপর ফাটকাবাজি করে খানিকটা, এবং খানিকটা সেনাবাহিনীর ঠিকাদারি মারফত জাতিকে ঠকিয়ে। এই জুয়াচোরদের আধিপত্যের ফলেই ডিরেক্টরেটের আমলে ফ্রান্স ধ্বংসের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছিল এবং নেপোলিয়ন অজুহাত পান কু'দেতার।

সুতরাং, সাঁ-সিমোঁর কাছে তৃতীয় সম্প্রদায় ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যেকার বৈরটা 'কর্মী' ও 'নিষ্কর্মাদের' মধ্যে একটা বৈর আকারে দেখা দেয়। শুধু সাবেকি সুবিধাভোগী শ্রেণী নয়, উৎপাদন ও বণ্টনে অংশ না নিয়ে যারা তাদের আয়ের ওপর বসে খায় তার সকলেই নিষ্কর্মা। 'কর্মী'ও

শুধু মজুরি-খাটা শ্রমিক নয়, কলওয়ালা, বণিক, ব্যাঙ্কার—সকলেই। নিষ্কর্মারা যে বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের সামর্থ্য হারিয়েছে তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল এবং পাকাপাকি স্থির হয়ে যায় বিপ্লবে। সম্পত্তিহীন শ্রেণীগুলিরও যে সে-সামর্থ্য নেই সেটা সাঁ-সিমোঁর মনে হয়েছিল 'সন্ত্রাসের শাসনের' অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত। তাহলে পরিচালনা করবে, নায়কত্ব করবে কে? সাঁ-সিমোঁর মতে তা করবে নতুন একটা ধর্মীয় বন্ধনে মিলিত বিজ্ঞান ও শিল্প, এ ধর্মবন্ধনের নির্বন্ধ হল ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার সেই ঐক্য পুনরুদ্ধার করা যা রিফর্মেশনের সময় থেকে নষ্ট হয়ে গেছে,—অবশ্যই অতীন্দ্রিয়বাদী এবং কড়া রকমের সোপানতান্ত্রিক 'নবখ্রীষ্টবাদ'। বিজ্ঞান অর্থে হল পণ্ডিতবর্গ, এবং শিল্প, সে হল সর্বাগ্রে সক্রিয় বুর্জোয়া, কলওয়ালা, বণিক, ব্যাঙ্কার। সাঁ-সিমোঁর অভিপ্রায় ছিল, এ বুর্জোয়াদের অবশ্যই রূপান্তরিত হতে হবে একধরনের জনকর্মচারীতে, সামাজিক অছিদারে; কিন্তু মজুরদের তুলনায় আধিপত্য ও অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত একটা অবস্থান তাদের তখনো থাকবে। বিশেষ করে ব্যাঙ্কারদের কাজ হবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ ক'রে সমগ্র সামাজিক উৎপাদন পরিচালিত করা। এ ধারণাটা ঠিক তেমন একটা সময়ের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় যখন ফ্রান্সে বৃহৎ শিল্প এবং সেই সঙ্গে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যেকার গহ্বরটা সবে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু সাঁ-সিমোঁ বিশেষ জোর যেখানে দেন সেটা এই: সর্বাগ্রে এবং সর্বোপরি তাঁর ভাবনা ছিল সেই শ্রেণীর ভাগ্য নিয়ে যারা সবচেয়ে সংখ্যাধিক ও সবচেয়ে গরিব ('la classe la plus nombreuse et la plus pauvre')।

'জেনেভা পত্রাবলিতে'ই সাঁ-সিমোঁ প্রস্তাব তুলেছিলেন:

'সমস্ত লোককেই কাজ করতে হবে'।

ঐ রচনায় তিনি একথাও স্বীকার করেন যে, সন্ত্রাসের শাসন ছিল সম্পত্তিহীন জনগণের শাসন।

তাদের তিনি বলেছেন, 'দ্যাখো, তোমাদের সাথীরা যখন ফ্রান্সে আধিপত্য করে তখন কী দাঁড়ায়; তারা একটা দুর্ভিক্ষ ঘটায়।'

কিন্তু ফরাসী বিপ্লবকে শ্রেণী-যুদ্ধ হিশেবে, শুধু অভিজাত ও বুর্জোয়াদের মধ্যেকার একটা যুদ্ধ নয়, অভিজাত, বুর্জোয়া ও

সম্পত্তিহীনদের মধ্যেকার একটা যুদ্ধ হিশেবে চিনতে পারা ১৮০২ সালের পক্ষে একটা অতি অর্থগর্ভ আবিষ্কার। ১৮১৬ সালে তিনি ঘোষণা করেন, রাজনীতি হল উৎপাদনের বিজ্ঞান, এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন রাজনীতিকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করবে অর্থনীতি। অর্থনৈতিক অবস্থা যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বনিয়াদ, এ জ্ঞান এখানে মাত্র ভ্রূণাকারে দেখা দিয়েছে। তবু এ ক্ষেত্রে তখনই যা বেশ পরিষ্কার করে প্রকাশ পেয়েছে সেটা হল এই ধারণা যে, ভবিষ্যতে মানুষের ওপরকার রাজনৈতিক শাসন পরিবর্তিত হবে বস্তুর ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন-প্রক্রিয়ার পরিচালনায়, অর্থাৎ 'রাষ্ট্রের বিলোপে', যা নিয়ে ইদানীং এত সোরগোল চলেছে। সমকালীনদের তুলনায় একই প্রকার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় সাঁ-সিমোঁ দেন ১৮১৪ সালে, মিত্রশক্তিদের প্যারিস প্রবেশের ঠিক পরেই*, এবং ফের ১৮১৫ সালে একশ' দিনের (৫১) যুদ্ধের সময় যখন তিনি ঘোষণা করেন, ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলন্ডের এবং পরে এই দুই দেশের সঙ্গে জার্মানির মৈত্রীই হল ইউরোপের সমৃদ্ধ বিকাশ ও শান্তির একমাত্র গ্যারাণ্টি। ওয়াটার্লু (৫২) যুদ্ধের বিজয়ীদের সঙ্গে মৈত্রীর কথা ১৮১৫ সালে ফরাসীদের কাছে প্রচার করতে হলে যেমন সাহস তেমনি ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টির প্রয়োজন ছিল।

সাঁ-সিমোঁর মধ্যে যদি পাই একটা এমন পরিপূর্ণ ব্যাপক দৃষ্টি যাতে পরবর্তী সমাজতন্ত্রীদের যেসব ধারণা একান্তভাবে অর্থনৈতিক নয় তার প্রায় সবগুলিই তাঁর মধ্যে ভ্রূণাকারে বর্তমান, তাহলে ফুরিয়েরের মধ্যে পাব তদানীন্তন সমাজব্যবস্থার একটা খাঁটি ফরাসী চালের সরস সমালোচনা, কিন্তু তাই বলে মোটেই তা কম গভীর নয়। ফুরিয়ে বুর্জোয়াকে, তাদের বিপ্লবপূর্বের অনুপ্রেরিত পয়গম্বর আর বিপ্লবোত্তর স্বার্থান্বেষী চাটুকারদের ধরেছেন তাদের স্বমুখনিঃসৃত উক্তিগুলি দিয়েই। বুর্জোয়া জগতের বৈষয়িক ও নৈতিক দৈন্য তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন নির্মমভাবে। একমাত্র যুক্তি-শাসিত একটা সমাজ, সার্বজনীন সুখের একটা সভ্যতা, মানুষের অসীম একটা পরিপূর্ণতার যে ঝলকিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পূর্বতন জ্ঞানপ্রচারকেরা, এবং তাঁর কালের বুর্জোয়া প্রবক্তারা যেসব রঙীন বুলি

* ১৮১৪ সালের ৩১ মার্চ। — সম্পাঃ

আওড়াতেন, তার মুখোমুখি তিনি দাঁড় করিয়ে দেন বুর্জোয়া জগৎটাকে। দেখিয়ে দেন কীভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে অতি উচ্চ বাগাড়ম্বরের সঙ্গে সঙ্গে যায় অতি শোচনীয় বাস্তব এবং বুলির এই অপদার্থ ভণ্ডুলতাকে তিনি বিধ্বস্ত করেছেন জ্বালাময় ব্যঙ্গে। ফুরিয়ে শুধু সমালোচক নন; তাঁর অচঞ্চল প্রশান্ত স্বভাব তাঁকে করে তুলেছে ব্যঙ্গবিদ, এবং নিঃসন্দেহে সর্বকালের সেরা ব্যঙ্গবিদদের অন্যতম। যেমন বলিষ্ঠ তেমনি সুন্দর করে তিনি বর্ণনা করেছেন বিপ্লবের পতনের পর যে জুয়াচুরি ফাটকাবাজির মহোৎসব শুরু হয়, সে সময়কার ফরাসী বাণিজ্যের মধ্যে এবং তারই বৈশিষ্ট্যসূচক যে দোকানদারি মনোবৃত্তি তখন প্রচলিত, তার কথা। এর চেয়েও তাঁর ওস্তাদি নরনারী সম্পর্কের বুর্জোয়া রূপ এবং বুর্জোয়া সমাজে নারীর যে স্থান, তাঁর সমালোচনায়। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন যে, কোনো একটা সমাজের সাধারণ মুক্তির স্বাভাবিক মাপকাঠি হল সে সমাজে নারী মুক্তির মান। কিন্তু সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বোধের ক্ষেত্রেই ফুরিয়ে মহত্তম। এযাবৎ সমাজের সমগ্র ধারাকে তিনি ভাগ করেছেন বিবর্তনের চারটি পর্যায়ে—বন্যতা, পিতৃতন্ত্র, বর্বরতা, সভ্যতা। শেষেরটি হল আজকের তথাকথিত সভ্য বা বুর্জোয়া সমাজ অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী থেকে যে সমাজব্যবস্থা শুরু হয়েছে। তিনি প্রমাণ করেন,

> 'বর্বরতার যুগে যে পাপের অনুষ্ঠান হত সরলভাবে তাদের সবকটিকেই একটা জটিল দ্ব্যর্থক দুমুখো ভণ্ডামির অস্তিত্বে উন্নীত করা হয়েছে সভ্য যুগে';

সভ্যতার গতি একটা 'পাপ চক্রের' মধ্য দিয়ে, বিরোধের মধ্য দিয়ে, যা সে ক্রমাগত সৃষ্টি করে চলেছে অথচ তার সমাধানে অক্ষম; সুতরাং, যা তার অভিপ্রেত অথবা অভিপ্রেত বলে ভান করে ঠিক তার বিপরীতেই সে ক্রমাগত উপনীত হচ্ছে, ফলে দৃষ্টান্তস্বরূপ,

> 'সভ্যতার আমলে **দারিদ্র্যের সৃষ্টি হচ্ছে অতি প্রাচুর্যের মধ্য থেকেই**'।

দেখা যাচ্ছে, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে ফুরিয়ে ঠিক তাঁর সমকালীন হেগেলের মতোই নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন। একই দ্বান্দ্বিকতার ব্যবহার করে তিনি সীমাহীন মানবিক উন্নয়নের বিরুদ্ধে তর্ক তুলেছেন, বলেছেন, প্রত্যেকটা

ঐতিহাসিক পর্যায়েরই যেমন উত্থান তেমনি অবতরণের যুগ বর্তমান, এবং এই সত্যকে প্রয়োগ করেছেন সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে। পৃথিবীর শেষ পরিণাম ধ্বংস, এই ধারণাটি কাণ্ট যেমন আমদানি করেন প্রকৃতবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, ফুরিয়েও তেমনি ইতিহাস বিজ্ঞানে চালু করেন মনুষ্য জাতির শেষ ধ্বংসের ধারণা।

ফ্রান্সের মাটির ওপর দিয়ে যখন বিপ্লবের ঝড় বয়ে গিয়েছিল, তখন ইংলণ্ডে চলছিল একটা শান্ততর বিপ্লব, যদিও তাই বলে সেটা কম প্রচণ্ড নয়। বাষ্প এবং নতুন নতুন যন্ত্র-তৈরির সরঞ্জামে হস্তশিল্প কারখানা পরিবর্তিত হচ্ছিল আধুনিক বৃহৎ শিল্পে এবং এইভাবে বিপ্লব ঘটাচ্ছিল বুর্জোয়া সমাজের সমগ্র ভিত্তিমূলেই। কারখানা-পর্বের বিকাশের ঢিমেতেতালা গতি পরিণত হল উৎপাদনের একটা সত্যকার ঝটিকাবর্তে। নিয়ত বর্ধমান ক্ষিপ্রতায় চলল বৃহৎ পুঁজিপতি ও নির্বৃত্ত প্রলেতারিয়েতে সমাজের ভাঙন। তাদের মাঝখানে, আগেকার স্থিতিশীল মধ্য শ্রেণীর বদলে কারুশিল্পী ও ক্ষুদে দোকানদারদের একটা টলমলে জনপুঞ্জ, জনসংখ্যার সবচেয়ে অস্থির একটা অংশ, কষ্টে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলল।

উৎপাদনের নয়া পদ্ধতি তখন সবে তার উত্থান পর্বের শুরুতে মাত্র; তখনো পর্যন্ত সেটা উৎপাদনের স্বাভাবিক নিয়মিত একটা পদ্ধতিই বটে, তদানীন্তন অবস্থায় সম্ভবপর একমাত্র পদ্ধতি। তাহলেও, তখনই তা থেকে বিপুল সামাজিক অবিচারের সৃষ্টি হয়ে চলেছে—বড়ো বড়ো শহরের সবচেয়ে নিকৃষ্ট সব মহল্লায় গৃহহীন জনতার ভিড়, চিরাচরিত সমস্ত নৈতিক বাঁধন, পিতৃতান্ত্রিক বাধ্যতা, পারিবারিক সম্পর্কের শৈথিল্য; একটা ভয়ঙ্কর মাত্রার অতি মেহনত, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের বেলায়; গ্রাম থেকে শহরে, কৃষি থেকে আধুনিক শিল্পে, জীবনধারণের স্থির অবস্থা থেকে দিন দিন পরিবর্তমান একটা অনিশ্চিত অবস্থায়, একেবারে নতুন একটা পরিস্থিতির মধ্যে সহসা নিক্ষিপ্ত হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর পরিপূর্ণ হতাশা।

এই সন্ধিক্ষণে সংস্কারক হিশেবে এগিয়ে এলেন ২৯ বছর বয়সের এক কারখানা-মালিক, প্রায় অনির্বচনীয় শিশুসুলভ একটা সারল্য তাঁর চরিত্রে, অথচ সেই সঙ্গেই যে মুষ্টিমেয়রা জন-নায়ক হয়েই জন্মায় তাদের একজন। রবার্ট ওয়েন বস্তুবাদী জ্ঞানপ্রচারকদের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, যথা: মানুষের

চরিত্র হল একদিকে বংশগতি এবং অন্যদিকে মানুষের জীবনকালের, বিশেষ করে তার বিকাশকালের পরিবেশের ফল। তাঁর শ্রেণীর অধিকাংশ লোকেই শিল্প বিপ্লবের মধ্যে দেখেছিল কেবল গোলমাল আর বিশৃঙ্খলা, আর ঘোলা জলে মাছ ধরে দ্রুত প্রভূত অর্থোপার্জনের সুবিধা। রবার্ট ওয়েন দেখলেন তাঁর প্রিয় তত্ত্বকে কাছে লাগিয়ে বিশৃঙ্খলার মধ্যে থেকে শৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ। ম্যাঞ্চেস্টারের একটা কারখানায় পাঁচ শতাধিক লোকের সুপারিনটেন্ডেন্ট হিশেবে এটা তিনি আগেই সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। ১৮০০ থেকে ১৮২৯ সাল পর্যন্ত তিনি স্কটল্যান্ডের নিউ ল্যানার্কে পরিচালক-অংশীদার হিশেবে একটি বৃহৎ সুতাকলের কাজ চালান সেই একই পদ্ধতিতে, কিন্তু অধিকতর স্বাধীনতা নিয়ে এবং এতটা সাফল্যের সঙ্গে যে ইউরোপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। প্রথমে যারা ছিল অতি হরেক রকমের একটা দঙ্গল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি নীতিভ্রষ্ট সব লোক, এবং ধীরে ধীরে যাদের সংখ্যা বেড়ে ওঠে ২৫০০-এ, এমন একটা জনতাকে তিনি রূপান্তরিত করেন এক আদর্শ লোকালয়ে, যেখানে মাতলামি, পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট, মোকদ্দমা, দীন আইন (poor laws), ভিক্ষাদান প্রভৃতি ছিল অজানা। এবং তা করেন নেহাৎ লোকগুলোর জন্য একটা মানুষের যোগ্য পরিস্থিতি রচনা ক'রে এবং বিশেষ করে উঠতি ছেলেমেয়েদের সযত্নে লালন ক'রে। শিশুদের বিশেষ বিদ্যালয়ের তিনিই প্রবর্তক, নিউ ল্যানার্কে প্রথমটি তিনি তা চালু করেন। দুই বছর বয়স থেকে ছেলেরা আসত বিদ্যালয়ে, সেখানে তারা এতই আনন্দে থাকত যে, বাড়ি ফিরিয়ে নেওয়া দায় হত। ওয়েনের প্রতিযোগীরা যে ক্ষেত্রে মজুর খাটাত দিন তের-চোদ্দ ঘণ্টা ক'রে, সে ক্ষেত্রে নিউ ল্যানার্কে কাজের দিন ছিল মাত্র সাড়ে দশ ঘণ্টা। তুলোর একটা সংকটে যখন চার মাসের জন্য কাজ বন্ধ থাকে, তখনো তাঁর মজুরেরা পুরো মজুরি পেয়ে এসেছে। এবং এসব সত্ত্বেও কারবারের মূল্য দ্বিগুণের বেশি বাড়ে, শেষ পর্যন্ত তা মোটা মুনাফা জুগিয়েছে মালিকদের।

তা সত্ত্বেও ওয়েনের তৃপ্তি ছিল না। তাঁর মজুরদের জন্য তিনি অস্তিত্বের যে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সেটা তাঁর চোখে তখনো মানুষের যোগ্য নয়।

'লোকগুলো আমার করুণানির্ভর ক্রীতদাস।'

অপেক্ষাকৃত অনুকূল যে পরিস্থিতিতে তাদের তিনি বসিয়েছেন তাতে চরিত্রের এবং বুদ্ধিবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ ও যুক্তিসিদ্ধ বিকাশ তখনো হচ্ছিল না, তাদের যোগ্যতার অবাধ অনুশীলন তো আরো কম।

'অথচ এই আড়াই হাজার অধিবাসীর মেহনতী অংশটা রোজ সমাজের জন্য যে পরিমাণ বাস্তব সম্পদ সৃষ্টি করছে তা করতে অর্ধশতকেরও কম আগে দরকার হত ছয় লক্ষ অধিবাসীর মেহনতী অংশের। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, ছয় লক্ষ লোক যে সম্পদ ভোগ করত, সে থেকে এই আড়াই হাজার লোক যা ভোগ করছে তা বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকা উচিত সেটা গেল কোথায়?'*

জবাবটা পরিষ্কার। তা গেছে তিন লক্ষ পাউন্ডের ছাঁকা মুনাফা ছাড়াও কারখানার স্বত্বাধিকারীদের লগ্নী মূলধনের ওপর ৫% পরিশোধ করতে। আর নিউ ল্যানার্কের পক্ষে যেটা খাটে, তা আরো বেশি খাটে ইংলন্ডের সমস্ত ফ্যাক্টরি সম্পর্কেই।

'অযথার্থরূপে প্রযুক্ত হলেও যন্ত্র কর্তৃক এই নতুন সম্পদ যদি না সৃষ্টি হত, তাহলে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এবং সমাজের অভিজাত প্রথাকে সমর্থনের জন্য ইউরোপীয় যুদ্ধগুলি চালান যেত না। অথচ এই নতুন শক্তি শ্রমিক শ্রেণীরই সৃষ্টি।'**

এ নতুন শক্তির ফল ভোগের অধিকার সুতরাং তাদেরই। নবসৃষ্ট অতিকায় উৎপাদন-শক্তি এযাবৎ যা ব্যক্তিবিশেষকে ধনী করা ও জনগণকে গোলাম করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, তা থেকে ওয়েন পেলেন সমাজ পুনর্নির্মাণের ভিত্তি; সকলের সাধারণ সম্পত্তি হিশেবে এগুলির নির্বন্ধ হল সকলের সাধারণ মঙ্গলের জন্য চালিত হওয়া।

বলা যেতে পারে, ব্যবসায়িক হিসাবের পরিণতিস্বরূপ এই বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বনিয়াদের ওপরেই ওয়েনের কমিউনিজমের ভিত্তি। আগাগোড়া তাঁর এই ব্যবহারিক চরিত্র বজায় থেকেছে। এইভাবে, ১৮২৩ সালে ওয়েন

* 'মনে ও আচরণে বিপ্লব' শীর্ষক একটি স্মারকলিপি থেকে, ২১ পৃষ্ঠা, এটি রচিত হয় 'ইউরোপের সমস্ত রেড রিপাবলিকান, কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের' উদ্দেশে এবং ১৮৪৮ সালের ফ্রান্সের অস্থায়ী সরকার এবং 'মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁর দায়িত্বশীল উপদেষ্টাদের' নিকট প্রেরিত হয়। (এঙ্গেলসের টীকা।)

** ঐ, ২২ পৃঃ। (এঙ্গেলসের টীকা।)

কমিউনিস্ট উপনিবেশ স্থাপন করে আয়ার্ল্যাণ্ডের দুর্দশা ত্রাণের প্রস্তাব তোলেন এবং তা প্রতিষ্ঠার খরচা, বাৎসরিক ব্যয় ও সম্ভাব্য আয়ের পুরো হিসাব ছকে দেন। ভবিষ্যতের জন্য সুনির্দিষ্ট তাঁর পরিকল্পনায় খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে এমন ব্যবহারিক জ্ঞানের সঙ্গে, ভিতের নকসা, সামনের পাশের এবং উপর থেকে-দেখা দৃশ্য সব সমেত যে, সমাজ সংস্কারের ওয়েন-পদ্ধতি একবার গ্রহণ করলে তার প্রত্যক্ষ খুঁটিনাটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপত্তি করার প্রায় জো নেই।

কমিউনিজমের অভিমুখে পদক্ষেপ করায় জীবনের মোড় ফিরে গেল ওয়েনের। যতদিন তিনি মাত্র মানবহিতৈষী, ততদিন কেবল ধনসম্পদ, সাধুবাদ, সম্মান ও গৌরবের পুরস্কার মিলেছে তাঁর। তিনি ছিলেন ইউরোপের সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যক্তি। শুধু স্বশ্রেণীর লোকেরাই নয়, রাষ্ট্রনেতারা, এমনকি রাজন্যেরাও তাঁর কথা শুনত সপ্রশংসায়। কিন্তু যখন তিনি তাঁর কমিউনিস্ট তত্ত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন, তখন সে তো আলাদা কথা। ওয়েনের মনে হয়েছিল সমাজ সংস্কারের পথ রোধ করে আছে তিনটি বৃহৎ প্রতিবন্ধক: ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ধর্ম ও বর্তমানের বিবাহ প্রথা। জানতেন, এদের আক্রমণ করলে কী তাঁর ভাগ্যে আছে—অবৈধীকরণ, সরকারী সমাজ থেকে বহিষ্কার, সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠার অবসান। কিন্তু এর কোনোটাই ফলাফলের তোয়াক্কা না করে সে আক্রমণ থেকে তাঁকে বিরত করতে পারে নি; এবং যা ভেবেছিলেন তাই ঘটল। সংবাদপত্রে তাঁর বিরুদ্ধে নীরবতার চক্রান্ত সমেত সরকারী সমাজ থেকে নির্বাসিত হয়ে, আমেরিকায় তাঁর অসফল কমিউনিস্ট পরীক্ষায় নিজের সমস্ত সম্পদ যা ঢেলেছিলেন সেসব খুইয়ে তিনি ফিরলেন সরাসরি শ্রমিক শ্রেণীর দিকে, তাদের মধ্যেই কাজ করে যান তিরিশ বছর। ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে প্রত্যেকটা সামাজিক আন্দোলন, প্রত্যেকটি সত্যকার অগ্রগতির সঙ্গে রবার্ট ওয়েনের নাম জড়িত। পাঁচ বছর সংগ্রামের পর, ১৮১৯ সালে তিনি ফ্যাক্টরিতে নারী ও শিশুদের কাজের ঘণ্টা সীমাবদ্ধ করার প্রথম আইন জোর করে পাশ করিয়ে নেন। ইংলণ্ডের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন যখন একটা বৃহৎ সাধারণ ট্রেড ইউনিয়নে ঐক্যবদ্ধ হয় তারই প্রথম কংগ্রেসে তিনি সভাপতিত্ব করেন (৫৩)। সমাজের পরিপূর্ণ কমিউনিস্ট সংগঠনের আগে উৎক্রমণ ব্যবস্থা হিশেবে তিনি একদিকে

প্রবর্তন করেন খুচরা ব্যবসা ও উৎপাদনের জন্য সমবায়-সমিতি। সেদিন থেকে অন্তত এই ব্যবহারিক প্রমাণ এগুলি দিয়ে এসেছে যে, সমাজের দিক থেকে বণিক ও কলওয়ালারা নিতান্ত অনাবশ্যক। অন্যদিকে তিনি প্রবর্তন করেন মেহনত-নোট মারফত মেহনতের ফল বিনিময়ের জন্য মেহনতী বাজার; এই মেহনত-নোটের একক ধরা হয় এক ঘণ্টার কাজ (৫৪); প্রতিষ্ঠানগুলি নিষ্ফল হতে বাধ্য ছিল, কিন্তু অনেক পরবর্তীকালের প্রুধোঁর বিনিময়-ব্যাঙ্কের (৫৫) প্রকল্পটা আগে থেকেই পুরোপুরি আন্দাজ করা হয় এতে,—শুধু এই তফাৎ যে একেই সমাজের সর্ব অকল্যাণের মহৌষধ বলে জাহির না করে বলা হয়েছে সমাজের অধিকতর একটা আমূল বিপ্লবের দিকে তা এক প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

ইউটোপীয় চিন্তাধারা উনিশ শতকের সমাজতন্ত্রী ধ্যান-ধারণাকে দীর্ঘকাল প্রভাবিত করে এসেছে এবং এখনো কিছু কিছু করছে। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফরাসী ও ইংরেজ সমাজতন্ত্রীরা সকলেই তার প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন করে এসেছে। ভেইটলিং-এর কমিউনিজম সমেত আগেকার জার্মান কমিউনিজমও ওই একই পন্থার পথিক। এদের সকলের কাছেই সমাজতন্ত্র হল পরম সত্য, যুক্তি ও ন্যায়ের প্রকাশ; আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র নিজের শক্তিতেই তা বিশ্বজয় করবে। এবং পরম সত্য যেহেতু দেশ কাল ও মানুষের ঐতিহাসিক বিকাশ নিরপেক্ষ, তাই কখন কোথায় সেটা আবিষ্কৃত হবে সেটা মাত্র দৈবের ঘটনা। তা সত্ত্বেও এক-একটা গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতার কাছে পরম সত্য, যুক্তি ও ন্যায় এক একরকম। এবং প্রত্যেকের এই বিশেষ প্রকারের পরম সত্য, যুক্তি ও ন্যায় যেহেতু তার সাবজেকটিভ বোধ, জীবনধারণের অবস্থা, জ্ঞানের বহর ও বুদ্ধিমার্গীয় অনুশীলন দ্বারা নির্ধারিত, সেইহেতু পরম সত্যগুলির সংঘাতের শুধু এইটে ছাড়া অন্য পরিণাম অসম্ভব যে, সেগুলি হবে একান্তরূপে পরস্পর পৃথক। এ থেকে শুধু একধরনের পাঁচমিশালী গড়পড়তা সমাজতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই বেরবে না এবং বস্তুতপক্ষে তাই আজো পর্যন্ত ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের অধিকাংশ সমাজতন্ত্রী-শ্রমিকদের মন আচ্ছন্ন করে আছে। সেই জন্যই জগাখিচুড়ি বেঁধে চলতে দেওয়া হয় মতামতের বহুবিধ সব প্রকারভেদকে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতাদের এমন সব সমালোচনী বিবৃতি, অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও ভবিষ্যৎ

সমাজ চিত্রের জগাখিচুড়ি, যাতে বিরোধিতা জাগবে সবচেয়ে কম; বিতর্কের স্রোতে এক-একটা উপাদানের সুনির্দিষ্ট তীক্ষ্ম ধারগুলো যতই নদীর গোল গোল নুড়ির মতো মসৃণ হয়ে উঠবে, সে জগাখিচুড়িও সেদ্ধ হয়ে উঠবে ততই সহজে। সমাজতন্ত্রকে বিজ্ঞানে পরিণত করতে হলে আগে তাকে স্থাপন করা দরকার বাস্তব ভিত্তির ওপর।

২

ইতিমধ্যেই অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দর্শনের পাশাপাশি এবং তারপরে দেখা দিয়েছে নতুন জার্মান দর্শন, যার পরিণতি হেগেলে। এ দর্শনের সবচেয়ে বড়ো গুণ হল যুক্তির উচ্চতম ধরন হিশেবে দ্বান্দ্বিকতার পুনঃপ্রবর্তন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা সকলেই ছিলেন স্বভাবদ্বান্দ্বিক এবং এ'দের মধ্যেকার সবচেয়ে বিশ্বকোষিক মনীষা আরিস্টটল দ্বান্দ্বিক চিন্তার সবচেয়ে মৌলিক রূপগুলির বিশ্লেষণ আগেই করে গেছেন। অন্যপক্ষে, নবতর দর্শনের মধ্যে যদিও দ্বান্দ্বিকতার চমৎকার প্রবক্তারাও ছিলেন (যথা, দেকার্ত, স্পিনোজা), তবু বিশেষ করে ইংরেজদের প্রভাবে তা ক্রমেই তথাকথিত আধিবিদ্যক (মেটাফিজিকাল) যুক্তিপ্রকরণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে— অষ্টাদশ শতকের ফরাসীরাও তার দ্বারা প্রায় পুরোপুরি আচ্ছন্ন হন, অন্তত পক্ষে তাঁদের যে রচনা বিশেষ করে দার্শনিক সেগুলির ক্ষেত্রে। সংকীর্ণ অর্থে যা দর্শন তার বাইরে ফরাসীরা কিন্তু দ্বান্দ্বিকতার সেরা কীর্তি রচনা করেছেন। দিদরোর 'Le Neveu de Rameau' ('রামোর ভাইপো') এবং রুসোর 'Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes' ('মানুষের মধ্যে অসাম্যের উদ্ভব') স্মরণ করলেই যথেষ্ট। এ দুই চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্য এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক।

সাধারণ নিসর্গ বা মানুষের ইতিহাস কিংবা আমাদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়াকলাপ যখন আমরা লক্ষ্য করি ও তাই নিয়ে ভাবি, তখন সর্বপ্রথমে যে ছবিটা আমাদের চোখে পড়ে, তাতে দেখি সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়ার, অসংখ্য বিনিময় (permutations) ও সংযুক্তির (combinations) অন্তহীন বিজড়ন, যেখানে কিছুই যা ছিল, যেখানে ছিল

এবং যেমন ছিল তা থাকে না, সবকিছুই সরে যায়, বদলায়, উদ্ভূত হয় ও লোপ পায়। সুতরাং, প্রথমে আমরা ছবিটা দেখি সমগ্রভাবে, তার আলাদা আলাদা অংশগুলো তখনো মোটের ওপর থাকে পশ্চাৎপটে; এগুচ্ছে, সংযুক্ত হচ্ছে, সম্পর্কিত হচ্ছে যে বস্তুগুলো তাদের বদলে লক্ষ্য পড়ে বরং গতির ওপর, রূপান্তরের ওপর, সম্পর্কপাতের ওপর। বিশ্বের এই প্রাথমিক, সহজ-সরল কিন্তু মূলত সঠিক বোধটা হল প্রাচীন গ্রীক দর্শনের বোধ এবং তা প্রথম পরিষ্কার করে সূত্রবদ্ধ করেন হেরাক্লিটস: সবকিছুই আছে তবু নেই, কারণ সবকিছুই **প্রবহমান,** নিয়ত পরিবর্তমান, নিয়তই তার উদ্ভব ও অন্তর্ধান। কিন্তু ঘটনাবলির এই ছবির সাধারণ চরিত্র সমগ্রভাবে সঠিক প্রকাশ করলেও যেসব খুঁটিনাটি অংশ দিয়ে এ ছবি তৈরি তার ব্যাখ্যার দিক থেকে এ বোধ অপ্রতুল, এবং যতক্ষণ এই সব খুঁটিনাটি আমরা না বুঝছি ততক্ষণ গোটা ছবিটার পরিষ্কার ধারণা হতে পারে না। এই খুঁটিনাটিগুলো বুঝতে হলে প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিক সম্পর্ক থেকে ছিন্ন করে এনে তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করতে হবে, বিচার করতে হবে তার প্রকৃতি, বিশেষ কারণ, ফলাফল ইত্যাদি। মূলত এ কাজ প্রকৃতিবিজ্ঞানের ও ঐতিহাসিক গবেষণার; এগুলি বিজ্ঞানের এমন শাখা যা ক্ল্যাসিক যুগের গ্রীকেরা সুযুক্তিতেই একটা গৌণ জায়গায় ঠেলে রেখেছিল, কারণ এ বিজ্ঞান যা নিয়ে কাজ করবে তার মালমশলা সংগ্রহ করতে হবে আগে। কিছু পরিমাণ প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক মালমশলা সংগ্রহ করার আগে কোনো বিচারমূলক বিশ্লেষণ, তুলনা, এবং শ্রেণী, ধারা ও প্রজাতিরূপে তার বিন্যাস হতে পারে না। যথাযথ প্রকৃতিবিজ্ঞানের (exact natural sciences) ভিত্তি তাই প্রথম রচিত হয় আলেকজেণ্ড্রীয় যুগের (৫৬) গ্রীক এবং পরে, মধ্য যুগে, আরবদের দ্বারা। সত্যকারের প্রকৃতিবিজ্ঞানের সূত্রপাত পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং তদবধি নিয়ত বর্ধমান দ্রুততায় তা এগিয়ে গেছে। আলাদা আলাদা অংশে প্রকৃতির বিশ্লেষণ, সুনির্দিষ্ট বর্গে বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ও বস্তুর সন্নিবেশ, বহুবিধ রূপের জৈব বস্তুর অভ্যন্তরীণ শারীরস্থান অধ্যয়ন—গত চারশ' বছরে প্রকৃতি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান যে অতিকায় পদক্ষেপে এগিয়েছে তার মূল শর্ত ছিল এইগুলি। কিন্তু কাজের এই পদ্ধতি থেকে প্রাকৃতিক বস্তু ও প্রক্রিয়াকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা, বিপুল সমগ্রটা থেকে

তাকে সম্পর্কচ্যুত করে দেখার একটা অভ্যাসও আমরা ঐতিহ্য হিশেবে পেয়েছি; তাদের দেখা গতির মধ্যে নয় স্থিতির মধ্যে, মূলত পরিবর্তমান বস্তু হিশেবে নয়, স্থির বস্তু হিশেবে, জীবনের মধ্যে নয়, মরণের মধ্যে। বেকন ও লক্ কর্তৃক এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যখন প্রকৃতিবিজ্ঞান থেকে দর্শনে আনীত হল, তখন তা থেকে দেখা দিল গত শতকের বৈশিষ্ট্যসূচক সংকীর্ণ আধিবিদ্যক ধরনের চিন্তা।

যিনি আধিবিদ্যক (metaphysician) তাঁর কাছে বস্তু ও তাদের মানসিক প্রতিচ্ছবি, ভাবনাদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তাদের বিচার করতে হবে একে একে, পরস্পর থেকে আলাদাভাবে, অনুসন্ধান বস্তু হিশেবে এগুলি স্থির অনড় ও চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট। আধিবিদ্যকের চিন্তা একান্তরূপে দুরপনেয় বিপরীতের (antithesis) ধারায়, তাঁহার বাণী, 'ইতি ইতি বা নেতি নেতি, কারণ ইহার অতিরিক্ত যাহা তাহা আসিতেছে শয়তানের নিকট হইতে।'* তাঁর কাছে একটা বস্তু হয় আছে, নয় নেই। একটা বস্তু একই কালে সেই বস্তু ও অন্য বস্তু হতে পারে না। ইতি ও নেতি পরস্পরকে নাকচ করে; কার্য ও কারণের মধ্যে অনড় বৈপরীত্য বর্তমান। প্রথম দৃষ্টিতে এধরনের চিন্তা আমাদের কাছে ভারি ভাস্বর লাগে, কারণ এ হল তথাকথিত পাকা সাধারণ বুদ্ধির কথা। কিন্তু নিজের চার দেয়ালের ঘরোয়া রাজত্বে পাকা সাধারণ বুদ্ধিটাকে বেশ ভদ্রস্থ দেখালেও যেই সে গবেষণার প্রশস্ত দুনিয়ায় পা বাড়ায়, অমনি অতি আশ্চর্য সব কান্ডকারখানার মধ্যে পড়তে হয় তাকে। আধিবিদ্যক ধরনের চিন্তা যদিও কতকগুলি ক্ষেত্রে সঙ্গত ও প্রয়োজনীয়,—নির্দিষ্ট বিচার্য বস্তুটির প্রকৃতি অনুসারে সে ক্ষেত্রের আয়তন বদলায়,—কিন্তু তাহলেও, আজ হোক, কাল হোক, তা একটা সীমায় পেঁছিয়, যার বাইরে গেলেই তা একপেশে সীমাবদ্ধ বিমূর্ত হয়ে পড়ে, সমাধানহীন বিরোধের মধ্যে পথ হারায়। আলাদা আলাদা বস্তুর বিচারে তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা সে ভুলে যায়, অস্তিত্বের বিচারে ভুলে যায় সে অস্তিত্বের শুরু ও শেষের কথা; স্থিতির বিচারে ভোলে গতি; গাছ দেখে, দেখে না অরণ্য।

---

* 'বাইবেল', ম্যাথু, ৫ অধ্যায়, ৩৭ উপবিভাগ।—সম্পাঃ

যেমন দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে আমরা জানি ও বলতে পারি, একটা প্রাণী জীবিত কি মৃত। কিন্তু খুঁটিয়ে বিচারের পর দেখা যাবে যে, বহু ক্ষেত্রেই প্রশ্নটা অতি জটিল, আইনজ্ঞরা তা ভালোই জানেন। মাতৃগর্ভে কোন যুক্তিসিদ্ধ সীমার পর শিশুকে হত্যা করলে সেটা খুন হবে, তা আবিষ্কার করতে তাঁরা বৃথাই মাথা ঠুকেছেন। মৃত্যুর একটা যথাযথ মুহূর্ত নির্ধারণ করাও সমান অসম্ভব, কেননা শারীরবৃত্তে প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃত্যু একটা তাৎক্ষণিক, মুহূর্তের ঘটনা নয়, অতি দীর্ঘায়ত একটা প্রক্রিয়া। একইভাবে, প্রতিটি জৈব সত্তাও প্রতিমুহূর্তেই সেই একই সত্তা আবার সে সত্তা নয়ও; প্রতি মুহূর্তে তা বাইরে থেকে পদার্থ আত্মস্থ করছে এবং অন্য পদার্থ পরিত্যাগ করছে; প্রতি মুহূর্তে তার দেহের কোনো কোষের মৃত্যু হচ্ছে, কোনো কোষের জন্ম হচ্ছে; দীর্ঘ বা স্বল্প কালের মধ্যে তার দেহের পদার্থ সম্পূর্ণ নবায়িত হয়ে উঠছে, তার স্থান নিচ্ছে পদার্থের অন্য পরমাণু, ফলে প্রত্যেকটা জৈব সত্তাই সর্বদাই সেই বটে তবু সে নয়। অপিচ, গভীরতর অনুসন্ধানে দেখা যায় যে বিপরীতের দুই মেরু অর্থাৎ সদর্থক ও নঞর্থক প্রান্তদুটি যে পরিমাণ পরস্পরবিরোধী সেই পরিমাণেই অবিচ্ছেদ্য, এবং **যতকিছু** বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট। একই ভাবেই দেখা যায়, কার্য ও কারণ রূপ বোধগুলি শুধু বিচ্ছিন্ন এক-একটা ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেই তবে খাটে, কিন্তু এই আলাদা আলাদা ঘটনাগুলি যেই সামগ্রিক বিশ্বের সঙ্গে সাধারণ সম্পর্কের মধ্যে বিবেচিত হয়, তখনই তারা পরস্পরের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং তা তালগোল পাকিয়ে যায় যখন সেই বিশ্বজনীন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবি, যেখানে কার্য ও কারণ নিয়ত স্থান পরিবর্তন করে চলেছে, ফলে একটা ক্ষেত্রে ও একটা মুহূর্তে যা কার্য, অন্য ক্ষেত্রে ও অন্য মুহূর্তে সেটাই হয়ে দাঁড়ায় কারণ, তেমনি আবার কারণও হয়ে দাঁড়ায় কার্য।

আধিবিদ্যক যুক্তির কাঠামোর মধ্যে এই সব প্রক্রিয়া ও ভাবনাধারার কোনোটাই আঁটে না। পক্ষান্তরে, দ্বান্দ্বিকতায় বস্তু ও তার প্রতিভূ, ভাবনা অনুধ্যেয় মূল সম্পর্ক, গ্রন্থিপরম্পরা, গতি, উদ্ভব ও অবসানের মধ্যে, উপরে যেসব প্রক্রিয়ার কথা বলা হল তা তার স্বীয় কর্মপদ্ধতিরই কতকগুলি সমর্থন। দ্বান্দ্বিকতার প্রমাণ হল প্রকৃতি, এবং আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের পক্ষ

নিয়ে বলতেই হবে যে, দিন দিন বর্ধমান অতি মূল্যবান মালমশলা দিয়ে এ প্রমাণ সে দাখিল করে চলেছে এবং দেখিয়েছে যে, শেষ বিচারে, প্রকৃতির ক্রিয়া অধিবিদ্যামূলক নয়, দ্বন্দ্বমূলক; নিয়ত পুনরাবৃত্ত একই বৃত্ত পথে চিরকাল সে চলে না, সত্যকার একটা ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়েই তার যাত্রা। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় ডারউইনের। প্রকৃতির আধিবিদ্যক বোধের বিরুদ্ধে তিনি প্রচণ্ডতম আঘাত হানেন এইটে প্রমাণ করে যে, সমস্ত জৈব সত্তা, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং স্বয়ং মানুষ কোটি কোটি বছরের এক বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। কিন্তু দ্বান্দ্বিকভাবে চিন্তা করতে শিখেছেন এমন প্রকৃতিবিদের সংখ্যা খুবই কম; এবং তাত্ত্বিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অধুনা যে অশেষ বিভ্রান্তি বর্তমান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, রচয়িতা ও পাঠক সকলের মধ্যেই যে সমান হতাশা দেখা যাচ্ছে, তার কারণ হল চিন্তার পূর্বাভ্যস্ত ধরনের সঙ্গে আবিষ্কৃত ফলাফলগুলির এই সংঘাত।

তাই বিশ্বের, তার বিবর্তনের, মানবজাতির বিকাশের এবং মনুষ্যমনে এ বিবর্তনের যে প্রতিফলন, তার সঠিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে কেবল দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে, যাতে জীবন ও মৃত্যুর, অগ্রগামী ও পশ্চাদগামী পরিবর্তনের অসংখ্য ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রতি অবিরাম লক্ষ্য রাখা হয়। নতুন জার্মান দর্শন এই প্রেরণাতেই এগিয়েছে। বিখ্যাত সেই প্রাথমিক অভিঘাত (impulse) একবার পাবার পর নিউটনের যে সৌরমণ্ডলী অবিচল ও চিরস্থায়ী তাকে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার, ঘূর্ণ্যমান বাষ্পস্তূপ (nebulous mass) থেকে সূর্য ও গ্রহাদির সৃষ্টিতে পরিণত করে কাণ্ট তাঁর কর্ম শুরু করেন। তা থেকে তিনি সেই সঙ্গে সিদ্ধান্তে টানেন যে, সৌরমণ্ডলের এই যদি উৎপত্তি হয় তাহলে তার ভবিষ্যৎ মৃত্যুও অনিবার্য। অর্ধ-শতাব্দী পরে তাঁর তত্ত্ব গাণিতিকভাবে নিষ্পন্ন করেন লাপ্লাস, এবং তারও অর্ধ-শতাব্দী পর বর্ণালী যন্ত্র (spectroscope) প্রমাণ করে যে, মহাশূন্যে ঘনীভবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই ধরনের ভাস্বর বাষ্পপুঞ্জ বর্তমান।

নতুন এই জার্মান দর্শন পরিণতি পেল হেগেলের তন্ত্রে। এ তন্ত্রে,— এবং এইটেই তার বড়ো গুণ—এই সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, বুদ্ধিমার্গীয়, সমগ্র বিশ্বই উপস্থাপিত হল একটা প্রক্রিয়ারূপে অর্থাৎ, অবিরত গতি, পরিবর্তন, রূপান্তর ও বিকাশরূপে; এবং এই সমস্ত গতি ও বিকাশ

যাতে একটা অখন্ড সমগ্র হয়ে উঠছে সেই অন্তর্নিহিত সম্পর্ক সন্ধানের চেষ্টা হল। কান্ডজ্ঞানহীন হিংসাকর্মের এক উন্দাম ঘূর্ণাবর্ত, পরিণত দার্শনিক বুদ্ধির কাছে যার প্রতিটি কর্মই সমান নিন্দার্হ এবং যতশীঘ্র ভোলা যায় ততই ভালো, এভাবে প্রতিভাত না হয়ে এ দৃষ্টিভঙ্গির কাছে মনুষ্য ইতিহাস প্রতিভাত হল মানুষেরই বিবর্তনের এক প্রক্রিয়ারূপে। নানান পথের মধ্য দিয়ে এ প্রক্রিয়ায় ক্রমপ্রগতি অনুসরণ করা ও বাহ্যত আকস্মিক সব ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তার অভ্যন্তরীণ নিয়মটিকে বার করার কাজ এবার বুদ্ধির।

যে সমস্যা উপস্থিত করা হল তার সমাধান যে হেগেলীয় তন্ত্র দেয় নি, সেকথা এখানে অবান্তর। এবং যুগান্তকারী কীর্তি হল এই যে সমস্যাটিকে তা বিবৃত করেছে। এ সমস্যা এমন যে, কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে তার সমাধান দেওয়া অসম্ভব। সাঁ-সিমোঁর মতো হেগেল যদিও তৎকালের এক অতি বিশ্বকোষিক মনীষা, তথাপি প্রথমত, তাঁর স্বীয় জ্ঞানের অনিবার্য সীমাবদ্ধ প্রসারে এবং তাঁর যুগের জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণার সীমাবদ্ধ প্রসার ও গভীরতায় তিনি সীমিত। এই সীমাবদ্ধতার সঙ্গে তৃতীয় একটি সীমার কথাও যোগ করতে হবে। হেগেল ছিলেন ভাববাদী। তাঁর কাছে তাঁর মস্তিষ্কমধ্যস্থ ভাবনাগুলি সত্যকার বস্তু ও প্রক্রিয়ার ন্যূনাধিক বিমূর্ত চিত্র নয়, বরং উল্টো, বিশ্বেরও পূর্বে অনাদি কাল থেকে কোথায় যেন অবস্থিত এক 'ভাবের' (Idea) বাস্তবীভূত চিত্রই হল এই বস্তু ও তার বিবর্তন। এধরনের চিন্তায় সবকিছুই একেবারে উল্টো করে দাঁড় করানো হয় এবং বিশ্বের ভেতরকার বস্তুসমূহের আসল সম্পর্কটাকে একেবারে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। আলাদা আলাদা বহু ঘটনাসমষ্টি সঠিকভাবে ও সপ্রতিভায় হেগেল হৃদয়ঙ্গম করলেও সদ্যবর্ণিত কারণে খুঁটিনাটিতে তাতে অনেক কিছুই রয়ে গেছে যা জোড়াতালি, কৃত্রিম, টেনেবুনে করা, অর্থাৎ ভুল। হেগেলীয় তন্ত্রটা এমনিতে একটা বিপুল গর্ভপাত, তবে এ জাতের গর্ভপাত এই শেষ। বস্তুতপক্ষে একটা অন্তর্নিহিত ও অনপনোদনীয় বিরোধিতায় তা পীড়িত। একদিকে তার মূলকথা হল এই বোধ যে, মানবিক ইতিহাস একটা বিবর্তন প্রক্রিয়া, সুতরাং তার প্রকৃতিবশেই কোনো তথাকথিত পরম সত্য আবিষ্কারই তার বুদ্ধিমার্গীয় শেষ কথা হতে পারে না। অথচ অন্যদিকে নিজেকে এই পরম

সত্যেরই মূলাধার বলে তা দাবি জানায়। প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের এই দর্শনতন্ত্র যা সবকিছুকে বিধৃত করছে ও চিরকালের মতো চূড়ান্ত হয়ে থাকছে,—এটা দ্বান্দ্বিক যুক্তির মূল নিয়মেরই বিরোধী। বহির্বিশ্বের নিয়মিত জ্ঞান যে যুগে যুগে বিপুল পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারে, একথা এ নিয়মে বস্তুতপক্ষে মোটেই নাকচ হয় না, বরং সেইটাই ধরে নেওয়া হয়।

জার্মান ভাববাদের এই মৌলিক স্ববিরোধের বোধ থেকে অনিবার্যই প্রত্যাবর্তন ঘটল বস্তুবাদে কিন্তু, nota bene, নেহাৎ সেই আধিবিদ্যক, অষ্টাদশ শতকের একান্তরূপের যান্ত্রিক বস্তুবাদে নয়। সাবেকি বস্তুবাদের চোখে সমস্ত অতীত ইতিহাস ছিল অযৌক্তিকতা ও জোর-জুলুমের এক কদাকার স্তূপ; আধুনিক বস্তুবাদ তার ভেতর দেখে মানবসমাজের বিবর্তন প্রক্রিয়া এবং সে বিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কারই তার লক্ষ্য। অষ্টাদশ শতকের ফরাসীদের কাছে, এমনকি হেগেলের কাছেও, সমগ্রভাবে প্রকৃতির যা বোধ সেটা এই যে, তা সংকীর্ণ, চিরকালের মতো অপরিবর্তনীয় চক্রে ঘূর্ণমান, গ্রহ-তারা সব চিরন্তন—যা শিখিয়েছিলেন নিউটন, এবং তার জীব-প্রজাতির নড়চড় নেই—যা শিখিয়েছিলেন লিনিয়স। আধুনিক বস্তুবাদ ধারণ করে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অধুনাতন আবিষ্কারগুলিকে, তাতে ধরা হয় যে প্রকৃতিরও একটা কালগত ইতিহাস আছে, গ্রহ-তারাগুলিরও জন্মমৃত্যু হচ্ছে যেমন জন্মমৃত্যু হচ্ছে জৈব প্রজাতিগুলির, যারা অনুকূল পরিস্থিতিতে বাস নিয়েছে এই সব গ্রহ-তারাতে। এবং সমগ্রভাবে প্রকৃতি যদি বা পুনরাবৃত্ত চক্রেই আবর্তিত বলে এখনো পর্যন্ত ধরতে হয়, তাহলে এ চক্রের আয়তন বেড়ে যাচ্ছে সীমাহীনরূপে। দুদিক থেকেই আধুনিক বস্তুবাদ মূলত দ্বান্দ্বিক; রাণীর মতো বিজ্ঞানের অবশিষ্ট প্রজাদের ওপর প্রভুত্ব করার দাবিদার কোনো একটা দর্শনের প্রয়োজন তার আর নেই। বিশেষ বিশেষ প্রত্যেকটি বিজ্ঞানই যতই বস্তুর এবং আমাদের বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের বিপুল সামগ্রিকতার মধ্যে নিজ নিজ অবস্থান পরিষ্কার করে নিতে বাধ্য, ততই এই সামগ্রিকতা নিয়ে একটা বিশেষ বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় অবান্তর নতুবা অনাবশ্যক। পূর্বতন সমস্ত দর্শনের মধ্য থেকে যেটুকু টিকে থাকে তা হল চিন্তা ও তার নিয়মের বিজ্ঞান—যুক্তি প্রকরণ (formal logic) ও দ্বন্দ্বতত্ত্ব। বাকি সবকিছুই প্রকৃতি ও ইতিহাসের বাস্তব বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

অবশ্য, প্রকৃতিবিষয়ক বোধে বিপ্লব যদিও হওয়া সম্ভব কেবল তদ্‌পযোগী গবেষণালব্ধ সুনির্দিষ্ট মালমশলার অনুপাতে, তাহলেও বেশ আগেই এমন কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল যাতে ঐতিহাসিক বোধের ক্ষেত্রে একটা চূড়ান্ত পরিবর্তন আসে। ১৮৩১ সালে প্রথম শ্রমিক অভ্যুত্থান ঘটে লিয়োঁ-তে, ১৮৩৮-১৮৪২ সালের মধ্যে প্রথম জাতীয় শ্রমিক আন্দোলন, ইংরেজ চার্টিস্টদের আন্দোলন শীর্ষে আরোহণ করে। একদিকে আধুনিক শিল্প এবং অন্যদিকে বুর্জোয়ার নবার্জিত রাজনৈতিক প্রাধান্য যে অনুপাতে বিকাশ পায় সেই অনুপাতে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম পুরোভাগে আসতে থাকে ইউরোপের অতি অগ্রসর দেশগুলির ইতিহাসে। পুঁজি ও মেহনতের সমস্বার্থ, অবাধ প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ সার্বজনীন সামঞ্জস্য ও সার্বজনীন সমৃদ্ধি—বুর্জোয়া অর্থনীতির এই সব শিক্ষাকে ক্রমেই সজোরে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিতে লাগল ঘটনা। এসব ব্যাপারকে আর উপেক্ষা করা চলে না, যেমন উপেক্ষা করা চলে না তাদের তাত্ত্বিক, যদিও অতি অপরিণত প্রকাশ—ফরাসী ও ইংরেজ সমাজতন্ত্রকে। কিন্তু ইতিহাসের পুরনো ভাববাদী যে ধারণা তখনো অপসৃত হয় নি, তার মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে শ্রেণী-সংগ্রামের কোনো জ্ঞান ছিল না, জ্ঞান ছিল না অর্থনৈতিক স্বার্থের; উৎপাদন তথা সর্ববিধ অর্থনৈতিক সম্পর্ক তার কাছে কেবল 'সভ্যতার ইতিহাসের' আনুষঙ্গিক গৌণ ঘটনা মাত্র।

নতুন তথ্যগুলির ফলে সমস্ত অতীত ইতিহাসের একটা নতুন বিচার আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। তখন দেখা গেল, আদিম পর্যায়গুলি বাদে **সমস্ত** অতীত ইতিহাসই হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস; সমাজের এই যুধ্যমান শ্রেণীগুলিও সর্বদাই উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতি অর্থাৎ তৎকালীন **অর্থনৈতিক** সম্পর্কের ফল; সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোটা থেকেই আসছে আসল বনিয়াদ, যা থেকে শুরু করে আমরা একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগের আইনী ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা তার ধর্মীয়, দার্শনিক ও অন্যবিধ ভাবধারার সমগ্র উপরিকাঠামোর চূড়ান্ত ব্যাখ্যা বার করতে পারি। ইতিহাসকে হেগেল মুক্ত করেছিলেন অধিবিদ্যা থেকে, তাকে তিনি দ্বান্দ্বিক করে তোলেন, কিন্তু তাঁর ইতিহাস-বোধ ছিল মূলত ভাববাদী। এবার কিন্তু ভাববাদ বিতাড়িত হল তার শেষ আশ্রয়, ইতিহাসের দর্শন থেকে, এবার

প্রবর্তিত হল ইতিহাসের একটা বস্তুবাদী ব্যাখ্যান, এযাবৎকাল যা হত সেভাবে মানুষের 'সত্তাকে' তার 'জ্ঞান' দিয়ে ব্যাখ্যা না করে 'জ্ঞানকে' তার 'সত্তা' দিয়ে ব্যাখ্যা করার একটা পদ্ধতি পাওয়া গেল।

সেসময় থেকে সমাজতন্ত্র আর কোনো না কোনো প্রতিভাবান মস্তিষ্কের আকস্মিক আবিষ্কার নয়। তা হল প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া এই দুই ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত শ্রেণীর ভেতরকার সংগ্রামের আবশ্যিক পরিণাম। যথাসম্ভব নিখুঁত একটা সমাজের বিধান বানানো আর নয়, তার কাজ হল সেই ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক ঘটনা-পরম্পরা অনুধাবন করা যা থেকে এই শ্রেণীগুলো ও তাদের বৈরের অনিবার্য উদ্ভব ঘটেছে এবং এইভাবে গড়ে-ওঠা অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সে সংঘাত দূরীকরণের উপায় বার করা। কিন্তু ইতিহাসের এই বস্তুবাদী ধারণার সঙ্গে আগের কালের সমাজতন্ত্রের ততটাই গরমিল যতটা গরমিল দ্বান্দ্বিকতা ও আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে ফরাসী বস্তুবাদীদের প্রকৃতিবিষয়ক বোধের। আগের কালের সমাজতন্ত্র অবশ্যই উৎপাদনের প্রচলিত পুঁজিবাদী পদ্ধতি ও তার ফলাফলের সমালোচনা করেছে। কিন্তু সেটাকে তা ব্যাখ্যা করতে পারে নি সুতরাং এর ওপর প্রাধান্য লাভ করা ছিল তার অসাধ্য। সম্ভব ছিল শুধু মন্দ বলে এগুলিতে বর্জন করা। পুঁজিবাদের আমলে যা অনিবার্য শ্রমিক শ্রেণীর সেই শোষণকে এই পূর্বতন সমাজতন্ত্র যতই সজোরে ধিক্কার দিতে থাকল ততই একথা পরিষ্কার করে বোঝাতে সে অক্ষম হয়ে উঠল, কিসে সেই শোষণ, কীভাবে তার উদ্ভব। কিন্তু সেজন্য দরকার ছিল (১) পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকে তার ঐতিহাসিক সম্পর্কের মধ্যে দেখানো, একটা বিশেষ ঐতিহাসিক যুগে তার অনিবার্যতা এবং সেইহেতু তার অনিবার্য পতনের কথাও উপস্থিত করা, এবং (২) তার মূল চরিত্র উদ্‌ঘাটন করা, যা তখনো সংগুপ্ত। এ কাজ নিষ্পন্ন হল **বাড়তি মূল্যের** আবিষ্কারে। দেখানো হল যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি এবং তদধীনে শ্রমিক শোষণের ভিত্তি হল দাম-না-দেওয়া শ্রমের আত্মসাৎ; বাজার থেকে পুঁজিপতি যদি শ্রমশক্তিকে পণ্য হিশেবে তার পুরো দাম দিয়েই কেনে, তাহলেও সে যে দাম দিচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্য নিষ্কাশিত করে নেয়; এবং শেষ বিশ্লেষণে এই বাড়তি মূল্য থেকেই সেই মূল্য-সমষ্টির সৃষ্টি যা দিয়ে মালিক শ্রেণীগুলির হাতে জমে উঠছে

ক্রমবর্ধমান পুঁজির স্তূপ। পুঁজিবাদী উৎপাদন এবং পুঁজির উৎপাদন উভয়েরই সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা গেল।

ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধ এবং বাড়তি মূল্য মারফত পুঁজিবাদী উৎপাদনের রহস্য উদ্‌ঘাটন, এই দুই বিরাট আবিষ্কারের জন্য আমরা **মার্কসের** কাছে ঋণী। এই আবিষ্কারগুলির ফলে সমাজতন্ত্র হয়ে উঠল বিজ্ঞান। পরের কাজ হল তার সবকিছু খুঁটিনাটি ও সম্পর্কপাত বিস্তারিত করে তোলা।

৩

ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধের শুরু এই কথা থেকে যে মনুষ্যজীবনের ভরণ-পোষণের উপায়ের উৎপাদন এবং তৎপরে উৎপাদিত বস্তুর বিনিময়—এই হল সমস্ত সমাজ কাঠামোর ভিত্তি, এবং ইতিহাসে আবির্ভূত প্রতিটি সমাজের ধনবণ্টনের ধরন এবং শ্রেণী ও বর্গে সমাজের বিভাগ নির্ভর করে কী উৎপাদন হল, কীভাবে উৎপাদিত হল এবং কীভাবে উৎপন্নের বিনিময় হল, তার ওপর। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্ত সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক বিপ্লবের অন্তিম কারণের সন্ধান করতে হবে মানুষের মস্তিষ্কে নয়, চিরন্তন সত্য ও ন্যায় নির্ণয়ে কোনো ব্যক্তির উন্নততর অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে নয়, উৎপাদন-পদ্ধতি ও বিনিময়ের ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে। তার সন্ধান করতে হবে **দর্শনের** মধ্যে নয়, প্রতি যুগের **অর্থনীতির** মধ্যে। প্রচলিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি অযৌক্তিক ও অন্যায়, 'যুক্তি যে হয়ে দাঁড়িয়েছে অ-যুক্তি এবং ন্যায় অ-ন্যায়'*, তা কেবল এই প্রমাণ করে যে, উৎপাদন-পদ্ধতিতে ও বিনিময়ের ধরনে অলক্ষ্যে এমন পরিবর্তন ঘটে গেছে যাতে পূর্বতন অর্থনৈতিক অবস্থার উপযোগী সমাজব্যবস্থাটা আর খাপ খাচ্ছে না। তা থেকে আরো দাঁড়ায় যে, উদ্‌ঘাটিত বৈষম্য থেকে ত্রাণের উপায়ও এই পরিবর্তিত উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যেই ন্যূনাধিক বিকশিত অবস্থায় থাকতে বাধ্য। মূল সব নীতি থেকে অবরোহ পদ্ধতিতে সে উপায়গুলো **উদ্ভাবনীয়**

* গ্যেটের 'ফাউস্ট', ১ম ভাগ, ৪র্থ দৃশ্য ('ফাউস্টের কক্ষ')।—সম্পাঃ

নয়, সেগুলো **উদ্ঘাটন করতে** হবে প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার কঠোর সত্যগুলির মধ্যে।

এই প্রসঙ্গে আধুনিক সমাজতন্ত্রের অবস্থান তাহলে কী?

একথা এখন সকলেই বেশ মানেন, সমাজের বর্তমান ব্যবস্থা আজকের শাসক শ্রেণী বুর্জোয়ার সৃষ্টি। বুর্জোয়ার বৈশিষ্ট্যসূচক উৎপাদন-পদ্ধতি, মার্কসের সময় থেকে যা উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি বলে পরিচিত তা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে, ব্যক্তি বিশেষ, গোটাগুটি এক-একটা সামাজিক বর্গ ও স্থানীয় সঙ্ঘের জন্য সামন্ততন্ত্র যে বিশেষ সুবিধা দিয়েছে তার সঙ্গে তথা সামন্ততন্ত্রের যা সামাজিক কাঠামো সেই বংশগত অধীনতা সম্পর্কের সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না। বুর্জোয়ারা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলে তার ধ্বংসের ওপর বানাল পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা,—অবাধ প্রতিযোগিতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, আইনের চোখে সমস্ত পণ্য-মালিকদের সমানাধিকার ইত্যাদি পুঁজিবাদী আশীর্বাদের রাজত্ব। তখন থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি স্বাধীনভাবে বিকাশ পেতে পারল। বাষ্প, যন্ত্র এবং যন্ত্রতৈরির যন্ত্র যখন থেকে পুরনো কারখানাকে আধুনিক শিল্পে রূপান্তরিত করে, তখন থেকে বুর্জোয়াদের পরিচালনায় উৎপাদন-শক্তি এমন দ্রুততায় ও এমন মাত্রায় বেড়েছে যা অশ্রুতপূর্ব। কিন্তু তার নিজের যুগে পুরনো কারখানা, এবং সে কারখানার প্রভাবে অধিকতর বিকশিত হস্তশিল্প যেমন গিল্ডের সামন্ত শৃঙ্খলের সঙ্গে সংঘাতে আসে, ঠিক তেমনি আধুনিক শিল্প তার পরিপূর্ণতর বিকাশে এবার সংঘাতে আসছে সেই সব সীমার সঙ্গে যার মধ্যে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি তাকে আটকে রাখছে। উৎপাদন-শক্তিকে ব্যবহার করার পুঁজিবাদী পদ্ধতিকে ইতিমধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে নতুন উৎপাদন-শক্তি। এবং উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে উৎপাদন-পদ্ধতির এই সংঘাতটা আদিম পাপ বনাম স্বর্গীয় ন্যায়ের মতো একটা সংঘাত নয়, যার উদ্ভব মানুষের মনে। সত্য ঘটনা হিশেবে, বাস্তবে, আমাদের বাইরে, এমনকি যে লোকগুলি এ সংঘাত সৃষ্টি করেছে তাদের অভিপ্রায় ও কর্মের অপেক্ষা না রেখেই এ সংঘাত বর্তমান। আধুনিক সমাজতন্ত্র আর কিছুই নয়—বাস্তব ক্ষেত্রের এই সংঘাতের প্রতিফলন ভাবনার ক্ষেত্রে, প্রত্যক্ষভাবে যে শ্রেণী তাতে পীড়িত সর্বাগ্রে সেই শ্রমিক শ্রেণীর মানসে সে সংঘাতের এক আদর্শ প্রতিচ্ছবি।

কী নিয়ে এই সংঘাত?

পুঁজিবাদী উৎপাদনের পূর্বে অর্থাৎ মধ্য যুগে উৎপাদনের উপায় মেহনতীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এই ভিত্তিতে ক্ষুদে শিল্পের ব্যবস্থাই ছিল সাধারণভাবে প্রচলিত; গ্রামাঞ্চলে ভূমিদাস বা স্বাধীন ক্ষুদে চাষীর কৃষিব্যবস্থা, শহরে গিল্ডের হস্তশিল্প। শ্রমের সরঞ্জাম—ভূমি, কৃষিযন্ত্র, কর্মশালা, হাতিয়ারপত্র ছিল এক একজনের একক শ্রমের সরঞ্জাম, শুধু একজন শ্রমিকের ব্যবহারেরই তা উপযোগী এবং সেই কারণে স্বভাবতই তা ছিল ক্ষুদ্র, বামনাকার ও সীমাবদ্ধ। কিন্তু ঠিক ঠিক এই জন্যই সাধারণত উৎপাদকই ছিল তার মালিক। উৎপাদনের এই বিক্ষিপ্ত, স্বল্প উপায়গুলিকে পুঞ্জীভূত করা, পরিবর্ধিত করা, আধুনিক উৎপাদনের প্রবল হাতিয়ারে পরিণত করা—এইটেই ছিল পুঁজিবাদী উৎপাদন ও তার প্রবক্তা বুর্জোয়াদের ঐতিহাসিক ভূমিকা। 'পুঁজি' গ্রন্থের চতুর্থ অংশে মার্কস বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, কীভাবে সরল সমবায়, কারখানা ও আধুনিক শিল্প, এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে তা ঐতিহাসিকভাবে রূপায়িত হয়ে এসেছে ১৫শ শতক থেকে। তাতে আরো দেখানো হয়েছে যে, উৎপাদনের এই সব ক্ষুদে ক্ষুদে উপায়গুলিকে যুগপৎ ব্যক্তির উৎপাদন-উপায় থেকে একমাত্র সমষ্টিগতভাবে পরিচালনীয় সামাজিক উৎপাদন-উপায়ে পরিণত না করে বুর্জোয়ারা সেগুলোকে শক্তিশালী উৎপাদন-শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারত না। চরকা, তাঁত, কামারের হাতুড়ির জায়গায় এল বয়ন-যন্ত্র, শক্তি-চালিত তাঁত, বাষ্প-চালিত হ্যামার; ব্যক্তিগত কর্মশালার জায়গায় এল ফ্যাক্টরি যাতে শত শত, হাজার হাজার মজুরের সহযোগ প্রয়োজন। একই ভাবে, উৎপাদন ব্যাপারটাই একসারি ব্যক্তিগত কর্ম থেকে পরিবর্তিত হল একসারি সামাজিক কর্মে এবং উৎপন্ন দ্রব্য পরিবর্তিত হল ব্যক্তিগত থেকে সামাজিক উৎপন্ন দ্রব্যে। ফ্যাক্টরি থেকে এবার যে সুতা, যে কাপড়, যে ধাতু দ্রব্যাদি বেরিয়ে আসতে লাগল তা হল বহু শ্রমিকের মিলিত উৎপাদন, যা পর পর বহু শ্রমিকের হাত ঘুরে এসে তবে তৈরি হয়েছে। কোনো একটা লোক একথা বলতে পারত না, 'এটা **আমি** তৈরি করেছি; এটা **আমার** মাল।'

কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো একটা সমাজে যেখানে উৎপাদনের মূল ধরনটা হল শ্রমের এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত বিভাগ যা কোনো পূর্বপরিকল্পিত ছকের

ওপর নয় এমনিই ধীরে ধীরে এসে পড়েছে, সেখানে উৎপন্নও **পণ্যের** রূপ নেয়, এ পণ্যের পারস্পরিক বিনিময়ে, বেচা-কেনায় ব্যক্তিগত উৎপাদক তার বহুবিধ চাহিদা মেটাতে পারে। এই ছিল মধ্য যুগের অবস্থা। যেমন, কৃষক কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করত হস্তশিল্পীর কাছে এবং তার কাছ থেকে কিনত হস্তশিল্পজাত সামগ্রী। ব্যক্তিগত উৎপাদক, পণ্য-উৎপাদকদের এই সমাজে চেপে বসল নতুন উৎপাদন-পদ্ধতি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কোনো **নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বিনাই** যা গড়ে উঠেছিল এবং সমগ্র সমাজ যার ওপর চলত সেই পুরনো শ্রম-বিভাগের ভেতর এবার এল একটা **নির্দিষ্ট পরিকল্পনার** ভিত্তিতে শ্রম-বিভাগ, যেমন ফ্যাক্টরিতে; **ব্যক্তিগত** উৎপাদনের পাশাপাশি আবির্ভূত হল **সামাজিক** উৎপাদন। দু-ধরনের উৎপাদনই একই বাজারে বিক্রয় হত, সুতরাং অন্তত মোটের ওপর সমান সমান দামে। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত শ্রম-বিভাগের চেয়ে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার সংগঠন প্রবলতর। সমষ্টিবদ্ধ ব্যক্তির সংযুক্ত সামাজিক শক্তি নিয়ে কাজ চালানো ফ্যাক্টরিগুলি ব্যক্তিগত ক্ষুদে উৎপাদকদের চেয়ে পণ্য-উৎপাদন করতে লাগল অনেক শস্তায়। শাখার পর শাখায় হার মানতে লাগল ব্যক্তিগত উৎপাদন। সমাজীকৃত উৎপাদন উৎপাদনের সমস্ত পুরনো পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটাল। কিন্তু সেই সঙ্গে তার বিপ্লবী চরিত্রটা এতই কম পরিজ্ঞাত ছিল যে, তা প্রবর্তিত হয় উল্টে বরং পণ্য-উৎপাদনের বৃদ্ধি ও বিকাশের উপায় হিশেবে। উদ্ভবের সময় তা পণ্য-উৎপাদন ও বিনিময়ের কতকগুলি তৈরি ব্যবস্থা পেয়েছিল এবং তা ব্যাপকভাবে কাজে লাগায়, যথা বণিক-পুঁজি, হস্তশিল্প, মজুরি-শ্রম। সমাজীকৃত উৎপাদন এইভাবে পণ্য-উৎপাদনের একটা নবরূপ হিশেবে প্রবর্তিত হওয়ায় অবধারিতভাবেই তার মধ্যে দখলীকরণের পুরনো রূপগুলো পুরো বজায় থাকে এবং তার উৎপন্নের ক্ষেত্রেও তা প্রযুক্ত হয়।

পণ্য-উৎপাদনের বিবর্তনের মধ্যযুগীয় স্তরে শ্রমোৎপন্ন বস্তুর মালিক কে, সে প্রশ্ন উঠতেও পারে নি। নিজেরই কাঁচামাল—সাধারণত তা তার নিজেরই তৈরি—তাই থেকে ব্যক্তিগত উৎপাদক নিজের হাতিয়ারপত্র দিয়ে, নিজের বা পরিবারের মেহনতে তা উৎপন্ন করত। উৎপন্ন বস্তুটা দখল করার কোনো প্রয়োজন উৎপাদকের ছিল না। অবধারিতভাবেই তা ছিল পুরোপুরি তারই জিনিস। সুতরাং, উৎপন্ন বস্তুর উপর তার মালিকানার ভিত্তি হল

তার নিজ শ্রম। যে ক্ষেত্রে বাইরের সাহায্য ব্যবহৃত হত, সেখানেও সাধারণত তার গুরুত্ব থাকত কম, এবং প্রায়শই মজুরি ছাড়া অন্য জিনিস দিয়ে তা পুষিয়ে দেওয়া হত। গিল্ডের শিক্ষানবিস ও কর্মীরা কাজ করত ভরণ-পোষণ ও মজুরির জন্য ততটা নয়, যতটা শিক্ষার জন্য, নিজেরাই যাতে তারা ওস্তাদ হয়ে উঠতে পারে সেই জন্য। তারপর শুরু হল বড়ো বড়ো কর্মশালা ও কারখানায় উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদকদের পুঞ্জীভবন, প্রকৃতই সমাজীকৃত উৎপাদন-উপায় ও সমাজীকৃত উৎপাদক হিশেবে তাদের রূপান্তর। কিন্তু সমাজীকৃত উৎপাদক এবং উৎপাদন-উপায় ও তাদের উৎপন্ন দ্রব্য এ পরিবর্তনের পরেও ঠিক আগের মতোই বিবেচিত হতে লাগল অর্থাৎ ধরা হতে থাকল ব্যক্তিগত উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্য রূপে। এযাবৎকাল মেহনতী সরঞ্জামের মালিকই উৎপন্ন দ্রব্যের দখল নিয়েছে কেননা সাধারণত এটা তারই উৎপন্ন, অন্যের সাহায্যটা ব্যতিক্রম। এবাব মেহনতী সরঞ্জামের মালিকই উৎপন্ন দ্রব্য দখল করতে থাকল, যদিও এটা এখন তার উৎপন্ন নয়, একান্তরূপে অন্যের মেহনত থেকে উৎপন্ন। এইভাবে, সামাজিকভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের দখল পেল না তারা, যারা সত্যিই উৎপাদনের উপায়কে চালু করেছে, যারা সত্যিই পণ্য-উৎপাদন করেছে, দখল পেল পুঁজিপতিরা। উৎপাদনের উপায় তথা উৎপাদনটাই মূলত সমাজীকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু এমন একটা দখলীকরণ প্রথার তা অধীন রইল যাতে এক এক জনের ব্যক্তিগত উৎপাদন স্বীকৃত এবং সেইহেতু, প্রত্যেকেই ছিল তার নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক এবং তা বাজারে আনত। এই রকমের দখলের অধীন হল উৎপাদন-পদ্ধতি, যদিও এ দখলের যে শর্ত তার উচ্ছেদ করে দিয়েছে তা।* এই স্ববিরোধটাই

* দখলের রূপ একই থাকলেই তার চরিত্রে উপরি-বর্ণিত কারণে উৎপাদনের মতোই সমান একটা বিপ্লব যে ঘটে যায় তা এ প্রসঙ্গে দেখানোর তেমন প্রয়োজন নেই। আমি আমার নিজের উৎপন্ন দখল করছি না অন্যের উৎপন্ন দখল করছি, তা অবশ্যই অতি পৃথক দুটো জিনিস। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভ্রূণাকারে সমগ্র পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি যার মধ্যে নিহিত সেই মজুরি-শ্রম অতিশয় প্রাচীন: আপতিক, বিক্ষিপ্ত রূপে তা বহু শতাব্দী যাবৎ দাস-শ্রমের পাশাপাশি থেকেছে। কিন্তু সে ভ্রূণ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিতে যথারীতি বিকশিত হতে পারল শুধু তখন, যখন প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক পূর্বশর্তগুলি পাওয়া গেল। (এঙ্গেলসের টীকা।)

নতুন উৎপাদন-পদ্ধতিকে পুঁজিবাদী চরিত্র দান করেছে এবং তার মধ্যেই **আজকের সমগ্র সামাজিক বৈরের বীজ নিহিত।** উৎপাদনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এবং সমস্ত উৎপাদনশীল দেশে এই নতুন উৎপাদন-পদ্ধতির আধিপত্য যতই বাড়ছে, যতই তা ব্যক্তিগত উৎপাদনকে এক নগণ্য হতাবশেষে পরিণত করেছে, **ততই পরিষ্কার করে ফুটে উঠেছে সমাজীকৃত উৎপাদনের সঙ্গে পুঁজিবাদী দখলের অসামঞ্জস্য।**

আগেই বলেছি, প্রথম পুঁজিপতিরা বাজারে অন্যান্য রূপের শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে মজুরি-শ্রমও পায় তৈরি অবস্থায়। কিন্তু সে ছিল ব্যতিরেকমূলক, অনুপূরক, সহায়ক, অস্থায়ী মজুরি-শ্রম। কৃষি-মেহনতি কখনো কখনো বা দিন-মজুর হিশেবে খাটলেও কয়েক একর নিজস্ব জমি তার ছিল, যাই ঘটুক না কেন, তা থেকে দুমুঠো জোগাড় করতে পারত সে। গিল্ডগুলির সংগঠন ছিল এমন যে, আজ যে জোগাড়ে কাল সে হত ওস্তাদ। কিন্তু উৎপাদনের উপায় সমাজীকৃত ও পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ সবকিছু বদলে গেল। ব্যক্তিগত উৎপাদকের উৎপাদন-উপায় তথা উৎপন্ন দ্রব্য ক্রমেই হয়ে উঠল মূল্যহীন; পুঁজিপতির অধীনে মজুরি-শ্রমিক হয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় রইল না। কিছু পূর্বে যা ছিল ব্যতিরেক ও সহায়ক, সেই মজুরি-শ্রম হয়ে দাঁড়াল নিয়ম ও সমস্ত উৎপাদনের ভিত্তি; আগে যা ছিল পরিপূরক তাই অবশিষ্ট রইল শ্রমিকদের একমাত্র কর্ম হিশেবে। যারা ছিল অস্থায়ী মজুরি-শ্রমিক তারা হয়ে দাঁড়াল স্থায়ী মজুরি-শ্রমিক। এই স্থায়ী মজুরি-শ্রমিকের সংখ্যা আরো প্রভূত পরিমাণ বেড়ে ওঠে সেসময় সংঘটিত সামন্ত ব্যবস্থার ভাঙনে, সামন্ত প্রভুদের লশকর বাহিনী ভেঙে দেওয়া, বাস্তু-জমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ প্রভৃতিতে। একদিকে পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত উৎপাদনের উপায় এবং অন্যদিকে শ্রমশক্তি ছাড়া যাদের আর কিছুই নেই সেই উৎপাদকেরা, এ দুয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হল। **সমাজীকৃত উৎপাদন ও পুঁজিবাদী দখলের মধ্যেকার বিরোধ আত্মপ্রকাশ করল প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার বৈর রূপে।**

আমরা দেখেছি, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি ঢুকে পড়ল পণ্য-উৎপাদক, ব্যক্তিগত উৎপাদকদের একটা সমাজের মধ্যে, যাদের সামাজিক বন্ধন ছিল উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়। কিন্তু পণ্য-উৎপাদনের ভিত্তিতে গড়া প্রত্যেকটি

সমাজের এই একটা বৈশিষ্ট্য আছে: উৎপাদকেরা তাদের নিজ সামাজিক অন্তঃসম্পর্কের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায়। যা পাওয়া গেছে তেমনি ধারা উৎপাদনের উপায় দিয়ে এবং বাকি চাহিদা মেটাতে যা দরকার তার বিনিময়ার্থে প্রত্যেকেই উৎপাদন করে তার নিজের জন্য। কেউ জানে না, তার বিশেষ মালটা বাজারে আসবে কতখানি, কী পরিমাণই বা তার চাহিদা হবে। কেউ জানে না, তার স্বীয় উৎপন্ন দ্রব্যটা সত্যকার চাহিদা মেটাবে কিনা, তার উৎপাদন-খরচ সে পুষিয়ে নিতে পারবে কিনা, এমনকি আদৌ তার পণ্যটা বিক্রি হবে কিনা। সমাজীকৃত উৎপাদনে রাজত্ব করে নৈরাজ্য। কিন্তু অন্যান্য প্রতিটি ধরনের উৎপাদনের মতো পণ্য-উৎপাদনেরও কতকগুলি বিশিষ্ট অন্তর্নিহিত অবিচ্ছেদ্য নিয়ম আছে; এবং নৈরাজ্য সত্ত্বেও, নৈরাজ্যের ভেতরে, নৈরাজ্যের মাধ্যমেই এ সব নিয়ম কাজ করে যায়। এ নিয়মগুলো আত্মপ্রকাশ করে সামাজিক আত্মসম্পর্কের একমাত্র অবিচল রূপে অর্থাৎ বিনিময়ের ক্ষেত্রে এবং প্রতিযোগিতার বাধ্যতামূলক নিয়ম হিশেবে ব্যক্তিগত উৎপাদকদের প্রভাবিত করে। প্রথম দিকে এ নিয়ম উৎপাদকদেরই জানা থাকে না, তা আবিষ্কার করতে হয় ক্রমে ক্রমে, অভিজ্ঞতার ফলে। এ নিয়ম তাই উৎপাদকদের অপেক্ষা না রেখে, তাদেরই বিরুদ্ধে, তাদের বিশেষ বিশেষ উৎপাদনের অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মরূপে কাজ করে যায়। উৎপন্ন শাসন করে উৎপাদকদের।

মধ্যযুগীয় সমাজে, বিশেষ করে আগেকার শতকগুলিতে উৎপাদনের মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানো। প্রধানত তা মেটাত শুধু উৎপাদক ও তার পরিবারের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত অধীনতা সম্পর্ক যেখানে ছিল, যেমন গ্রামাঞ্চলে, সেখানে তা সামন্ত প্রভুর প্রয়োজনও মেটাতে সাহায্য করত। সুতরাং, এটা বিনিময়ের ব্যাপার ছিল না, উৎপন্নও সেই কারণে পণ্যের রূপ নেয় নি। কৃষক পরিবারটির যা যা প্রয়োজন—কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র তথা তার জীবিকা নির্বাহের উপায়, প্রায় সব তারাই উৎপন্ন করত। নিজের প্রয়োজন মেটানো এবং সামন্ত প্রভুর নিকট ফসলী খাজনা পরিশোধের অতিরিক্ত যখন সে কিছু উৎপাদন শুরু করল, কেবল তখনই সে উৎপাদন করল পণ্য। সামাজিক বিনিময়ের মধ্যে যা এসেছে এবং বিক্রয়ের জন্য যা ছাড়া হয়েছে সেই উদ্বৃত্তটা হয়ে দাঁড়াল পণ্য।

শহরের হস্তশিল্পীদের প্রথম থেকেই পণ্য উৎপাদন করতে হত সত্য। কিন্তু তারাও তাদের নিজ নিজ প্রয়োজনের বেশির ভাগটাই নিজেরা মেটাত। বাগান আর জমি ছিল তাদের। গবাদি পশুপাল তাদের চরত বারোয়ারী বনে, কাঠ আর জ্বালানিও তারা পেত সেখান থেকে। মেয়েরা শণ, পশম বুনত ইত্যাদি। বিনিময়ের জন্য উৎপাদন, পণ্য-উৎপাদন তখনো মাত্র তার শৈশবে। সুতরাং, বিনিময় ছিল সংকুচিত, বাজার সংকীর্ণ, উৎপাদন-পদ্ধতি সুস্থির; বাইরের দিকে ছিল স্থানীয় বিচ্ছিন্নতা, ভিতর দিক থেকে ছিল স্থানীয় ঐক্য; গ্রামাঞ্চলে মার্ক,* শহরে গিল্ড।

কিন্তু পণ্য-উৎপাদনের প্রসার, বিশেষ করে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এযাবৎ যা ছিল সুপ্ত, পণ্য-উৎপাদনের সেই নিয়মগুলি অধিকতর প্রকাশ্যে প্রবলতররূপে সক্রিয় হয়ে উঠল। পুরনো বন্ধন হয়ে গেল শিথিল, বিচ্ছিন্নতার সাবেকি সীমা ভেঙে পড়ল, উৎপাদকেরা ক্রমেই বেশি বেশি পরিবর্তিত হল আলাদা আলাদা স্বাধীন পণ্য-উৎপাদক রূপে। পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, সাধারণ সামাজিক উৎপাদন রয়েছে এক পরিকল্পনাহীনতা, আকস্মিকতা, নৈরাজ্যের শাসনে এবং এ নৈরাজ্য ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু সমাজীকৃত উৎপাদনের এই নৈরাজ্যকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি প্রধান যে উপায়ে তীব্র করে তোলে, সেটা নৈরাজ্যের ঠিক বিপরীত। সে উপায় হল প্রতিটি আলাদা উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে একটা সামাজিক বনিয়াদের ওপর উৎপাদনের ক্রমবর্ধিত সংগঠন। এর সাহায্যে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি সাবেকি শান্তিপূর্ণ সুস্থির অবস্থার অবসান করল। শিল্পের কোনো একটা শাখায় উৎপাদনের এই পদ্ধতির সংগঠন প্রবর্তিত হলেই তা আর অন্য কোনো উৎপাদন-পদ্ধতিকে সেখানে বরদাস্ত করে না। শ্রমক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল রণক্ষেত্র। বিপুল সব ভৌগোলিক আবিষ্কার (৫৭) এবং তার পেছু পেছু উপনিবেশীকরণের ফলে বাজার বর্ধিত হল বহুগুণ, কারখানা-ব্যবস্থা হিশেবে হস্তশিল্পের রূপান্তর ত্বরান্বিত হল। একটা বিশেষ অঞ্চলের বিভিন্ন উৎপাদকদের মধ্যেই কেবল যুদ্ধ বাধল তা

* শেষের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য (এঙ্গেলসের টীকা)। এঙ্গেলস এখানে তাঁর নিজের রচনা 'মার্ক'-এর নজির দিচ্ছেন। এই সংস্করণে তা অন্তর্ভুক্ত হয় নি। — **সম্পাঃ**

নয়। স্থানীয় সংগ্রাম থেকে আবার সৃষ্টি হল জাতীয় সংঘাত, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বাণিজ্যিক যুদ্ধ (৫৮)। পরিশেষে, আধুনিক শিল্প ও বিশ্ববাজারের উন্মুক্তির ফলে এ সংগ্রাম হয়ে উঠল বিশ্বজনীন, এবং সেই সঙ্গে অভূতপূর্ব রকমের বিষাক্ত। উৎপাদনের স্বাভাবিক বা কৃত্রিম পরিস্থিতির সুবিধা দ্বারাই এখন এক একজন পুঁজিপতির তথা গোটা শিল্প ও দেশের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব নির্ধারিত হতে থাকল। যার হার হয় তাকে নির্মমভাবে ঠেলে ফেলা হয়। এ সেই ডারউইনী ব্যক্তির অস্তিত্বের সংগ্রাম প্রচণ্ড হয়ে স্থানান্তরিত হল প্রকৃতি থেকে সমাজে। পশুর পক্ষে অস্তিত্বের যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক তাই যেন হয়ে দাঁড়ায় মানবিক বিকাশের শেষ কথা। সমাজীকৃত উৎপাদন ও পুঁজিবাদী দখলের বিরোধ এবার প্রকাশ পায় **এক-একটা কারখানায় উৎপাদন সংগঠনের সঙ্গে সাধারণভাবে সমাজের উৎপাদন-নৈরাজ্যের বৈর হিসেবে।**

এই দুই রূপে যে বৈর উদ্ভব থেকেই তার মধ্যে নিহিত, তার ভেতরেই পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির গতি। ফুরিয়ে কর্তৃক পূর্বেই আবিষ্কৃত এ 'পাপ চক্র' থেকে তা কখনো বেরতে পারে না। আর তাঁর যুগে ফুরিয়ে যেটা লক্ষ্য করতে পারেন নি সেটা হল এই যে, এ চক্র ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে উঠছে; গতি হয়ে উঠছে ক্রমেই এক সর্পিলবৃত্ত, এবং কেন্দ্রের সংঘর্ষে গ্রহাদির গতির মতো তার অবসান অনিবার্য। সাধারণ সামাজিক উৎপাদনের মধ্যস্থ নৈরাজ্যের বাধ্যকরণী শক্তিতেই বিপুলসংখ্যক মানুষ পুরোপুরি প্রলেতারিয়েতে পরিণত হচ্ছে; এবং ব্যাপক প্রলেতারীয় জনগণই আবার পরিণামে উৎপাদন-নৈরাজ্যের অবসান ঘটাবে। সামাজিক উৎপাদনে নৈরাজ্যের বাধ্যকরণী শক্তিতেই আধুনিক শিল্পে যন্ত্রের সীমাহীন উন্নয়ন পরিণত হচ্ছে এক আবশ্যিক নিয়মে, এর ফলে প্রত্যেকটি শিল্পজীবী পুঁজিপতিকেই তার যন্ত্রকে ক্রমাগত উন্নত করে তুলতে হবে নইলে ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু যন্ত্রের উন্নয়ন অর্থ মানবিক শ্রমের অংশকে অনাবশ্যক করে তোলা। যন্ত্রের প্রবর্তন ও সংখ্যাবৃদ্ধির অর্থ যদি হয়ে থাকে অল্পসংখ্যক যন্ত্র-কর্মী দিয়ে লক্ষ লক্ষ কায়িক শ্রমিকের স্থানচ্যুতি, তাহলে যন্ত্রের উন্নয়নের অর্থ এবার যন্ত্র-কর্মীদেরই ক্রমাগত অপসারণ। পরিণামে এর অর্থ পুঁজির গড়পড়তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত একদল মজুরি-শ্রমিকের সৃষ্টি যাদের হাতের কাছে

পাওয়া যাবে, ১৮৪৫ সালে* যাকে বলেছিলাম, শিল্পের সেই একটা গোটাগর্নটি মজন্দ বাহিনী গঠন, শিল্প যখন খন্ব চড়া, তখন তাদের পাওয়া যাবে, অনিবার্য ধবংস এলেই আবার যাদের ছাঁটাই করা হবে, পংজির সঙ্গে অস্তিত্বের সংগ্রামে যারা শ্রমিক শ্রেণীর স্কন্ধে এক নিরন্তর ভারস্বরূপ, পংজির স্বার্থানন্যায়ী একটা নিচু মানে মজন্রি নামিয়ে রাখার মতো এক নিয়ন্ত্রক। এইভাবেই, মার্কসের কথায়, শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পংজির সংগ্রামে যন্ত্রই হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে প্রবল অস্ত্র; শ্রমিকের হাত থেকে অনবরতই তার জীবিকার উপায় ছিনিয়ে নেয় শ্রমের যন্ত্র; শ্রমিকেরই যা সৃষ্টি তাই হয়ে দাঁড়ায় তাকে অধীনস্থ করার এক হাতিয়ার।** এইভাবেই শ্রম-যন্ত্রের মিতব্যয় সেই সঙ্গে গোড়া থেকেই হয়ে দাঁড়ায় শ্রমশক্তির অতি বেপরোয়া অপচয়, শ্রম-কর্মের সাধারণ পরিস্থিতির ভিত্তিতেই লন্ণ্ঠন***; যন্ত্র, শ্রম-সময় সংক্ষেপের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, হয়ে দাঁড়ায় পংজির মূল্যবৃদ্ধির জন্য শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রতিটি মন্হূর্তকে পংজিপতির হাতে তুলে দেবার অতি মোক্ষম উপায়। এইভাবেই কিছ্ন লোকের কর্মহীনতার প্রাথমিক শর্ত হয় অন্য কিছ্নর অতি মেহনত এবং সারা বিশ্ব জন্ড়ে নতুন নতুন খরিদ্দার-সন্ধানী আধন্নিক শিল্প স্বদেশীয় জনগণের ভোগসীমাকে নামিয়ে আনে অনশন মাত্রার ন্যূনতমে, তাই করতে গিয়ে স্বদেশের নিজ বাজারকেই তা ধবংস করে। 'পংজি সঞ্চয়ের জোর ও ব্যাপকতার সঙ্গে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনতা, বা শিল্পের মজন্দ বাহিনীর ভারসাম্য সর্বদাই রক্ষিত হয় যে নিয়মে, তা পংজির সঙ্গে মজন্রকে যতটা কঠিন করে প্রোথিত করে রাখে তা প্রমিথিউসকে পাহাড়ে প্রোথিত করার ভালকানী কীলকের চেয়েও জোরালো। পংজি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা সঞ্চয় করে তোলে দৈন্য। এক প্রান্তে ধনসঞ্চয় তাই একই সঙ্গে হল অন্য প্রান্তে দৈন্য, শ্রম-জর্জরতা, দাসত্ব, অজ্ঞতা, পাশবিকতা, মানসিক অধঃপতনের সঞ্চয় অর্থাৎ সেই শ্রেণীর ক্ষেত্রে যারা **তাদেরই স্বীয় উৎপন্নকে** উৎপাদন করছে **পংজির আকারে।'** (মার্কসের 'পংজি', পৃঃ ৬৭১।) উৎপাদনের পংজিবাদী পদ্ধতি থেকে এছাড়া অন্য কোনো

* 'ইংলন্ডের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা', ১০৯ পৃঃ। — সম্পাঃ

** ক. মার্কস, 'পংজি', ১ খন্ড। — সম্পাঃ

*** ঐ। — সম্পাঃ

উৎপন্ন-বণ্টন আশা করা আর এ আশা করা সমান কথা যে, ব্যাটারির ইলেকট্রোড যতক্ষণ ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত ততক্ষণ অ্যাসিড মেশা জলকে তা বিশ্লিষ্ট করবে না, তার ধনাত্মক মেরু থেকে অক্সিজেন ও ঋণাত্মক মেরু থেকে হাইড্রোজেন ছাড়তে থাকবে না।

আমরা দেখেছি, আধুনিক শিল্প-যন্ত্রের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নশীলতা সামাজিক উৎপাদনের নৈরাজ্যের দ্বারা পরিণত হয়েছে এমন একটা বাধ্যতামূলক নিয়মে যাতে একেক জন শিল্পজীবী পুঁজিপতি সর্বদাই তার যন্ত্রকে উন্নত করতে, সর্বদাই সে যন্ত্রের উৎপাদনী ক্ষমতা বাড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়। উৎপাদনক্ষেত্র প্রসারের সম্ভাবনাটাও তার কাছে অনুরূপ একটা বাধ্যতামূলক নিয়মে দাঁড়ায়। আধুনিক শিল্পের বিপুল সম্প্রসারণ-শক্তির কাছে গ্যাসের সম্প্রসারণ-শক্তিকে মনে হয় ছেলেখেলা, এ শক্তি এখন আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় গুণগত ও পরিমাণগত সম্প্রসারণের এমন এক আবশ্যকতা রূপে যা কোনো বাধারই পরোয়া করে না। এ বাধা আসে পরিভোগ থেকে, বিক্রয় থেকে, আধুনিক শিল্প-মালের বাজার থেকে। কিন্তু বাজারের সম্প্রসারণ-ক্ষমতা ব্যাপকতায় ও তীব্রতায় শাসিত হয় প্রধানত অন্য কতকগুলি নিয়মে, যার তেজ অনেক কম। উৎপাদনের প্রসারের সঙ্গে বাজারের সম্প্রসারণ তাল রাখতে পারে না। সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে, এবং উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতিকে চূর্ণবিচূর্ণ না করা পর্যন্ত যেহেতু এই সংঘাত থেকে কোনো সত্যকার সমাধান সম্ভব নয়, তাই সংঘাতগুলো আসতে থাকে পর্যায়ক্রমে। পুঁজিবাদী উৎপাদন জন্ম দিল আর একটি 'পাপ চক্রের'।

বস্তুতপক্ষে, ১৮২৫ সালে যখন প্রথম সাধারণ সংকট দেখা দেয়, তখন থেকে সমগ্র শিল্প ও বাণিজ্যজগৎ, সমস্ত সভ্য জাতি ও তাদের মুখাপেক্ষী ন্যূনাধিক বর্বর জাতিদের উৎপাদন ও বিনিময় প্রতি দশ বছরে একবার করে বিকল হয়ে পড়ে। বাণিজ্য অচল হয়ে যায়, বাজারে অত্যধিক মাল সরবরাহ হয়, মাল জমতে থাকে, যতই তা অবিক্রেয় ততই তা স্তূপাকার, নগদ টাকা অদৃশ্য হয়, ঋণদান থেমে যায়, বন্ধ হয়ে যায় ফ্যাক্টরি আর শ্রমিক জনগণের জীবনধারণের উপায়ের অভাব ঘটে, কেননা জীবনধারণের উপায় তারা উৎপন্ন করেছে অতিমাত্রায়; একের পর এক দেউলিয়া, একের পর এক ক্রোক।

অচলাবস্থা চলে কয়েক বছর ধরে; উৎপাদন-শক্তি ও উৎপন্ন মালের অপচয় ও পাইকারীভাবে তার ধ্বংস চলতে থাকে যতদিন না সঞ্চিত পণ্যস্তূপের মোটের ওপর মূল্যহ্রাস হয়ে শেষ পর্যন্ত তা ঝরে যায়, যতদিন না উৎপাদন ও বিনিময় ধীরে ধীরে আবার চলতে শুরু করে। একটু করে তার গতি বাড়ে। শুরু হয় দুলকি চলন। শিল্পের দুলকি চলন বেড়ে ওঠে ধাবনে এবং ধাবনও পরিণত হয় শিল্প, কারবারী ঋণ ও ফাটকার এক খাঁটি উদ্দাম কদমে ছোটায়, শেষ পর্যন্ত পড়িমড়ি লম্ফঝম্পের পর সেখানে এসেই থামে যেখানে শুরু, অর্থাৎ সংকটের গহ্বরে। এই চলে ফিরে ফিরে। ১৮২৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পাঁচবার এই ঘটেছে এবং বর্তমানে (১৮৭৭) ছয়বারের বার তা ঘটছে। এসব সংকটের চরিত্র এতই পরিষ্কার যে ফুরিয়ে crise pléthorique বা রক্তাতিশয্যের সংকট বলে প্রথম সংকটটির যা বর্ণনা দিয়েছেন তাতেই সব সংকটের বর্ণনা হয়েছে।

এসব সংকটে সমাজীকৃত উৎপাদন ও পুঁজিবাদী দখলের বিরোধ এক প্রবল বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। পণ্য-সঞ্চালন কিছুকালের জন্য বন্ধ হয়। সঞ্চালনের যা মাধ্যম, সেই মুদ্রা হয়ে দাঁড়ায় সঞ্চালনের প্রতিবন্ধক। পণ্য-উৎপাদন ও পণ্য-সঞ্চালনের সমস্ত নিয়মই উল্টে যায়। অর্থনৈতিক সংঘাত পৌঁছয় তার শীর্ষ বিন্দুতে। **উৎপাদনের পদ্ধতি বিদ্রোহ করে বিনিময় ধরনের বিরুদ্ধে।**

ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরে উৎপাদনের সমাজীকৃত সংগঠন এত দূর বিকশিত হয়েছে যে, সমাজ উৎপাদনের যে-নৈরাজ্য থাকে তারই পাশাপাশি ও তার ওপর প্রভুত্ব করে, তার সঙ্গে তা আর খাপ খাচ্ছে না। এই ঘটনাটা খোদ পুঁজিপতিদের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে সংকট কালে পুঁজির হিংস্র পুঞ্জীভবনের মাধ্যমে, বহু বৃহৎ এবং বহুতর ক্ষুদ্র পুঁজিপতির ধ্বংসে। উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতির সমগ্র ঠাট ভেঙে পড়ে তারই নিজস্ব সৃষ্টি উৎপাদন-শক্তির চাপে। এই পুঞ্জ পুঞ্জ উৎপাদন-উপায়কে তা আর পুঁজিতে পরিণত করতে সক্ষম হয় না। সেগুলো পড়ে থাকে বেকার হয়ে এবং সেইহেতু শিল্পের মজুদ বাহিনীও থাকে বেকার। উৎপাদনের উপায়, জীবিকা নির্বাহের উপায়, পুঁজির হাতের আওতায় শ্রমিক, উৎপাদনের ও সাধারণ সম্পদের সমস্ত উপকরণই রয়েছে প্রচুর। কিন্তু 'প্রাচুর্য' হয়ে দাঁড়ায় অভাব-

অনটনের উৎস' (ফুরিয়ে), কারণ উৎপাদন ও জীবনধারণের উপায়ের পুঁজিতে রূপান্তরের প্রতিবন্ধক হয় এই প্রাচুর্যই। কেননা, পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের উপায় কাজ চালাতে পারে কেবল তখনই যখন তার প্রাথমিক রূপান্তর ঘটেছে পুঁজিতে, মানুষের শ্রমশক্তি শোষণের উপায়ে। উৎপাদন ও জীবন নির্বাহের উপায়কে পুঁজিতে রূপান্তরিত করার এই আবশ্যিকতা প্রেতের মতো শ্রমিক ও এই সব উপায়ের মধ্যে দণ্ডায়মান। কেবল এইটাই উৎপাদনের বৈষয়িক ও ব্যক্তিগত কারিকার সম্মিলনে বাধা দেয়; কেবলমাত্র তার জন্যই উৎপাদন-উপায়ের সচল থাকা, শ্রমিকের খেটে বেঁচে থাকা বারণ। তাই একদিকে, এই উৎপাদন-শক্তিকে আর বেশি পরিচালনা করার অক্ষমতায় পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি নিজেই অভিযুক্ত; অন্যদিকে, এই সব উৎপাদন-শক্তি ক্রমবর্ধমান তেজে এগিয়ে আসছে বর্তমান বিরোধের অবসানের দিকে, পুঁজি হিশেবে তাদের যে ধর্ম তা বিলোপের দিকে, **সামাজিক উৎপাদন-শক্তি হিশেবে তাদের যে চরিত্র তার ব্যবহারিক স্বীকৃতির দিকে।**

পুঁজি হিশেবে তাদের যে ধর্ম তার বিরুদ্ধে ক্রমপ্রবল উৎপাদন-শক্তির এই বিদ্রোহ, তাদের সামাজিক চরিত্র স্বীকৃত হোক, এই ক্রমবর্ধমান দাবির ফলে খাস পুঁজিপতি শ্রেণীও বাধ্য হয় তাদের ক্রমেই বেশি করে সামাজিক উৎপাদন-শক্তি হিশেবে ধরতে, পুঁজিবাদী পরিস্থিতির মধ্যে তা যতটা সম্ভব সেই পরিমাণে। বড়ো বড়ো পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের ভাঙন মারফত ধ্বংসের সময় যতটা, ঋণ ব্যবস্থায় অসীম স্ফীতি সমেত শিল্পের অতি চাপের পর্বটাতেও ততটাই বিপুল উৎপাদন-উপায়সমূহের সেই ধরনের একটা সমাজীকরণ ঘটাবার প্রবণতা থাকে, যা আমরা বিভিন্ন জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিতে প্রত্যক্ষ করছি। উৎপাদন ও বণ্টনের এই উপায়সমূহের অনেকগুলিই গোড়া থেকেই এতই বিরাট যে, রেলওয়ের মতোই তাতে অন্যাবিধ পুঁজিবাদী শোষণের অবকাশ মেলে না। আরো বিকাশের এক পর্যায়ে এই ধরনটাও অপ্রতুল হয়ে দাঁড়ায়। একটা বিশেষ দেশের একটা বিশেষ শিল্প-শাখার সমস্ত বড়ো বড়ো উৎপাদকেরা সংঘবদ্ধ হয় 'ট্রাস্টে', উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা সমিতিতে। উৎপাদ্যের মোট পরিমাণ তারা স্থির করে, নিজেদের মধ্যে তা ভাগাভাগি করে নেয় এবং এইভাবে আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা বিক্রয়মূল্য চাপিয়ে দেয়। কিন্তু কারবারে মন্দা পড়তেই

এই ধরনের ট্রাস্টের পক্ষে সাধারণত ভেঙে পড়া সম্ভব এবং ঠিক এই কারণেই সমিতিগুলির আরো বেশি পরিমাণ কেন্দ্রীভবনের প্রয়োজন তা জাগায়। এক-একটা শিল্পের সবখানিই পরিণত হয় এক অতিকায় জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিতে; অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার স্থান নেয় এই একটি কোম্পানির অভ্যন্তরীণ একচেটিয়া কারবার। তা ঘটেছে ১৮৯০ সালে ইংলণ্ডের অ্যালক্যালি উৎপাদনের ক্ষেত্রে, ৪৮টি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান একীকরণের পর তা এখন একটি কোম্পানির হাতে, ৬০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে একটি একক পরিকল্পনার ভিত্তিতে।

ট্রাস্টগুলিতে প্রতিযোগিতার স্বাধীনতা পরিণত হয় ঠিক তার বিপরীতে — একচেটিয়া কারবারে; এবং পুঁজিবাদী সমাজসুলভ বিনা-পরিকল্পনার উৎপাদন নতিস্বীকার করে আসন্ন সমাজতান্ত্রিক সমাজসুলভ নির্দিষ্ট পরিকল্পনার উৎপাদনের কাছে। অবশ্যই তাতে এখনো পর্যন্ত পুঁজিপতিদেরই সুবিধা ও উপকার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শোষণটা এত জাজ্বল্যমান যে তা ভেঙে পড়তে বাধ্য। ট্রাস্টগুলির উৎপাদন-পরিচালনা, ক্ষুদ্র একদল ডিভিডেণ্ট-লিপ্সু দ্বারা সমাজের এমন নির্লজ্জ শোষণ কোনো জাতিই সহ্য করবে না।

যাই হোক না কেন, ট্রাস্ট থাকুক বা না থাকুক, পুঁজিবাদী সমাজের সরকারী প্রতিনিধি রাষ্ট্রকে শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের পরিচালনভার গ্রহণ করতে হবে* নিজের হাতে। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিবর্তনের এই প্রয়োজন

* বলছি **'করতে হবে'** কেননা, উৎপাদন ও বণ্টনের উপায় যখন **সত্য করেই** জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিগুলি কর্তৃক পরিচালনের কাঠামোকে ছাড়িয়ে যাবে, এবং সেইহেতু তাদের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ যখন **অর্থনৈতিকভাবে** অনিবার্য হবে, কেবল তখনই যদি সে-কাজ আজকের এই রাষ্ট্রই করে তাহলেও, — ঘটবে একটা অর্থনৈতিক প্রগতি, সমস্ত উৎপাদন-শক্তির সমাজীকরণের দিকে প্রাথমিক আরো একটা পদক্ষেপ। কিন্তু ইদানীং, বিসমার্ক যখন থেকে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রীয় মালিকানা চালু করতে লেগেছেন, তখন থেকে একধরনের মেকি সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে, যা থেকে থেকেই একধরনের দাস্যবৃত্তিতে অধঃপতিত হচ্ছে, যা ঘোষণা করে, এমনকি বিসমার্কী ধরন সমেত **যে কোনো** রাষ্ট্রীয় মালিকানাই সমাজতান্ত্রিক। তামাক-শিল্প রাষ্ট্র দখল করলে যদি তা সমাজতান্ত্রিক হয়, তাহলে নিশ্চয়ই নেপোলিয়ন ও মেটেরনিখকে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে গণ্য করতে হবে। বেলজিয়ম রাষ্ট্র যদি নিতান্ত সাধারণ রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে

সর্বাগ্রে দেখা দেয় যোগাযোগ ও আদানপ্রদানের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলিতে — ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, রেলে।

আধুনিক উৎপাদন-শক্তির পরিচালনায় বুর্জোয়ারা আর সক্ষম নয়, এই যদি প্রকাশ পায় সংকট থেকে, তবে উৎপাদন ও বণ্টনের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলির জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি, ট্রাস্ট, ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয় সে কাজের জন্য বুর্জোয়ারা কী পরিমাণ অনাবশ্যক। পুঁজিপতির সামাজিক ক্রিয়ার সবকটিই এখন নির্বাহিত হয় বেতনভোগী কর্মচারী দ্বারা। ডিভিডেণ্ট পকেটস্থ করা, কুপন কাটা আর বিভিন্ন পুঁজিপতি যেখানে পরস্পরের পুঁজি হরণ করে সেই স্টক এক্সচেঞ্জে ফাটকা খেলা ছাড়া পুঁজিপতির আর কোনো সামাজিক কর্ম নেই। পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি প্রথমে বিতাড়িত করে মজুরদের; এখন তা বিতাড়িত করছে পুঁজিপতিদের, মজুরদের মতোই তাদেরও ঠেলে দিচ্ছে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার স্তরে, যদিও শিল্পের মজুর বাহিনীতে অবিলম্বেই নয়।

কিন্তু জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি ও ট্রাস্টে, অথবা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রূপান্তর, এর কোনোটাতেই উৎপাদন-শক্তির পুঁজিবাদী চরিত্রের অবসান হয় না। জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি ও ট্রাস্টে তা স্বতঃই স্পষ্ট। আর আধুনিক রাষ্ট্রও আবার শ্রমিক তথা ব্যক্তিবিশেষ পুঁজিপতির হামলার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির বাহ্য পরিস্থিতিকে রক্ষা করার জন্য বুর্জোয়া সমাজ কর্তৃক পরিগৃহীত একটা সংগঠন মাত্র। রূপ যাই হোক না কেন,

---

তার প্রধান রেলপথ নিজেই নির্মাণ করে; কোনো অর্থনৈতিক বাধ্যতার ফলে নয়, নিতান্তই যুদ্ধের সময় অনায়াসে হাতে রাখা যাবে বলে, সরকারের পক্ষে ভোটদায়ী গড্ডলিকারূপে রেলকর্মচারীদের গড়ে তোলার জন্য, এবং বিশেষ করে পার্লামেণ্টারী ভোটের তোয়াক্কা না রেখে নিজের জন্য একটা নতুন আয়ের উৎস তৈরির উদ্দেশ্যে যদি বিসমার্ক প্রধান প্রধান প্রুশীয় রেলপথ রাষ্ট্রায়ত্ত করেন, তাহলে কোনো অর্থেই, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে তা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হয় না। নইলে, রাজকীয় Seehandlung (৫৯), রাজকীয় চীনামাটি-কারখানা, এমনকি সৈন্যবাহিনীর দর্জি-প্রতিষ্ঠানকেও বলতে হয় সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, এমনকি তৃতীয় ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্মের রাজত্বকালে এক ধূর্ত শৃগাল যা গুরুত্বসহকারে প্রস্তাব করেছিল, রাষ্ট্র কর্তৃক বেশ্যালয়গুলি গ্রহণের সে ব্যাপারটা পর্যন্ত হয় সমাজতান্ত্রিক। (এঙ্গেলসের টীকা।)

আধুনিক রাষ্ট্র হল মূলত একটি পুঁজিবাদী যন্ত্র, পুঁজিপতিদের রাষ্ট্র, সামগ্রিক জাতীয় পুঁজির আদর্শ মূর্তায়ন। উৎপাদন-শক্তিকে যতই সে হাতে নিতে যায়, ততই সে সত্য করেই হয়ে ওঠে জাতীয় পুঁজিপতি, তত বেশি অধিবাসীকে তা শোষণ করতে থাকে। শ্রমিকেরা থেকেই যায় মজুরি-শ্রমিক, প্রলেতারীয়। পুঁজিবাদী সম্পর্কের অবসান হয় না বরং তাকে চূড়ান্ত শীর্ষে তোলা হয়। কিন্তু চূড়ান্ত শীর্ষে ওঠাতেই তা উল্টে পড়ে। উৎপাদন-শক্তির রাষ্ট্রীয় মালিকানা সংঘাতের সমাধান নয়, কিন্তু সে সমাধানের যা উপকরণ সেই টেকনিকাল শর্ত তার মধ্যেই লুক্কায়িত।

এ সমাধান সম্ভব কেবল আধুনিক উৎপাদন-শক্তির সামাজিক চরিত্রের বাস্তব স্বীকৃতিতে, এবং সেইহেতু, উৎপাদন-উপায়ের সমাজীকৃত চরিত্রের সঙ্গে উৎপাদন, দখল ও বিনিময় পদ্ধতির সামঞ্জস্য বিধানে। সামগ্রিকভাবে সমাজের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অন্য সমস্ত নিয়ন্ত্রণকে যা ছাপিয়ে উঠেছে সেই উৎপাদন-শক্তিকে প্রকাশ্যে ও সরাসরি সমাজের হাতে নিয়েই কেবল তা সম্ভব। উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের সামাজিক চরিত্রটা আজ উৎপাদকের বিরুদ্ধে সক্রিয়, সমস্ত উৎপাদন ও বিনিময়কে তা থেকে থেকেই বানচাল করে দেয়, অন্ধ বলাশ্রয়ী বিধ্বংসী এক প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই শুধু তার ক্রিয়া। কিন্তু সমাজ কর্তৃক উৎপাদন-শক্তিগুলিকে গ্রহণের পর উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের সামাজিক চরিত্রের ব্যবহার উৎপাদকেরা করবে তার প্রকৃতিটা পুরোপুরি বুঝে, বিঘ্ন ও পর্যায়ক্রমিক ধ্বংসের উৎস না হয়ে তা হবে উৎপাদনের প্রবলতম এক উত্তোলক।

সক্রিয় সামাজিক শক্তিগুলি কাজ করে ঠিক প্রাকৃতিক শক্তির মতোই; যতক্ষণ তাদের না বুঝছি, হিসাবে না মেলাচ্ছি, ততক্ষণ তা অন্ধ, বলাশ্রয়ী, বিধ্বংসী। কিন্তু একবার তাদের যদি বোঝা যায়, একবার যদি তাদের ক্রিয়া, গতিমুখ ও ফলাফল ধরা যায়, তাহলে তাদের ক্রমাগত আমাদের আজ্ঞাবহ করে তোলা, তাদের সাহায্যে আমাদের লক্ষ্যসাধন করাটা নির্ভর করছে আমাদেরই ওপর। আজকের পরাক্রান্ত উৎপাদন-শক্তিগুলির ক্ষেত্রে একথা বিশেষ করেই খাটে। এই সব সক্রিয় সামাজিক উপায়গুলির প্রকৃতি ও চরিত্র বুঝতে আমরা যতক্ষণ গোঁয়ারের মতো অনিচ্ছুক — এ বোধ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি ও তার সমর্থকদের প্রবণতার বিরুদ্ধেই যায় —

ততক্ষণ এ শক্তিগুলি কাজ করে যাবে আমাদের অপেক্ষা না রেখেই, আমাদের বিরুদ্ধে, ততক্ষণ তারা আধিপত্য করে যাবে আমাদের ওপর, পূর্বে যা আমরা বিশদে দেখিয়েছি। কিন্তু একবার যদি তাদের প্রকৃতি বোঝা যায়, তাহলে একত্রে-খাটা উৎপাদকদের হাতে তাদের পরিণত করা যায় দানবপ্রভু থেকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যে। তফাৎটা হল বজ্রস্থ বিদ্যুতের ধ্বংসশক্তির সঙ্গে টেলিগ্রাফ ও ভল্টেইক আর্কের বশীভূত বিদ্যুতের তফাৎ, দাবাগ্নির সঙ্গে মানুষের কাজে লাগানো আগুনের তফাৎ। শেষ পর্যন্ত আজকের উৎপাদন-শক্তিগুলির আসল চরিত্রের এই স্বীকৃতির ফলে উৎপাদনের সামাজিক নৈরাজ্যের স্থান নেয় নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে, সমাজ ও প্রতিটি ব্যক্তির প্রয়োজনানুযায়ী উৎপাদনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। উৎপন্ন দ্রব্য যেখানে প্রথমে উৎপাদককে ও পরে দখলকারীকে দাসত্ববন্ধনে বাঁধে, দখলের সেই পুঁজিবাদী পদ্ধতির জায়গায় তখন আসে দখলের এমন এক পদ্ধতি, আধুনিক উৎপাদন-উপায়ের চরিত্র যার ভিত্তি: একদিকে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া ও বাড়িয়ে তোলার উপায়স্বরূপ প্রত্যক্ষ সামাজিক দখল, এবং অন্যদিকে জীবিকা নির্বাহ ও উপভোগের উপায়স্বরূপ প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত দখল।

পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি জনসংখ্যার বিপুল অধিকাংশকে ক্রমেই পরিপূর্ণ প্রলেতারিয়েতে পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তির সৃষ্টি করে যা নিজের ধ্বংস ঠেকাবার জন্যই এ বিপ্লব সাধন করতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যেই যা সমাজীকৃত হয়ে উঠেছে, সেই বিপুল উৎপাদন-উপায়কে ক্রমাগত বেশি করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে বাধ্য করার সঙ্গে সঙ্গে তা নিজেই এ বিপ্লব সাধনের পথ দেখায়। **প্রলেতারিয়েত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ক'রে উৎপাদন-উপায়কে পরিণত করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতেই।**

কিন্তু তা করতে গিয়ে প্রলেতারিয়েত হিশেবে তার আত্মাবসান ঘটে, লুপ্ত হয় সমস্ত শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণী-বৈর, রাষ্ট্রের রাষ্ট্র হিশেবে যে অস্তিত্ব তাও বিলুপ্ত হয়। শ্রেণী-বৈরের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের এযাবৎ প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রের, অর্থাৎ pro tempore যা শোষক শ্রেণী, তেমন একটা বিশেষ শ্রেণীর এক সংগঠনের, প্রচলিত উৎপাদন-পরিস্থিতিতে যাতে বাইরে থেকে কোনো ব্যাঘাত না আসে, সেটা নিবারণই তার উদ্দেশ্য, এবং সুতরাং, বিশেষ করে নির্দিষ্ট উৎপাদন-পদ্ধতির (ক্রীতদাসত্ব, ভূমিদাসত্ব, মজুরি-শ্রম) সহগামী

পীড়ন ব্যবস্থার মধ্যে শোষিত শ্রেণীগুলিকে সবলে দাবিয়ে রাখাই তার উদ্দেশ্য। রাষ্ট্র ছিল সামগ্রিকভাবে সমাজের সরকারী প্রতিনিধি, একটা দৃষ্টিগোচর প্রতিভূ হিশেবে তার কেন্দ্রীভাব। কিন্তু তা শুধু যে পরিমাণে, তা তেমন একটা শ্রেণীর রাষ্ট্র যা তৎকালে সমগ্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে: প্রাচীন কালে ক্রীতদাসমালিক নাগরিকদের রাষ্ট্র; মধ্য যুগে সামন্ত প্রভুদের; আমাদের কালে বুর্জোয়াদের। রাষ্ট্র যখন অবশেষে সমগ্র সমাজের সত্যকার প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা নিজেকে করে তোলে অনাবশ্যক। অধীনে রাখার মতো কোনো সামাজিক শ্রেণী যেই আর থাকে না, যেই শ্রেণী-শাসন এবং আমাদের বর্তমান উৎপাদন-নৈরাজ্যের ভিত্তিতে অস্তিত্বের জন্য ব্যক্তিগত সংগ্রাম ও তদুদ্ভূত সংঘর্ষ ও অনাচারের অবসান হয়, অমনি দমন করার মতো কিছুও আর বাকি থাকে না, এবং একটা বিশেষ দমন-শক্তির, একটা রাষ্ট্রের আর প্রয়োজন হয় না। প্রথম যে কাজটার ফলে রাষ্ট্র সত্য করেই নিজেকে সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি করে তোলে — সমাজের নামে উৎপাদন-উপায়গুলিকে দখল করা — সেইটাই হল একই কালে রাষ্ট্র হিশেবে তার শেষ স্বাধীন কাজ। সামাজিক সম্পর্কে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্রে অনাবশ্যক হয়ে উঠতে থাকে এবং তারপর নিজে থেকেই তা শুকিয়ে মরে। লোক শাসন করার স্থানে আসে বস্তুর ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়ার পরিচালনা। রাষ্ট্রকে 'উচ্ছেদ' করা হয় না, **তা মরে যায়।** 'মুক্ত জনরাষ্ট্র'* কথাটিকে আন্দোলকেরা যে মধ্যে মধ্যে ন্যায্যতই ব্যবহার করে থাকেন, সেদিক থেকে এবং তার অন্তিম বৈজ্ঞানিক অপূর্ণতা, উভয় দিক থেকেই কথাটার মূল্যায়ন পাওয়া যাচ্ছে; এ থেকে, অবিলম্বে রাষ্ট্র উচ্ছেদের জন্য তথাকথিত নৈরাজ্যবাদীদের দাবিটারও ।

পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির ঐতিহাসিক আবির্ভাবকাল থেকেই বিভিন্ন ব্যক্তি তথা বিভিন্ন সম্প্রদায় সমস্ত উৎপাদন-উপায়ের ওপর সামাজিক দখলের স্বপ্ন দেখে এসেছেন ন্যূনাধিক অস্পষ্টভাবে, ভবিষ্যতের আদর্শ হিশেবে। কিন্তু তা সম্ভব হতে পারে, ঐতিহাসিক রূপে আবশ্যিক হয়ে উঠতে পারে শুধু তখনই যখন তার বাস্তবায়নের প্রত্যক্ষ অবস্থা বর্তমান। অপরাপর

* এই সংস্করণের ৯ খণ্ড, ২৮-৩৩, ৩৯-৪১ পৃঃ। — সম্পাঃ

প্রতিটি সামাজিক প্রগতির মতোই তা সম্ভবপর হয় এই জন্য নয় যে, লোকে বুঝতে পারছে, শ্রেণীর অস্তিত্ব ন্যায়, সমানাধিকার ইত্যাদির পরিপন্থী, এ শ্রেণী-বিলোপের ইচ্ছা দ্বারাই কেবল নয়, সম্ভবপর হয় কতকগুলি নতুন অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে। শোষক ও শোষিত শ্রেণী, শাসক ও নিপীড়িত শ্রেণীতে সমাজের বিভাগ ছিল পূর্বতন কালের উৎপাদনের অপরিণত সীমাবদ্ধ বিকাশের অপরিহার্য পরিণাম। সকলের অস্তিত্বের জন্য কোনো ক্রমে যেটুকু দরকার তার চেয়ে কেবল অতি অল্পপরিমাণ উদ্বৃত্ত যতদিন উৎপন্ন হচ্ছে সমগ্র সামাজিক মেহনত দ্বারা, সেইহেতু সমাজ-সদস্যদের বিপুল অধিকাংশের সমস্ত বা প্রায় সমস্ত সময় যতদিন খেয়ে যাচ্ছে মেহনতের পিছনে, — ততদিন অনিবার্যভাবেই এ সমাজ বিভক্ত থাকছে শ্রেণীতে। পুরোপুরি মেহনতের যারা বাঁধা গোলাম, সেই বিপুল অধিকাংশের পাশাপাশি উদিত হয় প্রত্যক্ষ উৎপাদনী শ্রম থেকে মুক্ত একটা শ্রেণী, যারা সমাজের সাধারণ বিষয়গুলির দেখাশোনা করে, যেমন শ্রম-পরিচালনা, রাষ্ট্রীয় কর্ম, আইন, বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদি। সুতরাং, শ্রম-বিভাগের নিয়মটাই আছে শ্রেণী-বিভাগের মূলে। কিন্তু তাতে করে বলাৎকার ও লুণ্ঠন, বুজরুকি ও জুয়াচুরি দ্বারা এই শ্রেণী-বিভাগ সম্পাদন আটকায় না। শাসক শ্রেণী একবার আধিপত্য পাবার পর শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের বিনিময়ে তার ক্ষমতা সংহত করা, নিজেদের সামাজিক নেতৃত্বটাকে জনগণের তীব্রতর শোষণে পরিণত করা তার আটকায় না।

কিন্তু এই যুক্তিতে শ্রেণী-বিভাগের যদি একটা বিশেষ ঐতিহাসিক ন্যায্যতা থেকে থাকে, তবে তা শুধু একটা বিশেষ পর্বের জন্য, কেবল একটা নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতির আমলে। তার ভিত্তি ছিল উৎপাদনের অপ্রতুলতা। আধুনিক উৎপাদন-শক্তির পূর্ণ বিকাশের ফলে তা ভেসে যাবে। এবং বস্তুত, সমাজের শ্রেণী-বিলোপে ঐতিহাসিক বিকাশের এমন একটা মাত্রা ধরে নেওয়া হয়, যেখানে অমুক অমুক বিশেষ শাসক শ্রেণী কেবল নয়, যে কোনো রকম শাসক শ্রেণীরই এবং সেইহেতু, শ্রেণীভেদের অস্তিত্বই হয়ে উঠেছে এক অপ্রচলিত কাল-ব্যতিক্রম। সুতরাং, তা ধরে নেয় উৎপাদনের এমন একটা পর্যায়ে বিকাশ, যেখানে সমাজের একটা বিশেষ শ্রেণী কর্তৃক উৎপাদনের উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের দখল এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রভুত্ব,

সংস্কৃতির একাধিপত্য ও বুদ্ধিমার্গীয় নেতৃত্ব শুধু যে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে তাই নয়, অর্থনীতি, রাজনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে বিকাশের প্রতিবন্ধক। এ সীমায় এখন আমরা পেঁছিছি। বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিমার্গীয় দেউলিয়াপনা স্বয়ং বুর্জোয়াদের কাছেও আর গোপন নয়। তাদের অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনার আবির্ভাব ঘটছে নিয়মিতভাবে প্রতি দশ বছর অন্তর। প্রতিটি সংকটেই সমাজ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠছে তারই উৎপাদন-শক্তি ও উৎপন্নের চাপে—তাকে সে আর ব্যবহার করতে পারছে না, অসহায়ের মতো সে এই অদ্ভুত স্ববিরোধের সম্মুখীন যে, উৎপাদকদের ভোগ্য কিছুই নেই কেননা পরিভোগী কেউ নেই। পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি যে নিগড় চাপিয়েছিল তা ফেটে বেরচ্ছে উৎপাদন-উপায়ের সম্প্রসারণী শক্তি। উৎপাদন-শক্তির অবিরাম, নিয়ত ত্বরান্বিত বিকাশ এবং সেই সঙ্গে উৎপাদনেরই কার্যত সীমাহীন বৃদ্ধির একমাত্র পূর্বশর্ত হল এই সব নিগড় থেকে উৎপাদন-উপায়ের মুক্তি। শুধু তাই নয়। উৎপাদন-উপায়ের ওপর সামাজিক দখলের ফলে শুধু যে উৎপাদনের বর্তমান কৃত্রিম বাধাগুলি দূর হয়ে যায় তাই নয়, দূর হয় উৎপাদন-শক্তি ও উৎপন্নের সেই প্রত্যক্ষ অপচয় ও সর্বনাশ, যা বর্তমানে উৎপাদনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ এবং সংকটকালে যা সর্বোচ্চে ওঠে। অধিকন্তু, আজকের শাসক শ্রেণী ও তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের কাণ্ডজ্ঞানহীন অমিতাচারের অবসান ক'রে তা উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্নের একটা বড়ো অংশকে উন্মুক্ত করে দেয় সাধারণ সমাজের জন্য। সমাজীকৃত উৎপাদন দ্বারা সমাজের প্রতিটি সদস্যের জন্য বৈষয়িকভাবে পর্যাপ্ত এবং দিন দিন পরিপূর্ণতর একটা অস্তিত্বই শুধু নয়, সকলের কায়িক ও মানসিক বৃত্তির অবাধ বিকাশ ও প্রয়োগের নিশ্চিতি-দেওয়া একটা অস্তিত্ব অর্জনের যে সম্ভাবনা, তা এই প্রথম এলেও **এসে গেছে।***

---

* পুঁজিবাদী চাপের তলেও আধুনিক উৎপাদন-উপায়ের বিপুল সম্প্রসারণী শক্তির একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাবে গোটাকতক সংখ্যা থেকে। মিঃ গিফেনের মতে, গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মোট সম্পদের পরিমাণ পূর্ণসংখ্যায়:

১৮১৪ সাল—২,২০,০০,০০,০০০ পাউণ্ড

১৮৬৫ সাল—৬,১০,০০,০০,০০০ পাউণ্ড

সমাজ কর্তৃক উৎপাদনের উপায় দখলের পর অবসান হয় পণ্য-উৎপাদনের এবং যুগপৎ উৎপাদকের ওপর উৎপন্নের আধিপত্যের। সামাজিক উৎপাদনে নৈরাজ্যের বদলে আসে প্রণালীবদ্ধ সুনির্দিষ্ট সংগঠন। ব্যক্তিগত অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম অন্তর্হিত হয়। একটা বিশেষ অর্থে তখনই সেই প্রথম মানুষ অবশিষ্ট প্রাণীজগৎ থেকে চূড়ান্তভাবে তফাৎ হয়ে অস্তিত্বের নিতান্ত পাশবিক পরিস্থিতি থেকে উত্তীর্ণ হয় সত্যকার মানবিক পরিস্থিতিতে। জীবনধারণের যে ক্ষেত্রটা মানুষকে ঘিরে আছে এবং এযাবৎ তার ওপর আধিপত্য করেছে, সেই সমগ্র ক্ষেত্রটা এখন আসে মানুষের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণে — এই প্রথম মানুষ হয়ে ওঠে প্রকৃতির সত্যকার সচেতন প্রভু, কেননা নিজেদের সমাজ-সংগঠনের প্রভু সে হতে পেরেছে। তারই নিজ সামাজিক ক্রিয়ার যে নিয়ম এতদিন পরকীয় প্রাকৃতিক নিয়মের মতো তার ওপর আধিপত্য করেছে, তা এখন ব্যবহৃত হবে পরিপূর্ণ বোধের সঙ্গে, এবং সেইহেতু তার ওপর প্রভুত্ব করবে মানুষ। মানুষেরই নিজ যে সামাজিক সংগঠন এতদিন প্রকৃতি ও ইতিহাস থেকে চাপানো এক আবশ্যিকতা রূপে তার সম্মুখীন হয়েছে, সে সংগঠন এখন হয়ে দাঁড়ায় তারই স্বাধীন কর্মের ফল। যে বহির্ভূত বিষয়গত শক্তিগুলি এতদিন ইতিহাসকে শাসন করেছে, তা চলে আসে মানুষেরই নিয়ন্ত্রণের অধীনে। শুধু সেই সময় থেকেই ক্রমাগত সচেতনভাবে মানুষই রচনা করবে তার স্বীয় ইতিহাস, কেবল সেই সময় থেকেই মানুষ যে সামাজিক কারণগুলিকে গতিদান করবে সেগুলি প্রধানত এবং ক্রমবর্ধমান পরিমাণে তারই বাঞ্ছিত ফলপ্রসব করবে। এ হল আবশ্যিকতার রাজ্য থেকে মুক্তির রাজ্যে মানুষের উত্তরণ।

আমাদের ঐতিহাসিক বিবর্তনের সংক্ষেপ রূপরেখার সারসংকলন করা যাক।

১৮৭৫ সাল—৮,৫০,০০,০০,০০০ পাউন্ড

সংকটকালে উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্নের অপচয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৭৩-১৮৭৮ সালের সংকটে কেবল জার্মান লৌহ-শিল্পেরই মোট ক্ষতির পরিমাণ ২,২৭,৫০,০০০ পাউন্ড বলে দ্বিতীয় জার্মান শিল্প-কংগ্রেসে (বার্লিন, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৮) উল্লিখিত হয়। (এঙ্গেলসের টীকা।)

১। **মধ্যযুগীয় সমাজ** — ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তিগত উৎপাদন। উৎপাদনের উপায় ব্যক্তিগত ব্যবহারের উপযোগী; সেইহেতু আদিম, কদাকার, নগণ্য, ক্রিয়া তাদের খর্বিত। হয় স্বয়ং উৎপাদক নয় তার সামন্ত প্রভুর আশু ভোগের জন্য উৎপাদন। এই ভোগের ওপর যদি কখনো একটা উদ্বৃত্তি ঘটে, কেবল তখনই সে উদ্বৃত্তিটা বিক্রয়ের জন্য ছাড়া হয়, বিনিময়ের মধ্যে আসে। সুতরাং, পণ্য-উৎপাদন নিতান্ত তার শৈশবে। তবু তখনই তার মধ্যে ভ্রূণাবস্থায় নিহিত **সামাজিক উৎপাদনের নৈরাজ্য।**

২। **পুঁজিবাদী বিপ্লব** — প্রথমে সরল সমবায় ও হস্তশিল্প কারখানার সাহায্যে শিল্পের রূপান্তর। এযাবৎ বিচ্ছিন্ন উৎপাদন-উপায়গুলির বড়ো বড়ো কারখানার মধ্যে কেন্দ্রীভবন। ফলস্বরূপ, ব্যক্তিগত থেকে সামাজিক উৎপাদন-উপায়ে তাদের রূপান্তর — এ রূপান্তরে বিনিময়ের ধরন মোটের ওপর অপ্রভাবিত। দখলের পূর্বতন রূপগুলিই বলবৎ। **পুঁজিপতির** উদয়। উৎপাদন-উপায়ের মালিক হিশেবে সে উৎপন্নকেও দখল করে এবং তাকে রূপান্তরিত করে পণ্যে। উৎপাদন হয়ে দাঁড়ায় একটা **সামাজিক** কাজ। বিনিময় ও দখল থেকেই যায় **ব্যক্তিগত** কাজ, এক-একটা ব্যক্তির ব্যাপার। **সামাজিক উৎপন্ন দখল করে ব্যক্তি পুঁজিপতি।** মৌলিক বিরোধ, তা থেকে অন্য সবকিছু বিরোধের উদয়, যার মধ্য দিয়ে চলেছে আমাদের সমাজ এবং আধুনিক শিল্প যা উদ্‌ঘাটিত করছে।

ক) উৎপাদনের উপায় থেকে উৎপাদকের বিচ্ছেদ। শ্রমিকদের জন্য আজীবন মজুরি-শ্রমের দণ্ড। **প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে বৈপরীত্য।**

খ) পণ্য-উৎপাদন যে নিয়মগুলির অধীন সেগুলির বর্ধমান আধিপত্য ও ক্রমাধিক কার্যকারিতা। বলগাহীন প্রতিযোগিতা। **এক-একটা ফ্যাক্টরিতে সমাজীকৃত সংগঠন এবং সমগ্রভাবে উৎপাদনের সামাজিক নৈরাজ্যের মধ্যে বিরোধ।**

গ) একদিকে, প্রতিযোগিতার ফলে প্রতিটি ব্যক্তিগত কলওয়ালার পক্ষে যা বাধ্যতামূলক, যন্ত্রের সেই ক্রমোন্নতি এবং তার অনুপূরক হিশেবে শ্রমিকদের নিয়ত বর্ধমান কর্মচ্যুতি। **শিল্পের মজুত বাহিনী।** অন্যদিকে, — এটাও প্রতিযোগিতার ফলে প্রতিটি কলওয়ালার পক্ষে বাধ্যতামূলক, উৎপাদনের সীমাহীন প্রসার। দুদিকেই উৎপাদন-শক্তির অশ্রুতপূর্ব বিকাশ,

চাহিদার তুলনায় যোগানের আধিক্য, অতি-উৎপাদন, বাজারে অত্যধিক সরবরাহ, প্রতি দশ বছর অন্তর সংকট, পাপ চক্র: **এদিকে উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্নের আধিক্য — ওদিকে** কর্মহীন ও জীবিকাহীন **শ্রমিকদের আধিক্য।** কিন্তু উৎপাদন ও সামাজিক সমৃদ্ধির এই দুটি কারিকা একত্রে সক্রিয় হতে অক্ষম, কারণ উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি উৎপাদন-শক্তিকে আটকে রাখে কাজ থেকে এবং উৎপন্নকে আটকে রাখে সঞ্চালন থেকে — যদি না তারা প্রথমে পরিণত হয় পুঁজিতে, কিন্তু এই অতি আধিক্যেই তা অসম্ভব। এ বিরোধ বেড়ে ওঠে এক অদ্ভুত স্তরে। **বিনিময়-রূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উৎপাদন-পদ্ধতি।** নিজেদেরই সামাজিক উৎপাদন-শক্তিকে আর পরিচালনা করতে অসামর্থ্যের দ্বারা বুর্জোয়ারা অভিযুক্ত।

ঘ) উৎপাদন-শক্তির সামাজিক চরিত্রের আংশিক স্বীকৃতি দিতে পুঁজিপতিরা নিজেরাই বাধ্য হয়। উৎপাদন ও যোগাযোগের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলিকে হাতে নেয় প্রথমে **জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি,** পরে ট্রাস্ট, অতঃপর **রাষ্ট্র।** অনাবশ্যক শ্রেণী রূপে প্রমাণিত হয় বুর্জোয়ারা। তাদের সামাজিক ক্রিয়ার সবই এখন চলে বেতনভোগী কর্মচারী দ্বারা।

৩। **প্রলেতারীয় বিপ্লব** — বিরোধসমূহের সমাধান। সামাজিক ক্ষমতা দখল করে প্রলেতারিয়েত, এবং তার দ্বারা বুর্জোয়ার হাত থেকে স্খলিত সমাজীকৃত উৎপাদন-উপায়গুলিকে পরিণত করে সাধারণ সম্পত্তিতে। এ কাজের ফলে উৎপাদনের উপায়গুলি এতদিন যে পুঁজির চরিত্র ধারণ করেছিল তা থেকে প্রলেতারিয়েত তাদের মুক্ত ক'রে তাদের সমাজীকৃত চরিত্রটার পরিপূর্ণ সক্রিয়তার স্বাধীনতা এনে দেয়। পূর্বনির্দিষ্ট একটা পরিকল্পনায় সমাজীকৃত উৎপাদন এখন থেকে সম্ভব হয়। উৎপাদনের বিকাশের ফলে তখন থেকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব কালাসঙ্গতি হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক উৎপাদন থেকে যে পরিমাণে নৈরাজ্য অন্তর্ধান করতে থাকে সেই পরিমাণে মরে যেতে থাকে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। মানুষ অবশেষে নিজেরই সমাজ-সংগঠনের প্রভু হবার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ হয়ে দাঁড়ায় প্রকৃতির প্রভু, নিজের প্রভু — মুক্ত।

সার্বজনীন মুক্তির এই কর্মই হল আধুনিক প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ব্রত। ঐতিহাসিক অবস্থাটিকে পুরোপুরি বোঝা, এবং সে

কারণে এই কর্মের চরিত্র প্রণিধান করা, যে স্মরণীয় কীর্তি প্রলেতারিয়েতের সাধন করার কথা, আজকের নিপীড়িত প্রলেতারীয় শ্রেণীকে, তার শর্ত ও তাৎপর্যের পরিপূর্ণ জ্ঞানদান করা—এই হল প্রলেতারীয় আন্দোলনের তাত্ত্বিক প্রকাশ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কর্তব্য।

১৮৮০ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের প্রথমার্ধে এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত

প্রকাশিত হয় *La Revue socialiste* পত্রিকায়, নং ৩, ৪, ৫, সংখ্যায়, ১৮৮০ সালের ২০ মার্চ, ২০ এপ্রিল, ৫ মে তারিখে এবং ফরাসী ভাষায় পৃথক পুস্তিকাকারে: F. Engels. 'Socialisme utopique et socialisme scientifique', Paris, 1880

ইংরেজি সংস্করণের পাঠ থেকে বাংলা অনুবাদ

ভ. ই. জাসুলিচের চিঠির উত্তরের প্রথম খসড়া (৬০)

১) পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্ভব সম্পর্কে আমার বিশ্লেষণে আমি বলেছিলাম যে তার গোপন রহস্যটা রয়েছে এইখানে যে 'উৎপাদনের উপায়সমূহ থেকে উৎপাদককে একদম বিচ্ছিন্ন করার' উপরে তা প্রতিষ্ঠিত ('পুঁজির' ফরাসী সংস্করণের পৃঃ ৩১৫, কলম ১) এবং 'জমি থেকে **কৃষি-উৎপাদনকারীর উচ্ছেদসাধন হল** সমগ্র প্রক্রিয়ার ভিত্তি। এই উচ্ছেদসাধনের ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে... আমাদের দৃষ্টান্ত হিশেবে আমরা যাকে নিচ্ছি, একমাত্র সেই ইংলণ্ডেই রয়েছে তার চিরায়ত রূপ' (ঐ, কলম ২)*।

একাজ করার সময়ে আমি এই প্রক্রিয়ার 'ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতাকে' **পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে সুস্পষ্টভাবেই** সীমাবদ্ধ রেখেছি। কেন? দয়া করে ৩২তম অধ্যায়টি দেখুন, সেখানে এই কথাগুলি দেখতে পাবেন: 'তার বিলুপ্তি, উৎপাদনের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও বিক্ষিপ্ত উপায়সমূহের সামাজিকভাবে কেন্দ্রীকৃত উপায়ে রূপান্তর, বহুর অতি-ক্ষুদ্র সম্পত্তির কতিপয়ের বিপুল সম্পত্তিতে রূপান্তর... বিরাট জনসাধারণের এই ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক উচ্ছেদসাধনই পুঁজির ইতিহাসের ভূমিকা... স্বোপার্জিত **ব্যক্তিগত সম্পত্তি**... স্থানচ্যুত হয় **পুঁজিবাদধর্মী ব্যক্তিগত সম্পত্তি** দিয়ে, তা নির্ভর করে থাকে অপরের নামত মুক্ত শ্রমের, অর্থাৎ মজুরি-শ্রমের শোষণের উপরে' (পৃঃ ৩৪১, কলম ২)**।

---

* তুলনীয়: এই সংস্করণের ৬ খণ্ড, ৩২-৩৩ পৃঃ। — সম্পাঃ

** ঐ, ১০৭-১০৮ পৃঃ। — সম্পাঃ

এইভাবে, শেষ বিশ্লেষণে, এখানে আমরা **একধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তির আরেকধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরের বিষয়টি বিবেচনা করছি।** রুশ চাষীরা যে জমি চাষ করে তা কোনোকালেই তাদের **ব্যক্তিগত সম্পত্তি** না-থাকায়, তাদের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব প্রযুক্ত হবে কী করে?

২) ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে **রুশ কৃষকদের** গ্রাম-সমাজের (কমিউন) **অবশ্যম্ভাবী ভাঙনের** সপক্ষে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হল এই:

অতীতের শতাব্দীগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে সারা পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে অল্পবিস্তর প্রাচীন ধরনের সম্প্রদায়গত সম্পত্তি দেখতে পাওয়া যায়; সমাজ-প্রগতির ফলে এখন তা সর্বত্র লোপ পেয়েছে। একমাত্র রাশিয়াতেই তা এই নিয়তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে কেন?

এর জবাবে আমি বলব: কারণ রাশিয়ায়, এক অনন্য ঘটনাসংযোগের দরুন, জাতীয় স্তরে এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান গ্রামীণ সমাজ ক্রমে ক্রমে তার আদিম লক্ষণগুলি পরিত্যাগ করতে সক্ষম এবং জাতীয় স্তরে যৌথ উৎপাদনের একটি উপাদান হিশেবে প্রত্যক্ষভাবে বিকাশ লাভ করতে সক্ষম। তা যে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সঙ্গে একই সময়ে রয়েছে, এই ঘটনাই তাকে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সমস্ত ভয়ংকর উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে না গিয়েই তার সমস্ত ইতিবাচক কৃতিত্বগুলির সুযোগ গ্রহণ করতে সক্ষম করে তোলে। রাশিয়া তো আধুনিক পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্নাবস্থায় বাস করে না; পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের (ইস্ট ইন্ডিয়ার) মতো সে বিদেশী দখলদারির শিকারও নয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রুশ সমর্থকরা যদি এরূপ এক বিবর্তনের **তত্ত্বগত** সম্ভাবনা অস্বীকার করতেন, তাহলে আমি তাঁদের এই প্রশ্নটি করতাম: রাশিয়া কি পশ্চিমের মতো যন্ত্র, স্টিমবোট, রেলওয়ে প্রভৃতি পাওয়ার জন্য যন্ত্রোৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ-সাধনের এক দীর্ঘ পরিণতি-কালের মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল? আমাকে তাঁরা একথাও বলুন, পশ্চিমে যা গড়ে উঠতে বহু শতাব্দী লেগেছিল সেই গোটা বিনিময়-ব্যবস্থা (ব্যাঙ্ক, ঋণদান সমিতি প্রভৃতি) তাঁরা এক লহমায় প্রবর্তন করতে পারলেন কী করে?

ভূমিদাসপ্রথা (৬১) বিলোপের সময়ে গ্রামীণ সমাজগুলিকে যদি সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক বিকাশের অবস্থায় রাখা যেত, যে বিপুল পরিমাণ সরকারী ঋণের বেশির ভাগটাই মিটিয়েছিল কৃষকরা সেই ঋণ, সেই সঙ্গে পুঁজিপতিতে

রূপান্তরিত 'সমাজের নতুন স্তম্ভদের' রাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় (এবারেও কৃষকদের স্বার্থের বিনিময়ে) অন্যান্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ যোগানো হয়েছিল — এই সমস্ত ব্যয় যদি গ্রামীণ সমাজের **ভবিষ্যৎ বিকাশের** জন্য ব্যবহৃত হত, তাহলে কেউই আজ গ্রাম-সমাজের বিনাশের 'ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতার' কথা বলতেন না: প্রত্যেকে একে স্বীকার করে নিতেন রুশ সমাজে পুনঃসৃষ্টিমূলক শক্তি হিশেবে এবং যেসমস্ত দেশ এখনও পুঁজিবাদী শাসনের দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ তাদের চাইতে শ্রেয়তর বস্তু হিশেবে।

রুশ গ্রাম-সমাজ রক্ষা করার (তার বিকাশের সাহায্যে) অনুকূলে আরেকটি বিষয় এই যে গ্রাম-সমাজ শুধু পুঁজিবাদী উৎপাদনের (পশ্চিমে) সমসাময়িকই নয়, এই সমাজব্যবস্থা যখন অক্ষুণ্ণ ছিল সেই কালপর্ব কাটিয়ে উঠেও সে টিকে রয়েছে, বরংচ পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় স্থানেই তাকে বিজ্ঞানের সঙ্গে, জনসাধারণের সঙ্গে এবং যে উৎপাদন-শক্তিসমূহের সে জন্ম দেয় তারই সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হতে দেখছে। এককথায়, রুশ কমিউন বা গ্রাম-সমাজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে দেখতে পাচ্ছে এক সংকটের অবস্থায়, যার অবসান হবে তার নিশ্চিহ্নতার মধ্যে, আধুনিক সমাজগুলির 'প্রাচীন' ধরনের সম্প্রদায়গত মালিকানায় প্রত্যাবর্তনের মধ্যে, কিংবা নিশ্চিত রূপেই যাঁকে বিপ্লবী প্রবণতাসম্পন্ন বলে সন্দেহ করা যায় না এবং যাঁর রচনাদি ওয়াশিংটন সরকারের সমর্থনপুষ্ট এমন জনৈক মার্কিন লেখকের* ভাষায় বলতে গেলে, আধুনিক সমাজ যে দিকে চলেছে সেই 'নতুন ব্যবস্থা' হবে এক প্রাচীন ধরনের সমাজের 'শ্রেয়তর রূপে পুনরুজ্জীবন', ফলে, 'প্রাচীন' শব্দটিতে খুব বেশি ভয় পাওয়া উচিত নয়।

কিন্তু সে ক্ষেত্রে, এই পরিবর্তনগুলি কী সে সম্পর্কে অন্তত অবহিত হওয়া দরকার। সে বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না।

আদিম সম্প্রদায়গুলির পতনের ইতিহাস (তাদের সকলকে সমান স্তরের বলে গণ্য করা ভুল হবে: ভূতত্ত্বগত স্তরসমষ্টির ক্ষেত্রে যেমন, ঐতিহাসিক গঠনবিন্যাসে অনেকগুলি মুখ্য, গৌণ ও তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক ধরন প্রভৃতি থাকে) এখনও লেখা বাকি। এযাবৎ শুধু নকসার মতো সংক্ষিপ্ত কিছু

---

* ল. মর্গান। — সম্পাঃ

রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুসন্ধান যথেষ্ট পরিমাণে এগিয়েছে, যাতে একথা বলা যায় যে: ১) আদিম সম্প্রদায়গুলির জীবনীশক্তি সেমিটিক, গ্রীক ও রোমক সমাজ প্রভৃতির চাইতে অতুলনীয়ভাবে বেশি ছিল এবং আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজগুলির তুলনায় কঠিনতর যুক্তিসহ ছিল; ২) তাদের পতনের কারণগুলি উৎসারিত হচ্ছে কতকগুলি অর্থনৈতিক বিষয় থেকে, যা তাদের এক নির্দিষ্ট স্থানের সীমা পেরিয়ে বিকাশ লাভ করতে বাধা দিয়েছে, এবং তাদের ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে, যা কোনো মতেই আজকের রুশ কমিউনের পটভূমির অনুরূপ নয়।

বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের লেখা আদিম সম্প্রদায়গুলির ইতিহাস পড়ার সময়ে সতর্ক থাকা উচিত। তাঁরা কোনো কিছুতেই পরাঙমুখ নন, এমন কি নির্ভেজাল বিকৃতিতেও না। যেমন, বলপ্রয়োগে ভারতীয় গ্রাম-সমাজগুলিকে ধ্বংস করার নীতিতে ব্রিটিশ সরকারের ঐকান্তিক সক্রিয় সমর্থক স্যর হেনরি মেইন কপটতাসহকারে আমাদের বলেন যে সরকারের তরফ থেকে এই সব গ্রাম-সমাজকে মদত দেবার মহতী প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছিল অর্থনৈতিক নিয়মের অমোঘ বলে!

কোনো না কোনো ভাবে এই গ্রাম-সমাজ বাইরে থেকে ও ভিতর থেকে অবিরত যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিনষ্ট হয়েছিল। তার হয়ত নৃশংস মৃত্যু ঘটেছিল। জার্মান উপজাতিগুলি যখন ইতালি, স্পেন, গল, প্রভৃতি জয় করেছিল তখন সেকেলে ধরনের গ্রাম-সমাজের আর অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু তার **স্বাভাবিক জীবনীশক্তি** প্রমাণিত হয় দুটি ঘটনা দিয়ে। এমন এক-একটি দৃষ্টান্ত আছে যেখানে তা মধ্য যুগের সমস্ত উত্থান-পতন কাটিয়ে উঠে একেবারে বর্তমান কাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ অবস্থায় টিকে আছে, যেমন আমার বাসভূমি ট্রিড্‌স অঞ্চলে। কিন্তু যা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে তাকে স্থানচ্যুত করে যে গ্রাম-সমাজ এসেছে — যে গ্রাম-সমাজে কর্ষণযোগ্য জমি পরিণত হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে, অথচ অরণ্য, গোচারণ ভূমি ও পতিত জমি সম্প্রদায়গত সম্পত্তি থেকে গেছে — তার উপরে সে তার ছাপ এমন জোরালোভাবে রেখে গেছে যে মউরার দ্বিতীয় স্তরের গঠনবিন্যাসের এই গ্রাম-সমাজ পর্যবেক্ষণ করে প্রাচীন আদিরূপ নতুন করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। শেষোক্তের রেখে-যাওয়া বৈশিষ্ট্যসূচক

ছাপের দরুন, জার্মানরা তাদের অধিকৃত সমস্ত জমিতে যে গ্রাম-সমাজ প্রবর্তন করেছিল, সেই নতুন গ্রাম-সমাজ গোটা মধ্য যুগ ধরে হয়ে উঠেছিল মুক্তি ও জনমুখী জীবনের দুর্গ।

গ্রাম-সমাজের জীবন সম্পর্কে কিংবা তার বিলুপ্তি কিভাবে, কোন সময়ে হয়েছে সে সম্পর্কে ট্যাসিটাসের যুগের পর আমরা কিছু জানি না বটে, তবে জুলিয়স সিজারের গল্প থেকে এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত সম্পর্কে অন্তত জানতে পারি। তাঁর সময়েই জমি পুনর্বণ্টন করা হচ্ছিল বছরে বছরে, যদিও সেটা ছিল জার্মান **কনফেডারেশনগুলির গোষ্ঠী** (gentes) ও **উপজাতিগুলির** (tribus) মধ্যে, একটি গ্রাম-সমাজের এক-একজন স্বতন্ত্র সদস্যের মধ্যে তখনো পর্যন্ত নয়। এইভাবে জার্মানিতে **গ্রাম-সমাজের** উদ্ভব ঘটেছিল আরো প্রাচীন সমাজের একটা ধরন থেকে এবং এশিয়া থেকে তৈরি অবস্থায় আমদানি হওয়ার পরিবর্তে তা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের ফল। সেখানে — ইস্ট ইন্ডিয়ায় — তা সবসময়ে সেকেলে গঠনবিন্যাসে **সর্বশেষ স্তর** বা সর্বশেষ কালপর্ব হিশেবেও দেখা যায়।

পুরোপুরি তত্ত্বগত দৃষ্টিকোণ থেকে, অর্থাৎ নিয়ত স্বাভাবিক অবস্থার অস্তিত্ব ছিল এই কথা পূর্বাহ্নেই অনুমান করে নিয়ে, গ্রাম-সমাজের সম্ভাব্য ভাগ্য বিচার করার উদ্দেশ্যে আমি এখন এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যা 'জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজকে' অধিকতর সেকেলে ধরনগুলির থেকে পৃথক করে।

সর্বপ্রথমে, গোড়ার দিকের আদিম সম্প্রদায়গুলির সবকটিরই ভিত্তি ছিল তাদের সদস্যদের অভিন্ন বংশপরিচয়; এই জোরালো অথচ সংকীর্ণ যোগসূত্র ভেঙে জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজ অপরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রসারিত করতে ও টিকিয়ে রাখতে অধিকতর সক্ষম।

দ্বিতীয়ত, জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজে বাসগৃহ ও তার পরিপূরক, অঙ্গন, জমি যে চাষ করে তারই ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অথচ কৃষি প্রবর্তনের বহু আগে বারোয়ারি বাসগৃহ ছিল গোড়ার দিককার সম্প্রদায়গুলির অন্যতম বৈষয়িক ভিত্তি।

সবশেষে, কর্ষণযোগ্য জমি সম্প্রদায়গত বা বারোয়ারি সম্পত্তি থাকলেও কিছুকাল অন্তর অন্তর তা জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজের সদস্যদের মধ্যে এমনভাবে

নতুন করে ভাগাভাগি করা হয় যে প্রত্যেকে তার নির্দিষ্ট খেত নিজেই চাষ করে এবং তার নিজের শ্রমের ফসল ভোগ করে, পক্ষান্তরে আরো সেকেলে সম্প্রদায়গুলিতে উৎপাদন ছিল সম্প্রদায়গত এবং শুধু উৎপন্ন সামগ্রী বণ্টন করা হত। অবশ্য, এই আদিম ধরনের যৌথ বা সমবায়মূলক উৎপাদন ছিল বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির দুর্বলতার ফল, উৎপাদনের উপায়সমূহের সামাজিকীকরণের ফল নয়।

'জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজে' অন্তর্নিহিত দ্বিবিধত্ব কিভাবে তাকে প্রাণশক্তি প্রদান করে তা সহজেই দেখা যায়, কারণ একদিকে সম্প্রদায়গত সম্পত্তি এবং তা থেকে উদ্ভূত সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক তাকে একটা দৃঢ় ভিত্তি যোগায়, আর ব্যক্তিগত বাসগৃহ, কর্ষণযোগ্য জমির অংশ-বিভক্ত চাষ এবং শ্রমের ফসল ব্যক্তিগতভাবে উপযোজন ব্যক্তির বিকাশে সহায়ক হয়, আদিমতর জনসম্প্রদায়গুলিতে বিদ্যমান অবস্থায় যা বেমানান ছিল।

কিন্তু একথাও সমান পরিষ্কার যে এই দ্বিবিধত্বই কালক্রমে ভাঙনের উৎস হয়ে উঠতে পারে। এক বৈরি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব ছাড়াও, গবাদি পশু দিয়ে যার শুরু সেই অস্থাবর সম্পত্তির (এর মধ্যে এমনকি ভূমিদাসও পড়ে) ক্রমান্বিত সঞ্চয়, কৃষিতে অস্থাবর সম্পত্তির ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং এই সঞ্চয়ের আনুষঙ্গিক অনেকগুলি অন্যান্য বিষয় — এখানে তা বিশদভাবে বর্ণনা করতে হলে মূল বিষয় থেকে আমাকে বহুদূর সরে যেতে হবে — অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য ভেঙে ফেলে গ্রাম-সমাজেরই ভিতরে এমন স্বার্থের সংঘাতের জন্ম দেয়, যার ফলে প্রথমেই কর্ষণযোগ্য জমি পরিণত হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে এবং শেষ পর্যন্ত অরণ্য, গোচারণ ভূমি ও পতিত জমি প্রভৃতি ব্যক্তিগত ভোগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় — এগুলি ইতিমধ্যেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির **সম্প্রদায়গত উপাঙ্গে** পরিণত হয়েছে। এই জন্যই 'জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজ' সর্বত্রই সেকেলে সামাজিক গঠনবিন্যাসের **সাম্প্রতিকতম ধরন** এবং সেই কারণেই, পশ্চিম ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজের কালপর্বটি হল সম্প্রদায়গত মালিকানা থেকে ব্যক্তিগত মালিকানায় উত্তরণের, প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় স্তরের গঠনবিন্যাসে উত্তরণের কালপর্ব। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে 'জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজের' বিকাশ সব অবস্থায় অবশ্যই

একই ধারা অনুসরণ করবে? নিশ্চয়ই না। তার উপাদানমূলক রূপটি নিম্নলিখিত বিকল্প তুলে ধরে: হয় তার অন্তর্নিহিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপাদানটি যৌথ উপাদানের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে, না হয় তার উল্টো। সবকিছুই নির্ভর করে যে ঐতিহাসিক পটভূমিতে সে রয়েছে, তার উপরে... এই দুটি সমাধানই সম্ভব কার্যকারণ নির্ণয়াত্মক পদ্ধতি নির্বিশেষে, কিন্তু স্পষ্টতই দুটির জন্যই দরকার একেবারে পৃথক ঐতিহাসিক পরিবেশ।

৩) রাশিয়াই একমাত্র ইউরোপীয় দেশ যেখানে 'জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজ' বর্তমান কাল পর্যন্ত জাতীয় স্তরে বজায় রাখা হয়েছে। সে বৈদেশিক দেশ দখলের শিকার নয়, যেমন ইস্ট ইণ্ডিয়া। সেই সঙ্গে আধুনিক পৃথিবী থেকে সে বিচ্ছিন্ন নয়। একদিকে, জমির সাধারণ মালিকানার দরুন সে অংশবিভক্ত ও ব্যক্তিগত কৃষিব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষভাবে ও ক্রমে ক্রমে যৌথ কৃষি ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে পারে, এবং যেসব তৃণভূমি ভাগাভাগি হয়ে যায় নি সেখানে রুশ কৃষকরা ইতিমধ্যেই তা করছে। রাশিয়ার জমির প্রাকৃতিক গঠনই বৃহদাকারে যন্ত্রের ব্যবহার দাবি করে। কৃষক যে শ্রমের **আর্তেল** প্রথায় (যৌথ উদ্যোগ) অভ্যস্ত এই ঘটনাটিই তার পক্ষে অর্থনীতির অংশবিভক্ত ব্যবস্থা থেকে সমবায়মূলক ব্যবস্থায় পরিবর্তনসাধনের কাজকে সহজতর করে তোলে, এবং সবশেষে, যে রুশ সমাজ এতকাল তার স্বার্থের বিনিময়ে বেঁচে থেকেছে, এরূপ উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় অগ্রিমমূল্য তারই প্রদেয়। অন্যদিকে, পৃথিবীর বাজারে যার আধিপত্য রয়েছে সেই পশ্চিমী উৎপাদনব্যবস্থার **যুগপৎ অস্তিত্ব** রাশিয়াকে সক্ষম করে তোলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার 'কওদিন ফর্কস'-এর (৬২) মধ্য দিয়ে না-গিয়েই তার অর্জিত সমস্ত ইতিবাচক কৃতিত্বকে গ্রাম-সমাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে।

'সমাজের নতুন স্তম্ভের' মুখপাত্ররা যদি আধুনিক গ্রাম-সমাজের বিবর্তনের তত্ত্বগত সম্ভাবনা অস্বীকার করেন, তাহলে তাঁদের প্রশ্ন করা যেতে পারে, যন্ত্র, স্টিমবোট, রেলওয়ে প্রভৃতি পাওয়ার জন্য রাশিয়া পশ্চিমের মতো যন্ত্রোৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশসাধনের এক দীর্ঘ পরিণতিকালের মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল কিনা। পশ্চিমে যা গড়ে উঠতে বহু শতাব্দী লেগেছিল সেই গোটা বিনিময়-ব্যবস্থা (ব্যাংক, জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি প্রভৃতি) রুশীরা

কী করে এক লহমায় প্রবর্তন করতে পারলেন, সে প্রশ্নও তাঁদের করা যায়।

রাশিয়ার 'জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজের' একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেটাই তার দুর্বলতা এবং সর্বদিক দিয়ে তার পক্ষে ক্ষতিকর। সেটা হল তার বিচ্ছিন্নতা, এক গ্রাম-সমাজের জীবন এবং অন্যান্য গ্রাম-সমাজের জীবনের মধ্যে যোগাযোগের অভাব, **নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ এই ক্ষুদ্র-বিশ্ব,** যা এই ধরনটির অন্তর্নিহিত লক্ষণ হিশেবে সর্বত্র দেখা যায় না, কিন্তু যেখানেই তা আছে সেখানেই গ্রাম-সমাজগুলির উপরে অল্পবিস্তর কেন্দ্রীকৃত স্বেচ্ছাচারের জন্ম দিয়েছে। রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলির একীকরণ প্রমাণ করে যে মঙ্গোলদের আক্রমণের পর রাশিয়া যে রাজনৈতিক ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে গিয়েছিল, তার দ্বারা এই বিচ্ছিন্নতা অনেকাংশে জোরদার হয়েছিল; মনে হয় মূলত এই বিচ্ছিন্নতার হেতু ছিল বিপুল বিস্তীর্ণ এলাকা। আজ এই বাধা সহজেই অতিক্রম করা যায়। যা করা দরকার সেটা হল সরকারী প্রতিষ্ঠান 'ভোলোস্ত'*কে স্থানান্তরিত করে তার জায়গায় গ্রাম-সমাজগুলিরই নির্বাচিত কৃষকদের এক পরিষদকে বসানো, এই পরিষদ তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্থা হিশেবে কাজ করবে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে, তার ভবিষ্যৎ বিকাশের সাহায্যে 'জমিভিত্তিক গ্রাম-সমাজ' সংরক্ষণের পক্ষে অতি অনুকূল একটি বিষয় এই যে গ্রাম-সমাজ যে শুধু পশ্চিমী পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে একই সময়ে রয়েছে এবং তাই তার কার্যপ্রণালীর কাছে আত্মসমর্পণ না-করেও তার কৃতিত্বগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারে তাই নয়, বরং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যখন পুরো অক্ষুণ্ণ ছিল সেই কালপর্ব কাটিয়েও তা টিকে রয়েছে, এবং এখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে দেখছে, পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দু'জায়গাতেই শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে, বিজ্ঞানের সঙ্গে এবং সে যে উৎপাদন-শক্তিসমূহের জন্ম দেয় সেগুলির সঙ্গেই সংঘাতে লিপ্ত হতে — এককথায়, এমন এক সংকটাবস্থায়, যার অবসান ঘটবে তার বিলুপ্তিতে, 'সেকেলে' ধরনের যৌথ মালিকানা ও যৌথ উৎপাদনের এক উচ্চতর রূপে আধুনিক সমাজগুলির প্রত্যাবর্তনে।

* মূল রচনায় শব্দটি রুশ ভাষাতে রয়েছে। — সম্পাঃ

একথা বলাই বাহুল্য যে গ্রাম-সমাজের বিবর্তন হবে ক্রমান্বিত বিবর্তন এবং প্রথম ধাপটি হবে তার **বর্তমান ভিত্তির** উপরে তার জন্য স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি।

কিন্তু তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা, জমির প্রায় অর্ধেক, এবং উন্নততর অংশই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, রাষ্ট্রীয় জোত-জমির কথা তো বলাই বাহুল্য। সেই জন্যই, ভবিষ্যৎ বিকাশের সাহায্যে 'গ্রাম-সমাজ' সংরক্ষণ রুশ সমাজের সাধারণ অগ্রগতির সঙ্গে মিলে যায়, রুশ সমাজের পুনর্জন্ম একমাত্র এই মূল্যেই ক্রয় করা যেতে পারে। এমনকি, শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও, রাশিয়ার কৃষি যে অচলাবস্থায় পড়ে আছে, রাশিয়া তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে গ্রাম-সমাজের বিকাশ ঘটিয়ে; ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থার ধারায় পুঁজিবাদী খাজনা প্রবর্তন করে তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করা এবং বেরিয়ে আসাটা হবে বাতুলতা, কারণ সারা দেশের কৃষির অবস্থার পক্ষে তা বেমানান।

বর্তমানে রুশ 'গ্রাম-সমাজ' যেসমস্ত কষ্ট ভোগ করছে, সেকথা বাদ দিয়ে, এবং একমাত্র তার উপাদানমূলক রূপ ও তার ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি মনোনিবেশ করে একথা সোজাসুজি স্পষ্ট হয়ে যায় যে তার অন্যতম মৌলিক লক্ষণ, জমির সাধারণ মালিকানা, যৌথ উৎপাদন ও উপযোজনের স্বাভাবিক ভিত্তি। তদুপরি, রুশ কৃষক যে কাজের **আর্তেল** প্রথায় অভ্যস্ত এই ঘটনাটি অর্থনীতির অংশবিভক্ত ব্যবস্থা থেকে যৌথ ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটানোর কাজকে তার পক্ষে সহজতর করে তোলে; এই যৌথ ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই সে কিছুটা পরিমাণে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করছে বিভক্ত না-হওয়া তৃণভূমিতে, নিকাশী কাজে এবং সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য উদ্যোগে। তবে, কৃষিতে ব্যক্তিগত উপযোজনের উৎস অংশবিভক্ত শ্রমকে স্থানান্তরিত করে যৌথ শ্রম কায়েম হওয়ার জন্য দুটি বিষয় দরকার — এরূপ পরিবর্তনের অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং তা অর্জনের জন্য আবশ্যকীয় বৈষয়িক অবস্থা।

অর্থনৈতিক প্রয়োজনের কথা বলতে গেলে 'গ্রাম-সমাজ' স্বাভাবিক অবস্থায় স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, অর্থাৎ তার উপরে চাপানো গুরুভার বোঝা সরানোর সঙ্গে সঙ্গে এবং উপযুক্তভাবে চাষ করার মতো যথেষ্ট জমি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই প্রয়োজন অনুভূত হবে। রুশ কৃষির যখন শুধুই

জমি দরকার ছিল এবং ছোট চাষীর সরঞ্জাম ছিল অল্পবিস্তর আদিম উপকরণ, সেই সময় চলে গেছে। এই সময়টা চলে গেছে আরো বেশি তাড়াতাড়ি, কারণ চাষীর অত্যাচার তার খেতকে নিঃস্ব ও বন্ধ্যা করে দেয়। তার এখন দরকার বৃহৎ আকারে সংগঠিত সমবায়মূলক শ্রম। আর যে চাষীর নিজের ২ কিংবা ৩ দেসিয়াতিনা* জমি চাষ করার প্রয়োজনীয় সঙ্গতি নেই সে কি দশগুণ বেশি দেসিয়াতিনা জমি নিয়ে আরো ভালো অবস্থায় পড়বে?

কিন্তু হাতিয়ার, সার, খামার-পদ্ধতি অর্থাৎ যৌথ শ্রমের পক্ষে অপরিহার্য সমস্ত উপায়-উপকরণ পাওয়া যাবে কোথায়? একই ধরনের সেকেলে গ্রাম-সমাজগুলির তুলনায় রুশী 'গ্রাম-সমাজের' বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই। ইউরোপে একমাত্র সেই বিশাল জাতীয় স্তরে রক্ষিত হয়েছে। সে তাই এমন এক ঐতিহাসিক পরিবেশে রয়েছে যেখানে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সহবর্তমান অস্তিত্ব তাকে যৌথ শ্রমের সমস্ত অবস্থা যোগায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার 'কওদিন ফর্কস'-এর মধ্য দিয়ে না-গিয়েও তার সমস্ত ইতিবাচক কৃতিত্বকে সে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম। রাশিয়ার জমির প্রাকৃতিক গঠনই বৃহৎ আকারে সংগঠিত ও সমবায়মূলক শ্রমে সম্পাদিত যন্ত্রের ব্যবহারে তাকে চাষ করার আমন্ত্রণ জানায়। প্রারম্ভিক সাংগঠনিক ব্যয়ের কথা — বুদ্ধিবৃত্তিগত তথা বৈষয়িক — বলতে গেলে, রুশ সমাজেরই তা 'গ্রাম-সমাজকে' প্রদেয়, 'গ্রাম-সমাজের' বিনিময়েই রুশ সমাজ এতদিন বেঁচে আছে এবং তারই মধ্যে তাকে তার 'পুনর্জন্মের উৎস' সন্ধান করতে হবে।

'গ্রাম-সমাজের' এই বিকাশ যে আমাদের সময়কার ইতিহাসের ধারার সঙ্গে মানানসই, তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হল ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলিতে, পুঁজিবাদী উৎপাদন যেখানে সবচেয়ে বেশি উন্নত সেইখানেই তার মারাত্মক সংকট, যে সংকটের অবসান হবে তার বিলুপ্তিতে এবং সবচেয়ে প্রাচীন ধরনটির — যৌথ উৎপাদন ও উপযোজন — উন্নততর রূপে আধুনিক সমাজের প্রত্যাবর্তনে।

৪) বিকাশলাভে সক্ষম হওয়ার জন্য সর্বোপরি প্রয়োজন জীবিত থাকা, আর এই ঘটনাটি না-দেখে পারা যায় না যে বর্তমান কালে 'গ্রাম-সমাজের' জীবন বিপন্ন।

* এক দেসিয়াতিনা প্রায় এক হেক্টরের সমান। — সম্পাঃ

জমির কৃষকদের উচ্ছেদ করার জন্য ইংলণ্ডে ও অন্যত্র যেরকম ঘটেছে সেই রকম, তাদের জমি থেকে বিতাড়িত করার প্রয়োজন হয় না; অনুশাসন জারী করে সম্প্রদায়গত সম্পত্তির বিলোপ ঘটানোরও দরকার নেই। কৃষকদের একটা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে তাদের শ্রমের ফসল থেকে বঞ্চিত করেই দেখুন, এমনকি আপনার পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়েও তাদের জমিতে তাদের বেঁধে রাখতে পারবেন না! রোমক সাম্রাজ্যের শেষ দিকে প্রাদেশিক রোমক অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসাররা — এরা কৃষক ছিল না, ছিল ব্যক্তিগত ভূস্বামী — তাদের জমি ছেড়ে দিয়ে, এমনকি নিজেদের ক্রীতদাস রূপে বিক্রি করেও ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, — সবই সেই সম্পত্তির হাত থেকে রেহাই পেতে যে সম্পত্তি কঠোর ও নির্দয় কর-আদায়ের সরকারী অজুহাতের বেশি আর কিছু ছিল না।

ভূমিদাসদের তথাকথিত মুক্তির পর থেকে রুশ গ্রাম-সমাজ রাষ্ট্রের দিক থেকে অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক অবস্থার সামনে পড়েছে, রাষ্ট্র তার হাতে কেন্দ্রীভূত সামাজিক শক্তি দিয়ে তাকে নিপীড়ন করা বন্ধ করে নি। রাষ্ট্রের কর-আদায়ের দরুন দুর্বল হয়ে পড়া গ্রাম-সমাজ বণিক, ভূস্বামী ও মহাজনদের শোষণের সহজ লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। বাইরে থেকে এই নিপীড়ন গ্রাম-সমাজেরই মধ্যে ইতিমধ্যেই বিদ্যমান স্বার্থের সংঘাতকে বাড়িয়ে তুলেছে এবং তার ভাঙনকে ত্বরান্বিত করেছে। কিন্তু এই সব নয়। কৃষকদের স্বার্থের বিনিময়ে রাষ্ট্র লালিত করেছে পশ্চিমী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সেই শাখাগুলিকে, যেগুলি কৃষির কোনো উৎপাদিকাক্ষমতার বিকাশসাধন না-করে, অনুৎপাদনশীল মধ্যস্বত্বভোগীদের দিয়ে কৃষিজাত পণ্য লুণ্ঠনকে সহজতর ও ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সহায়ক। এইভাবে তা ইতিমধ্যেই নিরক্ত 'গ্রাম-সমাজের' রক্ত-চোষা এক নতুন পুঁজিবাদী কীটকে সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করেছে।

... সংক্ষেপে, চাষীর, অর্থাৎ রাশিয়ায় বৃহত্তম উৎপাদন-শক্তির শোষণ সহজতর ও দ্রুততর করার ক্ষেত্রে এবং 'সমাজের নতুন স্তম্ভগুলিকে' সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহায়ক কৃৎকৌশলগত ও অর্থনৈতিক উপায়সমূহের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে রাষ্ট্র সাহায্য করেছে।

৫) ধ্বংসাত্মক প্রভাবগুলির এই মিলনের ফলে অবশ্যম্ভাবী রূপেই

গ্রাম-সমাজ ধ্বংস হবে, যদি না এক বলিষ্ঠ প্রতিকূল ক্রিয়া দিয়ে তাকে চূর্ণ করা যায়।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে: গ্রাম-সমাজের বর্তমান অবস্থা যাদের কাছে এত লাভজনক, সেই সমস্ত স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল (সরকারের রক্ষণাধীন বড়ো বড়ো শিল্পোদ্যোগ সহ) সোনার ডিম-পাড়া হাঁসটিকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করবে কেন? ঠিক এই কারণেই যে তারা বুঝতে পারছে 'বর্তমান অবস্থাটা' ধরে রাখা যাবে না এবং ফলত, তাকে শোষণ করার বর্তমান উপায়গুলিই সেকেলে। কৃষকের দুঃখকষ্ট ইতিমধ্যেই জমিকে নিঃশেষ করে ফেলেছে, জমি অনুৎপাদী হয়ে যাচ্ছে। অনুকূল অবস্থায় কোনো কোনো বছর সেখানে যে ভালো ফসল ফলেছে, তা বাতিল হয়ে গেছে অন্যান্য বছরের দুর্ভিক্ষে। গত দশ বছরের গড় পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে কৃষি-উৎপাদন শুধু যে স্থাণু তাই নয়, বরং পশ্চাৎগামী। সব শেষে, এই সর্বপ্রথম রাশিয়া খাদ্যশস্য রপ্তানি করার পরিবর্তে আমদানি করতে বাধ্য হচ্ছে। তাই নষ্ট করার মতো সময় নেই। এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতেই হবে। অল্পবিস্তর সম্পন্ন চাষীদের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ দিয়ে এক গ্রামীণ মধ্য শ্রেণী গঠন করতেই হবে এবং কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে নিছক প্রলেতারিয়েতে পরিণত করতেই হবে। এই লক্ষ্য মাথায় রেখেই 'সমাজের নতুন স্তম্ভের' মুখপাত্ররা গ্রাম-সমাজের উপরে আঘাতজনিত ক্ষতগুলিকেই তার জরাজীর্ণ দশার স্বাভাবিক উপসর্গ বলে অভিযোগ করেন।

এত বিচিত্র ধরনের স্বার্থ, বিশেষ করে দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের সদাশয় শাসনে খাড়া-করা 'সমাজের নতুন স্তম্ভগুলির' স্বার্থের কাছে 'গ্রাম-সমাজের' বর্তমান অবস্থা সুবিধাজনক, তবুও তারা সচেতনভাবে তাকে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করে কেন? কেন তাদের মুখপাত্ররা তার ক্ষতগুলিকে তার স্বাভাবিক জীর্ণদশার অকাট্য প্রমাণ বলে অভিযোগ করে? যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে তাকে তারা হত্যা করতে চায় কেন?

শুধু এই কারণে যে অর্থনৈতিক বিষয়গুলি — এখানে যেগুলি বিশ্লেষণ করতে গেলে আলোচ্য বিষয় থেকে আমাকে অনেকদূর সরে যেতে হবে — এই রহস্য প্রকাশ করেছে যে **গ্রাম-সমাজের বর্তমান অবস্থা টিঁকিয়ে রাখা যাবে না,** এবং জনসাধারণকে শোষণ করার বর্তমান উপায়গুলি অচিরেই

ঘটনাপ্রবাহে সেকেলে হয়ে যাবে। ফলে, নতুন কিছু দরকার, আর এই যে নতুন উপাদানটির কথা বিচিত্রতম ছদ্মবেশে ইঙ্গিত করা হচ্ছে সেটিকে সবসময়ে একই জিনিসে পর্যবসিত করা যেতে পারে: সম্প্রদায়গত সম্পত্তি বিলুপ্ত করা, অল্প বিত্তর সম্পন্ন চাষীদের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ থেকে একটা গ্রামীণ মধ্য শ্রেণী গঠন করা এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে নিছক প্রলেতারিয়েতে পরিণত করা।

একদিকে 'গ্রাম-সমাজ' প্রায় ভাঙনের কিনারায়, অন্যদিকে তার উপরে শেষ আঘাত হানার এক জোরালো ষড়যন্ত্রে তা বিপন্ন। রাশিয়ার গ্রাম-সমাজকে রক্ষা করার জন্য অবশ্যই এক রুশ বিপ্লব দরকার। প্রসঙ্গত, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা যাঁদের হাতে রয়েছে তাঁরা জনসাধারণকে এরূপ এক বিপর্যয়ের জন্য যথাসাধ্য করছেন।

সেই সঙ্গে, গ্রাম-সমাজের যখন রক্তক্ষরণ হচ্ছে এবং তা যখন অত্যাচারিত হচ্ছে, তার জমি অনুৎপাদী ও দুর্বল করে ফেলা হচ্ছে তখন 'সমাজের নতুন স্তম্ভগুলির' সাহিত্যিক পরিচারকরা গ্রাম-সমাজের উপরে হানা আঘাতজনিত ক্ষতগুলিকে পরিহাসভরে উল্লেখ করছে তার স্বতঃস্ফূর্ত জীর্ণদশার উপসর্গ বলে। তারা দাবি করছে যে তার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটছে এবং সদয়তম ব্যাপারটা হবে তার যন্ত্রণার অবসান ঘটানো। এখানে আমরা আর সমাধান করার মতো একটা সমস্যার মোকাবিলা করছি না, মোকাবিলা করছি নিতান্তই এক শত্রুর, যাকে পরাস্ত করতেই হবে। রুশ দেশীয় গ্রাম-সমাজকে রক্ষা করার জন্য একটি রুশ বিপ্লব অবশ্যই দরকার। এবং রুশ সরকার ও 'সমাজের নতুন স্তম্ভগুলি' এরূপ বিপর্যয়ের জন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত করার জন্য তাদের যথাসাধ্য করছে। যদি ঠিক সময়ে বিপ্লব হয়, যদি তা গ্রাম-সমাজের অবাধ বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য তার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে, তাহলে গ্রাম-সমাজ অচিরেই রুশ সমাজে নবজন্মদায়ক শক্তি হিশেবে, এবং যেসব দেশ এখনো পুঁজিবাদী শাসনের দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ তাদের চাইতে উন্নততর কিছু হিশেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে ও মার্চের গোড়ার দিকে মার্ক্স-কর্তৃক লিখিত
প্রথম প্রকাশ: 'মার্ক্স-এঙ্গেলস আরকাইভ' গ্রন্থের ১, ১৯২৪

পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী মুদ্রিত
ফরাসী থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কার্ল মার্কসের সমাধিপার্শ্বে বক্তৃতা

১৪ মার্চ, বেলা পৌনে তিনটেয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক চিন্তা থেকে বিরত হয়েছেন। মাত্র মিনিটদুয়েকের জন্য তাঁকে একা রেখে যাওয়া হয়েছিল। আমরা ফিরে এসে দেখলাম যে তিনি তাঁর আরামকেদারায় শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন — কিন্তু ঘুমিয়েছেন চিরকালের জন্য।

এই মানুষটির মৃত্যুতে ইউরোপ ও আমেরিকার জঙ্গী প্রলেতারিয়েত এবং ইতিহাস-বিজ্ঞান উভয়েরই অপূরণীয় ক্ষতি হল। এই মহান প্রাণের তিরোভাবে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল তা অচিরেই অনুভূত হবে।

ডারউইন যেমন জৈব প্রকৃতির বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন তেমনি মার্কস আবিষ্কার করেছেন মানুষের ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম, মতাদর্শের অতি নিচে এতদিন লুকিয়ে রাখা এই সহজ সত্য যে, রাজনীতি, বিজ্ঞান, কলা, ধর্ম ইত্যাদি চর্চা করতে পারার আগে মানুষের প্রথম চাই খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়-পরিচ্ছদ, সুতরাং প্রাণধারণের আশু বাস্তব উপকরণের উৎপাদন এবং সেইহেতু কোনো নির্দিষ্ট জাতির বা নির্দিষ্ট যুগের অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রাই হল সেই ভিত্তি যার ওপর গড়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট জাতিটির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইনের ধ্যান-ধারণা, শিল্পকলা, এমনকি তাদের ধর্মীয় ভাবধারা পর্যন্ত এবং সেই দিক থেকেই এগুলির ব্যাখ্যা করতে হবে, এতদিন যা করা হয়েছে সেভাবে উল্টো দিক থেকে নয়।

কিন্তু শুধু এই নয়। বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির এবং এই পদ্ধতি যে বুর্জোয়া সমাজ সৃষ্টি করেছে তার গতির বিশেষ নিয়মটিও মার্কস আবিষ্কার করেন। যে সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে এতদিন পর্যন্ত সব বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও সমাজতন্ত্রী সমালোচক উভয়েরই অনুসন্ধান

অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল, তার ওপর সহসা আলোকপাত হল বাড়তি মূল্য আবিষ্কারের ফলে।

একজনের জীবদ্দশার পক্ষে এরকম দুটো আবিষ্কারই যথেষ্ট। এমনকি এরকম একটা আবিষ্কার করতে পারার সৌভাগ্য যাঁর হয়েছে তিনিও ধন্য। কিন্তু মার্কস চর্চা করেছিলেন বহু বিষয় নিয়ে এবং কোনোটাই ওপর ওপর নয় — তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই, এমনকি গণিতশাস্ত্রেও তিনি স্বাধীন আবিষ্কার করে গেছেন।

এই হল বিজ্ঞানী মানুষটির রূপ। কিন্তু এটা তাঁর ব্যক্তিত্বের অর্ধেকও নয়। মার্কসের কাছে বিজ্ঞান ছিল এক ঐতিহাসিকভাবে গতিষ্ণু বিপ্লবী শক্তি। কোনো একটা তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের নতুন যে আবিষ্কার কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের কল্পনা করাও হয়ত তখনো পর্যন্ত অসম্ভব, তেমন আবিষ্কারকে মার্কস যত আনন্দেই স্বাগত জানান না কেন, তিনি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের আনন্দ পেতেন যখন কোনো আবিষ্কার শিল্প এবং সাধারণভাবে ঐতিহাসিক বিকাশে একটা আশু বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করছে। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎশক্তির ক্ষেত্রে যেসব আবিষ্কার হয়েছে তার বিকাশ এবং সম্প্রতি মার্সেল দেপ্রে-র আবিষ্কারগুলি তিনি খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করতেন।

কারণ মার্কস সবার আগে ছিলেন বিপ্লবী। তাঁর জীবনের আসল ব্রত ছিল পুঁজিবাদী সমাজ এবং এই সমাজ যেসব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে তার উচ্ছেদে কোনো না কোনো উপায়ে অংশ নেওয়া, আধুনিক প্রলেতারিয়েতের মুক্তিসাধনের কাজে অংশ নেওয়া, একে তিনিই প্রথম তার নিজের অবস্থা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে, তার মুক্তির শর্তাবলি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিলেন। তাঁর ধাতটাই ছিল সংগ্রাম। এবং যে আবেগ, যে অধ্যবসায় ও যতখানি সাফল্যের সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করতেন তার তুলনা মেলা ভার। প্রথম *Rheinische Zeitung* (১৮৪২) (৬৩), প্যারিসের *Vorwärts!* (১৮৪৪) (৬৪) পত্রিকা, *Deutsche-Brüsseler-Zeitung* (১৮৪৭) (৬৫), *Neue Rheinische Zeitung* (১৮৪৮-১৮৪৯),* *New-York Daily Tribune* (১৮৫২-১৮৬১) পত্রিকা (৬৬) এবং এছাড়া একরাশ

* এই খণ্ডের পৃঃ ৯৯-১১০ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

সংগ্রামী পুস্তিকা, প্যারিস, ব্রাসেল্‌স্‌ এবং লণ্ডনের সংগঠনে তাঁর কাজ এবং শেষে, সর্বোপরি মহান শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি গঠন — এটা এমন এক কীর্তি যে আর কোনো কিছু না করলেও শুধু এইটুকুর জন্যই এর প্রতিষ্ঠাতা খুবই গর্ববোধ করতে পারতেন।

এবং তাই, তাঁর কালের লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রোশ ও কুৎসার পাত্র হয়েছেন মার্কস। স্বেচ্ছাতন্ত্রী এবং প্রজাতন্ত্রী — দুধরনের সরকারই নিজ নিজ এলাকা থেকে তাঁকে নির্বাসিত করেছে। রক্ষণশীল বা উগ্র-গণতান্ত্রিক সব বুর্জোয়ারাই পাল্লা দিয়ে তাঁর দুর্নাম রটনা করেছে। এসব কিছুই তিনি ঠিক মাকড়শার ঝুলের মতোই ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন, উপেক্ষা করেছেন এবং যখন একান্ত প্রয়োজনবশে বাধ্য হয়েছেন একমাত্র তখনই এর জবাব দিয়েছেন। আর আজ সাইবেরিয়ার খনি থেকে কালিফোর্নিয়া পর্যন্ত, ইউরোপ ও আমেরিকার সব অংশে লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী সহকর্মীদের প্রীতির মধ্যে, শ্রদ্ধার মধ্যে, শোকের মধ্যে তাঁর মৃত্যু। আমি সাহস করে বলতে পারি যে মার্কসের বহু বিরোধী থাকতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত শত্রু তাঁর মেলা ভার।

যুগে যুগে অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর নাম, অক্ষয় থাকবে তাঁর কাজ!

১৮৮৩ সালের ১৭ মার্চ লণ্ডনের হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে এঙ্গেলসের ইংরেজীতে প্রদত্ত বক্তৃতা

১৮৮৩ সালের ২২ মার্চ *Der Sozialdemokrat* ১৩ নং পত্রিকায় জার্মান ভাষায় প্রকাশিত

পত্রিকার পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

মার্কস ও *Neue Rheinische Zeitung* (৬৭) (১৮৪৮-১৮৪৯)

আমরা যাকে জার্মান 'কমিউনিস্ট পার্টি' বলতাম, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আরম্ভে তা ছিল শুধু একটি স্বল্পসংখ্যকের কোষকেন্দ্র, ছিল গোপন প্রচারমূলক সমিতি হিশেবে সংগঠিত কমিউনিস্ট লীগ। সেই সময়ে জার্মানিতে সংঘ ও সভাসমিতির কোনো স্বাধীনতা ছিল না বলেই লীগকে গুপ্ত সংগঠন হতে হয়েছিল। বিদেশের বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থা থেকে লীগ তার সদস্য সংগ্রহ করত; এই সব সংস্থা ছাড়াও জার্মান দেশেই এর প্রায় ত্রিশটি সমিতি বা বিভাগ ছিল আর নানা জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে সদস্য ছিল। কিন্তু এই ক্ষুদ্র সংগ্রামী বাহিনীর ছিল একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা। তিনি মার্কস। সবাই স্বেচ্ছায় তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিত। আর তাঁরই দৌলতে লীগ নীতি ও রণকৌশলের এমন এক কর্মসূচি পেয়েছিল যার তাৎপর্য আজো পর্যন্ত পুরোপুরি বজায় আছে। সে কর্মসূচি **'কমিউনিস্ট ইশতেহার'**।

এখানে সর্বাগ্রে কর্মসূচির রণকৌশলের অংশটুকু নিয়েই আমাদের আগ্রহ। তার সাধারণ প্রতিপাদ্য হল এই:

'শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য পার্টিগুলির প্রতিপক্ষ হিশেবে কমিউনিস্টরা স্বতন্ত্র পার্টি গঠন করে না।

সমগ্রভাবে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র কোনো স্বার্থ তাদের নেই।

প্রলেতারীয় আন্দোলনকে রূপ দেওয়া বা গড়ে পিটে তোলার জন্য তারা নিজস্ব কোনো গোষ্ঠীগত নীতি খাড়া করে না।

শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য পার্টি থেকে কমিউনিস্টদের তফাতটা শুধু এই: (১) নানা দেশের শ্রমিকদের জাতীয় সংগ্রামের ভিতর তারা **জাতি-নির্বিশেষে** সারা প্রলেতারিয়েতের **সাধারণ স্বার্থটার** দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাকেই

সামনে টেনে আনে; (২) বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইকে যে বিভিন্ন **পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে হয় তার মধ্যে** তারা সর্বদা ও সর্বত্র **সমগ্র আন্দোলনের স্বার্থের** প্রতিনিধিত্ব করে।

সুতরাং কমিউনিস্টরা হল একদিকে **কার্যক্ষেত্রে** প্রতি দেশের শ্রমিক পার্টিগুলির সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অংশ — যে অংশ অন্যান্য সবাইকে সামনে ঠেলে নিয়ে যায়। অপরদিকে, **তত্ত্বের দিক দিয়ে** শ্রমিক শ্রেণীর অধিকাংশের তুলনায় তাদের এই সুবিধা যে শ্রমিক আন্দোলনের এগিয়ে যাওয়ার পথ, শর্ত এবং শেষ সাধারণ ফলাফল সম্বন্ধে তাদের স্বচ্ছবোধ রয়েছে।'*

আর জার্মান পার্টি সম্পর্কে বিশেষ করে বলা হয়েছিল:

'জার্মানিতে বুর্জোয়ারা যখন বিপ্লবী অভিযান করে তখনই কমিউনিস্টরা তাদের সঙ্গে একত্রে লড়ে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, সামন্ত জমিদারতন্ত্র এবং পেটি বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে।

কিন্তু বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে যে বৈর বিরোধ বর্তমান তার যথাসম্ভব স্পষ্ট স্বীকৃতিটা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সঞ্চার করার কাজ থেকে তারা মুহূর্তের জন্যও বিরত হয় না; এইজন্য যাতে, বুর্জোয়া শ্রেণী নিজ আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আসতে বাধ্য, জার্মান শ্রমিকেরা যেন তৎক্ষণাৎ তাকেই বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিশেবে ব্যবহার করতে পারে; এইজন্যই যাতে, জার্মানিতে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির পতনের পর যেন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধেই অবিলম্বে লড়াই শুরু হতে পারে।

কমিউনিস্টরা প্রধানত জার্মানির দিকে মন দিচ্ছে কারণ দেশে একটি বুর্জোয়া বিপ্লব আসন্ন,' ইত্যাদি ('ইশতেহার', চতুর্থ পরিচ্ছেদ**)।

এই রণকৌশলগত কর্মসূচি যে পরিমাণ ন্যায্য প্রতিপন্ন হয়েছে তা আর কোনো কর্মসূচি হয় নি। বিপ্লবের প্রাক্কালে ঘোষিত হয়ে এটি সে বিপ্লবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তারপর থেকে যখনই শ্রমিকদের কোনো

---

* এই উদ্ধৃতিটিতে মোটা হরফ এঙ্গেলসের। এই সংস্করণের প্রথম খণ্ডের ১৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** এই সংস্করণের প্রথম খণ্ডের ১৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

পার্টি তাদের কাজকর্মে এর থেকে বিচ্যুত হয়েছে তখনই প্রতিটি বিচ্যুতির শাস্তিও তারা পেয়েছে। আর আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরেও এটি মাদ্রিদ থেকে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ পর্যন্ত ইউরোপের সব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সচেতন শ্রমিক পার্টির পথের নিশানা হয়ে রয়েছে।

প্যারিসের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনাবলির (৬৮) ফলে জার্মানির আসন্ন বিপ্লব ত্বরান্বিত হল আর তাতে করে সে বিপ্লবের চরিত্র গেল বদলে। নিজস্ব ক্ষমতাবলে জয়লাভ করার বদলে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী জয়ী হল ফরাসী শ্রমিক বিপ্লবের টানে। পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বীদের অর্থাৎ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-মালিকানা, আমলাতন্ত্র ও কাপুরুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চূড়ান্ত ফয়সালা করতে পারার আগেই তাকে এক নতুন শত্রুর অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের সম্মুখীন হতে হল। কিন্তু ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের তুলনায় জার্মানির অনেক পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আর তা থেকে উদ্ভূত তার সমান পশ্চাৎপদ শ্রেণী-সম্পর্কের ফল সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল।

জার্মান বুর্জোয়া তখন সবেমাত্র তার বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রে নিজের নিঃশর্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার শক্তি বা সাহস কোনোটাই তার ছিল না, আর তা করার কোনো চূড়ান্ত প্রয়োজনীয়তাও ছিল না। প্রলেতারিয়েতও সমান অপরিণত। তারা বেড়ে উঠেছিল পরিপূর্ণ মানসিক দাসত্বের মধ্যে। তারা ছিল অসংগঠিত; স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ে তোলার মতো ক্ষমতাও তাদের তখনো হয় নি। বুর্জোয়ার স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থের গভীর বিরোধ সম্বন্ধে কেবল একটা ঝাপসা অনুভূতি তাদের ছিল। তাই মূলত বুর্জোয়ার ভয়াবহ প্রতিপক্ষ হলেও তারা তখনো বুর্জোয়ার রাজনৈতিক অনুষঙ্গ হিশেবেই রইল। জার্মান প্রলেতারিয়েত তখন যা ছিল তাই দেখা নয় বরং ভবিষ্যতে সে যা হয়ে উঠবে বলে ভয় ছিল এবং ফরাসী প্রলেতারিয়েত তখনই যা হয়ে উঠেছে, তাই দেখে ভয় পেয়ে বুর্জোয়ারা মনে করল যে, তার পরিত্রাণের একমাত্র পথ হল রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে কোনো ধরনের একটা আপস, তা সে আপস যতই কাপুরুষোচিত হোক না কেন। প্রলেতারিয়েত তখনো নিজের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা জানত না বলে প্রথমে তাদের বেশির ভাগকে নিয়ে তারা বুর্জোয়াদের অতি-অগ্রণী চরম বামপন্থী অংশের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয়। জার্মান শ্রমিকদের

সবচেয়ে বড়ো কাজ ছিল শ্রেণীগত পার্টি হিশেবে স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ার জন্য তাদের যেসব অধিকার অপরিহার্য সেগুলি অর্থাৎ মুদ্রণ, সংগঠন আর সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা অর্জন করা। নিজের শাসন ক্ষমতার স্বার্থেই এইসব অধিকারের জন্য লড়াই করা বুর্জোয়ার উচিত ছিল; কিন্তু শ্রমিকদের ভয়ে এখন সে এদের এইসব অধিকারের বিরোধিতা করতে থাকল। যে বিরাট জনসংখ্যাকে অকস্মাৎ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল তাদের মধ্যে দু'-একশত ছাড়া লীগসদস্য হারিয়ে গেল। জার্মান প্রলেতারিয়েত এইভাবে রাজনৈতিক রঙ্গভূমিতে প্রথম অবতীর্ণ হল চরম গণতান্ত্রিক পার্টি হিশেবে।

আমরা যখন জার্মানিতে এক বৃহৎ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করলাম তখন নিশান কী হবে তা এই থেকেই স্থির হয়ে গেল। সে নিশান একমাত্র গণতন্ত্রের নিশান হওয়াই সম্ভব ছিল। কিন্তু সেটা এমন এক গণতন্ত্র যা সর্বত্র ও সর্বক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুলবে তার বিশিষ্ট প্রলেতারীয় চরিত্র যেটা কিন্তু তখনো তার পতাকায় চিরকালের মতো উৎকীর্ণ করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। আমরা যদি তা না করতাম, আন্দোলনে যোগ দিতে, তার তখনই বর্তমান সবচেয়ে অগ্রণী, কার্যত প্রলেতারীয় দিকটার পক্ষ নিয়ে তা আরো এগিয়ে দিতে না চাইতাম তাহলে আমাদের পক্ষে ক্ষুদ্র প্রাদেশিক এক-পাতা কাগজে কমিউনিজম প্রচার করা আর বিরাট সক্রিয় এক পার্টির বদলে অতি ক্ষুদ্র এক সংকীর্ণ সম্প্রদায় গড়া ছাড়া আর কিছু করার থাকত না। কিন্তু বিজনে প্রচারকের ভূমিকা আমাদের জন্য নয়। ইউটোপীয়দের আমরা যে এত ভালো করে পড়েছিলাম, নিজেদের কর্মসূচিও রচনা করলাম, সেটা এই উদ্দেশ্যে নয়।

আমরা যখন কলোনে এলাম তখনো আংশিকভাবে গণতন্ত্রীদের, আর আংশিকভাবে কমিউনিস্টদের কাজ চলল এক বৃহৎ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কলোনের সংকীর্ণ স্থানীয় সংবাদপত্রে তা পরিণত করে আমাদের বার্লিনে পাঠাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রধানত মার্কসেরই চেষ্টায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করে নিই আর সংবাদপত্রটি আমাদের হয়ে দাঁড়ায়। এর বদলে আমাদের **হাইনরিখ ব্যুরগের্সকে** সম্পাদকমণ্ডলীতে নিতে হয়েছিল। তিনি (দ্বিতীয় সংখ্যায়) **একটি** প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তারপর আর কোনোদিন লেখেন নি।

বার্লিন নয়, বিশেষ করে কলোনই আমাদের প্রয়োজন ছিল। প্রথমত, কলোনই রাইন প্রদেশের কেন্দ্র। রাইন প্রদেশ ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গেছে, 'কোড নেপোলিয়ন' মারফত আধুনিক অধিকার-জ্ঞান আয়ত্ত করেছে, নিজস্ব বৃহৎ শিল্প গড়ে তুলেছে, আর সবদিক দিয়েই তা তখন জার্মানির সবচেয়ে অগ্রণী অংশ। নিজেদের পর্যবেক্ষণ থেকেই আমরা সমসাময়িক বার্লিনকে খুব ভালো করেই চিনতাম। তার বুর্জোয়া তখন সবেমাত্র জন্মগ্রহণ করছে। তার তোষামুদে পেটি বুর্জোয়ার মুখে খুব দুঃসাহস, কিন্তু কাজে তারা কাপুরুষ, আর শ্রমিক শ্রেণী তখনো পর্যন্ত মোটেই বিকাশলাভ করে নি, অসংখ্য আমলাতন্ত্রী, অভিজাত ও দরবারী জঞ্জাল সেখানে। তার পুরো চরিত্রই হল কেবল 'রেসিডেন্সের' মতো। কিন্তু চূড়ান্ত কথা হল: বার্লিনে তখন ঘৃণ্য প্রুশীয় ল্যান্ডর‍্যাখট* বলবৎ রয়েছে আর পেশাদার বিচারকেরা রাজনৈতিক মামলার বিচার করছেন। রাইনে 'কোড নেপোলিয়ন' বলবৎ ছিল, তাতে মুদ্রণ সংক্রান্ত কোনো মামলার প্রশ্নই ছিল না, কারণ আগে থেকেই এতে সেন্সর ব্যবস্থার কথা ধরে নেওয়া হয়েছিল। আর আইন না ভেঙে রাজনৈতিক অপরাধ করলে জুরীর সামনে হাজির হতে হত। বার্লিনে বিপ্লবের পরে তরুণ শ্লেফেল বাজে কারণে এক বছরের জন্য দণ্ডিত হন। কিন্তু রাইনে আমরা মুদ্রণের শর্তহীন স্বাধীনতা উপভোগ করতাম — আর সেই স্বাধীনতা শেষ বিন্দু পর্যন্ত কাজে লাগাতাম।

এইভাবে ১৮৪৮ সালের ১ জুন আমরা খুব অল্প শেয়ার ক্যাপিটাল নিয়ে সংবাদপত্র প্রকাশের কাজ শুরু করলাম; এবং শেয়ার-হোল্ডারেরা বিশ্বাসী ছিল না। প্রথম সংখ্যার পরই তাদের অর্ধেক আমাদের পরিত্যাগ করল আর মাসের শেষে একজনও আর রইল না।

সম্পাদকমণ্ডলীর গঠনতন্ত্র পরিণত হল মার্কসের একনায়কত্বে। বড়ো একটা দৈনিক সংবাদপত্র যাকে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হতে হবে, সেখানে অন্য কোনো ধরনের সংগঠনে স্বীয় নীতির সুসঙ্গত প্রচার সম্ভব নয়। তাছাড়া এ প্রশ্নে আমাদের কাছে মার্কসের একনায়কত্ব ছিল কেমন স্বতঃসিদ্ধ তর্কাতীত, আমরা সবাই সাগ্রহে তা মেনে নিয়েছিলাম। মূলত তাঁর

* ল্যান্ডর‍্যাখট — সাবেকী সামন্ত আইন। — সম্পাঃ

স্বচ্ছদৃষ্টি আর দৃঢ় মনোভাবের জন্যই এই পত্রিকাটি বিপ্লবের বছরগুলিতে সবচেয়ে নাম করা জার্মান সংবাদপত্র হয়ে দাঁড়ায়।

Neue Rheinische Zeitung পত্রিকার রাজনৈতিক কর্মসূচিতে দুটো মূলকথা ছিল:

একটি একক অখণ্ড গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্র আর রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ, পোল্যাণ্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সহ।

সেসময়ে পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্র দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল: উত্তর-জার্মান, — গণতান্ত্রিক এক প্রুশীয় সম্রাটকে মেনে নিতে আপত্তি ছিল না এদের; আর দক্ষিণ-জার্মান, সেসময়ে প্রায় পুরোপুরিভাবে ও নির্দিষ্টভাবে বাদেনীয় — এরা সুইজারল্যাণ্ডের অনুকরণে জার্মানিকে একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করতে চাইত। উভয়ের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই করতে হল। জার্মানির প্রুশীকরণ আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে তার বিভাগ চিরস্থায়ী করা, দুটোই প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের পক্ষে সমান ক্ষতিকর ছিল। এই স্বার্থরক্ষার জন্য জার্মানিকে চূড়ান্তভাবে একটি **জাতি** হিশেবে ঐক্যবদ্ধ করা একান্ত জরুরী হয়ে উঠেছিল। একমাত্র এর ফলেই চিরাচরিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্ত বাধা প্রতিবন্ধক থেকে মুক্ত এমন এক যুদ্ধক্ষেত্রের সৃষ্টি হত যেখানে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার পরস্পরের শক্তি যাচাই করার কথা। কিন্তু প্রাশিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবন্ধনও ছিল প্রলেতারীয় স্বার্থের একান্ত বিরোধী। জার্মানির বিপ্লবের পক্ষে সত্যকারের একমাত্র যে অভ্যন্তরীণ শত্রুকে উচ্ছেদ করা উচিত ছিল সে হল সমস্ত ব্যবস্থাধারা, সমস্ত ঐতিহ্য ও রাজবংশসহ প্রুশীয় রাষ্ট্র, আর তাছাড়া, জার্মানিকে বিভক্ত করে জার্মান অস্ট্রিয়াকে বাদ দিয়ে তবেই শুধু প্রাশিয়া জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারত। প্রুশীয় রাষ্ট্র ধ্বংস ও অস্ট্রীয় রাষ্ট্র চূর্ণ করে প্রজাতন্ত্র হিশেবে জার্মানির সত্যকারের ঐক্যসাধন, এছাড়া আমাদের আর কোনো আশু বিপ্লবী কর্মসূচি থাকতে পারত না। এবং রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের মাধ্যমে, একমাত্র সেই মাধ্যমেই এ কাজ করা যেত। আমি আবার পরে একথায় ফিরে আসব।

সাধারণত আড়ম্বর, গুরুগাম্ভীর্য বা উল্লাসের সুর ছিল না কাগজটিতে। আমাদের বিরোধীরা ছিল সম্পূর্ণই ঘৃণ্য আর বিনা ব্যতিক্রমে তাদের সকলের প্রতিই ছিল আমাদের চরম ঘৃণা। ষড়যন্ত্রকারী রাজতন্ত্র, দরবারী

চক্র, অভিজাততন্ত্র, *Kreuz-Zeitung* (৬৯)—সমগ্র সম্মিলিত 'প্রতিক্রিয়া', যাদের সম্পর্কে কূপমণ্ডূকেরা নৈতিক বিরক্তি বোধ করে থাকে, তাদের প্রতি শুধু ব্যঙ্গ ও উপহাস নিক্ষেপ করতাম আমরা। বিপ্লবের মাধ্যমে রঙ্গমঞ্চে যেসব নতুন পুজ্যজনদের আবির্ভাব ঘটেছিল, অর্থাৎ মার্চ মন্ত্রীবর্গ (৭০), ফ্রাংকফুর্ট ও বার্লিন পরিষদ (৭১) এবং সেখানকার দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয় অংশ, তাদের সম্পর্কেও আমাদের আচরণ ছিল একই। প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধেই ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টের* অকিঞ্চিৎকরতাকে, তার দীর্ঘ বক্তৃতার অনাবশ্যকতাকে, তার ভীরু প্রস্তাবাবলির উদ্দেশ্যহীনতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছিল। তার মূল্য হিশেবে আমাদের শেয়ার-হোল্ডারদের অর্ধেককে হারাতে হয়। ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টকে এমনকি একটা বিতর্ক ক্লাবও বলা যেত না, সেখানে প্রায় কোনো বিতর্কই হত না, প্রধানত সেখানে শুধু আগে থেকে তৈরি করা পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধ পাঠ হত এবং এমন সব প্রস্তাব গৃহীত হত যার উদ্দেশ্য ছিল জার্মান কূপমণ্ডূকদের অনুপ্রেরণা দেওয়া, তবে কেউই সেদিকে দৃষ্টিপাত করত না।

বার্লিন পরিষদের গুরুত্ব এর চেয়ে বেশি ছিল, তাদের বিরুদ্ধে ছিল সত্যিকারের এক শক্তি। শুধু হাওয়ায়, ফ্রাংকফুর্টের মেঘাতীত উচ্চতায় তারা বিতর্ক ও প্রস্তাব গ্রহণ করত না। তাই এদের দিকে বেশি মন দেওয়া হত। কিন্তু সেখানেও শুল্টসে-ডেলিচ, বেরেন্ড্স, এলস্নার, স্টাইন প্রভৃতি বামপন্থীদের পুজ্যজনদের প্রতিও ফ্রাংকফুর্টের পুজ্যজনদের মতোই তীব্র আক্রমণ চালানো হত; তাদের দৃঢ়তার অভাব, ভীরুতা এবং তুচ্ছ হিসাবীপনাকে নির্মমভাবে উদ্ঘাটন করা হত এবং তারা কীভাবে আপস মারফত ধাপে ধাপে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে তা প্রমাণ করে দেওয়া হত। এর ফলে স্বভাবতই গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ারা ত্রাস বোধ করত, এই পুজ্যজনদের তারা সবে সৃষ্টি করেছিল নিজের প্রয়োজনেই। তবে এ আতঙ্কে বোঝা গেল আমাদের বাণ ঠিক লক্ষ্যেই বিঁধেছে।

মার্চের দিনগুলির সঙ্গে সঙ্গেই নাকি বিপ্লব শেষ হয়ে গেছে, আর এখন শুধু তার ফল হস্তগত করা বাকি এই বলে পেটি বুর্জোয়া পরম উৎসাহের সঙ্গে যে বিভ্রান্তি প্রচার করেছিল আমরা তার বিরুদ্ধেও সমান

* ফ. এঙ্গেলস, 'ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্ট' দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

প্রতিবাদ জানাই। আমাদের কাছে ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ সত্যকার বিপ্লবের তাৎপর্য লাভ করত তখনই যদি সেটা একটি দীর্ঘ বিপ্লবী আন্দোলনের শেষ না হয়ে শুরু হত, মহান ফরাসী বিপ্লবের মতো যার মধ্য দিয়ে জনগণ তাদের নিজেদের সংগ্রামের ধারায় বিকশিত হয়ে উঠত আর পার্টিগুলি ক্রমশ আরো তীক্ষ্নভাবে পৃথক হয়ে বড়ো বড়ো শ্রেণীগুলির সঙ্গে অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণী, পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী আর প্রলেতারীয় শ্রেণীর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে যেত আর প্রলেতারিয়েত একাধিক লড়াইয়ের মধ্যে একটির পর একটি পৃথক অবস্থান জয় করে নিত। সুতরাং, আমরা সবাই তো একই জিনিস চাই, সব পার্থক্যের একমাত্র কারণ হল ভুল বোঝাবুঝি, এই বাঁধাবুলির সাহায্যে গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়া যখনই প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে তার শ্রেণী-বিরোধের কথা চাপা দিতে চাইত তখনই আমরা সর্বত্র তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতাম। কিন্তু পেটি বুর্জোয়াকে আমরা আমাদের প্রলেতারীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা করার সুযোগ যতই কম দিতাম, আমাদের সম্পর্কে তারা ততই নিরীহ এবং আপসমুখী হয়ে উঠত। যতই তীব্র ও দৃঢ়ভাবে তাদের বিরোধিতা করা যায় ততই তারা নম্র হয়ে ওঠে এবং শ্রমিকদের পার্টিকে ততই সুবিধাদান করতে থাকে। এ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হয়ে উঠেছি।

শেষত, আমরা বিভিন্ন তথাকথিত জাতীয় পরিষদের পার্লামেণ্টীয় ক্রেটিনিজম (মার্কসের ভাষায়) উদ্‌ঘাটন করে দিতাম। এই ভদ্রমহোদয়রা ক্ষমতার সব মাধ্যমই হাতছাড়া হয়ে যেতে দিয়েছিলেন — অংশত স্বেচ্ছায় — সেগুলিকে সরকারের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে। বার্লিন ও ফ্রাঙ্কফুর্টে নতুন শক্তিপ্রাপ্ত প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের পাশাপাশি ছিল শক্তিহীন পরিষদগুলি। তারা কল্পনা করত যে, তাদের অক্ষম প্রস্তাবাবলি পৃথিবী উলটিয়ে দেবে। চরম বামপন্থী পর্যন্ত সকলেই ছিল এই নির্বোধ আত্মপ্রতারণার শিকার। আমরা তাদের বার বার বলতাম, তাদের পার্লামেণ্টীয় জয়ই হবে কার্যত তাদের যুগপৎ পরাজয়।

আর বার্লিন ও ফ্রাঙ্কফুর্ট দু'জায়গাতেই ঠিক তাই ঘটল। 'বামপন্থীরা' সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার পরিষদকে ভেঙে দিল। সরকার যে এ কাজ করতে পারল তার কারণ হল পরিষদ জনগণের আস্থা হারিয়েছিল।

পরে আমি মারাত সম্পর্কে বুজারের বই পড়ে দেখতে পাই যে, একাধিক ব্যাপারে আমরা না জেনে সত্যিকারের 'Ami du Peuple'-এর (৭২) (রাজতন্ত্রীদের নকল 'জনগণের বন্ধু' নয়) মহান আদর্শ অনুকরণ করেছিলাম এবং যে ক্রুদ্ধ গর্জন ও ইতিহাস বিকৃতির ফলে প্রায় এক শতাব্দী ধরে সবাই সম্পূর্ণ বিকৃত এক মারাতের পরিচয় পেয়ে এসেছিল, তার একমাত্র কারণ হল মারাত নির্মমভাবে সেই মুহূর্তের পূজ্যজনদের অর্থাৎ লাফায়েৎ, বায়ি ও অন্যান্যদের মুখোশ টেনে খুলে দিয়েছিলেন এবং দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, তারা ইতিমধ্যেই বিপ্লবের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতক হয়ে উঠেছে। তাছাড়া আমাদের মতো তিনিও এ ঘোষণা চান নি যে, বিপ্লব শেষ হয়েছে, বরং তিনি চেয়েছিলেন বিপ্লব অবিরাম চলুক।

আমরা খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করলাম যে, আমরা যে ধারার প্রতিনিধি সে ধারা আমাদের পার্টির আসল লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগ্রাম শুরু করতে পারবে একমাত্র তখনই যখন জার্মানির সমস্ত সরকারী পার্টিগুলির মধ্যে সবচেয়ে চরমপন্থী পার্টিটি ক্ষমতায় আসবে। তখন আমরা হয়ে উঠব তার বিরোধী দল।

কিন্তু ঘটনাচক্রে দাঁড়াল এই যে, আমাদের জার্মান বিরোধীদের ব্যঙ্গ করা ছাড়াও জ্বলাময়ী আবেগও ঝংকৃত হয়ে উঠল। ১৮৪৮ সালের জুন মাসে প্যারিসের শ্রমিকদের বিদ্রোহ যখন শুরু হয় ততক্ষণে আমরা ঘাঁটি নিয়ে বসেছি। প্রথম গুলিবর্ষণ থেকেই আমরা দৃঢ়ভাবে বিদ্রোহীদের পক্ষ নিলাম। তাদের পরাজয়ের পর মার্কস একটি অত্যন্ত জোরালো প্রবন্ধে পরাজিতদের স্মৃতিতে অঞ্জলি দেন।*

আমাদের অবশিষ্ট শেয়ার-হোল্ডাররাও তখন আমাদের পরিত্যাগ করল। কিন্তু আমরা সন্তুষ্ট এই যে আমাদের পত্রিকা সারা জার্মানি ও প্রায় সারা ইউরোপে একমাত্র পত্রিকা ছিল যে বিধ্বস্ত প্রলেতারিয়েতের পতাকা উচ্চে তুলে ধরেছিল এমন এক মুহূর্তে যখন সব দেশের বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া পরাজিতদের উদ্দেশে কদর্য গালি বর্ষণ করছে।

আমাদের বৈদেশিক নীতি ছিল সরল: প্রতিটি বিপ্লবী জাতির পক্ষ

---

* কার্ল মার্কস, 'জুন বিপ্লব' দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

সমর্থন এবং ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার শক্তিশালী দুর্গ রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিপ্লবী ইউরোপের এক সাধারণ যুদ্ধের জন্য আহ্বান। ২৪ ফেব্রুয়ারি (৭৩) থেকে আমাদের কাছে একথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বিপ্লবের সত্যকারের ভয়ংকর শত্রু মাত্র **একটি** — রাশিয়া, এবং আন্দোলন যতই সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ছে, সংগ্রামে নামার প্রয়োজনীয়তা এ শত্রুর পক্ষে তত অদম্য হয়ে উঠছে। ভিয়েনা, মিলান ও বার্লিনের ঘটনাবলির ফলে রুশ আক্রমণ অবশ্য বিলম্বিত হবার কথা, কিন্তু বিপ্লব রাশিয়ার যত কাছে এগিয়ে আসছে সেই আক্রমণের অপরিহার্যতা ততই সুনিশ্চিত হয়ে উঠছে। কিন্তু যদি জার্মানিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানো যেত তাহলে হাপস্‌বুর্গ এবং হয়েনট্‌সলার্নের শেষ হত এবং বিপ্লব সর্বত্র জয়ী হত।

রুশীরা যখন সত্যি হাঙ্গেরি আক্রমণ করল, সেই মুহূর্ত পর্যন্ত সংবাদপত্রের প্রতিটি সংখ্যায় এই নীতি বিধৃত ছিল। এই আক্রমণ আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী পুরোপুরি প্রমাণ করল এবং সুনিশ্চিত করল বিপ্লবের পরাজয়।

১৮৪৯ সালের বসন্তকালে, যখন চূড়ান্ত সংগ্রামের দিন ঘনিয়ে আসছে তখন প্রতি সংখ্যায় সংবাদপত্রটির সুর তীব্র এবং আবেগদীপ্ত হয়ে উঠতে থাকল। 'সাইলেসিয়া মিলিয়ার্ড'-এ (৮টি প্রবন্ধ) **ভিলহেল্ম ভলফ** সাইলেসিয়ার কৃষকদের মনে করিয়ে দিলেন যে, তারা যখন সামন্ততান্ত্রিক অধীনতা থেকে মুক্তি পায় তখন সরকারের সাহায্যে জমিদাররা কীভাবে তাদের টাকা ও জমির ব্যাপারে ঠকিয়েছিল এবং তিনি দাবি করলেন যে, ক্ষতিপূরণ হিশেবে শত কোটি টেলার দিতে হবে।

এইসঙ্গে, এপ্রিল মাসে, **মার্কসের** 'মজুরি-শ্রম ও পুঁজি'* লেখাটি কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত হয়ে আমাদের নীতির সামাজিক লক্ষ্য স্পষ্টভাবে নির্ধারিত করে দিল। যে বিরাট সংগ্রামের প্রস্তুতি চলছিল, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি এবং হাঙ্গেরিতে যে বিরোধ তীব্রতর হয়ে উঠছিল, প্রতি সংখ্যায় ও প্রতি বিশেষ সংখ্যায় তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। বিশেষ করে এপ্রিল ও মে মাসের বিশেষ সংখ্যাগুলিতে ছিল জনগণের উদ্দেশে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান।

---

* এই সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

আমরা যে ৮০০০ দুর্গসৈন্য ও কারাগার সম্বলিত প্রথম শ্রেণীর এক প্রুশীয় দুর্গের মধ্যে এমন নির্ভয়ে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতাম তাতে জার্মানির সর্বত্র বিস্ময় প্রকাশ করা হত। কিন্তু সম্পাদকদের ঘরে ৮টি বন্দুক ও ২৫০টি কার্তুজ এবং কম্পোজিটরদের লাল জ্যাকোবিন টুপির (৭৪) দরুন আমাদের বাড়িও অফিসারদের কাছে এমন এক দুর্গ বলে প্রতীয়মান হত যা নেহাৎ হানা দিয়ে অধিকার করা সম্ভব নয়।

অবশেষে এল ১৮৪৯ সালের ১৮ মে তারিখের আঘাত।

ড্রেসডেন এবং এলবারফেল্ডে বিদ্রোহ দমিত হল, ইসারলোহুন বেষ্টিত হল; রাইন প্রদেশ এবং ওয়েস্টফালিয়া সৈন্যে প্লাবিত হয়ে উঠল। প্রুশীয় রাইনল্যান্ড ধর্ষণের পর তাদের পেলট্‌নেট ও বাডেনের বিরুদ্ধে পাঠানোর কথা। অবশেষে তখন সরকার আমাদের দিকে এগোবার সাহস পেল। সম্পাদকমণ্ডলীর অর্ধেককে অভিযুক্ত করা হল, বাকি অর্ধেক অ-প্রুশীয় বলে নির্বাসিত হলেন। এর বিরুদ্ধে কিছু করা অসম্ভব ছিল, কেননা সরকারের পেছনে রয়েছে পুরো একটা সৈন্যবাহিনী। আমাদের দুর্গ সমর্পণ করতে হল। কিন্তু আমরা পিছু হটে এলাম আমাদের অস্ত্রশস্ত্র রসদ সঙ্গে নিয়ে, ব্যান্ড বাজিয়ে, শেষ লাল সংখ্যার পতাকা উড়িয়ে; তাতে আমরা নিষ্ফল অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কলোনের শ্রমিকদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিলাম:

'আপনারা যে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন তার জন্য *Neue Rheinische Zeitung*-এর সম্পাদকরা বিদায়কালে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছে। চিরকাল এবং সর্বত্র তাদের শেষ কথা হবে: **শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি।**'

এইভাবে অস্তিত্বের এক বছর পূর্ণ হওয়ার কিছু আগে *Neue Rheinische Zeitung* পত্রিকার অবসান হল। প্রায় কোনো আর্থিক সম্বল ছাড়াই এটি শুরু হয়েছিল — আমি আগেই বলেছি যে, সামান্য যেটুকুর প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল তা-ও আসে নি, — কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই তার প্রচারসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজারে গিয়ে পৌঁছেছিল। কলোনের অবরুদ্ধ অবস্থার ফলে এটি বন্ধ হয়ে যায়। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি আবার তাকে গোড়া থেকে শুরু করতে হয়। কিন্তু ১৮৪৯ সালের মে মাসে যখন কাগজটি বন্ধ করে দেওয়া হল তখন তার গ্রাহকসংখ্যা আবার ছ'হাজারে

গিয়ে পৌঁছেছিল, যে ক্ষেত্রে *Kölnische Zeitung* পত্রিকার (৭৫) নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারেই গ্রাহকসংখ্যা ন'হাজারের বেশি ছিল না। *Neue Rheinische Zeitung*-এর মতো ক্ষমতা ও প্রভাব, তথা প্রলেতারীয় জনগণকে প্রদীপ্ত করে তোলার সামর্থ্য পরে বা আগে কোনো জার্মান সংবাদপত্রের হয় নি।

এবং এর জন্য সে ঋণী সর্বাগ্রে **মার্কসের** কাছে।

যখন আঘাত এল, সম্পাদকীয় বিভাগের সবাই ছড়িয়ে পড়লেন। **মার্কস** প্যারিসে গেলেন — সেখানে নাটকের যে শেষ অঙ্কের প্রস্তুতি চলছিল তা অনুষ্ঠিত হল ১৮৪৯ সালের ১৩ জুন তারিখে (৭৬); এখন, যখন ওপর থেকে ভেঙে যাওয়া বা বিপ্লবে যোগ দেওয়া এই দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নেওয়ার সময় হল ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের, তখন **ভিলহেল্ম ভলফ** পরিষদে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন, আর আমি পেলট্নেটে গিয়ে ভিলিখের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে (৭৭) অ্যাডজুট্যান্ট হলাম।

১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি এবং মার্চ মাসের গোড়ায় লিখিত

১৮৮৪ সালের ১৩ মার্চ *Der Sozialdemokrat* ১১ নং পত্রিকায় প্রকাশিত

স্বাক্ষর: **ফ. এঙ্গেলস**

সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত

জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কমিউনিস্ট লীগের ইতিহাস প্রসঙ্গে (৭৮)

১৮৫২ সালে (৭৯), কলোনের কমিউনিস্টদের দণ্ডাদেশের সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম যুগের উপর যবনিকা পড়ল। আজ এ যুগের কথা প্রায় সবাই ভুলে গেছে। কিন্তু ১৮৩৬ সাল থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এ যুগ, এবং বিদেশে জার্মান শ্রমিকদের বিস্তারলাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমস্ত সংস্কৃতিমান দেশেই আন্দোলন অবারিত হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়। বর্তমান আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন মূলগতভাবে সে যুগের জার্মান শ্রমিক আন্দোলনেরই সরাসরি ক্রমানুবর্তন। সেটি ছিল সাধারণভাবে **প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন,** এবং পরে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিতে যাঁরা নেতৃত্ব করছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই এসেছিলেন এর ভেতর থেকে। আর কমিউনিস্ট লীগ ১৮৪৭ সালের 'কমিউনিস্ট ইশতেহারের'* যে তাত্ত্বিক মূলনীতি তার পতাকায় লিখে নিয়েছিল তা আজো ইউরোপ ও আমেরিকা উভয় মহাদেশের সমগ্র প্রলেতারীয় আন্দোলনের দৃঢ়তম আন্তর্জাতিক বন্ধন হয়ে রয়েছে।

এখন পর্যন্ত এই আন্দোলনের সুসংবদ্ধ ইতিহাসের মূল উৎস একটিই পাওয়া গেছে। এটি হল তথাকথিত কালা কিতাব, ভেমুর্ট ও স্টিবার লিখিত 'ঊনবিংশ শতাব্দীর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র', বার্লিন, দুই খণ্ড, ১৮৫৩ ও ১৮৫৪। এই স্থূল সংকলনটি ইচ্ছাকৃত বহু মিথ্যাভাষণে পূর্ণ। আমাদের শতকের সবচেয়ে ঘৃণ্য ও জঘন্য দুজন পুলিশ এটি উদ্ভাবন করেছে। তবু সে যুগ সম্পর্কে অ-কমিউনিস্ট সমস্ত রচনার আদি উৎস এখনো এটিই।

---

* এই সংস্করণের ১ খণ্ড, ১৪১-১৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

আমি এখানে শুধু সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনাই দিতে পারি এবং তাও যে পরিমাণে লীগের কথা আসে কেবল সেই পরিমাণে এবং 'স্বরূপ প্রকাশ' বোঝার জন্য যেটুকু একান্ত প্রয়োজন শুধু সেটুকুই। আশা করি, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের যৌবনের সেই গৌরবময় পর্বের ইতিহাস সম্পর্কে আমি ও মার্কস যে মূল্যবান তথ্যাবলি সংগ্রহ করেছি তা গুছিয়ে তোলার সুযোগ আমি হয়ত কোনোদিন পাব।

* * *

জার্মান দেশান্তরীগণ কর্তৃক ১৮৩৪ সালে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক-প্রজাতন্ত্রী গুপ্ত 'বিধিবহির্ভূতদের' লীগ থেকে সবচেয়ে চরমপন্থী ও প্রধানত প্রলেতারীয় অংশটি ১৮৩৬ সালে আলাদা হয়ে গিয়ে নতুন একটি গুপ্ত সংগঠন, **ন্যায়নিষ্ঠদের লীগ** গঠন করল। আদি যে সংগঠনে বাকি ছিল কেবল ইয়াকব ভেনেডে-র মতো অতি নিষ্কর্মারা, সেটির শীঘ্রই পুরোপুরি মৃত্যু হল: ১৮৪০ সালে যখন পুলিশ জার্মানিতে এদের কয়েকটি শাখা খুঁজে বের করে তখন তাদের আসল চেহারার ছায়াটুকু পর্যন্ত প্রায় অবশিষ্ট নেই। কিন্তু নতুন লীগটি তুলনামূলকভাবে দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকল। বাব্যেফবাদ (৮০) ধারার সঙ্গে যুক্ত যে ফরাসী শ্রমিক কমিউনিজম এই সময়ে প্যারিসে গড়ে উঠছিল, এটি গোড়ায় ছিল তারই জার্মান অংশবিশেষ; 'সাম্যের' অপরিহার্য ফল হিশেবে সম্পত্তির সাধারণ মালিকানা দাবি করা হত। উদ্দেশ্য ছিল সে যুগের প্যারিসের গুপ্ত সংগঠনগুলির মতোই: অর্ধেক প্রচারমূলক সংগঠন, অর্ধেক ষড়যন্ত্রমূলক। তবে প্যারিসকেই বরাবর বিপ্লবী কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল হিশেবে ধরা হত, যদিও সুযোগ এলে জার্মানিতেও অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি বাদ যেত না। কিন্তু প্যারিস চূড়ান্ত যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে রইল বলে লীগ সে যুগে আসলে ফরাসী গুপ্ত সংগঠনের, বিশেষ করে ব্লাঙ্কি ও বার্বে পরিচালিত যে Société des saisons-এর* সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখত, তার জার্মান শাখার বেশি কিছু হয়ে ওঠে নি। ১৮৩৯ সালে ১২ মে ফরাসীরা অভ্যুত্থান শুরু করল। লীগের শাখারাও এগিয়ে যায় তাদের সঙ্গে এবং তাদের সঙ্গেই একত্রে সাধারণ পরাজয় বরণ করে (৮১)।

* ঋতু সমিতি। — সম্পাঃ

যেসব জার্মান গ্রেপ্তার হল তাদের মধ্যে ছিলেন **কার্ল শাপার** ও **হাইনরিখ বাউয়েরও**। বেশ দীর্ঘদিন কারাবাসের পর তাঁদের নির্বাসন দিয়ে তুষ্টি লাভ করল লুই ফিলিপের সরকার। দুজনেই লণ্ডনে চলে গেলেন। শাপার এসেছিলেন নাসাউয়ের ওয়েলবুর্গ থেকে। ১৮৩২ সালে তিনি যখন গিয়েসেনে বনবিদ্যা কলেজের ছাত্র তখনই গিওর্গ ব্যুখনার পরিচালিত ষড়যন্ত্রমূলক সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৩৩ সালের ৩ এপ্রিল ফ্রাঙ্কফুর্টের পুলিশ-ফাঁড়ি (৮২) আক্রমণে অংশ নেন, তারপর বিদেশে পালিয়ে যান এবং ১৮৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাৎসিনির স্যাভয় (৮৩) অভিযানে যোগ দেন। ৩০-এর দশকে যেসব পেশাদার বিপ্লবীর কিছুটা ভূমিকা ছিল, তিনি ছিলেন তাদের নিদর্শনস্বরূপ — দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ, যে কোনো মুহূর্তে জীবন সম্পদ এমনকি জীবনটাই বিপন্ন করতে তৈরি এক বীরপুরুষ। চিন্তাধারায় কিছুটা আলস্য থাকা সত্ত্বেও গভীর তাত্ত্বিক উপলব্ধির ক্ষমতাও তাঁর ছিল, তার প্রমাণ 'ডেমাগগ' (৮৪) থেকে তিনি রূপান্তরিত হলেন কমিউনিস্টে, এবং একবার যে জিনিসটা স্বীকার করে নিলেন তা আঁকড়ে রইলেন আরো অটলভাবে। ঠিক এই কারণেই সময়ে সময়ে তাঁর বিপ্লবী উদ্দীপনা বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে যেত। তবে সবক্ষেত্রেই তিনি পরে নিজের ভুল বুঝতেন এবং খোলাখুলিভাবে তা স্বীকার করতেন। তিনি ছিলেন বিরাট পুরুষ আর জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের আদি সংগঠনের কাজে তাঁর অবদান কোনোদিনই ভোলার নয়।

ফ্রাঙ্কনিয়ার হাইনরিখ বাউয়ের জুতা তৈরি করতেন। সজীব, সজাগ ও রসিক তরুণ। কিন্তু তাঁর ক্ষুদ্র দেহে অনেকখানি চাতুর্য ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাও লুকিয়ে ছিল।

প্যারিসে শাপার কম্পোজিটারের কাজ করতেন। লণ্ডনে এসে তিনি ভাষা শিক্ষক হিশেবে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা শুরু করলেন। আর দুজনেই লেগে গেলেন ছিন্ন সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে। লণ্ডনকে তাঁরা লীগের কেন্দ্র করে তুললেন। এখানে, হয়ত বা আরো আগে প্যারিসেই, তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন কলোনের ঘড়ি নির্মাতা **জোসেফ মল্**। মাঝারি আকারের, হার্কিউলিসের মতো চেহারা তাঁর। কতবার যে শাপার ও তিনি হলের দরজায় দাঁড়িয়ে শতখানেক বিরোধীর আক্রমণ রুখেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

উৎসাহ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার দিক থেকে তিনি তাঁর দুই কমরেডেরই সমতুল্য আর বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে উভয়েরই ঊর্ধ্বে। শুধু এই নয় যে তিনি একজন আজন্ম কূটনীতিক, যার প্রমাণ হয়ে যায় বিভিন্ন দৌত্যে তাঁর অসংখ্য সফরের সাফল্য থেকে। তাত্ত্বিক সমস্যায়ও তাঁর সামর্থ্য ছিল বেশি। ১৮৪৩ সালে লণ্ডনে এই তিনজনেরই সঙ্গে আমার আলাপ হয়। এঁরাই হলেন আমার দেখা প্রথম বিপ্লবী প্রলেতারীয়। সেসময় খুঁটিনাটি বিষয়ে আমাদের যতই মত পার্থক্য থাকুক না কেন — তাঁদের সংকীর্ণ সমতাবাদী কমিউনিজমের* বিপরীতে আমার ছিল ঠিক সমান সংকীর্ণ দার্শনিক ঔদ্ধত্য — এই সত্যকারের মানুষ তিনটি আমার মনে যে গভীর ছাপ এঁকে দিয়েছিলেন সেকথা কোনোদিন ভুলব না আমি, যে আমি তখন সবে মানুষ হতে চাইছি।

লণ্ডনে, এবং আরেকটু কম মাত্রায় সুইজারল্যাণ্ডে, তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ও সভাসমিতি করার স্বাধীনতা উপভোগ করতেন। ১৮৪০ সালের ৭ ফেব্রুয়ারিতেই জার্মান শ্রমিকদের শিক্ষা-সমিতি নামে আইনসঙ্গত সংগঠন হল। এটি এখনও আছে (৮৫)। এই সমিতি লীগে নতুন সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্র হিশেবে কাজ করত, এবং বরাবরের মতো এখানেও কমিউনিস্টরাই সমিতির সবচেয়ে সক্রিয় ও বুদ্ধিমান সদস্য ছিল বলে স্বাভাবিকভাবেই তার নেতৃত্ব পুরোপুরিভাবে গিয়ে পড়ল লীগের হাতে। কিছুদিনের মধ্যেই লণ্ডনে লীগের কয়েকটি সমিতি, বা তখনো পর্যন্ত তাদের যা বলা হত 'লজ' গড়ে উঠল। সুইজারল্যাণ্ডে ও অন্যান্য জায়গাতেও ঠিক একই স্বতঃসিদ্ধ নীতি অনুসরণ করা হল। যেখানে শ্রমিকদের সমিতি গড়া সম্ভব হত, সেখানেই সেগুলিকে একইভাবে কাজে লাগানো হত। যেখানে সমিতি গড়া বেআইনী ছিল সেখানে গায়ক সঙ্ঘ, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে যোগ দেওয়া হত। যোগাযোগ রক্ষা করা হত প্রধানত এমন সব সদস্য দিয়ে যারা অনবরত যাতায়াত করত। প্রয়োজন হলে তারা দূত হিশেবেও কাজ করত। সরকারের বিচক্ষণতা লীগকে উভয় ব্যাপারেই খুব সাহায্য করত। কারণ, নির্বাসনদণ্ড প্রয়োগ করে সরকার যে কোনো আপত্তিজনক শ্রমিককেই দূতে পরিণত

* আগেই বলেছি সমতাবাদী কমিউনিজম বলতে আমি বুঝি শুধুমাত্র সেই কমিউনিজম যার একমাত্র বা প্রধান ভিত্তি হল সমতার দাবি। (এঙ্গেলসের টীকা।)

করত। আর এই ধরনের শ্রমিকদের দশজনের মধ্যে ন'জনই ছিল লীগের সদস্য।

পুনঃস্থাপিত লীগ বেশ বিস্তারলাভ করল। বিশেষত সুইজারল্যাণ্ডে ভেইটলিং, আগস্ট বেকার (খুবই প্রতিভাবান লোক, কিন্তু অন্যান্য বহু জার্মানের মতো চরিত্রের অভ্যন্তরীণ দৃঢ়তার অভাবে এঁরও সর্বনাশ হয়) এবং অন্যান্যরা মোটামুটিভাবে ভেইটলিং-এর কমিউনিস্ট ব্যবস্থার অনুগামী একটা খুবই শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুললেন। ভেইটলিং-এর কমিউনিজমের সমালোচনা করার জায়গা এটা নয়। কিন্তু জার্মান প্রলেতারিয়েতের প্রথম স্বাধীন তাত্ত্বিক আলোড়ন হিশেবে তাৎপর্যের কথা বলতে গিয়ে মার্ক্স ১৮৪৪ সালে প্যারিসে *Vorwärts* পত্রিকায় যা লিখেছিলেন তা আমি আজো সমর্থন করি। মার্ক্স লিখেছিলেন: '(জার্মান) বুর্জোয়া তথা তার দার্শনিকবৃন্দ ও পণ্ডিতবর্গ বুর্জোয়ার মুক্তির বিষয়ে — তার রাজনৈতিক মুক্তির বিষয়ে — এমন কোন রচনা হাজির করতে পারে যা ভেইটলিং-এর 'সামঞ্জস্য ও স্বাধীনতার গ্যারাণ্টি' বইটির সঙ্গে তুলনীয়? জার্মান শ্রমিকদের এই অতুলনীয় ও উজ্জ্বল প্রথম প্রচেষ্টার সঙ্গে জার্মান রাজনৈতিক সাহিত্যের একঘেয়ে ভীরু মাঝারিপনার তুলনা করলে, প্রলেতারিয়েতের শিশুকালের এই বিরাট পাদুকার সঙ্গে বুর্জোয়ার ক্ষয়প্রাপ্ত রাজনৈতিক পাদুকার বামনাকারের তুলনা করলে এ ভবিষ্যদ্বাণী করতেই হবে যে, এই সিণ্ডারেলার দেহ হবে মল্লবীরোচিত।' এই মল্লবীর আজ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যদিও পূর্ণ অবয়ব পেতে তার এখনো দেরি আছে।

জার্মানিতেও লীগের অনেক শাখা ছিল। স্বভাবতই এগুলির প্রকৃতি ছিল অস্থায়ী। কিন্তু যতগুলি ভেঙে যেত তার চেয়ে গড়ে উঠত অনেক বেশি। সাত বছর পরেই কেবল ১৮৪৬ সালের শেষে পুলিশ বার্লিনে (মেণ্টেল) ও মাগডেবুর্গ (বেক) লীগের অস্তিত্বের চিহ্ন পায়, কিন্তু আর বেশি খোঁজ বার করতে পারে নি।

প্যারিস থেকে সুইজারল্যাণ্ডে যাবার আগে ভেইটলিংও সেখানে লীগের বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে একত্রিত করলেন। তিনি ১৮৪০ সালেও প্যারিসে ছিলেন।

লীগের কেন্দ্র ছিল দর্জিরা। সুইজারল্যান্ড, লন্ডন, প্যারিস — সর্বত্রই জার্মান দর্জিদের দেখা মিলত। প্যারিসে দর্জিদের মধ্যে জার্মান ভাষার প্রচলন এত বেশি ছিল যে, ১৮৪৬ সালে সেখানে আমার এমন একজন নরওয়েজীয় দর্জির সঙ্গে আলাপ হয় যিনি ট্রন্ধজেম থেকে সোজা সমুদ্রপথে ফ্রান্সে এসেছেন এবং ১৮ মাসে ফরাসী ভাষার প্রায় একটা কথাও না শিখলেও জার্মান শিখেছেন অতি চমৎকার। ১৮৪৭ সালে প্যারিসে সমিতিগুলির মধ্যে দুটি ছিল প্রধানত দর্জিদের নিয়ে তৈরি আর একটি আসবাব-বানিয়ে সূত্রধরদের নিয়ে।

ভারকেন্দ্র প্যারিস থেকে লন্ডনে সরে আসার পর একটা নতুন বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠল: জার্মান লীগ ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠল **আন্তর্জাতিক**। শ্রমিক সমিতিতে জার্মান এবং সুইস ছাড়া আরো এমন সব জাতির লোক দেখা যেত যাদের প্রধানত জার্মান ভাষার মাধ্যমেই বিদেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হত — অর্থাৎ স্ক্যান্ডিনেভীয়, ওলন্দাজ, হাঙ্গেরীয়, চেক, দক্ষিণ স্লাভ এবং রুশ ও আলসেসীয়দেরও। ১৮৪৭ সালে নিয়মিত যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে রক্ষিবাহিনীর ইউনিফর্ম পরিহিত একজন ব্রিটিশ গ্রিনেডিয়ারও ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সমিতির নাম দাঁড়াল **কমিউনিস্ট** শ্রমিক শিক্ষা-সমিতি। আর সদস্যদের কার্ডে 'সব মানুষই ভাই' এই কথাটি লেখা থাকত অন্তত বিশটি ভাষায়, অবশ্য দু'-চারটে ভুল যে তাতে থাকত না তা নয়। প্রকাশ্য সমিতিটির মতো গুপ্ত লীগের চরিত্রও কিছুদিনের মধ্যেই আরো আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করল। প্রথম দিকে সেটা অবশ্য সীমাবদ্ধ অর্থে: কার্যক্ষেত্রে — সদস্যদের বিভিন্ন জাতিসত্তার মারফত, আর তত্ত্বের ক্ষেত্রে — এই উপলব্ধির মাধ্যমে যে, যে কোনো বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হতে গেলে তা ইউরোপীয় বিপ্লব হওয়া চাই। তখন পর্যন্ত আর বেশি দূর এগোনো যায় নি, কিন্তু ভিত্তিটা পাতা ছিল।

ফরাসী বিপ্লবীদের সঙ্গে লীগের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা হল লন্ডনস্থ দেশান্তরীদের, ১৮৩৯ সালের ১২ মে তারিখের সংগ্রামসঙ্গীদের মাধ্যমে। র‍্যাডিকেল-পন্থী পোলদের সঙ্গেও তেমনি যোগাযোগ রাখা হত। পোলীয় দেশান্তরী বলে যাঁরা সরকারীভাবে পরিচিত তাঁরা এবং মাৎসিনি অবশ্য আমাদের বন্ধুর বদলে বরং বিরোধীই ছিলেন। ইংরেজ চার্টিস্টদের

আন্দোলনের বিশিষ্ট ইংরেজ চরিত্রের দরুন তাঁদের অবিপ্লবী বলে উপেক্ষা করা হত। অনেক পরে, আমার মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে লীগের লন্ডনস্থ নেতাদের যোগাযোগ হয়।

ঘটনাবলির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দিকেও লীগের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছিল। তখনো পর্যন্ত প্যারিসকে — সেকালের পক্ষে সঙ্গত কারণেই — বিপ্লবের উৎসস্থল বলে মনে করা হলেও প্যারিসের ষড়যন্ত্রকারীদের উপর নির্ভরশীলতা ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছিল। লীগের বিস্তারলাভের ফলে তার আত্মসচেতনতাও বৃদ্ধি পেল। বোঝা গেল যে, জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে লীগের ভিত্তি ক্রমেই দৃঢ় হয়ে উঠছে আর উত্তর ও পূর্ব ইউরোপের শ্রমিকদের পতাকাবাহী রূপে কাজ করার ঐতিহাসিক নির্বন্ধ এসে পড়েছে এই জার্মান শ্রমিকদের উপর। ভেইটলিং-এর মধ্যে এমন একজন কমিউনিস্ট তাত্ত্বিককে পাওয়া গিয়েছিল যাঁকে অসংকোচে তাঁর সমসাময়িক ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বীদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেওয়া যেত। আর শেষ কথা, ১২ মে-র অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই জিনিসটা শিখেছিলাম যে, বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে তখনকার মতো কোনো ফল হবে না। তবু যে প্রতি ঘটনাকেই আসন্ন ঝড়ের সংকেত বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হত, তবু যে পুরনো আধা-ষড়যন্ত্রমূলক নিয়মাবলিই অক্ষুণ্ণ রাখা হত, তা ছিল প্রধানত পুরনো বিপ্লবীদের একগুঁয়েমির দোষ, যার সঙ্গে ক্রমশ উদীয়মান সঠিকতর মতবাদের সংঘর্ষ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক, লীগের সামাজিক মতবাদ অনির্দিষ্ট হলেও তার মস্ত বড়ো একটা গলদ ছিল, যার মূল ছিল তখনকার পরিস্থিতির মধ্যেই। সদস্যদের মধ্যে যারা শ্রমিক তারা প্রায় সবাই ছিল হস্তশিল্পী। বড়ো বড়ো শহরগুলিতেও সাধারণত ক্ষুদ্র মালিকই তাদের শোষণ করত। দর্জির হস্তশিল্পকে একজন বৃহৎ পুঁজিপতির স্বার্থে চালানো একটা গার্হস্থ্য শিল্পে পরিণত করে বৃহদাকারে দর্জিবৃত্তি, অর্থাৎ যাকে এখন বলা হয় তৈরি পোশাকের উৎপাদন, সেরূপ শোষণ এমনকি লন্ডনেও তখন সবে শুরু হচ্ছে। একদিকে এই কারিগরদের শোষণ করত ক্ষুদ্র মালিক। অন্যদিকে তারা প্রত্যেকেই আশা রাখত যে, শেষে তারা নিজেরাই ক্ষুদ্র মালিক হয়ে উঠবে। তার উপর সেসময়ে জার্মান হস্তশিল্পীদের মনে

উত্তরাধিকার-সূত্রে-প্রাপ্ত বহু গিল্ডযুগীয় ধারণাও থেকে গিয়েছিল। তারা তখনো পুরোপুরি প্রলেতারীয় হয়ে ওঠে নি, তখন পর্যন্ত তারা ছিল পেটি বুর্জোয়ার উপাঙ্গ মাত্র। এই উপাঙ্গটি তখন আধুনিক প্রলেতারিয়েতে রূপান্তরিত হচ্ছে, কিন্তু বুর্জোয়া অর্থাৎ বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে সরাসরিভাবে তখন পর্যন্ত দাঁড়ায় নি। তাহলেও এই হস্তশিল্পীরা যে সহজাত প্রবৃত্তিবশে নিজেদের ভবিষ্যৎ বিকাশের ধারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং পূর্ণ সচেতনতার সঙ্গে না হলেও নিজেদের যে তারা প্রলেতারিয়েতের পার্টি হিশেবে সংগঠিত করতে পেরেছিল, সেইজন্যই তাদের সর্বোচ্চ সম্মান প্রাপ্য। কিন্তু তখনকার সমাজকে খুঁটিনাটিতে সমালোচনা করতে গেলেই অর্থাৎ অর্থনৈতিক তথ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গেলেই তাদের হস্তশিল্পসুলভ পুরনো সব কুসংস্কার প্রতিপদেই যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, সেটাও অনিবার্য। আর আমার বিশ্বাস হয় না যে, পুরো লীগের মধ্যে তখন এমন একজন লোকও ছিলেন যিনি অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে একটি বইও পড়েছেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু এসে যেত না। তখনকার মতো 'সমতা', 'ভ্রাতৃত্ব' ও 'ন্যায়'-এর সাহায্যে তারা তাত্ত্বিক সব বাধা পার হয়ে যেত।

ইতিমধ্যে লীগের ও ভেইটলিং-এর কমিউনিজমের পাশাপাশি আরেকটি মূলগতভাবে আলাদা ধরনের কমিউনিজম বিকাশলাভ করছিল। আমি যখন ম্যাঞ্চেস্টারে ছিলাম তখন আমায় ঠেকে শিখতে হয় যে, এতদিন পর্যন্ত যদিও অর্থনৈতিক তথ্যাবলি ইতিহাস রচনায় কোনোও স্থানই পায় নি বা নিতান্ত তুচ্ছ স্থানই পেয়েছে, তবু, অন্তত আধুনিক জগতে তা এক নির্ধারক ঐতিহাসিক শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে; এই অর্থনৈতিক তথ্যাবলিই হল আজকের দিনের শ্রেণীবিরোধ উদ্ভবের ভিত্তি; বৃহৎ শিল্পের কল্যাণে যেসব দেশে এইসব শ্রেণীবিরোধ পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে, সুতরাং বিশেষভাবে ইংলণ্ডে, সেসব দেশে তা আবার রাজনৈতিক পার্টিগঠনের ও পার্টি-সংঘাতের, আর তার ফলে সব রাজনৈতিক ইতিহাসেরও ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কসও এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলেন শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যেই *Deutsche-Französische Jahrbücher*-এ (১৮৪৪) (৮৬) তিনি তার এই মর্মে সাধারণীকরণ হাজির করেন যে, সাধারণভাবে বলতে গেলে রাষ্ট্র

নাগরিক সমাজকে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে না বরং সমাজই রাষ্ট্রকে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেইহেতু অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও তার বিকাশ থেকেই রাজনীতি ও তার ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করতে হবে, বিপরীতভাবে নয়। ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে আমি প্যারিসে মার্কসের সঙ্গে দেখা করি তখন তত্ত্বগত সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাদের পূর্ণ মতৈক্য পরিষ্কার হয়ে উঠল। আর তখন থেকেই শুরু হয় আমাদের মিলিত কাজ। ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে ব্রাসেল্‌সে আবার যখন আমাদের দেখা হয় তার মধ্যেই মার্কস উপরিউক্ত ভিত্তি থেকে ইতিহাসের বস্তুবাদী তত্ত্বকে তার প্রধান দিকগুলিতে পুরোপুরি বিকশিত করে তুলেছেন। এবার আমরা এই নব-অর্জিত দৃষ্টিভঙ্গিকে বিভিন্নতম দিকে বিশদে সংরচিত করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম।

এই যে আবিষ্কারটি ইতিহাসবিজ্ঞানে বিপ্লব এনেছিল, সেটা আমরা দেখেছি প্রধানত মার্কসেরই কীর্তি, এতে আমি খুবই নগণ্য অংশই দাবি করতে পারি। তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনে কিন্তু এ আবিষ্কারের একটা প্রত্যক্ষ গুরুত্বও ছিল। ফরাসী ও জার্মানদের মধ্যে কমিউনিজমকে, ইংরেজদের মধ্যে চার্টিস্টবাদকে তখন আর মনে হল না এমন এক আকস্মিক ঘটনা বলে, যা একই ভাবে না-ও ঘটতে পারত। এখন বোঝা গেল যে, এইসব আন্দোলন হল আধুনিক শোষিত শ্রেণী, প্রলেতারিয়েতের আন্দোলন, শাসক শ্রেণী, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে তার ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় সংগ্রামের ন্যূনাধিক বিকশিত বিভিন্ন রূপ, শ্রেণী-সংগ্রামের রূপ, কিন্তু আগেকার সব শ্রেণী-সংগ্রামের সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে, সমগ্রভাবে সমাজকে শ্রেণী-বিভাগ থেকে এবং ফলত শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে মুক্ত না করে আজকের দিনের শোষিত শ্রেণী, প্রলেতারিয়েত নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। এখন আর কমিউনিজমের মানে কল্পনার সাহায্যে যতদূর সম্ভব নিখুঁত এক আদর্শ সমাজ বানিয়ে তোলা নয়, এখন কমিউনিজমের মানে দাঁড়াল প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের প্রকৃতি, শর্তাবলি আর তদনুযায়ী সংগ্রামের সাধারণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি।

আমাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে, নতুন এইসব বৈজ্ঞানিক ফলাফল মস্ত মস্ত বইয়ে শুধু 'পণ্ডিত' মহালকে জানানো হবে। আমাদের মত ছিল

ঠিক বিপরীত । ইতিমধ্যে আমরা উভয়েই রাজনৈতিক আন্দোলনে বেশ গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়েছি, শিক্ষিত মহলে, বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানির শিক্ষিত মহলে, আমাদের বেশ কিছু সমর্থকও ছিল, আর সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে ছিল প্রচুর যোগাযোগ। আমাদের মতবাদের বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি রচনা করা আমাদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতকে এবং প্রথমত জার্মান প্রলেতারিয়েতকে আমাদের মতে টেনে আনার গুরুত্বও কিছু কম ছিল না। আমাদের ধারণা নিজেদের কাছে পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কাজ শুরু করে দিলাম। আমরা ব্রাসেল্‌সে একটি জার্মান শ্রমিক সমিতি (৮৭) গড়লাম আর *Deutsche-Brüsseler-Zeitung* পত্রিকা তুলে নিলাম নিজেদের হাতে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব পর্যন্ত এ পত্রিকাটি আমাদের মুখপত্র হিশেবে কাজ করেছে। চার্টিস্ট আন্দোলনের কেন্দ্রীয় মুখপত্র *The Northern Star* (৮৮) পত্রিকার সম্পাদক জুলিয়ান হার্নি-র মাধ্যমে আমরা এই আন্দোলনের বিপ্লবী অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। ঐ পত্রিকায় আমিও লিখতাম। ব্রাসেল্‌স্‌ গণতন্ত্রীদের সঙ্গেও (মার্কস ছিলেন গণতান্ত্রিক সমিতির (৮৯) সহসভাপতি) আর *Réforme*-এর (৯০) ফরাসী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গেও আমরা এক ধরনের জোট গড়ে তুলেছিলাম। *Réforme* পত্রিকায় আমি ইংরেজী ও জার্মান আন্দোলনের খবর সরবরাহ করতাম। সংক্ষেপে বলা যায়, র‍্যাডিকেল ও প্রলেতারীয় সংগঠনাদি ও তাদের মুখপত্রগুলির সঙ্গে আমাদের আশানুরূপ যোগাযোগই ছিল।

ন্যায়নিষ্ঠদের লীগের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল নিম্নরূপ: ঐ লীগের অস্তিত্বের কথা আমরা অবশ্য জানতাম; ১৮৪৩ সালে শাপার প্রস্তাব করেছিলেন যেন আমি ঐ লীগে যোগ দিই। আমি স্বভাবতই তখন রাজি হই নি। কিন্তু লন্ডনবাসীদের সঙ্গে নিয়মিত চিঠিপত্রের আদান-প্রদান তো আমরা চালাতামই; উপরন্তু প্যারিস গোষ্ঠীগুলির তদানীন্তন নেতা ডাঃ এভেরবেকের সঙ্গে রেখেছিলাম আরো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। লীগের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে না গিয়েও আমরা গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনারই খবর রাখতাম। অন্যদিকে, মৌখিক আলাপে, চিঠিপত্রে আর প্রেসের মাধ্যমে আমরা লীগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের তাত্ত্বিক মতামতের

উপর প্রভাব বিস্তার করতাম। এই উদ্দেশ্যে আমরা লিথোগ্রাফ করা নানা সার্কুলারেরও সাহায্য নিতাম, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেগুলি আমরা সারা পৃথিবীতে আমাদের বন্ধু ও পত্রদাতাদের কাছে পাঠিয়ে দিতাম যখন প্রশ্ন উঠত নির্মীয়মাণ কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে। কখনো কখনো এইসব সার্কুলারে লীগের আলোচনাও থাকত। যেমন, একজন তরুণ ওয়েস্টফালীয় ছাত্র হের্মান ক্রিগে আমেরিকায় গিয়ে সেখানে লীগের দূত হয়ে দাঁড়ায় এবং পাগলাটে হ্যারো হ্যারিঙের সঙ্গে যোগ দেয়। লীগের মাধ্যমে দক্ষিণ আমেরিকাকে উল্টে দেবার জন্য একটা সংবাদপত্র (৯১) প্রতিষ্ঠা করে তাতে সে লীগের নামে প্রচার করতে থাকল এক 'প্রেমভিত্তিক', প্রেমে ভরপুর, প্রেমের স্বপ্নে ভাবালু কমিউনিজম। এর বিরুদ্ধে একটা সার্কুলার ছাড়ি আমরা, তার ফলও হল।* লীগের মঞ্চ থেকে ক্রিগে অন্তর্হিত হল।

পরে ভেইটলিং ব্রাসেল্সে আসেন। কিন্তু যে সরল তরুণ সহকারী দর্জি একদিন নিজের প্রতিভায় নিজেই বিস্মিত হয়ে কমিউনিস্ট সমাজ ঠিক কেমন দেখতে হবে সেটা নিজের মনের কাছে পরিষ্কার করে নেবার চেষ্টা করেছিল, সে ভেইটলিং আর নেই। এখন তিনি একজন মহাপুরুষ, যাঁর শ্রেষ্ঠত্বের দরুন হিংসুটেরা তাঁর পেছনে লাগে, সর্বত্রই যিনি প্রতিদ্বন্দ্বী, গুপ্ত শত্রু আর ফাঁদের সন্ধান পান, দেশ থেকে দেশান্তরে বিতাড়িত এক পয়গম্বর; মর্ত্যলোকে স্বর্গ রচনার তৈরি দাওয়াই রয়েছে তাঁর কাছে আর তাঁর বদ্ধমূল ধারণা সবাই নাকি সেটি তাঁর কাছ থেকে চুরি করে নিতে চায়। লন্ডনে লীগের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর ইতিমধ্যেই মনোমালিন্য হয়ে গেছে। ব্রাসেল্সে মার্কস ও তাঁর স্ত্রী প্রায় অমানুষিক সহ্যশক্তি নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানেও কারুর সঙ্গে তাঁর বনিবনাও হল না। তাই কিছুদিন পরেই তিনি আমেরিকায় চলে যান তাঁর পয়গম্বরী ভূমিকাটা সেখানে যাচাই করে দেখার জন্য।

লীগের মধ্যে, বিশেষত লন্ডনস্থ নেতাদের মধ্যে যে নীরব বিপ্লব সাধিত হচ্ছিল তা এইসব পরিস্থিতিতে সুগম হয়। কমিউনিজমের

* ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস, 'ক্রিগের বিরুদ্ধে সার্কুলার'। — সম্পাঃ

পূর্ববর্তী সব ফরাসী সহজ সমতাবাদী ধারা আর ভেইটলিঙের কমিউনিজম এই উভয় ধারণার অপ্রতুলতাই ক্রমশ তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ভেইটলিঙের লেখা 'দরিদ্র পাপীর সুসমাচার' বইটির কয়েকটি অংশ যতই প্রতিভাদীপ্ত হোক না কেন, তিনি যে আদিম খ্রীষ্টীয় ধর্ম থেকে কমিউনিজম টানতে চান তার ফলে সুইজারল্যাণ্ডে আন্দোলন প্রথমে আলব্রেখ্‌টের মতো বোকাদের হাতে আর পরে কুলমানের মতো লোভী প্রবঞ্চক পয়গম্বরদের হাতে অনেকখানি চলে যায়। কিছু সাহিত্যিক যে 'খাঁটি সমাজতন্ত্রের' কথা প্রচার করেছিলেন — অর্থাৎ বিকৃত হেগেলীয় জার্মান ভাষায় ফরাসী সমাজতন্ত্রী বুলির এই যে অনুবাদ ও ভাবপ্রবণ প্রেমস্বপ্ন ('কমিউনিস্ট ইশতেহারে'* জার্মান বা 'খাঁটি' সমাজতন্ত্রের অংশ দ্রষ্টব্য) ক্রিগে ও তৎসংশ্লিষ্ট চর্চার মাধ্যমে লীগের মধ্যে চালু হয়েছিল, তা অচিরেই লীগের পুরনো বিপ্লবীদের কাছে বিরক্তিকর বোধ হল আর কিছুর জন্য না হলেও অন্তত তার লোল অক্ষমতার জন্য। আগেকার তাত্ত্বিক মতামতের অনুত্তীর্ণতা এবং সে মতামত থেকে উদ্ভূত ব্যবহারিক ভ্রান্তির জন্য লণ্ডনে ক্রমেই বেশি করে উপলব্ধি ঘটল যে, মার্কস ও আমার নতুন তত্ত্ব সঠিক। এ উপলব্ধি নিশ্চয় আরো সুগম হয়েছিল এইজন্য যে, লণ্ডনের নেতাদের মধ্যে তখন এমন দুজন লোক ছিলেন যাঁরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের সামর্থ্যে পূর্বোল্লিখিত সবার অনেক ঊর্ধ্বে। এঁরা হলেন: হিলব্রনের মিনিয়েচর শিল্পী কার্ল ফেণ্ডার আর থুরিঙ্গিয়ার দর্জি গেওর্গ একারিয়স।**

মোটকথা, ১৮৪৭ সালের বসন্তকালে মল্ ব্রাসেল্‌সে মার্কসের সঙ্গে আর ঠিক তার পরই প্যারিসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন আর তাঁর

---

* এই সংস্করণের ১ খণ্ড, ১৪১-১৭৯ পৃঃ। — সম্পাঃ

** প্রায় আট বছর আগে লণ্ডনে ফেণ্ডারের মৃত্যু হয়। আশ্চর্যরকম সূক্ষ্ম মেধা ছিল তাঁর। কৌতুকপ্রিয়, ব্যঙ্গপটু ও দ্বন্দ্ববাদী লোক ছিলেন তিনি। আমরা জানি যে, একারিয়স পরে বহু বছর শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। এই সাধারণ পরিষদে অন্যান্যদের মধ্যে লীগের নিম্নলিখিত পুরনো সদস্যরাও ছিলেন: একারিয়স, ফেণ্ডার, লেসনার, লখনার, মার্কস ও আমি। একারিয়স পরে পুরোপুরিভাবে ইংলণ্ডের ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

কমরেডদের তরফ থেকে আরেকবার আমাদের লীগে যোগদানের আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি জানালেন যে, তাঁরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাধারণ যথার্থতা এবং লীগের পুরনো ষড়যন্ত্রমূলক ঐতিহ্য ও রূপ থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমান নিঃসন্দেহ হয়েছেন। আমরা যদি লীগে যোগ দিই তাহলে একটি ইশতেহারে লীগের কংগ্রেসের সামনে আমাদের সমালোচনামূলক কমিউনিজম ব্যাখ্যা করার সুযোগ আমাদের দেওয়া হবে। তারপর এই ইশতেহারটি লীগের ইশতেহার হিশেবে প্রকাশিত হবে। সেই সঙ্গে অচল লীগ সংগঠনের বদলে নতুন, যুগ ও আদর্শের উপযোগী সংগঠন গড়ার ব্যাপারেও আমরা হাত লাগাতে পারব।

এ ব্যাপারে আমাদের কোনোই সন্দেহ ছিল না যে, শুধু প্রচারের উদ্দেশ্যে হলেও জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে একটা সংগঠন থাকা প্রয়োজন, আর সে সংগঠন যেহেতু কেবল স্থানীয় চরিত্রের হবে না তাই তার পক্ষে এমনকি জার্মানির বাইরেও গুপ্ত সংগঠনই হওয়া সম্ভব। লীগ ছিল ঠিক এইরকমই এক সংগঠন। এ লীগের যেসব ব্যাপারে আগে আমাদের আপত্তি ছিল তা এখন লীগের প্রতিনিধিরা নিজেরাই ভুল বলে পরিত্যাগ করছেন। এমনকি তার সংগঠনের কাজেও সহযোগিতা করতে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হল। 'না' বলা চলত কি? নিশ্চয়ই না। সুতরাং আমরা লীগে যোগ দিলাম। আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে মার্কস ব্রাসেল্সে লীগের একটি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করলেন আর আমি প্যারিসের তিনটি গোষ্ঠীতে উপস্থিত থাকতাম।

১৮৪৭ সালের গ্রীষ্মকালে লন্ডনে লীগের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভলফ ব্রাসেল্সের আর আমি প্যারিসের গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিশেবে ছিলাম। এই কংগ্রেসে প্রথমেই লীগের পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। ষড়যন্ত্রমূলক কালপর্বের সেই পুরনো রহস্যময় যেসব নাম তখনো ছিল, সেগুলি তুলে দেওয়া হল; এখন গোষ্ঠী, চক্র, পরিচালক চক্র, কেন্দ্রীয় কমিটি ও কংগ্রেস নিয়ে লীগ গঠিত হল আর এখন থেকে লীগের নাম হল 'কমিউনিস্ট লীগ'। প্রথম ধারায় বলা হয়: 'লীগের উদ্দেশ্য হল বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ, প্রলেতারিয়েতের শাসন, শ্রেণী-বিরোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত পুরনো বুর্জোয়া সমাজের বিলোপ আর শ্রেণীহীন

ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিবিহীন এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা।'* সংগঠনটি ছিল পুরোপুরি গণতান্ত্রিক, তার কমিটিগুলি ছিল নির্বাচনমূলক ও যে কোনো সময় অপসারণীয়। শুধু এর ফলেই ষড়যন্ত্রের আকাঙ্ক্ষায় বাধা পড়ল কারণ তার জন্য চাই একনায়কত্ব। আর অন্ততপক্ষে সাধারণ শান্তির সময়ের জন্য লীগ সম্পূর্ণভাবে একটি প্রচারমূলক সমিতিতে রূপান্তরিত হল। এখন যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হল তা এতই গণতান্ত্রিক ছিল যে এই নতুন নিয়মাবলি বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির আলোচনার্থে পেশ করা হয়, তারপর দ্বিতীয় কংগ্রেসে আবার সেগুলির আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত ১৮৪৭ সালের ৮ ডিসেম্বরে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। ভেমূর্ট ও স্টিবারের রচনার প্রথম খণ্ডে, ২৩৯ পৃষ্ঠায়, দশম পরিশিষ্টে এই নিয়মাবলি মুদ্রিত হয়েছে।

এই বছরই নভেম্বরের শেষে ও ডিসেম্বর গোড়ায় দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। মার্কসও এবার হাজির ছিলেন এবং যথেষ্ট দীর্ঘ এক বিতর্কে — কংগ্রেসে চলেছিল অন্ততপক্ষে দশদিন ধরে — তিনি নতুন মতবাদ সমর্থন করলেন। অবশেষে সব বিরোধ ও সন্দেহের নিরসন হল। নতুন মৌলিক নীতিগুলি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হল। মার্কস আর আমাকে 'ইশতেহার' রচনার ভার দেওয়া হল। ঠিক এর পরেই 'ইশতেহার' রচিত হয় আর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কয়েক সপ্তাহ আগে সেটি ছাপানোর জন্য লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর এটি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছে, প্রায় সব ভাষায় অনূদিত হয়েছে আর আজও বহু দেশে প্রলেতারীয় আন্দোলনের পথ-নির্দেশক হয়ে রয়েছে। 'সব মানুষই ভাই' লীগের এই পুরনো নীতির জায়গায় এল নতুন রণধ্বনি 'দুনিয়ার মজুর এক হও!' — সংগ্রামের আন্তর্জাতিক চরিত্রের প্রকাশ্য ঘোষণা হল তাতে। সতের বছর পরে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির মূলধ্বনিরূপে এই রণধ্বনি সারা পৃথিবী জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়, আর আজ সব দেশের জঙ্গী প্রলেতারিয়েত তার পতাকায় এটি উৎকীর্ণ করে নিয়েছে।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু হল। এতদিন পর্যন্ত লন্ডনে যে কেন্দ্রীয়

* ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট লীগের নিয়মাবলি' দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

কমিটি কাজ চালাচ্ছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষমতা দিয়ে দিল ব্রাসেল্‌সের পরিচালক চক্রের হাতে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত এল যে সময় তার আগেই ব্রাসেল্‌সে কার্যত অবরোধ অবস্থা জারী হয়েছে আর বিশেষ করে জার্মানরা সেখানে কোথাও একত্র হতে পারছে না। আমরা সবাই তখন প্যারিসে যাওয়ার জন্য তৈরি। কাজেই নতুন কেন্দ্রীয় কমিটিও ঠিক করল যে, কমিটি ভেঙে দিয়ে মার্কসের হাতে সব ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে আর তাঁকে অবিলম্বে প্যারিসে একটি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গড়ার ভার দেওয়া হবে। যে পাঁচজন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন (৩ মার্চ, ১৮৪৮), তাঁরা বিদায় নিতে না নিতেই পুলিশ জোর করে মার্কসের বাড়িতে ঢুকে তাঁকে গ্রেপ্তার করল আর পরদিনই তাঁকে ফ্রান্সে রওনা হতে বাধ্য করল। মার্কসও ঠিক সেখানেই যেতে চাইছিলেন।

প্যারিসে শীঘ্রই আমরা সবাই আবার মিলিত হলাম। সেখানে নিম্নলিখিত দলিলটি রচনা করে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির সব সদস্য তাতে সই করলেন। সারা জার্মানিতে এটি বিলি করা হয় আর আজো এর থেকে অনেকের অনেক কিছু শেখার আছে:

জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টির দাবি (৯২)

১। সমগ্র জার্মানিকে একটি একক অবিভাজ্য প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করতে হবে।

৩। জার্মান জনগণের পার্লামেণ্টে যাতে শ্রমিকরাও আসন গ্রহণ করতে পারেন তার জন্য জনগণের প্রতিনিধিদের বেতন দেওয়া হবে।

৪। জনগণের সর্বজনীন সশস্ত্রীকরণ।

৭। রাজরাজড়াদের জমিদারি ও অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক মহাল, সমস্ত খনি, আকর ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হবে। এইসব জমিতে সমগ্র সমাজের উপকারের জন্য আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে এবং বৃহদাকারে কৃষিকার্য করা হবে।

৮। কৃষকের জমি-জায়গার উপর বন্ধক রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলে ঘোষিত হবে; কৃষক এইসব বন্ধকের সুদ রাষ্ট্রকে দেবে।

৯। যেসব জেলায় ইজারা-চাষের (tenant farming) বিকাশ হয়েছে সেখানে জমির খাজনা বা ইজারার ভাড়া রাষ্ট্রকে কর হিশেবে দেওয়া হবে।

১১। পরিবহণের সব ব্যবস্থা: রেলপথ, খাল, জাহাজ, রাস্তা, ডাক ইত্যাদি রাষ্ট্র স্বহস্তে গ্রহণ করবে। এগুলি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হবে আর সম্পত্তিবিহীন শ্রেণীর এখতিয়ারে তা তুলে দেওয়া হবে।

১৪। উত্তরাধিকারের অধিকার সীমিতকরণ।

১৫। খুব উচ্চহারে ক্রমবর্ধমান কর-ব্যবস্থার প্রবর্তন আর ভোগ্যদ্রব্যের উপর থেকে কর অপসারণ।

১৬। জাতীয় কর্মশালা প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্র সব শ্রমিকের জীবিকা সুনিশ্চিত করবে আর যারা কাজ করতে অক্ষম তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।

১৭। বিনাবেতনে সর্বজনীন জনশিক্ষা।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলি কাজে পরিণত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করায় জার্মান প্রলেতারিয়েত, পেটি বুর্জোয়া ও কৃষকদের স্বার্থ আছে, কারণ জার্মানির যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এতদিন পর্যন্ত অল্প কয়েকজন শোষণ করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও অধীনতায় আবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করবে, সমগ্র সম্পদের উৎপাদক হিশেবে তাদের যে অধিকার ও যে ক্ষমতা প্রাপ্য তা পাওয়ার একমাত্র পথ হল উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলি কাজে পরিণত করা।

কমিটি: **কার্ল মার্কস, কার্ল শাপার, হ. বাউয়ের,**
ফ. এঙ্গেলস, জ. মল্, ভ. **ভলফ**।

সেসময়ে প্যারিসে বিপ্লবী বাহিনী গড়ার খুব একটা হুজুগ ছিল। স্পেনীয়, ইতালীয়, বেলজীয়, ওলন্দাজ, পোল ও জার্মানরা দলে দলে এসে মিলত নিজের নিজের পিতৃভূমি মুক্ত করার উদ্দেশ্যে। জার্মান বাহিনীর নেতৃত্ব করতেন হেরভেগ, বর্নস্টেড ও বের্নস্টাইন। বিপ্লবের ঠিক পরেই সমস্ত বিদেশী মজুরদের চাকরি তো যায়ই, তার উপর জনসাধারণও তাদের জ্বালাতন করত, এর ফলে এই সব বাহিনীতে খুব বেশি লোক আসতে থাকে। নতুন সরকার এই বাহিনীগুলিকে দেখল বিদেশী শ্রমিকদের

বিতাড়নের উপায় হিশেবে। এবং তাদের l'étape du soldat দিল অর্থাৎ তাদের চলার পথের ধারে ধারে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিল আর সীমানা পর্যন্ত দিনে পঞ্চাশ সেণ্টিম করে পথ খরচা ধার্য করল। এবং তার পরই বৈদেশিক মন্ত্রী সুবক্তা লামার্তিন, খুব সহজেই যাঁর চোখে জল আসত, চট করে সুযোগ বুঝে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের ধরিয়ে দিতেন তাদের নিজের নিজের সরকারের কাছে।

আমরা বিপ্লব নিয়ে এইভাবে খেলা করার বিরুদ্ধে অতি চূড়ান্ত আপত্তি জানিয়েছিলাম। জার্মানিতে তখন যেরকম আলোড়ন চলছে তার মধ্য দিয়ে আক্রমণ করা, যাতে বাইরে থেকে জোর করে বিপ্লব আমদানি করা হয়, তার মানে হত জার্মানির নিজের বিপ্লবকেই ক্ষতিগ্রস্ত করা, সরকারগুলিকে শক্তিশালী করা আর বাহিনীর লোকদেরই অসহায় অবস্থায় জার্মান সৈন্যবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া — লামার্তিন সে ব্যবস্থা পাকা করেই রেখেছিলেন। পরে যখন ভিয়েনা ও বার্লিনে বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হল তখন বাহিনী আরো উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে পড়ল। কিন্তু একবার যখন খেলা শুরু হয়েছে, তখন তা চালিয়েই যাওয়া হল।

আমরা এক জার্মান কমিউনিস্ট ক্লাব (৯৩) প্রতিষ্ঠা করলাম। সেখানে আমরা শ্রমিকদের পরামর্শ দিতাম যে, তারা যেন বাহিনী থেকে দূরে থাকে, বরং যেন এক-একজন করে দেশে ফিরে গিয়ে সেখানে আন্দোলনের জন্য কাজ করে। আমাদের পুরনো বন্ধু ফ্লকোঁ তখন অস্থায়ী সরকারের একজন সদস্য। আমরা যেসব শ্রমিকদের পাঠাতাম তাদের তিনি বাহিনীর লোকদের মতোই যাতায়াতের সুবিধা আদায় করে দিতেন। এইভাবে আমরা ৩০০ বা ৪০০ জন শ্রমিককে জার্মানিতে ফেরৎ পাঠালাম, তার মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল লীগের সদস্য।

যে জিনিসটা আগেই সহজে আন্দাজ করা সম্ভব ছিল তাই ঘটল, তখন যে ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে তার তুলনায় লীগের কার্যকা শক্তি ছিল খুবই দুর্বল। লীগের যেসব সদস্য আগে বিদেশে ছিল তাদের তিন চতুর্থাংশই দেশে ফিরে গিয়ে তাদের স্থায়ী বাসস্থান বদলে নেয়। ফলে তাদের পূর্বতন গোষ্ঠীগুলি অনেকাংশে ভেঙে গেল আর লীগের সঙ্গে তাদের আর কোনো যোগাযোগ রইল না। তাদের এক

অংশ, তাদের মধ্যে যারা বেশি উচ্চাভিলাষী, তারা সে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করার কোনো চেষ্টাও করল না বরং তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের এলাকায় নিজেদের উদ্যোগেই একটি করে ছোট ছোট পৃথক আন্দোলন শুরু করে দিল। শেষত, প্রতিটি ক্ষুদ্র রাজ্যে, প্রতি প্রদেশে ও প্রতি শহরে অবস্থার এত পার্থক্য ছিল যে, একেবারে সাধারণ ধরনের নির্দেশাবলি দেওয়া ছাড়া আর কিছু করা লীগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর সে নির্দেশ সংবাদপত্রের মাধ্যমেই অনেক ভালো করে পেঁছান যেত। অর্থাৎ, যেসব কারণের জন্য গুপ্ত লীগ প্রয়োজন হয়েছিল, সে কারণগুলি দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত লীগ হিশেবে এরও আর কোনো অর্থ রইল না। কিন্তু সদ্য যারা এই গুপ্ত লীগের ষড়যন্ত্রমূলক চরিত্রের শেষ রেশটুকু দূর করেছে তাদের এতে আশ্চর্য হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম।

তবে লীগ যে বিপ্লবী কার্যকলাপের চমৎকার বিদ্যালয় ছিল সেকথা এবার দেখা গেল। রাইনে যেখানে *Neue Rheinische Zeitung** একটা দৃঢ় কেন্দ্র জুগিয়েছিল সেখানে, নাসাউতে, রাইনের গিয়েসেনে ইত্যাদিতে সর্বত্র লীগের সদস্যরা চরম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। হামবুর্গেও ঠিক তাই হয়। দক্ষিণ জার্মানিতে পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রাধান্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্রেস্‌লাউতে ভিলহেল্ম ভলফ ১৮৪৮ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত খুবই সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেন। তার উপর তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টে সাইলেসিয়া থেকে বিকল্প প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। আর কম্পোজিটার স্টেফান বর্ন্, ব্রাসেল্‌স্ ও প্যারিসের যিনি ছিলেন লীগের সক্রিয় সদস্য তিনি বার্লিনে এক 'শ্রমিক ভ্রাতৃত্বের' প্রতিষ্ঠা করেন। এটি যথেষ্ট বিস্তারলাভ করেছিল আর ১৮৫০ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। বর্ন্ ছিলেন খুবই প্রতিভাবান যুবক। কিন্তু রাজনৈতিক নায়ক হয়ে ওঠার একটু বেশি তাড়া ছিল তাঁর। লোক জোগাড় করার জন্য তিনি যত আজেবাজে লোকদের সঙ্গে 'ভ্রাতৃত্ব' করতেন। আদৌ তিনি বিভিন্ন বিরোধী প্রবণতার মধ্যে একতা আনার, বিশৃঙ্খলার মধ্যে আলোকপাতের উপযোগী লোক ছিলেন না। ফলে 'ভ্রাতৃত্বের' সরকারী প্রকাশনীগুলিতে 'কমিউনিস্ট ইশতেহারের' দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে

* এই খণ্ডের ৯৯-১১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

গিল্ডের স্মৃতি, গিল্ডসুলভ আকাঙ্ক্ষা, লুই ব্লাঁ ও প্রুধোঁর টুকরোটাকরা, সংরক্ষণবাদ ইত্যাদির জগাখিচুড়ি মিলন ঘটে। অর্থাৎ এরা সবাইকে খুশী রাখতে চাইত। বিশেষত, 'ভ্রাতৃত্ব' ধর্মঘট, ট্রেড ইউনিয়ন ও উৎপাদক সমবায়-সমিতির আয়োজন করেছিল। কিন্তু একমাত্র যে ক্ষেত্রে এইসব জিনিস স্থায়ী ভিত্তিতে চালানো যায়, রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে সেই ক্ষেত্রটি জয় করে নেওয়াই যে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন সেকথা এদের মনে ছিল না। পরে প্রতিক্রিয়ার বিজয়ের ফলে 'ভ্রাতৃত্বের' নেতারা বিপ্লবী সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে যখন বাধ্য হন, তখন কিন্তু নিজেদের চারদিকে তারা যে বিশৃঙ্খল জনতার ভিড় জমিয়েছিলেন তারা স্বভাবতই তাঁদের ফেলে পালাল। বর্ন্ ১৮৪৯ সালের মে মাসে ড্রেসডেন অভ্যুত্থানে অংশ নেন (৯৪) আর খুব জোর বেঁচে যান। কিন্তু প্রলেতারিয়েতের বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলনের বিপরীতে দেখা গেল যে 'শ্রমিক ভ্রাতৃত্ব' হল বিশুদ্ধ এক (son der bund) পৃথক সংগঠন। তার অস্তিত্ব বহুলাংশেই কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ, আর এর ভূমিকা এতই গৌণ ছিল যে, প্রতিক্রিয়াশীলরা এই সংগঠনকে ১৮৫০ সালের আগে পর্যন্ত আর এর বাকি সব শাখাকে আরো অনেক বছর পরে পর্যন্ত বন্ধ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নি। বর্নের আসল নাম বুটের্‌মিল্‌খ। বড়ো একজন রাজনৈতিক নায়ক না হয়ে তিনি হয়েছেন সামান্য এক সুইস অধ্যাপক। এখন আর তিনি গিল্ডের ভাষায় মার্কসের অনুবাদ করেন না, বরং বিনম্র রেনাঁ-র অনুবাদ করেন তাঁর মিষ্টি জার্মানে।

প্যারিসে ১৮৪৯ সালের ১৩ জুন, জার্মানিতে মে বিদ্রোহের পরাজয় আর রুশীদের হাতে হাঙ্গেরীয় বিপ্লব দমনের সঙ্গে সঙ্গে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের বিরাট এক পর্ব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তখন পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা আদৌ চূড়ান্ত জয়লাভ করে নি। বিক্ষিপ্ত বিপ্লবী শক্তির পুনর্গঠন এবং সুতরাং লীগেও পুনর্গঠন প্রয়োজন ছিল। ১৮৪৮ সালের পূর্ববর্তীকালের মতো, তখনকার পরিস্থিতিতে প্রলেতারিয়েতের কোনো প্রকাশ্য সংগঠন গড়া সম্ভব হত না। কাজেই আবার গোপনে সংগঠন গড়তে হল।

১৮৪৯ সালের শরৎকালে পূর্বতন সব কেন্দ্রীয় কমিটি ও কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য আবার লন্ডনে মিলিত হলেন। অনুপস্থিত ছিলেন শুধু

শাপার ও মল্। শাপার ভিসবাডেন-এ কারারুদ্ধ ছিলেন, কিন্তু ১৮৫০ সালের বসন্তকালে নিরপরাধ বলে প্রমাণ হবার পর তিনিও এলেন। মল্ অত্যন্ত বিপজ্জনক বহু দৌত্য ও প্রচারমূলক সফরের পর — শেষ পর্যন্ত রাইন প্রদেশে একেবারে প্রুশীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পেলট্নেট গোলন্দাজবাহিনীর জন্য অশ্বারোহী গোলন্দাজদের সংগ্রহ শুরু করেন — ভিলিখের সৈন্যদলের বেসানসন শ্রমিক বাহিনীতে যোগ দেন ও মুর্গে এক সংঘর্ষের সময়ে রটেনফেলস সেতুর সামনে মাথায় গুলি লেগে মারা যান। কিন্তু এবার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন ভিলিখ। ১৮৪৫ সাল থেকে পশ্চিম জার্মানিতে যেধরনের ভাবপ্রবণ কমিউনিস্টদের খুব প্রাদুর্ভাব তাদেরই একজন ভিলিখ। কেবল সেইজন্যই সহজাত প্রবৃত্তিবশেই তিনি আমাদের সমালোচনী প্রবণতার গোপন বিরোধী ছিলেন। তার উপর, তিনি ছিলেন পুরোপুরি এক পয়গম্বর, জার্মান প্রলেতারিয়েতের পূর্বনির্দিষ্ট মুক্তিদাতারূপে তাঁর ব্যক্তিগত ব্রতে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না, আর সেই হিশেবে রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় একনায়কত্বেরই তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষ দাবিদার। ফলে ভেইটলিং যে আদিম খ্রীষ্টান কমিউনিজম প্রচার করেছিলেন, তদুপরি উদয় হল একধরনের কমিউনিস্ট ইসলামের। যাই হোক, তখনকার মতো এই নতুন ধর্মের প্রচার ভিলিখের সেনাপত্যাধীন উদ্বাস্তু শিবিরেই সীমাবদ্ধ রইল।

কাজেই লীগ নতুন করে সংগঠিত হল। ১৮৫০ সালের মার্চের 'বিবৃতি'* প্রকাশিত হল আর হাইনরিখ বাউয়েরকে দূত হিশেবে জার্মানিতে পাঠানো হল। মার্কস ও আমার সম্পাদিত এই 'বিবৃতিটি' আজো আগ্রহবহ, কারণ শীঘ্রই ইউরোপে যে উলটপালট হওয়ার কথা (ইউরোপীয় বিপ্লবগুলি — ১৮১৫, ১৮৩০, ১৮৪৮-১৮৫২, ১৮৭০ সালে — আমাদের শতাব্দীতে ১৫ থেকে ১৮ বছর অন্তর হয়েছে) তাতে কমিউনিস্ট শ্রমিকদের হাত থেকে সমাজের পরিত্রাতা হিশেবে জার্মানিতে যে পার্টির প্রথম ক্ষমতায় আসা অবশ্যম্ভাবী আজো তা হল পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্র। ঐ 'বিবৃতিতে' যা বলা হয়েছিল তার অনেক কিছুই তাই আজো প্রযোজ্য। হাইনরিখ বাউয়েরের

---

* এই সংস্করণের ২য় খন্ড, ৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

দৌত্য পুরোপুরিভাবে সফল হল। এই আমুদে ক্ষুদ্রাকার জুতাপ্রস্তুতকারকটি ছিলেন আজন্ম কূটনীতিক। লীগের ভূতপূর্ব সদস্যদের কেউ কেউ তখন কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, আর কেউ কেউ নিজের মতো করে কাজ করছেন। তাঁদের আর বিশেষত 'শ্রমিক ভ্রাতৃত্বের' তদানীন্তন নেতাদের বাউয়ের সক্রিয় সংগঠনের মধ্যে ফিরিয়ে আনলেন। ১৮৪৮ সালের আগের তুলনায় লীগ শ্রমিক, কৃষক ও ক্রীড়া সঙ্ঘগুলিতে অনেক বেশি নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে শুরু করল। ফলে, ১৮৫০ সালের জুন মাসে গোষ্ঠীগুলির কাছে পরবর্তী ত্রৈমাসিক ভাষণেই একথা জানানো সম্ভব হল যে, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্বার্থে জার্মানিতে সফররত বন্-এর ছাত্র শুর্টস (পরে আমেরিকার প্রাক্তন-মন্ত্রী) 'দেখেছেন যে, সক্ষম সব শক্তি ইতিমধ্যেই লীগের হাতে চলে গেছে'। নিঃসন্দেহে লীগই ছিল জার্মানির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ একমাত্র বিপ্লবী সংগঠন।

কিন্তু এই সংগঠন কী কাজে লাগবে, তা অনেকখানি নির্ভর করত বিপ্লবের নতুন এক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নেয় কিনা তার উপর। ১৮৫০ সালে তার আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকল, বলতে কি অসম্ভবই হয়ে উঠছিল। ১৮৪৭ সালের যে শিল্প-সংকট ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সোপান রচনা করেছিল, তা কেটে গিয়েছিল; শিল্প সমৃদ্ধির এক নতুন, অভূতপূর্ব যুগ শুরু হয়েছিল। যাদের চোখ ছিল এবং সে চোখ যারা কাজে লাগিয়েছিল, তাদের পরিষ্কার বোঝার কথা যে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবী ঝড় ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে।

'এই যে সাধারণ সমৃদ্ধির মধ্যে বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদন-শক্তিগুলি বুর্জোয়া সম্পর্কাদির চৌহদ্দির ভিতরে যথাসম্ভব সতেজভাবেই বিকশিত হচ্ছে, তার ফলে **সত্যকার বিপ্লবের কথা আর ওঠে না**। তেমন বিপ্লব শুধু সে পর্বেই সম্ভব, যখন আধুনিক উৎপাদন-শক্তি ও বুর্জোয়া উৎপাদন-কাঠামো, এই উভয় উপাদানের মধ্যেই পারস্পরিক সংঘাত উপস্থিত হয়। ইউরোপীয় ভূখণ্ডের শৃঙ্খলা পার্টির এক এক উপদলের প্রতিনিধির বর্তমানে যেসব ঝগড়াঝাঁটিতে মাতছে ও নিজেদের খেলো করে তুলছে, সেগুলি নতুন বিপ্লবের উপলক্ষ মোটেই যোগাচ্ছে না, পক্ষান্তরে তা সম্ভব হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কাদির বনিয়াদটা সাময়িকভাবে অতি মজবুত, আর প্রতিক্রিয়া যা জানে না, অতিশয় **বুর্জোয়া** বলেই।

বুর্জোয়া বিকাশ ব্যাহত করার জন্য প্রতিক্রিয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা **ওর গায়ে লেগে ঠিক ততখানি নিশ্চিতভাবেই ঠিকরে ফিরে আসবে, যেমন ফিরে আসবে গণতন্ত্রীদের সমস্ত নৈতিক ক্রোধ ও সোৎসাহ সকল ঘোষণা।'** *Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue* (৯৫), পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা, হামবুর্গ, ১৮৫০, ১৫৩ পৃষ্ঠায় '১৮৫০ সালের মে থেকে অক্টোবর মাসের পর্যালোচনায়' আমি আর মার্কস এই কথা লিখেছিলাম।

কিন্তু পরিস্থিতির এই শান্ত মূল্য-নিরূপণকে অনেকেই তখন ধৃষ্টোক্তি বলে গণ্য করেছিলেন। তখন লেদ্রু-রলাঁ, লুই ব্লাঁ, মাৎসিনি, কশুত এবং অপেক্ষাকৃত কম বিখ্যাত জার্মান তারকাদের মধ্যে রুগে, কিনকেল, গ্যেগ ও অন্যান্য সবাই লণ্ডনে গিয়ে গুচ্ছে গুচ্ছে ভবিষ্যতের অস্থায়ী সরকার গড়ার জন্য ভিড় করেছেন এবং সেটা শুধু তাঁদের নিজের নিজের পিতৃভূমির জন্যই নয়, সমগ্র ইউরোপেরও জন্য, বাকি কেবল আমেরিকার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় টাকাটা ধারে পাওয়া, তাহলেই ইউরোপীয় বিপ্লব আর তার স্বাভাবিক অনুষঙ্গ বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রগুলিকে পলকের মধ্যেই ঘটানো যাবে। আর ভিলিখের মতো লোক যে একথা বিশ্বাস করেছিলেন পুরনো বিপ্লবী ঝোঁকের বশে শাপারও যে বোকা বনেছিলেন এবং লণ্ডনের যে শ্রমিকরা নিজেরাই অনেকে দেশান্তরী তাদের বেশির ভাগই যে এদের পিছন পিছন বিপ্লবের বুর্জোয়া ডেমোক্রাটিক সংঘটক শিবিরে গিয়ে ঢুকেছিল, এতে আর আশ্চর্যের কী আছে? মোটকথা, আমাদের সংযমটা এঁদের মনঃপূত হয় নি, এঁদের মতে বিপ্লব ঘটানোর খেলায় যোগ দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সে কাজ করতে আমরা পুরোপুরি অস্বীকার করলাম। ফল হল বিভাগ। এবিষয়ে 'স্বরূপপ্রকাশ' রচনায় বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। তারপর নট্যুং গ্রেপ্তার হলেন। এঁর পরই হামবুর্গে গ্রেপ্তার হলেন হাউপ্‌ট। হাউপ্‌ট বিশ্বাসঘাতকতা করে কলোনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নাম ফাঁস করে দিলেন, বিচারে প্রধান সাক্ষী হবার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর আত্মীয়স্বজন এভাবে কলঙ্কিত হতে চাইলেন না, তাঁরা হাউপ্‌টকে রিও ডি জ্যানিরোতে চালান করে দিলেন। সেখানে তিনি পরে ব্যবসায়ী হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হন আর তাঁর সেবার স্বীকৃতি হিশেবে প্রথমে প্রুশীয় ও পরে জার্মান কন্সাল-

জেনারেল রূপে নিযুক্ত হন। এখন তিনি আবার ইউরোপে এসেছেন।*

'স্বরূপপ্রকাশ' রচনাটিকে আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য আমি কলোনের অভিযুক্তদের তালিকা দিচ্ছি: ১) পেটের রোজার চুরুট তৈরী করতেন; ২) হাইনরিখ ব্যুরগের্স, জীবনের অবসানকালে তিনি প্রতিনিধি-সভার প্রগতিশীল সদস্য ছিলেন; ৩) পেটের নট্যুং, দর্জি, কয়েক বছর আগে ফটোগ্রাফার হিশেবে ব্রেসলাউতে মারা গেছেন; ৪) ভিলহেল্ম রাইফ; ৫) ডাঃ হের্মান বেকার, এখন কলোনের প্রধান বার্গোমাস্টার ও উচ্চকক্ষের সদস্য; ৬) ডাঃ রলান্ড ডেনিয়েল্স, চিকিৎসক, কারাগারে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে মামলার কয়েক বছর পরে মারা যান; ৭) কার্ল অট্টো, রসায়নবিদ; ৮) ডাঃ আব্রাহাম ইয়াকবি, এখন নিউ ইয়র্কের চিকিৎসক; ৯) ডাঃ ইয়োহান ইয়াকব ক্লাইন, এখন চিকিৎসক আর কলোন শহরের কাউন্সিলার প্রতিনিধি; ১০) ফের্ডিনান্ড ফ্রাইলিখ্রাট, এর আগেই তিনি লন্ডনে চলে গিয়েছিলেন; ১১) ইয়ো. ল. এর্হার্ড, কেরানী; ১২) ফ্রিডরিখ লেসনার, দর্জি, এখন লন্ডনে আছেন। ১৮৫২ সালের ৪ অক্টোবর থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত জুরীর সমক্ষে প্রকাশ্য বিচারের পর রাজদ্রোহের অভিযোগে রোজার, ব্যুরগের্স ও নট্যুং-এর ছয় বছর, রাইফ, অট্টো ও বেকারের পাঁচ বছর আর লেসনারের তিন বছর দুর্গে রুদ্ধ থাকার দন্ডাদেশ হয়। ডেনিয়েল্স, ক্লাইন, ইয়াকবি ও এর্হার্ড মুক্তি পান।

কলোন মামলার সঙ্গেই জার্মান কমিউনিস্ট শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম পর্ব শেষ হল। দন্ডাদেশের ঠিক পরেই আমরা লীগ ভেঙে দিলাম। কয়েক মাস পরে ভিলিখ — শাপারের জোন্ডেরবুন্ডও (৯৭) চিরশান্তি লাভ করল।

---

* সপ্তম দশকের শেষে লন্ডনে শাপারের মৃত্যু হয়। ভিলিখ কৃতিত্বের সঙ্গে আমেরিকান গৃহযুদ্ধে (৯৬) অংশ নেন, তিনি ব্রিগেডিয়ার-জেনেরেল হন। মুরফ্রিসবোরো (টেনেসি)-র যুদ্ধে তাঁর বুকে গুলি লাগে, কিন্তু তিনি সেরে ওঠেন। প্রায় দশ বছর আগে আমেরিকায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অন্যান্য যাঁদের কথা উপরে উল্লেখ করা হল তাঁদের সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলব যে, অস্ট্রেলিয়ায় হাইনরিখ বাউয়েরের আর কোনো খোঁজ রাখা যায় নি আর ভেইটলিং ও এভেরবেক আমেরিকায় মারা গেছেন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

* * *

তখনকার সঙ্গে এখনকার এক পুরুষের ব্যবধান। তখন জার্মানি ছিল হস্তশিল্পের আর শুধু কায়িক পরিশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত গার্হস্থ্য শ্রমশিল্পের দেশ। এখন এটা এক বৃহৎ শিল্পপ্রধান দেশ, ক্রমাগত তার শিল্পগত রূপান্তর চলছে। শ্রমিক হিশেবে নিজেদের অবস্থা আর পুঁজির বিরুদ্ধে তাদের ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক বিরোধ হৃদয়ঙ্গম করেছে এমন শ্রমিকদের তখন একজন একজন করে খুঁজে বের করতে হত, কারণ এই বিরোধও তখন সবেমাত্র বিকাশলাভ করতে শুরু করেছে। আর আজ নিপীড়িত শ্রেণী হিশেবে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ চেতনা বিকাশের প্রক্রিয়া ঈষৎ বিলম্বিত করার জন্যই সমগ্র জার্মান প্রলেতারিয়েতকে জরুরী আইনের অধীনে রাখতে হয়। তখন স্বল্পসংখ্যক যে কয়জন প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভূমিকা উপলব্ধি পর্যন্ত এগোতে পেরেছিলেন তাঁদের গোপনে কাজ করতে হত, ৩ থেকে ২০ জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে লুকিয়ে একত্রিত হতে হত। আর আজ প্রকাশ্য বা গোপন কোনো সরকারী সংগঠনেরই প্রয়োজন হয় না জার্মান প্রলেতারিয়েতের। কোনো নিয়মাবলি, কমিটি, সিদ্ধান্ত বা অন্যান্য প্রত্যক্ষ রূপ ছাড়াই একই মনোভাবসম্পন্ন শ্রেণী কমরেডদের সহজ স্বতঃসিদ্ধ পারস্পরিক যোগাযোগ সমগ্র জার্মান সাম্রাজ্যের মূল ধরে নাড়া দিতে পারে। জার্মানির সীমানার বাইরে বিসমার্ক হলেন ইউরোপীয় ব্যাপারের সালিশ। কিন্তু ১৮৪৪ সালেই মার্কস ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে যা দেখেছিলেন, দেশাভ্যন্তরে জার্মান প্রলেতারিয়েতের সেই বলিষ্ঠ অবয়ব দিন দিন আরো শঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। কূপমণ্ডূকের উপযোগী করে যে সংকীর্ণ সাম্রাজ্য কাঠামো গড়া হয়েছিল তা এই দৈত্যের পক্ষে এখুনি অপ্রসর, এর মহাকায় দেহ আর প্রশস্ত স্কন্ধ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে ও শীঘ্রই এমন এক মুহূর্ত আসবে যখন সে তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোমাত্রই সাম্রাজ্যের সংবিধানের পুরো কাঠামো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে। শুধু তাই নয়। ইউরোপীয় ও আমেরিকান প্রলেতারিয়েতের আন্তর্জাতিক আন্দোলন এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, শুধু তার প্রথম সংকীর্ণ রূপ গুপ্ত লীগই নয়, তার চেয়ে বহুগুণে প্রশস্ত তার দ্বিতীয় রূপ প্রকাশ্য শ্রমজীবী

মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিও তার পক্ষে শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর শ্রেণীগত অবস্থার অভিন্নতা উপলব্ধির ভিত্তিতে সংহতির যে সহজ অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে, তা সব দেশের ও সব ভাষার শ্রমিকদের মধ্যেই একটি একক মহান প্রলেতারীয় পার্টি গড়ে তোলা ও সংহত রাখার পক্ষে যথেষ্ট। ১৮৪৭ সাল থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত লীগ যে মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করত, যাকে জ্ঞানী কূপমণ্ডূকেরা বদ্ধ উন্মাদদের ভ্রম কল্পনা হিশেবে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু গোষ্ঠীভক্তের গুপ্ত মতবাদ হিশেবে উড়িয়ে দিতে পারত, আজ সারা পৃথিবীর সব সভ্য দেশের সে মতবাদের অসংখ্য অনুগামী মিলবে, মিলবে যেমন সাইবেরিয়ার খনিতে দণ্ডিত কয়েদীদের মধ্যে তেমনি কালিফোর্নিয়ায় স্বর্ণ খনির শ্রমিকদের মধ্যে। আর এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা, স্বকালে যিনি ছিলেন সর্বাধিক ঘৃণিত, সর্বাধিক নিন্দিত ব্যক্তি, সেই কার্ল মার্কস জীবনের অবসানকালে হয়ে ওঠেন পুরনো ও নতুন উভয় দুনিয়ার প্রলেতারিয়েতের কাছেই চিরবাঞ্ছিত ও সদা প্রস্তুত পরামর্শদাতা।

লণ্ডন, ৮ অক্টোবর, ১৮৮৫

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কার্ল মার্কসের লেখা 'কলোনে কমিউনিস্টদের বিচারের স্বরূপপ্রকাশের' তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা হিশেবে এঙ্গেলস এটি লিখেছিলেন। ১৮৮৫ সালে জুরিখে এই সংস্করণটি প্রকাশিত হয়, ১৮৮৫ সালে *Der Sozialdemokrat* সংবাদপত্রে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়

পুস্তকের পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত
জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

লুড্‌ভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান (৯৮)

১৮৮৮ সালের সংস্করণের মুখবন্ধ

১৮৫৯ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশিত 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় মার্কস বলেছেন, ১৮৪৫ সালে ব্রাসেল্‌সে 'জার্মান দর্শনের ভাবাদর্শগত মতামতের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্যটি', অর্থাৎ ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, যা প্রধানত মার্কসেরই রচনা, 'আমরা যুক্তভাবে প্রস্তুত করব, বস্তুতপক্ষে, আমাদের এতদিনকার দার্শনিক বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে হিসাব নিকাশ মিটিয়ে নেব' বলে স্থির করেছিলাম। 'আমাদের এই সংকল্প কাজে পরিণত হল হেগেল-পরবর্তী দর্শনের সমালোচনারূপে। অক্‌টাভো-আকারের দুই বৃহৎ খণ্ডে এই পাণ্ডুলিপিটি ওয়েস্টফালিয়ায় প্রকাশকেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়ার অনেকদিন পরে আমরা খবর পেলাম যে, পরিবর্তিত অবস্থার দরুন লেখাটির মুদ্রণ সম্ভব নয়। পাণ্ডুলিপিটিকে মূষিকের দন্তুর সমালোচনার কবলেই ছেড়ে দেওয়া গেল সাগ্রহেই, কারণ আমাদের প্রধান যে উদ্দেশ্য, নিজেদের ধারণাকে স্বচ্ছ করা, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল।'

তারপর চল্লিশ বছরের বেশি কেটে গিয়েছে, মার্কস মারা গিয়েছেন, এবং আমাদের দুজনের মধ্যে কেউই এই বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করবার সুযোগ পাই নি। নানা প্রসঙ্গে আমরা হেগেলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছি; কিন্তু কোথাও সামগ্রিক ও ধারাবাহিকভাবে নয়। এবং ফয়েরবাখের প্রসঙ্গে আমরা একবারও প্রত্যাবর্তন করি নি, যদিও সব সত্ত্বেও হেগেল-দর্শন ও আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে নানা দিক থেকে তিনিই হলেন অন্তর্বর্তী যোগসূত্র।

ইতিমধ্যে জার্মানি ও ইউরোপের সীমানার বাইরে বহুদূর পর্যন্ত, পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যিক ভাষায় মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির অনুগামীরা দেখা

দিয়েছেন। অপরপক্ষে বিদেশে বিশেষত ইংলন্ড ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় চিরায়ত জার্মান দর্শন যেন একধরনের পুনর্জন্ম লাভ করছে এবং এমনকি জার্মানিতেও বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের নামে যে কাঙালী ভোজনের একলেক্‌টিক খিচুড়ি পরিবেশন করা হয় সে সম্বন্ধেও লোকে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে বলে মনে হয়।

এই পরিস্থিতিতে হেগেল-দর্শনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিষয়ে — কীভাবে আমরা এই দর্শন থেকেই যাত্রা করেছি এবং কী করে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি, সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ও প্রণালীবদ্ধ বিবরণীর প্রয়োজনীয়তা আমি ক্রমশই বেশি করে অনুভব করছিলাম। সেই সঙ্গে আমি অনুভব করছিলাম, আমাদের ঝড়-ঝাপটার দিনে (৯৯) আমাদের উপর হেগেলোত্তর অন্যান্য দার্শনিকদের তুলনায় ফয়েরবাখের যে প্রভাব, সেটার পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি না দিলে আমাদের মর্যাদার ঋণ অপরিশোধিত থাকে। তাই *Neue Zeit* (১০০) পত্রিকার সম্পাদক যখন ফয়েরবাখ সম্বন্ধে স্টার্কে রচিত গ্রন্থটি সমালোচনা করবার অনুরোধ জানালেন, তখন আমি তা সাগ্রহে স্বীকার করলাম। উক্ত পত্রিকার ১৮৮৬ সালের চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যায় আমার লেখা প্রকাশিত হয় এবং বর্তমানে আমার সংশোধনায় তাইই স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হচ্ছে।

এ লেখা ছাপাখানায় পাঠাবার আগে আমি ১৮৪৫-১৮৪৬ সালের সেই পুরনো পাণ্ডুলিপিটি* খুঁজে বের করেছি এবং আরেকবার পড়ে দেখেছি। তাতে ফয়েরবাখ সংক্রান্ত অংশটি** অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে। সে পাণ্ডুলিপির সমাপ্ত অংশটি হল ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এবং তাতে শুধু এই প্রমাণ হয় যে, তখনো পর্যন্ত আমাদের অর্থনৈতিক ইতিহাসের জ্ঞান কত অসম্পূর্ণ ছিল। ফয়েরবাখের আসল মতবাদের কোন সমালোচনা এতে নেই; অতএব বর্তমান উদ্দেশ্যে তা ব্যবহারোপযোগী নয়। অপরপক্ষে, মার্কসের একটি পুরনো খাতায় ফয়েরবাখ সম্বন্ধে এগারোটি থিসিস*** খুঁজে পেয়েছি; সেগুলি এখানে পরিশিষ্ট হিশেবে প্রকাশিত হল। ভবিষ্যতে

* ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস, 'জার্মান মতাদর্শ'। — সম্পাঃ

** এই সংস্করণের ১ খন্ড, ৯-১০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

*** ঐ, ৯-১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

বিশদ সংরচনের জন্য তিনি এই নোটগুলি তাড়াহুড়োয় লিখে রেখেছিলেন, মোটেই প্রকাশের জন্য নয়। কিন্তু নতুন বিশ্বদৃষ্টির প্রতিভাদীপ্ত ভ্রূণসত্তার প্রথম দলিল হিশেবে এগুলি অমূল্য।

লণ্ডন, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

১৮৮৮ সালে স্টুট্গার্টে প্রকাশিত 'লুডভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান' গ্রন্থের স্বতন্ত্র সংস্করণের জন্য এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত

মূল গ্রন্থের পাঠ অনুসরণে মুদ্রিত জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

লুদ্‌ভিগ ফয়েরবাখ
ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান

১

আলোচ্য পুস্তক প্রসঙ্গে* এমন এক যুগে ফিরে যেতে হয় যা সময়ের হিশেবে এক পুরুষের চেয়ে বেশি পূর্ববর্তী না হলেও জার্মানির বর্তমান পুরুষদের কাছে এমনই সুদূর যে, মনে হয় বুঝি একশ' বছর আগের কথা। অথচ এই যুগটিই ছিল জার্মানির ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের প্রস্তুতির যুগ; এবং তারপর আমাদের দেশে যা কিছু ঘটেছে তা ওই ১৮৪৮-এরই পূর্বানুবর্তন, বিপ্লবের ইচ্ছাপত্রের পরিপূরণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের মতোই ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মানিতেও দার্শনিক বিপ্লব রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সূচনা করে। কিন্তু উভয়ের রূপে কতই না প্রভেদ! ফরাসীরা সমস্ত সরকারী বিজ্ঞান, গির্জা এবং এমনকি প্রায়ই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও সম্মুখ সমরে লিপ্ত ছিলেন; দেশের সীমানার বাইরে হল্যান্ড বা ইংলন্ডে তাঁদের রচনা প্রকাশিত হত অথচ তখন তাঁদের নিজেদেরই প্রায়ই বাস্তিলে কারারুদ্ধ হবার আশংকা ছিল। অপরপক্ষে, জার্মানরা ছিলেন অধ্যাপক, তরুণদের রাষ্ট্রনিযুক্ত শিক্ষক, তাঁদের রচনাবলি ছিল মনোনীত পাঠ্যপুস্তক এবং দার্শনিক বিকাশ ধারার চরম পরিণতি যে হেগেল-প্রণালী তাকে যেন কিয়ৎ পরিমাণে এমনকি রাষ্ট্রের রাজকীয়-প্রুশীয় দর্শনের পর্যায়েই তুলে দেওয়া হল। এই অধ্যাপকদের আড়ালে, তাঁদের দুর্বোধ্য, পাণ্ডিত্য-কণ্টকিত পরিভাষা এবং দীর্ঘ, ক্লান্তিকর বাক্যাবলির পিছনে সত্যই কি কোনো বিপ্লবের আশ্রয়লাভ সম্ভবপর? এবং যে উদারপন্থীরা তখন বিপ্লবের প্রতিনিধি বলে পরিগণিত তাঁরাই কি এই

* কার্ল স্টার্কে রচিত 'লুদ্‌ভিগ ফয়েরবাখ', ফের্ডিনান্ড এঙ্কে সংস্করণ, স্টুট্‌গার্ট, ১৮৮৫। (এঙ্গেলসের টীকা।)

মস্তিষ্ক-বিভ্রান্তিকর দর্শনের তীব্র পরিপন্থী ছিলেন না? কিন্তু যে কথা সরকার বা উদারপন্থীরা কেউই লক্ষ্য করেন নি তা ১৮৩৩ সালেই অন্তত একজনের চোখে পড়েছিল, এবং তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং হাইনরিখ হাইনে (১০১)।

একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। হেগেলের বিখ্যাত উক্তি:

'যা বাস্তব তাই যৌক্তিক, যা যৌক্তিক তাই বাস্তব।'

এটি সংকীর্ণচিত্ত সরকারের কাছ থেকে যে পরিমাণ কৃতজ্ঞতা এবং সমান সংকীর্ণচিত্ত উদারপন্থীদের কাছ থেকে যে পরিমাণ উষ্মা অর্জন করেছে তা আর কোনো দার্শনিক বাক্যের পক্ষেই সম্ভব হয় নি। এ বাক্য সুস্পষ্টভাবেই বর্তমান পরিস্থিতিকে প্রমাণসিদ্ধ করে; স্বৈরতন্ত্র, পুলিশ রাষ্ট্র, রাজকীয় নির্দেশসাপেক্ষ বিচার ও সেন্সর-ব্যবস্থার উপর বর্ষণ করে দার্শনিক আশীর্বাণী। তৃতীয় ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্ম ও তাঁর প্রজারা বাক্যটিকে এই অর্থেই বুঝেছিলেন। কিন্তু হেগেলের মতে বর্তমানে যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে নিশ্চয় তার সবই বিনাশর্তে বাস্তব নয়। হেগেলের বিচারে কেবল সেটাই বাস্তবতার গুণবিশিষ্ট যেটা সেই সঙ্গে আবার আবশ্যিকও বটে।

'বিকাশধারার পথে বাস্তব নিজেকে আবশ্যিক বলে প্রতিপন্ন করে।'

তাই তাঁর মতে যে কোনো সরকারী ব্যবস্থা — হেগেল নিজেই 'বিশেষ এক খাজনা আইনের' দৃষ্টান্ত দিয়েছেন — বিনাশর্তে বাস্তব নয়। কিন্তু যেটা আবশ্যিক, শেষ পর্যন্ত তা যৌক্তিক বলেও প্রতিপন্ন হয়। অতএব তখনকার প্রুশীয় রাষ্ট্রের উপর প্রযুক্ত হলে হেগেলীয় বাক্যটির কেবল এই অর্থ দাঁড়ায়: এ রাষ্ট্র যতদূর পর্যন্ত আবশ্যিক, ততদূর পর্যন্তই যৌক্তিক বা যুক্তিসিদ্ধ, এবং যদি তা সত্ত্বেও এটি আমাদের কাছে অশুভ বলে প্রতীয়মান হয় এবং অশুভ চরিত্র সত্ত্বেও যদি তা টিকে থাকে তাহলে সরকারের অশুভ চরিত্রটা সঙ্গত এবং তার ব্যাখ্যা মিলবে প্রজাদের পাল্টা অশুভ চরিত্রের মধ্যে। তখনকার প্রুশীয়রা যে-রকম সরকার পাবার উপযুক্ত তারা তাই-ই পেয়েছিল।

কিন্তু হেগেলের মতে বাস্তবতা এমন একটা ধর্ম নয় যা কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর সর্বাবস্থায় এবং সর্বকালে প্রযোজ্য। বরং তার বিপরীতই। রোমক প্রজাতন্ত্র বাস্তব ছিল, কিন্তু যে রোমক সাম্রাজ্য তার স্থান নেয় তার সম্বন্ধেও তো একই কথা। ১৭৮৯ সালে ফরাসী রাজতন্ত্র এমনই অবাস্তব হয়ে পড়েছিল, অর্থাৎ হয়ে পড়েছিল এমনই আবশ্যিকতাহীন, যুক্তিবিরুদ্ধ যে মহান বিপ্লবের সাহায্যে তার ধ্বংস প্রয়োজন হল; সে বিপ্লবের প্রসঙ্গে হেগেল সর্বদাই দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। অতএব, এ দৃষ্টান্তে রাজতন্ত্র অবাস্তব, বিপ্লবই বাস্তব। এইভাবে, আগে যা ছিল বাস্তব বিকাশধারার পথে তাইই হয়ে পড়ে অবাস্তব, লোপ পায় তার আবশ্যিকতা, তার অস্তিত্বের অধিকার, তার যুক্তিসিদ্ধতা। এবং মুমূর্ষু বাস্তবের স্থানে আসে এক নতুন সজীব বাস্তব, শান্তিপূর্ণভাবেই আসে যদি পুরাতনের পক্ষে বিনা সংগ্রামে বিলীন হবার মতো সুবুদ্ধিটুকু বজায় থাকে; আর ওই পুরাতন যদি এ আবশ্যিকতার প্রতিরোধ করে তাহলে আসে বলপ্রয়োগে। এইভাবে হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুসারেই হেগেলের প্রতিপাদ্য পরিণত হচ্ছে তার বিপরীতে: মানব-ইতিহাসের ক্ষেত্রে সমস্ত বাস্তবই কালক্রমে যুক্তিবিরুদ্ধ হয়ে পড়ে; অতএব নিজের প্রকৃতি অনুসারেই তা যুক্তিবিরুদ্ধ, আগে থাকতেই অযৌক্তিকতায় কলঙ্কিত; এবং মানব-মনের মধ্যে যা-কিছু যুক্তিসঙ্গত তাই শেষ পর্যন্ত বাস্তব হতে বাধ্য, সমসাময়িক আপাত বাস্তবের সঙ্গে তার যতই বিরোধ থাকুক না কেন। হেগেলীয় চিন্তাপদ্ধতির সমস্ত নিয়ম অনুসারে সমস্ত বাস্তবের যৌক্তিকতা সংক্রান্ত প্রতিপাদ্যটি শেষ পর্যন্ত আর একটি প্রতিপাদ্যে পরিণত হয়: যা-কিছু অস্তিত্বশীল তাই বিনাশের যোগ্য।

কিন্তু হেগেল-দর্শনের (এবং কাণ্টের সময় থেকে দর্শনের সমগ্র আন্দোলনের এই শেষ পর্বে আমরা আবদ্ধ থাকব) প্রকৃত তাৎপর্য ও বৈপ্লবিক চরিত্র আসলে ঠিক এই যে, মানবিক চিন্তা ও ক্রিয়ার ফলাফলগুলি সম্পর্কে চূড়ান্তপনার সমস্ত ধারণার উপর তা চিরকালের মতো মরণ আঘাত হেনেছে। সত্য, যাকে জানাই হল দর্শনের উদ্দেশ্য, সে সত্য আর হেগেলের কাছে কয়েকটি চূড়ান্ত আপ্তবাক্যের সমষ্টিমাত্র নয়, যা কিনা একবার আবিষ্কৃত

হবার পর শুধু মুখস্থ করতে পারলেই হল। এখন থেকে সত্য মিলবে জ্ঞান-আহরণ প্রক্রিয়ার মধ্যেই, বিজ্ঞানের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্যেই, যে বিজ্ঞান ক্রমশই জ্ঞানের নিম্ন থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়, কিন্তু কখনোই তথাকথিত পরম সত্যকে আবিষ্কার করে এমন কোনো স্তরে পেঁছোয় না যার পর আর তার অগ্রগতি সম্ভব নয়, যেখানে ওই লব্ধ সত্যটির সামনে করজোড়ে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার কিছুই করবার নেই। এবং দার্শনিক জ্ঞান সম্বন্ধে প্রযোজ্য এই কথা অন্যান্য সমস্ত জ্ঞান ও বাস্তব কর্ম সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। মানবতার কোনো এক নিখুঁত আদর্শ অবস্থায় জ্ঞান যেমন কোনো পরিপূর্ণ সমাপ্তিতে উপনীত হতে পারে না, তেমনি ইতিহাসও তা পারে না। কোনো নিখুঁত সমাজ বা নিখুঁত 'রাষ্ট্রের' অস্তিত্ব শুধুমাত্র কল্পনাতেই সম্ভব। পক্ষান্তরে একের পর এক প্রতিটি ঐতিহাসিক ব্যবস্থাই হল মানব-সমাজের নিম্ন থেকে ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়ে শেষহীন বিকাশধারার মধ্যে উৎক্রমণমূলক পর্যায়মাত্র। প্রতিটি পর্যায়ই আবশ্যিক, অতএব যে যুগ ও পরিবেশের কারণে তার উদ্ভব সেই যুগ ও পরিবেশের পক্ষে তা সঙ্গত। কিন্তু তারই গর্ভে যে নতুন ও উচ্চতর পরিস্থিতি ক্রমশ বিকাশলাভ করে তার সামনে তার বৈধতা ও যুক্তিসঙ্গতি লোপ পায়। উন্নততর পর্যায়ের জন্য তাকে পথ দিতেই হবে, যে পর্যায় নিজেও আবার ক্ষয় ও বিনাশ লাভ করবে। ঠিক যেমন বুর্জোয়ারা বৃহৎ শিল্প, প্রতিযোগিতা এবং বিশ্ববাজার সৃষ্টি ক'রে কার্যত সমস্ত কায়েমী যুগপূজ্য প্রতিষ্ঠান বিলীন করেছে, তেমনি এই দ্বান্দ্বিক দর্শনও বিলীন করেছে পরম সত্যের সমস্ত ধারণা এবং তদনুগামী মানবতার একটা চূড়ান্ত অবস্থার ধারণা। দ্বান্দ্বিক দর্শনের কাছে চূড়ান্ত, পরম বা পূত বলে কিছুই নেই। এ দর্শন সবকিছুর ক্ষেত্রে ও মধ্যে অনিত্যতা প্রকাশ করে দেয়; তার সামনে উদ্ভব ও বিলয়ের অবিচ্ছিন্ন ধারা ছাড়া, নিম্ন থেকে উচ্চতর অবস্থায় শেষহীন উন্নয়ন ছাড়া আর কিছুই টিকতে পারে না। এবং দ্বান্দ্বিক দর্শন নিজেই আসলে চিন্তাপরায়ণ মস্তিষ্কে এই পদ্ধতির প্রতিবিম্বমাত্র। তার একটি রক্ষণশীল দিকও অবশ্যই আছে: এ দর্শন অনুসারে জ্ঞান ও সমাজের বিকাশের নির্দিষ্ট এক-একটা পর্যায় তাদের কাল ও পরিস্থিতির পক্ষে সঙ্গত, কিন্তু তার বেশি আর কিছুই নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির রক্ষণশীলতাটুকু

আপেক্ষিক, এর বৈপ্লবিক তাৎপর্যই অনাপেক্ষিক — একমাত্র এই পরমটুকুই দ্বান্দ্বিক দর্শনে স্বীকৃত।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রকৃতিবিজ্ঞানের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপূর্ণ সঙ্গতি আছে কিনা — এ বিজ্ঞান অনুসারে এমনকি পৃথিবীরও সম্ভাব্য অবসান এবং তার অধিবাসীদের বেশ সুনিশ্চিত অবসানের কথা বলা হয়, অতএব তাতে মানব-ইতিহাসেরও ঊর্ধ্বগতির দিক ছাড়াও একটি অধোগতির দিক স্বীকৃত — সে প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করবার প্রয়োজন নেই। সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন যখন মোড় ঘুরে নিম্নমুখী হবে সে বিন্দু থেকে আমরা অন্তত এখনো যথেষ্ট দূরে আছি এবং যে বিষয় এখনো প্রকৃতিবিজ্ঞানের কাছে আলোচ্য হয়ে ওঠে নি, হেগেল-দর্শন তা নিয়ে ভাবিত হবে এ আশা করতে পারি না।

কিন্তু এ কথাটা এখানে অবশ্যই বলা দরকার: হেগেলের রচনায় উপযোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এত সুস্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট হয় নি। এগুলি তাঁর পদ্ধতির অনিবার্য সিদ্ধান্ত, কিন্তু তিনি নিজে কখনো এতটা সুস্পষ্টভাবে সে সিদ্ধান্ত টানেন নি এবং বস্তুত তার সহজ কারণ এই যে, তিনি একটি দর্শনতন্ত্র গড়ে তুলতে বাধ্য ছিলেন এবং চিরাচরিত চাহিদা অনুসারে দর্শনতন্ত্রের উপসংহারে কোনো না কোনো চরম সত্য থাকতে বাধ্য। অতএব, বিশেষত তাঁর 'যুক্তিতত্ত্বে' ('Logic') হেগেল যত জোর দিয়েই বলুন না কেন যে, এই পরম সত্য কেবল যুক্তিমূলক (তাই ঐতিহাসিক) প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, তবু তিনি সে প্রক্রিয়ার এক পরিসমাপ্তি যোগাতে বাধ্য বোধ করলেন, কেননা তাঁর দর্শনতন্ত্রকে কোনো না কোনো এক বিন্দুতে এনে শেষ করতেই হবে। তাঁর 'যুক্তিতত্ত্বে' তিনি এই শেষটাকে আবার শুরুতে পরিণত করতে পারেন, কেননা এখানে তাঁর সমাপ্তি-বিন্দু অর্থাৎ পরম ভাবসত্তা — এবং তা এই অর্থেই পরম যে, সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের পরম অভাব বর্তমান — 'অনন্বিত হয়' (alienates) অর্থাৎ রূপান্তরিত হয় প্রকৃতিরূপে এবং পরে চৈতন্যের মধ্যে — অর্থাৎ চিন্তা ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে — ফের স্বরূপ লাভ করে। কিন্তু এই সমগ্র দর্শনের শেষে অনুরূপভাবে ফের শুরুতে প্রত্যাবর্তন সম্ভব কেবল এক উপায়ে, অর্থাৎ কিনা, ইতিহাসের পরিসমাপ্তি নিম্নোক্তভাবে কল্পনা করতে হবে: মানবজাতি

এই পরম ভাবসত্তার জ্ঞান লাভ করছে এবং ঘোষণা করছে যে, হেগেলীয় দর্শনেই সে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সমস্ত গোঁড়ামি লোপ পায় তার বিপরীতে এইভাবে হেগেলীয় দর্শনতন্ত্রের গোঁড়ামির সবটুকুই পরম সত্য বলে ঘোষিত হয়েছে। বৈপ্লবিক দিকটি তাই রক্ষণশীলতার অতি বৃদ্ধিতে চাপা পড়ে গিয়েছে এবং শুধু দার্শনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, সেটা ঐতিহাসিক কর্মের ক্ষেত্রেও। মানবজাতি হেগেলের মাধ্যমেই যখন ওই পরম ভাবসত্তার পরিব্যাখ্যানের পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন কার্যক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই এত দূর এগিয়েছে যে, এই পরম ভাবসত্তাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা তার পক্ষে সম্ভব। অতএব সমসাময়িকদের উপর ওই পরম ভাবসত্তার বাস্তব রাজনৈতিক দাবিও খুব বেশি লম্বা করা উচিত নয়। তাই 'ব্যবহারশাস্ত্রের দর্শনের' উপসংহারে আমরা দেখি, তৃতীয় ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্ম বারবার কিন্তু ব্যর্থভাবে প্রজাদের কাছে সাবেকী সমাজ বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত যে রাজতন্ত্রের, অর্থাৎ তখনকার পেটি-বুর্জোয়া জার্মান অবস্থার উপযোগী মালিক-শ্রেণীর সীমাবদ্ধ নরমপন্থী পরোক্ষ যে শাসন-ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারই মধ্যেই নাকি ওই পরম ভাবসত্তা রূপ নেবে, এবং তাছাড়াও আমাদের কাছে আভিজাত্যের আবশ্যিকতা মনন পদ্ধতিতে প্রমাণ করা হয়েছে।

তাই, এমন এক সমূহ বৈপ্লবিক চিন্তাপদ্ধতি যে কেমন করে এহেন চূড়ান্ত নিরীহ এক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত উপনীত হল তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাঁর দর্শনতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ আবশ্যিকতাগুলির মধ্যেই। আসলে এই বিশেষ ধরনের সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, হেগেল হলেন জার্মান, এবং সমসাময়িক গ্যেটের মতো তাঁর মাথাতেও একটি কূপমণ্ডূক টিকি ছিল। নিজ নিজ ক্ষেত্রে এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন এক-একজন অলিম্পীয় জিউস, কিন্তু কেউই জার্মান কূপমণ্ডূকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি।

কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও পূর্ববর্তী যে কোনো দর্শনতন্ত্রের তুলনায় হেগেলীয় তন্ত্র বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হতে বাধা পায় নি, এই সব ক্ষেত্রে চিন্তার এমন ঐশ্বর্য তা বিকশিত করতে পারল যা আজো বিস্ময়কর মনে হয়। মনের প্রপঞ্চবাদ (phenomenology) (তাকে মনের ভ্রূণতত্ত্ব ও প্রত্নজীববিদ্যার সমান্তরাল বলা যায়, বিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে

ব্যক্তিচেতনার প্রকাশ, যে-স্তরগুলো ইতিহাসগতভাবে অতিক্রান্ত মানুষের চেতনার স্তরের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হিশেবে আলোচিত), যুক্তিতত্ত্ব, প্রকৃতি-দর্শন, মনোদর্শন, শেষটি বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভাগ অনুসারে আলোচিত: ইতিহাসের দর্শন, ব্যবহারশাস্ত্রের দর্শন, ধর্মের দর্শন, দর্শনের ইতিহাস, নন্দনতত্ত্ব, ইত্যাদি—এই সব বিভিন্ন ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে হেগেল বিকাশের মূলসূত্র আবিষ্কার ও প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। এবং তিনি যেহেতু শুধুই সৃজনী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাই নয়, তাছাড়াও তাঁর ছিল বিশ্বকোষসুলভ পাণ্ডিত্য, তাই প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর কীর্তি যুগান্তকারী। একথা অবশ্য স্বতঃই বোঝা যায় যে, 'দর্শনতন্ত্রের' খাতিরে তাঁকে প্রায়ই কয়েকটি কৃত্রিম ছক সৃষ্টি করতে হয়েছে, যা নিয়ে তাঁর বামন প্রতিপক্ষের দল আজো পর্যন্ত অমন ভয়ংকর সোরগোল তোলে। কিন্তু এগুলি তাঁর কীর্তির নেহাতই ভারা-বাঁধা মাচা। এখানে অনর্থক এলোমেলো না ঘুরে কেউ যদি আরো এগিয়ে প্রকাণ্ড সৌধটির মধ্যে ঢুকতে পারেন তাহলে তাঁর চোখে পড়বে অসীম ঐশ্বর্য, যার পুরো মূল্য আজো ম্লান হয় নি। সমস্ত দার্শনিকের ক্ষেত্রেই ঠিক 'দর্শনতন্ত্রটা'ই অনিত্য এবং তার সহজ কারণ মানবমনের এক অমর বাসনা, সমস্ত দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হবার বাসনা। কিন্তু যদি সমস্ত দ্বন্দ্ব সত্যই একবার উত্তীর্ণ হওয়া যায় তাহলে আমরা উপনীত হব পরম সত্যে — শেষ হবে বিশ্ব ইতিহাসের, তবু সে ইতিহাসকে চলতেই হবে, যদিও তখন তার আর করণীয় কিছু নেই। অতএব, এখানে এক নতুন সমাধানহীন অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। একবার যদি এই কথা হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে — এবং সেকথা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য শেষ পর্যন্ত আর কোন দার্শনিক হেগেলের চেয়ে বেশি সহায়তা করেন নি — এইভাবে বুঝলে দর্শনের কর্তব্য দাঁড়ায় একজন একক দার্শনিককে দিয়ে সেইটে সম্পন্ন করানো যা কিনা সমগ্র মানবজাতির ক্রমবিকাশের দ্বারা সাধ্য, একথা হৃদয়ঙ্গম করা মাত্র, এতদিন ধরে দর্শনকে যে অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে সে অর্থে সমস্ত দর্শনের অবসান অনিবার্য। তখন এই পথে ও একক দার্শনিকের পক্ষে যা অনধিগম্য, সেই 'পরম সত্যকে' শান্তিতে ছেড়ে দেওয়া হবে, কিন্তু তার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের পথ ধরে সন্ধান করা যাবে অধিগম্য আপেক্ষিক সত্যাবলির এবং দ্বান্দ্বিক চিন্তা-পদ্ধতি অনুসারে সে সত্যগুলির সামান্যীকরণ। অন্তত

হেগেলের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনেরও পরিসমাপ্তি ঘটল; কেননা, একদিকে তিনি তাঁর দর্শনতন্ত্রে সমগ্র দার্শনিক বিকাশের অত্যাশ্চর্য সামান্যীকরণ করেছেন এবং অপরদিকে, অচেতনভাবে হলেও তিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন কীভাবে দর্শনতন্ত্রের গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর বাস্তব সদর্থক জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

জার্মানির দর্শন-রঞ্জিত আবহাওয়ায় হেগেলীয় তন্ত্রের প্রচণ্ড প্রভাবের কথা কল্পনা করা কঠিন নয়। কয়েক দশক ধরে এক বিজয়যাত্রা চলল, হেগেলের মৃত্যুতেও তার পরিসমাপ্তি ঘটে নি। বরং ১৮৩০ থেকে ১৮৪০ সালেই 'হেগেলবাদ' প্রায় একচ্ছত্র রাজত্ব করেছে এবং এমনকি বিরোধীদের মধ্যেও তার প্রভাব কমবেশি সংক্রামিত হয়েছে। ঠিক এই পর্বেই, সচেতন বা অচেতন যেভাবেই হোক, বহু বিচিত্র বিজ্ঞানে হেগেলীয় মতবাদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে এবং যে জনবোধ্য সাহিত্য ও দৈনিকপত্র সাধারণ 'শিক্ষিত বিবেকের' খোরাক যোগায় তাকেও তা সুভাষিত করেছে। কিন্তু গোটা রণক্ষেত্র জুড়ে এই যে জয়, সেটাই হল এক অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের ভূমিকা।

আগেই দেখেছি, সামগ্রিকভাবে দেখলে হেগেলীয় মতবাদের মধ্যে অতি বিভিন্ন সব ব্যবহারিক পক্ষতামূলক মতামত ধারণ করার মতো প্রচুর অবকাশ আছে। অথচ তখনকার জার্মানির তত্ত্বগত পরিমণ্ডলে ব্যবহারিক তাৎপর্য ছিল সর্বোপরি দুটি জিনিসের: ধর্ম এবং রাজনীতির। হেগেলীয় **তন্ত্রের** ওপর প্রধান জোর দিলে যে কেউ উভয় ক্ষেত্রেই যথেষ্ট রক্ষণশীল হতে পারত; দ্বান্দ্বিক **পদ্ধতিকে** প্রধানতম বিবেচনা করলে যে কারোর পক্ষেই রাজনীতি ও ধর্ম উভয় ব্যাপারেই চরম বিরোধী দলের অন্তর্গত হওয়া সম্ভব। তাঁর রচনায় বৈপ্লবিক উষ্মার প্রভূত অভিব্যক্তি সত্ত্বেও মনে হয় হেগেল নিজে মোটের উপর রক্ষণশীলতারই পক্ষপাতী ছিলেন। বস্তুত পদ্ধতির তুলনায় তাঁর দর্শনতন্ত্রের জন্য হেগেলকে ঢের বেশি 'কঠিন মানসিক পরিশ্রম' করতে হয়েছিল। তিরিশের দশকের শেষাশেষি তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ক্রমশই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। গোঁড়া পিয়েটিস্ট (১০২) ও সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তথাকথিত তরুণ হেগেলপন্থীরা (১০৩) — বামপন্থীরা — একটু একটু করে তৎকালীন তীব্র সমস্যাবলির

প্রতি তাঁদের দার্শনিক-ভদ্রলোকী আচরণ পরিহার করলেন — এতদিন পর্যন্ত এই জন্যই তাঁদের মতবাদের প্রতি রাষ্ট্রের সহনশীলতা এমনকি আনুকূল্য জুটেছিল। এবং ১৮৪০ সালে চতুর্থ ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্মের সঙ্গে সঙ্গে গোঁড়া ভণ্ডামি ও স্বৈরপন্থী-সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া সিংহাসনে আসীন হবার পর খোলাখুলি পক্ষগ্রহণ প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ল। তখনো দার্শনিক অস্ত্র নিয়েই সংগ্রাম চলেছে, কিন্তু তা আর অমূর্ত-দার্শনিক আদর্শের জন্য নয়। সরাসরি সাবেকী ধর্ম ও সমসাময়িক রাষ্ট্র উচ্ছেদের কথাই উঠল। *Deutsche Jahrbücher*-এ (১০৪) এখনো ব্যবহারিক লক্ষ্যের কথাটা দার্শনিক ছদ্মবেশে উপস্থাপিত হলেও ১৮৪২ সালের *Rheinische Zeitung*-এ তরুণ হেগেলপন্থী প্রচার সরাসরি উদীয়মান র‍্যাডিকেল বুর্জোয়ার দর্শন হিশেবেই আত্মপ্রকাশ করল, দার্শনিক আলখাল্লাটা ব্যবহৃত হত কেবল সেন্সরকে ছলনা করার জন্য।

সেসময়ে কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্র নেহাতই কণ্টকিত, তাই প্রধান সংগ্রাম ধর্মের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হল। অবশ্য এ সংগ্রাম পরোক্ষভাবে রাজনৈতিকও ছিল, বিশেষ করে ১৮৪০ থেকে। ১৮৩৫ সালে প্রকাশিত স্ট্রাউসের 'যীশুর জীবন' তার প্রথম প্রেরণা জোগায়। এই গ্রন্থে খ্রীষ্টীয় পুরাকথার (gospel myths) উৎস সংক্রান্ত যে মতবাদ প্রস্তাবিত হয়েছিল পরে ব্রুনো বাউয়ের তার বিরোধিতা করেন এবং প্রমাণ দেন যে, বহু খ্রীষ্টীয় গল্পই শাস্ত্রকারদের উদ্ভাবনমাত্র। মতবাদদুটির মধ্যে সংঘর্ষ চলে 'আত্মচেতনা' ও 'বস্তুসত্তা' (substance) নিয়ে দার্শনিক বিতর্কের ছদ্মবেশে। বাইবেলের অলৌকিক উপাখ্যানগুলি গোষ্ঠীর গর্ভে অচেতন, চিরাচরিত পুরাকথা-উদ্ভাবন প্রবৃত্তির পরিণাম, না সেগুলি শাস্ত্রকারদেরই উদ্ভাবন, এই সমস্যাকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে প্রশ্ন তোলা হল: বিশ্ব ইতিহাসের ক্ষেত্রে নির্ধারক সক্রিয় শক্তি 'বস্তুসত্তা' না 'আত্মচেতনা'? শেষ পর্যন্ত এলেন সমসাময়িক নৈরাজ্যবাদের পয়গম্বর স্টিরনার — বাকুনিন তাঁর কাছে অনেক ঋণী — এবং তিনি সার্বভৌম 'আত্মচেতনার' মাথায় পরালেন তাঁর সার্বভৌম 'অহং'-এর মুকুট (১০৫)।

হেগেলীয় সম্প্রদায়ের ভাঙনের এই দিকটার বিস্তারিত আলোচনা আমরা আর তুলব না। আমাদের কাছে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই: তরুণ

হেগেলপন্থীদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাঁদের অনেকেই প্রত্যক্ষ ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বাস্তব প্রয়োজনে ইঙ্গ-ফরাসী বস্তুবাদে গিয়ে পেঁছিলেন। এখানে সংঘর্ষ ঘটল তাঁদের সম্প্রদায়গত দর্শনতন্ত্রের সঙ্গে। বস্তুবাদ অনুসারে প্রকৃতিই একমাত্র সত্য; পক্ষান্তরে হেগেলীয় তন্ত্র অনুসারে প্রকৃতি আসলে পরম ভাবসত্তার 'অনন্বয়' মাত্র, অর্থাৎ, বলতে কি, তা ভাবসত্তার অধঃপতন বিশেষ; যাই হোক, এখানে চিন্তা-প্রক্রিয়া ও তার চিন্তাফল, বা ভাবসত্তাই হল আদি এবং প্রকৃতি হল উৎপন্ন বস্তু, তার অস্তিত্ব রয়েছে কেবল ভাবসত্তার অনুমতিসাপেক্ষে। এবং এই অন্তর্বিরোধের মধ্যেই তরুণ হেগেলপন্থীরা নানারকম হাবুডুবু খেয়েছেন।

তারপর এল ফয়েরবাখের 'খ্রীষ্টধর্মের মর্মবস্তু', ঘোরপ্যাঁচ বাদ দিয়ে সরাসরি বস্তুবাদকে আবার প্রতিষ্ঠিত ক'রে তা এক ফুৎকারে ওই অন্তর্বিরোধকে ধুলো করে দিল। কোনো রকম দর্শনের অপেক্ষা না করেই প্রকৃতি বর্তমান। মানুষ আমরা নিজেরাই হলাম প্রকৃতির উৎপন্ন, বেড়ে উঠেছি প্রকৃতির এই ভিত্তির ওপরেই। প্রকৃতি এবং মানুষের বাইরে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই এবং আমাদের ধর্মীয় উৎকল্পনায় যেসমস্ত উচ্চতর সত্তা উদ্ভাবিত হয়েছে, তারা হল আমাদের নিজেদেরই সত্তার কাল্পনিক প্রতিবিম্বমাত্র। ভাঙল মোহ; 'দর্শনতন্ত্র' ফেটে গিয়ে পরিত্যক্ত হল। প্রমাণ হল, অন্তর্বিরোধটির অবস্থান মাত্র আমাদের কল্পনাতেই, অতএব তা বিলীন হয়ে গেল। এ গ্রন্থ যে কী মুক্তির আস্বাদ দিল, অভিজ্ঞতা ছাড়া তার ধারণা করা যায় না। সঞ্চারিত হল সর্বব্যাপী উৎসাহ: আমরা সকলে তৎক্ষণাৎ ফয়েরবাখপন্থী হয়ে গেলাম। এই নতুন ধারণাকে মার্কস যে কী উৎসাহে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং সমস্ত সমালোচনামূলক আপত্তি সত্ত্বেও তিনি এর দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন তা 'পবিত্র পরিবার' বইটি পড়লে বোঝা যায়।

বইটির ত্রুটিগুলি পর্যন্ত তার আশু প্রভাবকে বাড়াতে সাহায্য করে। তার সাহিত্যসুলভ, কখনো কখনো এমনকি সাড়ম্বর, রচনারীতি ব্যাপক পাঠকসাধারণকে আকৃষ্ট করেছিল, এবং অনেক বছর ধরে অমূর্ত ও দুর্বোধ্য হেগেলপন্থার পর তা অন্তত স্বস্তিকর মনে হয়েছিল। বইটিতে প্রেম নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাস সম্বন্ধেও একই কথা; অবশ্য 'শুদ্ধ মননের' অধুনা অসহ্য

একাধিপত্যের পর তার যৌক্তিকতা যদিই বা না থাকে, অন্তত কৈফিয়ৎ ছিল। কিন্তু আমাদের পক্ষে কিছুতেই ভোলা চলবে না যে, ১৮৪৪ থেকে জার্মানির 'শিক্ষিত' সমাজে মহামারীর মতো যা সংক্রামিত হয়েছে সেই 'সাঁচ্চা সমাজতন্ত্র' শুরু করে ফয়েরবাখের ঠিক এই দুটি দুর্বলতা থেকেই। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বদলে তা সামনে আনে সাহিত্যিক বাণী, উৎপাদন-ব্যবস্থার অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রলেতারিয়েতের মুক্তির বদলে আনে 'প্রেমের' সাহায্যে মানবজাতির মুক্তি। সংক্ষেপে, ন্যক্কারজনক ফুলেল ভাষা ও প্রেমের উচ্ছ্বাসে তা আত্মহারা হয়। এই ধারার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কার্ল গ্রুন মশাই।

আরো একটি কথাও ভোলা চলবে না: হেগেলীয় সম্প্রদায়ে ভাঙন ধরলেও সমালোচনার সাহায্যে হেগেলীয় দর্শনের খণ্ডন হয় নি। স্ট্রাউস এবং বাউয়ের তার এক-একটি দিক গ্রহণ করে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিতর্ক চালান। ফয়েরবাখ সেই দর্শনতন্ত্র ভেঙে বেরিয়ে আসেন এবং তা স্রেফ বর্জন করেন। কিন্তু কোনো একটি দর্শনকে শুধু ভুল বলে ঘোষণা করলেই তা খণ্ডিত হয় না। এবং হেগেল-দর্শনের মতো অমন শক্তিশালী যে কীর্তি জাতির মানসিক বিকাশের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছে, তাকে শুধু অবজ্ঞা দিয়ে দূর করা যায় না। তার নিজের অর্থেই তাকে 'মুছে দেওয়া' প্রয়োজন, অর্থাৎ সমালোচনার সাহায্যে তার আধার ধ্বংস করে তার লব্ধ নতুন আধেয়টিকে রক্ষা করা প্রয়োজন। এই কাজ কী করে সমাধা হয়েছিল তা আমরা পরে দেখব।

কিন্তু ফয়েরবাখ যেমন বিনা বাক্যব্যয়ে হেগেলকে ঠেলে সরিয়ে দেন, ইতিমধ্যে ১৮৪৮-এর বিপ্লবও তেমনি বিনা বাক্যব্যয়েই সমস্ত দর্শনকেই ঠেলে সরিয়ে দেয়। এবং সে প্রক্রিয়ার মধ্যে ফয়েরবাখ নিজেও আড়ালে পড়ে যান।

২

সমস্ত দর্শনের, বিশেষত সাম্প্রতিকতম দর্শনের বৃহৎ বনিয়াদী প্রশ্ন হল চিন্তা ও সত্তার সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশ্ন। খুব আদিম কাল থেকেই, মানুষ যখন নিজের দেহ গঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং স্বপ্নচ্ছায়ার ব্যাখ্যা করতে

না পেরে* তার বিশ্বাস হয়েছে যে, তার চিন্তা ও সংবেদনা তার নিজস্ব দৈহিক প্রক্রিয়া নয়, কোনো এক বিশিষ্ট আত্মার কাজ, সে আত্মা দেহতে বাস করে এবং মৃত্যুর সময় দেহকে পরিত্যাগ করে, সেই যুগ থেকেই মানুষকে এই আত্মার সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা করতে হয়েছে। এ আত্মা যদি মৃত্যুর পর দেহকে পরিত্যাগ করেও বেঁচে থাকে, তাহলে তার আরো এক স্বতন্ত্র মৃত্যু সম্ভাবনা আবিষ্কার করবার কারণ থাকে না। এইভাবেই ধারণা জন্মাল আত্মা অমর; বিকাশের সে পর্যায়ে এই অমরত্বের কথাটা মোটেই সান্ত্বনা নয়, বরং এমনই এক নিয়তি যার বিরুদ্ধে যোঝবার প্রচেষ্টা নিষ্ফল, এবং প্রায়ই, যেমন গ্রীকদের মধ্যে, তাকে ধরা হত রীতিমতো এক দুর্ভাগ্য বলে। ধর্মমূলক সান্ত্বনার আকাঙ্ক্ষা থেকে নয়, বরং আত্মার অস্তিত্ব একবার স্বীকার করার পর দেহাবসানে আত্মা নিয়ে কী করা যাবে, এ বিষয়ে সাধারণ সীমাবদ্ধতাপ্রসূত বিহ্বলতা থেকে উদ্ভব হল ব্যক্তির অমরত্ব সংক্রান্ত বিরস ধারণার। ঠিক এইভাবেই বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিতে ব্যক্তিত্বারোপ করা প্রথম দেবতাদের উদ্ভব হল এবং ধর্মের আরো বিকাশের পর্যায়ে এই দেবতারা ক্রমশই অপ্রাকৃত রূপ লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যা দেখা দেয় সেই অমূর্তায়ন প্রক্রিয়ার — এমনকি বলতে পারি পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ার — মাধ্যমে বহু ন্যূনাধিক সীমাবদ্ধ এবং পরস্পরকে সীমাবদ্ধকারী দেবতাদের মধ্যে থেকে মানুষের মনে উদ্ভব হল একেশ্বরবাদী ধর্মগুলির (১০৬) একক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ধারণা।

তাই, যে কোনো ধর্মের মতোই চিন্তা ও সত্তার, আত্মা ও প্রকৃতির সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশ্নের, সমগ্র দর্শনের সর্বপ্রধান প্রশ্নের মূলে আছে বন্য দশার সংকীর্ণ ও অজ্ঞ ধারণা। কিন্তু ইউরোপের মানুষ খ্রীষ্টীয় মধ্য যুগের সুদীর্ঘ আচ্ছন্নতা থেকে জেগে ওঠবার পরই প্রশ্নটি পুরো তীক্ষ্ণতার সঙ্গে প্রথম উত্থাপিত হতে, তার পূর্ণ তাৎপর্য অর্জন করতে পারল। চিন্তার

---

* বন্য এবং নিম্ন-বর্বর স্তরের মানুষের মধ্যে এখনও এই মর্মে একটা সর্বজনীন ধারণা আছে যে, স্বপ্নে দেখা দেয় যে-নরমূর্তি সেটা সাময়িকভাবে দেহ-ছেড়ে-আসা আত্মা; কাজেই, স্বপ্নের অপচ্ছায়া স্বপ্নদ্রষ্টার বিরুদ্ধে কিছু করলে সেজন্যে আদত মানুষটিকেই দায়ী করা হয়। এইভাবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, গিয়ানার ইন্ডিয়ানদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল বলে লক্ষ্য করেছিলেন ইম্‌ থার্ন ১৮৮৪ সালে। (এঙ্গেলসের টীকা।)

সঙ্গে সত্তার সম্পর্ক কী, — চৈতন্য ও প্রকৃতির মধ্যে কোন্‌টি আদি — এই প্রশ্নটি প্রসঙ্গত মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিকস-এর ক্ষেত্রেও একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল, আর খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত রূপে শাণিত হয়েছিল: ঈশ্বর কি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, না, চিরকালই জগতের অস্তিত্ব ছিল?

এ প্রশ্নের যে যেমন উত্তর দিয়েছেন সেই অনুসারে দার্শনিকেরা দুটি বৃহৎ শিবিরে বিভক্ত হয়েছেন; যাঁরা প্রকৃতির তুলনায় চৈতন্যকে আদি বলেছেন, অতএব কোনো না কোনো ভাবে শেষ পর্যন্ত মেনেছেন জগৎ সৃষ্টির কথা — এবং দার্শনিকদের মধ্যে, যেমন হেগেলের বেলায়, এই সৃষ্টির ব্যাপারটা খ্রীষ্টধর্মের চেয়েও প্রায়ই অনেক বেশি জট-পাকনো ও বিদ্‌ঘুটে হয়ে ওঠে -- তাঁদের নিয়ে গড়ে উঠেছে ভাববাদীদের শিবির। অন্যেরা যাঁরা প্রকৃতিকে আদি মনে করেছেন তাঁরা বিভিন্ন বস্তুবাদী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ভাববাদ এবং বস্তুবাদ এই দুটি পরিভাষা শুরুতে এ ছাড়া আর কিছুই বোঝায় নি, এবং এখানেও এগুলি অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। আমরা পরে দেখব এগুলির উপর অন্য কোনো অর্থ আরোপ করলে কী রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

কিন্তু চিন্তার সঙ্গে সত্তার সম্পর্কের প্রশ্নটির আরো একটা দিক আছে: যে জগৎ দ্বারা আমরা পরিবৃত সে সম্বন্ধে আমাদের চিন্তার সঙ্গে সেই জগতের সম্পর্ক কী রকম? আমাদের চিন্তা কি বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সক্ষম, বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যা ধারণা, সেটা কি বাস্তবতার সঠিক প্রতিবিম্ব দিতে পারে? দর্শনের পরিভাষায় এই সমস্যাটিকে বলা হয় চিন্তা ও সত্তার অভিন্নতার সমস্যা। দার্শনিকদের বিপুল অধিকাংশই প্রশ্নটির ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। যেমন হেগেলের ক্ষেত্রে এই ইতিবাচক উত্তর স্বতঃসিদ্ধ: কেননা বাস্তব জগতের ক্ষেত্রে আমরা যার জ্ঞানলাভ করি তা হল সে জগতের মননসার, সেইটে যার কল্যাণে এ বিশ্ব হয়ে উঠছে পরম ভাবসত্তার ক্রমিক রূপায়ণ, যে ভাবসত্তা অনাদিকাল যাবৎ বিশ্ব থেকে স্বাধীনভাবে এবং বিশ্বের আগে থেকে কোথাও না কোথাও বর্তমান ছিল। একথা স্বতঃস্পষ্ট যে, মননপ্রক্রিয়া এমন একটা সারবস্তুকে জানতে সক্ষম, যা আগে থেকেই একটা মননসার। একথাও সমান সুস্পষ্ট যে, এখানে যা প্রতিপাদ্য সেটা মূল বাক্যের মধ্যেই সঙ্গোপনে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও চিন্তা ও সত্তার অভিন্নতা সংক্রান্ত তাঁর প্রমাণ থেকে আরো এই সিদ্ধান্ত করতে হেগেলের কোন বাধা হয় নি যে, তাঁর দর্শন তাঁর নিজের চিন্তার কাছে সঠিক বলেই সেটা একমাত্র সঠিক দর্শন, তাই চিন্তা ও সত্তার অভিন্নতার জন্য মানবজাতিকে তাঁর দর্শনকে তত্ত্বের ক্ষেত্র থেকে ব্যবহারে পরিবর্তিত করে সমগ্র জগৎকে হেগেলীয় মূলসূত্র অনুসারে রূপান্তরিত করতে হবে। প্রায় সমস্ত দার্শনিকের মতোই হেগেলও এই ভ্রান্তিটি পোষণ করেন।

এ ছাড়া আরো একদল দার্শনিক আছেন, যাঁরা বিশ্ব বিষয়ে কোনো জ্ঞানের সম্ভাবনা বা অন্তত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের সম্ভাবনা অস্বীকার করেন। আধুনিকদের মধ্যে এই দলে পড়েন হিউম এবং কাণ্ট এবং তাঁরা দর্শনের বিকাশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এই মতের খণ্ডনে চূড়ান্ত কথাটা ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যতটা সম্ভব তা হেগেল ইতিপূর্বেই বলে গেছেন। ফয়েরবাখ-সংযোজিত বস্তুবাদী আপত্তিগুলিতে গভীরতার চেয়ে চাতুর্য বেশি; অন্যান্য দার্শনিক উদ্ভটত্বের মতোই একথারও চূড়ান্ত খণ্ডন হল প্রয়োগ, অর্থাৎ পরীক্ষা ও শিল্প। আমরা যদি কোনো এক প্রাকৃতিক ঘটনা নিজেরাই ঘটাতে পারি, তার সমস্ত শর্ত পূরণ করে তাকে সম্ভব করে তুলতে পারি এবং তার উপরে তাকে আমাদের কাজে লাগাতে পারি, তাহলে সে ঘটনা বিষয়ে আমাদের ধারণার যাথার্থ্য প্রমাণ হবে ও তার ফলে কাণ্টের অজ্ঞেয় 'প্রকৃত-বস্তুর' অবসান ঘটবে। যতদিন না জৈব রসায়ন একের পর এক উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের রাসায়নিক বস্তুগুলি উৎপাদন করতে শুরু করে ততদিন পর্যন্ত এগুলিও ছিল ওই জাতীয় 'প্রকৃত-বস্তু'; 'প্রকৃত-বস্তুটি' তখন আমাদের বস্তুতে পরিণত হল, যেমন হয়েছে অ্যালিজারিন অর্থাৎ ম্যাডারের রং বস্তুটি — এখন আমরা ক্ষেতে চাষ করা ম্যাডারের শিকড় থেকে তা নিষ্কাশন করি না, অনেক সহজে আর সস্তায় তা উৎপাদন করি আলকাতরা থেকে। তিনশ' বছর ধরে কোপের্নিকাস বর্ণিত সৌরজগৎ ছিল একটি প্রকল্প, সেটা খুব সম্ভবপর হলেও তবুও শেষ পর্যন্ত প্রকল্প মাত্রই। কিন্তু যখন লেভেরিয়ে এই প্রণালীর তথ্য অনুসারে শুধু যে একটি অজ্ঞাত গ্রহের অস্তিত্বের প্রয়োজন অনুমান করলেন তাই নয়, এমনকি সেই গ্রহ আকাশের কোথায় থাকতে বাধ্য তাও হিসাব করে ঠিক করলেন, এবং যখন

গাল্লে বাস্তবিকই সেই গ্রহকে (১০৭) খুঁজে বার করলেন, তখন কোপের্নিকাসের প্রণালী প্রমাণিত হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি জার্মানিতে নব্যকাণ্টপন্থীরা কাণ্টের মতবাদ এবং ইংলণ্ডে অজ্ঞেয়তাবাদীরা (১০৮) হিউমের মতবাদ (যেখানে বস্তুত এ মতবাদ কখনো নিশ্চিহ্ন হয় নি) পুনরুজ্জীবিত করবার প্রচেষ্টা করেন, তাহলে বহুকাল আগেই উভয় মতের তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত খণ্ডন হয়ে যাবার পর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ হল পশ্চাদপসরণ মাত্র এবং কার্যক্ষেত্রে এ হল কেবল বস্তুবাদকে জগতের সামনে অস্বীকার করে গোপনে তা গ্রহণ করার এক লজ্জিত ধরন মাত্র।

কিন্তু দেকার্ত থেকে হেগেল এবং হব্‌স থেকে ফয়েরবাখ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল ধরে দার্শনিকেরা মোটেই বিশুদ্ধ মননের শক্তিতে পরিচালিত হন নি, যদিও তাঁরা তাই মনে করেছেন। পক্ষান্তরে, যা তাঁদের প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বেশি ঠেলে এগিয়ে দিয়েছে তা হল প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং শিল্পের দ্রুত অগ্রগতির জোয়ার। বস্তুবাদীদের বেলায় সেটা এমনিতেই পরিষ্কার। কিন্তু ভাববাদী দার্শনিকদের তন্ত্রগুলিও ক্রমবর্ধমানভাবে বস্তুবাদী আধেয় দিয়ে নিজেদের পূর্ণ করতে লাগল এবং সর্বভূতেশ্বরবাদ (১০৯) ধরনে আত্মা ও পদার্থের বিরোধ সমন্বয়ের প্রয়াস পেল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত হেগেলীয় দর্শনতন্ত্র হল পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ভাববাদী ভঙ্গিতে উল্টো করে দাঁড় করানো বস্তুবাদ।

অতএব বুঝতে পারা যায় স্টার্কে কেন ফয়েরবাখের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় প্রসঙ্গে প্রথমেই চিন্তা ও সত্তার সম্পর্ক সংক্রান্ত এই মৌলিক সমস্যাটির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কী তাই অনুসন্ধান করেছেন। একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় পূর্ববর্তী দার্শনিকদের, বিশেষত কাণ্টপরবর্তী দার্শনিকদের কথা অনাবশ্যক গুরুত্বগম্ভীর দার্শনিক ভাষায় আলোচনার পর, হেগেলের রচনার কয়েকটি অনুচ্ছেদের প্রতি অতিরিক্ত রকমের ফর্মালিস্ট মনোযোগ অর্পণ করে তাঁর প্রকৃত প্রাপ্য না দিয়ে ফয়েরবাখের প্রাসঙ্গিক সব রচনা-পারম্পর্যে প্রতিফলিত তাঁর 'অধিবিদ্যার' ক্রমবিকাশ খুঁটিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এ বর্ণনা সযত্নে ও প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যাত, কেবল স্টার্কে-র সমগ্র গ্রন্থের মতোই তা দার্শনিক পরিভাষায় কণ্টকিত, যা সর্বত্র অপরিহার্য নয়। এই পরিভাষা আরো বিরক্তিকর লাগে এই কারণে যে, লেখক কোনো একটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের

এমনকি ফয়েরবাখেরও বাগ্‌ধারা অনুসরণ করে যান নি, অতি বিভিন্ন সব ধারার, বিশেষত আজকাল দর্শনমন্য যেসব ধারার বহুল প্রচলন, সেগুলির পরিভাষা তার মধ্যে গুঁজে দিয়েছেন।

যদিও অবশ্য ফয়েরবাখ কখনো ঠিক গোঁড়া হেগেলপন্থী ছিলেন না, তবু তাঁর বিবর্তনধারা হল জনৈক হেগেলপন্থীর বস্তুবাদীতে পরিণতির বিবর্তন। এই বিকাশের কোনো এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে তাঁর পূর্বসূরির ভাববাদী দর্শনতন্ত্রের সঙ্গে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ প্রয়োজন হয়। শেষ পর্যন্ত অনিবার্যভাবেই তাঁর উপলব্ধি হয় যে, হেগেলীয় 'পরম ভাবসত্তার' প্রাক্-বিশ্ব অস্তিত্ব, বিশ্বের অস্তিত্বের আগেই 'যৌক্তিক বর্গসমূহের পূর্বস্থিতি' আসলে বিশ্ববহির্ভূত এক স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসের আজগুবি জের ছাড়া আর কিছুই নয়; আমরা যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক জগতের অন্তর্গত সেটাই একমাত্র সত্য, এবং আমাদের চেতনা ও চিন্তা যতই অতীন্দ্রিয় বলে প্রতীত হোক না কেন তা একটি পদার্থময় অঙ্গ — মস্তিষ্কের সৃষ্টি। চৈতন্য থেকে পদার্থ উৎপন্ন নয়, বরং চৈতন্য হল পদার্থের সর্বোচ্চ সৃষ্টি। নিঃসন্দেহেই একথা হল বিশুদ্ধ বস্তুবাদ। কিন্তু এই পর্যন্ত অগ্রসর হয়েই ফয়েরবাখ হঠাৎ থেমে যান। তিনি প্রচলিত দার্শনিক কুসংস্কার উত্তীর্ণ হতে পারেন না, যদিও সে কুসংস্কার জিনিসটার বিরুদ্ধে নয়, 'বস্তুবাদ' নামটির বিরুদ্ধে। তিনি বলেন:

'আমার কাছে বস্তুবাদ হল মানবিক সত্তা ও জ্ঞানরূপী ইমারতটির ভিত্তি; কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে শারীরবৃত্তবিদের কাছে, প্রকৃতিবিজ্ঞানীর কাছে, যেমন মলেশট-এর কাছে বস্তুবাদ যা, আমার কাছে তা নয় — তাদের পেশা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ঐ ইমারতটাই হল বস্তুবাদ। বস্তুবাদীদের সঙ্গে পেছনের দিকে আমি সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু সামনের দিকে নয়।'

পদার্থ ও চৈতন্যের সম্পর্ক বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সাধারণ বিশ্ববীক্ষা রূপে বস্তুবাদ এবং ইতিহাসের কোন এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে যথা অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বিশ্ববীক্ষা যে বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়েছিল, এই দুটি জিনিসকে এখানে ফয়েরবাখ গুলিয়ে ফেলেছেন। শুধু তাই নয়, আজও প্রকৃতিবিজ্ঞানী এবং শারীরবৃত্তবিদদের মাথায় অষ্টাদশ

শতাব্দীর বস্তুবাদটি যে অগভীর ও স্থূল রূপে বিরাজমান, এবং পঞ্চাশের দশকে ব্যুখনার, ফগ্‌ট ও মলেশট তাঁদের সফরকালে তার যে রূপটি প্রচার করেছেন, ফয়েরবাখ সেটাকেও এর সঙ্গে তাল পাকিয়েছেন। কিন্তু ভাববাদ যেমন পরপর নানা স্তরের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে, বস্তুবাদও তাই। এমনকি প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রতিটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তারও রূপ বদল করতে হয়েছে। এবং ইতিহাসের উপরও বস্তুবাদ প্রযুক্ত হবার পর এখানেও তার বিকাশের একটি নতুন পথ উন্মোচিত হয়েছে।

গত শতাব্দীর বস্তুবাদ ছিল প্রধানতই যান্ত্রিক, কেননা সেসময়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানের মধ্যে শুধুমাত্র বলবিজ্ঞান একটা নির্দিষ্ট উপসংহারে পেঁছেছে, তাও আবার সে হল শুধু কঠিন (পার্থিব ও নভোচারী) বস্তুর বলবিজ্ঞান, অর্থাৎ সংক্ষেপে অভিকর্ষের বলবিজ্ঞান। রসায়ন তখন নেহাতই তার শৈশবে — ফ্লজিস্টন (১১০) তত্ত্বের পর্যায়ে। জীববিজ্ঞানের তখনো কাঁথামোড়া নবজাতকের মতো অবস্থা: উদ্ভিদ ও প্রাণীজীব-সত্তা নিয়ে স্থূল ধরনের পরীক্ষা করা হয়েছে এবং শুধু যান্ত্রিক কারণের সাহায্যে সেগুলির ব্যাখ্যা হচ্ছে। দেকার্তের কাছে জীবজন্তু যা, অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদীদের কাছে মানুষও তাই, যন্ত্রমাত্র। চিরায়ত ফরাসী বস্তুবাদের প্রথম বিশিষ্ট এবং সেকালের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী ত্রুটি হল রাসায়নিক ও জৈব প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বলবিদ্যার মাপকাঠি প্রয়োগ — এই সব প্রক্রিয়ায় অবশ্য বলবিদ্যার নিয়মাবলিও বৈধ, কিন্তু তা অন্য উন্নততর নিয়মের চাপে পিছনে হটে গিয়েছে।

এই বস্তুবাদের দ্বিতীয় বিশিষ্ট সীমাবদ্ধতা হল বিশ্বকে একটা প্রক্রিয়া হিশেবে, অবিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্য দিয়ে যাওয়া পদার্থ হিশেবে উপলব্ধির অক্ষমতা। এই অক্ষমতার সঙ্গে সেসময়কার প্রকৃতিবিজ্ঞানের মাত্রা ও তৎসংযুক্ত অধিবিদ্যামূলক অর্থাৎ দ্বন্দ্বতত্ত্ববিরোধী দার্শনিকতার সঙ্গতি ছিল। তখনো এটুকু জানা ছিল যে, প্রকৃতি অন্তত গতিময়। কিন্তু তখনকার ধারণা অনুসারে এই গতি অনন্তকাল ঘটে চলেছে একই বৃত্তে এবং অতএব একই স্থানে আবদ্ধ, বারবার একই ফলাফল সৃষ্টি করছে। এই ধারণা তখন অনিবার্য ছিল। সৌরজগতের উদ্ভব বিষয়ে কাণ্টের মতবাদ (১১১) তখন সবেমাত্র প্রস্তাবিত হয়েছে এবং

তখনো মতবাদটি শ্ধুমাত্র কৌতুকাবহ। পৃথিবীর বিকাশের ইতিহাস বা ভূতত্ত্ব তখনো একান্তভাবেই অজ্ঞাত এবং সেসময়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এ ধারণা হাজির করাই সম্ভব হয় নি যে, আজকের দিনের জীবন্ত প্রাণীগুলি সরল থেকে জটিলে বিবর্তনের এক সুদীর্ঘ ধারার পরিণাম। অতএব, প্রকৃতি সংক্রান্ত অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অনিবার্য ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিকদের এ নিয়ে দোষারোপ করা এই কারণে আরো অসঙ্গত হবে যে, হেগেলের মধ্যেও একই ব্যাপার দেখা যায়। তাঁর মতে ভাবসত্তার মাত্র 'অনন্বয়' হিশাবে প্রকৃতির কোনো কালগত বিকাশ সম্ভব নয়; তার শুধুমাত্র দেশগত (space) বৈচিত্র্য প্রসারিত হতে পারে, অতএব তার মধ্যে বিবৃত বিকাশের সমস্ত স্তর তা একই সময়ে এবং পাশাপাশি উদ্ঘাটিত করে দেয় এবং একই প্রক্রিয়ার অন্তত পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য। দেশগত, কিন্তু কালবহির্ভূত — অথচ সেটা হল যে কোনো বিকাশের মূল শর্ত — বিকাশের এই আজগুবি ধারণাটা হেগেল প্রকৃতির উপর আরোপ করেন ঠিক এমন এক সময়ে যখন কিনা ভূতত্ত্ব, ভ্রূণতত্ত্ব, উদ্ভিদ ও জীবের শারীরবৃত্ত এবং জৈব রসায়ন যথেষ্ট বিকশিত হয়েছে এবং যখন এই নতুন বিজ্ঞানগুলির ভিত্তিতে সর্বত্রই বিবর্তনের ভবিষ্যৎ তত্ত্বের উজ্জ্বল পূর্বাভাস দেখা দিচ্ছে (যথা গ্যেটে এবং লামার্ক)। কিন্তু এটা তাঁর দর্শনতন্ত্রের জন্য দরকার; অতএব সেই দর্শনতন্ত্রের খাতিরে তাঁর পদ্ধতির কপটতা প্রয়োজন।

ইতিহাসের ক্ষেত্রেও একই অনৈতিহাসিক ধারণা প্রচলিত ছিল। সেখানে মধ্য যুগের জেরের সঙ্গে সংগ্রামে দৃষ্টি আবিল হয়েছিল। মধ্য যুগকে ধরা হত যেন হাজার বছরের সর্বাত্মক বর্বরতা দিয়ে ইতিহাসের একটা ছেদ। মধ্য যুগে ঘটা বিরাট অগ্রগতি — ইউরোপীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্র বিস্তার, পাশাপাশি মহান প্রাণবান জাতিগুলির উদ্ভব এবং সর্বোপরি চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর বিরাট টেকনিকাল অগ্রগতি, এসব কিছুই লক্ষ্য করা হত না। এইভাবে ইতিহাসের বিরাট অন্তর্সম্পর্ক প্রসঙ্গে একটা যুক্তিসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি অসম্ভব হয়েছিল এবং ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল বড়ো জোর যেন দার্শনিকদের কাজে লাগবার মতো দৃষ্টান্ত ও উদাহরণের সংকলন।

পঞ্চাশের দশকের জার্মানিতে যে বিকৃতিকারকেরা বস্তুবাদ-ফেরিওয়ালাদের ভূমিকা নিতেন, তাঁরা তাঁদের গুরুদেবদের এই সংকীর্ণতা কোনমতেই উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। ইতিমধ্যে প্রকৃতিবিজ্ঞানের যা-কিছু অগ্রগতি হয়েছিল সেগুলি তাঁদের কাজে লাগত কেবল জগৎস্রষ্টার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে নতুন প্রমাণ হিশেবে। বস্তুত, মতবাদটিকে উন্নততর করার কাজে তাঁদের কোনই আগ্রহ ছিল না। যদিও ভাববাদের ক্ষমতা শেষ সীমায় পেণছৈছিল এবং ১৮৪৮-এর বিপ্লব তার উপর মৃত্যুবাণ হানল, তবুও তার এটুকু সান্ত্বনা ছিল যে, বস্তুবাদের পতন ঘটেছে তখন আরো নিচে। এধরনের বস্তুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ফয়েরবাখ নিঃসন্দেহেই ঠিক কাজ করেছিলেন; তবে এই ভ্রাম্যমাণ প্রচারকদের মতবাদকে সাধারণভাবে বস্তুবাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা তাঁর পক্ষে উচিত হয় নি।

এখানে কিন্তু দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, ফয়েরবাখের জীবদ্দশাতে প্রকৃতিবিজ্ঞানে প্রচণ্ড আলোড়নের অবস্থা চলেছে, মাত্র গত পনেরো বছরেই তা একটা বোধবিধায়ক, আপেক্ষিক উপসংহারে উপনীত হয়েছে। তখন আগের তুলনায় অভাবনীয় পরিমাণ নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে; কিন্তু সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং তারই সাহায্যে একের পর এক ঘটে চলা আবিষ্কারগুলির বিশৃঙ্খলায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা কেবলমাত্র সাম্প্রতিক কালেই সম্ভব হয়েছে। একথা সত্য যে, ফয়েরবাখের জীবদ্দশাতেই তিনটি চূড়ান্ত আবিষ্কার ঘটেছিল — জীবকোষ, শক্তির রূপান্তর এবং ডারউইনের নামাঙ্কিত বিবর্তনের তত্ত্ব আবিষ্কার। কিন্তু তখন পর্যন্ত স্বয়ং প্রকৃতিবিজ্ঞানীরাই যেসব আবিষ্কার নিয়ে হয় বিতর্ক করছেন, নয় তার পর্যাপ্ত ব্যবহার কীভাবে হতে পারে তা বুঝতে পারছেন না, সেসব আবিষ্কারের পূর্ণমূল্য উপলব্ধি করতে হলে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি যে পরিমাণ অনুসরণ করতে হয় তা গ্রামাঞ্চলের নির্জনে নিঃসঙ্গ দার্শনিকটির পক্ষে কীভাবে সম্ভব হতে পারে? জার্মানির দুরবস্থাই এর জন্য দায়ী; তারই ফলে একলেকটিক ঊর্ণাজাল বিস্তারকারীরাই দর্শন-অধ্যাপনার প্রধান পদগুলি দখল করে রেখেছিলেন, অথচ তাঁদের চেয়ে ঢের বড়ো হলেও

ফয়েরবাখকে একটি ছোট্ট পল্লীতে বসে গ্রাম্য ও নীরস হয়ে উঠতে হয়েছিল। অতএব, এখন প্রকৃতি বিষয়ে যে ঐতিহাসিক বোধ সম্ভব হয়েছে এবং যার সাহায্যে ফরাসী বস্তুবাদের সমস্ত একপেশেমি দূর করা যায়, তা যে ফয়েরবাখের পক্ষে অনধিগম্য ছিল সেটা তাঁর দোষ নয়।

দ্বিতীয়ত, ফয়েরবাখ সম্পূর্ণ সঠিকভাবেই বলেছেন যে, নিছক প্রকৃতিবিজ্ঞানমূলক বস্তুবাদই 'মানবিক জ্ঞানরূপী ইমারতটি নয়, সে ইমারতের ভিত্তিমাত্র', কেননা, আমাদের জীবন চলে শুধুমাত্র প্রকৃতিতেই নয়, মানব-সমাজেও, এবং প্রকৃতির মতো তারও বিকাশের ইতিহাস আছে, বিজ্ঞান আছে। অতএব প্রশ্ন ছিল সমাজের বিজ্ঞানের সঙ্গে, অর্থাৎ তথাকথিত ঐতিহাসিক ও দার্শনিক বিজ্ঞানগুলির যোগফলের সঙ্গে বস্তুবাদী ভিত্তির সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা এবং এই ভিত্তির উপর এই বিজ্ঞানের পুনর্গঠন করা। কিন্তু ফয়েরবাখের পক্ষে এই কাজ সম্পাদনের ভাগ্য হয় নি। এই 'ভিত্তিটি' সত্ত্বেও তিনি সাবেকী ভাববাদের বন্ধনে আবদ্ধ রইলেন, যে কথা তিনি এই বলে স্বীকার করেছেন যে, 'বস্তুবাদীদের সঙ্গে পেছনের দিকে আমি সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু সামনের দিকে নয়।' কিন্তু এ ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে স্বয়ং ফয়েরবাখই 'সামনের দিকে' অগ্রসর হন নি, ১৮৪০ বা ১৮৪৪-এ তাঁর যে মতবাদ ছিল তা ছাড়িয়ে এগোন নি। এবং এরও কারণ আবার প্রধানতই তাঁর নিঃসঙ্গ জীবন, যার ফলে সামাজিক মেলামেশার ব্যাপারে দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে আগ্রহশীল হয়েও তিনি বাধ্য হয়েছিলেন অন্যান্য সমতুল্য ব্যক্তিদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও প্রতিবাদী আদানপ্রদানের বদলে শুধুমাত্র নিজের নিঃসঙ্গ মাথা থেকেই চিন্তা উৎপাদন করতে। আমরা পরে বিশদে দেখব, এই ক্ষেত্রে তিনি কতখানি ভাববাদী হয়ে থেকেছেন।

এখানে শুধু আরো এটুকু বলা দরকার যে, স্টার্কে ভুল জায়গায় ফয়েরবাখের ভাববাদ অনুসন্ধান করেছেন।

'ফয়েরবাখ ভাববাদী; তিনি মানব অগ্রগতিতে বিশ্বাসী' (পৃঃ ১৯)। 'সমগ্রের ভিত্তিটি, বনিয়াদটি তবুও ভাববাদী রয়ে গেছে। আমাদের কাছে বাস্তববাদ (realism) বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ মাত্র, আসলে আমরা আমাদের ভাববাদী ধারাই অনুসরণ করে যাই। করুণা, প্রেম, সত্যোৎসাহ এবং ন্যায়ানুসরণ কি ভাববাদী শক্তি নয়?' (পৃঃ VIII)।

প্রথমত, এখানে ভাববাদের অর্থ আদর্শ লক্ষ্যপ্রবণতা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সেগুলি বড়ো জোর কাণ্টীয় ভাববাদ ও তাঁর 'পরম নির্দেশের' (categorical imperative) পক্ষে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু স্বয়ং কাণ্ট তাঁর দর্শনকে 'তুরীয় ভাববাদ' আখ্যা দিয়েছিলেন — তার কারণ মোটেই এই নয় যে, তিনি এ দর্শনে নৈতিক আদর্শেরও আলোচনা করেছেন। স্টার্কে-র নিশ্চয়ই মনে পড়বে, তার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। নৈতিক অর্থাৎ সামাজিক আদর্শে বিশ্বাস হল দার্শনিক ভাববাদের সারমর্ম, এই কুসংস্কারের উৎস দর্শনের বাইরে, জার্মান কূপমণ্ডূকদের মধ্যে, যাঁরা কিনা তাঁদের প্রয়োজনীয় দার্শনিক জ্ঞান মুখস্থ করে রেখেছেন শিলারের পদ্য থেকে। কাণ্টের অক্ষম 'পরম নির্দেশকে' (অক্ষম কেননা তার দাবিটা অসম্ভব এবং অসম্ভব বলেই তা কখনো একটুকু বাস্তব হয় না) পরিপূর্ণ ভাববাদী হেগেলের চেয়ে বেশি কঠোর সমালোচনা আর কেউ করেন নি, অবাস্তব আদর্শ নিয়ে কূপমণ্ডূকসুলভ ভাবালু যে উৎসাহ শিলার মারফত পরিবেশিত হয়েছে, তাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে উপহাস আর কেউ করেন নি (দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর 'Phenomenology' দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয়ত, একথা অস্বীকার করবার কোনই উপায় নেই যে, মানুষকে যা কর্মে চালিত করে তা সবই আসে তার মস্তিষ্কের মাধ্যমেই, আহার ও পানের ক্ষেত্রেও, যেটা শুরু হয় মস্তিষ্কের মাধ্যমে সঞ্চারিত ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধের ফল হিশেবে এবং শেষ হয় একইভাবে মস্তিষ্কের মাধ্যমে সঞ্চারিত তৃপ্তি বোধের ফল হিশেবে। মানুষের উপর বহির্জগতের প্রভাব অভিব্যক্ত হয় তার মস্তিষ্কেই; অনুভূতি, চিন্তা, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা রূপে সেখানে প্রতিফলিত হয়, সংক্ষেপে, প্রতিফলিত হয় 'আদর্শ প্রবণতার' রূপে, এবং এই রূপেই তা 'আদর্শ শক্তিতে' পরিণত হয়। অতএব, কেউ 'আদর্শ প্রবণতার' অনুগামী বলেই এবং 'আদর্শ শক্তি' তার উপর প্রভাবশীল, একথা স্বীকার করলেই যদি সে ভাববাদী বলে প্রতিপন্ন হয়, তাহলে যে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তিই তো জন্ম-ভাববাদী হবেন এবং সে ক্ষেত্রে আদৌ কোন বস্তুবাদী কি সম্ভব হতে পারে?

তৃতীয়ত, মানবতা — অন্তত বর্তমানে — মোটের উপর প্রগতির অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে, এই বিশ্বাসের সঙ্গে বস্তুবাদ-বনাম-ভাববাদের সংঘর্ষের

কোন সম্পর্ক নেই। ডীইস্ট (১১২) ভল্টেয়র এবং র‍ুসোর মতো ফরাসী বস্তুবাদীরাও সমানে এই বিশ্বাস পোষণ করতেন প্রায় একটা উগ্রান্ধ মাত্রায় এবং সেজন্য অনেক সময়েই ব্যক্তিগতভাবে মহান স্বার্থত্যাগও করেছেন। যেমন, যদি কেউ ভাল অর্থে 'সত্যোৎসাহ ও ন্যায়ানুসরণে' সমগ্র জীবন উৎসর্গ করে থাকেন তাহলে তিনি দিদরোই। অতএব, স্টার্কে যদি এ সমস্তকেই ভাববাদ বলে ঘোষণা করেন তাহলে শুধু প্রমাণ হবে যে, 'বস্তুবাদ' শব্দটি এবং উভয় চিন্তাধারার মধ্যে গোটা বিরোধটির এখানে সমস্ত তাৎপর্য তাঁর কাছে লুপ্ত হয়ে গেছে।

আসল কথা হল 'বস্তুবাদ' শব্দটির বিরুদ্ধে পুরোহিতদের সুদীর্ঘকালব্যাপী কটূক্তির ফলে এর বিরুদ্ধে যে সাবেকী ফিলিস্টাইন সংস্কার সৃষ্টি হয়েছে, স্টার্কে এখানে — যদিও হয়ত অচেতনভাবেই — সেই সংস্কারের প্রতি মার্জনাহীন আনুকূল্য প্রকাশ করেছেন। বস্তুবাদ শব্দটা বলতে ফিলিস্টাইন বোঝে ভোজনবিলাস, মাতলামি, আত্মম্ভরিতা, দেহকাম, ঔদ্ধত্য, লোভ, কৃপণতা, লালসা, মুনাফা শিকার এবং ফাটকাবাজি জোচ্চুরি, সংক্ষেপে, সেই সমস্ত নোংরা কদভ্যাস যা সে নিজে আচরণ করে গোপনে। ভাববাদ বলতে সে বোঝে সদাচার, সমস্ত মানব-সমাজের প্রতি প্রেম এবং সাধারণভাবে এক 'উন্নততর পৃথিবীতে' বিশ্বাস, যা নিয়ে সে অপরের কাছে বড়াই করে বটে, কিন্তু নিজে তাতে বিশ্বাস রাখে বড়ো জোর তখন, যখন অত্যধিক মদ্যপানের পর সকালে মাথা ধরেছে অথবা দেউলে হতে হয়েছে — এককথায়, তার নিত্য 'বস্তুবাদী' আতিশয্যের ফল ভোগ হবার পর। সেই সময়েই সে তার প্রিয় গানটি ধরে: মানুষ কে? অর্ধ-পশু, অর্ধ-দেবশিশু।

এটুকু ছাড়া আর যা আছে তাতে আজ জার্মানিতে যেসব প্রগল্ভ উপ-অধ্যাপকেরা দার্শনিক নামে খ্যাত তাঁদের আক্রমণ ও মতবাদের বিরুদ্ধে ফয়েরবাখকে সমর্থন করবার উদ্দেশ্যে স্টার্কে বিশেষ আয়াস করেছেন। চিরায়ত জার্মান দর্শনের গর্ভস্রাবে যাঁদের উৎসাহ আছে তাঁদের কাছে এসব অবশ্যই মূল্যবান; স্টার্কে-র কাছে হয়ত এসব প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। আমরা কিন্তু পাঠকদের এ থেকে নিষ্কৃতি দেব।

৩

ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ে ফয়েরবাখের দর্শন দেখলেই তাঁর আসল ভাববাদটি স্পষ্ট ধরা পড়ে। তিনি কোনো মতেই ধর্মের উচ্ছেদ চান না; তিনি ধর্মকে উন্নত করতে চান। ধর্মের মধ্যে দর্শনকেই বিলীন হতে হবে।

'মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন যুগকে শুধুমাত্র ধর্মের পরিবর্তন দিয়েই পৃথক করতে হবে। মূল যখন থাকে মানবহৃদয়ে, শুধুমাত্র তখনই কোনো ঐতিহাসিক আন্দোলন গভীর ভিত্তি পায়। হৃদয় ধর্মের একটা আধার নয়, যাতে ধর্ম হৃদয়ের মধ্যেও থাকবে; হৃদয়ই ধর্মের সারার্থ।' (পৃঃ ১৬৮-এ স্টার্কে উদ্ধৃত করেছেন।)

ফয়েরবাখের মতে, মানুষে-মানুষে প্রীতিমূলক সম্পর্কই, হৃদয়ভিত্তিক সম্পর্কই হল ধর্ম; এতদিন পর্যন্ত এ সম্পর্ক বাস্তবের এক কাল্পনিক প্রতিবিম্বের মধ্যেই, মানবগুণের কাল্পনিক প্রতিবিম্বস্বরূপ এক বা বহু দেবতার মাধ্যমে তার সত্য অন্বেষণ করেছে; কিন্তু এখন প্রত্যক্ষভাবে এবং অপর কিছুর মাধ্যম ছাড়াই 'আমি' এবং 'তুমি'র মধ্যে প্রেমেই সে সত্য খুঁজে পেয়েছে। অতএব, শেষ পর্যন্ত ফয়েরবাখের কাছে এই নতুন ধর্মের সর্বোচ্চ যদিই বা না হয় তাহলেও অন্তত একটি উচ্চতম রূপ হল যৌনপ্রেম।

যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে মানুষ আছে ততদিন পর্যন্ত মানুষে-মানুষে প্রীতির, বিশেষত স্ত্রী-পুরুষে প্রীতির সম্পর্ক বর্তমান। বিশেষত যৌনপ্রেমের গত আটশ' বছরের মধ্যে যে বিকাশ ঘটেছে ও যে স্থানে তা পৌঁছেছে তার ফলে এই যুগটায় সে প্রেম সমস্ত কাব্যের অনিবার্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে প্রবর্তিত ধর্মাবলি (positive religions) রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত-যৌনপ্রেমের অর্থাৎ বিবাহ বিধির উপর একটা উচ্চতর পবিত্রতা অর্পণ করার কাজেই সীমাবদ্ধ; এবং প্রেম ও বন্ধুত্বের আচরণে এতটুকু বদল না ঘটিয়েই আগামীকালই এসব বিলুপ্ত হতে পারে। যেমন, ১৭৯৩-১৭৯৮ সালে ফ্রান্সে খ্রীষ্টধর্ম কার্যত এমন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছিল যে, এমনকি নেপোলিয়নও বিনা বাধাবিঘ্নে তা পুনঃপ্রচলিত করতে পারেন নি। অথচ তার জন্য এই মধ্যবর্তী সময়টুকুতে ফয়েরবাখের অর্থে কোন বদলির প্রয়োজন অনুভূত হয় নি।

এখানে ফয়েরবাখের ভাববাদটা হল এই যে, যৌনপ্রেম, বন্ধুত্ব, করুণা, আত্মত্যাগ, প্রভৃতি পারস্পরিক আকর্ষণের উপর নির্ভরশীল সম্পর্কগুলিকে মাত্র তাদের যথার্থ সত্তায়, অর্থাৎ এমনকি তাঁর মতে পর্যন্ত যা কিনা অতীতের ব্যাপার, সেই ধর্মের স্মৃতির সঙ্গে সম্বন্ধহীনভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না। তিনি দাবি করেন যে, শুধুমাত্র 'ধর্মের' নামে পবিত্রীকৃত হলেই এই সম্পর্কগুলির পূর্ণমূল্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁর কাছে প্রধান কথা এই নয় যে, এই একান্ত মানবীয় সম্পর্কাবলির অস্তিত্ব আছে; তার বদলে বড়ো কথা হল এগুলিকে নতুন ও প্রকৃত ধর্ম বলে বিবেচনা করতে হবে। ধর্মের একটা ছাপ মারবার পরই তিনি এগুলির মূল্য স্বীকার করবেন। রিলিজিয়ন (ধর্ম) শব্দটি এসেছে religare ক্রিয়া থেকে এবং তার আদি-অর্থ হল বন্ধন। অতএব দুটি মানুষের মধ্যে যে কোনো বন্ধনই হল ধর্ম। এ জাতীয় ব্যুৎপত্তিগত কায়দাই ভাববাদী দর্শনের শেষ সম্বল। কথাটার আসল প্রয়োগের ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে কী বোঝাচ্ছে সেটা নয়, ব্যুৎপত্তির দিক থেকে শব্দটির পক্ষে কী বোঝানো উচিত এটাই যেন আসল কথা। অতএব যৌনপ্রেম ও নরনারীর মিলনকেই ধর্মের স্তরে উন্নীত করা হোক যাতে ভাববাদী স্মৃতির পক্ষে অমন প্রিয় একটা শব্দ — ধর্ম — ভাষা থেকে মুছে না যায়। চল্লিশের দশকে প্যারিসের লুই ব্লাঁ ধারার সংস্কারকেরা ঠিক একইভাবে কথা বলতেন। ধর্ম ছাড়া মানুষ বলতে তাঁরাও নেহাতই দানব বুঝতেন এবং আমাদের বলতেন: Donc, l'athéisme c'est votre religion!* ফয়েরবাখ যদি প্রকৃতির মূলত বস্তুবাদী ধারণার উপর প্রকৃত ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চান, তবে সেটা হবে আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানকে খাঁটি এ্যালকেমি বলে বিবেচনা করারই সমান। ঈশ্বর ছাড়াও যদি ধর্ম সম্ভব হয় তাহলে পরশপাথর বাদ দিয়েও এ্যালকেমি হতে পারে। প্রসঙ্গত, ধর্ম এবং এ্যালকেমির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। পরশপাথরের নানা ঐশী শক্তি আছে এবং কপ্প ও বের্তেলো-র তথ্যে প্রমাণ হয়েছে, খ্রীষ্টীয় মতবাদ গড়ে তোলায় প্রথম দুই শতাব্দীর মিশরীয়-গ্রীক এ্যালকেমিস্টদের হাত ছিল।

---

* তার মানে, নাস্তিকতাই আপনাদের ধর্ম। — সম্পাঃ

'মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন যুগকে শুধু ধর্মের পরিবর্তন দিয়েই পৃথক করতে হবে' —ফয়েরবাখের এই দাবি একান্তই ভ্রান্ত। আজ পর্যন্ত যে তিনটি বিশ্ব ধর্ম বর্তমান আছে, বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলামধর্ম, শুধু সেই তিনটির বেলায় বলা যায়, ধর্মমূলক পরিবর্তন বিরাট ঐতিহাসিক পরিবর্তনের **সহচর ছিল।** প্রাচীন উপজাতীয় ও জাতীয় ধর্ম — যেগুলির স্বতঃস্ফূর্ত উদয় হয়েছিল — সেগুলির চরিত্র প্রচারমূলক ছিল না এবং সেই সব উপজাতি ও জনগণের স্বাধীনতা লোপ পাওয়া মাত্র সেগুলি প্রতিরোধের সমস্ত শক্তি হারাল। ক্ষয়িষ্ণু রোমক সাম্রাজ্য ও সেখানে সদ্য গৃহীত, তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ খ্রীষ্টীয় বিশ্ব ধর্মের সঙ্গে সহজ সংযোগই জার্মানদের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল। কমবেশি কৃত্রিমভাবে উত্থিত শুধু এই বিশ্ব ধর্মগুলির ক্ষেত্রেই, বিশেষত খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামধর্মের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, ব্যাপকতর ঐতিহাসিক আন্দোলনের উপর ধর্মের ছাপ পড়েছে। এমনকি খ্রীষ্টধর্মের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, প্রকৃতই বিশ্ব তাৎপর্যের বিপ্লবের ক্ষেত্রে ধর্মের ছাপটুকু ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বুর্জোয়ার মুক্তি সংগ্রামের শুধুমাত্র প্রথমাবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ; এবং তার প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় পূর্বেকার সমগ্র মধ্যযুগীয় ইতিহাসের মধ্যে, যেখানে কিনা ধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব ছাড়া আর কোনো ধরনের ভাবাদর্শ ছিল না, ফয়েরবাখ যে মনে করেছিলেন, এর কারণ মানুষের হৃদয় ও ধর্মমূলক প্রয়োজনের মধ্যে, তা নয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুর্জোয়াও যখন আপন শ্রেণীসঙ্গত ভাবাদর্শ গড়ে তোলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হল তখন সে নিজের মহান ও চূড়ান্ত বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব সম্পন্ন করল শুধু আইনগত ও রাজনৈতিক ধারণার কাছেই আবেদন জানিয়ে, ধর্ম নিয়ে তখন তার শুধু ততটুকুই মাথাব্যথা যতটুকু কিনা এই ধর্ম তার পথে বাধা হয়েছে। কিন্তু একথা সে কখনো ভাবে নি যে, পুরনো ধর্মের স্থানে একটি নতুন ধর্মের প্রবর্তন করতে হবে। এধরনের প্রচেষ্টায় রবেস্পিয়ের (১১৩) কীভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন তা সকলের জানা আছে।

যে সমাজে আমাদের বাস করতে হচ্ছে, যে সমাজ শ্রেণী-সংঘর্ষ ও শ্রেণী-শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের

ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মানবীয় ভাবাবেগের সম্ভাবনা আজকাল বহুলাংশেই হ্রাস পেয়েছে। এই ভাবাবেগগুলিকে ধর্ম হিশেবে গৌরবান্বিত করে আরো হ্রস্ব করার আমাদের কারণ নেই। একইভাবে, বিশেষত জার্মানিতে প্রচলিত ইতিহাসতত্ত্ব বিরাট ঐতিহাসিক শ্রেণী-সংগ্রামকে যথেষ্ট অস্পষ্ট করেছে; অতএব, এইসব সংগ্রামের ইতিহাসকে গির্জা-ইতিহাসের লেজুড়ে পরিণত করে ঐ ইতিহাসবোধকে একেবারে অসম্ভব করে তোলার প্রয়োজনও আমাদের নেই। এ থেকেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, আজ আমরা ফয়েরবাখকে ছাড়িয়ে কতখানি অগ্রসর হয়েছি। তাঁর প্রেমমূলক নবধর্মের গৌরব-কীর্তনে নিবেদিত 'সর্বশ্রেষ্ঠ' রচনাংশও আজ একেবারে অপাঠ্য।

একমাত্র যে ধর্মকে ফয়েরবাখ গুরুত্বসহকারে বিচার করেছেন তা হল খ্রীষ্টধর্ম, একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্ত্যের বিশ্ব ধর্ম। তিনি প্রমাণ করেছেন, খ্রীষ্টীয় ঈশ্বর হল মানুষের অতিকল্পিত প্রতিবিম্ব, মুকুর-চিত্র। এখন এই ঈশ্বর কিন্তু স্বয়ং হলেন এক ক্লান্তিকর অমূর্তায়ন পদ্ধতির পরিণাম, অসংখ্য পুরাতন উপজাতীয় ও জাতীয় দেবতাদের ঘনীভূত সারনির্যাস। অতএব, এই ঈশ্বর যে মানুষের প্রতিবিম্ব সেই মানুষও বাস্তব মানুষ নয়, তাও একইভাবে অসংখ্য বাস্তব মানুষের সারনির্যাস, অমূর্ত অর্থে মানুষ, অতএব নিজেও সে এক ভাবমূর্তি মাত্র। যে ফয়েরবাখ প্রতি পৃষ্ঠায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, প্রত্যক্ষ বাস্তব জগতে বিভোরতার প্রচার করেন, তিনি নিজেই মানুষে-মানুষে মাত্র যৌন-সম্পর্কটুকু ছাড়া বাকি যে কোনো সম্পর্কের কথাই তুলুন না কেন, সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণই অমূর্তপন্থী হয়ে যান।

সমস্ত সম্পর্কের মাত্র একটি দিকই তাঁকে আকৃষ্ট করে, তা হল নৈতিক দিক। এবং এইদিক থেকেও হেগেলের তুলনায় আমরা ফয়েরবাখের আশ্চর্য দৈন্য দেখে স্তম্ভিত হই। হেগেলের নীতিশাস্ত্র বা নৈতিক আচরণের মতবাদ হল অধিকার-দর্শন (philosophy of right) এবং তার অন্তর্গত হল: ১) বিমূর্ত অধিকার, ২) নৈতিকতা, ৩) সুনীতি (Sittlichkeit); আবার এই শেষটির অন্তর্গত হল: পরিবার, নাগরিক সমাজ এবং রাষ্ট্র। এখানে আধারটি যেমন ভাববাদী, আধেয়টি তেমনিই বাস্তববাদী। নৈতিকতা ছাড়াও আইন, অর্থনীতি ও রাজনীতির সমগ্র ক্ষেত্র এর অন্তর্গত। ফয়েরবাখের বেলায় ঠিক এর

বিপরীত। আধারের দিক থেকে তিনি বাস্তববাদী, শুরু করছেন মানুষ থেকে, কিন্তু এ মানুষের বাস কোন্ জগতে তাঁর কোনো উল্লেখ নেই, সুতরাং এ মানুষ সর্বদাই সেই বিমূর্ত মানুষই থেকে যাচ্ছে, যে আধিপত্য করেছে ধর্মের দর্শনে। এ মানুষকে কোন নারী জন্ম দেয় নি; যেন গুটি ভেঙে এ মানুষ বেরিয়ে এসেছে একেশ্বরবাদী ধর্মের ঈশ্বর থেকে। তাই সে ঐতিহাসিকভাবে উৎপন্ন এবং ইতিহাস নির্ধারিত কোনো বাস্তব জগতের বাসিন্দা নয়। অবশ্য অন্য মানুষের সঙ্গে তার আদানপ্রদান আছে সত্য, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেও আবার তারই মতন অমূর্ত মানুষ। ফয়েরবাখের ধর্ম সংক্রান্ত দর্শনে আমরা তবু নর ও নারী পেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর নীতিশাস্ত্র থেকে এই শেষ পার্থক্যটুকুও মুছে গিয়েছে। অবশ্যই ফয়েরবাখ সুদীর্ঘ ব্যবধানের পর পর এ জাতীয় কথাও বলেছেন যে,

'প্রাসাদে ও কুটীরে মানুষের চিন্তা বিভিন্ন।' — 'ক্ষুধা ও ক্লেশের ফলে যদি তোমার দেহে খোরাক কিছু না থাকে, তাহলে তোমার মস্তিষ্ক, মানস ও হৃদয়েও নৈতিকতার জন্যও কোনো খোরাক থাকবে না।' — 'রাজনীতিই আমাদের ধর্ম হওয়া উচিত।' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু এ জাতীয় বচনের সাহায্যে ফয়েরবাখ একেবারে কিছুই লাভ করতে পারেন নি, এগুলি নেহাতই বাক্য হয়ে থেকে যায় এবং এমনকি স্টার্কেকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, ফয়েরবাখের কাছে রাজনীতি ছিল অলংঘনীয় সীমান্ত এবং

'সমাজ সংক্রান্ত বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, তাঁর কাছে ছিল terra incognita (না-জানা ভূমি)।'

হেগেলের তুলনায় সু-কু বিচারেও তিনি সমান অগভীর বলে প্রতীয়মান হন।

হেগেল বলেছেন, 'লোকের বিশ্বাস, মানুষ স্বভাবতই ভাল, একথা বললে বুঝি একটা মস্ত কিছু বলা হয়। কিন্তু লোকে ভুলে যায়, এর চেয়ে ঢের কথা হল, মানুষ স্বভাবতই মন্দ।'

হেগেলের মতে, ঐতিহাসিক বিকাশের চালিকা-শক্তি যে রূপে দেখা দেয় সেটা মন্দ। একথার দুটি অর্থ আছে। একদিকে বুঝতে হবে, প্রতিটি

নতুন অগ্রগতি প্রতিভাত হয় পবিত্রের অপবিত্রকরণ হিশেবেই, যে অবস্থা পুরনো এবং পচা হলেও লোক-ব্যবহার দ্বারা পবিত্রীকৃত তার বিরুদ্ধে বিপ্লব হিশেবে। এবং অপরপক্ষে, শ্রেণী-সংঘর্ষ শুরু হবার পর থেকে মানুষের কু-প্রবৃত্তিগুলিই — লোভ ও ক্ষমতা-লালসা ঐতিহাসিক বিকাশের হাতল হিশেবে কাজ করেছে। সামন্ততন্ত্র এবং বুর্জোয়ার ইতিহাস তার একক একটানা প্রমাণ। কিন্তু নৈতিক কু'য়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা অনুসন্ধান করার কথা ফয়েরবাখের মাথায় আসে নি। তাঁর কাছে ইতিহাস একেবারে এক ভুতুড়ে রাজ্য, যেখানে তিনি অস্বস্তি ভোগ করেন।

'মানুষ যখন প্রকৃতিতে প্রথম উদ্ভূত হল তখন সে নেহাতই প্রকৃতির জীব, মানুষ নয়; মানুষ হল মানুষেরই সৃষ্টি, সংস্কৃতির সৃষ্টি, ইতিহাসের সৃষ্টি' —

এমনকি তাঁর নিজের এই বাণীও তাঁর কাছে রয়ে গেল সম্পূর্ণ বন্ধ্যা।

অতএব, নীতির ব্যাপারে ফয়েরবাখ আমাদের যাকিছু বলেছেন তা নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। সুখানুসন্ধান মানুষের মধ্যে সহজাত, অতএব সমস্ত নৈতিকতার তা ভিত্তি হতে বাধ্য। কিন্তু এই সুখানুসন্ধান দ্বিবিধ সংশোধনসাপেক্ষ। প্রথমত, আমাদের কাজের স্বাভাবিক পরিণাম দ্বারা: পানাধিক্যের পর মাথা ধরে এবং ক্রমাগত বাড়াবাড়ির পর রোগ হয়। দ্বিতীয়ত, তার সামাজিক পরিণাম দ্বারা: আমরা যদি অপরের সমজাতীয় সুখাকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা না দিই তাহলে তারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে, এবং অতএব আমাদের সুখাকাঙ্ক্ষার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। ফলে, আমাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে হলে আমাদের আচরণের পরিণাম ঠিকমতো বিচার করতে পারা চাই এবং অপরকেও সমানভাবেই সুখাকাঙ্ক্ষার অধিকার দিতে আমরা বাধ্য। নিজেদের সম্বন্ধে যুক্তিসিদ্ধ আত্মসংযম এবং অপরের প্রতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রেম — বারবার এই প্রেম! — ফয়েরবাখের নৈতিকতার এই দুটিই হল মৌলিক নিয়ম; অন্যান্য সমস্ত নিয়মই এ দুটির অনুসিদ্ধান্ত। এবং এ কয়েকটি কথার শূন্যতা ও স্থূলতা ফয়েরবাখের চতুরতম যুক্তি বা স্টার্কের সবচেয়ে জোরালো স্তুতিও ঢাকা দিতে পারে না।

শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থেকে মানুষ তার সুখাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে পারে নেহাতই ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে, এবং তাতে লাভ না তার, না

অপরের। বরং তার দরকার বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক, তার প্রয়োজন মেটাবার উপায়গুলি, অর্থাৎ খাদ্য, বিরুদ্ধ লিঙ্গের ব্যক্তি, বই, আলাপ তর্কবিতর্ক, কাজকর্ম এবং ব্যবহার করা ও বানিয়ে তোলার মতো বস্তু। ফয়েরবাখের নৈতিকতায় হয় ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, চরিতার্থতার এই উপকরণ এবং বস্তুগুলি প্রত্যেকেরই নিঃসন্দেহেই আছে, আর না হয় এতে এক অকেজো সদুপদেশই দেওয়া হচ্ছে মাত্র, অতএব যারা এই উপকরণগুলি থেকে বঞ্চিত তাদের কাছে এর কানাকড়িও মূল্য নেই। আর সেকথা ফয়েরবাখ নিজেই স্পষ্টভাবে বলেছেন:

'প্রাসাদে ও কুটীরে মানুষের চিন্তা বিভিন্ন।' — 'ক্ষুধা ও ক্লেশের ফলে যদি তোমার দেহে খোরাক কিছু না থাকে, তাহলে তোমার মস্তিষ্ক, মানস ও হৃদয়েও নৈতিকতার জন্যও কোনো খোরাক থাকবে না।'

অপরের সুখাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার সমান অধিকার প্রসঙ্গেও কি ব্যাপারটা বেশি ভাল দাঁড়ায়? দাবিটাকে ফয়েরবাখ এক পরম দাবি হিশেবে পেশ করেছেন, যা সর্বকালে এবং সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। কিন্তু কবে থেকে এ দাবি স্বীকৃত হয়েছে? প্রাচীনকালে দাস ও প্রভুর মধ্যে, কিংবা মধ্য যুগে ভূমিদাস ও ব্যারনের মধ্যে কোনকালেই কি সুখাকাঙ্ক্ষায় সমান অধিকারের কোন কথা ছিল? শাসক শ্রেণীর সুখাকাঙ্ক্ষার কাছে নিপীড়িত শ্রেণীর এই আকাঙ্ক্ষা কি নির্মমভাবে এবং 'আইন-বলে' বলি দেওয়া হয় নি? — হ্যাঁ, সেটা অবশ্য দুর্নীতিই ছিল; কিন্তু আজকাল সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। — যখন থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রামে ও পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশের খাতিরে সামাজিক বর্গের সমস্ত বিশেষ অধিকার অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিশেষ অধিকার বিলোপ করতে এবং আইনের সামনে, প্রথমত ব্যক্তিগত আইন এবং তারপর ক্রমশ রাষ্ট্রীয় আইনের সামনে সকলের সাম্য প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে, তখন থেকে নেহাতই কথার কথা হিশেবে ঐ সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এই ভাবাদর্শগত অধিকারকে অবলম্বন করে সুখাকাঙ্ক্ষা বাঁচতে পারে খুবই কম। বৈষয়িক উপকরণ অবলম্বন করলেই সে বাঁচে সবচেয়ে বেশি; এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিতে সযত্নে এই ব্যবস্থাই করা হয়, যাতে এই সমানাধিকারীদের মধ্যে

বিপুল সংখ্যাগুরুর দল নিছক বাঁচবার পক্ষে যতটুকু অপরিহার্য শুধু ততটুকুই পায়। অতএব, দাসপ্রথা বা ভূমিদাসপ্রথায় সংখ্যাগুরুর পক্ষে সুখাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার সমান অধিকার যেটুকু ছিল, পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থায় তার চেয়ে আদৌ বেশি হলে তা নেহাত যৎসামান্য বেশি মাত্র। আর, মানসিক সুখের উপায়ের, অর্থাৎ শিক্ষার সুযোগের দিক থেকেই কি আমাদের অবস্থা বিশেষ ভাল? এমনকি 'সাদোভার স্কুল মাস্টার'ও (১১৪) কি একান্তই এক কল্পিত ব্যক্তি নয়?

আরো কথা আছে। ফয়েরবাখের নীতিশাস্ত্র অনুসারে নৈতিক চরিত্রের শ্রেষ্ঠ মন্দির হল ফাটকাবাজার, কেবল অবশ্য ঠিকমতো ফাটকাবাজি করা চাই। আমার সুখাকাঙ্ক্ষা যদি আমাকে ফাটকাবাজারের দিকে পরিচালিত করে এবং আমি যদি আমার কাজের পরিণামকে সঠিকভাবে বিচার করতে পারি যাতে শুধু প্রীতিকর ফলাফলই ঘটে, অপ্রীতিকর কিছু না হয়, অর্থাৎ আমি যদি শুধু জিতেই চলি, তাহলে সেটা ফয়েরবাখের উপদেশ পালনই হবে। তাছাড়া, এতে আমি অপর কারুর সুখাকাঙ্ক্ষা অনুসরণে হস্তক্ষেপ করছি না, কেননা আমি যেমন স্বেচ্ছায় ফাটকাবাজারে গিয়েছিলাম তেমনি স্বেচ্ছায় সেও গিয়েছিল। আমার সঙ্গে ফাটকাবাজি করে সেও তার সুখাকাঙ্ক্ষারই অনুসরণ করেছে, যেমন কিনা আমিও করেছি। তার যদি টাকা খোয়া যায় তাহলে স্বতঃই প্রমাণ হবে যে, বেহিসেবের কারণে কাজটি তার নীতিগর্হিত হয়েছিল, এবং যেহেতু আমি তাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিলাম সেইহেতু আমি এমনকি এক আধুনিক রাদামানথস-এর মতোই সগর্বে বুক চাপড়াতে পারি। প্রেম শব্দটি যদি নেহাতই ভাবালু শব্দালংকার না হয়, তাহলে বলতে হবে ফাটকাবাজারে প্রেমেরও রাজত্ব রয়েছে, কেনানা সেখানে প্রত্যেকেই অপরের সাহায্যে সুখাকাঙ্ক্ষার সার্থকতা অনুসন্ধান করে। প্রেমের উদ্দেশ্যই ঠিক এই-ই এবং প্রেমের বাস্তব ক্রিয়া বলতেও তাই। সুতরাং, আমার কাজের ফলাফল সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নিয়ে আমি যদি সাফল্যের সঙ্গে জুয়া খেলতে পারি, তাহলে আমি ফয়েরবাখের নৈতিকতার কঠোরতম বিধি-নির্দেশই পালন করব, তাছাড়া বড়োলোকও হয়ে যাব। অন্য কথায়, ফয়েরবাখের নৈতিকতা ঠিক আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজেরই ছাঁচে ঢালা, ফয়েরবাখ স্বয়ং তা না চাইলেও বা কল্পনা না করলেও।

কিন্তু প্রেম! — হ্যাঁ, ফয়েরবাখের কাছে সর্বত্রই এবং সর্বকালে প্রেমই হল সেই অলৌকিক দেবতা যে বাস্তব জীবনের সমস্ত বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ করে দেয়, আবার তাও কিনা এমন এক সমাজে যা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত! এইখানে তাঁর দর্শনের শেষ বৈপ্লবিক রেশটুকুও উপে যায়, বাকি থাকে শুধু সেই পুরনো কীর্তন: পরস্পরকে ভালবেসো, স্ত্রী পুরুষ এবং পদ নির্বিচারে পরস্পরকে আলিঙ্গন করো, — মিলমিশের এক সার্বজনীন মাতলামি!

সংক্ষেপে, ফয়েরবাখের নৈতিকতার দশা তাঁর পূর্ববর্তী সকলের মতোই। তার উদ্দেশ্য হল সব যুগের, সব মানুষের এবং সব অবস্থার পক্ষে উপযোগী হওয়া এবং ঠিক এই কারণেই তা কখনো কোথাও প্রযুক্ত হতে পারে না। বাস্তব জগতের ক্ষেত্রে তা কাণ্টের পরম নির্দেশের মতোই অক্ষম। বাস্তবে প্রতিটি শ্রেণী, এমনকি প্রতিটি পেশার নিজস্ব নৈতিক আদর্শ আছে, এবং শাস্তির ভয় না থাকামাত্র তাও লঙ্ঘিত হয়। আর যে প্রেমে সকলকে মেলাবার কথা তার প্রকাশ ঘটে যুদ্ধ, কলহ, মামলা, গৃহবিবাদ, বিবাহবিচ্ছেদ এবং এক কর্তৃক অপরকে সম্ভবপর সমস্ত শোষণে।

কিন্তু ফয়েরবাখ যে প্রবল প্রেরণা সঞ্চার করে যান, সেটা কী করে অমনভাবে তাঁর নিজের পক্ষে নিষ্ফল হল? তার সোজা কারণ, যে অমূর্তায়নের প্রতি তাঁর অমন ভয়ংকর ঘৃণা তারই এলাকা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি কখনই প্রাণবান বাস্তবে পেঁছিবার পথ খুঁজে পান নি। তিনি প্রাণপণে প্রকৃতি আর মানুষকে আঁকড়ে থাকতে চান, কিন্তু তাঁর কাছে প্রকৃতি আর মানুষ শব্দমাত্রই। বাস্তব প্রকৃতি ও বাস্তব মানুষ সম্বন্ধে তিনি আমাদের সুনির্দিষ্ট কিছু বলতে পারেন না। ফয়েরবাখের অমূর্ত মানুষ থেকে বাস্তব জীবন্ত মানুষে পেঁছিবার একমাত্র উপায় হল, তাকে ইতিহাসের অংশী হিশেবে দেখা। কিন্তু ফয়েরবাখের ঠিক এতেই আপত্তি। ফলে ১৮৪৮ সালটি, যার তাৎপর্য তিনি বুঝতে পারেন নি, তাঁর কাছে শুধু বাস্তব জগতের সঙ্গে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ এবং নির্জনে অবসর গ্রহণ বলেই প্রতিপন্ন হল। এ ক্ষেত্রেও ফের দোষটা প্রধানত জার্মানির তখনকার অবস্থার যা তাঁকে অমন শোচনীয়ভাবে ক্ষয়ে যেতে বাধ্য করে।

কিন্তু ফয়েরবাখ না করলেও সে পদক্ষেপ গ্রহণ করতেই হল।

ফয়েরবাখের নবধর্মের কেন্দ্র অমূর্ত মানবপূজার পরিবর্তে আনতে হল বাস্তব মানব ও তার ঐতিহাসিক বিকাশের বিজ্ঞান। ফয়েরবাখ ছাড়িয়ে ফয়েরবাখের দৃষ্টিকোণের এই পরবর্তী বিকাশের সূত্রপাত করেন মার্কস ১৮৪৫ সালে 'পবিত্র পরিবার' গ্রন্থে।

৪

স্ট্রাউস, বাউয়ের, স্টিরনার, ফয়েরবাখ এঁরা সকলেই যতক্ষণ না দর্শনের ক্ষেত্র ত্যাগ করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত হেগেলীয় দর্শনেরই শাখাপ্রশাখা। 'যীশুর জীবন' এবং 'আপ্তবাক্য' গ্রন্থের পর স্ট্রাউস শুধুই রেনাঁ-র কায়দায় দার্শনিক ও যাজক-ঐতিহাসিক সাহিত্য রচনায় নিজেকে নিযুক্ত করেছেন। বাউয়ের কেবল খ্রীষ্টধর্মের উৎস সংক্রান্ত ইতিহাসের ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য লাভ করেছেন, যদিও এই ক্ষেত্রে তাঁর কীর্তিটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বাকুনিন স্টিরনারকে প্রুধোঁর সঙ্গে মিলিয়ে এই মিশ্রণটিকে 'নৈরাজ্যবাদ' আখ্যা দিলেও স্টিরনার একটা কৌতুকাবহ বস্তু হিশেবেই রয়ে গেলেন। দার্শনিক হিশেবে তাৎপর্য ছিল একমাত্র ফয়েরবাখের। কিন্তু যে দর্শন হতে চায় সমস্ত বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে এবং তাদের সকলের যোগসূত্র হিশেবে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, — সে দর্শন তাঁর কাছে একটা পবিত্র বস্তু হিশেবেই রয়ে গেল — তাঁর সীমানা তিনি যে শুধু পার হতে পারেন নি তা নয়, দার্শনিক হিশেবেও তিনি মাঝপথে থেমে গিয়েছিলেন, নিচের দিকটায় বস্তুবাদী, উপরের দিকটায় ভাববাদী। সমালোচনার মাধ্যমে হেগেলকে প্রত্যাখ্যান করার সামর্থ্য তাঁর ছিল না; তিনি শুধুই হেগেলকে নিষ্প্রয়োজন বলে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন, যদিও হেগেলীয় দর্শনতন্ত্রের বিশ্বকোষসুলভ ঐশ্চর্যের তুলনায় তিনি নিজে এক গালভরা প্রেমধর্ম এবং এক ক্ষীণ নির্বীর্য নৈতিকতা ছাড়া সদর্থক বেশি কিছু পেশ করতে পারেন নি।

কিন্তু হেগেলীয় সম্প্রদায়ের ভাঙন থেকে আরো একটা ধারার উদ্ভব হয় এবং একমাত্র সেইটিই প্রকৃত ফলপ্রসূ হয়েছে। এই ধারাটি মূলত মার্কসের নামের সঙ্গে জড়িত।*

---

* এখানে আমি একটা ব্যক্তিগত জবাবদিহি করতে চাইছি। মার্কসের তত্ত্বে

এ ক্ষেত্রেও বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে। তার মানে ভাববাদী উৎকেন্দ্রিকতার প্রাক্-সংস্কারবাদ থেকে মুক্ত হয়ে দেখলে বাস্তব জগৎ — অর্থাৎ প্রকৃতি ও ইতিহাস — যেভাবে প্রতীত হয় তাকে সেইভাবেই জানবার জন্য এ ধারা কৃতসংকল্প। স্থির করা হল, কাল্পনিক অন্তঃসম্পর্কে নয়, তাদের স্বকীয় অন্তঃসম্পর্কে দেখা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে যে ভাববাদী উদ্ভাবন খাপ খায় না, তাকে নির্মমভাবে পরিহার করতে হবে। বস্তুবাদ বলতে এ ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। নতুন ধারায় বস্তুবাদী দর্শনকে এই প্রথম সত্যই গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হয়েছে এবং অন্তত তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে সমস্ত প্রাসঙ্গিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে সুসঙ্গতভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

হেগেলকে নিছক পাশে ঠেলে দেওয়া হল না। বরং, ইতিপূর্বে তাঁর যে বৈপ্লবিক দিকটি বর্ণিত হয়েছে, তাঁর সেই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি থেকেই শুরু করা হল। কিন্তু হেগেলীয় রূপে সেটা ছিল অকেজো। হেগেলের মতে, দ্বন্দ্বতত্ত্ব হল ধারণার আত্মবিকাশ। পরম ধারণা শুধুই যে অনন্তকাল অজ্ঞাত কোথাও বর্তমান তাই নয়, অস্তিত্বশীল সমগ্র বিশ্বের প্রকৃত জীবন্ত আত্মাও

আমার অংশীদারির কথা ইদানীং বারবার উল্লেখ করা হয়েছে — কাজেই, বিষয়টার মীমাংসার জন্য এখানে কয়েকটা কথা না-বলে পারছি নে। মার্কসের সঙ্গে চল্লিশ বছরের সহযোগের আগেও এবং তার মধ্যেও এই তত্ত্বের ভিত্তিস্থাপনে এবং আরো বিশেষভাবে এর বিশদীকরণে আমার কিছুটা স্বতন্ত্র অংশ ছিল, তা আমি অস্বীকার করতে পারি নে। কিন্তু, এর প্রধান মূলনীতিগুলির অধিকাংশ, বিশেষত অর্থবিদ্যা আর ইতিহাসের ক্ষেত্রে, আর সর্বোপরি সেগুলির চূড়ান্ত প্রখর উপস্থাপনা মার্কসেরই। যা-ই হোক, অল্প কয়েকটা বিশেষ ক্ষেত্রে আমার কাজ বাদে আমার যা অবদান তা মার্কস আমাকে ছাড়াও বেশ করতে পারতেন। মার্কসের যা সাধনসাফল্য তা আমি কখনই সাধন করতে পারতাম না। আমাদের বাদবাকি আর সবার চেয়ে মার্কস দাঁড়িয়ে ছিলেন আরো উপরে, তিনি দেখতেন আরো দূর অবধি, তাঁর বিবেচনা-পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র ছিল আরো প্রশস্ত, সেটা হত আরো দ্রুত। মার্কস ছিলেন মহাপ্রতিভাধর; আমরা অন্যান্যেরা ছিলাম বড়োজোর বিশেষ কর্মদক্ষতাসম্পন্ন। তিনি না হলে এই তত্ত্ব আজ যা ততখানি হত না। কাজেই, এই তত্ত্ব তাঁর নাম বহন করছে সঙ্গত কারণেই। (এঙ্গেলসের টীকা।)

হল তাই। যে সমস্ত প্রাথমিক পর্যায়ের মাধ্যমে তার আত্মবিকাশ, 'যুক্তিতত্ত্ব' গ্রন্থে সেগুলি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে এবং সেগুলি সবই সে ধারণার মধ্যেই নিহিত। তারপর প্রকৃতি রূপে পরিবর্তিত হয়ে সেই ধারণা নিজেকে 'অনন্বিত' করে; সেখানে আত্ম-চেতনাহীনভাবে, প্রাকৃতিক আবশ্যিকতার ছদ্মবেশে তার এক নববিকাশ শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে পুনরায় তা আত্ম-চেতনায় প্রত্যাবর্তন করে। তারপর ইতিহাসের ক্ষেত্রে সেই আত্ম-চেতনা আবার স্থূলরূপ থেকে নিজেকে বিকশিত করতে করতে শেষ পর্যন্ত হেগেলীয় দর্শনে সেই পরম ধারণা সম্পূর্ণভাবে নিজেতে প্রত্যাবর্তন করে। অতএব, প্রকৃতি ও ইতিহাসে যে দ্বান্দ্বিক বিকাশ দেখা দেয় অর্থাৎ নিচুর থেকে উঁচুর দিকে যে অগ্রগতি সমস্ত আঁকাবাঁকা পথে ও সাময়িক পশ্চাদগতি সত্ত্বেও অব্যাহত থাকে, হেগেলের মতে সেই কার্যকারণ সম্পর্ক হল আসলে অনন্তকাল থেকে গতিশীল ধারণার শোচনীয় অনুমুদ্রণ মাত্র; কোথায় তা জানা নেই, কেবল এটুকু স্পষ্ট যে, তা কোনো চিন্তাশীল মানব মস্তিষ্ক থেকে স্বতন্ত্র। ভাবাদর্শগত এই বিকার পরিহারের প্রয়োজন ছিল। আমরা আবার বস্তুবাদীভাবে আমাদের মাথার মধ্যেকার ধারণাগুলিকে বুঝলাম, বাস্তব বস্তুকে পরম ধারণার বিকাশের কোনো পর্যায়ের প্রতিরূপ বলে না ধরে ধারণাগুলিকে বুঝলাম বাস্তব বস্তুর প্রতিরূপ হিশেবে। এইভাবে দ্বন্দ্বতত্ত্ব পরিণত হল বহির্জগৎ ও মানবচিন্তা উভয় ক্ষেত্রেই গতির সাধারণ নিয়ম সংক্রান্ত বিজ্ঞানে: দুই সারি এই নিয়মাবলির সারবস্তু অভিন্ন, কিন্তু মানব-মন যে পরিমাণে এগুলিকে সচেতনভাবে প্রয়োগ করতে পারে, সেই পরিমাণে তাদের প্রকাশে পার্থক্য ঘটে; প্রকৃতিতে এবং এ পর্যন্ত মানব-ইতিহাসের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নিয়মাবলি অচেতনভাবে আপাত আকস্মিকতার এক অনন্ত পরম্পরার মধ্যে বাহ্য আবশ্যিকতা রূপে কার্যকর থাকে। এইভাবে ধারণার দ্বান্দ্বিকতাটা নিজেই পরিণত হল বাস্তব জগতের দ্বান্দ্বিক গতির সচেতন প্রতিবিম্বে এবং ফলে হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বকে উলটিয়ে দেওয়া হল, কিংবা বলা ভাল, তা যেভাবে মাথার ওপর দাঁড়িয়েছিল তা ঘুরিয়ে তাকে পায়ের উপর দাঁড় করানো হল। এবং লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব বহু বছর ধরে আমাদের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ও তীক্ষ্ণতম অস্ত্রের কাজ করেছে তাকে শুধু আমরাই আবিষ্কার করেছি তাই নয়;

আমাদের, এমনকি হেগেলের অপেক্ষা না রেখেই স্বতন্ত্রভাবে তা আবিষ্কার করেছেন এক জার্মান শ্রমিক — ইয়োসেফ ডিট্‌স্‌গেন।*

যাই হোক, এইভাবে আবার পুনঃস্থাপিত করা হল হেগেলীয় দর্শনের বৈপ্লবিক দিকটি এবং সেই সঙ্গেই তার যেসব ভাববাদী ভূষণের ফলে হেগেলের পক্ষে তার সুসঙ্গত প্রয়োগ ব্যাহত হয়েছিল তা বাদ দেওয়া হল। বিশ্বকে তৈরি জিনিসের যৌগিক সমাহার না ভেবে প্রক্রিয়ার যৌগিক সমাহার বলে বিবেচনা করতে হবে, যেখানে আপাত-স্থির জিনিসগুলি তথা আমাদের মাথায় সেইগুলির মানস প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ধারণাগুলি এক অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, উদ্ভব ও বিলয়ের মধ্য দিয়ে চলেছে, যেখানে সমস্ত আপাত-আপাতন ও সাময়িক পশ্চাদগতি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এক ক্রমাগ্রসর বিকাশই জয়ী হয় — এই মূল মহান চিন্তা বিশেষত হেগেলের সময় থেকে সাধারণের চেতনায় এমনভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছে যে, তার সাধারণ রূপটি আজ আর বড়ো একটা অস্বীকার করা হয় না। কিন্তু মুখে এই মূল চিন্তা স্বীকার করা এবং বাস্তবে অনুসন্ধানের প্রতি ক্ষেত্রে খুঁটিয়ে তার প্রয়োগ করা, এ দুটি আলাদা ব্যাপার। কিন্তু যদি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সর্বদা অন্বেষণ অগ্রসর হয় তাহলে চরম সমাধান এবং সনাতন সত্যের দাবি চিরকালের মতো শেষ হয়; সমস্ত অর্জিত জ্ঞানের অনিবার্য সীমাটা সম্বন্ধে সবসময়েই হুঁশ থাকে, হুঁশ থাকে যে, যে-পরিস্থিতিতে জ্ঞানটি অর্জিত হয়েছে তার দ্বারাই সে জ্ঞান নিয়ন্ত্রিত। অপরপক্ষে, এখনো প্রচলিত প্রাচীন অধিবিদ্যার কাছে সত্য ও মিথ্যা, ভাল ও মন্দ, অভিন্ন ও ভিন্ন, আবশ্যিক ও আপতিকের মধ্যে যে বিরোধ দুর্লঙ্ঘ্য বলে বিবেচিত হয় তার সামনে আর সশ্রদ্ধ হবার প্রয়োজন হয় না। বোঝা যায় যে, এই বিরোধগুলির নেহাতই আপেক্ষিক সত্যতা বর্তমান, এখন যা সত্য বলে স্বীকৃত তারই মধ্যে মিথ্যার দিক নিহিত আছে এবং তা ভবিষ্যতে প্রকাশ পাবে; ঠিক যেমন এখন যা মিথ্যা বলে বিবেচিত তার মধ্যেও সত্যের দিক নিহিত বলেই অতীতে তা সত্য বলে বিবেচিত হয়েছিল; যাকে আবশ্যিক বলা হয় তা নিছক আপতিকতা দ্বারাই

* 'মানব মস্তিষ্কের কাজের প্রকৃতি একজন কায়িক-শ্রমিকের বিবরণ', হাম্‌বুর্গ, ১৮৬৯। — সম্পাঃ

গঠিত এবং তথাকথিত আপাতিকতা হল একটা রূপ যার পিছনে লুকিয়ে আছে আবশ্যিকতা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অনুসন্ধান ও চিন্তার যে সাবেকী পদ্ধতিকে হেগেল 'অধিবিদ্যামূলক' আখ্যা দিয়েছেন, যে পদ্ধতি প্রধানত **জিনিসগুলিকে সমাপ্ত** অনড় ও অপরিবর্তনীয় হিশেবে অনুসন্ধান করত এবং যে পদ্ধতির জের মানুষের মনকে এখনো তীব্রভাবে প্রভাবিত করে, সেই পদ্ধতিরও তখনকার কালে যথেষ্ট ঐতিহাসিক ন্যায্যতা ছিল। প্রক্রিয়াকে বিচার করার আগে প্রথমে জিনিসগুলি পরীক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। একটি নির্দিষ্ট জিনিস কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তা দেখবার আগে জানা দরকার জিনিসটি ঠিক কী। এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানের অবস্থা তখন এইরকমই। যে প্রকৃতিবিজ্ঞান তখন পরিসমাপ্ত বস্তু হিশেবে জীবন্ত ও জড় বস্তুর অনুসন্ধান করত, তা থেকেই দেখা দেয় সাবেকী অধিবিদ্যা, যাতেও জিনিসগুলি পরিসমাপ্ত বস্তু বলেই বিবেচিত। কিন্তু এই অনুসন্ধান যখন এতদূর অগ্রসর হল যে, প্রকৃতিতেই এই জিনিসগুলির যে পরিবর্তন চলেছে সে সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ অনুসন্ধানের পর্যায়ে উৎক্রমণের মতো চূড়ান্ত পদক্ষেপ সম্ভবপর হল, তখন দর্শনের ক্ষেত্রেও পুরনো অধিবিদ্যার শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। এবং বস্তুত গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিবিজ্ঞান যে ক্ষেত্রে ছিল মূলতই **সংগ্রহের** বিজ্ঞান, পরিসমাপ্ত জিনিসের বিজ্ঞান, সে ক্ষেত্রে আমাদের শতাব্দীতে তা মূলতই **শৃঙখলা সাধনের** বিজ্ঞান, পরিবর্তন প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান, এই জিনিসগুলির উৎস এবং বিকাশ তথা যে পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে এই সমস্ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এক বিরাট সমগ্রতার সৃষ্টি করে, তার বিজ্ঞান। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের মধ্যে যেসব প্রক্রিয়া চলে তার অনুসন্ধান করে শারীরবৃত্ত; বীজ থেকে পরিণতাবস্থা পর্যন্ত ব্যক্তি-শরীরের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করে ভ্রূণবিদ্যা; পৃথিবীর উপরিতল কীভাবে ক্রমশ গঠিত হয়েছে তার আলোচনা করে ভূতত্ত্ব — এই সবকটি বিজ্ঞানই আমাদের শতাব্দীতে জন্মেছে।

কিন্তু সর্বোপরি তিনটি বিরাট আবিষ্কারের ফলে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত আমাদের জ্ঞান হু হু করে বেড়ে গিয়েছে:

প্রথমত, জীবকোষ আবিষ্কার, যে এককটির বহুলীভবন ও

পৃথকীভবনের ফলে গোটা উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ গড়ে ওঠে। তাতে করে সমস্ত উন্নত জীবের দেহ একই সাধারণ নিয়ম অনুসারে গড়ে ওঠে শুধু এই স্বীকৃতিই নয়, তাছাড়াও জীবকোষের পরিবর্তন ক্ষমতার ফলে কীভাবে দেহসত্তার প্রজাতি পরিবর্তন হয় এবং সেইহেতু ব্যক্তিগত বিকাশের অতিরিক্ত একটা বিকাশের মধ্য দিয়ে তা যায়, এটা বোঝবারও পথনির্দেশ পাওয়া গেল।

দ্বিতীয়ত, তেজের রূপান্তর, এতে প্রমাণিত হল, যে তথাকথিত শক্তিগুলি প্রথমত অজৈব প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল — যান্ত্রিক শক্তি ও তার পরিপূরক, তথাকথিত স্থৈতিক (potential) তেজ, তাপ, বিকিরণ (আলো বা বিকীর্ণ তাপ), বিদ্যুৎ, চৌম্বক তেজ ও রাসায়নিক তেজ — এসবই হল সার্বিক গতির অভিব্যক্তির বিভিন্ন রূপ এবং এগুলি নির্দিষ্ট এক-একটা অনুপাতে পরস্পরে পরিণত হয়, যার ফলে নির্দিষ্ট পরিমাণের একটি তেজ অন্তর্হিত হলে তার জায়গায় নির্দিষ্ট পরিমাণের অপর একটি তেজ আবির্ভূত হয়; অতএব প্রকৃতির সমগ্র গতিই এক রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণের এক অবিরাম প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়।

শেষত, ডারউইনের সর্বপ্রথম দেওয়া এই সুসংবদ্ধ প্রমাণ যে, আজকের দিনে আমাদের চারপাশে মানুষসুদ্ধ যে-জীবজগৎ রয়েছে তা আদিতে কয়েকটি এককোষী বীজ থেকে সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশের পরিণাম এবং সেই আদি জীবকোষগুলিও আবার রাসায়নিক উপায়ে উদ্ভূত প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ বা অ্যালবুমেন থেকে জাত।

এই তিনটি বিরাট আবিষ্কার এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানে অন্যান্য বিপুল অগ্রগতির ফলে আমরা এমন জায়গায় পৌঁছেছি যেখানে আমরা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তঃসম্পর্কটা দেখতে পারি এবং তা শুধু এক-একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নয়, তাছাড়াও সমগ্রের সঙ্গে এইসব নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের অন্তঃসম্পর্কেও। অতএব, প্রয়োগমূলক প্রকৃতিবিজ্ঞানই যে সমস্ত তথ্য দিয়েছে, তার সাহায্যে আমরা মোটামুটি সুসংবদ্ধভাবে প্রকৃতির অন্তঃসম্পর্কের একটা সামগ্রিক পরিচয় দিতে পারি। এই সামগ্রিক দৃষ্টিটা জোগাবার ভার ইতিপূর্বে ছিল তথাকথিত প্রকৃতি-দর্শনের উপর। কিন্তু প্রকৃতি-দর্শন সে দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারত কেবল বাস্তব কিন্তু তখনো অজানা অন্তঃসম্পর্কের স্থানে ভাবময় ও কাল্পনিক অন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করে, তথ্যের অভাব মনের খেয়াল

দিয়ে প্রণ করে এবং বাস্তব ফাঁকগর্লির উপর কল্পনার সেতুবন্ধন করে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে তা নানা চমৎকার ধারণায় উপনীত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালের নানা আবিষ্কারের প্র্বাভাস দিয়েছিল, কিন্তু তাছাড়াও উদ্ভাবন করেছিল বহ্ বাজে কথা; যা অবশ্য না হয়ে পারত না। আজকের দিনে আমাদের কালোপযোগী একটা 'প্রকৃতি ব্যবস্থায়' উপনীত হবার জন্য যখন প্রাকৃতিক গবেষণার ফলাফলগর্লির উপর শ্ধ্ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ তাদের নিজস্ব অন্তঃসম্পর্কের দ্ষ্টিকোণ থেকে দ্ষ্টিপাত করলেই যথেষ্ট, যখন এমনকি প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের অধিবিদ্যারঞ্জিত মনের উপর তাদের ইচ্ছার বির্দ্ধেই এই অন্তঃসম্পর্কের দ্বান্দ্বিক চরিত্র আত্মপ্রতিষ্ঠা করছে, তখন আজ প্রকৃতি-দর্শন চ্ড়ান্তভাবে খারিজ হয়ে যায়। তাকে প্নর্দ্ধার করবার প্রতিটি প্রচেষ্টা শ্ধ্ অবান্তরই নয়, **পশ্চাদগতিই হবে।**

কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে যে কথা সত্য, যাকে এখন আমরা বিকাশের একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বলে মানছি, সেই কথা সমাজ ইতিহাসের প্রতিটি শাখায় এবং মানবীয় (তথা স্বর্গীয়) বিষয় নিয়ে ব্যাপ্ত সমস্ত বিজ্ঞানের সমষ্টির ক্ষেত্রেও সমান সত্য। প্রকৃতি-দর্শনের মতো ইতিহাস, অধিকার এবং ধর্মের দর্শনের ক্ষেত্রেও — ঘটনার মধ্যে প্রমাণিত বাস্তব অন্তঃসম্পর্কের স্থান নিয়েছিল দার্শনিকের নিজস্ব মন-গড়া এক অন্তঃসম্পর্ক; সামগ্রিকভাবে ইতিহাস ও তার বিভিন্ন অংশকে বোঝা হত ভাবসত্তার ক্রমিক র্পায়ণ বলে এবং স্বভাবতই সে ভাবসত্তাটি হল দার্শনিকেরই নিজস্ব প্রিয় ভাবসত্তা। এই মতে, ইতিহাসের ক্রিয়া অচেতন হলেও তা অবশ্যই আগে থেকে নির্ধারিত একটা আদর্শ লক্ষ্য সাধনের দিকে চলে, যেমন, হেগেলের কাছে, সে উদ্দেশ্য হল পরম ভাবসত্তার র্পায়ণ এবং ওই পরম ভাবসত্তার অভিম্খে অবিচল প্রবণতাই হল ঐতিহাসিক ঘটনাবলির অভ্যন্তরীণ অন্তঃসম্পর্ক। এইভাবে বাস্তব কিন্তু তখনো অজানা পারস্পরিক সম্পর্কের স্থানে এল এক নতুন, রহস্যময় অচেতন অথবা ক্রমচেতন ভবিতব্য। অতএব প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেরকম, এখানেও সেইভাবেই কাল্পনিক ও কৃত্রিম অন্তঃসম্পর্ক দ্র করে বাস্তব অন্তঃসম্পর্কের আবিষ্কার প্রয়োজন এবং এই কর্তব্যটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় মানব সমাজের ইতিহাসে গতির যেসব সাধারণ নিয়ম প্রাধান্য করে সেগ্লির আবিষ্কার।

কিন্তু একদিক থেকে সমাজ এবং প্রকৃতির বিকাশের ইতিহাসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রকৃতির উপর মানুষের প্রতিক্রিয়ার কথা বাদ দিলে প্রকৃতির ক্ষেত্রে কেবল অন্ধ অচেতন শক্তিগুলি পরস্পরের উপর সক্রিয় এবং সেগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে দেখা দেয় সাধারণ নিয়মাবলি। ভাসা ভাসা ভাবে দেখা অসংখ্য আপাত-আপাতনের ক্ষেত্রেই হোক, বা যে চরম ফলাফলের মধ্যে এই আপতনগুলির অভ্যন্তরীণ নিয়মানুবর্তিতা প্রমাণিত হচ্ছে সেখানেই হোক, কোনো ঘটনাই সচেতন বাঞ্ছিত লক্ষ্যানুসারী নয়। পক্ষান্তরে, মানব-সমাজে প্রতিটি কর্মকর্তা চেতনাবিশিষ্ট, তারা সংকল্প নিয়ে বা আবেগবশে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে ক্রিয়াশীল; সচেতন উদ্দেশ্য ছাড়া, বাঞ্ছিত লক্ষ্য ছাড়া এখানে কোনো কিছুই ঘটে না। কিন্তু বিশেষ করে কোনো নির্দিষ্ট যুগ বা ঘটনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাতে এই মূল সত্য বদলে যায় না যে, অভ্যন্তরীণ সাধারণ নিয়ম দ্বারাই ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত। কেননা, এখানেও সমস্ত ব্যক্তিমানুষের সচেতন উদ্দেশ্য সত্ত্বেও উপরিভাগে বাহ্যত আপাতিকতারই রাজত্ব। যা চাওয়া যায় তা নেহাত কালেভদ্রেই ঘটে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসংখ্য বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যের মধ্যে পরস্পর প্রতিকূলতা ও সংঘাত দেখা যায়, কিংবা শুরু থেকেই এই উদ্দেশ্যগুলির চরিতার্থতা সম্ভব নয় বা সে চরিতার্থতার উপায় অপর্যাপ্ত। অতএব, ইতিহাসের ক্ষেত্রে অসংখ্য ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও ব্যক্তিগত ক্রিয়ার মধ্যে সংঘাতের পরিণামে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তার সঙ্গে অচেতন প্রাকৃতিক পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়। কর্মের পেছনে বাঞ্ছিত লক্ষ্য থাকলেও তার যে আসল ফলাফল দাঁড়ায় সেটা বাঞ্ছিত নয়; অথবা সে ফলাফল বাঞ্ছিত লক্ষ্যের অনুকূল বলেই মনে হলেও তার চরম পরিণামটা হয় বাঞ্ছিতের চেয়ে একেবারে অন্য রকম। অতএব, ঐতিহাসিক ঘটনাও আপাতিকতার শাসনাধীন বলে মনে হয়, কিন্তু যেখানে ওপরে-ওপরে যা আপাতিকতার ক্রিয়া মনে হয় সেখানে সর্বদাই প্রকৃতপক্ষে তা অভ্যন্তরীণ নিগূঢ় নিয়মাবলি দ্বারাই শাসিত এবং সমস্যা হল শুধু সেই নিয়মাবলির আবিষ্কার।

শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের পরিণাম যাই হোক না কেন, মানুষই তার স্রষ্টা, যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সচেতন উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ করে, এবং

বিভিন্ন দিকে সক্রিয় তাদের এই বহু ইচ্ছা এবং বহির্বিশ্বের উপর বিবিধ প্রভাবের সারফলটাই হল ইতিহাস। অতএব, প্রশ্নটা হল বহু ব্যক্তি কী ইচ্ছা করে। ইচ্ছা নির্ধারিত হয় রিপু অথবা বিচারের দ্বারা। কিন্তু যে কারিকা দ্বারা রিপু ও বিচার প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তা বহুবিধ। আংশিকভাবে তা বহির্বস্তু হতে পারে, হতে পারে আদর্শমূলক প্রেরণা: উচ্চাকাঙ্ক্ষা, 'সত্য ও ন্যায়ের উৎসাহ', ব্যক্তিগত ঘৃণা এবং এমনকি রকমারি বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত খামখেয়াল। কিন্তু অপরপক্ষে আমরা দেখেছি যে, ইতিহাসে ক্রিয়াশীল বহু ব্যক্তিগত ইচ্ছা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত ফলাফল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, অনেক সময় একেবারে বিপরীত ফলাফল সৃষ্টি করে; অতএব সামগ্রিক ফলের তুলনায় এই প্রেরণার গুরুত্ব নেহাতই গৌণ। অপরপক্ষে, আরো প্রশ্ন ওঠে, এই প্রেরণাও আবার কোন চালিকা-শক্তি দ্বারা পরিচালিত, কী কী সেই ঐতিহাসিক কারণ যা কর্মরত মানুষদের মস্তিষ্কে গিয়ে এই সব প্রেরণার রূপ নেয়?

পুরনো বস্তুবাদ কখনো এ প্রশ্ন তোলে নি। ইতিহাস সংক্রান্ত তার যেটুকু বা ধারণা তা ছিল নেহাত প্রায়োগিক। এই ধারণা অনুসারে সমস্ত ক্রিয়াকেই তার পেছনকার উদ্দেশ্য দিয়ে বিচার করা হত, ইতিহাসের অংশগ্রহণকারী মানুষদের ভাল আর মন্দ দুভাগে ভাগ করা হত আর তারপর দেখা যেত, সাধারণতই যারা ভাল তারা ঠকছে, যারা মন্দ তারা হচ্ছে জয়ী। অতএব, পুরনো বস্তুবাদের কাছে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, ইতিহাস অধ্যয়ন থেকে খুব কিছু শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা নেই এবং আমাদের কাছে দাঁড়ায় এই যে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে পুরনো বস্তুবাদ নিজের প্রতিই মিথ্যাচরণ করছে, কেননা সে বস্তুবাদ অনুসারে ইতিহাসের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল আদর্শমূলক চালিকা-শক্তিগুলির মূল অন্বেষণ করার বদলে, এই শক্তিগুলির পিছনে রয়েছে কোন চালিকা-শক্তি সেকথা আবিষ্কার করার পরিবর্তে, আদর্শমূলক চালিকা-শক্তিগুলিকেই চরম কারণ বলে ধরা হয়। তার অসঙ্গতিটা এইখানে নয় যে, **আদর্শমূলক** চালিকা-শক্তিকে স্বীকার করা হচ্ছে, বরং এইখানে যে, এই আদর্শমূলক প্রেরণার পিছনকার চালক হেতু পর্যন্ত অন্বেষণ চালানো হচ্ছে না। অপরপক্ষে, ইতিহাসের দর্শন অনুসারে, বিশেষত হেগেল যার প্রতিনিধি, এইটে মানা হয় যে, ইতিহাসে ক্রিয়াশীল মানুষদের বাহ্যিক এবং

আসল উদ্দেশ্যাবলিও কোনো মতেই ঐতিহাসিক ঘটনার চরম কারণ নয়, এই উদ্দেশ্যের পিছনে অন্য কোনো চালিকা-শক্তি বর্তমান এবং তারই আবিষ্কার প্রয়োজন। কিন্তু সে দর্শন ইতিহাসের মধ্যেই এই সব শক্তির সন্ধান করে নি, বাইরে থেকে, দার্শনিক মতাদর্শ থেকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে সেগুলি আমদানি করেছে। যেমন হেগেল প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসকে তার অভ্যন্তরীণ অন্তঃসম্পর্ক দিয়ে ব্যাখ্যা করার বদলে শুধুই বলেছেন যে, এ ইতিহাস 'সুন্দর ব্যক্তিত্বের রূপকে' পরিস্ফুট করা ছাড়া আর কিছুই নয়, তা এক নিছক 'শিল্পকর্মের' রূপায়ণ মাত্র। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীকদের সম্পর্কে তিনি এমন অনেক কথা বলেছেন যা চমৎকার ও গভীরতার পরিচায়ক, কিন্তু তাই বলে আজ আমাদের পক্ষে এই ধরনের ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করায় বাধা নেই, যা কথার প্যাঁচ ছাড়া আর কিছুই নয়।

অতএব, যখন চালিকা-শক্তিগুলিকে অনুসন্ধান করবার প্রশ্ন ওঠে, যে শক্তি ইতিহাসে ক্রিয়াশীল মানুষদের প্রেরণার পিছনে সচেতন বা অচেতন ভাবে এবং আসলে প্রায়ই অচেতনভাবে বর্তমান এবং যেগুলি হল ইতিহাসের প্রকৃত চরম চালিকা-শক্তি, তখন প্রশ্নটা আসলে ব্যক্তি বিশেষদের উদ্দেশ্য নিয়ে ততটা নয়, তাঁরা যত বড়োই হোন না কেন যতটা সেই সব প্রেরণা নিয়ে যা বিপুল জনগণকে, সমগ্র জাতিকে এবং জাতির অভ্যন্তরস্থ সমগ্র শ্রেণীকে সচল করে তোলে এবং তা খড়ের আগুন যেমন দাউদাউ করে জ্বলে উঠে হঠাৎ নিভে যায় সেরকম ক্ষণিক নয়, বরং বিরাট ঐতিহাসিক রূপান্তর ঘটানোর মতো একটা স্থায়ী কর্মের জন্য। কর্মরত জনগণ ও তাদের নেতা তথাকথিত মহাপুরুষদের মনে যা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ বা মতাদর্শগত ও এমনকি মহিমান্বিতরূপে সচেতন প্রেরণা হিশেবে প্রতিফলিত হয়, সেই চালক হেতুগুলিকে নিরূপণ করাই হল একমাত্র পথ এবং এই পথে অগ্রসর হয়ে আমরা সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে এবং নির্দিষ্ট এক-একটা যুগে ও নির্দিষ্ট এক-একটা দেশের ক্ষেত্রে সক্রিয় নিয়মগুলির খোঁজ পাব। যাকিছু মানুষকে সচল করে তোলে সেটা তার মনের মধ্য দিয়ে সক্রিয় হতে বাধ্য; কিন্তু তার মনে এর কী রূপ দাঁড়াবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর। শ্রমিকেরা এখনো পুঁজিবাদী যন্ত্রশিল্পকে মোটেই মেনে নিতে পারে

নি, যদিও তারা ১৮৪৮ সালেও রাইন অঞ্চলে যা করত সেভাবে এখন যন্ত্রগুলি স্রেফ চূর্ণ করতে শুরু করে না।

কিন্তু ইতিহাসের এই চালক হেতুগুলির সঙ্গে তার ফলাফলের অন্তঃসম্পর্ক জটিল ও প্রচ্ছন্ন বলে ইতিপূর্বের সমস্ত যুগে এগুলিকে আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব ছিল, তবে আমাদের বর্তমান যুগ এই অন্তঃসম্পর্কগুলিকে এমন সরল করে দিয়েছে যে, এখন ধাঁধার সমাধান সম্ভব হয়েছে। বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা থেকে, অর্থাৎ অন্তত ১৮১৫ সালের ইউরোপীয় শান্তি থেকে (১১৫), ইংলন্ডের কারুর কাছেই আর একথা গোপন নেই যে, সেখানে সমগ্র রাজনৈতিক সংগ্রাম চলেছে দুটি শ্রেণীর মধ্যে, ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণী (landed aristocracy) ও বুর্জোয়ার (middle class) মধ্যে প্রাধান্যের দাবি নিয়ে। ফরাসী দেশে বুর্‌বোঁ বংশের ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে একই ব্যাপার অনুভূত হয়েছে। তিয়েরি থেকে গিজো, মিনিয়ে ও তিয়ের পর্যন্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠা পর্বের (১১৬) ঐতিহাসিকেরা মধ্য যুগের পরবর্তী সমগ্র ফরাসী ইতিহাস প্রসঙ্গে সর্বত্রই মূলসূত্র হিশেবে তার উল্লেখ করেন। এবং ১৮৩০ সাল থেকে উভয় দেশেই শ্রমিক শ্রেণী, প্রলেতারিয়েত, ক্ষমতার তৃতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী হিশেবে স্বীকৃত হয়েছে। পরিস্থিতি এতই সরল হয়েছে যে, অন্তত সবচেয়ে অগ্রগামী দুটি উপরোক্ত দেশের ক্ষেত্রে এই তিন বিরাট শ্রেণীর সংগ্রাম, তাদের স্বার্থসংঘাতের মধ্যে আধুনিক ইতিহাসের চালিকা-শক্তি না দেখতে হলে ইচ্ছে করেই চোখ বুজে থাকা দরকার।

কিন্তু এই শ্রেণীগুলির আবির্ভাব হল কী করে? অন্তত প্রথম দৃষ্টিতে যদিই বা ইতিপূর্বের সামন্ততান্ত্রিক বৃহৎ জমিদারির উদ্ভবকে রাজনৈতিক কারণ দিয়ে জুলুমদারি অধিকার হিশেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়, তবুও বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত সম্বন্ধে তা সম্ভব নয়। এই দুটি বিরাট শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের কারণ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ভাবেই বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক বলে দেখা গেল। এবং একথাও সমান স্পষ্ট হল যে, যেমন ভূমি-মালিকানার বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার, তেমনি বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের ক্ষেত্রেও প্রথম ও প্রধানতম প্রশ্ন হল অর্থনৈতিক স্বার্থ, রাজনৈতিক ক্ষমতা শুধু তা হাসিল করার উপায়মাত্র। অর্থনৈতিক অবস্থার, কিংবা আরো

নিখুঁতভাবে বললে, উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলেই বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত উভয়েরই আবির্ভাব। প্রথমে গিল্ড কায়িক শিল্প থেকে হস্তশিল্প-কারখানা এবং তারপর হস্তশিল্প-কারখানা থেকে বাষ্পশক্তি এবং যন্ত্রশক্তিসহ বৃহৎ শিল্পে উৎক্রমণের ফলেই ওই দুটি শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে। বিকাশের এক পর্যায়ে বুর্জোয়া শ্রেণী যে নতুন উৎপাদন-শক্তিকে চালু করে -- প্রথমত শ্রমবিভাগ ও সামগ্রিকভাবে একই সাধারণ কারখানা-ব্যবস্থায় অংশোৎপাদক বহু মেহনতীর মিলন — তার সঙ্গে এবং এই উৎপাদন-শক্তির মাধ্যমে বিকশিত বিনিময়-ব্যবস্থার শর্ত ও প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে পাওয়া ও আইন-মারফত পবিত্র করা উৎপাদন-পদ্ধতি, অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গিল্ডগত বিশেষাধিকার এবং অসংখ্য ব্যক্তিগত ও স্থানীয় বিশেষাধিকার (বিশেষাধিকারহীন সম্প্রদায়গুলির কাছে এগুলি তখন কতকগুলি নিগড় মাত্র) আর খাপ খায় না। বুর্জোয়া শ্রেণীর মারফত সূচিত উৎপাদন-শক্তি বিদ্রোহ করল সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ও গিল্ড মালিকদের দ্বারা সূচিত উৎপাদন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তার ফলাফল সকলেই জানেন: ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে ক্রমশ এবং ফ্রান্সে এক আঘাতে সামন্ততান্ত্রিক বাধাগুলি চুরমার হয়ে গেল। জার্মানিতে এ প্রক্রিয়া এখনো শেষ হয় নি। কিন্তু ঠিক যেমন বিকাশের একটি পর্যায়ে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে কারখানা-শিল্পের সংঘাত বাধে, ঠিক তেমনি তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে আজ ইতিমধ্যেই বৃহদায়তন উৎপাদনের সংঘাত দেখা দিয়েছে। এই ব্যবস্থার মধ্যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ এই শিল্প একদিকে জনসাধারণের বৃহত্তম অংশকে ক্রমশই প্রলেতারিয়ানে পরিণত করে এবং অপরদিকে উৎপন্ন করে ক্রমবর্ধমান অবিক্রেয় উৎপন্ন। পারস্পরিক হেতুস্বরূপ অতি-উৎপাদন ও ব্যাপক দুর্দশা এই বিদ্ঘুটে স্ববিরোধই হল বৃহৎ শিল্পের পরিণাম এবং তারই ফলে উৎপাদন-শক্তিকে মুক্তি দেবার জন্য উৎপাদন-ব্যবস্থায় এক পরিবর্তনের প্রয়োজন অনিবার্যভাবেই দেখা দেয়।

অতএব, অন্তত আধুনিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রমাণ হয় যে, সমস্ত রাজনৈতিক সংগ্রামই হল শ্রেণী-সংগ্রাম, এবং মুক্তিকামী সমস্ত শ্রেণী-সংগ্রামের রাজনৈতিক রূপ অনিবার্য হলেও — কেননা সমস্ত শ্রেণী-সংগ্রামই

রাজনৈতিক সংগ্রাম — তা শেষ পর্যন্ত **অর্থনৈতিক** মুক্তির প্রশ্নেই আবর্তিত। অতএব, অন্তত এই ইতিহাসের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল গৌণ, এবং নাগরিক সমাজ (civil society), অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রটাই হল নির্ধারক। হেগেলও যে চিরাচরিত ধারণাকে শ্রদ্ধা করেছেন, সেই ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রই হল নির্ধারক বস্তু এবং নাগরিক সমাজ হল তার দ্বারা নির্ধারিত। বাহ্য রূপটা সেইরকমই। যেমন, ব্যক্তি-বিশেষের কর্মের সমস্ত চালিকা-শক্তি তার মস্তিষ্কের মাধ্যমে অবশ্য চালিত এবং তাকে সক্রিয় করার জন্য তার ইচ্ছা প্রেরণা রূপে পরিণত হতে বাধ্য, তেমনই নাগরিক সমাজের সমস্ত প্রয়োজন — যে শ্রেণীই সেখানে শাসক শ্রেণী হোক না কেন — আইন হিশেবে সাধারণ বৈধতা লাভের জন্য রাষ্ট্রের ইচ্ছার মাধ্যমে অগ্রসর হতে বাধ্য। এটা হল অবস্থাটির আনুষ্ঠানিক দিক এবং সেই দিকটিই স্বতঃসিদ্ধ। তবুও প্রশ্ন ওঠে, এই নিছক অনুষ্ঠানমূলক ইচ্ছার — তা ব্যক্তিরই হোক আর রাষ্ট্রেরই হোক — সারবস্তু কী, এবং সেই সারবস্তু এল কোথা থেকে, আর কিছু না হয়ে ঠিক এই ইচ্ছাটাই বা কেন? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই যে, আধুনিক ইতিহাসে রাষ্ট্রের ইচ্ছা মোটের উপর নিয়ন্ত্রিত হয়েছে নাগরিক সমাজের পরিবর্তনশীল চাহিদার দ্বারা, এই শ্রেণী বা ওই শ্রেণীর কর্তৃত্ব দ্বারা, শেষ বিচারে উৎপাদন-শক্তির ও বিনিময়-সম্পর্কের বিকাশ দ্বারা।

কিন্তু যদি বিশাল উৎপাদন-উপায় ও যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ আমাদের এই আধুনিক কালেও রাষ্ট্রটা স্বাধীন বিকাশের এক স্বাধীন ক্ষেত্র না হয়, যদি শেষ পর্যন্ত সমাজ-জীবনের অর্থনৈতিক শর্ত দ্বারাই তার সত্তা ও বিকাশের ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে পূর্ববর্তী সমস্ত যুগেই একথা আরো বেশি সত্য হতে বাধ্য যখন মানুষের বৈষয়িক জীবনোৎপাদনের এত প্রচুর উপায় ছিল না, এবং অতএব, যখন এই জাতীয় উৎপাদনের আবশ্যিকতা মানুষের উপর অনেক বেশি প্রভুত্ব বিস্তার করে থেকেছে। যদি আজকের দিনেও, বৃহৎ শিল্প ও রেলপথের যুগেও, রাষ্ট্র মোটের উপর উৎপাদন নিয়ন্ত্রণকারী শ্রেণীরই অর্থনৈতিক প্রয়োজনের ঘনীভূত প্রকাশমাত্র হয়, তাহলে যে যুগে প্রত্যেক পুরুষই তাদের সামগ্রিক আয়ুষ্কালের অনেক বেশি অংশ বৈষয়িক প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে ব্যয় করতে বাধ্য ছিল এবং

অতএব আজ আমাদের তুলনায় তার উপর ঢের বেশি নির্ভরশীল হতে বাধ্য ছিল, সে যুগে একথা নিশ্চয়ই অনেক বেশি সত্য হতে বাধ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাসকে গুরুত্ব সহকারে বিচার করলেই কথাটা সম্পূর্ণ পর্যাপ্তভাবে প্রমাণিত হয়। কিন্তু অবশ্যই এখানে সে বিচারের অবতারণা সম্ভব নয়।

রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় আইন যদি অর্থনৈতিক সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে অবশ্যই নাগরিক আইনের বেলাতেও একই কথা, — প্রকৃতপক্ষে সেগুলি মূলতই কোনো এক নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যা স্বাভাবিক, ব্যক্তি-বিশেষদের মধ্যে সেই ধরনের প্রচলিত অর্থনৈতিক সম্পর্কের অনুমোদন মাত্র। কিন্তু যেভাবে এই অনুমোদন দেওয়া হয় তার রূপ অবশ্য নানারকম হতে পারে। সমগ্র জাতীয় বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ইংলণ্ডে যেমন ঘটেছে, তেমনিভাবে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক আইনের রূপগুলিকে মোটের উপর অক্ষুণ্ণ রেখে তার মধ্যে বুর্জোয়া বিষয়বস্তু পুরে দেওয়া, বস্তুত সামন্ততান্ত্রিক নামটার মধ্যে সরাসরি বুর্জোয়া অর্থ ধরে নেওয়া সম্ভব। কিংবা পশ্চিম মহাদেশীয় ইউরোপে যেমন ঘটেছে তাও হতে পারে, অর্থাৎ রোমক আইন, যা কিনা পৃথিবীতে পণ্য-উৎপাদকদের প্রথম বিশ্ব আইন এবং যে আইনে সরল পণ্যের মালিকদের মূল আইনগত সম্পর্কের অপরূপ সূক্ষ্ম পরিব্যাখ্যান বর্তমান (ক্রেতা-বিক্রেতা, উত্তমর্ণ-অধমর্ণ, চুক্তি, বাধ্যবাধকতা, প্রভৃতি), তাকে ভিত্তি হিশেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ছোট বুর্জোয়ার ও তখনো আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উপকারার্থে, শুধুমাত্র আইনগত ব্যবহারের মাধ্যমে (সারা-জার্মান আইন) এই আইনকে সেই সমাজের স্তরে নিয়ে আসা সম্ভব; কিংবা তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত ও নীতিবাগীশ ব্যবহারজীবীদের সহায়তায় এই আইনকে এ জাতীয় সমাজ স্তরের উপযোগী করে ঢেলে সেজে একটা বিশেষ আইনসংহিতায় পরিণত করা যায় — সে পরিস্থিতিতে এ সংকলন অবশ্য আইনের দৃষ্টিকোণ থেকেও হবে খারাপ (যথা, প্রাশিয়ার Landrecht)। আবার সে ক্ষেত্রে বিরাট বুর্জোয়া বিপ্লবের পর এই একই রোমক আইনের ভিত্তিতে ফরাসী 'Code civile'-এর মতো বুর্জোয়া সমাজের চিরায়ত আইনসংহিতাও রচনা করা সম্ভব। অতএব, নাগরিক আইন যদি আইনগত রূপে সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের অভিব্যক্তি মাত্র হয়, তাহলে

অবস্থার তারতম্য অনুসারে সে অভিব্যক্তি ভালভাবেও হতে পারে, খারাপভাবেও হতে পারে।

রাষ্ট্রকে আমরা দেখি মানুষের উপর একটা প্রথম মতাদর্শগত শক্তি হিশেবে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে সমাজের সাধারণ স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য সমাজ একটি সংস্থা গড়ে নেয়। সেই সংস্থা হল রাষ্ট্রশক্তি। গড়ে উঠতে না উঠতেই এ সংস্থা সমাজের প্রসঙ্গে নিজেকে স্বতন্ত্র করে নেয় এবং অবশ্য যতই তা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর সংস্থায় পরিণত হয়, যতই প্রত্যক্ষভাবে সেই শ্রেণীর প্রাধান্য কায়েম করে, ততই বেশি করে রাষ্ট্রের এই স্বাতন্ত্র্য দেখা দেয়। শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিপীড়িত শ্রেণীর সংগ্রাম অনিবার্যভাবেই রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয়, এ সংগ্রাম সর্বাগ্রে শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে তার অর্থনৈতিক ভিত্তির অন্তঃসম্পর্কের চেতনা ম্লান হয়ে যায় এবং এমনকি তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে পারে। সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের বেলায় সম্পূর্ণভাবে তা না হলেও সে সংগ্রামের ঐতিহাসিকদের বেলায় প্রায় সর্বত্রই তা ঘটে। রোমক প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম সংক্রান্ত প্রাচীন গ্রন্থকারদের মধ্যে একমাত্র আপিয়নই সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার করে আমাদের জানিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা কী ছিল, অর্থাৎ ভূমি-সম্পত্তিই।

কিন্তু সমাজের সম্পর্কে রাষ্ট্র একবার স্বাধীন শক্তিতে পরিণত হবার পরই তা আরো একটি মতাদর্শের সৃষ্টি করে। বস্তুত পেশাদার রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় আইনের (Public Law) তত্ত্বকার এবং নাগরিক আইনের (Private Law) আইনবিদদের কাছেই অর্থনৈতিক তথ্যের সঙ্গে সম্পর্কটা একেবারে হারিয়ে যায়। যেহেতু প্রতিটি ক্ষেত্রেই আইনের সমর্থন লাভের জন্য অর্থনৈতিক ঘটনার পক্ষে আইনগত প্রেরণার রূপে পরিগ্রহ প্রয়োজন, এবং তাতে করে যেহেতু প্রচলিত সামগ্রিক আইন ব্যবস্থার কথা মনে রাখা অবশ্যই প্রয়োজন, তাই আইনগত রূপটিই হয়ে ওঠে সর্বেসর্বা এবং অর্থনৈতিক বিষয়বস্তুটি শূন্য হয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় আইন ও নাগরিক আইন স্বতন্ত্র দুটি ক্ষেত্র হিশেবে বিবেচিত হয়, যাদের উভয়েরই যেন নিজস্ব ও স্বাধীন ঐতিহাসিক বিকাশ আছে, সমস্ত অভ্যন্তরীণ বিরোধের সুসঙ্গত সমাধান ঘটিয়ে উভয়েরই যেন একটা ধারাবাহিক উপস্থাপন সম্ভব ও প্রয়োজন।

আরো উন্নত অর্থাৎ কিনা বৈষয়িক-অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে আরো দূরে সরে যাওয়া মতাদর্শ গ্রহণ করে দর্শন ও ধর্মের রূপ। এ ক্ষেত্রে ধ্যান-ধারণার সঙ্গে তাদের বৈষয়িক অস্তিত্বের অন্তঃসম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর হয়ে দাঁড়ায় এবং মধ্যবর্তী যোগসূত্রগুলির দরুন হয়ে ওঠে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর। অথচ এ পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান। যেমন, পঞ্চদশ শতকের মধ্য থেকে সমগ্র রেনেসাঁস যুগ মূলতই নগরের অতএব বার্গারদের (নাগরিকদের) অবদান, তেমনি পরবর্তী নব জাগ্রত দর্শনের বেলাতেও একই কথা। তার বিষয়বস্তু মূলতই হল ছোট ও মাঝারি বার্গারদের পক্ষে বড়ো বুর্জোয়ায় বিকশিত হবার পর্যায়োপযোগী চিন্তার দার্শনিক অভিব্যক্তি মাত্র। গত শতাব্দীর ইংরেজ ও ফরাসী দার্শনিকদের বেলায়, যাঁরা বহু ক্ষেত্রে ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ হিশেবে সমান, একথা সুস্পষ্ট; এবং ইতিপূর্বে হেগেলীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমরা একথা প্রমাণ করেছি।

এখন আমরা সংক্ষেপে ধর্মের কথা আলোচনা করব, কেননা তা বৈষয়িক জীবন থেকে সবচেয়ে দূরে এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বাস্তব জীবনের সঙ্গে সবচেয়ে সম্পর্কহীন। অত্যন্ত আদিম যুগে মানুষের নিজের প্রকৃতি ও তার পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি বিষয়ে ভ্রান্ত ও আদিম ধারণা থেকে ধর্মের উৎপত্তি। কিন্তু প্রতিটি ভাবাদর্শের একবার উদ্ভব হবার পর তা চলতি ধারণা-সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিকশিত হয় এবং সেগুলিকে আরো বিকশিত করে। না হলে তা ভাবাদর্শই হত না, অর্থাৎ চিন্তার তেমন একটা কারবার হত না, যেখানে চিন্তাকে স্বাধীনভাবে বিকাশমান, নিজস্ব নিয়মাধীন একটা স্বাধীন সত্তা হিশেবে দেখা হচ্ছে। যাদের মাথার মধ্যে এই চিন্তাপদ্ধতি ক্রিয়াশীল সেই মানুষদের বৈষয়িক জীবনের অবস্থাই যে শেষ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার গতি নিয়ন্ত্রণ করে, সেকথা অনিবার্যভাবেই এই ব্যক্তিদের কাছে অজ্ঞাত থাকে, কেননা তা না হলে সমস্ত ভাবাদর্শটাই শেষ হয়ে যায়। ধর্মের এই আদি ধারণাগুলি প্রতিটি জ্ঞাতি-সম্পর্কমূলক জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই মোটের ওপর সাধারণ, কিন্তু গোষ্ঠীগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে প্রতিটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর ভাগ্যে জীবন-ধারণের যে অবস্থা ঘটে সেই অবস্থা অনুসারে বিশেষ এক-একটা গোষ্ঠীগত ধরনে তা বিকশিত হতে থাকে। কয়েকটি জাতিগোষ্ঠী প্রসঙ্গে, বিশেষত আর্য (তথাকথিত ইন্দো-ইউরোপীয়) গোষ্ঠীর প্রসঙ্গে এই বিকাশ

পদ্ধতি খ‍্রটিয়ে বিচার করা হয়েছে তুলনাম‍্লক প‍্রাণতত্ত্বে। প্রতিটি জাতির মধ্যে এই যে দেবতাদের বানানো হল তাঁরা জাতীয় দেবতা; যে জাতীয় সীমানা রক্ষা করা তাঁদের দায়িত্ব তার বাইরে তাঁদের প্রভাব যায় নি। এ সীমানার অন্যদিকে অন্য দেবতাদের অক্ষ‍্ণ্ন প্রতিপত্তি। যতদিন পর্যন্ত একটি জাতির সত্তা বর্তমান শ‍্ধ‍্মাত্র ততদিন পর্যন্তই লোকেদের কল্পনায় এই দেবতাদের অস্তিত্ব চলতে পারত; জাতির পতনের সঙ্গে দেবতাদেরও পতন হত। রোমক বিশ্ব সাম্রাজ্যের আঘাতে প‍্রনো জাতিসত্তাগ‍্লির পতন ঘটেছিল, — এখানে এই সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন নেই। ম্লান হয়ে গেল প‍্রনো জাতীয় দেবতাগ‍্লি, এমনকি রোম নগরের সংকীর্ণ পরিধির পক্ষে উপযোগী রোমক দেবতারাও ক্ষয় পেল। বিশ্ব সাম্রাজ্যের পরিপ‍্রক হিশেবে যে বিশ্ব ধর্মেরও প্রয়োজন, সেকথা স্পষ্ট প্রকাশ পেল রোমে স্থানীয় দেবতাদের সঙ্গে যেসব বিদেশী দেবতাদের সামান্যমাত্র সম্মান ছিল তাঁদের জন্য স্বীকৃতি এবং দেবী জোগানোর প্রচেষ্টায়। কিন্তু এইভাবে সম্রাটের আজ্ঞায় কোন বিশ্ব ধর্ম স‍ৃষ্ট হয় না। ইতিমধ্যেই নিঃশব্দে সাধারণীকৃত প্রাচ্য এবং বিশেষত ইহ‍্দী ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে স্থ‍্ল গ্রীক, বিশেষত স্টোইক দর্শনের মিশ্রণ থেকে নতুন বিশ্ব ধর্মের অর্থাৎ খ‍্রীষ্টধর্মের আবির্ভাব হয়ে গেছে। আজ প‍্ঙখান‍্প‍্ঙখ গবেষণা করেই খ‍্রীষ্টধর্মের আদির‍্প আবিষ্কার করা সম্ভব, কেননা ধর্মটি আমাদের কাছে যে সরকারী চেহারায় এসে পেণছেছে সেটা হল তার সেই রাষ্ট্রধর্ম চেহারা, যাতে তাকে নিকাই সম্মেলন (১১৭) ঢেলে সাজে। কিন্তু ২৫০ বছর পরে ধর্মটি যে রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হল তা থেকেই প্রমাণ হয় ধর্মটি ছিল তখনকার অবস্থার কত অন‍্র‍্প। মধ্য য‍্গে যে পরিমাণে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটে চলল, সেই পরিমাণেই তার ধর্মগত পরিপ‍্রক হিশেবে, সামন্ততান্ত্রিক সোপান ব্যবস্থাসহ, খ‍্রীষ্টধর্মও বিকশিত হতে লাগল। এবং বার্গাররা সতেজ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ক্যাথলিকবাদের বির‍্দ্ধে প্রটেস্টাণ্ট ধর্মদ্রোহ বেড়ে ওঠে, যা প্রথম দেখা দয়ে ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে আলবিগেংসদের (১১৮) মধ্যে, যখন সেখানকার নগরগ‍্লির চ‍্ড়ান্ত সম‍ৃদ্ধি চলছে। দর্শন, রাজনীতি, আইন — ভাবাদর্শের বাকি সবকিছ‍্কে মধ্য য‍্গ ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সংয‍্ক্ত করে এবং সেগ‍্লিকে ধর্মতত্ত্বেরই অঙ্গ করে দেয়।

তাই সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনই ধর্মতত্ত্বমূলক রূপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। জনগণের অনুভূতির পুষ্টি হত শুধুমাত্র ধর্মের পথ্য দিয়ে। অতএব উদ্দাম কোনো আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল তাদের নিজেদের স্বার্থকে ধর্মের সাজে সাজিয়ে পরিবেশন করা। এবং ঠিক যেমনভাবে বার্গাররা শুরু থেকেই বিত্তহীন নাগরিক প্লেব, দিনমজুর ও নানাবিধ চাকরবাকরদের এক লেজুড় সৃষ্টি করেছিল, যারা কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক স্তরের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যারা উত্তরকালের প্রলেতারিয়েতের অগ্রদূত, তেমনি অচিরে ধর্মদ্রোহও নরমপন্থী বার্গার ধর্মদ্রোহ এবং প্লেবীয় বৈপ্লবিক ধর্মদ্রোহ এই দুই ভাগে বিভক্ত হল, দ্বিতীয়টি এমনকি বার্গার ধর্মদ্রোহীদের কাছেও ঘৃণাই।

প্রটেস্টান্ট ধর্মদ্রোহের দুর্মরতা ছিল উঠতি বার্গারদের দুর্জয়তারই সহগ। বার্গাররা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠার পর সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের বিরুদ্ধে তাদের যে সংগ্রাম এ পর্যন্ত ছিল প্রধানতই স্থানীয়, তা জাতীয় আয়তন গ্রহণ করতে লাগল। প্রথম বড়ো সংগ্রাম ঘটল জার্মানিতে অর্থাৎ তথাকথিত রিফর্মেশন। বার্গাররা তখনো নিজেদের পতাকাতলে অবশিষ্ট বিপ্লবী সামাজিক বর্গকে — শহরের প্লেবীয়দের এবং গ্রামাঞ্চলের নিম্ন স্তরের অভিজাত শ্রেণী এবং কৃষকদের — মেলাবার মতো শক্তিশালী বা বিকশিত হয় নি। অভিজাত শ্রেণী প্রথমটায় পরাজিত হয়; বিদ্রোহী হয়ে ওঠে কৃষকেরা এবং সমগ্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের সেইটিই হল সর্বোচ্চ বিন্দু। কিন্তু নগরগুলি তাদের অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করে এবং এইভাবে ভূস্বামী রাজাদের সেনাবাহিনীর সামনে পরাজিত হয় বিপ্লব। এই রাজারাই আহরণ করে সবটুকু লাভ। তারপর তিন শতাব্দী ধরে ইতিহাসে স্বাধীন ও সক্রিয় অংশগ্রহণকারী জাতিগুলির মধ্য থেকে জার্মানি অদৃশ্য হয়। কিন্তু জার্মান লুথারের পাশে আবির্ভূত হন ফরাসী কালভাঁ। খাঁটি ফরাসীসুলভ তীক্ষ্ণতায় তিনি রিফর্মেশনের বুর্জোয়া চরিত্রটিকে পুরোভাগে আনেন, গির্জাগুলিকে প্রজাতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রূপ দেন। জার্মানিতে লুথারের রিফর্মেশন যখন অধঃপতিত হয়েছে এবং দেশকে ছারখার করেছে, তখন জেনেভা, হল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডে প্রজাতন্ত্রবাদীদের ধ্বজা হয়ে দাঁড়িয়েছে কালভাঁ-র রিফর্মেশন, হল্যান্ডকে তা মুক্তি দিয়েছে স্পেন ও জার্মান সাম্রাজ্যের

আধিপত্য থেকে এবং ইংলণ্ডে তখন বুর্জোয়া বিপ্লবের যে দ্বিতীয় অংক অভিনীত হচ্ছে তার জন্য জুগিয়েছে মতাদর্শগত সাজপোশাক। সেইখানেই কালভাঁবাদ তখনকার বুর্জোয়া স্বার্থের সত্যকার ধর্মমূলক ছদ্মবেশ হিশেবে দেখা দেয় এবং এই কারণেই অভিজাত শ্রেণীর একাংশের সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর আপসে যখন ১৬৮৯ সালের বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটল তখন তা পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করতে পারে নি (১১৯)। ইংরেজদের রাষ্ট্রীয় গির্জা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল, কিন্তু তা আর আগেকার ক্যাথলিকদের রূপে নয়, যেখানে রাজা পোপের ভূমিকা পালন করে, — প্রতিষ্ঠিত হল কালভাঁবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত রূপে। পুরনো রাষ্ট্রীয় গির্জায় ক্যাথলিক রবিবারে ফুর্তির উৎসব পালন করা হত এবং তা নিরানন্দ কালভাঁ-র রবিবারের বিরোধী ছিল। নতুন বুর্জোয়াভাবাপন্ন গির্জা শেষোক্ত প্রথাটি প্রবর্তিত করল, আজো তা ইংলণ্ডের শোভা হয়ে আছে।

ফ্রান্সে ১৬৮৫ সালে সংখ্যালঘিষ্ঠ কালভাঁপন্থীদের দমন করা হল এবং হয় তাদের ক্যাথলিকপন্থী করা হল আর না হয় বিতাড়ন করা হল দেশ থেকে (১২০)। কিন্তু তাতে কীই বা লাভ হল? ইতিমধ্যেই স্বাধীন চিন্তাশীল পিয়ের বেল তাঁর কর্মজীবনের শীর্ষস্থানে পেঁছেছেন এবং ১৬৯৪ সালে জন্ম হল ভল্টেয়রের। চতুর্দশ লুই-এর জবরদস্ত ব্যবস্থার ফলে ফরাসী বুর্জোয়ার পক্ষে অধার্মিক এবং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক রূপে তাদের বিপ্লব সংঘটন আরো সহজই হয়ে দাঁড়াল, বিকশিত বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে একমাত্র এই রূপটিই উপযোগী। জাতীয় পরিষদের আসনগুলি অধিকার করলেন প্রটেস্টাণ্টদের পরিবর্তে স্বাধীন চিন্তাশীলেরা। এইভাবে খ্রীষ্টধর্ম উপনীত হল তার চরম অবস্থায়। ভবিষ্যতে কোনো প্রগতিশীল শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার মতাদর্শগত ভূষণ যোগাবার যোগ্যতা আর তার রইল না। ক্রমশই তা শুধু শাসক শ্রেণীগুলির একমাত্র সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াল এবং এটা তারা নেহাতই শাসনের উপায় হিশেবে, নিম্নতর শ্রেণীদের বন্ধনে রাখবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। তাছাড়া বিভিন্ন শাসক শ্রেণী তাদের নিজের নিজের উপযোগী ধর্ম ব্যবহার করে: ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণী ব্যবহার করে ক্যাথলিক জেসুইটবাদ বা প্রটেস্টাণ্ট গোঁড়ামি; উদারপন্থী ও র‍্যাডিকেল বুর্জোয়া শ্রেণী ব্যবহার করে যুক্তিবাদ (rationalism)। এবং এইসব ভদ্রলোকেরা নিজেরা নিজেদের

নির্দিষ্ট ধর্মগুলিতে বিশ্বাস করেন কি না করেন, তাতে কিছুই এসে যায় না।

অতএব, আমরা দেখছি: ধর্ম একবার গড়ে ওঠার পর তার মধ্যে ঐতিহ্যগত উপাদান বর্তমান থাকে, কারণ মতাদর্শের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঐতিহ্য হল একটি মস্ত রক্ষণশীল শক্তি। কিন্তু এই উপাদানের যে রূপান্তর ঘটে তা আসে শ্রেণী-সম্পর্ক থেকে, অর্থাৎ যে মানুষেরা এই রূপান্তর ঘটায় তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে। এবং বর্তমানে এইটুকু কথাই যথেষ্ট।

উপরে ইতিহাস সংক্রান্ত মার্কসীয় ধারণার শুধুমাত্র একটি সাধারণ খসড়া দেওয়াই সম্ভব, বড়ো জোর তার সঙ্গে মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্তও। তার প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে ইতিহাস থেকেই, এবং এই প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি যে, অন্যান্য রচনায় তা পর্যাপ্তভাবেই পাওয়া যাবে। কিন্তু এই ধারণা থেকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে দর্শনের পরিসমাপ্তি ঘটে, ঠিক যেমন প্রকৃতি সংক্রান্ত দ্বান্দ্বিক ধারণার ফলে সমস্ত প্রকৃতি-দর্শন অপ্রয়োজনীয় এবং অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এখন আর কোথাওই আমাদের মস্তিষ্ক থেকে অন্তঃসম্পর্ক আবিষ্কারের প্রশ্ন থাকে না, তার পরিবর্তে এগুলিকে আবিষ্কার করতে হয় বাস্তব ঘটনা থেকেই। প্রকৃতি এবং ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃত হয়ে দর্শনের জন্য যেটুকু ক্ষেত্র বাকি থাকে, — সেটুকু যদি আদৌ থাকে — সেটা হল বিশুদ্ধ চিন্তার ক্ষেত্র: চিন্তাপদ্ধতির নিয়মের তত্ত্ব, যুক্তিতত্ত্ব ও দ্বন্দ্বতত্ত্ব।

* * *

১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর থেকে 'শিক্ষিত' জার্মানি তত্ত্বকে বিদায় জানিয়ে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। কায়িক শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র উৎপাদন এবং হস্তশিল্প-কারখানার স্থানে এল খাঁটি বৃহৎ শিল্প। আবার বিশ্ববাজারে আবির্ভূত হল জার্মানি। ছোট ছোট রাষ্ট্র, সামন্ততন্ত্রের জের এবং আমলাতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থার ফলে এই বিকাশের বিরুদ্ধে প্রধানতম যেসব প্রতিবন্ধক ছিল, অন্তত সেগুলিকে নতুন ক্ষুদ্র জার্মান সাম্রাজ্য (১২১) দূর করেছে। কিন্তু স্পেকুলেশন যতই দার্শনিকের পাঠাগার ছেড়ে ফাটকাবাজারে গিয়ে মন্দির স্থাপন করতে লাগল ততই শিক্ষিত জার্মানি হারাল তার তত্ত্বের মহান আগ্রহ — লব্ধ ফলাফল ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য

হবে কিনা, তা পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে অপ্রিয় হবে কিনা, এসব চিন্তার অপেক্ষা না করে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক অন্বেষণের প্রবণতা। অথচ গভীরতম রাজনৈতিক অবমাননার দিনেও এই শক্তিই ছিল জার্মানির গৌরব। একথা ঠিক যে, বিশেষত খুঁটিনাটি গবেষণার ক্ষেত্রে জার্মানির সরকারী প্রকৃতিবিজ্ঞান তখনো প্রথম শ্রেণীতেই তার স্থান অধিকার করে রইল। কিন্তু মার্কিন পত্রিকা *Science* ন্যায্যতই মন্তব্য করেছে যে, বিচ্ছিন্ন সব তথ্যের মধ্যে ব্যাপক সম্পর্কসূত্র স্থাপন এবং সেগুলি থেকে সাধারণ নিয়ম টানার ক্ষেত্রে আগে যেমন জার্মানিতে প্রধান কাজ হত, তার বদলে এখন ইংলণ্ডে প্রধান কাজ হচ্ছে। এবং ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের তথা দর্শনেরও ক্ষেত্রে চিরায়ত দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে আগেকার সেই নির্ভীক তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের উৎসাহ। তার স্থান অধিকার করেছে শূন্যগর্ভ পল্লবগ্রাহিতা এবং পদ ও রোজগার নিয়ে সশঙ্ক ভাবনা, এমনকি ইতরতম চাকুরি মনোবৃত্তি পর্যন্ত। এই বিজ্ঞানগুলির সরকারী প্রতিনিধিরা হয়ে দাঁড়িয়েছেন বুর্জোয়া শ্রেণীর এবং বর্তমান রাষ্ট্রের অনাবৃত মতাদর্শগত প্রতিনিধি, কিন্তু তা এমন একটা যুগে যখন উভয়ই হল শ্রমিক শ্রেণীর প্রকাশ্য বিরোধী।

একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে তত্ত্বের প্রতি জার্মান আগ্রহ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এখান থেকে তাকে কোনোভাবে উচ্ছেদ করা যায় না। এখানে উচ্চ পদের জন্য, মুনাফার জন্য বা উপর মহল থেকে সদয় দাক্ষিণ্যলাভের জন্য কোনো মাথাব্যথা নেই। অপরপক্ষে, বিজ্ঞান যতই নির্ভয় ও নিরাসক্তভাবে অগ্রসর হয়, ততই দেখা দেয় শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার সঙ্গতি। যে নব ধারা অনুসারে সমগ্র সমাজ-ইতিহাস ব্যাখ্যার মূলসূত্র পাওয়া যাবে শ্রমবিকাশের ইতিহাসের মধ্যেই, তা শুরু থেকেই প্রধানত শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিই আবেদন করেছে এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেই যে সাড়া পেয়েছে, সরকারী বিজ্ঞানের কাছ থেকে তা এই সাড়া চায়ও নি, প্রত্যাশাও করে নি। জার্মান শ্রমিক আন্দোলনই জার্মান চিরায়ত দর্শনের উত্তরাধিকারী।

১৮৮৬ সালের গোড়ায় লিখিত

Die Neue Zeit পত্রিকার ৪ ও ৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে এবং স্বতন্ত্র পুস্তক হিশেবে প্রকাশিত হয় স্টুটগার্টে, ১৮৮৮ সালে

জার্মান থেকে ইংরেজী অনুবাদের ভাষান্তর

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

ফ্লোরেন্স কেলি-ভিশনেভেৎস্কায়া সমীপে

নিউ ইয়র্কে

লণ্ডন, ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৬

...গত দশ মাসে মার্কিন মেহনতী মানুষ যে বিরাট অগ্রগতি করেছে, আমার ভূমিকা* অবশ্যই পুরোপুরি তার প্রতি নিবদ্ধ হবে এবং স্বভাবতই হেনরি জর্জ ও তাঁর জমি সংক্রান্ত পরিকল্পনাকেও ছুঁয়ে যাবে। কিন্তু বিস্তারিতভাবে তা নিয়ে আলোচনা করার ভঙ্গি তা করতে পারে না। তার সময় হয়েছে বলেও আমি মনে করি না। অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে আন্দোলন শুরু থেকেই তত্ত্বগতভাবে একেবারে সঠিক খাতে আরম্ভ হওয়া ও এগিয়ে চলার চাইতে বরং আন্দোলন ছড়িয়ে পড়া উচিত, সুসমঞ্জসভাবে অগ্রসর হয়ে দৃঢ়মূল হওয়া উচিত এবং যথা সম্ভব সমগ্র মার্কিন প্রলেতারিয়েতকে তার আওতায় আনা উচিত। নিজের ভুলভ্রান্তি থেকে শেখার চাইতে, তিক্ত অভিজ্ঞতায় শেখার চাইতে অনুধাবনের তত্ত্বগত স্বচ্ছতার শ্রেয়তর পথ আর নেই। আর গোটা একটা বিরাট শ্রেণীর পক্ষে অন্য কোনো পথ নেই, বিশেষ করে মার্কিনদের মতো এমন বিশেষ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ও তত্ত্ব সম্পর্কে এমন অবজ্ঞাপূর্ণ একটি জাতির পক্ষে। বিরাট জিনিসটি হল শ্রমিক শ্রেণীকে একটি **শ্রেণী হিশেবে** চলতে দেওয়া; একবারও তা অর্জিত হলে তারা অচিরেই দেখতে পাবে সঠিক গতিমুখটিকে, আর যারা প্রতিরোধ করে, সেই হেনরি জর্জ বা পাওডারলি, তাদের নিজেদের ছোট ছোট গোষ্ঠী নিয়ে পড়ে থাকবে অসহায় অবস্থায়। সুতরাং আমি এই আন্দোলনে 'নাইটস অব লেবার'কেও (১২২) অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে

---

* ফ. এঙ্গেলস, 'আমেরিকায় শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন। 'ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' গ্রন্থের মার্কিন সংস্করণের ভূমিকা'।—সম্পাঃ

মনে করি, এই আন্দোলনকে বাইরে থেকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়, বরং ভিতর থেকে বৈপ্লবিক করে তোলা উচিত, এবং আমি মনে করি যে, আমেরিকায় বসবাসকারী জার্মানদের অনেকেই যে বলিষ্ঠ ও গৌরবময় আন্দোলন তাঁদের সৃষ্টি নয় তার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের আমদানি-করা ও সর্বদা বোধ্যগম্য নয় এমন তত্ত্বকে একধরনের alleiuseligmachendes Dogma* করে তুলতে চেষ্টা করে, এবং যে আন্দোলন সেই গোঁড়া মতবাদকে গ্রহণ করে নি এমন যে কোনো আন্দোলন থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে মারাত্মক ভুল করেছিলেন। আমাদের তত্ত্ব গোঁড়া মতবাদ নয়, বরং বিবর্তনের এক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা, আর সেই প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক কতকগুলি পর্যায় জড়িত। প্রধানতর শিল্পোন্নত দেশগুলিতে তৈরি তত্ত্ব সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতনতা নিয়ে মার্কিনরা শুরু করবে, এমন প্রত্যাশা করা অসম্ভবেরই প্রত্যাশা করা। জার্মানদের যেটা করা উচিত তা হল তাঁদের নিজেদের তত্ত্ব অনুসারে কাজ করে — ১৮৪৫ ও ১৮৪৮ সালে আমরা যেমন বুঝেছিলাম তাঁরা যদি তা তেমন করে বোঝেন — যে কোনো প্রকৃত শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়া, তার faktische** যাত্রাস্থলটি যেমন, তেমনভাবেই তাকে গ্রহণ করা এবং প্রত্যেকটি ভুল, প্রত্যেকটি বিপর্যয় কীভাবে মূল কর্মসূচির ভ্রান্ত তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিণতি ছিল তা দেখিয়ে তাকে ক্রমে ক্রমে তত্ত্বগত স্তরে তুলে আনা: তাঁদের উচিত, 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এর ভাষায়, বর্তমানের আন্দোলনের মধ্যে সেই আন্দোলনের ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব করা।*** কিন্তু সর্বোপরি আন্দোলনকে সংহত হওয়ার সময় দিন; জনগণ বর্তমানে যেসব জিনিস যথাযথভাবে বুঝতে পারে না, কিন্তু অচিরেই বুঝতে শিখবে সেসব জিনিস জোর করে জনগণের গলাধঃকরণ করিয়ে প্রথম আরম্ভের বিশৃঙ্খলাকে আরো বেশি জট পাকিয়ে তুলবেন না। মতবাদের দিক দিয়ে নিখুঁত একটা মঞ্চের সপক্ষে এক লক্ষ ভোটের চাইতে আগামী নভেম্বর মাসে প্রকৃত এক শ্রমিক পার্টির সপক্ষে দশ বা কুড়ি লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের ভোট বর্তমানে অপরিসীমভাবে অনেক বেশি মূল্যবান। চলমান জনসাধারণকে

* একমাত্র রক্ষাকারী গোঁড়া মতবাদ। — সম্পাঃ

** প্রকৃত। — সম্পাঃ

*** এই সংস্করণের ১ খণ্ড, ১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

জাতীয় ভিত্তিতে সংহত করার প্রথম প্রচেষ্টাই — আন্দোলনের অগ্রগতি হলে শীঘ্রই তা করতে হবে — মুখোমুখি নিয়ে আসবে তাঁদের সবাইকে — জর্জপন্থী, 'নাইটস অব লেবার', ট্রেড ইউনিয়নিস্ট এবং সকলকে; আর আমাদের জার্মান বন্ধুরা যদি তার মধ্যে আলোচনার প্রবৃত্ত হওয়ার মতো দেশের ভাষা যথেষ্ট শিখে থাকেন, তাহলে তখন তাঁদের সময় আসবে অপরের অভিমতের সমালোচনা করার এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের অসঙ্গতি তুলে ধরে তাঁদের ক্রমে ক্রমে নিজেদের প্রকৃত অবস্থা, পুঁজি এবং মজুরি-শ্রমের পরস্পরসম্পর্ক তাঁদের জন্য যে অবস্থা তৈরি করে দিয়েছে তা উপলব্ধি করাবেন। কিন্তু শ্রমিক পার্টির সেই জাতীয় সংহতিকে — তা যে মঞ্চেই হোক না কেন — বিলম্বিত বা রোধ করতে পারে এমন সবকিছুকেই আমি বিরাট ভুল বলে মনে করি, এবং তাই হেনরি জর্জ কিংবা 'নাইটস অব লেবার' কারও সম্পর্কেই সম্পূর্ণরূপে ও বিশদভাবে কিছু বলার মতো সময় হয়েছে বলে আমি মনে করি না...

পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী মুদ্রিত ইংরেজী থেকে অনূদিত

টীকা

(১) **'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'** নামক এঙ্গেলসের বইটি হল 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' থেকে নেওয়া তিনটি অধ্যায়ের সমষ্টি। কিছু অদল-বদল করে এটি লেখা হয়েছে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে: তা হল মার্কসীয় শিক্ষাকে অখণ্ড এক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি রূপে জনবোধ্য আকারে শ্রমিকদের কাছে হাজির করা। এই বইটিতে এঙ্গেলস মার্কসবাদের তিনটি অঙ্গের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এটিতে দেখিয়েছেন, কেমন করে গড়ে উঠেছে দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, এবং কেমন করে মার্কসের দুটি মহান আবিষ্কার ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা বিশদীকরণ ও বাড়তি মূল্য সৃষ্টির কল্যাণেই সমাজতন্ত্র এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি লাভ করেছে।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলি দেখিয়ে, ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও তার ভুলত্রুটি নির্দেশ করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র উৎপত্তির বিভিন্ন পূর্বশর্তের বিশেষত্বের ব্যাখ্যা করেন এঙ্গেলস।

এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে এঙ্গেলস প্রমাণ করেন যে, পুঁজিতন্ত্রের প্রধান দ্বন্দ্বটি — উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আর পুঁজিবাদী মালিকানার মধ্যেকার দ্বন্দ্বটি — দূর করা যেতে পারে কেবলমাত্র প্রলেতারীয় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

পৃঃ ৭

(২) **আইজেনাখপন্থী এবং লাসালপন্থী** — উনিশ শতকের ৬০-এর ও ৭০-এর বছরগুলির গোড়ার দিকে জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের দুটি পার্টি।

আইজেনাখপন্থী — ১৮৬৯ সালে আইজেনাখে উদ্বোধনী কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সদস্যরা।

লাসালপন্থী — জার্মান পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী ফ. লাসালের সমর্থক ও অনুগামীরা; ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত সারা-জার্মান শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য

ছিল তারা। সর্বজনীন ভোটাধিকার ও শান্তিপূর্ণ সংসদীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য সংগ্রামের মধ্যে নিজ উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ রেখে এই ইউনিয়ন সুবিধাবাদী রাজনীতি অনুসরণ করত।

১৮৭৫ সালের ২২-২৭ মে-তে গোথায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে এই দুই ধারার মিলন ঘটে। মিলিত এই পার্টির নাম হয় জার্মানির সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টি। পৃঃ ৭

(৩) **দ্বিধাতুমান** (Bimetallism) —একটি মুদ্রা-ব্যবস্থা, যাতে মুদ্রার কাজ সম্পাদন করে দুটি মূল্যবান ধাতু — সোনা আর রুপো। পৃঃ ৮

(৪) *Vorwärts* ('আগুয়ান') — জার্মানির সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র, ১৮৭৬ সাল থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত লাইপজিগে প্রকাশিত। পৃঃ ৮

(৫) **'মার্ক'** — প্রাচীন জার্মান লোকসমাজ। 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' বইয়ের প্রথম জার্মান সংস্করণের ক্রোড়পত্র হিশেবে 'মার্ক' শিরোনামে প্রাচীন কাল থেকে জার্মান কৃষককুলের ইতিহাস সম্বন্ধে এঙ্গেলস একটা সংক্ষিপ্ত খসড়া রচনা করেছিলেন। পৃঃ ৯

(৬) **অজ্ঞেয়বাদ** *(Agnosticism)* — গ্রীক উপসর্গ a — না; এবং gnosis — **জ্ঞান** থেকে। এই ভাববাদী দার্শনিক তত্ত্বে বলা হয় জগৎ অজ্ঞেয়, মানুষের মন সীমাবদ্ধ এবং অনুভূতির এলাকার বাইরে তা কিছু জানতে পারে না। পৃঃ ১০

(৭) **স্কলাস্টিক** — মধ্য যুগের স্কুলে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া ধর্মীয়-ভাববাদী দর্শনের ভিতরে আধিপত্যকারী ধারাগুলির একটি সাধারণ নাম।

স্কলাস্টিক দর্শন প্রকৃতি আর পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা অধ্যয়ন করে না এবং খ্রীষ্টান চার্চের উপদেশবাক্যের উপর ভিত্তি করে তার সাধারণ নীতি থেকে বুদ্ধিমত্তার নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেয় এবং মানুষের আচরণ নির্ধারণের চেষ্টা করে। পৃঃ ১১

(৮) **ধর্মতত্ত্ব** (Theology) — (গ্রীক থেকে আক্ষরিক অর্থে অনুবাদ করলে অর্থ হয় ঈশ্বরচর্চা) — ধর্মীয় শিক্ষা, যা কিনা এক পদ্ধতি রূপে এবং ধর্মীয় নৈতিকতা, উপদেশ-বাক্য আর ধর্মমতের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠার প্রয়াস পেয়েছিল। পৃঃ ১১

(৯) **নামবাদী** — মধ্যযুগীয় দর্শনের একটি মতধারার প্রতিনিধি; আলোচ্য দর্শনটি

এই মত পোষণ করত যে, সাধারণ ধারণাগুলো হল শুধু নাম, যা দিয়ে মানুষের চিন্তা ও ভাষার ব্যাখ্যা দেওয়া চলে এবং যা কিনা কেবলমাত্র আলাদা আলাদা বস্তুর রূপ নির্ধারণের পক্ষে উপযোগী। মধ্যযুগীয় বাস্তববাদীদের সঙ্গে নামবাদীদের পার্থক্য হল এই যে, শেষোক্তরা বস্তুর আদিরূপ ও গঠনমূলক উৎস হিশেবে ধারণার অস্তিত্বকে অস্বীকার করত। অর্থাৎ কিনা, তারা বস্তুকে মুখ্য এবং ধারণাকে গৌণ বলে বিবেচনা করত। এই অর্থে নামবাদ ছিল মধ্য যুগে বস্তুবাদের প্রথম প্রকাশ। পৃঃ ১১

(১০) Homoioméreia — প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক আনাক্সেইগরসের শিক্ষানুসারে অতি ক্ষুদ্র নির্দিষ্ট বস্তুময় কণিকা সীমাহীনভাবে বিভাজনযোগ্য। আনাক্সেইগরসের মতে হোমিওমিরিয়ে সমগ্র অস্তিত্বের আদি ভিত্তি এবং তা দিয়েই বিভিন্ন বস্তু গঠিত। পৃঃ ১১

(১১) **আস্তিক্যবাদ** (Theism) — ধর্মীয়-দার্শনিক শিক্ষা; এটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিশেবে, অতি বুদ্ধিমান আর ধরা-ছোঁয়ার নাগালের বাইরের এক অস্তিত্ব হিশেবে, সৃষ্টিকর্তা হিশেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে। আস্তিক্যবাদের শিক্ষানুসারে ঈশ্বর সক্রিয়ভাবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক জীবনে অংশ নিয়ে থাকেন। পৃঃ১৩

(১২) **ইন্দ্রিয়বাদ** — জ্ঞানতত্ত্বের বিশেষ এক ধারা, তাতে ইন্দ্রিয়ই হল জ্ঞানের মুখ্য উপায়। পৃঃ ১৩

(১৩) **ডীইজম** (Deism) — সাকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্ত ভাব-ধারণা প্রত্যাখ্যানকারী দর্শন, যাতে ঈশ্বরকে জগতের নিরাকার আদি হেতু বলে ধরা হত। পৃঃ ১৩

(১৪) এখানে ১৮৫১ সালের মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত লণ্ডনে অনুষ্ঠিত প্রথম সারা-বিশ্ব বাণিজ্য ও শিল্প প্রদর্শনীর কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৪

(১৫) **ইংলন্ডের রাষ্ট্রীয় চার্চ (অ্যাংলিকান চার্চ)** — ১৬শ শতকের পোপের সঙ্গে ইংরেজ রাজবংশের সংঘর্ষের সময়ে উদ্ভূত হয়।

ইংলন্ডের রাজা চার্চের প্রধান। ১৭শ শতকের গোড়া থেকে এটা ইংলন্ডের রাজনৈতিক জীবনে রক্ষণশীল ধারণা সমর্থন করে। পৃঃ ১৪

(১৬) **ব্যাপটিস্টবাদ** — প্রটেস্টান্টবাদের রকমফের, উদ্ভূত হয় ১৭শ শতকের গোড়ায়। ধর্ম ও চার্চ সংগঠনের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন ব্যাপটিস্টরা সরল করেছিল; ধর্মদীক্ষা দেওয়া হত কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের। পৃঃ ১৪

(১৭) **'স্যালভেশন আর্মি'** — প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় এবং লোকহিতৈষী সংস্থা, ১৮৬৫ সালে ইংলন্ডে গঠিত হয় এবং ১৮৮০ সালে সামরিক ধরনে এর পুনর্সংগঠনের

পর এই নাম দেওয়া হয়। বুর্জোয়াদের বিস্তৃত সমর্থন লাভ করে এই সংস্থা শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে শ্রমজীবী জনগণের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে নিজ জাল বিস্তার করে। পৃঃ ১৪

(১৮) **অধ্যাত্মবাদ** (ল্যাটিন শব্দ spiritus, অর্থাৎ **আত্মা** থেকে) — অস্তিত্বের আদি হেতু রূপে আত্মাকে মুখ্য বলে মানা হয় ভাববাদী এই শিক্ষায়। অধ্যাত্মবাদীদের মতানুসারে দেহের উপর নির্ভর না করে আত্মা একেবারে স্বতন্ত্রভাবে অনন্তকাল ধরে বিরাজ করছে। পৃঃ ১৭

(১৯) **ধর্ম-সংস্কার** — ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে বিপুল এক সামাজিক আন্দোলন; ১৬শ শতকে এটি ছড়িয়ে পড়েছিল জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ইংলন্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য বহু দেশে। যেসমস্ত দেশে এই রিফর্মেশন জয় লাভ করে, সেখানে এই সংস্কারের ধর্মীয় উত্তরাধিকার হিশেবে বহু নতুন ও তথাকথিত প্রটেস্টান্ট চার্চ গড়ে ওঠে (ইংলন্ডে, স্কটল্যান্ডে, নেদারল্যান্ডে, জার্মানি আর স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলির কয়েকটি অঞ্চলে)। পৃঃ ২০

(২০) **'গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লব'** —১৬৮৮ সালের কু'দেতাটিকে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা এই নামে অভিহিত করেন; এর ফলে ইংলন্ডে স্টুয়ার্টের সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং ভূস্বামী-অভিজাত শ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের মধ্যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে উইলিয়ম অভ অরেঞ্জের নেতৃত্বে সংবিধানসম্মত রাজ (১৬৮৯) প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃঃ ২১

(২১) **সাদা ও লাল গোলাপের যুদ্ধ** (১৪৫৫-১৪৮৫) — এখানে সিংহাসনের জন্য সংগ্রামরত ইংলন্ডের সামন্তকুলের দুই প্রতিনিধির মধ্যেকার যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে; এই কুলদ্বয়ের একটি হল ইয়র্করা, যাদের প্রতীকচিহ্নে অঙ্কিত ছিল সাদা গোলাপ, আর ল্যাংকেস্টারদের প্রতীকচিহ্নে ছিল লাল গোলাপ। ইয়র্কদের চারিপাশে দলবদ্ধ হয়েছিল দক্ষিণের অধিকতর বিত্তশালী বৃহৎ সামন্তদের এক অংশ, নাইট-সম্প্রদায় এবং শহুরে জনগণ; ল্যাংকেস্টারদের সমর্থনে ছিল উত্তরের জমিদার-সম্প্রদায়ের অভিজাত সামন্তসমাজ। এই যুদ্ধের ফলে পুরনো সামন্ত পরিবারগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং যুদ্ধান্তে ক্ষমতায় আসে নতুন টিউডর বংশ, যার ফলে ইংলন্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় নিরংকুশ রাজতন্ত্র। পৃঃ ২২

(২২) **কার্থেজিয়ান দর্শন** (Cartesius) — ১৭শ শতকের ফরাসী দার্শনিক দেকার্তের অনুগামীদের শিক্ষা; তাঁরা তাঁর দর্শন থেকে বস্তুবাদী সিদ্ধান্তে উপনীত হন। পৃঃ ২২

(২৩). **'মানবিক ও নাগরিক অধিকার ঘোষণাপত্র'** — এই বিলটি সংবিধান-সভা কর্তৃক গৃহীত হয় ১৭৮৯ সালে। এতে বর্ণিত হয়েছিল নতুন বুর্জোয়া ব্যবস্থার

রাজনৈতিক নীতিসমূহ। ১৭৯১ সালে ফরাসী সংবিধানে ঘোষণাটি সংযুক্ত হয়েছিল; এর উপরেই ভিত্তি করে ১৭৯৩ সালে জ্যাকোবিন 'মানবিক ও নাগরিক অধিকার ঘোষণাপত্র' নামের বিলটি রচিত হয়েছিল, যেটি ১৭৯৩ সালে জাতীয় কনভেনশন কর্তৃক গৃহীত ফ্রান্সের প্রথম রিপাবলিকান সংবিধানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। পৃঃ ২৪

(২৪) 'Code Civil'—এখানে এবং অন্যত্র উল্লিখিত **নেপোলিয়নের বিধির** মাধ্যমে এঙ্গেলস কেবল একটিমাত্র দেওয়ানী বিধি, তথা ১৮০৪ সালে প্রথম নেপোলিয়নের রাজত্বকালে গৃহীত ও 'নেপোলিয়নের বিধি' নামে খ্যাত বিধিটিরই উল্লেখ করছেন না, বরং তা উল্লেখ করছেন ব্যাপক অর্থে, অর্থাৎ ১৮০৪-১৮১০ সালে প্রথম নেপোলিয়নের রাজত্বকালে গৃহীত পাঁচটি বিধির (দেওয়ানী, দেওয়ানী-মোকদ্দমামূলক, বাণিজ্যিক, ফৌজদারি এবং ফৌজদারি-মোকদ্দমামূলক) বুর্জোয়া অধিকারের সমগ্র ব্যবস্থার। নেপোলিয়নের ফ্রান্স কর্তৃক বিজিত জার্মানির পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলগুলিতে এই বিধিসমূহ চালু করা হয়েছিল এবং ১৮১৫ সালে রাইন প্রদেশ প্রাশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পরেও ওই অঞ্চলে এই বিধিগুলি কার্যকর ছিল। পৃঃ ২৪

(২৫) এখানে **নির্বাচনী আইন সংস্কার** সম্পর্কে বলা হচ্ছে; এ সম্পর্কে বিলটি ইংলন্ডের সাধারণ সভায় গৃহীত হয় ১৮৩১ সালে এবং ১৮৩২ সালের জুনে লর্ডস-সভায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। এই সংস্কারটি শিল্প-বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিবৃন্দের পার্লামেণ্টে প্রবেশের পথ খুলে দেয়। এই সংস্কারের জন্য সংগ্রামের প্রধান শক্তি প্রলেতারিয়েত ও পেটি বুর্জোয়ারা উদারপন্থী বুর্জোয়াগণ কর্তৃক প্রতারিত হয় এবং নির্বাচনী অধিকার লাভে বঞ্চিত হয়। পৃঃ ২৬

(২৬) এখানে শস্য আইন নাকচ সংক্রান্ত ইংলন্ডের পার্লামেণ্ট কর্তৃক ১৮৪৬ সালের জুনে গৃহীত বিলের কথা বলা হচ্ছে। বিদেশ থেকে শস্যের আমদানি সীমিত অথবা নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তথাকথিত এই **শস্য আইনটি** ইংলন্ডে প্রবর্তিত হয় বৃহৎ ভূস্বামী আর জমিদারদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে। ১৮৪৬ সালে এই বিলটি গৃহীত হবার ফলেই শিল্প-বুর্জোয়াদের বিজয় সূচিত হয়, তারাই অবাধ বাণিজ্যের স্লোগান তুলে শস্য আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছিল। পৃঃ ২৬

(২৭) শ্রমিকদের বিপুল আন্দোলনের চাপে পড়ে ১৮২৪ সালে ইংলন্ডের পার্লামেণ্ট শ্রমিকদের সমিতি (ট্রেড ইউনিয়ন) নিষিদ্ধ করার নীতি নাকচ করে এক আইন প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়। পৃঃ ২৭

(২৮) **জনগণের সনদ** — চার্টিস্টদের দাবি সহ পার্লামেন্টে বিবেচনার উদ্দেশ্যে খসড়া আইন হিশেবে এটি প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ সালের ৮ মে; এতে ছিল মোট ছ'টি দফা: সার্বজনীন ভোটাধিকার (২১ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের জন্য), প্রতিবছর পার্লামেন্টের নির্বাচন, গোপন ভোটব্যবস্থা, ভোটকেন্দ্রের সমতাবিধান, পার্লামেন্টে নির্বাচিত হতে আগ্রহী প্রার্থীদের জন্য আবশ্যক সম্পত্তির শর্ত নাকচ করা, পার্লামেন্ট-সদস্যদের বেতন দেওয়া। জনগণের সনদটি গ্রহণ করার দাবি জানিয়ে পার্লামেন্টের দরবারে চার্টিস্টরা মোট তিনটি আবেদন পেশ করে, কিন্তু প্রতিবারই, যথাক্রমে ১৮৩৯, ১৮৪২ ও ১৮৪৯ সালে পার্লামেন্ট কর্তৃক তা অগ্রাহ্য হয়। পৃঃ ২৭

(২৯) **শস্য আইনবিরোধী লীগ** — ইংরেজ শিল্প-বুর্জোয়াদের একটি সংগঠন, ১৮৩৮ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের কারখানা-মালিক কবডেন ও ব্রাইট এর প্রতিষ্ঠা করেন। অবাধ বাণিজ্যের দাবি তুলে লীগ শস্য নিয়ন্ত্রণ আইন রদের চেষ্টা করে, যাতে শ্রমিকদের মজুরি কমানো যায় এবং ভূমি-সম্পত্তির মালিক অভিজাতদের আর্থনীতিক ও রাজনীতিক অবস্থান দুর্বল করা যায়। শস্য আইন রদের পর (১৮৪৬) লীগের অস্তিত্ব লোপ পায়। পৃঃ ২৭

(৩০) এখানে ১৮৪৮ সালের ১০ এপ্রিল লন্ডনে চার্টিস্টদের আয়োজিত বিরাট গণ-মিছিলের কথা বলা হচ্ছে; এটি আয়োজিত হয়েছিল জনগণের সনদ গ্রহণ সম্পর্কে এক আবেদন-পত্র পার্লামেন্টে পেশ করার উদ্দেশ্যে। সংগঠকদের কঠিন মনোবলের অভাব ও দোদুল্যমানতার ফলে এটি ব্যর্থ হয়। এই মিছিলের ব্যর্থতাকে শ্রমিকদের উপর হামলা আর চার্টিস্টদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অস্ত্র হিশেবে ব্যবহার করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা। পৃঃ ২৭

(৩১) এখানে ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর লুই বোনাপার্ট কর্তৃক সংগঠিত রাষ্ট্রীয় কু'দেতার কথা বলা হচ্ছে; এর ফলে সূচিত হয় বোনাপার্ট শাসনের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের কাল। পৃঃ ২৭

(৩২) **'জোনাথান ভাই'** — ইংলন্ডের উত্তর আমেরিকা উপনিবেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় (১৭৭৫-১৭৮৩) ইংরেজরা উত্তর আমেরিকাবাসীদের এই বিদ্রূপাত্মক নাম দেয়। পৃঃ ২৮

(৩৩) **রিভাইভ্যালিজ্‌ম্‌** — প্রটেস্টান্ট চার্চের একটি ধারা। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংলন্ডে এর উদ্ভব হয় এবং পরে উত্তর আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে; ধর্মীয় প্রচার আর ঈশ্বরে বিশ্বাসী নতুন নতুন গোষ্ঠী গড়ে তোলার মাধ্যমে এর অনুগামীরা খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব সংহত ও বিস্তারের চেষ্টা করে। পৃঃ ২৮

(৩৪) ১৮৬৭ সালে ইংলণ্ডে ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনের চাপে **দ্বিতীয় সংসদীয় সংস্কার** সাধিত হয়। এই সংস্কারের জন্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেয় প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদ। সংস্কারের ফলে ইংলণ্ডে ভোটদাতাদের সংখ্যা দু'গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়, বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিকদের বিপুল অংশও ভোটাধিকার লাভ করে। পৃঃ ৩০

(৩৫) **হুইগ ও টোরি** — ১৭শ শতকের ৮ম-৯ম দশকে গঠিত ইংলণ্ডের রাজনীতিক পার্টি। হুইগ পার্টি পুঁজিপতিগোষ্ঠী আর ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের এবং সেইসঙ্গে 'বুর্জোয়া-বনে-যাওয়া' অভিজাতদের একাংশের স্বার্থ প্রকাশ করে। হুইগরাই লিবারেল (উদারনৈতিক) পার্টি সূচনা করে। টোরি পার্টি প্রতিনিধিত্ব করে বড়ো বড়ো জমিদার আর অ্যাংলিকান চার্চের যাজকমণ্ডলীর শীর্ষব্যক্তিদের; পরে তারাই কন্সারভেটিভ (রক্ষণশীল) পার্টির সূচনা করে। পৃঃ ৩০

(৩৬) গোপন ব্যালট পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয় ১৮৭২ সালে। পৃঃ ৩৫

(৩৭) **ক্যাথিডার-সোশ্যালিজম** — ১৯শ শতকের অষ্টম-শেষ দশকের বুর্জোয়া ভাবাদর্শের একটি ধারা, এর প্রতিনিধিরা, সর্বপ্রথমে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপকরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা-মঞ্চ (জার্মান ভাষায় Katheder, এ থেকেই নাম) থেকে সমাজতন্ত্রের ছদ্মবেশে বুর্জোয়া সংস্কারবাদ প্রচার করেন। ক্যাথিডার-সোশ্যালিস্টরা বলেন যে, রাষ্ট্র হল শ্রেণী-উধর্ব একটি প্রতিষ্ঠান, যা বৈর শ্রেণীগুলির মধ্যে শান্তি স্থাপনে এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থে ঘা না দিয়ে ধীরে ধীরে 'সমাজতন্ত্র' চালু করতে সক্ষম। ক্যাথিডার-সোশ্যালিজমের কর্মসূচি ছিল শ্রমিকদের রোগ আর দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে বীমার ব্যবস্থা করা, কারখানার আইন-কানুন গঠন, ইত্যাদি কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা। ক্যাথিডার-সোশ্যালিস্টরা মনে করতেন যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলি যদি খুব ভালভাবে সংগঠিত থাকে, তাহলে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম ও রাজনৈতিক পার্টির প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না। ক্যাথিডার-সোশ্যালিজম ছিল সংশোধনবাদী ভাবাদর্শের অন্যতম উৎসস্বরূপ। পৃঃ ৩১

(৩৮) **পুজার্চনা** (অধিকতর প্রচারিত নাম হল — পিউজিইজ্ম্) — অ্যাংলিকান চার্চের মধ্যেকার একটি ধারা, উদ্ভব হয় ১৯ শতকের ৩০-এর বছরগুলিতে; অ্যাংলিকান চার্চের মধ্যে ক্যাথলিক ধর্মাচার (এর থেকেই এই নামের উৎপত্তি) ও ক্যাথলিকবাদের অন্য কিছু রীতিনীতি পুনঃপ্রবর্তনের ডাক দেয় এই ধারার অনুগামীরা। পৃঃ ৩১

(৩৯) **ইস্ট-এন্ড** — লন্ডনের পূর্বাঞ্চল, শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকা। পৃঃ ৩৩

(৪০) সমস্ত অগ্রসর পুঁজিতান্ত্রিক দেশে কেবল যুগপৎই প্রলেতারীয় বিপ্লব সমাধা হতে পারে, অতএব একটিমাত্র দেশে বিপ্লবের বিজয় অসম্ভব — এই সিদ্ধান্তটি সুসম্পূর্ণভাবে রূপ লাভ করে ১৮৪৭ সালে এঙ্গেলসের 'কমিউনিজমের মূল উপাদানসমূহ' (বর্তমান সংস্করণের ১ খন্ড, ১০৬-১২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) নামক রচনায়; এই সিদ্ধান্তটি ঠিক ছিল প্রাক্-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের কালে। নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে, একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের কালে, ভ. ই. লেনিন সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিতন্ত্রের অসম অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেন এবং সেখান থেকে এগিয়ে নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছান: একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের আমলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় প্রথমে কয়েকটি, এমনকি একটিমাত্র দেশেও সম্ভব এবং সব দেশে অথবা বেশির ভাগ দেশে বিপ্লবের যুগপৎ বিজয় অসম্ভব। এই থিসিস প্রথম তুলে ধরা হয় ভ. ই. লেনিনের 'ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র স্লোগান প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে (১৯১৫)। পৃঃ ৩৩

(৪১) **সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন** জার্মানিতে জারি করা হয় ১৮৭৮ সালের ২১ অক্টোবর। আইনে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সমস্ত সংস্থা, বড়ো বড়ো শ্রমিক সংগঠন, শ্রমিক সংবাদপত্র নিষিদ্ধ হয়, বাজেয়াপ্ত করা হয় সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের উপর চালানো হয় নির্যাতন। ১৮৯০ সালের ১ অক্টোবর বিপুল শ্রমিক আন্দোলনের চাপে সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন রদ করা হয়। পৃঃ ৩৬

(৪২) রুসোর তত্ত্বানুসারে প্রথম প্রথম মানুষ বাস করত একেবারে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে, যেখানে সকলেই ছিল সমান। ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং সম্পত্তির ক্ষেত্রে অসমতা দেখা দেওয়ার ফলে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশ ছেড়ে নাগরিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস শুরু করে এবং এরই ফলে দেখা দেয় রাষ্ট্র, যা কিনা গড়ে উঠেছিল সামাজিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে। কিন্তু ভবিষ্যতে রাজনৈতিক অসমতা উদ্ভূত হবার ফলে সামাজিক এই বোঝাপড়া লঙ্ঘন করা হয় এবং অধিকারহীনতার এক নতুন পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়। শেষোক্ত এই ব্যাপারটির বিলোপসাধনের ডাক দেয় আরো উন্নত এক রাষ্ট্র, যা কিনা গড়ে উঠেছিল নতুন সামাজিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে। পৃঃ ৩৬

(৪৩) **আনাব্যাপটিস্টরা** অথবা পুনঃক্রসপন্থীরা — এই সম্প্রদায়ের সদস্যদের এই নামকরণ হয়েছিল এই কারণে যে, তারা প্রাপ্তবয়স্ক লোকেদের পুনরায় ক্রস করার (ধর্মে দীক্ষা দেওয়ার) পক্ষপাতী ছিল। পৃঃ ৩৭

(৪৪) এঙ্গেলস এখানে **'সাচ্চা লেভেলারদের'** ('সমতাবাদী') অথবা 'ডিগেরদের ('অনুসন্ধানকারীদের') কথা বলছেন। এরা ছিল ১৭শ শতকের ইংরেজ বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়কার উগ্র বামপন্থী ধারার প্রতিনিধি। এরা গ্রাম ও শহরের গরীবতম স্তরের স্বার্থ রক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করত। তারা জমির উপর মালিকানা বিলোপসাধনের দাবি উত্থাপন করেছিল, সেকেলে ঢালাও সমতাবাদী কমিউনিজমের সমর্থনে প্রচারকার্য চালিয়েছিল এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর জমিতে যৌথভাবে হাল কর্ষণের মাধ্যমে তাদের ভাবধারাগুলি বাস্তবায়িত করার প্রয়াস পেয়েছিল। পৃঃ ৩৭

(৪৫) এঙ্গেলস সর্বাগ্রে এখানে ইউটোপীয় কমিউনিজমের প্রতিনিধিবৃন্দ তথা ত. মোরের 'ইউটোপিয়া' এবং ত. কাম্পানেলার 'সূর্য শহর' নামক গ্রন্থদ্বয়ের কথা বলছেন। পৃঃ ৩৭

(৪৬) **জ্ঞানপ্রচারকরা** — ১৮শ শতকের ফ্রান্সের সামাজিক-রাজনৈতিক একটি ধারার প্রতিনিধিরা। মঙ্গল, ন্যায় আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রচারের মাধ্যমে তাঁরা সমাজের দোষ-ত্রুটি দূর করার, প্রচলিত রীতি ও রাজনীতি পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালান। ফরাসী জ্ঞানপ্রচারক ভল্টেয়র, রুসো, ম'তেস্কোর ক্রিয়াকলাপে ধর্মীয়-সামন্ততান্ত্রিক মতধারার প্রভাব হটাতে বহুল পরিমাণে সহায়তা করে, জ্ঞানপ্রচারকরা শুধু যে চার্চের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তাই নয়, একাধারে তাঁরা চার্চের রীতিনীতি, চিন্তাভাবনার স্কলাস্টিক ধারার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। পৃঃ ৩৮

(৪৭) **'সন্ত্রাসের শাসন'** — জ্যাকোবিনদের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের পর্যায় (জুন ১৭৯৩ — জুলাই ১৭৯৪) (৭৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ৩৮

(৪৮) **ডিরেক্টরেট** (মোট পাঁচ জন সভাপতিকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল, যাদের একজনকে নির্বাচিত করা হত প্রতি বছরে) — ১৭৯৫-১৭৯৯ সালে ফ্রান্সে কার্যনির্বাহী ক্ষমতার পরিচালন সংস্থা; গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক নীতিকে সমর্থন জানাত এবং বড়ো বড়ো বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষা করত। পৃঃ ৩৮

(৪৯) এখানে ১৮শ শতকের শেষ ভাগের ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের এই সূত্রবাণীর কথা বলা হচ্ছে: 'স্বাধীনতা, সমতা, সৌভ্রাত্র্য'। পৃঃ ৩৯

(৫০) **নিউ ল্যানার্ক** (New Lanark) — স্কট্‌ল্যাণ্ডের ল্যানার্ক শহরের অদূরে অবস্থিত সুতাকল, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮৪ সালে। কারখানা সংলগ্ন অঞ্চলে ছোট্ট একটি বসতিও ছিল। পৃঃ ৪০

(৫১) ফ্রান্স-বিরোধী ষষ্ঠ যুক্তফ্রণ্টে অংশগ্রহণকারী দেশের (রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ইংলণ্ড, প্রাশিয়া এবং অন্যান্য রাষ্ট্র) সম্মিলিত সেনাবাহিনী প্যারিসে প্রবেশ করে ১৮১৪ সালের ৩১ মার্চ। প্রথম নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যের পতন ঘটে, আর সিংহাসন হারানোর পর স্বয়ং নেপোলিয়ন বিতাড়িত হয়ে এলবা দ্বীপে নির্বাসিত হতে বাধ্য হন। ফ্রান্সে সেই প্রথম বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে।

একশ' দিন — প্রথম নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যের স্বল্পকালীন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর্ব, টিকে ছিল ১৮১৫ সালের ২০ মার্চ থেকে সেই বছরেরই ২২ জুন পর্যন্ত। ২০ মার্চ তিনি এলবা দ্বীপের নির্বাসন ছেড়ে প্যারিস প্রত্যাবর্তন করেন আর ২২ জুন তাঁকে দ্বিতীয় বারের জন্য সিংহাসন পরিত্যাগ করতে হয়। পৃঃ ৪৩

(৫২) **ওয়াটার্লুতে** (বেলজিয়ম) ১৮১৫ সালের ১৮ জুন ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে ইংরেজ-হল্যাণ্ড বাহিনী এবং ব্লুখেরের নেতৃত্বে প্রুশীয় সেনাবাহিনীর কাছে প্রথম নেপোলিয়ন বাহিনী পরাজিত হয়। ১৮১৫ সালের যুদ্ধে এ লড়াই চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে, এর ফলে ফ্রান্স-বিরোধী সপ্তম যুক্তফ্রণ্টের (ইংলণ্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, সুইডেন, স্পেন এবং অন্যান্য রাষ্ট্র) চূড়ান্ত জয় ও নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যের পতন সম্ভব হয়ে ওঠে। পৃঃ ৪৩

(৫৩) ১৮৩৩ সালের অক্টোবর মাসে লণ্ডনে ওয়েনের সভাপতিত্বে বিভিন্ন সমবায়-সমিতি ও ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় **ব্রিটেন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের শিল্পোৎপাদনমূলক মহান জাতীয় ঐক্যবদ্ধ ইউনিয়ন**। বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের তরফ থেকে কঠিন বাধা-বিপত্তি দেখা দেওয়ার ফলে ১৮৩৪ সালে আগস্টে এ ইউনিয়নের পতন ঘটে। পৃঃ ৪৮

(৫৪) এঙ্গেলস এখানে উৎপাদিত বিভিন্ন বস্তুর ন্যায়জনক লেনদেনের জন্য গঠিত তথাকথিত বাজারের কথা বলছেন; এ বাজারগুলি শ্রমিকদের ওয়েনপন্থী সমবায়-সমিতির উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল ইংলণ্ডের বিভিন্ন শহরে। এই সমস্ত বাজারে মাল লেনদেন করা হত মেহনত-নোটের সাহায্যে, যা গণনা করা হত এক ঘণ্টার কাজ হিশেবে। এই সংগঠনগুলি অবশ্য অচিরেই দেউলিয়া হয়ে যায়। পৃঃ ৪৯

(৫৫) ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবের সময় প্রুধোঁ এক বিনিময়-ব্যাংক গড়ে তোলার চেষ্টা চালান। ১৮৪৯ সালের ৩১ জানুয়ারি প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর 'Banque de peuple' ('জনগণের ব্যাঙ্ক')। এই ব্যাংক কোনরকমে টিকে ছিল

মাত্র দু'মাস, বাস্তবে এর ক্রিয়াকলাপ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এপ্রিল মাসের গোড়ায় ব্যাঙ্কটি বন্ধ হয়ে যায়। পৃঃ ৪৯

(৫৬) এখানে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত সময়কালের কথা বলা হচ্ছে। এই নামকরণটি হয়েছিল আলেকজেণ্ড্রিয়া (ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত) নামক মিশরের এক শহরের নাম থেকে, যেটি তখন আন্তর্জাতিক লেনদেনের এক বিরাট কেন্দ্র ছিল। আলেকজেণ্ড্রীয় সময়কালে বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি ঘটে, যার মধ্যে ছিল অঙ্কশাস্ত্র ও প্রযুক্তিবিদ্যা (ইউক্লিড ও আর্কিমিডিস), ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, চিকিৎসাবিদ্যা এবং অন্যান্য আরো। পৃঃ ৫১

(৫৭) এই আবিষ্কারগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল দুটি: ১৪৯২ সালে ক্রিস্টফার কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার এবং ১৪৯৮ সালে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা কর্তৃক ভারতের নৌপথ আবিষ্কার। পৃঃ ৬৬

(৫৮) এখানে বড়ো বড়ো বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের মধ্যে ১৭শ ও ১৮শ শতকে যেসমস্ত যুদ্ধ ঘটে, তার কথা বলা হচ্ছে; এগুলি ঘটে ভারত ও আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং ঔপনিবেশিক বাজার হস্তগত করার জন্য। প্রথম প্রথম প্রতিযোগিতারত দেশগুলির মধ্যে প্রধান ছিল ইংলণ্ড এবং হল্যাণ্ড (ইংলণ্ড-হল্যাণ্ড বাণিজ্যিক যুদ্ধগুলি ঘটে ১৬৫২-১৬৫৪, ১৬৬৪-১৬৬৭, ১৬৭২-১৬৭৪ সালে)। পরে অবশ্য নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধ দেখা দেয় ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে। এই সমস্ত যুদ্ধে বিজয়ী হয় ইংলণ্ড, যার হাতে ১৮শ শতকের শেষে একত্রিত হয়েছিল প্রায় সমগ্র বিশ্ব বাণিজ্য। পৃঃ ৬৭

(৫৯) Seehandlung ('নৌ-বাণিজ্য')—১৭৭২ সালে প্রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত একটি বাণিজ্য ও অর্থ লেনদেন সমাজ। রাষ্ট্রীয় বহু বিশেষ-বিশেষ সুবিধার অধিকারী ছিল এবং সরকারকে তা বিপুল পরিমাণে কর্জ দিত। পৃঃ ৭০

(৬০) ১৮৮১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ভ. ই. জাসুলিচ লিখিত পত্রের জবাব হিশেবে এইটিই ছিল মার্কসের প্রথম খসড়া। রাশিয়ায় পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যেসমস্ত তর্ক রুশ সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে চলত, সে ব্যাপারে 'পুঁজি' যে ভূমিকা পালন করেছে, সে প্রসঙ্গে জাসুলিচ সবকিছু এ পত্রের মাধ্যমে মার্কসকে জানান। তিনি তাঁর সহকর্মী তথা রুশ 'বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদের' তরফ থেকে তাঁকে অনুরোধ জানান তিনি যেন এ প্রসঙ্গে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন, বিশেষ করে গ্রাম-সমাজের প্রশ্নে। এ চিঠি যখন মার্কস পান, তখন তিনি 'পুঁজির' তৃতীয় খণ্ডের উপর কাজ করছিলেন। সেসময় তিনি রাশিয়ায় সামাজিক-অর্থনৈতিক

সম্পর্ক প্রসঙ্গে, রুশ গ্রাম-সমাজের অবস্থা ও অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে বহু পড়াশোনা করেন। আলোচ্য আবেদনটিতে যথার্থ সাড়া দিয়ে তিনি বহু অতিরিক্ত কাজ করেন এবং নানান উৎসের গভীর পড়াশোনা চালিয়ে এক সাধারণ মতবাদে আসেন এবং পরিশেষে তিনি এই সিদ্ধান্ত টানেন যে, 'অনিষ্টকর যে প্রভাব' চারিদিক থেকে যেভাবে রুশ সমাজকে গলা টিপে ধরেছে, তার থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র পথ হল পশ্চিম ইউরোপের প্রলেতারীয় বিপ্লব সমর্থিত রুশ গণ-বিপ্লবের পথ। পশ্চিম ইউরোপের প্রলেতারিয়েতদের বিজয়ের জন্য এক সফল পরিস্থিতি গড়ে তুলতে পারে রুশ বিপ্লব, অন্যদিকে পশ্চিম ইউরোপের প্রলেতারিয়েতরা আবার রাশিয়াকে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পথ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে। মার্কসের এ মতবাদের সঙ্গে অবশ্য রুশ সমাজতন্ত্রীদের কল্পনার কোনো মিল ছিল না। তাদের কল্পনা ছিল বৃহৎ শিল্পের বিকাশ না ঘটিয়েই গ্রাম-সমাজের সহায়তায় একেবারে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় লাফ দেওয়া। পৃঃ ৮৩

(৬১) ভূমিদাসপ্রথা রাশিয়ায় ১৮৬১ সালে রদ হয়। পৃঃ ৮৪

(৬২) খ্রীষ্টপূর্ব ৩২১ সালে 'কওদিন ফর্কসে' প্রাচীন রোমক শহর কওদিনের কাছে সামনাইটরা (মধ্য আপেনিজ পর্বতশ্রেণীর বসবাসকারীর এক গোষ্ঠী) রোমের এক সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে এবং 'জোয়াল-কাঁধে' তাদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে বাধ্য করে। পরাজিত সেনাবাহিনীর পক্ষে এ ব্যাপারটিকে সেসময় সর্বাপেক্ষা লজ্জার ঘটনা বলে মনে করা হত। আর ঠিক এখান থেকেই উদ্ভূত হয়েছে 'কওদিন ফর্কস পরিক্রমা করা' কথাটি, অর্থাৎ কিনা যতদূর সম্ভব মাথা নত করা। পৃঃ ৮৯

(৬৩) *Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe* ('রাজনীতি, বাণিজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত রাইন পত্রিকা') — দৈনিক সংবাদপত্র, কলোনে ১৮৪২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৮৪৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৮৪২ সালের এপ্রিল থেকে মার্কস এই সংবাদপত্রে লিখতেন, আর সেই বছরেরই অক্টোবর থেকে তার অন্যতম সম্পাদক; এঙ্গেলসও এই সংবাদপত্রে লিখতেন। পৃঃ ৯৭

(৬৪) *Vorwärts!* ('আগুয়ান!') — জার্মান সংবাদপত্র, ১৮৪৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহে দু'দিন করে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হত। এই সংবাদপত্রে লিখতেন মার্কস ও এঙ্গেলস। পৃঃ ৯৭

(৬৫) *Deutsche-Brüsseler-Zeitung* ('জার্মান-ব্রাসেল্স্ সংবাদপত্র') — ব্রাসেল্সে জার্মান দেশান্তরীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, ১৮৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে ১৮৪৮

সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৮৪৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে মার্কস ও এঙ্গেলস এর স্থায়ী কর্মী হন এবং তার সঠিক দিক নির্ধারণের ব্যাপারে সরাসরি প্রভাব ফেলেন। মার্কস ও এঙ্গেলসের পরিচালনায় সংবাদপত্রটি কমিউনিস্ট লীগের মুখপত্রে পরিণত হয়। পৃঃ ৯৭

(৬৬) *New-York Daily Tribune* ('দৈনিক নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন') — প্রগতিশীল বুর্জোয়া সংবাদপত্র, প্রকাশিত হয় ১৮৪১ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত। ১৮৫১ সালের আগস্ট থেকে ১৮৬২ সালের মার্চ পর্যন্ত এই সংবাদপত্রে লেখেন মার্কস ও এঙ্গেলস। পৃঃ ৯৭

(৬৭) আলোচ্য প্রবন্ধটি এঙ্গেলস লেখেন মার্কসের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে। এখানে তিনি ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে প্রলেতারীয় বিপ্লবীদের রণকৌশলের বিশেষত্বটির রূপ উদ্ঘাটন করেছেন। এঙ্গেলসের এই রচনাটি জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং তাদের ক্রিয়াকলাপের সঠিক রণকৌশলগত আচার-আচরণ সম্পর্কে অনেককিছু আমাদের দেখিয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, সাধারণ গণতান্ত্রিক কর্তব্যের সঙ্গে প্রলেতারীয় কর্তব্যের মিলন ঘটাতে হবে এবং সফলভাবে এ কাজ করা উচিত প্রলেতারীয় পার্টির। মার্কসের ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের রণকৌশলের দৃষ্টান্ত অনুসারে এঙ্গেলস জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের এই শিক্ষা দিয়েছেন: সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকার জন্য সংগ্রাম, প্রলেতারিয়েতদের শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষা করা, এ ব্যাপারে পেটি বুর্জোয়া হাতছানির কাছে মাথা নত করা চলবে না, এবং শাসক মহলের তরফ থেকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতির সাহায্যে প্রলেতারিয়েতকে বোকা বানানোর প্রচেষ্টার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হবে নির্মমভাবে। পৃঃ ৯৯

(৬৮) ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটে, যার ফলে লুই ফিলিপ রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটে। পৃঃ ১০১

(৬৯) *Kreuz-Zeitung* ('ক্রস সংবাদপত্র') — জার্মান দৈনিক সংবাদপত্র *Neue Preußische Zeitung* ('নতুন প্রুশীয় সংবাদপত্র')-এর এই নাম হয়েছিল এইজন্য যে, এর শিরোনামায় অঙ্কিত ছিল একটি ক্রসচিহ্ন। ১৮৪৮ সালের জুন থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত বার্লিন থেকে প্রকাশিত হয়; এটি ছিল প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত আর প্রুশীয় য়ুঙ্কারদের মুখপত্র। পৃঃ ১০৫

(৭০) প্রুশীয় সরকারের মন্ত্রীবর্গ সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে। ১৮৪৮ সালে মার্চ বিপ্লবের পরে এই সরকার ক্ষমতা পায়। উদারনৈতিক বুর্জোয়া শ্রেণীর

হান্‌জেমান, কাম্প্‌হাউজেন এবং অন্যান্য নেতারা প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আপস করে বিশ্বাসঘাতক নীতি অনুসরণ করেন। পৃঃ ১০৫

(৭১) **ফ্রাংকফুর্ট পরিষদ** — জার্মানিতে মার্চ বিপ্লবের পর আহূত জাতীয় সভা; ১৮৪৮ সালের ১৮ মে ফ্রাংকফুর্ট অন মাইনে শুরু হয়েছিল এই 'সভার' অধিবেশন। জার্মানির রাজনৈতিক খণ্ড-বিখণ্ডতা ঘোচানো এবং নিখিল জার্মান সংবিধান রচনা করাই ছিল এই 'পরিষদের' প্রধান কর্তব্য। কিন্তু উদারপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভীরুতা আর দোদুল্যমানতা এবং বামপন্থী বিভাগের দ্বিধা আর আত্মবিরোধের দরুন এই 'পরিষদ' দেশে সর্বোচ্চ ক্ষমতা হস্তগত করতে অপারগ হয় এবং ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের জার্মান বিপ্লবের প্রধান প্রধান প্রশ্নে স্থিরনিশ্চিত মতাবস্থান নিতে পারে না। ১৮৪৯ সালের ৩০ মে 'পরিষদকে' চলে যেতে হয়েছিল শ্টুটগার্টে। ১৮৪৯ সালের ১৮ জুন সৈন্যদল সেটিকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল।

বার্লিন পরিষদ আহূত হয় ১৮৪৮ সালের মে মাসে বার্লিনে; তার উদ্দেশ্য ছিল 'রাজার সম্মতি অনুযায়ী' সংবিধান রচনা করা। নিজ ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি হিশেবে এই সূত্রটিকে গ্রহণ করে 'পরিষদ' জনগণের সার্বভৌমত্বের নীতিটিকে অগ্রাহ্য করে; রাজার নির্দেশানুসারে নভেম্বরে এটিকে স্থানান্তরিত করা হয় ব্রান্ডেনবার্গ শহরে; ১৮৪৮ সালের ডিসেম্বরে প্রাশিয়ায় সংঘটিত রাষ্ট্রীয় কু'দেতার সময় পরিষদটি ভেঙে যায়। পৃঃ ১০৫

(৭২) বুজারের 'Marat, l'Ami du Peuple' ('জনগণের বন্ধু মারাত') নামক গ্রন্থটি প্যারিসে প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে।

L'Ami du Peuple ('জনগণের বন্ধু') — এই সংবাদপত্রটি ১৭৮৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭৯৩ সালের ১৪ জুলাই পর্যন্ত প্রকাশ করেন জ. প. মারাত; এই নামে সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয় ১৭৮৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭৯২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত; সংবাদপত্রে এই স্বাক্ষর থাকত: Marat, l'Ami du Peuple. পৃঃ ১০৭

(৭৩) **১৮৪৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি** — ফ্রান্সে লুই ফিলিপ রাজতন্ত্র উৎখাতের দিন। ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বিজয়ের সংবাদ শুনে রুশ জার প্রথম নিকোলাই ইউরোপে বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রস্তুতির জন্য রাশিয়ায় আংশিকভাবে সৈন্য সংযোজনার ব্যাপারে যুদ্ধমন্ত্রীকে নির্দেশ দেন। পৃঃ ১০৮

(৭৪) **জ্যাকোবিন** — ১৮শ শতাব্দীর শেষের দিক্‌কার ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে একটি রাজনৈতিক উপদল; ফরাসী বুর্জোয়াদের বামপন্থী পক্ষের প্রতিনিধিরা, সামন্ততন্ত্র আর স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবে এবং অবিচলিতভাবে সমর্থন করে। পৃঃ ১০৯

(৭৫) *Kölnische Zeitung* ('কলোনের সংবাদপত্র') — দৈনিক জার্মান সংবাদপত্র, এই নামে কলোনে প্রকাশিত হত ১৮০২ সাল থেকে; ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লব পর্যায়ে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেওয়া প্রতিক্রিয়ার কালে এটি প্রাশিয়ার লিবারেল বুর্জোয়াদের কাপুরুষতামূলক ও বিশ্বাসঘাতক রাজনীতির প্রতিভূ ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে এটি জাতীয়তাবাদী লিবারেল পার্টির সঙ্গে জড়িত ছিল। পৃঃ ১১০

(৭৬) **১৮৪৯ সালের ১৩ জুন** — ইতালিতে বিপ্লব দমন করার উদ্দেশ্যে ফরাসী সৈন্য প্রেরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য এই দিন প্যারিসে পেটি-বুর্জোয়া পার্টি 'পর্বত' এক শান্তিপূর্ণ মিছিলের আয়োজন করে। সেনাদল মিছিলটিকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। 'পর্বত'-এর বহু নেতা গ্রেপ্তার ও নির্বাসিত হন অথবা ফ্রান্স থেকে দেশান্তরে যেতে বাধ্য হন। পৃঃ ১১০

(৭৭) ভিলিখের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাধারণ সেনা হিশেবে ১৮৪৯ সালে এঙ্গেলস বাডেন-পেলট্‌নেট অভ্যুত্থানে অংশ নেন। পৃঃ ১১০

(৭৮) মার্কসের 'কলোন কমিউনিস্ট মামলার স্বরূপপ্রকাশ' পুস্তিকার জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধ হিশেবে ১৮৮৫ সালে এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট লীগের ইতিহাস প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি রচনা করেন। জার্মানিতে যে বছরগুলিতে জরুরী আইন বলবৎ ছিল, সেসময়ে সেখানকার শ্রমিক শ্রেণীর কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি ছিল ১৮৪৯-১৮৫২ সালের প্রতিক্রিয়ার পর্যায়ের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা পুরোপুরি মনে রাখা। ঠিক এই কারণে মার্কসের এই পুস্তিকাটি পুনর্মুদ্রিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এঙ্গেলস।

'কমিউনিস্ট লীগের ইতিহাস প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটিতে এঙ্গেলস আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন বিকাশে প্রলেতারিয়েতের প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠনের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও তার অর্থের রূপ উদ্‌ঘাটন করেন, সেই প্রথম নিজ ভাবাদর্শমূলক পতাকা বলে সেই সংগঠন বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের কর্মসূচি ঘোষণা করে। প্রলেতারীয় পার্টি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট লীগ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; ঠিক এই লীগের ইতিহাসের দৃষ্টান্তের সাহায্যেই এঙ্গেলস দেখান যে, সংকীর্ণতাবাদী বিভিন্ন ধারার বিরুদ্ধে মার্কসবাদের বিজয়লাভ সম্ভব হয় এই কারণে যে, জন্মলগ্ন থেকেই এই তত্ত্বটি প্রলেতারিয়েতের ব্যবহারিক বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাকে পুরোপুরিভাবে প্রতিফলিত করে এবং সে তত্ত্ব তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পৃঃ ১১১

(৭৯) এখানে কলোনের প্ররোচনামূলক বিচারের কথা বলা হচ্ছে; কমিউনিস্ট লীগের ১১ জন সদস্যের বিরুদ্ধে প্রুশীয় সরকার কর্তৃক এ মামলাটি খাড়া করা

হয়েছিল (১৮৫২ সালের ৪ অক্টোবর থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত)। ঝুটা দলিল ও মিথ্যার ভিত্তিতে তাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ তোলা হয়েছিল। বিচারে তাঁদের মধ্যে সাত জনের ৩ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়। পৃঃ ১১১

(৮০) **বাব্যেফবাদ**—ইউটোপীয় ঢালাও সমতাবাদী কমিউনিজমের অন্যতম ধারা; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফরাসী বিপ্লবী গ্রাক্‌স বাব্যেফ ও তাঁর সমর্থকদের দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃঃ ১১২

(৮১) Société des Saisons ('ঋতু সমিতি')—রিপাবলিকান সোশ্যালিস্টদের চক্রান্তকারী গুপ্ত সংগঠন, অ. ব্লাঙ্কি ও আ. বার্বে-র নেতৃত্বে ১৮৩৭ সাল থেকে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত প্যারিসে এটি সক্রিয় ছিল।

১৮৩৯ সালে ১২ মে অভ্যুত্থান—এটি ঘটে প্যারিসে; এতে প্রধান ভূমিকা পালন করে বিপ্লবী শ্রমিকরা। সংগঠিত করে 'ঋতু সমিতি'। অভ্যুত্থানটির পেছনে বিপুল জনগণের সমর্থন ছিল না, ফলে রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী ও জাতীয় রক্ষীবাহিনী কর্তৃক তা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পৃঃ ১১৩

(৮২) এখানে জার্মানিতে চক্রান্তের বিরুদ্ধে জার্মান ডেমোক্রাটদের সংগ্রামের একটি অধ্যায়ের কথা বলা হচ্ছে; এটি ফ্রাঙ্কফুর্টের হত্যাকাণ্ড নামে অভিহিত হয়। ১৮৩৩ সালের ৩ এপ্রিল র‍্যাডিকেল অংশের একটি দল জার্মান লীগের কেন্দ্রীয় সংগঠন তথা ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মাইন শহরের সেইম লীগের বিরুদ্ধাচারণ করে দেশে কু'দেতা ঘটানোর চেষ্টা চালায় এবং জার্মানিকে তারা অখণ্ড প্রজাতন্ত্র হিশেবে ঘোষণা করে; ভালভাবে প্রস্তুত না থাকার জন্য সেনাদল এ অভ্যুত্থানকে চূর্ণ করে দেয়। পৃঃ ১১৩

(৮৩) ১৮৩১ সালে ইতালির বুর্জোয়া ডেমোক্রাট মাৎসিনি 'তরুণ ইতালি' নামে এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি এই সমাজের সদস্য, এবং তৎসহ সুইজারল্যাণ্ডের একদল বিদেশী বিপ্লবী দেশান্তরীর সহায়তায় স্যাভয় অভিমুখে এক অভিযানের আয়োজন করেন; এর লক্ষ্য ছিল ইতালিকে সংঘবদ্ধ করার জন্য এবং স্বাধীন এক বুর্জোয়া ইতালীয় প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য সেখানে জনবিদ্রোহ সংঘটিত করা। স্যাভয়ে এই দলটিকে পদদলিত করে পিয়েমো-র সেনাবাহিনী। পৃঃ ১১৩

(৮৪) **'ডেমাগগ'** (demagogue) হিশেবে জার্মানিতে ১৮১৯ সাল থেকে জার্মান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধী-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের একটি অংশকে অভিহিত করা হত; এরা জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল কাঠামোর

বিরুদ্ধাচারণ করত এবং দাবি জানাত সংঘবদ্ধ এক জার্মানি গড়ে তোলার। জার্মান রাজ 'ডেমাগগদের' গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখত। পৃঃ ১১৩

(৮৫) এখানে লন্ডনস্থ **জার্মান শ্রমিকদের শিক্ষা-সমিতির** কথা বলা হচ্ছে; উনিশ শতাব্দীর ৫০-এর বছরগুলিতে এটি গ্রেট উইন্ডমিল স্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। ১৮৪০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ক. শাপার, জ. মল্ ও ন্যায়নিষ্ঠদের লীগের অন্যান্য সদস্যরা এই সমাজটির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৯-১৮৫০ সালে এতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন মার্কস ও এঙ্গেলস। ১৮৫০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর মার্কস ও এঙ্গেলস এবং তাঁদের বহু সমর্থক এ সমাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন; এর কারণ হল এই যে, এর অধিকাংশ সদস্য ভিলিখ-শাপারের সাম্প্রদায়িক-হঠকারী অংশের পক্ষ নেন। ১৮৬৪ সালে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজ লন্ডনে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির জার্মান শাখায় পরিণত হয়। লন্ডনস্থ শিক্ষা-সমিতি টিকে ছিল ১৯১৮ সাল পর্যন্ত; সে বছরে ব্রিটিশ সরকার এটিকে বন্ধ করে দেয়। পৃঃ ১১৪

(৮৬) *Deutsch-Französische Jahrbücher* ('জার্মান-ফরাসী বার্ষিকী') — এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হত প্যারিস থেকে জার্মান ভাষায়, ক. মার্কস এবং আ. রুগে এর সম্পাদনা করতেন। ১৮৪৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এর শুধু প্রথম, ডবল সংখ্যাটিই প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাবার প্রধান কারণ হল মার্কস এবং বুর্জোয়া র‍্যাডিকাল রুগে-র মধ্যে মৌলিক মতবিরোধ। পৃঃ ১১৮

(৮৭) **জার্মান শ্রমিক সমিতি** — ১৮৪৭ সালে আগস্ট মাসের শেষের দিকে মার্কস এবং এঙ্গেলস এটি প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাসেল্সে; বেলজিয়মবাসী জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রসার ঘটানো এবং বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ভাবধারা প্রচার করা ছিল এর উদ্দেশ্য। মার্কস, এঙ্গেলস আর তাঁদের সহকর্মীদের নেতৃত্বে এই সমিতি বেলজিয়মবাসী জার্মান বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতদের সংঘবদ্ধ করার এক আইনসঙ্গত কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সমিতির সর্বশ্রেষ্ঠ সদস্যরা কমিউনিস্ট লীগের ব্রাসেল্স্ শাখারও সদস্য ছিলেন। ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া বিপ্লবের স্বল্পকাল পরেই ব্রাসেল্সে জার্মান শ্রমিক সমিতির ক্রিয়াকলাপ শেষ হয়ে যায়, কেননা সমিতির সদস্যদের গ্রেপ্তার এবং নির্বাসিত করেছিল বেলজিয়মের পুলিশ। পৃঃ ১২০

(৮৮) *The Northern Star* ('উত্তরের নক্ষত্র') — সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা, চার্টিস্টদের কেন্দ্রীয় মুখপত্র, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৭ সালে; প্রকাশিত হয় ১৮৫২ সাল পর্যন্ত, প্রথমে লিড্স-এ এবং ১৮৪৪ সালের নভেম্বর থেকে

লণ্ডনে। ১৮৪৩ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকায় এঙ্গেলসের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১২০

(৮৯) **গণতান্ত্রিক সমিতি**—১৮৪৭ সালের শরতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রাসেল্‌সে, সাধারণ সদস্য হিশেবে সংঘবদ্ধ করেছিল বিপ্লবী প্রলেতারীয়দের, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল দেশান্তরী জার্মান বিপ্লবীরা, এবং বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া ডেমোক্রাসির অগ্রণী কর্মীরা, এই সমিতি প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশ নেন মার্কস ও এঙ্গেলস। ১৮৪৭ সালের ১৫ নভেম্বর মার্কস তার সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন, সভাপতি মনোনীত হন বেলজিয়মের গণতন্ত্রী ল. জোত্‌রাঁ। মার্কসের ক্রিয়াকলাপের কল্যাণে ব্রাসেল্‌সের গণতান্ত্রিক সমিতিটি আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম বৃহৎ কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৮৪৮ সালে মার্চ মাসের গোড়ায় ব্রাসেল্‌স্ থেকে মার্কসের নির্বাসনের পর এবং সমিতির বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্মীদের উপর বেলজিয়ম সরকারের নির্যাতনের ফলে এ সমিতির কার্যকলাপ অতি ক্ষীণ রূপ ধারণ করে, তা একেবারে প্রায় আঞ্চলিক রূপ নেয় এবং ১৮৪৯ সালে প্রকৃতপক্ষে তা বন্ধ হয়ে যায়। পৃঃ ১২০

(৯০) *La Réforme* ('সংস্কার')—ফরাসী দৈনিক, পেটি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী আর পেটি-বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীদের মুখপত্র; প্যারিসে ১৮৪৩ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৮৪৭ সালের অক্টোবর থেকে ১৮৪৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এঙ্গেলস এতে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পৃঃ ১২০

(৯১) *Der Volks-Tribun* ('জন ট্রিবিউন')—সাপ্তাহিক পত্রিকা, 'সাচ্চা সমাজতন্ত্রীদের' দ্বারা নিউ ইয়র্কে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়; ১৮৪৬ সালের ৫ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১২১

(৯২) **'জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টির দাবি'**—১৮৪৮ সালের ২১ ও ২৯ মার্চের মধ্যে প্যারিসে এটি লিখিত হয় মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক। এটি ছিল জার্মানিতে বিপ্লব সূচিত করার জন্য কমিউনিস্ট লীগের রাজনৈতিক কর্মসূচিস্বরূপ। হ্যান্ডবিল হিশেবে ছাপিয়ে নির্দেশমূলক দলিল রূপে এটি বিতরণ করা হত মাতৃভূমিতে ফিরে-আসা কমিউনিস্ট লীগের সদস্যদের মধ্যে। বিপ্লবের সময় মার্কস, এঙ্গেলস ও তাঁদের সমর্থকরা কর্মসূচি রূপ এই দলিলটি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের প্রচেষ্টা করেন। পৃঃ ১২৫

(৯৩) এখানে কমিউনিস্ট লীগের উদ্যোগে ১৮৪৮ সালের ৮-৯ মার্চ প্যারিসে গঠিত জার্মান শ্রমিকদের ক্লাবের কথা বলা হচ্ছে। এ সমিতির নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন

স্বয়ং মার্কস। এই ক্লাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল প্যারিসে দেশান্তরী জার্মান শ্রমিকদের এক করা এবং বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রলেতারীয় রণকৌশল তাদের কাছে ব্যাখ্যা করা। পৃঃ ১২৫

(১৪) এখানে ১৮৪৯ সালের **৩-৮ মে মাসের ড্রেসডেন সশস্ত্র** অভ্যুত্থান ও মে-জুলাই মাসের **দক্ষিণ আর পশ্চিম জার্মানির** অভ্যুত্থানের কথা বলা হচ্ছে; এটি সংঘটিত হয়েছিল রাজতন্ত্রী সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য। এ সংবিধানটি গৃহীত হয়েছিল ১৮৪৯ সালের ২৮ মার্চ ফ্রাঙ্কফুর্টের জাতীয় সভা কর্তৃক, তবে জার্মানির বহু সরকারই তা মানতে অস্বীকার করে। এ অভ্যুত্থানের চরিত্র ছিল বিচ্ছিন্ন আর স্বতঃস্ফূর্ত এবং এটিকে ছত্রভঙ্গ করা হয় ১৮৪৯ সালের জুলাইয়ের মাঝামাঝি। পৃঃ ১২৯

(১৫) *Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue* ('নতুন রাইন পত্রিকা। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীক্ষা') — মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি পত্রিকা, কমিউনিস্ট লীগের তাত্ত্বিক মুখপত্র। প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৫০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত; বেরিয়েছিল মোট ছ'টি সংখ্যা। পৃঃ ১৩২

(১৬) **আমেরিকান গৃহযুদ্ধ** (১৮৬১-১৮৬৫) — এটি ঘটে উত্তরের শিল্পপ্রধান প্রদেশগুলি আর দক্ষিণের দাসপ্রধান প্রদেশগুলির অভ্যুত্থানকারীদের মধ্যে। শেষোক্তরা সেখানে দাসপ্রথা রক্ষা করার চেষ্টা করছিল এবং ১৮৬১ সালে তারা উত্তরের প্রদেশগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। এই যুদ্ধটি ছিল দুই সমাজব্যবস্থা তথা দাসপ্রথা ও মজুরি-শ্রমব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামের ফল। পৃঃ ১৩৩

(১৭) **জোণ্ডেরবুণ্ড** (স্বতন্ত্র ইউনিয়ন) — ১৯শ শতকের পঞ্চম দশকে সুইজারল্যান্ডের প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাথলিক ক্যান্টনদের স্বতন্ত্র সংগঠনে যেমন ঘটেছিল, সেই ঘটনার সঙ্গে মিল দেখে ভিল্লিখ আর শাপারের সংকীর্ণতাবাদী-হঠকারী উপদলকে বিদ্রূপ করে এই নাম দিয়েছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস; ১৮৫০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর কমিউনিস্ট লীগের ভেঙে যাওয়ার পর এ উপদলটি তার নিজস্ব কেন্দ্রীয় কমিটি সহ স্বতন্ত্র এক সংগঠন রূপে গড়ে ওঠে। নিজ ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে এই উপদলটি প্রাশিয়ার পুলিশকে জার্মানির কমিউনিস্ট লীগের অবৈধ সংস্থাটি খুঁজে বের করতে সাহায্য করে এবং কমিউনিস্ট লীগের বিশিষ্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে ১৮৫২ সালে কলোন কমিউনিস্ট মামলাটি সাজিয়ে তোলার বাহানা দেয় (৭৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১৩৩

(৯৮) ফ. এঙ্গেলসের **'ল্যুডভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান'** নামক পুস্তকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভাবন প্রক্রিয়া ও তার মূলকথার রূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে; দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল ভিত্তির প্রণালীবদ্ধ বিবরণ দেওয়া হয়েছে, এবং তৎসহ মার্কসবাদের সঙ্গে দর্শনের ক্ষেত্রে এর পূর্বসূরীদের সম্পর্কের রূপ উন্মোচন করা হয়েছে। এই পূর্বসূরীদের মধ্যে আছেন হেগেলীয় ও ফয়েরবাখীয় চিরায়ত জার্মান দর্শনের অতি বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ।

আলোচ্য রচনায় এঙ্গেলস দর্শনের ইতিহাসের অস্তিত্বের সমগ্র পর্বের গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্বের, দুই শিবির তথা বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সংগ্রামের চিত্র উন্মোচন করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম এখানে সমগ্র দর্শনের মূল প্রশ্নটির ধ্রুপদী সংজ্ঞা দেন: প্রশ্নটি হল চিন্তার সঙ্গে সত্তার আর আত্মার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কজনিত। এ প্রশ্নের যিনি যেমন উত্তর দিয়েছেন সেই অনুসারে দার্শনিকরা দুটি বৃহৎ শিবিরে বিভক্ত হয়েছেন।

বস্তুবাদ এবং ভাববাদের মধ্যে সন্ধি ঘটাবার প্রয়োজনে অন্তর্বর্তীমূলক দর্শন (দ্বৈতবাদ, অজ্ঞেয়বাদ) সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে এঙ্গেলস জোর গলায় অযৌক্তিক বলে ঘোষণা করেন। অজ্ঞেয়বাদের যে কোনো রূপকেই তিনি অগ্রাহ্য করেন এবং দেখান যে, 'অন্যান্য দার্শনিক উদ্ভটত্বের মতোই এ কথারও চূড়ান্ত খণ্ডন হল প্রয়োগ, অর্থাৎ পরীক্ষা ও শিল্পোৎপাদন' (বর্তমান সংস্করণের ১৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সৃষ্টির ফলে দর্শনের ক্ষেত্রে মার্কস যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছেন এঙ্গেলস এখানে তারই মর্মরূপ উন্মোচন করেছেন। তিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রকৃত অর্থটি আমাদের সামনে পুরোপুরি তুলে ধরেছেন, যে বস্তুবাদ মানব-সমাজ বিকাশের সাধারণ নিয়ম-কানুনগুলি আবিষ্কার করেছে। সমস্ত প্রকার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, যা রাজনৈতিক গঠন এবং ধর্ম ও দর্শন সহ সামাজিক চৈতন্যের সমস্ত প্রকার রূপভেদের চরিত্র নির্ধারণ করে — এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করে এঙ্গেলস একই সময়ে ভাবাদর্শমূলক উপরি-কাঠামোর সক্রিয় ভূমিকা, এই কাঠামোর স্বাধীনভাবে বিকাশের ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর তার উল্টো প্রভাবের ব্যাপারেও জোর দিয়ে বলেছেন।

এ ব্যাপারে এঙ্গেলসের সবচেয়ে বড়ো অবদান হল এই যে, পার্টি ও শ্রেণী-সংগ্রাম প্রতিফলনকারী বিভিন্ন দার্শনিক ধারার মধ্যেকার সংগ্রামের সমগ্র ইতিহাসের দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে পার্টির দর্শনের মূলনীতি তিনি গড়ে তুলেছেন। পৃঃ ১৩৬

(৯৯) **'ঝড়-ঝাপটা'** — ১৮শ শতকের ৮ম-৯ম দশকের জার্মান বার্গারদের সাহিত্যিক আর সামাজিক আন্দোলন। এই আন্দোলনটি ছিল সামন্ত-স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জার্মানির নবীন লেখকদের একটি স্বকীয় সাহিত্যিক বিদ্রোহ। পৃঃ ১৩৭

(১০০) *Die Neue Zeit* ('নব কাল') — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির তাত্ত্বিক পত্রিকা; স্টুটগার্টে ১৮৮৩ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫-১৮৯৪ সালে এঙ্গেলস এতে তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পৃঃ ১৩৭

(১০১) ১৮৩৩-১৮৩৪ সালে জার্মানিতে হাইনে তাঁর দুটি গ্রন্থ — 'রোমান্টিক স্কুল' ও 'জার্মানিতে ধর্ম ও দর্শনের ইতিহাস চর্চা প্রসঙ্গে' — প্রকাশ করেন। পৃঃ ১৪০

(১০২) **পিয়েটিজম** (ল্যাটিন শব্দ pietas — আধ্যাত্মিক ধার্মিকতা) — ১৭শ শতকের শেষে পশ্চিম ইউরোপের প্রটেস্টান্টদের (লুথারপন্থী আর কালভাঁপন্থী) মাঝে উদ্ভূত ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদী একটি মতধারা। পৃঃ ১৪৬

(১০৩) **তরুণ হেগেলপন্থী** — হেগেলের শিক্ষা থেকে উনিশ শতকের চতুর্থ এবং পঞ্চম দশকে উদ্ভূত জার্মান দর্শনের ক্ষেত্রে একটা ভাববাদী মতধারা। পৃঃ ১৪৬

(১০৪) *Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst* ('বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক জার্মান বর্ষপঞ্জি') — তরুণ হেগেলপন্থীদের সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ক পত্রিকা, এই নামে লাইপজিগ থেকে প্রকাশিত হত ১৮৪১ সালের জুলাই থেকে ১৮৪৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত। পৃঃ ১৪৭

(১০৫) এখানে ১৮৪৫ সালে লাইপজিগে প্রকাশিত ম. স্টির্নারের 'অদ্বিতীয় এবং তার সম্পত্তি' নামক গ্রন্থের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৪৭

(১০৬) **একেশ্বরবাদ** — ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্যতম ধারা, যার মূলে রয়েছে এক এবং একক ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস। এর বিপরীত ধারাটি হল বহু ঈশ্বরবাদ। পৃঃ ১৫০

(১০৭) এখানে ১৮৪৬ সালে জার্মান জ্যোতির্বিদ ই. হাল্লে কর্তৃক আবিষ্কৃত নেপচুন গ্রহের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৫৩

(১০৮) ৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১০৯) **সর্বভূতেশ্বরবাদ** (Pantheism) — ধর্মীয়-দার্শনিক শিক্ষা, যাতে ঈশ্বর ও বিশ্বকে এক ও অখণ্ড রূপে দেখা হয়েছে। পৃঃ ১৫৩

(১১০) **ফ্লজিস্টিক তত্ত্ব** — ১৮শ শতকে রসায়নবিদ্যায় বহুলপ্রচারিত একটি তত্ত্ব, যা অনুসারে দহনপ্রক্রিয়া বস্তুতে নিহিত বিশেষ পদার্থ ফ্লজিস্টনের উপর নির্ভর

করে; এই পদার্থ দহনপ্রক্রিয়ার সময় দেহ থেকে নিঃসৃত হয়। বিখ্যাত ফরাসী রসায়নবিদ আ. ল. লাভুয়াজিয়ে এই তত্ত্বের অমূলকতা প্রমাণ করেন। তিনি দহনপ্রক্রিয়ার যথার্থ ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে দহনপ্রক্রিয়ার মূলে আছে দহনীয় বস্তুর সঙ্গে অক্সিজেনের মিলন। পৃঃ ১৫৫

(১১১) এখানে কান্টের 'নেবুলা প্রকল্পের' কথা বলা হচ্ছে। এই প্রকল্প অনুসারে সৌরজগতের উৎপত্তি কুয়াশা থেকে (ল্যাটিন nebula — কুয়াশা)। পৃঃ ১৫৫

(১১২) ১৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১১৩) এখানে 'ধরা-ছোঁয়ার-বাইরের এক বস্তুর' আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নেপোলিয়নের প্রচেষ্টার কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৬৩

(১১৪) সাদোভা শহরের নিকটে প্রাশিয়ার জয়লাভের পর (১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রাশিয়ার যুদ্ধে) জার্মান বুর্জোয়া পত্রপত্রিকার জগতে এ নামটি এক অতি প্রচলিত কথায় পরিণত হয়েছিল; এর অর্থ ছিল এই যে, প্রাশিয়ার যথার্থ জনশিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণেই বুঝি-বা প্রাশিয়ার জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল। পৃঃ ১৬৮

(১১৫) এখানে নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর ১৮১৫ সালের ২০ নভেম্বরের স্বাক্ষরিত প্যারিস শান্তি চুক্তির কথা বলা হচ্ছে। স্বাক্ষরকারীদের একদিকে ছিল ফরাসী-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট তথা ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া, আর অন্যদিকে ছিল ফ্রান্স। পৃঃ ১৮০

(১১৬) **পুনঃপ্রতিষ্ঠা পর্ব** — ১৮১৪-১৮৩০ সালে ফ্রান্সে বুরবোঁ বংশের দ্বিতীয় বারের রাজত্বের কালপর্যায়, অভিজাতবর্গ এবং যাজকমণ্ডলীর স্বার্থের সমর্থক এই প্রতিক্রিয়াশীল বুরবোঁ রাজত্ব উচ্ছেদ হয়েছিল ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবে। পৃঃ ১৮০

(১১৭) **নিকাই সম্মেলন** — এশিয়া মাইনরের নিকাই শহরে ৩২৫ সালে সম্রাট প্রথম কনস্টানটাইন দ্বারা আহূত রোমক সাম্রাজ্যের খ্রীষ্টান চার্চের বিশপদের প্রথম বিশ্ব সম্মেলন; এই সম্মেলন সমস্ত খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য বাধ্যতামূলক তথাকথিত এক 'বিশ্বাস-প্রতীক' নির্ধারণ করে। পৃঃ ১৮৬

(১১৮) **আলবিগে'সরা** (আল্‌বি শহরের নাম থেকে) — ১২শ আর ১৩শ শতকে দক্ষিণ ফ্রান্স আর উত্তর ইতালির শহরগুলিতে বহুবিস্তৃত ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। আলবিগে'সরা ক্যাথলিক চার্চের জাঁকজমকের আচার-অনুষ্ঠান এবং চক্রতন্ত্রের

বিরোধিতা করত, আর সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে শহরগুলির ব্যাপারী ও হস্তশিল্পীদের প্রতিবাদ প্রকাশ করত ধর্মীয় রূপে। পৃঃ ১৮৬

(১১৯) এখানে ব্রিটেনের 'গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লবের' কথা বলা হচ্ছে। ২০ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৮৮

(১২০) ১৭শ শতকের ৩য় দশক থেকে বৃদ্ধি পাওয়া প্রটেস্টান্ট-কালভাঁপন্থীদের (হুগেনটদের) রাজনীতিক আর ধর্মীয় উৎপীড়নের পরিস্থিতিতে ১৬৮৫ সালে চতুর্দশ লুই ১৫৯৮ সালে নান্ত্-এ ঘোষিত অনুশাসন (এডিক্ট) বাতিল করেন, যার ফলে প্রটেস্টান্ট-কালভাঁপন্থীরা ধর্মবিশ্বাস আর ঈশ্বর-সেবার স্বাধীনতা পায়; এই নান্ত্ অনুশাসন বাতিলের পর কয়েক লক্ষ কালভাঁপন্থী ফ্রান্স থেকে দেশান্তরী হয়। পৃঃ ১৮৮

(১২১) এই সংজ্ঞার মাধ্যমে আমরা ১৮৭১ সালে কর্তৃত্ববাদী প্রাশিয়ার ছত্রছায়ার উদ্ভূত জার্মান সাম্রাজ্যের (অস্ট্রিয়া বাদে) কথা বুঝি। পৃঃ ১৮৯

(১২২) **'নাইটস অব লেবার'**— আমেরিকান শ্রমিকদের সংগঠন, ১৮৬৯ সালে ফিলাডেলফিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়; ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত এটি ছিল এক গুপ্ত সমিতি। এই সংগঠনটি প্রধানত অশিক্ষিত মজুরদের একত্রিত করত, যাদের মধ্যে নিগ্রোরাও ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল সমবায়-সমিতি আর পারস্পরিক সহায়তা-সংস্থা গড়ে তোলা। রাজনৈতিক সংগ্রামে শ্রমিকদের ভাগ নেওয়াকে এ সমিতি প্রকৃতপক্ষে অস্বীকার করে এবং শ্রেণী-সহযোগিতার অবস্থান নেয়। ১৮৮৬ সালে এর সদস্যদের সর্বাত্মক ধর্মঘটে ভাগ নিতে না দিয়ে এ সমিতির নেতারা ধর্মঘট-বিরোধী অবস্থান নেয়; তা সত্ত্বেও সাধারণ সদস্যরা কিন্তু এতে যোগ দিয়েছিল; এরপর শ্রমিকদের বিপুল অংশের মধ্যে এ সমিতি নিজ প্রভাব হারাতে থাকে এবং ৯০-এর বছরগুলির শেষে এটি ভেঙে যায়। পৃঃ ১৯১

নামের সূচি

অ

আ

ই

ট

ড

ত

দ

দুনিয়ার মজদুর এক হও!

কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

❋

খণ্ড

১১

প্রগতি প্রকাশন

মস্কো

সম্পাদনা: দ্বিজেন শর্মা ও প্রফুল্ল রয়

К. Маркс и Ф. Энгельс
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В XII ТОМАХ
Том II
На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

МЭ $\frac{10101\text{-}901}{014(01)\text{-}82}$ 546-82　　0101010000

সূচি

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি (১)

১৮৮৪ সালের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

নিচের অনুচ্ছেদগুলি এক দিক দিয়ে একটি অর্পিত দায়িত্ব পালনেরই ফলশ্রুতি। পরিকল্পনাটি ছিল স্বয়ং কার্ল মার্কসের, আর কারও নয়; তিনি তাঁর নিজের -- বলা যেতে পারে আমাদের দুজনের পর্যালোচিত ইতিহাসের বস্তুবাদী শিক্ষার অনুষঙ্গে মর্গানের গবেষণার ফলগুলি বিবৃত করতে এবং এভাবে তার সামগ্রিক তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কারণ, মর্গান তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে আমেরিকায় ইতিহাসের সেই একই বস্তুবাদী ধারণা পুনরাবিষ্কার করেন, যা মার্কস চল্লিশ বছর আগেই আবিষ্কার করেছিলেন, এবং বর্বরতা ও সভ্যতার তুলনামূলক বিচারে ঐ ধারণা থেকে তিনি প্রধান প্রধান বিষয়ে মার্কসেরই সমসিদ্ধান্তে পৌছন। এবং ঠিক যেমন জার্মানির সরকারঘেঁষা অর্থনীতিজ্ঞরা বহু বছর ধরে 'পুঁজি' গ্রন্থ থেকে প্রবল আগ্রহে কুম্ভিলকবৃত্তি করে তা ক্রমাগত অবগোপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন তেমনি ইংলন্ডের 'প্রাগেতিহাস' সংক্রান্ত বিজ্ঞানের প্রবক্তরাও মর্গানের রচিত 'প্রাচীন সমাজ'* সম্পর্কে তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। আমার প্রয়াত বন্ধুর অসমাপ্ত কাজের স্থলবর্তী হিসেবে এই রচনাটি অকিঞ্চিৎকর প্রমাণিত হতে

* 'Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization'. By Lewis H. Morgan. London, Macmillan and Co., 1877. গ্রন্থটি আমেরিকায় মুদ্রিত এবং লন্ডনে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। লেখক কয়েক বছর আগে লোকান্তরিত হয়েছেন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

পারে। তবে মর্গান থেকে মার্কসের বিস্তৃত উদ্ধৃতিগুলির* মধ্যে তাঁর সমালোচনামূলক মন্তব্যগুলি আমার হাতে আছে এবং সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রেই আমি সেগুলি পুনরুদ্ধৃত করেছি।

বস্তুবাদী প্রত্যয় অনুযায়ী, শেষ বিচারে প্রত্যক্ষ জীবনের উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদনই ইতিহাসের নির্ধারক নিমিত্ত। কিন্তু আবার এর নিজস্ব প্রকৃতিও দ্বিবিধ। এর একদিকে জীবনধারণের উপকরণ — খাদ্য, পরিধেয় ও আশ্রয়, এবং এজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদন; অপরদিকে খোদ মানুষের উৎপাদন, প্রজাতির প্রসারসাধন। একটি বিশেষ ঐতিহাসিক যুগের, একটি বিশেষ দেশের মানুষ যে যে সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে বসবাস করে, একদিকে শ্রমের বিকাশের স্তর, অপরদিকে পরিবারের বিকাশের স্তর — সেগুলি এই দ্বিবিধ উৎপাদনের শর্তাধীন। শ্রমের বিকাশ যত কম হয়, উৎপন্নের পরিমাণ এবং সেহেতু সমাজের সম্পদ যত সীমাবদ্ধ থাকে, গোত্রীয় সম্পর্কের উপর সমাজব্যবস্থার নির্ভরশীলতা ততই প্রকটিত হয়। তথাপি গোত্রীয় বন্ধনের ভিত্তিতে গঠিত এই সমাজকাঠামোর মধ্যে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়; বৃদ্ধি পায় আনুষঙ্গিক ব্যক্তিগত মালিকানা ও বিনিময়, সম্পদের অসাম্য, পরের শ্রমশক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং ফলত শ্রেণীবিরোধের ভিত্তি: নবজাত সামাজিক উপাদানগুলি কয়েক পুরুষ ধরে পুরাতন সমাজব্যবস্থাকে নতুন অবস্থাগুলির সঙ্গে অভিযোজনের চেষ্টা করে, শেষ অবধি, যতদিন না উভয়ের এই অসঙ্গতি থেকে আসে পরিপূর্ণ উলট-পালট। গোত্রীয় বন্ধনভিত্তিক পুরাতন সমাজ নবজাত সামাজিক শ্রেণীগুলির সংঘাতে বিদীর্ণ হয়; তার স্থলবর্তী হয় রাষ্ট্রের আকারে সংগঠিত এক নতুন সমাজ — এখানে আর গোত্রীয় বন্ধনভিত্তিক গোষ্ঠী নয় আঞ্চলিক গোষ্ঠীই নিম্নতন একক, — যে সমাজে পারিবারিক প্রথা পুরোপুরি মালিকানা প্রথার অধীন, এবং যে সমাজে এযাবৎকার সমগ্র **লিখিত** ইতিহাসের মর্মবস্তু শ্রেণীবিরোধ ও শ্রেণীসংগ্রাম অতঃপর অবাধে বিকশিত হতে থাকে।

আমাদের লিখিত ইতিহাসের এই প্রাগৈতিহাসিক ভিত্তির মূল

---

* **ক.** মার্কস, 'লুইস গ. মর্গানের **'প্রাচীন সমাজ' বইয়ের সংক্ষিপ্ত** বিবরণ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

বৈশিষ্ট্যগুলি আবিষ্কার ও পুনরুদ্ধার এবং উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের গোত্রীয় বন্ধনের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও জার্মান ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অদ্যাবধি দুর্বোধ্য ধাঁধার চাবিকাঠির সন্ধানলাভ — মর্গানের মহৎ কৃতিত্ব। তাঁর গ্রন্থটি একদিনের রচনা নয়। প্রায় চল্লিশ বছর তাঁর বিষয়বস্তুর সঙ্গে যুঝে যুঝে শেষ পর্যন্ত তিনি সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেন। এজন্যই তাঁর রচনা আমাদের কালের যুগান্তকারী অল্প কয়েকটি গ্রন্থের অন্যতম।

বর্তমান রচনার কোন উপাদানগুলি মর্গান থেকে গৃহীত এবং কোনগুলি আমার নিজস্ব, পাঠক মোটামুটি সহজেই তা অনুমান করতে পারবেন। গ্রীস ও রোমের ইতিহাস সম্পর্কিত অংশে আমি মর্গানের তথ্যে আবদ্ধ থাকি নি, পরন্তু আমার জানা তথ্যও যোগ করেছি। কেল্ট ও জার্মানদের সম্পর্কিত অংশগুলি মুখ্যত আমার নিজের; এক্ষেত্রে মর্গানের অবলম্বন ছিল প্রায় একান্তই পরের হাত-ফেরতা তথ্যাদি এবং জার্মানদের সম্পর্কে ট্যাসিটাসের রচনা বাদ দিলে তিনি শুধুমাত্র মিঃ ফ্রিম্যানের নিম্নমান উদারনৈতিক অপব্যাখ্যার উপরই নির্ভর করেছিলেন। যেসব অর্থনৈতিক যুক্তি মর্গানের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু আমার পক্ষে একেবারেই অনুপযোগী ছিল সেগুলি আমি নবপর্যায়ে উপস্থাপিত করেছি। এবং সর্বশেষে, যেখানে মর্গানকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ধৃত করা হয় নি, বলা বাহুল্য, সেসব সিদ্ধান্তের জন্য আমিই দায়ী।

রচনাকাল: আনুমানিক ২৬ মে, ১৮৮৪

নিম্নোক্ত গ্রন্থে প্রকাশিত: F. Engels. 'Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats.' Hottingen-Zürich, 1884

১৮৮৪ সালের সংস্করণের সঙ্গে মেলানো ১৮৯১ সালের সংস্করণের পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত

মূল রচনা জার্মান ভাষায়

১৮৯১ সালের চতুর্থ জার্মান সংস্করণের ভূমিকা

আদি পরিবারের ইতিহাস প্রসঙ্গে
(বাখোফেন, ম্যাক-লেনান, মর্গান)

এই রচনার পূর্ববর্তী বহুমুদ্রিত সংস্করণগুলি প্রায় ছয় মাস হল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে এবং অনেক দিন হল প্রকাশক* আমাকে একটি নতুন সংস্করণ তৈরির অনুরোধ করেছেন। অধিকতর জরুরী কাজের জন্য এযাবৎ আমি তা করতে পারি নি। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর সাত বছর কেটে গিয়েছে এবং এসময়ে পরিবারের আদি রূপগুলি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। সংশোধন ও পরিবর্ধনের কাজে অধ্যবসায়ের সঙ্গে হাত দেওয়া দরকার ছিল, বিশেষ করে এই জন্য যে, বর্তমান রচনাটির স্টিরিও-মুদ্রণের যে প্রস্তাব রয়েছে তাতে আরও কিছু পরিবর্তন আমার পক্ষে কিছুকালের মতো সম্ভব হবে না।

এজন্য আমি সমস্ত রচনাটি সযত্নে পরীক্ষা করেছি এবং কতকগুলি তথ্য সংযোজন করেছি এবং তাতে বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়েছে বলেই আমার আশা। অধিকন্তু, বর্তমান ভূমিকায় বাখোফেন থেকে মর্গান পর্যন্ত পরিবারের ইতিহাসের ক্রমপরিণতির এক সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা আমি দিয়েছি মূলত এজন্য যে, প্রাগৈতিহাস বিষয়ক জাতিদম্ভ-আক্রান্ত ইংরেজ পণ্ডিতরা আদিম সমাজের ইতিহাসের ধারণায় বিপ্লব সৃষ্টিকারী মর্গানের আবিষ্কারগুলি সম্পর্কে নীরব থেকে এগুলির হননে সর্বথা সচেষ্ট, যদিও এই আবিষ্কারের ফলগুলি আত্মসাৎ করতে তাঁরা একটুও দ্বিধান্বিত নন। অপরাপর দেশেও এই ইংরেজী দৃষ্টান্ত প্রায়শই অনুসৃত হচ্ছে।

আমার রচনাটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। প্রথমত ইতালীয় ভাষায়: 'L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello stato', versione riveduta dall'autore, di Pasquale Martignetti; Benevento, 1885. তারপর রুমানীয় ভাষায়: 'Origina familiei, proprietatei private şi a statui', traducere de Joan Nadejde, ইয়াস্সি

* ই. ডিট্স। — সম্পাঃ

শহরের *Contemporanul* (২) পত্রিকায়, প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ থেকে মে, ১৮৮৬। অতঃপর ডেনিশ ভাষায়: 'Familjens, Privatejendommens og Statens Oprindelse'. Dansk, af Forfatteren gennemgaact Udgave, besörget af Gerson Trier, Köbenhavn, 1888. বর্তমান জার্মান সংস্করণ থেকে আঁরি রাভে কর্তৃক একটি ফরাসী অনুবাদও যন্ত্রস্থ আছে।

* * *

সপ্তম দশকের আগে পর্যন্ত পরিবারের ইতিহাস বলতে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। এক্ষেত্রে ইতিহাস বিষয়ক বিজ্ঞান তখনও সম্পূর্ণভাবে মোজেসের পঞ্চপুস্তকের প্রভাবাধীন। পরিবারের পিতৃপ্রধান রূপ যা ওখানে অন্য যেকোনো বইয়ের চাইতে বিশদভাবে বিবৃত তাকেই শুধু যে বিনা বাক্যব্যয়ে পরিবারের প্রাচীনতম রূপ বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল তাই নয়, বহুগামিতা বাদ দিয়ে একেই বর্তমান কালের বুর্জোয়া পরিবারের সমার্থবাচক ধরা হয়েছিল, — যেন পরিবারের ক্ষেত্রে আদৌ কোনো ঐতিহাসিক বিকাশ ঘটে নি। বড়জোর আদিকালে নির্বিচার যৌনসম্পর্কের একটি যুগের সম্ভাব্য অস্তিত্বটুকুই শুধু স্বীকার করা হত। একথা সত্যি যে, একগামিতা ছাড়াও প্রাচ্যের বহুগামিতা এবং ভারত-তিব্বতীয় বহুভর্তৃক প্রথাও জানা ছিল; কিন্তু এই তিনটি রূপকে কোনো ঐতিহাসিক পরম্পরায় সাজানো যায় নি এবং এগুলি পাশাপাশি পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবেই উপস্থিত ছিল। প্রাচীনকালের কোনো কোনো জনসমষ্টির মধ্যে এবং এখনও বর্তমান কোনো কোনো বন্য জাতির মধ্যে বংশপর্যায় পিতৃ পরিবর্তে মাতৃ অনুসারী এবং সেজন্য মাতৃধারাই একমাত্র বৈধ বিবেচিত; বর্তমানের অনেক জাতির অভ্যন্তরস্থ নির্দিষ্ট অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ (গোষ্ঠীগুলি তখনও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা হয় নি) এবং প্রথাটি পৃথিবীর সর্বত্রই সহজদৃষ্ট; ইত্যাকার ঘটনাগুলি অবশ্য জানা ছিল এবং প্রতিদিন নতুন নতুন দৃষ্টান্তাবলীও উদ্‌ঘাটিত হচ্ছিল। কিন্তু ঐগুলির যথাযথ প্রয়োগ কেউ জানত না এবং এমন কি এডুয়ার্ড টাইলর 'মানবসমাজের আদি ইতিহাস ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের গবেষণা'

(১৮৬৫) রচনায় কোনো কোনো বন্য জাতির মধ্যে জ্বলন্ত কাঠকে লোহার হাতিয়ার দিয়ে ছোঁয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এবং অনুরূপ সব ধর্মীয় ছাইপাঁশের সঙ্গে একত্রে নিতান্ত এক 'অদ্ভুত প্রথা' হিসেবই এগুলি বিবেচিত হয়েছে।

১৮৬১ সালে বাখোফেনের 'মাতৃ-অধিকার' প্রকাশিত হবার পর থেকেই পরিবারের ইতিহাসের চর্চা শুরু হয়েছে। গ্রন্থকার এই রচনায় নিম্নলিখিত প্রতিপাদ্যগুলি উপস্থাপিত করেছেন: ১। শুরুতে মানবসমাজ নির্বিচার যৌনসম্পর্কের মধ্যে বসবাস করত, গ্রন্থকর্তা দুর্ভাগ্যক্রমে যার নামকরণ করেছেন 'হেটায়ারিজম' (উপপত্নী প্রথা বা সমষ্টিগত বিবাহ); ২। এই নির্বিচার যৌনসম্পর্কের প্রেক্ষিতে সঠিক পিতৃত্বের পূর্ণ অনিশ্চয়তা বিধায় বংশধারা কেবল নারীর দিক থেকে — মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী — স্থিরীকৃত হত, এবং আদিতে প্রাচীনকালের সমস্ত জাতির মধ্যেই তা বিরাজিত ছিল; ৩। ফলত মাতা ও পরবর্তী পুরুষের একমাত্র সঠিক নির্ধারণযোগ্যা জনয়িত্রী বিধায় মাতা রূপে নারীদের উপর উচ্চ মর্যাদা ও শ্রদ্ধা আরোপিত হত এবং বাখোফেনের ধারণা অনুযায়ী নারীতন্ত্র (gynecocracy) এরই ফলশ্রুতি; ৪। নারী যখন নিছক একটি পুরুষেরই উপভোগ্যা, সেই একগামিতায় উত্তরণের অর্থ একটি আদিম ধর্মীয় নির্দেশ লঙ্ঘন (অর্থাৎ বাস্তবক্ষেত্রে ঐ একই নারীর উপর অন্যান্য পুরুষের চিরাচরিত প্রাচীন অধিকারের লঙ্ঘন), এই লঙ্ঘনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হত অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নারীটিকে অপরের কাছে সমর্পণের মূল্যে এই লঙ্ঘনের স্বীকৃতি আদায় করা হত।

বাখোফেন এই প্রতিপাদ্যের সমর্থন পেয়েছেন প্রাচীনকালের চিরায়ত সাহিত্য থেকে অপরিসীম পরিশ্রমে আহৃত অসংখ্য উদ্ধৃতি থেকে। তাঁর মতে 'হেটায়ারিজম' থেকে একগামিতার এবং মাতৃ-অধিকার থেকে পিতৃ-অধিকারের উত্তরণ ঘটেছে, বিশেষত গ্রীকদের মধ্যে, ধর্মীয় ধারণাগুলির ক্রমবিকাশের ফলে, পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিস্বরূপ প্রচলিত প্রাচীন দেবতামণ্ডলীর মধ্যে নতুন ধারণার প্রতিনিধি নতুন দেবতাদের প্রবেশের ফলে, যেজন্য নবীনদের দ্বারা প্রাচীনরা ক্রমে ক্রমে অপসারিত হয়েছে। অর্থাৎ বাখোফেনের মতে মানুষ যে বাস্তব অবস্থার মধ্যে বসবাস করে তার বিকাশ নয়, পরন্তু সেই মানুষের মনে এই জীবনাবস্থার ধর্মীয় প্রতিফলনই নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সামাজিক অবস্থানের ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তদনুসারে

বাখোফেনের আলোচনায় এস্কাইলাস রচিত 'ওরেস্টিয়া' ক্ষয়িষ্ণু মাতৃ-অধিকার এবং বীরযুগের উদীয়মান ও বিজয়ী পিতৃ-অধিকারের মধ্যে সংগ্রামের নাট্যরূপ হিসেবেই উল্লিখিত। ক্লাইটেম্নেস্ট্রা তাঁর প্রেমিক এজিস্থাসের জন্য ট্রয় যুদ্ধ (৩) থেকে সদ্য-প্রত্যাগত স্বামী আগামেম্ননকে হত্যা করলেন; কিন্তু আগামেম্ননের ঔরসে তাঁর পুত্র ওরেস্ট মাকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিল। এজন্য মাতৃ-অধিকারের দানবীয় রক্ষিণী ইরিনিয়ারা তার পশ্চাদ্ধাবন করল, কারণ মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী মাতৃহত্যাই ঘৃণ্যতম পাপ, এর কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই। কিন্তু অ্যাপোলো যিনি দৈববাণী মারফত ওরেস্টকে এই কাজে প্রবৃত্ত করেছিলেন এবং এথেনা, যাঁকে মধ্যস্থ হতে বলা হল, এই দেবতাদ্বয় এখানে পিতৃ-অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন ব্যবস্থার প্রতিনিধি — এঁরাই ওরেস্টকে রক্ষা করলেন। এথেনা উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনলেন। ওরেস্ট ও ইরিনিয়াদের সেই বিতর্কেই প্রকটিত হয়েছে সমগ্র মতবিরোধের সারসংক্ষেপ। ওরেস্ট ঘোষণা করে যে, ক্লাইটেম্নেস্ট্রা দ্বিবিধ পাপে পাপী — তিনি নিজের স্বামীকে এবং সেসঙ্গেই তার পিতাকে হত্যা করেছেন। অতএব কেন ইরিনিয়ারা অধিকতর অপরাধী ক্লাইটেম্নেস্ট্রার বদলে তাকে নিপীড়িত করছে? উত্তরটি চমকপ্রদ:

'যারে সে করেছে হত্যা সেই স্বামীর সাথে **ছিল নাকো রক্তের সম্পর্ক**।'

রক্তের সম্পর্কহীন কোনো পুরুষ যদি হত্যাকারিণীর স্বামীও হয় তাহলেও সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আছে এবং সেটি ইরিনিয়াদের দেখবার বিষয় নয়। শুধু রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধদের মধ্যে হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া তাদের কাজ। এই ধরনের হত্যার মধ্যে মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী মাতৃহত্যাই ঘৃণ্যতম। অ্যাপোলো ওরেস্টের পক্ষ নিয়ে হস্তক্ষেপ করলেন। এথেনা এথেন্সের জুরী — এরিওপেগোইটিসদের এই প্রশ্নে ভোট দিতে বললেন। বেকসুর খালাস ও শাস্তির পক্ষে ভোট সমান সমান হল। তখন এথেনা বিচারের সভানেত্রী হিসেবে ওরেস্টের পক্ষে তাঁর ভোট দিয়ে তাকে মুক্ত করলেন। মাতৃ-অধিকারের উপর পিতৃ-অধিকার বিজয়ী হল। ইরিনিয়ারা নিজেই যাঁদের আখ্যা দিয়েছিল 'ছোটপক্ষের দেবতা' — তাঁরাই ইরিনিয়াদের

হারিয়ে দিলেন এবং ইরিনিয়ারা শেষ পর্যন্ত নববিধানের অধীনে নতুনতর পদ গ্রহণে রাজী হল।

'ওরেস্টিয়া'র এই নতুন কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভুল ব্যাখ্যাটি সমগ্র রচনার শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম একটি অংশ, অথচ সেইসঙ্গে দেখা যায় যে, বাখোফেন নিজেই ইরিনিয়া, অ্যাপোলো ও এথেনাকে বিশ্বাস করছেন, যা এস্কাইলাসের তৎকালীন বিশ্বাসের তুলনায় অন্তত কিছুমাত্র কম নয়; বস্তুত তিনি বিশ্বাস করেন যে, গ্রীসের বীরযুগে এঁরাই মাতৃ-অধিকারকে অপসারিত করে পিতৃ-অধিকার প্রতিষ্ঠার আশ্চর্য যাদু ঘটিয়েছিলেন। স্পষ্টত, যে ধারণায় ধর্মই বিশ্ব-ইতিহাসের চূড়ান্ত কারিকাশক্তি, নিছক অতীন্দ্রিয়বাদেই তার অনিবার্য শেষ পরিণতি। এজন্যই বাখোফেনের স্থূলকায় গ্রন্থটি পাঠ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং মোটেই সর্বদা উপযোগী নয়। কিন্তু এতে পথিকৃৎ হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব একটুও ক্ষুণ্ণ হয় না, কারণ নির্বিচার যৌনসম্পর্কের একটা অজানা আদিম অবস্থা সম্বন্ধে প্রচলিত ফাঁকা বুলির জায়গায় তিনিই সর্বপ্রথম প্রমাণ উপস্থিত করেন যে, গ্রীক ও এশিয়াবাসীদের মধ্যে একগামিতার আগে সত্যসত্যই সেরূপ একটি অবস্থা ছিল যখন প্রতিষ্ঠিত কোনো রীতি লঙ্ঘন না করেও শুধু যে একটি পুরুষ বহু নারীর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক রাখত তাই নয়, পরন্তু একজন নারীও বহু পুরুষের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক রাখতে পারত — যে অবস্থার বহু চিহ্ন প্রাচীন চিরায়ত সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে; নারীরা যে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে, সীমিত বাধ্যবাধকতায় অপর পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণের মূল্যে একপতিপত্নিত্বের অধিকার ক্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল তন্মধ্যে নিজের চিহ্ন না রেখে প্রথাটি লুপ্ত হয় নি; তাই প্রথমে শুধুমাত্র নারী থেকে, মাতৃ ধারা অনুযায়ীই বংশপরম্পরার হিসাব নির্ধারিত হত; এবং এভাবে নারী বংশপরম্পরার বিশেষ তাৎপর্য একগামিতার যুগেও বেশ কিছুকাল বজায় ছিল যখন পিতৃত্ব সুনিশ্চিত অথবা অন্তত স্বীকৃত; এবং সন্তানসন্ততির একমাত্র সুনিশ্চিত জনয়িত্রী হিসেবে মায়ের এই আদি প্রতিষ্ঠার ফলে মাতা এবং সাধারণভাবে নারীর জন্য এমন একটি উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত ছিল, যা পরবর্তী যুগে তাঁরা আর পান নি। বাখোফেন অবশ্য এই প্রতিপাদ্যগুলি এতটা পরিষ্কার করে ব্যক্ত করেন নি — তাঁর অতীন্দ্রিয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে ব্যাহত করেছে। কিন্তু তিনি

প্রমাণ করেছেন যে, এই প্রতিপাদ্যগুলি নির্ভুল এবং ১৮৬১ সালে এর তাৎপর্য ছিল সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক।

বাখোফেনের বিরাট গ্রন্থটি জার্মান ভাষায়, অর্থাৎ এমন একটি জাতির ভাষায় লিখিত হয়েছিল, যারা বর্তমান পরিবারের প্রাগৈতিহাসিক বৃত্তান্ত সম্বন্ধে তৎকালে অন্যান্য জাতির চেয়ে অনেক কম আগ্রহী ছিল। তাই তিনি অজ্ঞাতই থেকে গেলেন। তাঁর অব্যবহিত উত্তরসূরী ১৮৬৫ সালে একই ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করলেন, যিনি কখনও বাখোফেনের নাম পর্যন্ত শোনেন নি।

এই উত্তরসূরী জে. এফ. ম্যাক-লেনান তাঁর পূর্বসূরীর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। প্রতিভাশালী অতীন্দ্রিয়বাদীর জায়গায় আমরা পাই একজন কাঠখোট্টা আইনজীবীকে: উচ্ছ্বসিত কাব্যকল্পনার জায়গায় যেন মামলারত একজন উকিলের সুবিবেচিত যুক্তি শুনি। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের বহু বন্য, বর্বর, এমন কি সভ্য জাতির মধ্যে ম্যাক-লেনান বিবাহের একটি প্রথার সন্ধান পান যাতে পাত্র একাকী অথবা সবান্ধবে পাত্রীকে তার আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে হরণ করার ভান করে। প্রথাটি নিশ্চয়ই কোনো পূর্ববর্তী প্রথার লুপ্তাবশেষ, যখন এক উপজাতির লোকেরা অন্য উপজাতি থেকে সত্যসত্যই বলপূর্বক হরণ করে স্ত্রী সংগ্রহ করত। কেমন করে এই 'রাক্ষস বিবাহ' প্রথা হল? যতদিন পুরুষেরা নিজ উপজাতির মধ্যে যথেষ্টসংখ্যক নারী পেত, ততদিন এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে কিছু কিছু দল আছে (১৮৬৫ সালেও এই গোষ্ঠীগুলিকে পুরো উপজাতির সঙ্গে এক করে দেখা হত) যেখানে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ, ফলত পুরুষেরা স্ত্রী এবং নারীরা স্বামী ভিন্ন দল থেকে সংগ্রহ করতে বাধ্য হত; আবার কোথাও কোথাও প্রথানুযায়ী একটি বিশেষ দলের পুরুষেরা কেবলমাত্র নিজেদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সংগ্রহে বাধ্য ছিল। ম্যাক-লেনান প্রথম ধরনের দলকে বহির্বৈবাহিক (exogamous) এবং দ্বিতীয়টিকে অন্তর্বৈবাহিক (endogamous) আখ্যা দেন এবং নির্বিচারে বহির্বৈবাহিক ও অন্তর্বৈবাহিক 'উপজাতি'র মধ্যে একটা অনড় বৈপরীত্য বিধিবদ্ধ করেন। এবং যদিও বহির্বিবাহ সম্পর্কিত নিজস্ব গবেষণার ফলে এই সত্যটি তাঁর চোখের সামনেই ফুটে ওঠে যে, অধিকাংশ, বা সব ক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই এই বৈপরীত্যটি শুধু তাঁর কল্পনাতেই অবস্থিত, তবুও এর ভিত্তিতেই তিনি

তাঁর সমগ্র মতবাদটি গড়ে তোলেন। তদনুসারে বহির্বৈবাহিক উপজাতিরা কেবলমাত্র অন্যান্য উপজাতি থেকেই তাদের স্ত্রী সংগ্রহ করতে পারে; এবং তাঁর ধারণানুসারে বন্য অবস্থার বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত আন্তঃউপজাতীয় স্থায়ী যুদ্ধাবস্থার প্রেক্ষিতে কাজটি কেবলমাত্র বলপূর্বক হরণ মাধ্যমেই সম্ভব।

ম্যাক-লেনান তারপর প্রশ্ন করছেন: কোথা থেকে এই বহির্বিবাহ প্রথা এল? রক্তবন্ধন ও অজাচারের ধারণাগুলির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ এগুলি অনেক পরেই দেখা দিয়েছে। কিন্তু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কন্যা-সন্তানদের মেরে ফেলার যে প্রথাটি বন্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গে এর যোগাযোগ থাকা সম্ভব। এই প্রথার ফলে প্রত্যেকটি উপজাতিতে পুরুষের সংখ্যাধিক্য ঘটল, যার অবশ্যম্ভাবী ও অব্যবহিত ফল এক নারীর উপর একাধিক পুরুষের দখল — বহুভর্তৃক প্রথা। ফলত একটি শিশুর মাতৃপরিচয় জানা যেত, কিন্তু পিতৃপরিচয় নয়, তাই এই কুলপঞ্জী হত পুরুষবর্জিত এবং নারী অনুসারী। এই হল মাতৃ-অধিকার। এবং একটি উপজাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের ঘাটতির অন্যতর ফল (বহুভর্তৃক প্রথা দিয়ে এই অভাব উপশম হয়, দূর হয় না) অন্যান্য উপজাতি থেকে নিয়মিতভাবে বলপূর্বক নারী অপহরণ।

'যেহেতু বহির্বৈবাহিক প্রথা ও বহুভর্তৃক প্রথা উভয়েরই কারণ একটি — নারী-পুরুষের সংখ্যায় অসামঞ্জস্য — তাই **সমস্ত বহির্বৈবাহিক জাতিগুলিকে আদিতে বহুভর্তৃক** বলে গণ্য করতে আমরা বাধ্য... অতএব কোনো তর্কের অবকাশ না রেখেই আমরা বলতে পারি যে, বহির্বৈবাহিক জাতিগুলির মধ্যে প্রথম গোত্রব্যবস্থা ছিল সেইটে, যাতে শুধুমাত্র মায়ের রক্তসম্পর্কই স্বীকৃত ছিল' (ম্যাক-লেনান, 'প্রাচীন ইতিহাসের রূপরেখা', ১৮৮৬। 'আদিম বিবাহ', ১২৪ পৃঃ)।

ম্যাক-লেনান কথিত বহির্বৈবাহিক প্রথার ব্যাপক প্রচলন ও প্রভূত গুরুত্ব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণের মধ্যেই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব নিহিত। বহির্বিবাহ দলের অস্তিত্ব মোটেই তাঁর **আবিষ্কার** নয়, আর তিনি তা বুঝেছেন আরও কম। অনেক পর্যবেক্ষকের পূর্বতন বিচ্ছিন্ন যেসব মন্তব্য থেকে ম্যাক-লেনান তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাদের কথা বাদ দিলেও তাঁর

ল্লখ্য,
এই
ত ও
৮৪৭
র্কিত
করেন
ভাবে
বৃত্তি
ক্ষেত্রে
নের
বলে
কার
শুধু
nly)
বর্তী
াত্রায়
ীকৃত
কটি
মধ্যে
ছেন।
জের
এই

ত ও
সৃতি

দিতম

উদ্ধৃত লেথামের ('বর্ণনামূলক নৃকুলতত্ত্ব', ১৮৫৯) অংশটি অবশ্য উ
যেখানে লেথাম যথাযথ ও নির্ভুলভাবে ভারতবর্ষের মাগারদের মধ্যে
প্রথার বিবরণ দেন এবং ঘোষণা করেন যে, এটি সাধারণভাবে প্রচলিত
পৃথিবীর সব মহাদেশেই সহজদৃষ্ট। এমন কি আমাদের মর্গানও ১৮
সালেই (*American Review* পত্রিকায় প্রকাশিত) ইরকোয়াসদের সম্প
পত্রাবলীতে এবং ১৮৫১ সালে লেখা 'ইরকোয়াসদের লীগ'এ প্রমাণ ক
যে, উপজাতিগুলির এই গোষ্ঠীর মধ্যেও প্রথাটি চালু ছিল এবং নির্ভুল
এর বিবরণ দেন অথচ পরে দেখা যাবে, ম্যাক-লেনানের উকিলসুলভ মনো
এই বিষয়টিকে যতটা তালগোল পাকিয়েছিল, মাতৃ-অধিকারের
বাখোফেনের অতীন্দ্রিয়বাদী কল্পনাও ততটা পারে নি। এটিও ম্যাক-লেন
কৃতিত্ব যে, তিনি মাতৃ-অধিকার অনুসারী বংশগণনাকেই আদিতর
মেনেছিলেন, যদিও তিনি পরে এক্ষেত্রে বাখোফেনের অগ্রাধিকার স্বী
করেন। কিন্তু এখানেও তিনি মোটেই স্পষ্ট নন; তিনি ক্রমাগত '
নারীধারা অনুসারী আত্মীয়তা'র (Kinship through females o
কথা বলেন এবং পূর্বপর্যায়ে নির্ভুল এই আখ্যাটিকে বিকাশের পর
স্তরেও বরাবর প্রয়োগ করেছেন, যখন বংশপরম্পরা ও উত্তরাধিকার পূর্ণম
নারীধারা অনুসারে নির্ধারিত হলেও পুরুষধারা থেকেও আত্মীয়তা স্বী
ও ব্যক্ত হত। এই হচ্ছে আইনজীবীর গণ্ডীবদ্ধতা যিনি নিজের মনে এ
অনড় আইনী সংজ্ঞা দাঁড় করিয়েছেন এবং যে পরিস্থিতিতে তা ইতি
অচল হয়ে গেছে সেই পরিস্থিতিতেও তার অটুট প্রয়োগ অব্যাহত রেখে

যুক্তিযুক্ত বলে শোনালেও স্পষ্টতই ম্যাক-লেনানের তত্ত্ব তাঁর নি
কাছেও খুব যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে হয় নি। অন্ততপক্ষে তিনি নিজেই
ঘটনায় আশ্চর্য হয়েছেন:

'লক্ষ্য করা গেছে যে,' (ভান করে) 'হরণের রীতি এখন সর্বাধিক সুচিহ্
প্রতীয়মান শুধু সেইসব জাতির মধ্যে যেখানে আত্মীয়তার ক্ষেত্রে **পুরুষধারার অনু
বিরাজ করছে**' (১৪০ পৃঃ)।

পুনরাপি:

'এটি খুব আশ্চর্যজনক যে, যেখানে বহির্বৈবাহিক প্রথা এবং আত্মীয়তার আ

রূপ পাশাপাশি বর্তমান সেখানেও আমাদের জ্ঞানত আর শিশু হত্যার রীতি প্রচলিত নেই' (১৪৬ পৃঃ)।

এই দুটি ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে তাঁর ব্যাখ্যাকে ভুল প্রমাণ করে এবং তা কাটাবার জন্য তাঁকে নবতর, জটিলতর সব প্রকল্প দাঁড় করাতে হয়।

তাহলেও ইংলণ্ডে তাঁর তত্ত্বটি খুব প্রশংসিত হয় ও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে; সাধারণভাবে ম্যাক-লেনান সেদেশে পরিবারের ইতিহাসের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রামাণ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। বহির্বৈবাহিক ও অন্তর্বৈবাহিক 'উপজাতির' বৈপরীত্য সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের কিছু কিছু ব্যতিক্রম ও অদলবদল সত্ত্বেও তা প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীর সাধারণত স্বীকৃত ভিত্তি হিসেবেই টিকে থাকল এবং চোখে ঠুলির মতো অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে স্বাধীন পর্যালোচনা ও ফলত সুস্পষ্ট অগ্রগতিকে অসম্ভব করে তুলল। ম্যাক-লেনানকে নিয়ে বাড়াবাড়ি ইংলণ্ডে এবং ইংরেজী ফ্যাশনের অনুকরণে অন্যত্রও রেওয়াজ হয়ে উঠেছিল, তার প্রতিতুলনায় উল্লেখ করা কর্তব্য যে, পুরোপুরি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত বহির্বৈবাহিক ও অন্তর্বৈবাহিক 'উপজাতিগুলির' বৈপরীত্য দ্বারা তাঁর কৃত ক্ষতির পরিমাণ তাঁর গবেষণার সমগ্র সুফলের চেয়েও বেশি।

অচিরেই আরও অনেক তথ্য জানা গেল যেগুলি এই মতবাদের পরিপাটী কাঠামোর মধ্যে আর মোটেই অভিযোজ্য নয়। ম্যাক-লেনান বিবাহের তিনটি মাত্র রূপ জানতেন — বহুপত্নী প্রথা, বহুভর্তৃক প্রথা ও একপতিপত্নী প্রথা। কিন্তু একবার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হবার পর এর সমর্থনে ক্রমেই অধিকতর প্রমাণ আবিষ্কার শুরু হল এবং দেখা গেল যে, অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে বিবাহের এমন পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল যাতে একদল পুরুষ সমষ্টিগতভাবে একদল নারীর স্বামিত্ব করত, এবং **লাবক** (তাঁর রচিত 'সভ্যতার উৎপত্তি', ১৮৭০) এই সমষ্টিগত বিবাহকে (Communal marriage) একটি ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকার করলেন।

এর অব্যবহিত পরেই ১৮৭১ সালে **মর্গান** তাঁর নতুন এবং বহুবিধ প্রামাণ্য তথ্যাদি নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, ইরকোয়াসদের মধ্যে প্রচলিত বিশেষ ধরনের আত্মীয়তা বিধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে প্রযোজ্য এবং তা একটি

গোটা মহাদেশে পরিব্যাপ্ত, যদিও তাদের প্রচলিত দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন স্তরের আত্মীয়তার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ বিরোধ আছে। অতঃপর তিনি আমেরিকার ফেডারেল সরকারকে তাঁর রচিত প্রশ্নাবলি ও কয়েকটি সারণী সাহায্যে অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে প্রচলিত আত্মীয়তা বিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে রাজী করান এবং প্রাপ্ত জবাবগুলি থেকে তিনি আবিষ্কার করেন যে: ১। আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের আত্মীয়তা বিধি এশিয়ায় বহু উপজাতির মধ্যে এবং কিছুটা পরিবর্তিত রূপে আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াতেও প্রচলিত; ২। হাওয়াই এবং অন্যান্য অস্ট্রেলীয় দ্বীপগুলিতে বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায় এক ধরনের সমষ্টি-বিবাহ থেকে এর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা লাভ সম্ভব; এবং ৩। এই ধরনের বিবাহের পাশাপাশি একই দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত আত্মীয়তা বিধি কেবল প্রাচীনতর কিন্তু অধুনালুপ্ত এক ধরনের সমষ্টি-বিবাহ দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায়। সংগৃহীত তথ্য ও তাঁর সিদ্ধান্তগুলি একত্র করে তিনি ১৮৭১ সালে 'রক্তসম্পর্ক ও আত্মীয়তার প্রথাবলি' নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করে আলোচনাকে এক অসীম ব্যাপকতায় সম্প্রসারিত করেন। আত্মীয়তার প্রথাগুলি থেকে শুরু করে তিনি তাদের প্রতিষঙ্গী পরিবারগুলির কাঠামো পুনর্গঠিত করেন এবং এভাবে অনুসন্ধানের এক নতুন ধারা ও মানবজাতির প্রাগেতিহাসের সুদূরপ্রসারী এক পশ্চাৎপ্রেক্ষিত উন্মুক্ত করেন। এই পদ্ধতি সঠিক প্রতিপন্ন হলে ম্যাক-লেনানের পরিপাটি বিন্যাস হাওয়ায় মিলিয়ে যেত।

ম্যাক-লেনান তাঁর 'আদিম বিবাহ' ('প্রাচীন ইতিহাসের রূপরেখা', ১৮৭৬) নামক রচনার একটি নতুন সংস্করণে নিজের মতবাদ প্রতিপাদন করেন। তিনি নিজেই নিছক প্রকল্পের ভিত্তিতে কৃত্রিমভাবে পরিবারের ইতিহাস গড়ে তুলেছিলেন অথচ লাবক ও মর্গানের কাছে তিনি তাঁদের প্রত্যেকটি বক্তব্যের স্বপক্ষে শুধু প্রমাণই চান নি, দাবী করেছিলেন অকাট্য প্রমাণ, একমাত্র যে-ধরনের প্রমাণ স্কটল্যান্ডের আদালতে গ্রাহ্য। এবং তা চাইলেন এমন একটি ব্যক্তি যিনি জার্মানদের মধ্যে প্রচলিত মায়ের ভাই এবং বোনের ছেলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে (ট্যাসিটাস রচিত 'জার্মানিয়া', ২০ অনুচ্ছেদ), সিজারের উক্তি যে দশ-বারো জন ব্রিটন দল বেঁধে সাধারণ একদল স্ত্রী রাখত, তা থেকে, এবং বর্বরদের মধ্যে মেয়েদের

যৌথভর্তৃক প্রথা সম্পর্কে প্রাচীন লেখকদের অন্যান্য বক্তব্য থেকে নির্দ্বিধায় সিদ্ধান্ত করে বসলেন যে, বহুভর্তৃক প্রথা এই সমস্ত জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল! মনে হয়, আমরা যেন বাদী পক্ষের উকিলের অভিযোগ শুনছি, নিজের মামলার পক্ষে সবরকম স্বাধীনতা নিতে যাঁর বাধে না, অথচ প্রতিবাদী পক্ষের উকিলের প্রতিটি কথার পিছনে যিনি অতি আনুষ্ঠানিক ও আইনত বৈধ প্রমাণই কেবল দাবী করেন।

সমষ্টি-বিবাহ একটি নিছক কল্পনা — একথা ঘোষণা করে তিনি বাখোফেন থেকেও অনেক পিছিয়ে গেছেন। তাঁর মতে মর্গানের আত্মীয়তা বিধি সামাজিক ভদ্রতারীতির বেশি কিছু নয়, এবং তা ইণ্ডিয়ানদের দ্বারা ভিন্নগোত্রীয় — শ্বেতজাতির লোকদের 'ভ্রাতা' ও 'পিতা' সম্ভাষণে প্রমাণিত। একথার অর্থ, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী শব্দগুলি যেন সম্ভাষণের ফাঁকা বুলিমাত্র, কারণ ক্যাথলিক ধর্মের পুরোহিত এবং প্রধানা সন্ন্যাসিনীদেরও পিতা এবং মাতা বলে সম্ভাষণ করা হয় এবং সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী এমন কি ফ্রিম্যাসন ও ইংলণ্ডের কারুজীবী ইউনিয়নের সভ্যরাও নিজেদের সভার ভাবগম্ভীর অধিবেশনে ভ্রাতা এবং ভগিনী বলে সম্ভাষিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, ম্যাক-লেনানের আত্মপক্ষ সমর্থন শোচনীয়ভাবে দুর্বল ছিল।

একটি বিষয় অবশ্য বাকি ছিল, যেখানে ম্যাক-লেনান সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন ওঠে নি। তাঁর সমস্ত পদ্ধতিটি বহির্বৈবাহিক ও অন্তর্বৈবাহিক 'উপজাতিদের' যে বৈপরীত্যের উপর দাঁড়িয়েছিল সেটি তখনও অক্ষুণ্ণই ছিল না, এমন কি এটিকে সাধারণভাবে পরিবারের সমগ্র ইতিহাসের ভিত্তি বলেই গ্রহণ করা হয়েছিল। একথা স্বীকার করা হত যে, এই বৈপরীত্য ব্যাখ্যা করার জন্য ম্যাক-লেনানের প্রচেষ্টা যথোপযুক্ত নয় এবং তাঁর নিজের বর্ণিত তথ্যেরই তা বিরোধী; কিন্তু পরস্পরের একেবারে বিপরীতমুখী দুই ধরনের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র উপজাতির এই অস্তিত্ব, যাদের একটি পত্নী সংগ্রহ করত নিজেদের মধ্য থেকে অথচ অপরটির কাছে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল— এই বৈপরীত্য একেবারে তর্কাতীত বেদবাক্য হিসেবেই পরিগণিত হত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জিরো-তেলোঁর 'পরিবারের উৎপত্তি' (১৮৭৪) এবং এমন কি লাবকের 'সভ্যতার উৎপত্তি' (৪র্থ সংস্করণ, ১৮৮২) তুলনীয়।

এখানেই মর্গানের মূল রচনা 'প্রাচীন সমাজ' (১৮৭৭) গ্রন্থের কথা

আসে, যার ভিত্তিতে বর্তমান পুস্তকটি লিখিত। মর্গানের ১৮৭১ সালের অস্পষ্ট অনুমানটি এখানে পরিপূর্ণ স্পষ্টতায় বিকশিত। এখানে বহির্বিবাহ আর অন্তর্বিবাহের বৈপরীত্য অনুপস্থিত; অদ্যাবধি কোথাও কোনো বহির্বৈবাহিক 'উপজাতি' আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু যে সময়ে সমষ্টি-বিবাহ প্রচলিত ছিল — এবং খুব সম্ভবত সর্বত্রই কোনো না কোনো সময় এটি ছিল — তখন উপজাতি গড়ে উঠত মাতৃরক্তে সম্পর্কিত কয়েকটি দল, গোত্র (gentes) নিয়ে, যেখানে অভ্যন্তরে বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল; ফলে যদিও গোত্রের লোকেরা নিজেদের উপজাতির মধ্য থেকেই পত্নী সংগ্রহ করতে পারত ও সাধারণত তাই করত, কিন্তু তা করতে হত নিজেদের গোত্রের বাইরে থেকে। সুতরাং, গোত্রগুলি কঠোরভাবে বহির্বৈবাহিক হলেও কয়েকটি গোত্রসমন্বিত উপজাতি কঠোরভাবেই অন্তর্বৈবাহিক ছিল। এবার ম্যাক-লেনানের কৃত্রিম যুক্তির অন্তিম অবশেষটুকুও ভেঙে পড়ল।

মর্গান অবশ্য এতেই তৃপ্ত থাকেন নি। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের গোত্র থেকে স্বীয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ অতঃপর তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হল। তিনি আবিষ্কার করলেন যে, মাতৃ-অধিকারভিত্তিক ঐ গোত্রের আদিরূপ থেকেই পিতৃ-অধিকার অনুযায়ী সংগঠিত পরবর্তী গোত্রসমূহ উদ্ভূত যা প্রাচীনকালের সভ্য জাতিগুলির মধ্যে সহজদৃষ্ট। যে গ্রীক ও রোম গোত্র একদা সমস্ত পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের কাছে ধাঁধাস্বরূপ ছিল এখন ইণ্ডিয়ান গোত্রেই তার ব্যাখ্যা মিলল এবং এভাবেই আদি সমাজের সমগ্র ইতিহাসের একটি নতুন ভিত্তি আবিষ্কৃত হল।

সমস্ত সভ্য জাতির পিতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রগুলির পূর্ববর্তী স্তর হিসেবে আদি মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রের পুনরাবিষ্কারের তাৎপর্য আদিম সমাজের ইতিহাসের ক্ষেত্রে জীববিজ্ঞানে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব তথা অর্থশাস্ত্রে মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বের সমতুল্য। এর সাহায্যে মর্গান এই প্রথম পরিবার-ইতিহাসের একটি রূপরেখা তৈরি করতে পারলেন, যাতে বর্তমানে লভ্য তথ্যের ভিত্তিতে যথাসম্ভব খসড়াকারে বিবর্তনের চিরায়ত পর্যায়গুলি প্রমাণসিদ্ধভাবে নিরূপণ করা হল। স্পষ্টতই, এতে আদিম সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনার এক নতুন যুগ দেখা দিল। মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রের স্তম্ভের উপরই ন্যস্ত হল এই সমগ্র বিজ্ঞানের ভার;

এই আবিষ্কারের পরই গবেষণার লক্ষ্য, অনুসন্ধানের বিষয় এবং এর ফলাফল বিন্যাসের পদ্ধতি আমরা জানতে পারলাম। এর দরুন মর্গানের রচনা প্রকাশের পর এক্ষেত্রে অগ্রগতি পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ ত্বরিত হল।

বর্তমানে মর্গানের আবিষ্কারগুলিকে ইংলন্ডেরও প্রাগেতিহাসবিদরা সাধারণভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন অথবা সঠিক বলতে গেলে আত্মসাৎ করেছেন। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে এই বিপ্লবের জন্য মর্গানের কাছে আমরা ঋণী, তাঁদের মধ্যে একজনও বোধহয় প্রকাশ্যে সে কথা স্বীকার করবেন না। ইংলন্ডে তাঁর পুস্তক সম্বন্ধে যথাসম্ভব নীরবতা বিরাজিত এবং তাঁর **পূর্ববর্তী** রচনার দাক্ষিণ্যসূচক প্রশংসা করেই মর্গানকে বাতিল করা হয়; তাঁর পরিব্যাখ্যানের খুঁটিনাটি সমালোচনার জন্য সাগ্রহে সংগ্রহ করা হয়, অথচ তাঁর সত্যিকার মহৎ আবিষ্কারগুলি সম্পর্কে অনমনীয় নীরবতা চোখে পড়ে। 'প্রাচীন সমাজের' প্রথম সংস্করণটি আর মুদ্রিত হয় নি; আমেরিকায় এই ধরনের পুস্তকের উপযোগী বাজার নেই; ইংলন্ডে বইটিকে যেন নিয়মিতভাবে চেপে রাখা হয়েছে এবং এই যুগান্তকারী রচনার যে সংস্করণটি এখনও বাজারে পাওয়া যায় সেটি একটি জার্মান অনুবাদ।

কেন এই কুণ্ঠা যাকে, হয়ত, নীরবতার চক্রান্ত বলে না ভাবা দুষ্কর, বিশেষত যখন আমাদের মান্যগণ্য প্রাগেতিহাস বিষয়ক পণ্ডিতদের রচনাগুলি নিছক ভদ্রতাসূচক উদ্ধৃতি অথবা দোস্তির অন্যান্য সাক্ষ্যে ভরপুর? সে কি এই জন্য যে, মর্গান আমেরিকান এবং তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইংরেজ প্রাগেতিহাস বিষয়ক পণ্ডিতদের অত্যন্ত প্রশংসনীয় পরিশ্রম সত্ত্বেও, সে তথ্যের বিন্যাস ও বর্গভেদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য, সংক্ষেপে নিজস্ব প্রয়োজনীয় ধারণার জন্য দুজন প্রতিভাশালী বিদেশী — বাখোফেন ও মর্গানের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হওয়া তাঁদের পক্ষে ভারী কষ্টকর? একজন জার্মান বরং সহনীয়, কিন্তু একজন আমেরিকান? প্রতিটি ইংরেজ কোনো আমেরিকানকে দেখামাত্র কীরকম দেশপ্রেমিক হয়ে ওঠেন তার অনেক হাস্যকর দৃষ্টান্ত আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সময় দেখেছি (৪)। এসঙ্গে অবশ্যযোজনীয় যে, ম্যাক-লেনান ইংলন্ডের প্রাগেতিহাসবিদ্যার, বলা যেতে পারে সরকারীভাবে বিঘোষিত প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা; শিশুহত্যা থেকে শুরু করে বহুভর্তৃক প্রথা ও রাক্ষস বিবাহ মারফৎ মাতৃ-অধিকারসমন্বিত

পরিবার প্রথা পর্যন্ত তাঁর এই কৃত্রিম ঐতিহাসিক কাঠামোর অতি সশ্রদ্ধ উল্লেখ প্রাগেতিহাস বিষয়ক পণ্ডিতদের কাছে একধরনের শালীনতা হিসেবে স্বীকৃত ছিল; সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী বহির্বৈবাহিক ও অন্তর্বৈবাহিক 'উপজাতির' অস্তিত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশও তখন চরম ধৃষ্টোক্তি; অতএব মর্গান এই সমস্ত পবিত্র আপ্তবাক্য উড়িয়ে দেওয়ায় একধরনের মহাপাপী হয়ে উঠলেন। উপরন্তু মর্গান এগুলি এমন যুক্তি সহকারে পর্যুদস্ত করলেন যে, বক্তব্যটির উপস্থাপনামাত্রই সেটি তৎক্ষণাৎ সকলের কাছেই বোধগম্য হয়ে উঠল এবং ম্যাক-লেনানের ভক্তরা, যাঁরা এতকাল বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহের মধ্যে হোঁচট খেয়ে ঘুরছিলেন তাঁদের প্রায় কপাল চাপড়ে বলতে হত: কী বোকামী, কেন যে এগুলি আমরা নিজেরা অনেক আগেই আবিষ্কার করতে পারি নি!

তাছাড়া, সরকারী গোষ্ঠীর কাছ থেকে নিরুত্তাপ উদাসীনতা ছাড়া আর কোনো ব্যবহার না-পাওয়ার পক্ষে এই অপরাধই যেন যথেষ্ট ছিল না, সে অপরাধের পাত্র মর্গান কানায় কানায় পূর্ণ করে তুললেন শুধু সভ্যতার সমালোচনা এবং ফুরিয়ের কথা মনে পড়ে এমন ভঙ্গিতে আমাদের বর্তমান সমাজের বুনিয়াদী রূপ — পণ্যোৎপাদনসর্বস্ব সমাজের সমালোচনা করেই নয়, কার্ল মার্কস ব্যবহার করতে পারতেন এমন ভাষায় সমাজের ভবিষ্যৎ রূপান্তরের কথা বলেও। তাই এর উপযুক্ত পুরস্কার মর্গান পেলেন যখন ম্যাক-লেনান ক্রুদ্ধভাবে 'ঐতিহাসিক পদ্ধতির চরম বিদ্বেষী' বলে তাঁকে অভিযুক্ত করলেন, এবং এমন কি ১৮৮৪ সালেও যখন জেনেভায় অধ্যাপক জিরো-তেলোঁ সে অভিমত সমর্থন করলেন। অথচ তিনি সেই একই জিরো-তেলোঁ, যিনি ১৮৭৪ সালে ('পরিবারের উৎপত্তি') ম্যাক-লেনানের বহির্বৈবাহিক গোলকধাঁধায় বেঘোরে ঘুরে মরছিলেন এবং তা থেকে কেবল মর্গানই তাঁকে উদ্ধার করেন!

আদিম সমাজের ইতিহাস আর কোন কোন অগ্রগতির জন্য মর্গানের কাছে ঋণী তার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন; বর্তমান পুস্তকেই অতঃপর সকল প্রয়োজনীয়ের সন্ধান মিলবে। মর্গানের মূল রচনা প্রকাশের চৌদ্দ বছর পর আদিম মানবসমাজের ইতিহাস সম্পর্কিত আমাদের তথ্যভাণ্ডার আজ অনেক বেশী পরিপুষ্ট। নৃতত্ত্ববিদ, পর্যটক এবং পেশাদার প্রাগেতিহাস

বিষয়ক পণ্ডিত ছাড়াও তুলনামূলক আইনবিধির প্রতিনিধিরা এক্ষেত্রে যোগ দিয়েছেন এবং নতুন তথ্য ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সংযুক্ত করেছেন। ফলত মর্গানের কোনো কোনো প্রকল্প বিচলিত এমন কি খণ্ডিতও হয়ে গেছে। কিন্তু কোথাও নতুন সংগৃহীত তথ্যাবলির ফলে তাঁর প্রধান প্রত্যয় অপর প্রত্যয় দিয়ে স্থানচ্যুত হয় নি। আদিম সমাজের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তিনি যে ধরনের শৃঙ্খলা প্রবর্তন করেছিলেন তার মূল বৈশিষ্ট্যাবলি আজও সুপ্রতিষ্ঠ। এমন কি একথাও আমরা বলতে পারি, যে হারে এই বিরাট অগ্রগতিসাধকের নাম গোপন করা হচ্ছে সেই হারেই তা ক্রমবর্ধমানভাবে সর্বসাধারণের স্বীকৃতি লাভ করছে।*

লণ্ডন, ১৬ জুন, ১৮৯১

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

Die Neue Zeit পত্রিকার খণ্ড ২, সংখ্যা ৪১, ১৮৯০-১৮৯১ এবং ১৮৯১ সালে স্টুটগার্ট থেকে মুদ্রিত ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের 'Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats' গ্রন্থে প্রকাশিত

পত্রিকায় প্রকাশিত বয়ানের সঙ্গে মেলানো গ্রন্থের বয়ান অনুযায়ী মুদ্রিত

মূল রচনা জার্মান ভাষায়

---

* ১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিউ ইয়র্ক থেকে ফেরার পথে রচেস্টারের একজন ভূতপূর্ব কংগ্রেস সদস্যের সঙ্গে আমার দেখা হয়, তিনি লুইস মর্গানকে চিনতেন। দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর সম্বন্ধে খুব অল্পই তিনি আমায় বলতে পারেন। তিনি বলেন, রচেস্টারে মর্গান একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে বাস করতেন নিজ অধ্যয়নেই নিমগ্ন থেকে। তাঁর ভাই ছিলেন একজন কর্নেল, ওয়াশিংটনে সামরিক মন্ত্রণালয়ের কোনো পদাধিকারী। এই ভাইয়ের সালিসিতেই তিনি তাঁর গবেষণায় সরকারকে আগ্রহী করতে ও সরকারী খরচে তাঁর কতকগুলি রচনা প্রকাশ করতে সক্ষম হন। এই ভূতপূর্ব কংগ্রেস সদস্য বলেন যে, কংগ্রেসে থাকার সময় তিনি নিজেও এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি

মর্গানের গবেষণা প্রসঙ্গে

১

সংস্কৃতির প্রাগৈতিহাসিক স্তরসমূহ

বিশেষজ্ঞের জ্ঞান নিয়ে মানুষের প্রাগৈতিহাসিক অবস্থা পর্যালোচনায় মর্গানই প্রথম একটি সুস্পষ্ট শৃঙ্খলা আনয়নে প্রয়াসী হন; যতদিন না নতুনতর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসম্ভারে কোনো অদলবদল জরুরী হয়ে উঠছে, ততদিন এক্ষেত্রে তাঁর যুগবিভাগই নিঃসন্দেহে প্রচলিত থাকবে।

বন্যাবস্থা, বর্বরতা এবং সভ্যতা — এই তিনটি মূল যুগের মধ্যে তিনি স্বভাবতই প্রথম দুটি যুগ এবং তৃতীয় যুগে উত্তরণ নিয়েই ভাবিত হন। প্রথম দুটি যুগকে তিনি জীবনোপকরণ উৎপাদনের অগ্রগতি অনুযায়ী নিম্ন, মধ্য এবং ঊর্ধ্ব এই তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন, কারণ, তাঁর কথামতো,

> 'এই বিষয়ে দক্ষতা অর্জনই পৃথিবীতে মানুষের ঊর্ধ্বাধিষ্ঠান ও আধিপত্যের পক্ষে চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ; জীবজগতে একমাত্র মানুষই খাদ্য উৎপাদনের উপর প্রায় চরম আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হয়। মানবিক অগ্রগতির সমস্ত মহাযুগ অল্পবিস্তর সরাসরিভাবেই জীবনযাত্রার উপকরণের উৎস পরিবর্ধনের সঙ্গে সম্বিত।'

পরিবার প্রথার আনুষঙ্গিক ক্রমবিকাশ সত্ত্বেও তাতে যুগবিভাগের এমন সুস্পষ্ট মাপকাঠি পাওয়া দুষ্কর।

ক। বন্যাবস্থা

১। **নিম্নস্তর।** মানবজাতির শৈশব; মানুষ তখনও তার আদি বাসভূমি গ্রীষ্ম অথবা উপগ্রীষ্ম মণ্ডলীয় বনানীতে থাকত। অন্তত আংশিকভাবেও তারা বৃক্ষবাসী ছিল, অন্যথা বৃহদাকার হিংস্র জন্তুর মুখে তাদের টিকে থাকার ঘটনাটি ব্যাখ্যা করা যায় না। দারুফল ও সাধারণ ফলমূলই ছিল

তাদের খাদ্য; এই পর্বের উল্লেখ্যতম কৃতিত্ব — পৃথকোচ্চারিত কথাবার্তার আয়ত্তীকরণ। ঐতিহাসিক যুগের জ্ঞাত কোনো জনসমষ্টিতেই আর সেই আদিম স্তরের সাক্ষাৎ মেলে না। যদিও এই পর্ব সম্ভবত হাজার হাজার বছর অব্যাহত ছিল তবু এর অস্তিত্বের কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই; কিন্তু পশুজগৎ থেকে মানুষের উৎপত্তি স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি উত্তরণ স্তর মেনে নেওয়া অপরিহার্য।

২। মধ্যস্তর। আহার্য হিসেবে মৎস্যখাদ্য ব্যবহার (তন্মধ্যে কাঁকড়া, শামুক ও অন্যান্য জলজ জীবও অন্তর্ভুক্ত) এবং আগুনের প্রয়োগ থেকে এই স্তরের শুরু। মাছ ও আগুন পরস্পর পরিপূরক, কারণ, কেবলমাত্র আগুনের সাহায্যেই মাছ খাদ্য হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যবহার্য। এই নতুন খাদ্য কিন্তু মানুষকে জলবায়ু ও স্থানবিশেষের গণ্ডি থেকে মুক্ত করল। নদীর গতিপথ এবং সমুদ্রের উপকূল ধরে মানুষ বন্যযুগেই ভূপৃষ্ঠের বেশির ভাগ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয়। আদি প্রস্তরযুগের, তথাকথিত পুরাপ্রস্তরযুগের যে সকল স্থূল, অমার্জিত পাথরের হাতিয়ারগুলি সম্পূর্ণভাবে অথবা প্রধানত এই সময়েরই বৈশিষ্ট্য, সেগুলি সমস্ত মহাদেশেই ছড়ানো ও এই পদযাত্রারই সাক্ষ্য। বসবাসের নতুন অঞ্চলগুলির কারণে এবং কাঠ ঘষে আগুন তৈরি বিদ্যার সঙ্গে সন্নিপাতী নতুন নতুন আবিষ্কারের অবিরাম সক্রিয় তাগিদে নতুন সব খাদ্যসামগ্রী পাওয়া গেল, যেমন তপ্ত ভস্মে ঝলসানো অথবা গর্ত করে (ভূমি চুল্লি) সেঁকা শ্বেতসারযুক্ত মূল ও কন্দ এবং দৈবাৎ শিকারলব্ধ জন্তু, যেগুলি লগুড় ও বর্শা — এই দুটি আদিম অস্ত্র আবিষ্কারের পরে খাদ্যের তালিকাভুক্ত হয়েছিল। কেতাবে লেখা নিছক শিকারী জাতি অর্থাৎ **শুধু** শিকার করেই যারা খাদ্য সংগ্রহ করে, এমন জাতি কোনোদিনই ছিল না, কারণ শিকার সংগ্রহের আত্যন্তিক অনিশ্চয়তার জন্য তা অসম্ভব ছিল। খাদ্য উৎসের ক্রমাগত অনিশ্চয়তার ফলে এ সময়ে সম্ভবত নরমাংস ভোজনের উদ্ভব ঘটে এবং বহুদিন তা অব্যাহত থাকে। অস্ট্রেলীয় এবং অনেক পলিনেশীয়ও অদ্যাবধি বন্যাবস্থার এই মধ্যস্তরে অবস্থিত।

৩। ঊর্ধ্বস্তর। তীর-ধনুক আবিষ্কার থেকেই এই স্তরের শুরু ফলত বন্য জীবজন্তু নিয়মিত খাদ্যভুক্ত হয় এবং শিকার স্বাভাবিক বৃত্তি হয়ে

ওঠে। ধনুক, ছিলা ও তীর — তিনটি মিলিয়ে একটি জটিল হাতিয়ার, এর আবিষ্কারের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে অনেক দিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও মানসিক শক্তির উৎকর্ষ, এবং ফলত আনুষঙ্গিক আরও বহু আবিষ্কারের সঙ্গে তাদের পরিচয়ের বিষয়টিও বিবেচ্য। তীর-ধনুকের সঙ্গে সুপরিচিত অথচ তদবধি মৃৎশিল্প-অজ্ঞ (মর্গান যাকে বর্বরতায় উত্তরণের কালক্রম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন) এমন বিভিন্ন উপজাতির তুলনাক্রমে এই আদি পর্যায়েও গ্রামে বসবাস ও জীবনোপকরণ উৎপাদনের ওপর আংশিক আধিপত্যের সূচনা চোখে পড়ে; দেখা যায়: কাঠের পাত্র ও বাসনকোসন, (তাঁত ছাড়াই) গাছ বাকলের আঁশ থেকে আঙ্গুলে বস্ত্রবয়ন, গাছের ছাল বা শরে বোনা ঝুড়ি-চুপড়ি, এবং মার্জিত (নব্যপ্রস্তরযুগীয়) পাথরের হাতিয়ার। বহুক্ষেত্রে আগুন ও পাথরের কুঠার দিয়ে ইতিমধ্যেই গাছের গুঁড়ি থেকে কুঁদে তোলা ডোঙ্গা এবং কোথাও কাঠ ও তক্তা তৈরি করে গৃহনির্মাণও সহজলক্ষ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মধ্যে এই সব অগ্রগতি সহজদৃষ্ট, তীর-ধনুকের সঙ্গে পরিচিতি সত্ত্বেও যারা মৃৎশিল্প-অজ্ঞ। বর্বরযুগের লোহার তলোয়ার এবং সভ্যযুগের আগ্নেয়াস্ত্রের মতো তীর-ধনুকই ছিল বন্যাবস্থার নির্ধারক অস্ত্রবিশেষ।

খ। বর্বরতা

১। **নিম্নস্তর**। মৃৎশিল্প থেকেই এর সূচনা। বহু ক্ষেত্রেই কথাটি প্রমাণিত এবং সম্ভবত সর্বক্ষেত্রেই, আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য প্রথমে কাঠের পাত্র অথবা ঝুড়ি-চুপড়িগুলিতে মাটির প্রলেপ দেওয়া থেকে এর উদ্ভব; এ থেকে অচিরেই আবিষ্কার হল যে, কাদাকে ছাঁচে ঢাললে ভেতরের আধার ছাড়াই উদ্দেশ্যসিদ্ধি সম্ভব।

এই পর্যন্ত বিবর্তনের ধারা অঞ্চল নির্বিশেষে একটি বিশেষ যুগের সকল জাতি সম্পর্কে সাধারণভাবে সত্য বলে ধরা যায়। বর্বরতার সূচনার সঙ্গে কিন্তু আমরা এমন একটা স্তরে এসে পড়ি যখন দুটি মহাদেশের মধ্যে প্রাকৃতিক অবস্থার পার্থক্য প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। বর্বরযুগের মূল বৈশিষ্ট্য: পশু বশীকরণ ও পালন এবং চাষবাস। পূর্ব মহাদেশ, তথাকথিত প্রাচীন গোলার্ধে গৃহপালনের উপযোগী প্রায় সব জন্তু এবং একটি ছাড়া

প্রায় সমস্ত চাষযোগ্য খাদ্যশস্যই ছিল; কিন্তু পশ্চিম গোলার্ধ বা আমেরিকায় ছিল একটিমাত্র পালনযোগ্য স্তন্যপায়ী জন্তু — লামা, তাও আবার কেবল দক্ষিণের একটি অংশে, এবং চাষোপযোগী একটিমাত্র খাদ্যশস্য — কিন্তু সবার সেরা — ভুট্টা। প্রাকৃতিক অবস্থার এই বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে অতঃপর প্রতিটি গোলার্ধের জনসমষ্টি নিজ নিজ বিশিষ্ট পথে এগিয়েছে এবং উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন পর্যায়ের সীমান্তরেখায় বিভিন্নতা চিহ্নিত হয়েছে।

২। মধ্যস্তর। পূর্ব মহাদেশে পশু বশীকরণ এবং পশ্চিমে সেচের সাহায্যে খাদ্যশস্য চাষ ও গৃহনির্মাণের জন্য আডব (রৌদ্রে শুকানো মাটির ইট) এবং পাথর ব্যবহারের সঙ্গে এই স্তরের সূচনা ঘটেছে।

আমরা প্রথমে পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে আলোচনা শুরু করব, কারণ ইউরোপীয়গণ কর্তৃক বিজিত হবার পূর্বাবধি এখানে কোথাও এই মধ্যস্তর অতিক্রান্ত হয় নি।

বর্বরতার নিম্নস্তরের ইণ্ডিয়ানদের যখন সন্ধান মেলে (মিসিসিপির পূর্বাঞ্চলীয়রা সবাই এই স্তরের লোক) তখন তারা অংশত বাগানে ভুট্টার চাষ এবং সম্ভবত কিছু কিছু কুমড়ো, খরমুজ, প্রভৃতি শাকসব্জীও চাষ করত এবং তা থেকেই তাদের খাদ্যের একটা মোটা অংশ আসত। কাঠের বেড়াঘেরা গ্রামে কাঠের তৈরী বাড়িতে তারা বাস করত। উত্তর-পশ্চিমের উপজাতিগুলি বিশেষত যারা কলম্বিয়া নদীর এলাকায় বসবাস করত, তারা তখনও বন্যাবস্থার ঊর্ধ্বস্তরে ছিল এবং মৃৎশিল্প ব্যবহার অথবা কোনো রূপ চাষবাস সম্পর্কে কিছুই জানত না। অপরদিকে, নিউ মেক্সিকোর পুয়েব্লো (৫) ইণ্ডিয়ানরা, মেক্সিকানরা, কেন্দ্রীয় আমেরিকার বাসিন্দারা এবং পেরুর অধিবাসীরা বিজিত হবার সময় বর্বরতার মধ্যস্তরে অবস্থিত ছিল। তারা পাথর অথবা আডব দিয়ে তৈরী দুর্গের মতো বাড়িতে বসবাস করত; তারা জলবায়ু ও আঞ্চলিক অবস্থানুযায়ী কৃত্রিম সেচব্যবস্থায় বাগানে ভুট্টা ও অন্যান্য খাদ্যশস্য চাষ করত এবং এইটাই ছিল তাদের খাদ্যসংগ্রহের প্রধান উপায়; তারা কয়েকটি পশুপাখিও পুষত। দৃষ্টান্ত হিসেবে মেক্সিকানদের টার্কি ও অন্যান্য পাখি এবং পেরুবাসীদের লামা উল্লেখ্য। তাছাড়া, তারা ধাতুর ব্যবহারও জানত, কিন্তু লোহা ছাড়া, আর সেজন্য তারা তখনও পাথরের হাতিয়ার ও পাথুরে অস্ত্রের ব্যবহার

কাটিয়ে উঠতে পারে নি। স্পেন কর্তৃক বিজিত হবার পর এদের স্বতন্ত্র বিকাশ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

পূর্ব গোলার্ধে দুধ ও মাংসদায়ী পশুপালনের সঙ্গেই বর্বরতার মধ্যস্তরের শুরু; সম্ভবত এই পর্বের অনেক কাল পর্যন্ত চাষবাস অজ্ঞাত ছিল। গবাদি পশু বশীকরণ ও পালন এবং বড় বড় পশুযূথ সংগঠনই হয়ত বর্বর জাতিগুলি থেকে আর্য ও সেমিট জাতিগুলির পার্থক্যের কারণ। ইউরোপ ও এশিয়ার আর্যদের মধ্যে গবাদি পশুর নাম এখনও একইরকমের, কিন্তু চাষযোগ্য উদ্ভিদের নাম মোটেই অভিন্ন নয়।

উপযুক্ত স্থানে পশুযূথের সৃষ্টি থেকেই রাখালিয়া জীবনধারা এল ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর ধারে ঘাসে ভরা সমতলভূমিতে সেমিট জাতিগুলির মধ্যে, ভারতে এবং অক্সাস ও জাক্সার্টিস*, দন ও নীপার নদীগুলি বরাবর অনুরূপ তৃণভূমিতে আর্য জাতিগুলির মধ্যে। সম্ভবত এরকম পশুচারণ অঞ্চলের সীমান্তেই প্রথম বন্য পশুকে পোষ মানানো হয়েছিল। এজন্যই উত্তরপুরুষদের ধারণা জন্মাল যে, পশুপালক জাতিগুলির উৎপত্তি এমন সব অঞ্চলেই হয়েছে, যেখানে মানবজাতির উৎপত্তি তো দূরের কথা, পরন্তু তাদের বন্যযুগের পূর্বপুরুষদের পক্ষে, এমন কি বর্বরতার নিম্নস্তরের লোকেদের পক্ষেও তা বসবাসের প্রায় অযোগ্য ছিল। অপরপক্ষে, মধ্যস্তরের বর্বর জাতিগুলি একবার পশুপালকের জীবনযাত্রা গ্রহণের পর আর কখনই স্বেচ্ছায় এসব ঘাসভরা জলধৌত সমতলভূমি ছেড়ে পূর্বপুরুষদের বাসভূমি বনাঞ্চলে ফিরে যাবার কথা ভাবে নি। এমন কি যখন আর্য ও সেমিট জাতিগুলি উত্তর ও পশ্চিমে যেতে বাধ্য হয় তখনও তারা পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের বনাঞ্চলে ততদিন পর্যন্ত বসবাস করতেই পারে নি যতদিন না খাদ্যশস্যের চাষাবাদ করে প্রতিকূল এই অঞ্চলেও বিশেষ করে শীতকালে তারা পশুগুলিকে খাদ্য যোগাতে এবং শীত কাটাতে সমর্থ হয়েছে। একথা খুবই সম্ভবপর যে, প্রধানত পশুখাদ্যের প্রয়োজন মেটাবার জন্য খাদ্যশস্যের চাষাবাদ শুরু হয় এবং পরবর্তীকালেই ঐগুলি মানুষের পুষ্টির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

* অক্সাস বর্তমান আমু দরিয়া, জাক্সার্টিস বর্তমান সির দরিয়া। — সম্পাঃ

আর্য ও সেমিট জাতিগুলির খাদ্যতালিকায় মাংস ও দুধের প্রাচুর্য এবং বিশেষত শিশুদের শরীর গঠনে এসব খাদ্যের উপকারিতা দিয়েই এই দুটি জাতির উন্নত বিকাশ সম্ভবত ব্যাখ্যা করা যায়। বস্তুত, নিউ মেক্সিকোর পুয়েব্লো ইন্ডিয়ান, যাদের প্রায় নিছক নিরামিষাশী হতে হয়েছিল, তাদের মস্তিষ্ক বর্বরতার নিম্নস্তরে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত বেশী মাংস ও মৎস্যভোজী ইন্ডিয়ানদের তুলনায় ছোট ছিল। যাহোক এ স্তরে নরমাংস ভোজন ক্রমশ লোপ পেতে থাকে এবং শেষ অবধি মাত্র ধর্মীয় আচার অথবা সমার্থবোধক, যাদুবিদ্যার অঙ্গ হিসেবেই এটি টিকে থাকে।

৩। **ঊর্ধ্বস্তর।** লৌহাকরিক গলিয়ে লোহা তৈরিতেই এর সূচনা। বর্ণলিপির আবিষ্কার এবং লিখিত বিবরণে তা ব্যবহারের মাধ্যমেই সভ্যযুগে এর উৎক্রান্তি। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, ঐই স্তরটি শুধুমাত্র পূর্ব গোলার্ধের জাতিগুলিই স্বাধীনভাবে অতিক্রম করেছে, তাতে উৎপাদনোন্নতি পূর্ববর্তী সব স্তরগুলির সমষ্টিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বীরযুগের গ্রীকরা, রোম প্রতিষ্ঠার অব্যবহিতপূর্ব ইটালিক উপজাতিগুলি, ট্যাসিটাসের সমকালীন জার্মানরা এবং ভাইকিং যুগের নরমানরা এই স্তরের অন্তর্গত।

সর্বোপরি, এ সময়ই সর্বপ্রথম আমরা পশুচালিত লোহার ফলাওয়ালা লাঙ্গল দেখতে পাই যেজন্য ব্যাপক চাষবাস বা **ভূমিকর্ষণ** সম্ভবপর হয় এবং তদবস্থায় জীবনোপকরণের পরিমাণ কার্যত অফুরান হয়ে ওঠে; এসঙ্গেই আমরা দেখতে পাই যে, বনজঙ্গল সাফ করে তা কৃষি ও গোচারণের জমিতে পরিণত করা হচ্ছে যা আবার লোহার কুঠার ও লোহার কোদাল ব্যতীত ব্যাপক আকারে করা অসম্ভব হত। কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং ছোট ছোট এলাকা অপেক্ষাকৃত জনাকীর্ণ হতে থাকে। ভূমিকর্ষণের আগে নিতান্তই ব্যতিক্রম হিসেবেই কেবল লাখ পাঁচেক লোক একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে একত্র হতে পারত; তবে খুব সম্ভব কখনই এমন ব্যাপার ঘটে নি।

হোমারের কাব্যে, বিশেষ করে 'ইলিয়ড'এ আমরা বর্বরতার ঊর্ধ্বস্তরের শীর্ষাবস্থা দেখি। উন্নত লৌহ যন্ত্রপাতি, কামারের হাপর, যাঁতা, কুমারের চাক, তেল ও মদ উৎপাদন, উন্নীত ধাতুকর্ম ও শিল্পকলায় তার উত্তরণ, মালগাড়ি ও যুদ্ধরথ, তক্তা ও কড়ির সাহায্যে জাহাজ নির্মাণ, শিল্প

হিসেবে স্থাপত্যের সূচনা, মিনার ও অস্ত্রনিক্ষেপের জন্য সছিদ্র প্রাকার সমেত প্রাচীরবেষ্টিত নগর, হোমারের মহাকাব্য এবং সমগ্র পুরাকথা — বর্বরতা থেকে সভ্যতায় উত্তরণকালে গ্রীকরা এসব মূল উত্তরাধিকার আত্মীকৃত করেছিল। যদি আমরা এসঙ্গে সিজার বর্ণিত, এমন কি ট্যাসিটাস বর্ণিত জার্মানদের তুলনা করি — যারা তখন সংস্কৃতির সেই স্তরের চৌকাঠে পা বাড়িয়েছে, যে স্তর থেকে হোমার যুগের গ্রীকরা ঊর্ধ্বতন স্তরে উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছিল, তাহলেই, বর্বরতার ঊর্ধ্বস্তরের উৎপাদনোন্নতির প্রকট সমৃদ্ধি আমাদের চোখে পড়বে।

বন্যাবস্থা ও বর্বরতার মধ্য দিয়ে সভ্যতার সূচনা পর্যন্ত মানবসমাজের বিবর্তনের যে ছবিটি মর্গানের রচনা থেকে এখানে উল্লিখিত তা ইতিমধ্যেই বহু নতুন বৈশিষ্ট্য, এবং তদতিরিক্ত, তর্কাতীত বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ, তর্কাতীত প্রমাণ যে, এগুলি সরাসরি উৎপাদনক্ষেত্র থেকে আহৃত। তবু আমাদের যাত্রাশেষে প্রকাশ্য পূর্ণাঙ্গ ছবিটির তুলনায় একে অস্পষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর মনে হবে; তখনই কেবল বর্বরতা থেকে সভ্যতায় উত্তরণের পূর্ণ আলেখ্য দেওয়া সম্ভব হবে এবং এ দুটির মধ্যে জাজ্বল্যমান পার্থক্য ফুটে উঠবে। আপাতত মর্গানের পর্ববিভাগের নিম্নরূপ সাধারণীকরণ সম্ভব: বন্যাবস্থা — এ পর্বে ব্যবহার্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলির দ্রুত আহরণেরই প্রাধান্য ছিল; মানুষের তৈরি কৃত্রিম জিনিসগুলি মূলত আহরণে ব্যবহৃত হাতিয়ারেই সীমিত ছিল। বর্বরতা — এ পর্বে পশুপালন ও কৃষির প্রচলন হয় এবং মানুষের কর্মকান্ড মাধ্যমে প্রকৃতির উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির পদ্ধতিগুলি আয়ত্তে আসে। সভ্যতা — এই পর্বে প্রকৃতিজাত সামগ্রীকে আরও ব্যবহারযোগ্য করে তোলা এবং যথার্থ শ্রমশিল্প ও কলার জ্ঞান অর্জিত হয়।

২

পরিবার

মর্গান তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ সময় ইরকোয়াসদের মধ্যে কাটিয়েছেন যারা এখনও নিউ ইয়র্ক রাজ্যে বসবাস করে এবং এদের একটি উপজাতি (সেনেকা) তাঁকে স্বজাতিভুক্ত করে। তিনি এদের এমন একটি আত্মীয়তা

বিধি লক্ষ্য করেন যেটি তাদের বাস্তব পারিবারিক সম্পর্কের বিরোধী। যুগল বিবাহ, উভয় পক্ষের সম্মতিতে সহজ বিবাহবিচ্ছেদ এদের মধ্যে নিয়ম হিসেবে প্রচলিত ছিল এবং এই প্রথাকে মর্গান নাম দিয়েছিলেন 'জোড়বাঁধা পরিবার'। এভাবে বিবাহিত দম্পতির সন্তানদের সকলেই জানত ও মানত এবং কাকে পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী বলা হবে, তা নিয়েও কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকত না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এইসব শব্দাবলী বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হত। ইরকোয়াস শুধু নিজের সন্তানদেরই পুত্র, কন্যা বলে সম্ভাষণ করত না, ভাইদের সন্তানদেরও তাই বলত এবং শেষোক্তরা তাকে পিতা সম্ভাষণ করত। অপরপক্ষে, সে তার বোনের সন্তানদের ভাগনে-ভাগনী ডাকত এবং তারা তাকে মামা বলত। বিপরীতভাবে ইরকোয়াস নারীরা নিজের সন্তান ছাড়াও বোনদের সন্তানদেরও পুত্র, কন্যা বলে সম্ভাষণ করত এবং তারাও তাকে মা বলত। অথচ সে তার ভাইয়েদের সন্তানদের ভাইপো-ভাইঝি বলত এবং তারা তাকে পিসী বলে ডাকত। একইভাবে ভাইদের সন্তানরা পরস্পরকে ভাইবোন সম্ভাষণ করত; বোনদের সন্তানরাও তা করত। পক্ষান্তরে, একজন নারীর সন্তান এবং তার ভাইয়ের সন্তানরা পরস্পরকে মামাতো ও পিসতুতো ভাইবোন বলে ডাকত। এবং এগুলি শুধুমাত্র ফাঁকা কথা ছিল না, পরন্তু এতে রক্তসম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ও সমান্তরতা, সমতা ও অসমতা সম্বন্ধে বাস্তবক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণাই অভিব্যক্ত হত; এবং এই ধারণাগুলিই সগোত্র আত্মীয়তার পূর্ণ বিকশিত বিধির ভিত্তিস্বরূপ যদ্বারা একটি ব্যক্তিসত্তার একশ' রকমের পৃথক পৃথক সম্পর্ক প্রকাশ করা সম্ভব হত। অধিকন্তু, প্রথাটি যে আমেরিকার সমস্ত ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে পুরোপুরি বলবৎ (এখনও পর্যন্ত কোনো ব্যতিক্রম আবিষ্কৃত হয় নি) শুধু তাই নয়, এমন কি ভারতের আদিম অধিবাসী, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় উপজাতি এবং হিন্দুস্তানের গৌরা উপজাতিগুলির মধ্যে এই রীতির প্রায় অবিকৃত প্রচলন রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের তামিলদের মধ্যে এবং নিউ ইয়র্ক রাজ্যের সেনেকা ইরকোয়াসদের মধ্যে দুই শতাধিক বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচলিত আত্মীয়তার অভিব্যক্তিগুলি আজও পর্যন্ত অভিন্ন। এবং যেমন আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে তেমনি ভারতের এই উপজাতিগুলির মধ্যেও পরিবারের প্রচলিত রূপ থেকে উদ্ভূত সম্পর্কগুলি সগোত্র আত্মীয়তা বিধির বিরোধী।

এর ব্যাখ্যা কি? বন্যাবস্থা ও বর্বরতার যুগে সমস্ত জাতির সমাজ বিধিতে আত্মীয়তার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তা খেয়াল রাখলে এরকম একটি ব্যাপক প্রচলিত ব্যবস্থার তাৎপর্য শুধু কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এমন একটি প্রথা, যা আমেরিকার সর্বত্র সাধারণভাবে, যা এশিয়ায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন বর্ণের জাতিগুলির মধ্যে একইভাবে বর্তমান এবং রূপের কিছু রদবদল করে যা আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সর্বত্র প্রচলিত, তার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিতে হবে; দৃষ্টান্তস্বরূপ, ম্যাক-লেনান উল্লেখ্য, তিনি যেভাবে ঘটনাটি উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন সেভাবে তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পিতা, পুত্র, ভাই ও বোন এগুলি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক উপাধিমাত্র নয়; পরন্তু এগুলির সঙ্গে একেবারে নির্দিষ্ট এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পারস্পরিক দায়দায়িত্ব জড়িয়ে আছে, যে দায়দায়িত্ব সমগ্রভাবে এসব জাতির সমাজব্যবস্থার অন্যতম মূল অঙ্গ। আর সে ব্যাখ্যাও মিলল। স্যান্ডউইচ (হাওয়াই) দ্বীপপুঞ্জে এই শতাব্দীর প্রথমার্ধেও পরিবারের এমন একটি রূপ ছিল যাতে আমেরিকা ও প্রাচীন ভারতীয় আত্মীয়তা বিধিতে নির্ধারিত পিতা ও মাতা, ভাই ও বোন, পুত্র ও কন্যা, মামা ও পিসী, ভাগনে ও ভাগনী নবীকৃত হত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, হাওয়াইর তৎকালীন প্রচলিত আত্মীয়তা বিধির সঙ্গে আসলে আবার বিদ্যমান পরিবারের বিরোধিতাও ছিল। সেখানে পিতামাতার ভাইবোনদের সমস্ত সন্তানদের বিনা ব্যতিক্রমে ভাই এবং বোন মনে করা হত এবং শুধুমাত্র মা ও মায়ের বোনেদের নয় অথবা শুধুমাত্র বাপ ও বাপের ভাইদের নয়, পরন্তু বিনা ব্যতিক্রমে বাপমায়ের সমস্ত ভাই-বোনেদেরই সাধারণ সন্তান বলে তাদের গণ্য করা হত। অতএব আমেরিকার আত্মীয়তা বিধি থেকে যদি পরিবারের আদিমতর এমন একটি রূপের পূর্বানুমান করতে হয় যা খাস আমেরিকাতেও আর নেই, কিন্তু এখনও হাওয়াইতে টিকে আছে, তাহলে পক্ষান্তরে হাওয়াইর আত্মীয়তা বিধি আরও আদিম এমন একটি পারিবারিক রূপের সন্ধান দেয় যা অদ্যাপি কোথাও আর না থাকলেও একদিন **নিশ্চয়ই** প্রচলিত ছিল অন্যথা তার অনুষঙ্গী আত্মীয়তা বিধির উদ্ভব ঘটত না। মর্গান লিখছেন:

'পরিবার একটি সক্রিয় সত্তা; এটি কখনও অচলায়তন নয়, নিম্নতর থেকে উর্ধ্বতর পর্যায়ে সমাজের উন্নয়নের সমতালে পরিবারও নিম্নতর থেকে উর্ধ্বতর রূপে অগ্রসর

হয়। পক্ষান্তরে সগোত্র আত্মীয়তা বিধি নিষ্ক্রিয়, পরিবারের অগ্রগতি তাতে লিপিবদ্ধ হয় সুদীর্ঘ ব্যবধান পরম্পরায় এবং তার আমূল পরিবর্তন ঘটে শুধুমাত্র পরিবারের আমূল পরিবর্তনের পর।'

মার্কস এতে যোগ করেছেন: 'এই একই কথা রাজনীতি, আইন, ধর্ম ও দর্শনের পদ্ধতি সম্পর্কেও সাধারণভাবে প্রযোজ্য।' পরিবার বিকশিত হতে থাকলেও সগোত্র আত্মীয়তা বিধি শিলীভূত হয়ে পড়ে এবং পরিবার রীতিসর্বস্বতায় পর্যবসিত আত্মীয়তা বিধির গণ্ডিকে অতিক্রম করে। ক্যুভিয়ে যেমন প্যারিসের কাছে একটি জন্তুর ক্রোড়-অস্থি থেকে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পেরেছেন যে এটি একটি কাঙ্গারু জাতীয় জন্তুর হাড় এবং অধুনা বিলুপ্ত হলেও একদিন ওখানে এরা বসবাস করত, তেমনই ঐতিহাসিকভাবে পরিবাহিত একটি সগোত্র আত্মীয়তা বিধি থেকে ততখানি নিশ্চয়তার সঙ্গেই আমরা বলতে পারি যে, সেই বিধির উপযোগী পরিবারের একটি বিলুপ্ত রূপ কোনো এক সময়ে বর্তমান ছিল।

উল্লিখিত সগোত্র আত্মীয়তা বিধি এবং পারিবারিক রূপগুলি বর্তমানে প্রচলিত অবস্থা থেকে এদিক দিয়ে পৃথক যে, তখন প্রতি শিশুর কয়েকটি পিতা ও মাতা ছিল। আমেরিকায় প্রচলিত যে সগোত্র আত্মীয়তা বিধি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পারিবারিক রূপের অনুষঙ্গী তাতে ভ্রাতা ও ভগিনী একই শিশুর পিতা ও মাতা হতে পারে না; পক্ষান্তরে, হাওয়াইর সগোত্র আত্মীয়তা বিধি এমন একটি পারিবারিক রূপের কথা বলে যাতে এইটাই ছিল নিয়ম। এভাবে আমরা এমন একসারি পারিবারিক রূপের সম্মুখীন হই যাতে আমাদের মধ্যে এতদিন যে রূপগুলি একমাত্র প্রচলিত রূপ হিসেবে পরিগণিত হত তা খণ্ডিত হয়। প্রচলিত ধারণায় কেবল একগামিতা সম্পর্কেই, তার সঙ্গে কিছু কিছু পুরুষের বহুগামিতা এবং হয়ত বা কিছু কিছু নারীর বহুভর্তৃকত্বও মেনে নেওয়া এবং নীতিবাগীশ কূপমণ্ডূকদের অনুকরণে তা চেপে যাওয়া হয় আর কার্যত আনুষ্ঠানিক সমাজের এই সীমাগুলি চুপি চুপি হলেও অসংকোচে লঙ্ঘন করা হয়। পক্ষান্তরে, আদিম ইতিহাস পর্যালোচনায় এমন পরিস্থিতি দেখা যায় যেখানে পুরুষের বহুগামিতা ও সেসঙ্গে তাদের স্ত্রীদের বহুভর্তৃক প্রথা প্রচলিত রয়েছে এবং তাদের সাধারণ সন্তানসন্ততি সেজন্য সকলেরই সন্তানসন্ততি হিসেবে পরিগণিত

হচ্ছে; এই অবস্থাও আবার ক্রমরূপান্তরের পথে পরিণামে একগামিতার সম্পর্কে এসে পৌঁছয়। এই পরিবর্তনগুলির চারিত্র্য এরূপ যে, শুরুতে সমষ্টি-বিবাহসূত্রে আবদ্ধ জনগোষ্ঠী ব্যাপকসংখ্যক হলেও ক্রমশ তাদের সংখ্যা খর্বিত হয়ে শেষ অবধি তা একটি যুগলে এসে দাঁড়ায় — যার প্রাধান্য এখন সহজলক্ষ্য।

এভাবে পশ্চাৎপ্রেক্ষিতে পরিবারের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে তাঁর অধিকাংশ সহযোগীদের সঙ্গে অভিন্নমত মর্গান এমন একটি আদিম অবস্থার অস্তিত্বের সিদ্ধান্তে উপনীত হন যখন একটি উপজাতির মধ্যে অবাধ যৌনসম্পর্কের প্রাধান্য ছিল, ফলে প্রত্যেকটি নারী সমানভাবে প্রত্যেকটি পুরুষের এবং তেমনই প্রত্যেকটি পুরুষ প্রত্যেকটি নারীর পতিপত্নী ছিল। এরূপ একটি আদিম অবস্থার কথা অবশ্য গত শতক থেকেই উঠেছে, কিন্তু অত্যন্ত সাধারণভাবে; বাখোফেনই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই অবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কিংবদন্তির মধ্যে এর চিহ্ন খোঁজেন -- স্মর্তব্য, এইটিই তাঁর অন্যতম মহৎ অবদান। তাঁর আবিষ্কৃত চিহ্নগুলিতে যে উচ্ছৃঙ্খল যৌনসম্পর্কভিত্তিক কোনো সামাজিক অবস্থার কিছুমাত্র সন্ধান মেলে না, মেলে এর আরও কিছু পরবর্তী একটি রূপ, সমষ্টি-বিবাহ, আজ আমরা তা জানি। উক্ত আদিম সামাজিক অবস্থা সত্য হলেও তা এত সুদূর অতীতের ব্যাপার যে, বর্তমান জীবিত অনুন্নত বন্যদের কোনো শিলীভূত সমাজে তার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ দুরাশা মাত্র। বাখোফেনের কৃতিত্ব: তিনি প্রশ্নটিকে গবেষণার পুরোভাগে এনেছিলেন।*

মনুষ্যজাতির যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে এরূপ একটি প্রাথমিক অবস্থার অস্তিত্ব অস্বীকার করাই সম্প্রতি রেওয়াজ হয়ে উঠেছে। মানুষকে এই 'কলঙ্ক' থেকে বাঁচানোই এর উদ্দেশ্য। প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবের কথা ছাড়াও অবশিষ্ট

* বাখোফেনের আবিষ্কার অথবা, বলা ভাল, অনুমান সম্পর্কে তাঁর অল্পজ্ঞানের প্রমাণ এই আদি অবস্থাটিকে হেটায়ারিজম সনাক্তীকরণেই চিহ্নিত। অবিবাহিত পুরুষ অথবা একপতিপত্নিত্বে আবদ্ধ পুরুষের সঙ্গে অবিবাহিত নারীদের যৌনসঙ্গম বোঝানোর অর্থেই গ্রীকরা শব্দটি প্রবর্তন করে। এতে সর্বত্রই একটা নির্দিষ্ট ধরনের বিবাহের অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হত যার বাইরে সঙ্গমটি ঘটছে এবং গণিকাবৃত্তি, কিংবা ইতিমধ্যে

জীবজগতের দৃষ্টান্ত এখানে সবিশেষ উল্লিখিত হয়; লেতুর্নো ('বিবাহ ও পরিবারের বিবর্তন', ১৮৮৮) সেখান থেকে সংগৃহীত অসংখ্য তথ্য মাধ্যমে জীবজগতেরও নিম্নস্তরে নির্বিচার যৌনসম্পর্কের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। এই তথ্যাবলি থেকে আমি একমাত্র এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারি যে, এগুলি মানুষ এবং তার আদিম জীবনাবস্থা সম্পর্কে কিছুই প্রমাণ করে না। মেরুদণ্ডী জীবজন্তুর দীর্ঘ সঙ্গমপর্বের যথেষ্ট ব্যাখ্যা শারীরবৃত্তীয় হেতু মাধ্যমেই নির্ণয়সাধ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পক্ষীরাজ্যে ডিম ফোটাবার সময় পক্ষিণীর অপরিহার্য সাহায্যের কথা উল্লেখ্য। পাখিগুলির বিশ্বস্ত একগামিতার দৃষ্টান্ত মানুষ সম্পর্কে কোনো কিছুই প্রমাণ করে না, কারণ মানুষ পাখি থেকে জন্মায় নি। আর যদি কঠোর একগামিতাই সর্বপ্রধান পুণ্য বলে মনে করা হয় তাহলে ফিতাকৃমিকেই শ্রেষ্ঠ মানতে হয়, কারণ তার পঞ্চাশ থেকে দুই শ' খণ্ডে বিভক্ত শরীরের প্রত্যেকটি খণ্ডে একজোড়া পুরুষ ও স্ত্রী যৌনাঙ্গ আছে এবং কৃমিকীট শরীরের প্রত্যেকটি খণ্ডে আত্মসঙ্গম করেই সারা জীবন কাটায়। অবশ্য আমরা যদি শুধুমাত্র স্তন্যপায়ীদের কথাই ধরি তাহলে তাদের মধ্যে যৌনজীবনের সবক'টি রূপ — নির্বিচার যৌনসম্পর্ক, সমষ্টি-বিবাহের মতো কিছু, বহুগামিতা এবং একগামিতাও পাওয়া যাবে। কেবলমাত্র বহুভর্তৃক প্রথাই সেখানে অনুপস্থিত। কেবল মানুষই এতে সমর্থ হয়েছে। এমন কি আমাদের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় — চতুর্ভুজদের মধ্যেও মাদীমর্দার জোটবন্ধনে যথাসম্ভব বৈচিত্র্যের প্রকাশ দেখা যায়; এবং যদি আমরা গণ্ডি আরও সংকীর্ণ ক'রে শুধুমাত্র চারটে নরসদৃশ বানরজাতির কথা ধরি তাহলে লেতুর্নো তাদের সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলতে সক্ষম যে, তারা কখনও একগামী এবং কখনও বহুগামী, কিন্তু জিরো-তেলোঁ সসুরের যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে তিনি জোর করে বলছেন, এরা একগামী। ভেস্তের্মার্ক তাঁর রচিত 'মানব বিবাহের ইতিহাস'এ (লন্ডন,

---

উদ্ভূত একটি সম্ভাবনা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কথাটি ভিন্নার্থে কখনও ব্যবহৃত হয় নি এবং মর্গানের সঙ্গে আমিও তা এই অর্থেই ব্যবহার করছি। ঐতিহাসিকভাবে উদ্ভূত নরনারী সম্পর্কগুলি তাদের জীবনের বাস্তব অবস্থাসৃষ্ট নয়, সেই পর্বের মানুষের ধর্মীয় ধ্যানধারণাজাত — তাঁর এই অপ্রাকৃত বিশ্বাসেই বাখোফেনের অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলি সর্বত্রই অসম্ভব রহস্যাচ্ছন্ন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

১৮৯১) নরসদৃশ বানরদের মধ্যে একগামিতা সম্বন্ধে সম্প্রতি যেসব কথা বলেছেন তাতেও বিশেষ কিছু প্রমাণিত হয় না। বস্তুত, এসব তথ্যের প্রকৃতি দেখে লেতুর্নো সততার সঙ্গে স্বীকার করছেন:

'স্তন্যপায়ীদের মধ্যে মানসিক উন্নতির স্তরের সঙ্গে যৌনসম্পর্কের রূপের আদৌ কোনো নির্দিষ্ট সম্বন্ধ দেখা যায় না।'

এবং এস্পিনাস ('প্রাণী সমাজ', ১৮৭৭) খোলাখুলিই বলছেন:

'যূথই পশুদের মধ্যে দৃষ্ট সর্বোচ্চ সামাজিক সংগঠন। যূথ সম্ভবত বহু পরিবার নিয়ে গঠিত, কিন্তু গোড়া থেকেই **পরিবার ও যূথ পরস্পরবিরোধী** এবং তারা পরস্পরবিপরীত অনুপাতে বিকাশপ্রাপ্ত।'

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায় যে, পরিবারে ও একত্রে অন্যান্য জোটে বাসরত নরসদৃশ বানর সম্পর্কে আমরা সুনির্ধারিত কিছুই জানি না। এর প্রাপ্ত বহু বিবরণ প্রত্যক্ষ পরস্পরবিরোধী। এতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এমন কি বন্যমানব উপজাতি সম্পর্কিত আমাদের বিভিন্ন বিবরণও কত যে পরস্পরবিরোধী, আর কত যে সমালোচনা, বিচার ও পরিমার্জনা এজন্য প্রয়োজন! কিন্তু মানবসমাজ অপেক্ষা বানরসমাজ পর্যবেক্ষণ কঠিনতর। সেইজন্য বর্তমানে এধরনের সম্পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য বিবরণ থেকে গৃহীত সকল সিদ্ধান্তই আমাদের পক্ষে অবশ্যপরিত্যাজ্য।

কিন্তু এস্পিনাসের উপরোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি থেকে একটি নির্ভরতর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উচ্চতর পশুগুলির যূথ ও পরিবার পরিপূরক নয়, পরন্তু পরস্পরবিরোধী। সঙ্গমঋতুর সময়ে মর্দাদের মধ্যে ঈর্ষার ফলে প্রত্যেকটি পশুযূথের বাঁধন কীভাবে আলগা হয়ে যায় অথবা সাময়িকভাবে ভেঙে পড়ে এস্পিনাস তার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন:

'পরিবার যেখানে খুব দৃঢ়বদ্ধ, যূথের উদ্ভব সেখানে বিরল ব্যতিক্রম। পক্ষান্তরে, যেখানে অবাধ যৌনসম্পর্ক অথবা বহুগামিতাই রীতি, সেখানে প্রায় স্বাভাবিকভাবেই যূথ গড়ে ওঠে... যূথ গঠনে পারিবারিক বন্ধনের শৈথিল্য এবং এর আনুষঙ্গিক প্রাণীসত্তার মুক্তিও প্রয়োজন। এজন্যই পাখিগুলির সংঘবদ্ধ ঝাঁক বিরল দৃষ্টান্ত... পক্ষান্তরে, স্তন্যপায়ীদের মধ্যে অল্পাধিক সংঘবদ্ধ সমাজ সহজলক্ষ্য এবং তা নিছক এজন্য যে,

প্রাণীসত্তা সেখানে পরিবারলিপ্ত নয়... তাই যূথের সামগ্রিক চেতনার সূচনাকালে পরিবারের সামগ্রিক চেতনাই এর সবচেয়ে বড় শত্রু। নির্দ্বিধায় বলা যায়: পরিবারের চেয়ে কোনো উচ্চতর সমাজরূপ যদি উদ্ভূত হয়ে থাকে তবে তা শুধু এজন্যই সম্ভব যে, সে সমাজরূপ মৌলিকভাবে পরিবর্তিত পরিবারগুলিকে আত্মীকৃত করে; এতে করে এমন সম্ভাবনাও বাতিল হয় না যে, ঠিক সেই কারণেই পরবর্তী সময়ে এই পরিবারগুলি অনেক বেশী অনুকূল অবস্থার মধ্যে নিজেদের পুনর্গঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল' (এস্পিনাসের প্রাগুক্ত গ্রন্থ জিরো-তেলোঁ কর্তৃক 'বিবাহ ও পরিবারের উৎপত্তি' পুস্তকে উদ্ধৃত, ১৮৮৪, ৫১৮-৫২০ পৃঃ)।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, মানবসমাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে পশুসমাজগুলির অবশ্যই কিছুটা মূল্য আছে, কিন্তু তা কেবলমাত্র নেতিবাচক। যতদূর জানা গেছে, উচ্চতর মেরুদণ্ডীদের মধ্যে কেবলমাত্র দুই ধরনের পরিবারই বর্তমান: বহুগামিতা অথবা একক যুগল; উভয়তই কেবল **একজন** পূর্ণবয়স্ক পুরুষ, একটি মাত্র স্বামীর স্থান। মর্দার ঈর্ষাই পশু পরিবারের বন্ধন ও সীমানা নির্ধারিত; ফলত পরিবার ও যূথের মধ্যে বিরোধিতার উদ্ভব। উচ্চতর সামাজিক রূপ — যূথ কোথাও অসম্ভাব্য, কোথাও শিথিল হয়ে পড়ে বা যৌনসঙ্গমের ঋতুতে একেবারেই ভেঙে যায়, অন্তত যূথের অব্যাহত বিকাশ মর্দার ঈর্ষায় ব্যাহত হয়। পশু পরিবার এবং আদিম মানবসমাজ যে দুটি ভিন্ন সত্তা, কেবল এতেই তার পর্যাপ্ত প্রমাণ নিহিত। পশুস্তর উৎক্রমণকালে আদিম মানুষের কোনো পরিবারই ছিল না, নয়ত, সর্বাধিক, এমন ধরনের কোনো পরিবার তাদের ছিল যা পশুরাজ্যে অনুপস্থিত। মানুষরূপে উদীয়মান যে প্রাণীটি অমন হাতিয়ারহীন সেও যূথবদ্ধতার সর্বোচ্চ রূপ — একক জোড় বেঁধে বিচ্ছিন্নভাবে অল্পসংখ্যায় টিকে থাকতে পারে, যা শিকারীদের বিবরণ থেকে ভেস্তের্মার্ক গরিলা ও শিম্পাঞ্জীদের উপর আরোপ করেছেন। কিন্তু বিবর্তন প্রক্রিয়ায় পশুস্তর উত্তরণের জন্য এবং প্রকৃতির রাজ্যে জ্ঞাত শ্রেষ্ঠতম অগ্রগতি সাধনের জন্য আরও একটি প্রয়োজনীয় উপাদান: যূথের মিলিত শক্তি ও যৌথ ক্রিয়া দ্বারা জীবসত্তার অপ্রতুল আত্মরক্ষা সামর্থ্যের প্রতিস্থাপন। নরসদৃশ বানরেরা আজ যে অবস্থায় বসবাস করে তা দিয়ে মনুষ্যস্তরে উৎক্রান্তি মোটেই ব্যাখ্যাসাধ্য নয়। এই বানরগুলি দেখে এদের ক্রমক্ষীয়মাণ, ভ্রষ্ট উপশাখা বলেই মনে হয়, যাদের অন্তত নিশ্চিত অবনতি ঘটছে। এদের এবং আদিম মানুষের

পারিবারিক রূপের সমান্তরাল তুলনাভিত্তিক সকল সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। কারণ, প্রাপ্তবয়স্ক মর্দাদের পরস্পরসহিষ্ণুতা ও ঈর্ষামুক্তিই সেসব বৃহৎ এবং দীর্ঘস্থায়ী যূথ গঠনের প্রথম শর্ত, যেগুলির মধ্যে অবস্থানের দৌলতেই কেবল পশুস্তর থেকে মানুষে উৎক্রান্তি সম্ভবপর হয়েছে। বস্তুত, ইতিহাসের অবিসংবাদিত প্রমাণসিদ্ধ এবং বর্তমানেও যত্রতত্র পরীক্ষণীয় এমন প্রাচীনতম, আদিতম পরিবারের কোন রূপটি আমরা দেখতে পাই? সমষ্টি-বিবাহে, যে বিবাহে একদল পুরুষ ও আর একদল নারী যৌথভাবে সকলেরই পতি ও পত্নী এবং যেখানে ঈর্ষা অনুপস্থিতপ্রায়। তাছাড়া, বিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে আমরা এমন একটি ব্যতিক্রমী বহুভর্তৃক প্রথা পাই যা ঈর্ষাবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং সেজন্যই পশুজগতে তা অজ্ঞাত। অবশ্য সমষ্টি-বিবাহের যে রূপগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেগুলির সঙ্গে এমন সব অদ্ভুত জটিল উপাদান জড়িয়ে আছে যাতে অনিবার্য পূর্ববর্তী যুগের সহজতর যৌনসম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং এভাবে শেষ বিচারে পশুত্ব থেকে মানবত্বে উৎক্রমণপর্বের উপযোগী একটি উচ্ছৃঙ্খল যৌনসঙ্গম পর্বের অবধারিত নির্দেশ মেলে; তাই যেখান থেকে আমাদের চিরকালের মতো উত্তীর্ণ হয়ে আসার কথা, পশুদের বিবাহরূপের কথা তুলে আমরা ঠিক সেখানেই ফিরে আসছি।

তাহলে, উচ্ছৃঙ্খল যৌনসম্পর্কের অর্থ কী? এর অর্থ, বর্তমান বা অতীতের বিধিনিষেধ তখন বলবৎ ছিল না। আমরা আগেই ঈর্ষাবোধের প্রতিবন্ধকতার পতন লক্ষ্য করেছি। অন্ততপক্ষে এটুকু নিশ্চিত যে, বিকাশের অপেক্ষাকৃত পরবর্তী পর্যায়ের একটি আবেগরূপেই ঈর্ষার উন্মেষ ঘটেছে। অজাচার সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। আদিকালে শুধু যে ভাইবোনই স্বামীস্ত্রী হিসেবে বসবাস করত তাই নয়, পরন্তু অদ্যাবধিও অনেক জাতির মধ্যে মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির যৌনসম্পর্ক প্রচলিত আছে। বানক্রফ্‌ট ('উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাজ্যসমূহের আদিম উপজাতি', ১৮৭৫ ১ খণ্ড) বেরিং প্রণালীর কেভিয়েট, আলাস্কার নিকটবর্তী কাডিয়াক দ্বীপের অধিবাসী এবং ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকার মধ্যাঞ্চলে টিনে'দের মধ্যে এই সম্পর্কের অস্তিত্ব দেখেছেন; লেতুর্নো চিপেওয়ে ইণ্ডিয়ান, চিলির কিউকাস, কেরিবিয়ান এবং ইন্দোচীনের কারেনদের মধ্য

থেকে একই তথ্য সংগ্রহ করেছেন; পার্থীয়, পারসিক, শক ও হূণ প্রভৃতিদের সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদের বিবরণের উল্লেখ অতঃপর নিষ্প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রজন্মের লোকেদের মধ্যে যে যৌনসম্পর্ক বস্তুত বিশেষ বিভীষিকার উদ্রেক না করেই এমন কি সর্বাধিক কূপমণ্ডূক দেশেও বর্তমানে ঘটে থাকে, অজাচার বিধি উদ্ভাবনের (এটি উদ্ভাবন বৈকি এবং অতীব মূল্যবান উদ্ভাবন) পূর্বকালীন মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততিদের যৌনসম্পর্ক সে তুলনায় জঘন্যতর বিবেচ্য নয়; বস্তুত, ষাট বছরের 'কুমারীও' অর্থকৌলিন্যের দৌলতে কখন কখন ত্রিশ বছরের যুবককে বিয়ে করে। যাহোক, যদি আমরা পরিবারের জ্ঞাত আদিতম রূপের সঙ্গে জড়িত অজাচারী ধারণাগুলি প্রত্যাহার করি — যে ধারণাগুলি আমাদের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং অনেক সময় একেবারে বিপরীত — তাহলে আমরা এমন একধরনের যৌনসম্পর্ক পাই যাকে কেবল নির্বিচারই বলা চলে, — নির্বিচার এই অর্থে যে, পরবর্তী-কালের প্রথাবদ্ধ বাধানিষেধ তখন ছিল না। এ থেকে অবশ্য দৈনন্দিন উচ্ছৃঙ্খল যৌনাচার সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে উত্তরণ সঙ্গত নয়। কিছু আলাদা আলাদা সাময়িক জোড় বাঁধা এতে মোটেই বাতিল হচ্ছে না; বস্তুত, সমষ্টি-বিবাহেও এখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটাই দেখা যাচ্ছিল। এই আদি অবস্থা অস্বীকার-কারীদের শেষতম ভেস্তের্মার্ক, যাঁর সংজ্ঞার্থে সন্তানের জন্মাবধি অটুট স্ত্রীপুরুষ জোড়ই কেবল বিবাহ, তাহলে বলা চলে যে, উচ্ছৃঙ্খল যৌনসম্ভোগ অর্থাৎ যৌনাচারের রীতিমাফিক বাধানিষেধের অনুপস্থিতির খেলাপ না হয়ে নির্বিচার যৌনসম্পর্কের অবস্থাতেও এই ধরনের বিবাহ খুবই সম্ভবপর ছিল। ভেস্তের্মার্ক অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে শুরু করেছেন যে,

> 'নির্বিচার যৌনসম্পর্কের সঙ্গে ব্যক্তিগত রুচির অবদমনও সংশ্লিষ্ট', অতএব 'বেশ্যাবৃত্তিই এর প্রকৃষ্টতম রূপ।'

আমার কিন্তু উল্টোই মনে হয়, বেশ্যালয়ের চশমা দিয়ে যতক্ষণ আমরা দেখছি, ততক্ষণ আদি অবস্থা বুঝবার সকল চেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। সমষ্টি-বিবাহের আলোচনাকালে আমরা আবার এই প্রসঙ্গে ফিরব।

মর্গানের মতে উচ্ছৃঙ্খল যৌনসম্পর্কের এই আদি অবস্থা থেকে সম্ভবত খুব গোড়ার দিকে দেখা দিল:

১। একরক্তসম্পর্কিত পরিবার — পরিবারের প্রথম স্তর। এখানে বিবাহের দলগুলি বিভিন্ন পুরুষানুক্রমে নির্ধারিত: পরিবারের গণ্ডির মধ্যে সমস্ত ঠাকুরদা ও ঠাকুমারা পরস্পরের স্বামীস্ত্রী, তাদের সন্তানসন্ততিদের অর্থাৎ বাপেদের ও মায়েদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য, তার অনুরূপ, শেষোক্তদের সন্তানসন্ততিরা আবার তৃতীয় চক্রের স্বামীস্ত্রী, এদের সন্তানসন্ততিরা অর্থাৎ প্রথমোক্তদের প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রীরা আবার চতুর্থ চক্রের স্বামীস্ত্রী। এভাবে এই প্রকার পরিবারে কেবলমাত্র পূর্বপুরুষের সঙ্গে উত্তরপুরুষের, মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির বিবাহসম্পর্কের (আমাদের ভাষায়) অধিকার ও দায়িত্ব থাকত না। ভাইয়েরা ও বোনেরা, — নিকট সম্পর্ক বা দূর সম্পর্কের সমস্ত মামাত, পিসতুত, মাসতুত, জেঠতুত, খুড়তুত, ভাইবোনেরা — পরস্পরের ভাই ও বোন এবং **ঠিক এজন্যই** তারা সবাই পরস্পরের স্বামী ও স্ত্রী হত। পরিবারের এই স্তরে ভাইবোন সম্পর্কের মধ্যে যৌনসম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত ছিল।* এই ধরনের একটি

* ১৮৮২ সালের বসন্তকালে একটি চিঠিতে (৬) মার্কস খুব কড়া ভাষায় ভাগ্নারের 'নিবেলুং' রচনায় আদিম অবস্থার সম্পূর্ণ বিকৃতির নিন্দা করেন। 'কে কখন শুনেছে যে, একজন ভাই তার বোনকে বধূ বলে আলিঙ্গন করছে?' (৭) ভাগ্নারের এই 'লম্পট দেবতা' যারা বেশ আধুনিক ছাঁচে প্রেমের সঙ্গে অজাচারের চাট মিশিয়ে নিত, এদের উত্তরে মার্কস বলেছেন: 'আদিম যুগে ভগিনী পত্নী **ছিলই এবং সেইটাই ছিল নৈতিকতা**'। (১৮৮৪ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

ভাগ্নারের অনুরাগী জনৈক ফরাসী বন্ধু [বনিয়ে] এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত না এবং তিনি বলছেন যে, ভাগ্নারের আদর্শ প্রাচীন 'জ্যেষ্ঠা এড্ডা'য় অর্থাৎ 'ওগিসড্রেকা'তেই (৮), লোকি ফ্রেইয়াকে এভাবে তিরস্কার করছে, 'তুই দেবতাদের সামনে নিজের ভাইকে আলিঙ্গন করেছিস।' এতে নাকি দেখা যায় যে, তখনই ভাইবোনের বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। 'ওগিসড্রেকা'য় কিন্তু সেই যুগ প্রকাশিত যখন পুরাতন কিংবদন্তিতে বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ছে; এটি দেবতাদের সম্পর্কে নিছক লুসিয়ানিয়ান ধরনের বিদ্রূপাত্মক রচনা। যদি মেফিস্টোফিলিস কায়দায় লোকি ফ্রেইয়াকে এভাবে তিরস্কার করেন তাহলে এটা বরং ভাগ্নারের বিরুদ্ধেই যায়। আরও কয়েক ছত্র পরে লোকি নিয়োর্ড'কে বলছে: 'তুমি ভগিনীকে দিয়ে (এমন) সন্তান উৎপাদন করেছ' (vidh systur thinni gaztu slikan mög)। নিয়োর্ড আস্ জাতির লোক ছিল না, সে ছিল একজন ভান এবং সে 'ইংলিঙ্গা সাগা'তে বলছে যে, ভান দেশে ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ প্রচলিত, কিন্তু আস্‌দের মধ্যে নয় (৯)। এ থেকে মনে হতে পারত

প্রতিনিধিস্থানীয় পরিবার হচ্ছে একজোড়া স্ত্রীপুরুষের বংশধরদের নিয়ে গঠিত যাদের মধ্যে আবার এক-একধাপের বংশধররা সকলেই পরস্পরের ভ্রাতাভগিনী এবং ঠিক এইজন্যই পরস্পরের স্বামী ও স্ত্রী।

একরক্তসম্পর্কিত পরিবার লোপ পেয়েছে। ইতিহাসে পরিচিত সবচেয়ে বন্য জাতিগুলির মধ্যেও এধরনের পরিবারের কোনো প্রমাণযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু এর অস্তিত্ব একসময়ে **অবধারিত** ছিল, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আত্মীয়তা বিধি থেকে এই সিদ্ধান্তে উত্তরণে আমরা বাধ্য হই। বিধিটি এখনও পলিনেশিয়ায় সর্বত্র প্রচলিত এবং এতে আত্মীয়তার এমন স্তরসমূহ প্রকাশিত যার উৎপত্তি কেবল এধরনের পরিবারেই সম্ভব; পরিবারের সমগ্র পরবর্তী বিকাশ থেকেও আমরা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হই, এতে এই রূপটি পারিবারিক বিকাশের একটি আবশ্যি
পর্যায় হিসেবে স্বীকৃত।

২। পুনালুয়া পরিবার। পরিবার সংগঠনের ক্ষেত্রে মাতা
সন্তানসন্ততির যৌনসম্পর্ক রহিত করাই যদি প্রথম পদক্ষেপ
ভাইবোনদের যৌনসম্পর্ক নিষিদ্ধকরণ এর অবশ্যম্ভাবী দ্বিত
শেষোক্তদের বয়সের আত্যন্তিক ঘনিষ্ঠতার জন্য এই পদক্ষেপ
গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথমটির চেয়ে কঠিনতরও ছিল। ধীর গতিতে
সম্পন্ন হয়, সম্ভবত শুরুতে কিছু বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে সহোদর
মধ্যে (অর্থাৎ মায়ের দিক থেকে), পরে ক্রমশ এটাই নিয়ম

যে, ভানরা আস্‌দের চেয়ে পুরনো দেবতা ছিল। সে যাইহোক, নিয়ে
মধ্যে সমকক্ষ হিসেবে বসবাস করত এবং এভাবে 'ওগিস্‌ড্রেকা' থেকে বর
পাওয়া যায় যে, যখন নরওয়েতে দেবতাদের সম্পর্কে গাথা রচিত হয় ত
ভগিনীর পরস্পর বিবাহে, অন্তত দেবতাদের মধ্যে, কোনো ঘৃণার উদ্রে
যদি কেউ ভাগ্‌নারের ত্রুটি মার্জনা করতে চান তাহলে তিনি 'এড্ডা' থেকে উ
গ্যেটের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারেন, কারণ গ্যেটে ভগবান ও দেবদা
গাথায় অনুরূপ ভুল করে মন্দিরে দেবদাসীর আত্মসমর্পণকে ধর্মীয় কর্ত
এবং ব্যাপারটিকে বড় বেশি আধুনিক বেশ্যাবৃত্তির অনুরূপ করে তুলেছি
সালের চতুর্থ সংস্করণে এঙ্গেলসের সংযোজন।)

...ক পূর্ববর্তী।

...পিতার সঙ্গে
...হয়, তাহলে
...ীয় পর্যায়।
...টি একাধারে
...ত ব্যাপারটি
...ভাইবোনদের
...হয়ে দাঁড়ায়

...ার্ড আস্‌দের
...ং বেশি প্রমাণ
...তখন ভ্রাতা ও
...ক করত না।
...দ্ধৃতি না দিয়ে
...সী সম্পর্কিত
...ব্য বলেছিলেন
...লেন। (১৮৯১

(হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে বর্তমান শতকেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম পাওয়া যেত), এবং সর্বশেষে, এমন কি সমান্তরবর্তী সমস্ত ভাইবোনদের মধ্যে অথবা আমরা যা বলি — প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাজিনদের মধ্যেও বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। মর্গানের মতে এটা

'সক্রিয় প্রাকৃতিক নির্বাচন নীতির একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।'

যেসব উপজাতির মধ্যে তখনও ভাই ও ভগিনীদের মধ্যে বিবাহ নিয়ম ও কর্তব্য হিসেবে প্রচলিত ছিল তাদের তুলনায় নিয়ন্ত্রিত অন্তর্প্রজনানুসারী উপজাতিরা যে দ্রুততর ও অধিকতর বিকশিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। গোত্রসংগঠনের মধ্যেই এই অগ্রগতির ফলাফলের প্রবল প্রভাব প্রমাণিত, এ থেকেই গোত্রের প্রত্যক্ষ উদ্ভব, এবং লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে দূরান্তর গমন; সমস্ত না হলেও পৃথিবীর অধিকাংশ বর্বর জাতিগুলির ক্ষেত্রেই গোত্র সমাজগঠনের ভিত্তি এবং গ্রীস ও রোমে সরাসরি এ থেকেই আমরা সভ্যস্তরে উত্তীর্ণ।

প্রত্যেকটি আদি পরিবারই বড়জোর কয়েক পুরুষের পরই বিভক্ত হতে বাধ্য হত। বর্বরযুগের মধ্যস্তরের শেষাশেষি পর্যন্ত অব্যাহত ব্যতিক্রমহীন আদিম সাম্যতন্ত্রী সাধারণ গৃহস্থালী ব্যবস্থায় পারিবারিক গোষ্ঠীর একটা সর্বোচ্চ আয়তন নির্ধারিত হয়েছিল। অবস্থাবিশেষে কিছু ভিন্নতর হলেও তা প্রত্যেকটি স্থানীয় এলাকায় কমবেশি সুনির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এক মায়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনসম্পর্কের অবৈধতার ধারণা উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো গৃহস্থালী গোষ্ঠী বিভাগ এবং নতুন গৃহস্থালী গোষ্ঠী (পারিবারিক দলের সঙ্গে যার সাদৃশ্য অনিবার্য নয়) প্রতিষ্ঠার উপর এর প্রভাব অবশ্যম্ভাবী ছিল। এক বা একাধিক ভগিনীদল, একটি গৃহস্থালী গোষ্ঠীর কেন্দ্র হত, আর তাদের সহোদর ভাইরা হত আর একটি গোষ্ঠীর কেন্দ্র। এভাবে অথবা অনুরূপ কোনো উপায়ে একরক্তসম্পর্কিত পরিবার থেকে মর্গান কথিত পুনালুয়া পরিবার উৎপন্ন হল। হাওয়াই প্রথা অনুযায়ী সহোদরা অথবা সমান্তরবর্তী (অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় বা তদধিক স্তরের কাজিন সম্পর্কিত বোনরা) কয়েক জন ভগিনী তাদের সাধারণ স্বামীদের সাধারণ স্ত্রী হলেও এই সম্পর্কের আওতা থেকে তাদের ভাইরা বাদ পড়ত।

এই স্বামীরা এখন আর পরস্পরকে ভাই বলে সম্ভাষণ করে না, বস্তুত, তাদের এখন আর ভাই হওয়াও নিষ্প্রয়োজন, পরন্তু তারা পরস্পরকে ডাকে 'পুনালুয়া' অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ সাথী, বলা যেতে পারে associé*। ঠিক একইভাবে একদল সহোদর অথবা সমান্তরবর্তী ভাই একত্রে এমন একদল নারীর সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ হত, যারা এদের ভগিনী **নয়** এবং এই নারীরাও পরস্পরকে পুনালুয়া বলে ডাকত। এটিই পরিবার গঠনের চিরায়ত রূপ, পরবর্তীকালে যার বিবিধ পরিবর্তন ঘটে এবং যার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য: একটি নির্দিষ্ট পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে একদল পুরুষ ও একদল স্ত্রীর যৌথ পতিপত্নী সম্পর্ক, যা থেকে প্রথমে স্ত্রীদের সহোদর ভাইদের এবং পরে সমান্তরবর্তী ভাইদেরও বাদ দেওয়া হত এবং একইভাবে তা স্বামীদের বোনেদের ক্ষেত্রে অনুসৃত হত।

পরিবারের এই রূপটি থেকে একেবারে পরিপূর্ণ যথার্থতায় আমেরিকায় প্রচলিত আত্মীয়তা বিধির বিভিন্ন ধাপগুলি পাওয়া যায়। আমার মায়ের বোনদের সন্তানসন্ততি তখনও থাকছে আমার মায়েরও সন্তানসন্ততি; তেমনই আমার বাপের ভাইদের ছেলেমেয়ে আমার বাপেরও ছেলেমেয়ে এবং তারা সকলেই আমার ভাইভগিনী, কিন্তু আমার মায়ের ভাইদের ছেলেমেয়েরা এখন তার ভাইপোভাইঝি, আমার বাপের বোনদের ছেলেমেয়েরা তার বোনপো ও বোনঝি এবং তারা সকলেই আমার কাজিন। বস্তুত, আমার মায়ের বোনদের স্বামীরা যখন আমার মায়েরও স্বামী এবং আমার বাপের ভাইদের স্ত্রীরা তেমনই সকলে তারও স্ত্রী থাকছে — ঘটনাক্ষেত্রে সর্বত্র না হলেও অধিকারের দিক দিয়ে — তখন ভাইবোনেদের মধ্যে যৌনসম্পর্ক সমাজে নিন্দিত হওয়ায় প্রথম স্তরের যে কাজিনরা এতকাল নির্বিচারে ভ্রাতাভগিনী বলে গণ্য হত তারা দুটো শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গেল: একটি শ্রেণী এখনও আগের মতো ভাইবোন থাকল (সমান্তর); বাকিরা — একদিকে ভাইয়ের ছেলেমেয়ে ও অপরদিকে বোনের ছেলেমেয়ে — আর ভাইবোন হতে **পারে না,** এদের সাধারণ জনকজননী — সাধারণ বাপ বা সাধারণ মা অথবা সাধারণ বাপমা — থাকতে পারে না এবং এজন্য এই

---

* সহযোগী। — সম্পাঃ

প্রথম প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল ভাইপোভাইঝি ও বোনপোবোনঝিদের, নারীপুরুষ কাজিনদের নতুন শ্রেণী যেটি পূর্বতন পরিবার প্রথায় অর্থহীন ছিল। আমেরিকার আত্মীয়তা বিধি যা ব্যক্তিগত বিবাহের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যেকোনো পরিবারের সঙ্গে আদৌ খাপ খায় না তার সূক্ষ্মতম খুঁটিনাটিগুলিরও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ও স্বাভাবিক সমর্থন এই পুনালুয়া পরিবার থেকে পাওয়া যায়। যে পরিমাণে এই আত্মীয়তা বিধির প্রচলন ছিল অন্তত ঠিক সেই পরিমাণেই পুনালুয়া পরিবার অথবা তদনুরূপ কোনো প্রকার পরিবারের অস্তিত্ব অপরিহার্য ছিল।

পরিবারের এই যে রূপটির অস্তিত্ব হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে সত্যসত্যই প্রমাণিত হয়েছে তার খবর সম্ভবত গোটা পলিনেশিয়াতেই আমরা পেতাম যদি ধর্মপ্রাণ মিশনারিরা আমেরিকার সেকালের স্পেনীয় যাজকদের মতো, এসব খ্রীষ্টধর্মবিরুদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে 'জঘন্যতা' ছাড়াও আরও বেশি কিছু লক্ষ্য করতে পারতেন।* তৎকালে বর্বরতার মধ্যস্তরবর্তী ব্রিটনরা সিজারের বর্ণনায় 'তারা দশ-বারো জন যৌথভাবে স্ত্রী রাখত এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা ভাইয়ে ভাইয়ে এবং বাপমা ও ছেলেমেয়ে মিলে' যা সমষ্টি-বিবাহেরই অস্তিত্বে প্রকৃষ্টভাবে ব্যাখ্যেয়। যৌথভাবে স্ত্রী রাখার মতো বয়স্ক দশ-বারো জন পুত্র বর্বরযুগে মা'দের থাকত না, কিন্তু আমেরিকার সগোত্র আত্মীয়তা বিধির আনুষঙ্গিক পুনালুয়া পরিবারে অনেক ভাই থাকতে পারত, কারণ একজনের নিকট ও দূর সম্পর্কের সকল কাজিনরাই তার ভাই ছিল। 'বাপমা ও ছেলেমেয়ে মিলে' এই বর্ণনায় সিজারের পক্ষে ভুল করা সম্ভব; এই প্রথায় অবশ্য পিতা ও পুত্র অথবা মাতা ও কন্যা একই বিবাহদল থেকে একেবারে বাদ না পড়লেও বাপ ও মেয়ে অথবা মা ও ছেলের সম্পর্ক অবশ্যই বাদ পড়ে। হিরোডোটস ও অন্যান্য প্রাচীন লেখকেরা বন্য ও বর্বর জাতিগুলির

---

* এ বিষয়ে এখন কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বাখোফেন উচ্ছৃঙ্খল যৌনসম্পর্কের যে চিহ্নগুলি — তাঁর তথাকথিত 'পাপনিষেক' আবিষ্কার করেছেন বলে বিশ্বাস করতেন তা সমষ্টি-বিবাহেই প্রত্যাবৃত হয়। 'বাখোফেন 'পুনালুয়া' বিবাহকে যদি 'অবৈধ' মনে করেন, তাহলে সেই যুগের কোনো লোক বর্তমানে মাতা অথবা পিতার দিকের দূর বা নিকট সম্পর্কের কাজিনদের মধ্যে বিবাহকেও সহোদর ভাইবোনদের বিবাহের মতো অজাচার বলতে পারে' (মার্কস)। (এঙ্গেলসের টীকা।)

মধ্যে সমষ্টিগতভাবে পত্নীসম্ভোগের যে বিবরণ দিয়েছেন, সমষ্টি-বিবাহের এই বা তার অন্য কোনো রূপ দিয়েই তা ব্যাখ্যা করাই সহজতম। ওয়াটসন এবং কেই 'ভারতীয় জাতিসমূহ' নামক রচনায় অযোধ্যার টিকুরদের (গঙ্গার উত্তর দিকে অবস্থিত) যে বিবরণ দিয়েছেন তাতেও এই কথাই প্রযোজ্য:

'তারা বড় বড় গোষ্ঠীতে প্রায় যথেচ্ছভাবে বসবাস করে' (অর্থাৎ যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে) 'এবং যখন দুজন লোককে বিবাহিত বলে ধরা হয় তখন সে বন্ধনটা নামমাত্রই থাকে।'

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোত্র সংগঠন প্রত্যক্ষভাবে পুনালুয়া পরিবার থেকে উদ্ভূত বলেই মনে হয়। অস্ট্রেলিয়ার বিবাহ-শ্রেণীর (১০) পদ্ধতি থেকেও এর সূত্রপাত হওয়া অবশ্যই সম্ভব: অস্ট্রেলীয়দের মধ্যেও গোত্র আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে পুনালুয়া পরিবার দেখা দেয় নি ও তাদের সমষ্টি-বিবাহের ধরন আরও স্থূলতর।

সব ধরনের সমষ্টিগত পরিবারে শিশুর পিতা অনিশ্চিত কিন্তু মাতা নিশ্চিত। যদিও মা সমগ্র পরিবারের সমস্ত সন্তানসন্ততিকে নিজের সন্তান বলে সম্ভাষণ এবং তাদের প্রত্যেকের প্রতি মায়ের কর্তব্য পালন করত, তবুও নিজের কোলের সন্তানদের সে আলাদা করেই জানত। অতএব এটা খুবই স্পষ্ট যে, সমষ্টি-বিবাহের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র **মায়ের** দিক দিয়েই বংশপরম্পরা নির্ধারণ এবং এভাবে কেবলমাত্র **মাতৃধারারই** স্বীকৃতি সম্ভব। বস্তুত, সমস্ত বন্য জাতি এবং বর্বরতার নিম্নস্তরবর্তী জাতিগুলির মধ্যেই ব্যাপারটি সহজলক্ষ্য; এর প্রথম আবিষ্কারই বাখোফেনের দ্বিতীয় মহৎ কৃতিত্ব। কেবলমাত্র মা মারফৎ বংশ নির্ণয় এবং এ থেকে কালক্রমে উদ্ভূত উত্তরাধিকার সম্পর্ককে তিনি মাতৃ-অধিকার আখ্যা দিয়েছেন। আমি সংক্ষেপণের জন্য আখ্যাটি বজায় রাখছি। অবশ্য আখ্যাটি সুনির্বাচিত নয়, কারণ সমাজবিকাশের সেই স্তরে আইনী অর্থে অধিকার বলে তখনও কিছু ছিল না।

এখন যদি আমরা পুনালুয়া পরিবারের দুটি টিপিক্যাল দল থেকে একটি নিই — অর্থাৎ যেটিতে কতকগুলি সহোদরা ও সমান্তর বোন (অর্থাৎ সহোদর বোনদেরই বংশের প্রথম, দ্বিতীয় বা তদধিক পর্যায়ের ভগিনী) ও তাদের সঙ্গে তাদের সন্তানসন্ততি এবং মায়ের দিক দিয়ে তাদের সহোদর

ও সমান্তর ভাইরা (আমাদের মত অনুযায়ী এরা বোনদের স্বামী নয়) রয়েছে তাহলে আমরা আদি রূপের গোত্রভুক্ত সেসব লোকগুলিকেই ঠিক খুঁজে পাব। এরা সকলেই একই মাতৃজাত, এবং প্রত্যেক প্রজন্মেই এই মেয়েরা একই আদি জননীর বংশজাত হিসেবে পরস্পরের ভগিনী। এই ভগিনীদের স্বামীরা কিন্তু এখন আর তাদের ভাই হতে পারে না, অর্থাৎ তারা ঐ আদি জননীর বংশজাত হতে পারে না এবং সেজন্য তারা এই রক্তসম্পর্কিত গোষ্ঠীর, পরবর্তীকালের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়; কিন্তু তাদের সন্তানসন্ততি এই গোষ্ঠীরই অন্তর্গত, আর মাতৃবংশানুক্রমই একক নির্ধারক, কারণ একমাত্র এটিই সুনিশ্চিত। যখন সমস্ত ভাইবোনদের, এমন কি মায়ের দিক দিয়ে দূর সম্পর্কের সমান্তর ভাইবোনদের মধ্যে পর্যন্ত যৌনসম্পর্ক নিষিদ্ধ হল, তখনই উপরোক্ত গোষ্ঠী গোত্রে রূপান্তরিত হল, অর্থাৎ এটিই মাতৃধারার রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়ের একটি সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী হয়ে উঠল যেখানে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ; এখন তা সামাজিক ও ধর্মীয় চরিত্রের অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠান মারফৎ নিজেকে ক্রমেই সংহত করে তুলল এবং একই উপজাতির অন্যান্য গোত্র থেকে পৃথক হয়ে উঠল। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরে করব। যাহোক, আমরা যদি দেখি যে, পুনালুয়া পরিবার থেকে গোত্রের উদ্ভব শুধু আবশ্যিকই নয়, স্পষ্টতই অবশ্যম্ভাবীও, তাহলে প্রায় নিশ্চয়তার সঙ্গে ধরে নেওয়া যায় যে জাতিগুলির মধ্যে গোত্রসংগঠন বর্তমান সেখানেই, অর্থাৎ প্রায় সমস্ত বর্বর ও সভ্য জাতিগুলির মধ্যে, আগে এই পারিবারিক রূপের অস্তিত্ব ছিল।

যেসময় মর্গান তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেন তখনও সমষ্টি-বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। বিভিন্ন শ্রেণীতে সংগঠিত অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে সমষ্টি-বিবাহের প্রচলন সম্পর্কে অল্পকিছু তথ্য ছিল এবং উপরন্তু ১৮৭১ সালেই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পুনালুয়া পরিবার সম্পর্কে পাওয়া খবরটি মর্গান প্রকাশ করেন। আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত যে আত্মীয়তা বিধি মর্গানের সমস্ত গবেষণার প্রারম্ভবিন্দু এ থেকে একদিকে তার পূর্ণ ব্যাখ্যা মিলল; অপরদিকে পাওয়া গেল মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্র উদ্ভবের অন্যতর একটি তৈরি পথের সন্ধান; এবং সর্বশেষে অস্ট্রেলীয় শ্রেণী থেকে এর বিকাশের স্তর বহুদূর উন্নত ছিল। কেন মর্গান এই পুনালুয়া

পরিবারকেই জোড়বাঁধা পরিবার উৎপত্তির পূর্ববর্তী একটি আবশ্যিক স্তর বলে ভেবেছিলেন এবং প্রাচীন যুগে এই ধরনের পরিবারের সার্বত্রিক অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন, এখন তা বোধগম্য। তারপর সমষ্টি-বিবাহের অন্যান্য ধরনেরও বহু তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে এবং এখন আমরা জানি যে, মর্গান এক্ষেত্রে খুব বেশি এগিয়ে গিয়েছিলেন। তথাপি পুনালুয়া পরিবার মারফৎ তিনি সৌভাগ্যক্রমে সমষ্টি-বিবাহের উচ্চতম ও চিরায়ত রূপটির সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিলেন, যা থেকে উচ্চতর পর্যায়ে এর উত্তরণের সহজতম ব্যাখ্যা সম্ভবপর।

সমষ্টি-বিবাহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ সমৃদ্ধির জন্য ইংরেজ মিশনারি লরিমার ফাইসনের কাছে আমরা সর্বাধিক ঋণী, কারণ ইনি এই ধরনের পরিবারের চিরায়ত আবাসভূমি — অস্ট্রেলিয়ায় বহুদিন এ নিয়ে গবেষণারত ছিলেন। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার মাউন্ট গ্যাম্বিয়ার অঞ্চলে অস্ট্রেলীয় নিগ্রোদেরই মধ্যে তিনি বিকাশের সর্বনিম্ন স্তর দেখতে পান। গোটা উপজাতিটি এখানে দুটো বড় শ্রেণীতে বিভক্ত — ক্রকি ও কুমাইট। এক-একটি শ্রেণীর অভ্যন্তরে যৌনসম্পর্ক কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ; অপরপক্ষে একটি শ্রেণীর প্রত্যেকটি পুরুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অপর শ্রেণীর প্রত্যেকটি নারীর স্বামী এবং তেমনিই ঐ নারীও জন্মলগ্নেই তার স্ত্রী। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি নয়, গোটা দলের সঙ্গে দল, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণী এখানে বিবাহবদ্ধ। লক্ষণীয় যে, দুটি বহির্বৈবাহিক শ্রেণীতে বিভাগজনিত বাধানিষেধ ছাড়া বয়স অথবা বিশেষ রক্তসম্পর্কের কোনো বাছবিচার নেই। একজন ক্রকি বৈধভাবেই প্রতিটি কুমাইট নারীকে স্ত্রী হিসেবে পাচ্ছে; যেহেতু কোনো কুমাইট নারীর গর্ভজাত তাঁর নিজের কন্যাও মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী কুমাইট, সেজন্য এই কন্যাটি জন্মের সময় থেকেই প্রত্যেক ক্রকি পুরুষের অর্থাৎ নিজ বাপেরও স্ত্রী। অন্তত আমাদের জ্ঞাত শ্রেণীসংগঠনের কোনোটিই এক্ষেত্রে কোনো নিষেধ আরোপ করে না। অতএব এই সংগঠন হয় এমন যুগে শুরু হয়েছিল যখন অন্তর্প্রজনন সংকুচিত করার সমস্ত অস্পষ্ট প্রেরণা সত্ত্বেও মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির যৌনসম্পর্ক তখনও বিশেষ বীভৎস ব্যাপার বলে গণ্য হয় নি — আর তাই সোজা নির্বিচার যৌনসম্পর্কের মধ্য থেকেই শ্রেণীসংগঠনের উদ্ভব হয়েছে, অথবা বিবাহভিত্তিক শ্রেণী

উদ্ভবের ফলে যখন মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির যৌনসম্পর্ক **ইতিমধ্যেই** প্রথানুসারে নিষিদ্ধ, সেক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা পূর্বতন একরক্তসম্পর্কিত পরিবারেরই অব্যবহিত অস্তিত্বের ইঙ্গিত এবং তা উত্তরণের লক্ষ্যে এটাই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত। এই শেষোক্ত অনুমানটিই অধিকতর সম্ভবপর মনে হয়। যতদূর আমি জানি, অস্ট্রেলিয়ার কোনো বিবরণে মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির যৌনসম্পর্কের নিদর্শন নেই, এবং বহির্বিবাহের পরবর্তী রূপ মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রেও, তার সূচনা থেকেই, এমন সম্পর্কের মৌন নিষেধও অনুমেয়।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার মাউন্ট গ্যাম্বিয়ার অঞ্চল ছাড়াও দ্বিশ্রেণী প্রথা আরও পূর্ব দিকে — ডার্লিং নদীর সন্নিহিত অঞ্চলে, এবং উত্তর-পূর্ব দিকে কুইন্সল্যাণ্ডেও প্রচলিত এবং এভাবে বহুদূরে বিস্তৃত। এই প্রথায় শুধু ভাই ও বোনেরা, মাতৃপক্ষের ভাইদের ও বোনদের সন্তানসন্ততির বিবাহ নিষিদ্ধ, কারণ এরা একই শ্রেণীভুক্ত; পক্ষান্তরে, ভাই ও বোনের ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক বিবাহ সিদ্ধ ছিল। নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে ডার্লিং নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কামিলারোই'দের মধ্যে, অন্তর্প্রজনন বন্ধ করার আরও একটি পদক্ষেপের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে দুটি মূল শ্রেণী চার ভাগে বিভক্ত এবং এই চারটি শ্রেণীর প্রত্যেকটি দলবদ্ধভাবে একটি বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গে বিবাহিত হয়। প্রথম দুটি শ্রেণীর লোকেরা জন্ম থেকেই পরস্পরের স্বামীস্ত্রী; মা প্রথম না দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত তদনুসারেই সন্তানসন্ততি তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত; আর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সন্তানসন্ততি যারা তদনুরূপ পরস্পরবিবাহিত হত তারা আবার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হত। সুতরাং, এক প্রজন্ম সবসময়ই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর, পরবর্তী প্রজন্ম তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর এবং তদনুবর্তী প্রজন্ম আবার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হত। এই প্রথা অনুযায়ী (মাতৃপক্ষীয়) ভাই ও বোনদের ছেলেমেয়েরা পরস্পর স্বামীস্ত্রী হতে পারে না, কিন্তু নাতিনাত্নীরা পারে। এই অদ্ভুত জটিল প্রথাটির সঙ্গে — অন্তত পরবর্তী যুগে মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্র জোড়বন্দী হলে তা আরও জটিল হয়ে ওঠে। কিন্তু এখন আমরা সে আলোচনা করতে পারব না। আমরা দেখি, অন্তর্প্রজনন রোধের প্রেরণা কীভাবে বার বার নিজেকে জাহির করেছে,

কিন্তু তা লক্ষ্যহীনভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কোনো স্পষ্ট উদ্দেশ্যবোধ ব্যতিরেকে।

যে সমষ্টি-বিবাহ অস্ট্রেলিয়ায় আজও বিবাহ-শ্রেণী অর্থাৎ সমগ্র মহাদেশে প্রায়শই বিক্ষিপ্ত একটি গোটা শ্রেণীর পুরুষের সঙ্গে অনুরূপ বিক্ষিপ্ত একটি শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের বিবাহ, খুঁটিয়ে দেখলে এই সমষ্টি-বিবাহকে আর তত ভয়ংকর মনে হয় না, যেমনটি গণিকালয়-রঞ্জিত কল্পনায় কূপমণ্ডূকরা ভাবতে অভ্যস্ত। বরং, এই বিবাহের অস্তিত্ব সম্পর্কে বহু বৎসর কারও কোনো ধারণাই ছিল না এবং সম্প্রতি আবার এ নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। ভাসাভাসাভাবে দেখলে একে একধরনের শিথিল একপতিপত্নী প্রথা এবং কোথাও কোথাও আপতিক বিশ্বাসঘাতকতাযুক্ত বহুপত্নী প্রথা মনে হবে। যে বিধি অনুযায়ী এই বিবাহ নিয়ন্ত্রিত তা আবিষ্কারে ফাইসন ও হাউইটের সেই বহু বৎসরের পর্যবেক্ষণ অনুসৃতব্য (কার্যত একজন সাধারণ ইউরোপীয়ের নিজেদের বিবাহ পদ্ধতির কথাই মনে পড়বে) — সেই বিধি অনুযায়ী নিজের বাড়ি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে, সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজ্ঞাত ভাষাভাষী লোকদের মধ্যেও একজন অস্ট্রেলীয় নিগ্রো শিবির থেকে শিবিরে ও উপজাতি থেকে উপজাতিতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অনেকসময় এমন স্ত্রীলোক পায় যারা তার কাছে বিনা আপত্তিতে, বিনা প্রতিরোধে আত্মদান করে এবং প্রথানুযায়ী একাধিক পত্নীর অধিকারী ব্যক্তি রাত্রির জন্য অতিথিকে অন্যতম স্ত্রী উপহার দেয়। এক্ষেত্রে যেখানে একজন ইউরোপীয় কেবলমাত্র দুর্নীতি ও আইনহীনতাই দেখে, সেখানে আসলে রয়েছে কড়াকড়ি নিয়ম। এই নারীরা অপরিচিত লোকটির বৈবাহিক শ্রেণীভুক্ত এবং সেজন্য জন্মসূত্রেই তারা তার স্ত্রী; যে বিবাহ বিধি অনুযায়ী এক দল অপর দলের জন্য বরাদ্দকৃত সেই নিয়মানুসারেই বৈবাহিক শ্রেণীর বাহিরে যৌনসম্পর্ক বহিষ্কারদণ্ডে নিষিদ্ধ। এমন কি যেখানে নারীহরণ স্বীকৃত, প্রায়শই সংঘটিত এবং অনেক এলাকায় রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত সেখানেও শ্রেণী বিবাহের বিধি কড়াকড়িভাবে পালনীয়।

নারীহরণ প্রথার মধ্যেই, অন্ততপক্ষে জোড়বাঁধা বিবাহের রূপে হলেও একপতিপত্নী প্রথায় উত্তরণের লক্ষণ অভিব্যক্ত: একজন যুবক যখন তার বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে একটি মেয়েকে হরণ করে বা নিয়ে পালায়, তখন

একের পর এক সকলের সঙ্গেই ঐ মেয়েটির যৌনসম্পর্ক ঘটে; কিন্তু মেয়েটি শেষে হরণে উসকানিদাতা যুবকেরই পত্নী বলে গণ্য হয়। এবং পক্ষান্তরে অপহৃতা মেয়েটি লোকটির কাছ থেকে পালিয়ে অপর কারও কাছে ধরা পড়লে সে ঐ শেষোক্ত ব্যক্তির স্ত্রী হয় এবং প্রথম লোকটি সেই অগ্রাধিকার হারায়। এভাবেই সাধারণ প্রচলিত সমষ্টি-বিবাহের পাশাপাশি এবং তার অভ্যন্তরে — ঐকান্তিক সম্পর্ক, বেশী বা কম সময়ের জন্য জোড়বাঁধা এবং বহুপত্নিত্বও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে; ফলত এখানেও সমষ্টি-বিবাহের ক্রমবিলুপ্তি ঘটছে; এখন, ইউরোপীয়দের প্রভাবে কোনটি আগে বিলুপ্ত হবে সমষ্টি-বিবাহ না প্রথাটির অনুসারী অস্ট্রেলিয়ার নিগ্রোরা, সেটিই মূল প্রশ্ন।

সে যাইহোক, অস্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত গোটা শ্রেণীর বিবাহ সমষ্টি-বিবাহেরই অতি অধস্তন ও আদিম রূপ; পক্ষান্তরে, আমাদের জানামতো পুনালুয়া পরিবারই এর বিকাশের উচ্চতম পর্যায়। পূর্বতনটি সম্ভবত যাযাবর বন্যদের সামাজিক অবস্থার উপযোগী, কিন্তু শেষোক্তটির জন্য সাম্যতন্ত্রী গোষ্ঠীর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী বসতি অপরিহার্য এবং এ থেকেই পরবর্তী উচ্চতর স্তরের প্রত্যক্ষ উদ্ভব। এই দুয়ের মধ্যবর্তী কোনো কোনো স্তর নিশ্চয়ই একদিন আবিষ্কৃত হবে। এখানেই আমাদের সামনে রয়েছে অনুসন্ধানের একটি সদ্যোন্মুক্ত ও অকর্ষিতপ্রায় ক্ষেত্র।

৩। **জোড়বাঁধা পরিবার।** সমষ্টি-বিবাহের আমলে অথবা তারও আগে কমবেশি সময়ের জন্য জোড়বাঁধা পরিবার দেখা যেত; বহু পত্নীর মধ্যেও একজনের একটি প্রধানা পত্নী (একে অবশ্য তখনও প্রিয় পত্নী বলা চলে না) থাকত এবং ঐ মানুষটি হত আবার বহু পতির মধ্যে তার প্রধান পতি। এই অবস্থার জন্য মিশনারিদের মধ্যে নেহাৎ কম ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় নি, তাঁরা সমষ্টি-বিবাহের মধ্যে কখনও দেখতেন নির্বিচারে বহুভোগ্য স্ত্রী, কখনও বা খুশিমতো বিবাহবিচ্ছেদ। এই ধরনের জোড়বাঁধার অভ্যাস অবশ্য গোত্রের বিকাশ এবং যাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ সেই 'ভাইদের' ও 'বোনদের' শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই ক্রমান্বয়ে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধকরণে গোত্রপ্রদত্ত প্রেরণায় ঘটনাবলি আরও এগিয়ে চলে। এভাবে আমরা ইরকোয়াস এবং

বর্বরতার নিম্নস্তরে অবস্থিত অধিকাংশ অন্যান্য ইন্ডিয়ান উপজাতিগুলির মধ্যে দেখি যে, তাদের প্রথাস্বীকৃত **সকল** আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ এবং তারাও আবার কয়েক শত রকমের। বিবাহের এই নিষেধাজ্ঞার ক্রমবর্ধিত জটিলতা সমষ্টি-বিবাহকে ক্রমেই অসম্ভব করে তোলে এবং **জোড়বাঁধা পরিবার** তার স্থলবর্তী হয়। এই স্তরে একজন পুরুষ একটি মাত্র নারীর সঙ্গে বাস করে, অবশ্য তা পুরুষের পক্ষে বহুপত্নিত্ব এবং কখনও-বা বিশ্বাসভঙ্গের অধিকারসহ, যদিও অর্থনৈতিক কারণে বহুগামিতা কদাচিৎ আচরিত হত; সেইসঙ্গে নারীর পক্ষে একত্র বসবাসের সময় পাতিব্রত্য অবশ্যপালনীয় এবং ব্যভিচার নিষ্ঠুরভাবে দণ্ডনীয় ছিল। অবশ্য যেকোনো পক্ষ থেকেই সহজেই বিবাহবন্ধন ভেঙে দেওয়া চলত এবং সন্তানেরা আগের মতো কেবল মায়েরই অধিকারভুক্ত হত।

এভাবে রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়দের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিবাহনিষেধের প্রেক্ষিতে, প্রকৃতির নির্বাচনী প্রভাবের প্রসারণ ঘটে। মর্গানের কথায়:

> 'রক্তসম্পর্কশূন্য গোত্রের মধ্যে বিবাহ শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে একটি অধিকতর শক্তিশালী জাতি সৃষ্টি করল; যখন দুটি উন্নতিশীল উপজাতির মিলনে একটি জাতির উদ্ভব ঘটে তখন নতুন করোটি ও মস্তিষ্ক উভয় উপজাতির নৈপুণ্যের যোগফলকে দীর্ঘায়ত ও সম্প্রসারিত করবে।'

সেজন্য গোত্রভিত্তিক উপজাতিগুলি দ্বারা পশ্চাৎপদ উপজাতিদের পরাজয় অথবা নিজেদের দৃষ্টান্তের জোরে তাদের স্বপথে আনয়ন অবশ্যম্ভাবী ছিল।

অতএব স্ত্রীপুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কের যে পরিধিতে একদা গোটা উপজাতি বেষ্টিত ছিল, তার ক্রমসংকোচনের মধ্যেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে পরিবারের বিবর্তন ঘটেছে। প্রথমে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, পরে দূরতর আত্মীয়েরা এবং শেষ অবধি বিবাহসূত্রের কুটুম্বরাও ক্রমান্বয়ে বর্জিত হয়, শেষে কার্যক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের সমষ্টি-বিবাহ অসম্ভব হয়ে পড়ে; এবং সর্বশেষে বাকি রইল কেবলমাত্র একটি, তখনও শ্লথবদ্ধ, যুগল, সেই অণু যা ভেঙে গেলেই বিবাহের পুরোপুরি উচ্ছেদ। একপতিপত্নী প্রথার উৎপত্তির মূলে আধুনিক শব্দার্থে ব্যক্তিগত যৌনপ্রেম কত যে সামান্য ছিল, শুধুমাত্র এই একটিমাত্র তথ্যেই তা প্রমাণিত। এই

স্তরবর্তী জাতিগুলির বাস্তব আচরণে এর আরও প্রমাণ মেলে। পরিবারের পূর্বতন অবস্থায় পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের কখনও অভাব হত না, বরং ঠিক উল্টো, অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত নারী ছিল, কিন্তু এখন নারী দুর্লভ হয়ে উঠল, তাদের খুঁজে পাবার প্রয়োজন দেখা দিল। ফলত জোড়বাঁধা বিবাহের অনুষঙ্গ হিসেবে স্ত্রী হরণ ও নারী ক্রয় শুরু হল। এটি ছিল সংঘটিত গভীরতর পরিবর্তনের ব্যাপক **লক্ষণ**, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়; লক্ষণগুলি নেহাতই স্ত্রী সংগ্রহের পদ্ধতি ছিল, তবু পাণ্ডিতম্মন্য স্কটিশ ম্যাক-লেনান সেগুলিকে পরিবারের বিশেষ বিশেষ ধরনে রূপান্তরিত করে নাম দিলেন 'রাক্ষস বিবাহ' এবং 'ক্রীত বিবাহ'। উপরন্তু, আমেরিকার ইন্ডিয়ান এবং (একই স্তরের) অন্যান্য উপজাতির মধ্যে বিবাহ ঘটাবার দায়িত্ব পাত্রপাত্রীর নয়, এমন কি এদের মতামত গ্রহণও অবান্তর বিবেচিত, এটি কেবল উভয়ের মায়েরই ব্যাপার। এভাবে প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি নরনারীর বাগ্দান হয় এবং আসন্ন বিবাহের দিনেই কেবল তারা রফার কথাটি জানতে পারে। বিবাহের আগে দত্তা কন্যার ক্রয়পণস্বরূপ পাত্রীর গোত্রের আত্মীয়দের জন্য (অর্থাৎ পাত্রীর মাতৃপক্ষীয় আত্মীয়দের, পিতা বা পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়দের নয়) পাত্রকে উপহার দিতে হয়। পতিপত্নীর যেকোনো একজনের ইচ্ছামতো বিবাহ ভেঙে দেওয়া যায়। তথাপি বহু উপজাতি, যথা ইরকোয়াসদের মধ্যে, ক্রমে ক্রমে এরূপ বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে জনমত বেড়ে ওঠে। স্বামীস্ত্রীর বিরোধে উভয় তরফের গোত্র আত্মীয়দের হস্তক্ষেপে মিটমাটের চেষ্টা এবং তা ব্যর্থ হলেই তবেই বিচ্ছেদ, আর সন্তানরা তখন মায়েরই সঙ্গী এবং উভয়েই পুনর্বিবাহের অধিকারী।

স্বতন্ত্র গৃহস্থালী প্রয়োজনীয় অথবা বাঞ্ছনীয় হবার পক্ষে জোড়বাঁধা পরিবার অত্যন্ত দুর্বল ও অস্থায়ী ছিল, তাই পূর্বানুসৃত সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালী ভেঙে যায় নি। কিন্তু গৃহে নারীর আধিপত্যেই সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালী অর্থবহ, যেমনটি জন্মদাতা পিতার নিশ্চিত সনাক্তীকরণ অসম্ভব বিধায় গর্ভধারিণী মায়ের নির্বিশেষ স্বীকৃতির মধ্যে নারী অর্থাৎ মা'দের উচ্চ মর্যাদা সূচিত। সমাজের সূচনায় নারীদের পুরুষের দাসীত্বে পর্যবসিত থাকার প্রত্যয়টি আঠারো শতকের আলোকোদয় (এনলাইটেনমেণ্ট) যুগ থেকে পাওয়া অতি আজগুবি একটি ধারণামাত্র। সমস্ত বন্যদের মধ্যে এবং নিম্নস্তর,

মধ্যস্তর ও অংশত ঊর্ধ্বস্তরের বর্বরদের মধ্যেও নারী শুধু স্বাধীনই ছিল না, পরন্তু সে ছিল অত্যন্ত সম্মানিত আসনের অধিকারী। জোড়বাঁধা পরিবারে সেকালেও নারীর মর্যাদা কী ছিল সেনেকা উপজাতির ইরকোয়াসদের মধ্যে মিশনারি হিসেবে বহু বছর বসবাসকারী আশার রাইটের সাক্ষ্য শুনুন:

'তাদের পারিবারিক ব্যবস্থার কথা বলতে গেলে, যখন তারা পুরানো লম্বা বাড়িতে' (সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালীতে অনেকগুলি পরিবার থাকত) 'বসবাস করত... তখন সর্বদাই কোনো একটি কুল' (গোত্র) 'সেখানে আধিপত্য করত, সুতরাং মেয়েরা অন্যান্য কুল' (গোত্র) 'থেকে স্বামী গ্রহণ করত।' '...সচরাচর মেয়েরাই বাড়ির মধ্যে আধিপত্য করত; বাড়ির ভাণ্ডার ছিল সাধারণের সম্পত্তি; কিন্তু রসদ যোগানোর ব্যাপারে নিজ দায়িত্বপালনে অক্ষম বা অলস স্বামী কিংবা প্রেমিকের কপালে দুঃখ জুটত। বাড়িতে তার সন্তানসন্ততির সংখ্যা অথবা জিনিসপত্র যতই থাক না কেন, যেকোনো সময় তাকে তল্পি গুটিয়ে চলে যাবার হুকুম দেয়া যেত; এবং এই ধরনের আদেশ অমান্য করার চেষ্টাও তার পক্ষে শুভ হত না; এই বাড়ি তার পক্ষে অসহনীয় করে তোলা হত এবং তাকে নিজের কুলে' (গোত্রে) 'ফিরে যেতে হত অথবা—প্রায়ই যা ঘটত—অপর একটি কুলে নতুন বিবাহ পাততে হত। যেমন অন্য সর্বত্র, তেমনি কুলের' (গোত্রের) 'মধ্যেও মেয়েরাই প্রবল ক্ষমতাশালী। প্রয়োজনমতো সর্দারের মাথা থেকে, তাদের ভাষায়, শিঙ ভেঙে দিয়ে তাকে সাধারণ যোদ্ধাদের সারিতে নামিয়ে দিতেও তারা ইতস্তত করত না।'

সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালীতে সকল অথবা অধিকাংশ নারীই এক ও অভিন্ন গোত্রজ, আর পুরুষরা ছিল বিভিন্ন গোত্র থেকে আগত—এ অবস্থায়ই আদিম যুগে সাধারণদৃষ্ট নারী আধিপত্যের বাস্তব ভিত্তি; আর এটির আবিষ্কারই বাখোফেনের তৃতীয় মহৎ অবদান।—অধিকন্তু এসঙ্গে আরও যোজ্য যে, পর্যটক ও মিশনারিদের বিবরণে উল্লিখিত বন্য ও বর্বরদের মধ্যে মেয়েদের উপর চাপানো অত্যধিক শ্রমের তথ্যটি উপরোক্ত বক্তব্যের বিরোধী নয়। যে কারণগুলি দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে শ্রমবিভাগ নিয়ন্ত্রিত তা সমাজে স্ত্রীলোকের স্থাননির্ধারক কারণ থেকে একেবারেই আলাদা। যেসব জাতির নারীরা আমাদের বিবেচনায় মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রমে বাধ্য তারা প্রায়শই যে প্রকৃত শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে তা ইউরোপীয়দের নিজ নারীদের দেয় মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশি। সভ্যতার যুগের যে মহিলা কৃত্রিম মর্যাদায় বেষ্টিত ও সমস্ত বাস্তব কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন, তার সামাজিক অবস্থান বর্বরযুগের কঠোরশ্রমী নারীর চেয়ে ঢের নীচে, বর্বরযুগের যে নারী স্বজাতির মধ্যে

সত্যিকার মহিলা (lady, frowa, Frau=কর্ত্রী) হিসেবে গণ্যা ছিল এবং তা তার সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রকৃতির দৌলতে।

জোড়বাঁধা পরিবার বর্তমান সময়ে আমেরিকায় সমষ্টি-বিবাহকে সম্পূর্ণভাবে স্থানচ্যুত করেছে কি না জানতে হলে উত্তর-পশ্চিম এবং বিশেষত দক্ষিণ আমেরিকার যে জাতিগুলি এখনও বন্যাবস্থার ঊর্ধ্বস্তরে আছে তাদের মধ্যে যথাযথ অনুসন্ধান প্রয়োজন। এই শেষোক্তদের মধ্যে যৌনস্বাধীনতার এতসব দৃষ্টান্তের বিবরণ পাওয়া যায়, যাতে মোটেই মনে করা চলে না যে পুরানো সমষ্টি-বিবাহ পুরোপুরি দমিত হয়েছে। অন্তত পক্ষে, এর সমস্ত চিহ্ন অদ্যাবধিও লুপ্ত হয় নি। উত্তর আমেরিকার কমপক্ষে চল্লিশটি উপজাতির মধ্যে কোনো পুরুষ একটি পরিবারের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিয়ে করলে তার বাকি বোনেরাও প্রাপ্তবয়স্কা অবস্থায় তার স্ত্রীরূপে গণ্য — যা একদল ভগিনীর আগেকার যৌথ পতি প্রথার জের। এবং বানক্রফ্‌ট বলেছেন যে, বন্যাবস্থার ঊর্ধ্বস্তরবর্তী কালিফোর্নিয়া উপদ্বীপের অধিবাসীদের কয়েকটি উৎসব আছে যেখানে কয়েকটি 'উপজাতি' নির্বিচার যৌনসম্পর্কের উদ্দেশ্যেই একত্রিত হয়। এই গোত্রীয় উৎসবগুলি যে এদের কাছে সেই অতীত দিনের অস্পষ্ট স্মৃতি যখন একটি গোত্রের সকল নারী অন্য গোত্রের সকল পুরুষকে স্বামী এবং সে গোত্রের পুরুষেরা অন্যতর গোত্রের সমস্ত নারীদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করত, তা সহজবোধ্য। তেমন প্রথা আজও অস্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত। কয়েকটি জাতির মধ্যে দেখা যায় যে, বয়ঃবৃদ্ধ পুরুষ, নৃপতি ও যাদুকর-পুরোহিতরা নিজ স্বার্থে যৌথ স্ত্রী প্রথার সুযোগে বেশির ভাগ নারীকেই নিজ একচেটিয়া অধিকারে রাখে; কিন্তু তারাও কোনো কোনো উৎসব এবং বৃহৎ জনজমায়েতের সময় পুরাতন সমষ্টি-সঙ্গম অনুমোদন করতে বাধ্য হয় এবং বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষসম্ভোগের জন্য নিজ স্ত্রীদের ছেড়ে দেয়। ভেস্তের্মার্ক তাঁর বইয়ে (২৮-২৯ পৃঃ দ্রঃ) প্রায়শই সংঘটিত এরূপ স্যাটার্ন উৎসবের (১১) ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যখন স্বল্পকালের জন্য সাবেকী অবাধ যৌনমিলন বলবৎ হয়, যেমন, ভারতবর্ষে হো, সাঁওতাল, পাঞ্জা ও কোটারদের মধ্যে এবং আফ্রিকার কিছু উপজাতির মধ্যে, ইত্যাদি। কিন্তু যখন এসব দেখে ভেস্তের্মার্ক সিদ্ধান্ত করেন যে এগুলি, তাঁর অননুমোদিত সেই সমষ্টি-বিবাহের লুপ্তাবশেষ নয়, পরন্তু তা পশু ও

আদিম মানুষের মধ্যে সমভাবে প্রচলিত সঙ্গম-ঋতুরই জের, তখনই অবাক হতে হয়।

এবার আমরা বাখোফেনের চতুর্থ মহৎ আবিষ্কার — সমষ্টি-বিবাহ থেকে জোড়বাঁধা বিবাহে উত্তরণের বহু অন্তর্বর্তী প্রকারভেদে পেঁছই। বাখোফেনের বর্ণনায় যা দেবতাদের সনাতন নির্দেশ লঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত শেষে নারীর পাতিব্রত্যের অধিকারক্রয়, সেটি আসলে আদিম সমাজের সমষ্টিভিত্তিক পতিসম্ভোগ থেকে মুক্ত হয়ে একটি পুরুষের স্ত্রী হওয়ার অধিকার অর্জনের প্রায়শ্চিত্তেরই রহস্যাবৃত প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রায়শ্চিত্তে পরপুরুষে সীমিত পরিসর আত্মদান রীতি অভিব্যক্ত: বাবিলন নারীদের মিলিটা মন্দিরে বছরে একদিন করে আত্মদান করতে হত; মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য উপজাতি তাদের কন্যাদের কয়েক বছরের জন্য আনাইটিস মন্দিরে পাঠাত, যেখানে নিজেদের বাছাই করা পুরুষের সঙ্গে অবাধ যৌনসম্পর্কের পর তারা বিবাহের অনুমতি পেত; ভূমধ্যসাগর থেকে গঙ্গার উপকূল পর্যন্ত এশিয়ার প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যে ধর্মের আবরণে এই ধরনের প্রথা লক্ষণীয়। কালক্রমে মুক্তির জন্য প্রায়শ্চিত্তমূলক আত্মবলিও হালকা হয়ে আসে, যা বাখোফেনও লিখেছেন:

> 'বার্ষিক আত্মদানের বদলে একবার মাত্র আত্মদান চালু হয়; বিবাহিতা নারীর হেটায়ারিজমের স্থলে দেখা দেয় কুমারীদের হেটায়ারিজম, বিবাহিত পর্বে তার আচরণ প্রতিস্থাপিত হয় বিবাহপূর্ব আচরণে, সকলের কাছে নির্বিচার আত্মদানের বদলে আসে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কাছে আত্মদান' ('মাতৃ-অধিকার', ১৯ পৃঃ)।

অন্যান্য কিছুসংখ্যক জাতির মধ্যে আবার ধর্মের এ আবরণটি নেই; কোনো কোনো জাতির মধ্যে, যেমন পুরাকালের থ্রেশিয়ান, কেল্ট প্রভৃতি, ভারতবর্ষের বহু আদিবাসী, মালয়ের জাতিগুলি, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী এবং আমেরিকার অনেক ইন্ডিয়ানদের মধ্যে আজও মেয়েদের বিবাহপূর্ব প্রভূত যৌনস্বাধীনতা প্রচলিত। দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই তা সহজলক্ষ্য। যেকোনো ব্যক্তি সেদেশের কিছুটা ভিতরে গিয়েছেন, তিনিই কথাটির সত্যতা স্বীকার করবেন। ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত একটি ধনী পরিবার সম্পর্কে আগাসিজের ('ব্রাজিল ভ্রমণ', বস্টন-নিউ ইয়র্ক, ১৮৮৬, ২৬৬ পৃঃ) নিম্নলিখিত বিবরণটি স্মরণীয় যখন তাঁকে পরিবারের

মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হল এবং তিনি মেয়ের বাবার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিযুক্ত একজন অফিসার ঐ বালিকার মায়ের স্বামীই হচ্ছে তার বাবা,—তখন মা হেসে উত্তর দিলেন: naõ tem pai, é filha da fortuna— ওর কোনো বাপ নেই, সে দৈবাৎ হয়েছে।

'এভাবেই ইণ্ডিয়ান অথবা সংকর নারী এদেশে তাদের অবৈধ সন্তানদের পরিচয় দেয়, এতে কোনো অন্যায় বা লজ্জার কিছু আছে বলে তারা মনে করে না। এটি মোটেই একটি অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, পরন্তু উল্টোটাই ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। শিশুরা... প্রায়ই তাদের মা'কে কেবল জানে, কারণ সমস্ত যত্ন ও দায়িত্ব মা'কেই পালন করতে হয়; তাদের বাপ সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না, আর সেই মা বা তার সন্তানদের কারও মনেই হয় না যে, বাপের উপর তাদের কোনো দাবিদাওয়া আছে।'

সভ্য মানুষের কাছে যা নিতান্ত অদ্ভুত মনে হয়, মাতৃ-অধিকার ও সমষ্টি-বিবাহ অনুসারে সেটিই বাঁধা রীতি।

কোনো কোনো জাতির মধ্যে আবার বরের বন্ধু ও আত্মীয়েরা অথবা বরযাত্রীরা বিবাহের সময়ই বধূর উপর তাদের চিরাচরিত অধিকার খাটায় এবং পাত্রের পালা আসে সবশেষে; উদাহরণস্বরূপ, পুরাকালীন বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে এবং আফ্রিকার অজিল এবং অদ্যাবধি আবিসিনিয়ার বারেয়া জাতির মধ্যে এর প্রচলন দেখা যায়। অন্য কোনো কোনো জাতির মধ্যে আবার একজন কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তি—উপজাতি প্রধান অথবা গোত্রপতি, নৃপতি, ওঝা, পুরোহিত, প্রিন্স অথবা যে উপাধিই হোক না কেন — ইনিই সমস্ত সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং বধূর সঙ্গে প্রথম রাত্রি যাপনের অধিকার ভোগ করেন। নিওরোম্যাণ্টিক চিন্তাধারার হাজার চুণকাম সত্ত্বেও এই ঘটনা, jus primae noctis,* আজও পর্যন্ত আলাস্কার অধিকার অধিকাংশ বাসিন্দা (বানক্রফ্‌ট, 'আদিম উপজাতি', ১ খণ্ড, ৮১ পৃঃ), উত্তর মেক্সিকোর তাহু জাতি (উক্ত গ্রন্থ, ৫৮৪ পৃঃ) এবং অন্য জাতিগুলির মধ্যে সমষ্টি-বিবাহের লুপ্তাবশেষ হিসেবে টিকে আছে; এবং প্রথাটি গোটা মধ্যযুগে, অন্ততপক্ষে মূল কেল্টিক দেশগুলিতে ছিল, যেখানে এটি সরাসরি সমষ্টি-বিবাহ থেকেই এসেছিল, যেমনটি ঘটেছে আরাগনে। কাস্তিলিয়ার কৃষক কোনোদিনই

* প্রথম রাত্রির অধিকার। — সম্পাঃ

ভূমিদাস ছিল না, আরাগনে কিন্তু ফার্ডিন্যান্ড ক্যাথলিক ১৪৮৬ সালে এই প্রথা রদ করার পূর্বাবধি অত্যন্ত জঘন্য আকারে ভূমিদাস প্রথা প্রচলিত ছিল (১২)। সরকারী আইনটিতে বলা হয়েছে:

'আমরা এই রায় দিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লিখিত মহোদয়গণ' (সেনিওর, ব্যারন) '...আর কৃষকগণ কর্তৃক বিবাহিত বধূদের সহিত প্রথম রাত্রি যাপন করিতে অথবা বিবাহের রাত্রে পাত্রী শয্যায় শুইবার পর নিজ কর্তৃত্বের চিহ্নস্বরূপ শয্যা ও পাত্রীকে মাড়াইয়া যাইতে পারিবে না; অথবা উপরোক্ত মহোদয়গণ কৃষকের সন্তানসন্ততির ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিনা মূল্যে অথবা মূল্য দিয়া তাহাদিগের সেবা গ্রহণ করিতে পারিবে না' (ক্যাটালনীয় লিপি থেকে উদ্ধৃত; জুগেন্‌হাইম, 'ভূমিদাস প্রথা', সেন্ট-পিটার্সবুর্গ, ১৮৬১, ৩৫৫ পৃঃ)।

বাখোফেন যেখানে জোর করে বলেছেন যে তাঁর কথিত 'হেটায়ারিজম' অথবা 'পাপনিষেক' থেকে একপতিপত্নী প্রথা মূলত নারীদের চেষ্টাতেই এসেছিল, সেখানেও তিনি সম্পূর্ণ নির্ভুল। জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশের ফলে অর্থাৎ আদিম সাম্যতন্ত্রী ব্যবস্থার অবনতি ও জনসংখ্যার ঘনত্ববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারী যৌনসম্পর্কগুলি যতই তার আদিম আরণ্যক চরিত্র হারিয়ে ফেলতে থাকল, মেয়েদের কাছে অবশ্যই তা ততই অধিকতর হীন ও পীড়নমূলক হয়ে উঠেছিল এবং ততই সাগ্রহে তারা পরিত্রাণ হিসেবে পাতিব্রত্যের অধিকার, একটি পুরুষের সঙ্গে অস্থায়ী অথবা স্থায়ী বিবাহ প্রত্যাশা করেছিল। এই অগ্রগতি পুরুষাশ্রিত হতে পারে না, এবং তা অন্তত এই কারণে যে, তারা কোনোদিন, এমন কি আজও আসল সমষ্টি-বিবাহের সুবিধা ত্যাগের কথা স্বপ্নেও কামনা করে না। মেয়েদের চেষ্টায় জোড়বাঁধা বিবাহের উদ্ভব ঘটলেই শুধু পুরুষরা কড়াকড়িভাবে একগামিতা প্রচলন করতে পারল—অবশ্য কেবলমাত্র নারীদের পালনীয় হিসেবেই।

জোড়বাঁধা পরিবার দেখা দেয় বন্যাবস্থা ও বর্বরতার সীমারেখায়, প্রধানত বন্যাবস্থার ঊর্ধ্বস্তরে এবং কোথাও কোথাও বর্বরতার নিম্নস্তরে। পরিবারের এই রূপটিই বর্বরযুগের বৈশিষ্ট্য, ঠিক যেমনটি সমষ্টি-বিবাহ বন্যাবস্থার এবং একগামিতা সভ্যতার চারিত্র্য। স্থায়ী একগামিতায় উত্তরণে এর অধিকতর বিকাশের জন্য ইতিপূর্বে সক্রিয় কারণগুলি ছাড়াও পৃথক

কারণের প্রয়োজন ছিল। জোড়বাঁধা পরিবারে সমষ্টি ইতিমধ্যেই তার শেষ একক, তার দুই পরমাণুসমন্বিত একটি অণু — এক পুরুষ ও এক নারীতে খর্বিত। প্রাকৃতিক নির্বাচন ক্রমাগত সমষ্টি-বিবাহের পরিধি কমিয়ে কমিয়ে তার কর্তব্য সমাপ্ত করেছে; এদিকে তার করণীয় আর কিছুই ছিল না। তাই কোনো নতুন **সামাজিক** চালিকাশক্তি সক্রিয় না হলে জোড়বাঁধা পরিবার থেকে নতুনতর এক প্রকার পরিবার উদ্ভবের কোনো কারণ থাকত না। কিন্তু চালিকাশক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠল।

জোড়বাঁধা পরিবারের চিরায়ত জন্মভূমি আমেরিকার কথা এবার থাক। এখানে পরিবারের উচ্চতর কোনো রূপ বিকশিত হয়েছিল অথবা এই মহাদেশ আবিষ্কার ও বিজয়ের পূর্বে এখানে কোথাও কখনও কঠোর একগামিতার প্রচলন ছিল এরূপ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কোনো সাক্ষ্য মেলা দুষ্কর। প্রাচীন গোলার্ধে কিন্তু ব্যাপারটি অন্যরূপ।

এখানে পশুপালন এবং পশুযূথের বংশবৃদ্ধি মাধ্যমে তদবধি অপ্রত্যাশিত সম্পদের উৎস এবং সম্পূর্ণ নতুন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠল। বর্বরতার নিম্নস্তর পর্যন্ত স্থায়ী সম্পদ বলতে ছিল ঘরবাড়ির প্রায় সবটুকু, পরিধেয়, স্থূল অলঙ্কার এবং খাদ্য সংগ্রহ ও প্রস্তুতের হাতিয়ার: নৌকা, অস্ত্রশস্ত্র এবং সরলতম গার্হস্থ্য তৈজসপত্র। নতুন খাদ্যসংগ্রহ প্রাত্যহিক কর্ম ছিল। আর এখন ঘোড়া, উট, গাধা, গোরু, ভেড়া, ছাগল ও শূকরের দল নিয়ে অগ্রগামী পশুপালক জাতিগুলি—ভারতবর্ষের পঞ্চনদ ও গঙ্গার এলাকা, তথা অক্সাস ও জাক্সার্টিসের তখনকার পর্যাপ্ত জলসিঞ্চিত স্তেপভূমির আর্যগণ এবং ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী সেমিটরা যে সম্পদ অর্জন করেছিল, যেজন্য শুধু তদারকি ও নিতান্ত প্রাথমিক যত্নেই ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় প্রজনন, দুধ ও মাংসের সমৃদ্ধতম খাদ্যলাভ সম্ভব হত। খাদ্যসংগ্রহের সমস্ত পূর্বকালীন পদ্ধতি অতঃপর পশ্চাদ্ভূমিতে বিলীন এবং একদা অপরিহার্য বন্য পশু শিকার বিলাসে পর্যবসিত হল।

কিন্তু এই নতুন সম্পদের অধিকারী ছিল কারা? নিঃসন্দেহে, শুরুতে গোত্রের অধিকারেই ছিল। কিন্তু খুব গোড়ার দিকেই সম্ভবত পশুযূথের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা দিয়েছিল। মোজেসের তথাকথিত প্রথম পুস্তকের রচয়িতার কাছে পিতৃপুরুষ অ্যাব্রাহাম পশুযূথের মালিক হিসেবে যেভাবে

প্রতীয়মান হয়েছিলেন, সেটা একটা পারিবারিক গোষ্ঠীকর্তার স্বীয় অধিকারে, নাকি একটি গোত্রের বংশপরম্পরাগত সত্যিকার নৃপতির পদমর্যাদা বলে, তা বলা খুবই কঠিন। একটি বিষয় কিন্তু সন্দেহাতীত এবং সেটি এই যে আধুনিক শব্দার্থে তাঁকে সম্পত্তির মালিক মনে করা সঙ্গত নয়। প্রামাণ্য ইতিহাসের সূচনাতেই সর্বত্র পশুযূথগুলি যে ইতিমধ্যেই পরিবারের কর্তাদের পৃথক সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল তাও সমভাবেই সত্য, ঠিক যেমনটি বর্বরযুগের শিল্পসামগ্রী, ধাতুনির্মিত তৈজসপত্র, বিলাসদ্রব্য এবং, সবশেষে, মানবিক পশুদল অর্থাৎ ক্রীতদাসেদেরও ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

দাস প্রথার উদ্ভাবনও ততদিনে সুসম্পূর্ণ। বর্বরতার নিম্নস্তরে ক্রীতদাস নিষ্প্রয়োজনীয়। তাই বিকাশের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে পরাজিত শত্রুর প্রতি আচরণ থেকে আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের আচরণ ভিন্নতর ছিল। পুরুষরা নিহত অথবা বিজয়ী উপজাতিতে ভ্রাতৃবৎ গৃহীত হত; নারীদের বিবাহ মাধ্যমে অথবা অনুরূপ অন্য কোনো উপায়ে বেঁচে যাওয়া সন্তানসহ তাদের নিজ উপজাতিতে গ্রহণ করা হত। এই স্তরে মানুষের শ্রমশক্তি ভরণপোষণের বাড়তি উল্লেখ্য কিছুই উৎপাদন করত না। পশুপালন, ধাতুকর্ম, বয়নশিল্প এবং সবশেষে ক্ষেতকর্ষণ প্রবর্তনের সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। যেমন এককালের অতি সুলভ স্ত্রীদের বর্তমান বিনিময়মূল্য দেখা দিল এবং তাদের ক্রয় শুরু হল, তেমনই শ্রমশক্তির ক্ষেত্রেও তাই ঘটল, বিশেষত পশুযূথগুলি শেষ অবধি পারিবারিক সম্পত্তি হয়ে ওঠার পর। পরিবারের বৃদ্ধি গবাদি পশুর মতো এত দ্রুত ঘটে নি। পশুপালনের জন্য বেশি লোকের দরকার হত; যুদ্ধবন্দীরা ঠিক এই উদ্দেশ্যেই কাজে লাগত এবং উপরন্তু ঠিক গবাদি পশুর মতোই এদেরও প্রজনন সম্ভবপর ছিল।

এমন সম্পদ্ এক-একটি পরিবারের মালিকানাধীন হবার পর এবং সেখানে দ্রুত বৃদ্ধির ফলে সে জোড়বাঁধা বিবাহ ও মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার উপর দারুণ আঘাত হানল। জোড়বাঁধা বিবাহ পরিবারের মধ্যে একটি নতুন উপাদান সংযোজিত করেছিল। এই ব্যবস্থায় গর্ভধারিণী মায়ের পাশে জন্মদাতা প্রামাণ্য পিতাকেও পাওয়া যেত, যিনি আধুনিক যুগের অনেক 'পিতা'র চেয়ে সম্ভবত বেশি প্রামাণ্য ছিলেন। পরিবারের তৎকালীন শ্রমবিভাগের ধারানুযায়ী খাদ্যসংগ্রহ এবং সেজন্য

প্রয়োজনীয় উপকরণের ভার তথা শেষোক্তগুলির মালিকানাও ছিল পুরুষদের; বিবাহবিচ্ছেদ হলে পুরুষেরা এগুলি নিয়ে যেত, ঠিক যেমন নারীরা পেত গৃহস্থালীর সমস্ত জিনিসপত্র। তখনকার সমাজব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী পুরুষ খাদ্যদ্রব্যের নতুন উৎস অর্থাৎ গবাদি পশু ও পরে শ্রমের নতুন হাতিয়াররূপে ক্রীতদাসদেরও মালিক ছিল। কিন্তু ঐ সমাজরীতি অনুসারেই পুরুষের সন্তানসন্ততি উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃসম্পত্তি পেত না, কারণ এ ব্যাপারে অবস্থাটি ছিল নিম্নরূপ:

মাতৃ-অধিকার, অর্থাৎ যতদিন একমাত্র মাতৃধারায় বংশপরম্পরা নির্ণীত হত এবং গোত্রের আদি উত্তরাধিকার প্রথা অনুযায়ী, গোত্রের কেউ মারা গেলে গোত্রভুক্ত আত্মীয়রা তার সম্পত্তির মালিক হত। সম্পত্তির গোত্রভুক্তি অপরিহার্য ছিল। প্রথম দিকে, আলোচ্য সম্পত্তি অকিঞ্চিৎকর বিধায় সম্ভবত তা গোত্রের নিকটতম আত্মীয়, অর্থাৎ মাতৃপক্ষের রক্তসম্পর্কিতদের দখলভুক্ত হত। মৃত পুরুষের সন্তানসন্ততি কিন্তু তার স্বগোত্রীয় নয়, তারা মায়ের গোত্রভুক্ত। গোড়ার দিকে তারা মায়ের রক্তসম্পর্কিত অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে একত্রে মাতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত, এবং সম্ভবত পরে তারা এ সম্পত্তির প্রথম দাবীদার হয়েছিল; কিন্তু তারা পিতৃসম্পত্তি পেত না, কারণ তারা পিতার গোত্রভুক্ত ছিল না এবং সম্পত্তিটি সেই গোত্রের মধ্যে থাকারই নিয়ম ছিল। অতএব পশুযূথের মালিকের মৃত্যুতে পশুযূথের মালিকানা যেত প্রথমত তার ভাই ও বোন এবং বোনের ছেলেমেয়ে অথবা তার মাসীদের ছেলেমেয়েদের দখলে। আর তার নিজ ছেলেমেয়ে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হত।

এভাবে সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন পরিবারে স্ত্রীর তুলনায় পুরুষের প্রতিষ্ঠা বাড়ল তেমনি পক্ষান্তরে তার বর্তমান শক্তিশালী সামাজিক অবস্থার জোরে নিজের সন্তানসন্ততির স্বপক্ষে প্রচলিত উত্তরাধিকার প্রথা পরিবর্তনের উদ্দীপনাও সঞ্চারিত হল। কিন্তু মাতৃ-অধিকারভিত্তিক বংশধারার আওতায় তা অসম্ভব ছিল। তাই প্রথাটি পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল এবং তাই করা হল। আর কাজটি আজ যত কঠিন মনে হয়, সেকালে তা তেমন কিছু শক্ত ছিল না। কারণ, বিপ্লবটি মানব অভিজ্ঞতার অন্যতম চূড়ান্ত বিপ্লব হওয়া সত্ত্বেও এতে গোত্রের কোনো জীবিত সদস্যের কোনো

অবস্থান্তর ঘটাবারই প্রয়োজন হয় নি। সকলেই পূর্ববৎ স্বস্থানে থাকতে পারত। এই সহজ সিদ্ধান্তটুকুই যথেষ্ট যে, ভাবী প্রজন্মের সন্তানসন্ততি তারই গোত্রভুক্ত, কিন্তু নারীর সন্তানসন্ততি গোত্রচ্যুত এবং তাদের পিতৃ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হবে। এভাবে মাতৃপক্ষীয় বংশপরম্পরা নির্ণয় এবং সম্পত্তি উত্তরাধিকারের উচ্ছেদ ঘটল এবং পিতৃপক্ষীয় বংশপরম্পরা নির্ণয় ও সম্পত্তি উত্তরাধিকার প্রবর্তিত হল। সভ্য জাতিগুলির মধ্যে কবে এবং ঠিক কীভাবে বিপ্লবটি ঘটেছিল আমরা তার কিছুই জানি না। এটি সম্পূর্ণ প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্তর্গত। কিন্তু এমন বিপ্লব যে সত্যিই **ঘটেছিল** তা মাতৃ-অধিকারের অসংখ্য লুপ্তাবশেষ, বিশেষত বাখোফেন সংগৃহীত তথ্যাদি থেকে সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত হয়। কত সহজে যে বিপ্লবটি ঘটে তা গোটাকতক ইন্ডিয়ান উপজাতির মধ্যেই চোখে পড়ে; অংশত সম্পদবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রা প্রণালীর পরিবর্তনের (বনজঙ্গল থেকে প্রান্তরে বসবাস) ফলে এবং অংশত সভ্যতা ও মিশনারিদের নৈতিক প্রভাবে অতি সম্প্রতি এদের মধ্যে ব্যাপারটি ঘটেছে এবং এখনও ঘটে চলেছে। মিসুরী অববাহিকার আটটি উপজাতির ছয়টিতে পিতৃপক্ষীয় এবং দুটিতে আজও মাতৃপক্ষীয় বংশানুসৃতি ও তদনুযায়ী উত্তরাধিকার বজায় আছে। পিতৃসম্পত্তির অধিকারী করার জন্য শনী, মিয়ামি ও ডেলওয়ার উপজাতিগুলির মধ্যে সন্তানসন্ততির পিতৃগোত্রীয় নামকরণক্রমে পিতার গোত্রভুক্ত করার প্রথা প্রচলিত হয়েছে। 'নাম বদলে বস্তু বদলের স্বাভাবিক মানবীয় কারচুপি! যেখানেই প্রত্যক্ষ স্বার্থের যথেষ্ট প্রেরণা থাকে, সেখানেই কোনো ছিদ্র ধরে প্রচলিত ঐতিহ্যের মধ্যেই ঐতিহ্য ভাঙা!' (মার্কস)। ফলত অসম্ভব গোলমাল পাকিয়ে উঠল এবং তখন তার সমাধান ব্যতীত কোনো গত্যন্তর না থাকায় আংশিক সমাধানও করা হল এবং তা পিতৃ-অধিকারে উত্তরণ মাধ্যমে। 'এটিই মনে হয় সবচেয়ে স্বাভাবিক পরিবর্তন' (মার্কস)। প্রাচীন গোলার্ধের সভ্য জাতিগুলির মধ্যে কীভাবে এই পরিবর্তন ঘটেছিল সে বিষয়ে তুলনামূলক আইন বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য অবশ্য নিতান্ত প্রকল্পমাত্র — ম. কভালেভ্স্কির 'পরিবার ও সম্পত্তির উৎপত্তি ও বিবর্তনের রূপরেখা', স্টকহোম, ১৮৯০ দ্রষ্টব্য।

মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদ **নারী জাতির এক বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরাজয়।** পুরুষ গৃহস্থালীর কর্তৃত্বও দখল করল, নারী হল পদানত, শৃঙ্খলিত,

পুরুষের লালসার দাসী, সন্তানসৃষ্টির যন্ত্রমাত্র। নারীর এই অবনত অবস্থা যা বিশেষভাবে বীরযুগের এবং ততোধিক চিরায়ত যুগের গ্রীকদের মধ্যে পরিস্ফুট, তাই ক্রমে পালিশ এবং আংশিক রূপান্তরণে মোলায়েম হয়েছে, কিন্তু মোটেই লুপ্ত হয় নি।

এভাবে প্রতিষ্ঠিত একচ্ছত্র পুরুষ শাসনের প্রথম পরিণামস্বরূপ তৎকালে উদীয়মান মধ্যবর্তী রূপটি পিতৃপ্রধান পরিবারেই সহজলক্ষ্য। বহুপত্নী প্রথা নয় (প্রথাটি সম্পর্কে পরে বলা হবে), পরন্তু

'পরিবারের প্রধানস্বরূপ পিতৃক্ষমতাধীনে কিছুসংখ্যক স্বাধীন ও পরাধীনকে একটি পরিবারে সংগঠিত করাই এর মূল বৈশিষ্ট্য। সেমিট রীতিতে এই পরিবারের প্রধান বহুপত্নীক, গোলামরাও নিজ নিজ স্ত্রী ও সন্তানের অধিকারী এবং সমগ্র পরিবারটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলবিশেষে পশুপালনের লক্ষ্যেই সংগঠিত।'*

দাস গোলাম ও পিতৃক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মূল বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত এই ধরনের পরিবারের পূর্ণাঙ্গ রূপ রোমান পরিবারেই প্রকটিত। শুরুতে familia শব্দার্থে আমাদের আধুনিক কূপমণ্ডূকদের যা আদর্শ, সেই ভাবপ্রবণতা ও সংসারিক ঝগড়াঝাঁটির সমাহারগত কোনো তাৎপর্য বিধৃত ছিল না; এমন কি রোমানদের মধ্যে গোড়ার দিকে এতে বিবাহিত দম্পতি ও তাদের সন্তানসন্ততিকেও নয়, শুধু গোলামদেরই বোঝাত। Famulus মানে একজন ঘরোয়া দাস এবং familia মানে ব্যক্তিবিশেষের অধিকারভুক্ত সমস্ত ক্রীতদাস। এমন কি গেয়াসের সময় পর্যন্ত familia, id est patrimonium (অর্থাৎ উত্তরাধিকার) উইল করে অর্সানো হত। রোমানরা একটি নতুন ধরনের সামাজিক সংগঠন বোঝাবার জন্য এই শব্দটি আবিষ্কার করে,—এতে পরিবার প্রধানের অধীনে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি এবং কয়েকজন গোলাম থাকত, আর রোমানদের পিতৃক্ষমতা অনুযায়ী তিনি ছিলেন সকলের দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

'অতএব এই শব্দটি ল্যাটিন উপজাতিগুলির বর্মাবৃত পারিবারিক প্রথার চেয়ে পুরানো নয়, যা চাষবাস ও বিধিবদ্ধ দাস প্রথার সূচনার পর এবং গ্রীক ও আর্যবংশীয় ইটালিক জাতিগুলি পৃথক হয়ে যাওয়ার উদ্ভূত হয়েছে।'**

---

* L. H. Morgan. 'Ancient Society', London, 1877, pp. 465-466.—সম্পাঃ

** ঐ, ৪৭০ পৃঃ। — সম্পাঃ

এর সঙ্গে মার্কস যোগ করেছেন: 'আধুনিক পরিবারের মধ্যে ভ্রূণাবস্থায় শুধু দাসত্ব (servitus) নয়, পরন্তু ভূমিদাসত্বও আছে, কারণ জন্মলগ্ন থেকেই এটি কৃষি বেগারির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। পরবর্তী যুগে সমাজ ও তার রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘটিতব্য সকল ব্যাপক বিরোধই **ক্ষুদ্রাকারে** এর অন্তর্গত আছে।'

এধরনের পরিবারই জোড়বাঁধা পরিবার থেকে একগামিতায় উত্তরণের অন্তর্বর্তী স্তরস্বরূপ। নারীর সতীত্ব অর্থাৎ সন্তানের পিতৃত্বের নিশ্চয়তার জন্য নারীকে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের অধীন করা হয়; আপন স্ত্রীর হত্যাও এক্ষেত্রে নিজ অধিকারপ্রয়োগ হিসেবে গ্রাহ্য।

পিতৃপ্রধান পরিবারের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা লিখিত ইতিহাসের যুগে তথা এমন একটি ক্ষেত্রে পৌঁছই যেখানে তুলনামূলক আইনবিচার পদ্ধতি থেকে আমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যলাভ সম্ভব। বস্তুত, এর ফলেই আমাদের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। পিতৃপ্রধান পারিবারিক গোষ্ঠী, যেগুলি সার্ভ ও বুলগারদের মধ্যে Zádruga (মিতালির সমার্থক কিছু একটা) অথবা Bratstvo (ভ্রাতৃত্ব) নামে এবং প্রাচ্য জাতিগুলিতে সামান্য পরিবর্তিত আকারে আজও প্রচলিত সেগুলিই যে সমষ্টি-বিবাহে উদ্ভূত মাতৃ-অধিকারভিত্তিক পরিবার ও আধুনিককালের পরিচিত একক পরিবারের অন্তর্বর্তী পর্যায় তা প্রমাণের জন্য আমরা মাক্সিম কভালেভ্স্কির নিকট ঋণী ('পরিবার ও সম্পত্তির উৎপত্তি ও বিবর্তনের রূপরেখা', স্টকহোম, ১৮৯০, ৬০-১০০ পৃঃ)। অন্তত পক্ষে, প্রাচীন গোলার্ধের সভ্য জাতিগুলি, আর্য ও সেমিটদের ক্ষেত্রে এটি প্রমাণিত বলে মনে হয়।

দক্ষিণী স্লাভদের 'জাদ্রুগা' পারিবারিক গোষ্ঠীর একটি প্রকৃষ্টতম বিদ্যমান উদাহরণ। এই পরিবার একজন পিতার কয়েক পুরুষের পুত্রপ্রপৌত্র ও তাদের স্ত্রীদের নিয়ে গঠিত, সকলেই এক গৃহস্থালীর অন্তর্ভুক্ত, তারা একত্রে জমি চাষ করে, একই সাধারণ ভাঁড়ার থেকে খাওয়াপরা চালায় এবং সমবেতভাবে সমস্ত উদ্বৃত্ত জিনিসের অধিকারী হয়। এধরনের গোষ্ঠীতে একজন মাত্র গৃহকর্তার (domàćin) চূড়ান্ত আধিপত্য স্বীকৃত, যিনি বাহিরে গোষ্ঠীর প্রতিনিধি, ছোটখাট বিষয়ের নিষ্পত্তিকারী এবং আর্থিক ব্যবস্থাপক বিধায় তিনিই এই তহবিল এবং সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনার জন্য দায়ী। তাঁকে নির্বাচিত হতে হয় এবং এতে বয়োজ্যেষ্ঠতা সবসময় অপরিহার্য

নয়। পরিবারের মেয়ে ও তাদের কাজকর্ম পরিচালনা করেন গৃহকর্ত্রী (domácica), যিনি সাধারণত ঐ গৃহকর্তারই স্ত্রী। মেয়েদের স্বামী নির্বাচনে তাঁর মত খুবই গুরুত্বপূর্ণ কখনও-বা সিদ্ধান্তমূলক। সমস্ত পূর্ণবয়স্ক সদস্য, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়দের নিয়ে গঠিত পারিবারিক সংসদের উপরই কিন্তু গোষ্ঠীর চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত। এই সভার সামনে গৃহকর্তা তাঁর কাজের হিসাব দেন; এই সভা শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সভ্যদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করে; কোনো গুরুত্বপূর্ণ ক্রয়বিক্রয়, বিশেষত জমিজমা, প্রভৃতি সম্বন্ধে এখানেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রাশিয়াতেও এই ধরনের বৃহৎ পারিবারিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রমাণ হয়েছে মাত্র বছর দশেক আগে;* রুশদেশের লোকাচারে গ্রাম্য 'ওব্শিচনা' বা গ্রামগোষ্ঠীর মতোই এগুলি দৃঢ়মূল বলে এখন সাধারণভাবে স্বীকৃত। ডাল্‌মেসীয় আইনবিধির (১৩) একই পরিভাষায় (vervj),** রাশিয়ার প্রাচীনতম আইনসংহিতা — ইয়ারোস্লাভের 'প্রাভদা' (ন্যায়)-এ এবং পোলিশ ও চেকদের ঐতিহাসিক সূত্র থেকে এদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

হৈস্লারের মতে ('জার্মান অধিকার প্রথা') জার্মানদের মধ্যে আদিতে যে অর্থনৈতিক একক ছিল সেটা আধুনিক অর্থে একক পরিবার নয়, পরন্তু একটি 'গৃহস্থালী গোষ্ঠী' যাতে স্ব স্ব পরিবার সমেত কয়েক প্রজন্মের লোকজন এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের দাসরাও থাকত। রোম পরিবারও যে শেষ অবধি এধরনের পরিবারে এসে পৌঁছেছিল তা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং গৃহকর্তার স্বৈরক্ষমতা ও তার তুলনায় পরিবারের বাকি সভ্যদের অধিকারহীনতা সম্পর্কে সম্প্রতি জোর প্রশ্ন উঠেছে। আয়ার্ল্যান্ডের কেল্টদের মধ্যে এজাতীয় পারিবারিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব এখন অনুমিত হচ্ছে; ফ্রান্সে একেবারে ফরাসী বিপ্লবের সময় পর্যন্ত নিভের্নে'তে parçonneries নামে এগুলি টিকে ছিল এবং ফ্রাঁশ-কঁতে'তে আজও পুরোপুরি লোপ পায় নি। লুআঁ পরগনায় (সোঁ—লুয়ার জেলা) বড় বড় কৃষক গৃহস্থালী দেখা যায় যেখানে ছাদসমান উচ্চ একটি সাধারণের ব্যবহার্য কেন্দ্রীয় হল-ঘরের চারদিকে

---

* ম. কভালেভ্স্কির 'আদিম আইনগত অধিকার' গ্রন্থের প্রথম পর্ব — 'গোত্র' (মস্কো, ১৮৮৬) এখানে স্মরণ করা হয়েছে। — সম্পাঃ

** গোষ্ঠী। — সম্পাঃ

শোবার ঘর থাকে, এসব ঘরে ছয় থেকে আট ধাপের সিঁড়ি দিয়ে পেঁছিতে হয় এবং এগুলিতে একই পরিবারের কয়েক প্রজন্মের লোকজন বাস করে।

ভারতবর্ষে মহান আলেকজান্ডারের যুগে নিয়ার্কাস এই গৃহস্থালী গোষ্ঠী ও এজমালি চাষবাসের উল্লেখ করেছেন এবং এগুলি আজও সেই একই অঞ্চলে, পঞ্জাব ও সমগ্র উত্তর-পশ্চিমে বিদ্যমান। ককেশাস অঞ্চলে কভালেভ্স্কি নিজে এর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন। আলজেরিয়ার কাবিলদের মধ্যে এখনও এটি দেখা যায়। এমন কি আমেরিকাতেও এর অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করা হয়; জুরিতা বর্ণিত প্রাচীন মেক্সিকোর calpullisকে (১৪) এধরনের গৃহস্থালীর সঙ্গে অভিন্ন করে দেখাবার চেষ্টা করা হচ্ছে; পক্ষান্তরে, কুনোভ ('Das Ausland', 1890, N° 42-44 [১৫]) মোটামুটি স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করেছেন যে, পেরু বিজয়কালে সেখানে পর্যায়ক্রমিক কর্ষিত জমি বণ্টন অর্থাৎ ব্যক্তিগত চাষ, সমেত একধরনের মার্ক-সংগঠন প্রচলিত ছিল (আশ্চর্য যে এখানেও নামকরণ ছিল marca)।

সে যাহোক, জমির সাধারণ মালিকানা ও সমবেত চাষবাসের সঙ্গে সংযুক্ত পিতৃপ্রধান গৃহস্থালী গোষ্ঠী এখন পূর্বাপেক্ষা অন্যতর এক তাৎপর্য অর্জন করল। প্রাচীন গোলার্ধের সভ্য ও অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে মাতৃপ্রধান পরিবার থেকে একক পরিবারে উত্তরণের সময় এধরনের গৃহস্থালীর যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, সে সম্পর্কে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই। পরে আমরা কভালেভ্স্কির আরও একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করব, যথা: পিতৃপ্রধান গৃহস্থালী গোষ্ঠী একটি উত্তরণমূলক পর্যায়, যা থেকে আলাদা আলাদা পরিবারের চাষবাস এবং চাষজমি ও চারণভূমি প্রথমে পর্যায়ক্রমে এবং পরে স্থায়ীভাবে বিলি করার পদ্ধতি সহ গ্রামগোষ্ঠী বা মার্ক-গোষ্ঠী বিকশিত হয়েছে।

এসব গৃহস্থালী গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ পারিবারিক জীবনের ব্যাপারে অন্তত রাশিয়ার ক্ষেত্রে এটা উল্লেখযোগ্য যে, শোনা যায়, গৃহকর্তা তরুণীদের, বিশেষত পুত্রবধূদের ক্ষেত্রে পদমর্যাদার প্রবল অপব্যবহার করত এবং অনেক সময় ওরা হারেমে বন্দী হত; রুশ লোকসঙ্গীতে এই অবস্থার মুখর প্রতিফলন সহজলক্ষ্য।

মাতৃ-অধিকার উচ্ছেদের পরবর্তীকালীন দ্রুত-উদ্ভূত একগামিতা

আলোচনায় আগেই এখানে বহুপত্নিত্ব ও বহুভর্তৃক প্রথা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। এই দুই রকমের বিবাহই নিয়মের ব্যতিক্রম, ইতিহাসের বিলাস সামগ্রী হিসেবেই বিবেচ্য, যদি না কোনো দেশে এগুলো পাশাপাশি দেখা যায়, আর যতদূর জানা গেছে এমনটি কোথাও ঘটে নি। অতএব, সমাজের প্রথা নির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা এযাবৎ প্রায় সমান থাকায় বহুপত্নী বিবাহের আওতাবহির্ভূত পুরুষেরা যেহেতু বহুভর্তৃক প্রথা থেকে পরিত্যক্ত স্ত্রীলোকদের নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তাই এটা খুবই স্পষ্ট যে, উপরোক্ত দুই রকমের বিবাহের কোনোটারই ব্যাপক প্রচলন হতে পারে নি। বস্তুত, পুরুষের পক্ষ থেকে বহুপত্নিত্ব স্পষ্টত দাস প্রথারই ফল এবং ব্যতিক্রমী অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রেই তা সীমিত। সেমিটিক পিতৃপ্রধান পরিবারে কেবলমাত্র পরিবারের পিতা স্বয়ং এবং বড়জোর তার জনকয়েক পুত্রের বহু স্ত্রী থাকত, বাকি সকলকে এক-একটি পত্নী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। প্রাচ্যের সর্বত্র আজও এটি অব্যাহত। বহুপত্নিত্ব ধনী ও হোমরাচোমরাদের একটি বিশেষ অধিকার এবং স্ত্রী সংগ্রহের উৎস ছিল প্রধানত দাসীক্রয়; সাধারণত অধিকাংশ লোকই একগামিতায় তুষ্ট থাকত। ভারতবর্ষ ও তিব্বতে বহুভর্তৃক প্রথা অনুরূপ একটি ব্যতিক্রম, সমষ্টি-বিবাহ থেকে এর উদ্ভবের নিশ্চিত চিত্তাকর্ষক প্রশ্নটির আরও খুঁটিনাটি অনুসন্ধান প্রয়োজন। তবু বাস্তব ক্ষেত্রে মুসলমানদের ঈর্ষাপৃক্ত হারেমগুলির তুলনায় এগুলি অনেক বেশি সহনশীল। যেমন, ভারতের নায়ারদের মধ্যে তিন, চার অথবা বেশীসংখ্যক পুরুষের একটিমাত্র সাধারণ স্ত্রী থাকে; কিন্তু এদের মধ্যে আবার প্রত্যেকেই ঐ একই সময়ে আরও তিন বা ততোধিক পুরুষের সঙ্গে মিলে একটি দুটি, তিনটি, চারটি বা ততোধিক স্ত্রীও রাখতে পারে। বিস্ময়ের কথা যে, ম্যাক-লেনান এসব বিবাহ ক্লাবের বর্ণনা দিয়ে **ক্লাব-বিবাহের** নতুন বর্গ আবিষ্কার করেন নি, যেখানে পুরুষেরা একই সময়ে কয়েকটি ক্লাবের সভ্য হতে পারত। এই বিবাহ ক্লাবকে অবশ্য যথার্থ বহুভর্তৃক প্রথা বলা যায় না; পক্ষান্তরে জিরো-তেলোঁর ভাষায়, এটি সমষ্টি-বিবাহের এক বিশেষ রূপ, যেখানে পুরুষ বহুপত্নীক এবং নারী বহুবল্লভা।

৪। **একগামী পরিবার।** ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, বর্বরতার মধ্যস্তর থেকে ঊর্ধ্বস্তরে উত্তরণযুগে জোড়বাঁধা পরিবার থেকে এর উৎপত্তি; এর

চরম বিজয় — সভ্যতার সূচনার অন্যতম চিহ্ন। স্বামীর আধিপত্যই এর ভিত্তি; এর সুস্পষ্ট লক্ষ্য সুনিশ্চিত পিতৃত্বের সন্তানোৎপাদন, কারণ এটি নির্ধারিত হলে তবেই সন্তানসন্ততি বিতর্কাতীত বংশধর হিসেবে যথা সময়ে পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। জোড়বাঁধা বিবাহ থেকে একগামী পরিবারের পার্থক্য এই যে, এখানে বিবাহবন্ধন অনেক বেশি শক্ত, কোনো পক্ষের মর্জিমতো সেটা এখন আর ভাঙা যায় না। এখন, সাধারণত কেবলমাত্র স্বামীই বিবাহবন্ধন ছেদ করে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারে। দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাসভঙ্গের অধিকারী এখনও পুরুষ, অন্তত্পক্ষে লোকাচারে তা অনুমোদিত হচ্ছে (Code Napoléon* অনুযায়ী স্বামীকে সুস্পষ্টভাবে এই অধিকার দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে রক্ষিতাকে দম্পতির গৃহে নিয়ে আসছে [১৬]), এবং সমাজের অধিকতর অগ্রগতির সঙ্গে পুরুষরা এই অধিকার অধিক পরিমাণে খাটাচ্ছে; যদি কোথাও কোনো স্ত্রী প্রাচীন যৌনসম্পর্ক প্রথা স্মরণক্রমে তা ফিরে পাবার চেষ্টা করে তবে সে পূর্বাপেক্ষাও কঠোরতর শাস্তির সম্মুখীন হচ্ছে।

গ্রীকদের মধ্যে এই নতুন ধরনের পরিবারের কঠোরতম রূপ দেখা যায়। মার্কসের মতে, পুরাকথার দেবীদের প্রতিষ্ঠা থেকে এমন একটি পূর্বতন পর্ব বোঝা যায়, যখন পর্যন্ত নারী অধিকতর স্বাধীন ও শ্রদ্ধার পাত্রী ছিল, কিন্তু বীরযুগে পুরুষাধিপত্য এবং ক্রীতদাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নারীর অবস্থার অনেক অবনতি চোখে পড়ে। 'অডিসি'তে পাওয়া যায়, কীভাবে টেলিমেকাস মা'কে ধমক দিয়ে মুখ বুজতে বাধ্য করছে।** হোমারের কাব্যে বন্দী যুবতীরা বিজয়ীদের লালসার শিকার হচ্ছে, সামরিক দলপতিরা পদমর্যাদাক্রমে একের পর এক শ্রেষ্ঠা সুন্দরীদের নিজের জন্য বাছাই করছে; এধরনের একটি দাসী নিয়ে আকিলিস ও আগামেম্ননের ঝগড়াকে কেন্দ্র করেই যে সমগ্র 'ইলিয়ড' কাব্য, তা আমরা জানি। হোমারের কাব্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি নায়ক প্রসঙ্গেই তার শিবির ও শয্যাসঙ্গিনী বন্দিনী কুমারীরও উল্লেখ আছে। এই কুমারীরা আবার দম্পতির সংসারেও গ্রহণীয়,

* নেপোলিয়নের কোড। — সম্পাঃ

** হোমার, 'অডিসি', প্রথম গাথা। — সম্পাঃ

যেমন এস্কাইলাসের আগামেম্নন কাসাণ্ড্রাকে নিয়েছিল।* এসব দাসীপ্রসূত সন্তানরা পিতৃসম্পত্তির একটি ক্ষুদ্রাংশের ভাগী এবং এরা স্বাধীন নাগরিক হিসেবে গণ্য হত। টিউক্রস টেলামনের এমনি এক অবৈধ পুত্র এবং তাকে পিতৃনাম ধারণের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। বিবাহিত স্ত্রী এসবই সহ্য করতে বাধ্য, কিন্তু তার নিজের বেলায় কঠোর সতীত্ব এবং পাতিব্রত্য অবশ্যপালনীয়। একথা অনস্বীকার্য যে, সভ্যযুগের চেয়ে বীরযুগে গ্রীক নারী অধিকতর সম্মানীয়া ছিল; কিন্তু তাসত্ত্বেও স্বামীর কাছে সে কেবলমাত্র তার বৈধ উত্তরাধিকারীদের মা, প্রধানা গৃহকর্ত্রী এবং ক্রীতদাসীদের কর্মাধ্যক্ষা, যারা তার স্বামীর ইচ্ছামতো রক্ষিতা হিসেবে ব্যবহার্য ছিল এবং ব্যবহৃত হত। একগামিতার পাশাপাশি এই দাস প্রথার অস্তিত্ব, সর্বতোভাবে **পুরুষের** দখলীভূত সুন্দরী তরুণী দাসীদের উপস্থিতি শুরু থেকে একগামিতার উপর এই বিশিষ্ট চারিত্র্য মুদ্রিত করে যে, একগামিতা **কেবল নারীরই জন্য,** পুরুষের জন্য নয়। আর তার এই বৈশিষ্ট্য আজও অপসৃত হয় নি।

পরবর্তী যুগের গ্রীকদের ক্ষেত্রে ডোরিয়ান ও আইওনিয়ানদের অবশ্যই পৃথক করে দেখা প্রয়োজন। স্পার্টা প্রথমোক্তদের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এবং এমন কি হোমার উল্লিখিত বিবাহের চেয়েও প্রাচীনতর বিবাহসম্পর্ক এদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্র কর্তৃক স্থানীয় প্রথানুসারে পরিবর্তিত এক ধরনের জোড়বাঁধা বিবাহ স্পার্টায় দেখা যায়, যা এখনও সমষ্টি-বিবাহের বহু লক্ষণে চিহ্নিত। সন্তানহীন বিবাহ ভেঙে দেওয়া হত; স্ত্রী নিঃসন্তান বিধায় রাজা আনাক্সান্দ্রিদাস (খৃঃপূঃ ৬৫০) আরও একটি বিবাহ করেন এবং দুটি গৃহস্থালী অব্যাহত রাখেন; সে যুগেরই রাজা এরিস্টোনিস পূর্বতন দুটি নিঃসন্তান স্ত্রীর সঙ্গে একটি তৃতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন, তবে প্রথমোক্তদের অন্যতমাকে ত্যাগ করে। পক্ষান্তরে, কয়েকজন ভ্রাতা একজন সাধারণ স্ত্রী রাখতেও পারত; বন্ধুপত্নীর প্রতি অনুরাগী হলে বন্ধুর সঙ্গে তার অংশভাগী হওয়া চলত; আর কেউ নিজ স্ত্রীকে বিসমার্ক কথিত একটি তাগড়া 'মর্দা ঘোড়ার' কাছে তুলে দিলেও তা সঙ্গতই বিবেচিত হত, এমন কি শেষোক্ত

---

* এস্কাইলাস, 'ওরেস্টিয়া; আগামেম্নন'। — সম্পাঃ

ব্যক্তিটি সহনাগরিক না হলেও। প্লুটার্কের রচনায় এক জায়গায় স্পার্টার জনৈক নারী কর্তৃক তার পশ্চাদ্ধাবক প্রণয়ীকে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পাঠানোর ঘটনা,—শ্যোমানের মতে অধিকতর যৌনস্বাধীনতারই ইঙ্গিতবাহী। প্রকৃত ব্যভিচার অর্থাৎ স্বামীর অজানতে স্ত্রীর অবিশ্বস্ততা তাই তখনও অশ্রুতপূর্ব। অপরদিকে, স্পার্টার গৌরবযুগে সেখানে অন্তত গার্হস্থ্য দাসদাসী ব্যবস্থার কোনো অস্তিত্ব ছিল না; হেলোট ভূমিদাসরা মহালের মধ্যে আলাদাভাবে থাকত এবং এজন্য তাদের নারীদের সঙ্গে সংসর্গের প্রলোভন স্পার্টাবাসীদের (১৭) কমই ছিল। এমতাবস্থায় স্পার্টার নারীরা যে অন্যান্য গ্রীক নারীদের চেয়ে অধিকতর সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেটা খুবই স্বাভাবিক। গ্রীক নারীদের মধ্যে কেবল স্পার্টার নারী এবং এথেন্সের হেটায়ার শিরোমণিরাই প্রাচীনদের দ্বারা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত এবং এদের উক্তি তাদের কাছে লিপিভুক্তিযোগ্য হিসেবে বিবেচ্য।

এথেন্সের অনুসারী আইওনিয়ানদের মধ্যে অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাদের মেয়েরা শুধু সুতা কাটা, কাপড় বোনা ও সেলাই, বড়জোর একটু-আধটু লেখাপড়া শিখত। তাদের পৃথক রাখা হত এবং শুধু মেয়েদের সঙ্গেই মিশতে দেওয়া হত। বাড়ির একটি পৃথক ও নির্দিষ্ট অংশে, উপরতলায় অথবা বাড়ির পিছনে মেয়েদের মহল থাকত—যেখানে পুরুষরা বিশেষত অচেনা লোকেরা যেতে পারত না; বাইরের কোনো পুরুষ এলে মেয়েরা সেখানে চলে যেত। দাসী সঙ্গে না নিয়ে তারা বাইরে যেত না; বাড়িতে তারা কার্যত পাহারার মধ্যে থাকত; এরিস্টফেনিস লম্পটদের ভয় দেখাবার জন্য ডালকুত্তা পোষার কথা বলেছেন,* এশিয়ার নগরগুলিতে মেয়েদের পাহারা দেবার জন্য খোজা-প্রহরী রাখা হত; হিরোডোটসের সেই প্রাচীন যুগেই ব্যবসার জন্য খিওস দ্বীপে খোজা তৈরি করা হত এবং ভাক্সমুথের মতে এটি শুধু বর্বরদের জন্যই করা হত না। ইউরিপিডিসের রচনায় স্ত্রীকে বলা হয়েছে oikurema** অর্থাৎ গৃহস্থালী চালানোর একটি বস্তুমাত্র (শব্দটি ক্লীবলিঙ্গের), এবং সন্তান প্রসবের কথা ছেড়ে দিলে

---

* এরিস্টফেনিস, 'থেস্‌মফরার উৎসবে মেয়েরা'। — সম্পাঃ

** ইউরিপিডিস, 'ওরেস্ট'। — সম্পাঃ

এথেন্সবাসীর কাছে তারা প্রধানা ঝি'র অতিরিক্ত কিছুই ছিল না। স্বামী ব্যায়ামাদি করত, তার সামাজিক কাজকর্ম চালাত, এই শেষোক্ত থেকে স্ত্রী বহিষ্কৃত ছিল; তাছাড়াও স্বামীর ব্যবহারের জন্য ছিল দাসীরা, এবং এথেন্সের সমৃদ্ধির সময়ে ছিল ব্যাপক গণিকাবৃত্তি—যা কম করে বললেও, রাষ্ট্রের আনুকূল্য পেত। এই গণিকাবৃত্তির আশ্রয়েই অনন্যা সেসব গ্রীক মহিলাদের উন্মেষ ঘটে যারা রসবোধ ও শিল্পরুচিতে প্রাচীনকালে মেয়েদের সাধারণ স্তরের অনেক উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিল যেখানে স্পার্টার মেয়েরা পৌঁছেছিল নিজেদের চরিত্রবলে। এথেন্সীয় পরিবারের কঠোরতম সমালোচনা: ওখানে মেয়েকে নারী হতে হলে আগে তাকে হেটায়ার হতে হত।

কালক্রমে শুধু অবশিষ্ট আইওনিয়ানরাই নয়, পরন্তু মূল ভূখন্ড এবং উপনিবেশের সমস্ত গ্রীকরাও এই এথেন্সীয় পরিবারের ছাঁচেই নিজেদের গার্হস্থ্য সম্পর্ক ক্রমেই বেশি করে গড়ে তুলতে থাকে। কিন্তু সবরকম অবরোধ ও প্রহরা সত্ত্বেও গ্রীক নারী স্বামীপ্রতারণার যথেষ্ট সুযোগ পেত। নিজ স্ত্রীর কাছে ভালবাসা নিবেদনে লজ্জিত এই স্বামীরা হেটায়ারদের সঙ্গেই সবরকমের কামক্রিয়ায় চিত্তবিনোদন করত। কিন্তু নারীর এই অপমান পুনরাঘাত করল পুরুষদেরই এবং এই অধঃপতিতরা বালক-রতির বিকৃতিপঙ্কে নিমজ্জিত হল, গ্যানিমেডের পুরাকথায় অবনত করল নিজেদের এবং নিজ দেবতাদের।

প্রাচীন যুগের সভ্যতম ও উন্নততম জাতির মধ্য থেকে যথাসম্ভব সংগৃহীত তথ্যানুসারে এটিই একগামিতার সূচনা। এটি কোনোক্রমেই ব্যক্তিগত যৌনপ্রেমের ফসল নয়, এই দুইয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নেই, কারণ বিবাহ তখনও পূর্ববৎ সেই সুবিধাসর্বস্ব বিবাহই টিকে থাকল। পরিবারের এই প্রথম রূপটি স্বাভাবিক ছিল না, ছিল অর্থনৈতিক অবস্থাসাপেক্ষ, যথা: আদি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত সাধারণ মালিকানার উপর ব্যক্তিগত মালিকানার জয়লাভের ফলস্বরূপ। পরিবারের মধ্যে পুরুষের আধিপত্য, সম্পত্তির উত্তরাধিকারীস্বরূপ সন্তানসন্ততি জননে তার একক অধিকার যে একপত্নী বিবাহের একমাত্র লক্ষ্য, গ্রীকরা খোলাখুলিভাবেই তা ঘোষণা করে। এটুকু ছাড়া বিবাহটি ছিল একটি বোঝা, দেবতা, রাষ্ট্র ও পূর্বপুরুষদের প্রতি একটি কর্তব্য যা পালন ব্যতীত সে নিরুপায়।

এথেন্সের আইনে শুধু বিবাহই বাধ্যতামূলক নয়, পরন্তু পুরুষের ন্যূনতম কতকগুলি তথাকথিত দাম্পত্য কর্তব্যও অবশ্যপালনীয় ছিল।

অতএব ইতিহাসে একগামিতার উদ্ভব মোটেই নারী ও পুরুষের পুনর্মিলনসঞ্জাত নয়, আর বিবাহের উচ্চতম রূপ হিসেবে তো নয়ই, বরং তার উল্টো, প্রাগৈতিহাসিক যুগে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব ঘোষণায় একজন কর্তৃক অপরকে অবদমনের ফলেই উদ্ভূত। ১৮৪৬ সালে মার্কস ও আমার রচিত অপ্রকাশিত একটি পাণ্ডুলিপিতে নিম্নোক্ত কথাগুলি আছে: 'সন্তান প্রজনই নারী ও পুরুষের প্রথম শ্রমবিভাগ'।* আর আজ আমি এসঙ্গে যোগ করতে পারি: ইতিহাসের প্রথম শ্রেণীবিরোধ একগামী বিবাহের ফলে নারী-পুরুষের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ এবং প্রথম শ্রেণীনিপীড়ন পুরুষ কর্তৃক নারীপীড়নের সন্নিপাতী। একগামিতা ইতিহাসের অন্যতম মুখ্য প্রাগ্রসর পদক্ষেপ, কিন্তু সেসঙ্গে দাস প্রথা ও ব্যক্তিগত সম্পদ সহ তা অদ্যাবধি অব্যাহত এমন এক যুগের পত্তন করে যেখানে প্রতিটি অগ্রগতিই একটি আপেক্ষিক পশ্চাদ্গতির অনুষঙ্গ, যেখানে জনসমষ্টির একাংশের সচ্ছলতা ও উন্নতি অপরাংশের দুঃখ ও পীড়নের মধ্যে সংগৃহীত। একগামিতা সভ্য সমাজের কোষস্বরূপ, যেখানে পুরোপুরি প্রকটিত সামাজিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধের প্রকৃতিগুলি ইতিমধ্যেই আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব।

জোড়বাঁধা পরিবার, এমন কি একগামিতার বিজয় অর্জনের সঙ্গে কিন্তু যৌনসম্পর্কের প্রাচীন আপেক্ষিক স্বাধীনতা আদৌ লুপ্ত হয় নি।

'পুনালুয়া দলগুলির ক্রমবিলুপ্তিতে পুরানো বিবাহ প্রথার গণ্ডী বহুদূর সংকুচিত হলেও তখনও এটি বিকাশমান পরিবারকে ঘিরে থাকে এবং সভ্যতার একেবারে সূচনা পর্যন্ত তার স্কন্ধ থেকে আর চ্যুত হয় নি... শেষ অবধি তা হেটায়ারিজমের নব রূপে আত্মীকৃত হয়ে পরিবারের উপর দোদুল্যমান একটি কালো ছায়ার মতো সভ্যযুগেও মানুষকে অনুগমন করছে।'

মর্গানের মতে হেটায়ারিজমের অর্থ **একগামিতার পাশাপাশি** পুরুষ ও অবিবাহিত নারীর বিবাহবন্ধনের বহিস্থ যৌনসঙ্গম এবং তা যে সভ্যযুগের আগাগোড়া বহুরূপে পল্লবিত ও ক্রমাগত প্রকাশ্য গণিকাবৃত্তিরূপে বিকশিত,

* ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস, 'জার্মান ভাবাদর্শ'। — সম্পাঃ

সকলেই তা জানেন। এই হেটায়ারিজমের মূল প্রত্যক্ষভাবে সমষ্টি-বিবাহ এবং পাতিব্রত্যের অধিকার অর্জনের জন্য নারীর প্রায়শ্চিত্তমূলক আত্মদান প্রথায় অনুসৃতব্য। প্রথমে কামদেবের মন্দিরে অর্থ দিয়ে আত্মদান ছিল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, এবং শুরুতে টাকাকড়ি জমা হত মন্দিরের তহবিলে। আর্মেনিয়ার আনাইটিস ও করিন্থের আফ্রোদিতের মন্দিরের হায়েরোডুল (১৮) এবং ভারতবর্ষের মন্দিরের দেবদাসী—তথাকথিত বায়াদেরই (পর্তুগীজ bailadeira—'নর্তকী' শব্দের অপভ্রংশ) প্রথম গণিকা। গোড়ার দিকে সকল নারীর অবশ্যপালনীয় এই ধর্মীয় আত্মদান শেষে সকল নারীর প্রতিনিধিস্বরূপ একমাত্র মন্দির পূজারিণীদেরই কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। মেয়েদের বিবাহপূর্ব যৌনস্বাধীনতা থেকেই অন্যান্য জাতির মধ্যে হেটায়ারিজমের উদ্ভব, অতএব অনুরূপভাবে সমষ্টি-বিবাহেরই লুপ্তাবশেষ, শুধু আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে ভিন্ন পথে। সম্পত্তির বৈষম্য শুরু হবার পর অর্থাৎ বর্বরতার ঊর্ধ্বতন পর্যায় থেকেই দাসশ্রমের পাশাপাশি বিক্ষিপ্তভাবে মজুরি-শ্রমও দেখা দেয় এবং যুগপৎ তার অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে ক্রীতদাসীর বাধ্যতামূলক আত্মদানের পাশাপাশি স্বাধীন নারীদের পেশাগত গণিকাবৃত্তিরও উদ্ভব ঘটে। এভাবে সমষ্টি-বিবাহ সভ্যতার উপর এক দ্বিবিধ উত্তরাধিকার ন্যস্ত করে, যেমন সভ্যতা সৃষ্ট সবকিছুই দ্বিবিধ, দ্বিমুখী, অন্তরে দ্বিধাবিভক্ত ও বৈরতা-দ্যোতক: একদিকে একগামিতা, অন্যদিকে হেটায়ারিজম ও তার চূড়ান্ত রূপ—গণিকাবৃত্তি। হেটায়ারিজম অন্য যেকোনো প্রথার মতোই একটি সামাজিক প্রথা; এতে পুরুষের পুরানো যৌনস্বাধীনতা অব্যাহত। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রথাটি শুধু সহ্য করাই নয়, সোৎসাহে, বিশেষত শাসক শ্রেণীতে আচরিত হলেও মুখে মুখে তা নিন্দিত। অবশ্য এই নিন্দাবাদ গণিকাবিলাসী পুরুষকে উদ্দেশ্য করে নয়, কেবলমাত্র নারীর উদ্দেশ্যেই: বর্জিত, পতিত এই নারীরা আরও একবার সমাজের বুনিয়াদী নিয়মস্বরূপ নারীর উপর পুরুষের চূড়ান্ত আধিপত্যকেই প্রমাণিত করে।

তাসত্ত্বেও একগামিতার মধ্যে দ্বিতীয় একটি বিরোধের উন্মেষ ঘটে। যে স্বামীর জীবন হেটায়ারিজমে সুশোভিত, তার পাশেই অবহেলিতা স্ত্রীর অবস্থান। একটি আপেলের আধখানা খেয়ে তার পুরোটা হাতে ধরে রাখা

যেমন অসম্ভব, কোনো বিরোধের একটি দিক থাকবে আর অন্য দিকটি থাকবে না, সেও তেমনি অচল। তবু মনে হয়, স্ত্রীর কাছ থেকে উচিত শিক্ষা না পাওয়া পর্যন্ত পুরুষ অন্য কথাই ভেবেছিল। একগামিতার সঙ্গে অতঃপর তৎকালে অজ্ঞাত দুটি স্থায়ী সামাজিক জীব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়—স্ত্রীর উপপতি ও প্রতারিত স্বামী। পুরুষ নারীর উপর বিজয়ী, কিন্তু তার মাথায় প্রতারিতের মুকুট পরাবার ভার উদারচিত্তে গ্রহণ করেছে বিজিতারা। ব্যভিচার নিষিদ্ধ, কঠোরভাবে দণ্ডিত তবু অদম্য এই ব্যভিচার একপতিপত্নী প্রথা ও হেটায়ারিজমের পাশাপাশি এক অপরিহার্য সামাজিক প্রথাস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত। সন্তানের নিশ্চিত পিতৃত্ব এখনও বড়জোর নৈতিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই সমাধানহীন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নেপোলিয়ন কোডের তিনশ' বারো ধারার নির্দেশ:

'L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari' — 'বিবাহ স্থিতিকালীন গর্ভাধান ঘটিলে স্বামীই সন্তানের পিতা।'

তিন হাজার বছরের একপতিপত্নী প্রথার এ-ই তো পরিণাম!

অতএব একক পরিবারের যেসব ক্ষেত্রে এর ঐতিহাসিক উদ্ভব যথাযথ প্রতিফলিত এবং পুরুষের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের ফলে নারী-পুরুষের তীব্র বিরোধ সুপরিস্ফুট, সেখানে আমরা ক্ষুদ্রাকারে ঠিক সেই সব দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতির ছবি পাই, যা নিয়ে সভ্যতার সূত্রপাত থেকেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এগিয়ে চলেছে, আর যার নিষ্পত্তি বা সমাধানে তা অক্ষম। স্বভাবতই আমি কেবল একপতিপত্নী প্রথার সেসব ঘটনার কথা বলতে চাইছি যেখানে বিবাহিত জীবন সত্যসত্যই সমগ্র প্রথার আদি চারিত্র্যের নিয়ম অনুসারেই চলে, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সব বিবাহের ক্ষেত্রেই যে ব্যাপারটা এমন নয়, তা জার্মান কূপমণ্ডূকের চেয়ে আর কেউ বেশি জানে না, যে রাষ্ট্রশাসনের মতো গৃহশাসনেও অক্ষম এবং যার স্ত্রী স্বামীর অনুপযুক্ততা বিধায় সঙ্গত কারণেই তার ক্ষমতা আত্মসাৎ করে। তবে সান্ত্বনা হিসেবে জার্মান কূপমণ্ডূক তার সহব্যথী ফরাসীর চেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান কল্পনা করে, কারণ ফরাসীর হাল প্রায়শই তার চেয়ে খারাপ ওঠে।

তবে গ্রীকদের মধ্যে একক পরিবার যে চিরায়ত কঠোর রূপ পরিগ্রহ করেছিল, সর্বত্র ও সর্বদা তার অবিকল অনুকৃতি মোটেই ঘটে নি। ভবিষ্যতের বিশ্ববিজয়ী রোমানদের এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রীকদের তুলনায় ঈষৎ অমার্জিত, কিন্তু দূরপ্রসারী ছিল, তাদের নারীসমাজ অনেক বেশি সম্মান ও স্বাধীনতা ভোগ করত। রোমানরা বিশ্বাস করত, স্ত্রীর জীবনমৃত্যুর ক্ষমতাধিকারী হলেই তার সতীত্ব যথেষ্ট নিশ্চিত থাকে। তাছাড়া, এখানে স্ত্রীও ঠিক স্বামীর মতোই স্বেচ্ছায় বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারী ছিল। কিন্তু ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে জার্মানদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য একগামিতার সর্বাধিক অগ্রগতি ঘটে, কারণ দারিদ্র্যের জন্যই সম্ভবত এদের মধ্যে জোড়বাঁধা বিবাহ থেকে পুরোপুরি একগামিতার বিবর্তন তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। ট্যাসিটাস বর্ণিত তিনটি ঘটনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত: প্রথমত, বিবাহের পবিত্রতায় এদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও—'প্রত্যেকটি পুরুষ একটি স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত এবং স্ত্রীলোকেরা সতীত্বের বেষ্টনীতে বসবাস করত',—পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও উপজাতির নৃপতিদের মধ্যে বহুপত্নিত্ব ছিল যা জোড়বাঁধা বিবাহ প্রথার অনুসারী আমেরিকানদেরই অনুরূপ। দ্বিতীয়ত, মাতৃ-অধিকার থেকে পিতৃ-অধিকারে সম্ভবত তাদের উত্তরণ ঘটেছে অল্প কিছুদিন আগে, কারণ মাতুল অর্থাৎ মাতৃপক্ষীয় নিকটতম পুরুষ আত্মীয় তখনও প্রায় জন্মদাতা পিতার চেয়েও আপনজন হিসেবে গণ্য; এই ব্যাপারটিও আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গীর অনুরূপ, যাদের মধ্যে আমাদের প্রাগৈতিহাসিক অতীতকে বোঝার চাবিকাঠি দেখেছিলেন মার্কস—কথাটা তিনি প্রায়ই বলতেন। এবং তৃতীয়ত, জার্মানদের মধ্যে নারীরা উচ্চ সম্মান পেত এবং সামাজিক ব্যাপারেও তাদের প্রতিপত্তি ছিল, যা একগামিতার বৈশিষ্ট্যসূচক পুরুষাধিপত্যের প্রত্যক্ষ বিরোধী। এসব বিষয়েই জার্মানরা স্পার্টানদের ঘনিষ্ঠ; এদের মধ্যেও যে জোড়বাঁধা বিবাহ সম্পূর্ণরূপে লোপে পায় নি তা আমরা আগেই দেখেছি। তাই এ সূত্রেও জার্মানদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন উপাদান বিশ্বপ্রাধান্য অর্জন করল। রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা নতুন একগামিতায় এবার নমনীয়তর পুরুষাধিপত্যের আচ্ছাদন প্রসারিত হল এবং চিরায়ত প্রাচীন যুগের অজ্ঞাত, অন্তত বাহ্যিক বিষয়ে নারীকে

অধিকতর স্বাধীনতা ও সম্মানের আসন দেওয়া হল। এতে করে এই প্রথম, বৃহত্তম নৈতিক অগ্রগতির একটি সম্ভাবনার সৃষ্টি হল যা আমরা পেয়েছি একগামিতা থেকে ও তারই কল্যাণে এই সম্ভাবনাটি ক্ষেত্রবিশেষে একগামিতার অভ্যন্তরে অথবা সমান্তরালে, কিংবা তার বিরোধিতায়, যথা তৎকালে বিশ্ব-অজ্ঞাত আধুনিক ব্যক্তিগত যৌনপ্রেম বিকশিত হয়েছে।

কিন্তু উক্ত অগ্রগতি নিশ্চিতই এই পরিস্থিতিজাত যে, জার্মানরা তখনও জোড়বাঁধা পরিবারে বসবাস করত এবং তদনুযায়ী নারীর মর্যাদাকে তারা যথাসম্ভব একগামিতার সঙ্গে যুক্ত করেছিল; জার্মান চরিত্রের রূপকথাসুলভ কোনো বিস্ময়কর শুদ্ধতা এর উৎস নয়, জোড়বাঁধা পরিবারের অভ্যন্তরে একগামিতার তীব্র নৈতিক দ্বন্দ্বের অনুপস্থিতির জন্যই এমনটি ঘটেছে। উল্টোই, জার্মানরা দেশান্তরী হয়ে, বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলের যাযাবরদের কাছে পেঁছিলে তাদের যথেষ্ট নৈতিক অবনতি ঘটে এবং অশ্বারোহণের পারদর্শিতা ছাড়াও এরা তাদের কাছ থেকে গুরুতর অস্বাভাবিক অনাচার আয়ত্ত করে, আমিয়ানাস তাইফালি সম্পর্কে এবং প্রকোপিয়াস হেরুলি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবেই তা বলে গেছেন।

যদিও একগামী পরিবারের একমাত্র বিদিত রূপ থেকেই আধুনিক যৌনপ্রেমের বিকাশ সম্ভব, তবু এমন ধারণা সঙ্গত নয় যে প্রেম কেবলমাত্র অথবা প্রধানত স্বামীস্ত্রীর ভালবাসা হিসেবেই বিকশিত হয়েছে। পুরুষাধিপত্যাধীন কঠোর একগামিতার সামগ্রিক চারিত্র্যের ফলেই তা বাতিল হয়ে যায়। ঐতিহাসিকভাবে সক্রিয় সকল শ্রেণী অর্থাৎ সমস্ত শাসক শ্রেণীর মধ্যে জোড়বাঁধা পরিবারের পরবর্তীকালীন বিবাহপদ্ধতিই অটুট ছিল যা মাতাপিতার ব্যবস্থাকৃত একটি সুবিধাজনক ব্যাপার। যৌনপ্রেমের প্রথম যে রূপ ইতিহাসে আসক্তিরূপে আবির্ভূত, যে আবেগে সকলেরই (অন্তত শাসক শ্রেণীর যেকোনো ব্যক্তির) সমানাধিকার, যা যৌনাবেগের সর্বোচ্চ রূপ, মধ্যযুগীয় শিভালরি-প্রণয়ই—সেই বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত প্রথম যৌনপ্রেম যা দাম্পত্য প্রেম থেকে একেবারেই আলাদা। পক্ষান্তরে, প্রভাঁসালদের মধ্যে এর চিরায়ত রূপ পাল তুলে ছুটেছিল ব্যভিচারের দিকে, আর তারই গুণগান করেছেন কবিরা। 'আলবাস' (জার্মান ভাষায় 'প্রভাত সঙ্গীত') প্রভাঁসালদের প্রেমের কবিতার কুসুমাঞ্জলি। নাইট্ প্রণয়িনীর (পরস্ত্রীর) সঙ্গে রাত্রি

যাপনরত, বাইরে প্রহরা এবং প্রথম প্রভাতী আলোয় (alba) অলক্ষিতে পালানোর জন্য তাকে ডেকে দেওয়া—ইত্যাকার বর্ণাঢ্য কাহিনী এতে বর্ণিত। বিদায় দৃশ্যই এর শীর্ষবিন্দু। উত্তরাঞ্চলের ফরাসী ও মান্য জার্মান, উভয়েরই কাব্যরীতিতে শিভালরি সমেত এটি গৃহীত; এবং আমাদের প্রাচীন কবি ভল্‌ফ্রাম ফন এশেন্‌বাখ এর ইঙ্গিতময় যে তিনটি অপূর্ব প্রভাতী সঙ্গীত রচনা করেছিলেন সেগুলি তিনটি দীর্ঘ বীরগাথার চেয়েও আমার কাছে প্রিয়তর।

আমাদের যুগে বুর্জোয়া বিবাহ প্রথা দুই রকমের। ক্যাথলিক দেশসমূহে আগের মতোই মাতাপিতা তরুণ বুর্জোয়া দুলালের জন্য উপযোগী পাত্রী যোগাড় করে দেন এবং এর ফলে স্বভাবতই একগামিতার স্ববিরোধ পরিপূর্ণভাবেই প্রকটিত হয়: স্বামী ও স্ত্রী যথাক্রমে অবাধ হেটায়ারিজম এবং ঢালাও ব্যভিচার চালায়। ক্যাথলিক গির্জায় বিবাহবিচ্ছেদ নিশ্চয়ই এজন্য নিষিদ্ধ, কারণ তাঁরা জানেন মৃত্যুর মতো ব্যভিচারও এক নিদানহীন নিয়তি। পক্ষান্তরে, প্রটেস্টাণ্ট দেশগুলিতে সাধারণত বুর্জোয়া ঘরের দুলালকে স্বশ্রেণী থেকে কমবেশি স্বাধীনভাবে স্ত্রী নির্বাচন করতে দেওয়া হয়; ফলত বিবাহের ভিত্তিতে কিছুটা ভালবাসার অবকাশ থাকে এবং শালীনতার জন্য প্রটেস্টাণ্টসুলভ ভণ্ডামিবশে ভালবাসার অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে পুরুষের হেটায়ারিজম-আসক্তি অনেক কম এবং নারীর ব্যভিচারও সহজলভ্য নয়। কিন্তু যেহেতু উক্ত প্রত্যেক ধরনের বিবাহেই নারী-পুরুষের বিবাহপূর্ব জীবনধারাই অটুট থাকে এবং যেহেতু প্রটেস্টাণ্ট দেশসমূহে বুর্জোয়াদের অধিকাংশই বিষয়াসক্ত, তাই প্রটেস্টাণ্টদের একগামিতার উত্তর দৃষ্টান্তগুলির গড়পড়তা হিসাব ধরলেও দাম্পত্য জীবন সেখানে নিরেট একঘেয়েমি মাত্র, আর তাকেই বলা হয় দাম্পত্য সুখ। উপন্যাস এই দুই ধরনের বিবাহের প্রকৃষ্ট দর্পণ; ফরাসী ও জার্মান উপন্যাসে যথাক্রমে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টাণ্ট ধরনের বিবাহের সাক্ষাৎ মেলে। উভয় ক্ষেত্রে পুরুষেরই 'প্রাপ্তি ঘটে'; জার্মান উপন্যাসের তরুণ যুবক পায় একটি কুমারী, ফরাসী উপন্যাসে পুরুষের ভাগ্যে জোটে অসতীর পতি হবার হেনস্থা। এখানে কার দুর্ভোগ যে বেশি উভয় ক্ষেত্রে তা বলা শক্ত, কেননা জার্মান উপন্যাসের রসাভাব ফরাসী বুর্জোয়ার মনে যতখানি আতংক

জাগায়, ফরাসী উপন্যাসের 'দুর্নীতি' জার্মান কূপমণ্ডূকের মনে ঠিক ততখানি ত্রাসের সঞ্চার করে। অবশ্য সম্প্রতিকালে 'বার্লিন মহানগরীতে পরিণত হওয়ায়' এখানকার বহুকালের পুরানো হেটায়ারিজম ও ব্যভিচার সম্পর্কে জার্মান উপন্যাসে কিঞ্চিৎ সহানুভূতির উদ্রেক ঘটেছে।

কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে বিবাহ পাত্রপাত্রীর শ্রেণীনির্ভর বিধায় এগুলি সুবিধাবাদী বিবাহই থেকে যায়। পূর্বোক্ত দুটি ক্ষেত্রেই এই রকম বিবাহ প্রায়ই অত্যন্ত স্থূল বেশ্যাবৃত্তিতে পরিণত হয়—কখনও দু'পক্ষেই, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রীর পক্ষে; স্ত্রীর সঙ্গে সাধারণ পতিতার পার্থক্য এটুকু যে, সে ভাড়াটে মজুরের মতো নিজের দেহ ভাড়া খাটায় না, পরন্তু সে দেহটি বিক্রি করে চিরদাসত্বে। সমস্ত সুবিধাবাদী বিবাহ সম্পর্কে ফুরিয়ের মন্তব্যটি প্রযোজ্য:

> 'ব্যাকরণে এই যেমন দুটি নেতিবাচক শব্দে একটি ইতিবাচক শব্দ হয়, তেমনই বিবাহের নীতিশাস্ত্রেও দুটি বেশ্যাবৃত্তি মিলে একটি পুণ্যধর্ম সৃষ্টি হয়।'

সরকারীভাবে স্বীকৃত হোক বা না হোক কেবলমাত্র শোষিত শ্রেণীগুলির মধ্যে অর্থাৎ বর্তমান প্রলেতারীয়দের মধ্যেই স্ত্রী সম্পর্কে যৌনপ্রেম সাধারণ ব্যাপার হতে পারে এবং হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে চিরায়ত একগামিতার সমস্ত পুরানো বুনিয়াদই অপসৃত। যে সম্পত্তির সংরক্ষণ ও উত্তরাধিকারের জন্যই একগামিতা ও পুরুষাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে সম্পত্তিই এখানে অনুপস্থিত। অতএব এখানে পুরুষাধিপত্য জাহির করার কোনো প্রেরণা নেই। উপরন্তু, তার উপায়ও অবর্তমান; এই আধিপত্যের রক্ষক বুর্জোয়া আইনের অস্তিত্ব শুধু বিত্তবান শ্রেণী এবং প্রলেতারীয়দের সঙ্গে তাদের লেনদেনের জন্যই; এতে অর্থব্যয় হয় এবং সেজন্যই শ্রমিকের দারিদ্র্যের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে তার আচরণের ব্যাপারে এর কোনো ভূমিকা নেই। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত আর সামাজিক সম্বন্ধই এখানে নির্ধারক হেতু। উপরন্তু, যখন বৃহৎ শিল্প নারীকে গৃহকোণ থেকে উৎখাত করে শ্রমবাজার ও কারখানায় পাঠাল এবং প্রায়শ তাকে পরিবার পালনের জন্য যথেষ্ট রোজগার করতে বাধ্য করল, তখনই প্রলেতারীয় সংসারে পুরুষাধিপত্যের ভিত্তি সর্বৈব বিলুপ্ত হল—সম্ভবত শুধু একগামী

বিবাহের প্রতিষ্ঠা থেকে নারীর প্রতি আচরিত দৃঢ়মূল রূঢ়তার কিছু কিছু অবশেষ ছাড়া। তাই প্রলেতারীয় পরিবার, এমন কি যেখানে নিবিড় প্রেম ও উভয় পক্ষের পূর্ণ বিশ্বস্ততা বর্তমান সেখানেও, এবং সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক ও পার্থিব আশীর্বাদ সত্ত্বেও সঠিক অর্থে আর একগামী নয়। একগামিতার দুটি চিরন্তন অনুষঙ্গ হেটায়ারিজম ও ব্যভিচারের ভূমিকা তাই এখানে নগণ্যপ্রায়; বস্তুত নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এবং সদ্ভাবের অনুপস্থিতিতে ছাড়াছাড়িই স্বামী-স্ত্রীর পছন্দ। এক কথায়, প্রলেতারীয় বিবাহ ব্যুৎপত্তিগত অর্থে একগামী হলেও ঐতিহাসিক অর্থে মোটেই তা নয়।

আমাদের আইনজ্ঞরা অবশ্য বলে থাকেন যে, আইনপ্রণয়নের প্রগতিতে ক্রমেই অধিক পরিমাণে নারীজাতির অভিযোগের কারণগুলি দূরীভূত হচ্ছে। আধুনিক সভ্য দেশের আইনবিধিতে ক্রমশই একথা স্বীকৃত হচ্ছে যে, প্রথমত, বিবাহের কার্যকারিতার জন্য উভয় পক্ষের স্বেচ্ছামূলক রফা প্রয়োজন, এবং দ্বিতীয়ত, গোটা বিবাহিত জীবনে অধিকার ও দায়িত্বের প্রশ্নে উভয়পক্ষই সমানাধিকারী। এই দুটি দাবী যথাযথভাবে কার্যকরী হলে মেয়েদের চাওয়ার আর কিছুই থাকে না।

এই খাঁটি উকিলী বাক্‌চাতুর্য প্রলেতারীয়দের দাবীদাওয়া নাকচকারী র‍্যাডিকাল বুর্জোয়া-প্রজাতন্ত্রীদের যুক্তিরই অনুরূপ। শ্রমচুক্তি মালিক-শ্রমিক উভয় পক্ষের স্বেচ্ছার ভিত্তিতে সম্পাদিত হওয়াই নাকি নিয়ম। কিন্তু **কাগজে কলমে** আইন উভয় পক্ষকে একই ভিত্তিতে দাঁড় করিয়ে দেয় বলেই চুক্তিটি স্বেচ্ছামূলক ধরা হয়। ভিন্নতর শ্রেণী-অবস্থানের দরুন প্রাপ্ত একটি পক্ষের ক্ষমতা, অপর পক্ষের ওপর তার চাপ, উভয়ের বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা—এসব এখানে আইনের বিবেচ্য নয়। এবং শ্রমচুক্তি বলবৎ থাকার সময় উভয় পক্ষকেই সমান অধিকারভোগী মনে করা হয়, যতক্ষণ না কোনো এক পক্ষ সুস্পষ্টভাবে এই অধিকার ত্যাগ করে। অর্থনৈতিক অবস্থা হেতু শ্রমিক যে তার সমানাধিকারের সামান্যতম আভাসটুকুও ছেড়ে দিতে বাধ্য, এই বিষয়েও আইন একেবারেই উদাসীন।

বিবাহের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিই সবচেয়ে প্রগতিশীল আইনেও যথেষ্ট বিবেচিত হয়। আইনের যবনিকার

আড়ালে চলমান বাস্তব জীবনে কী ঘটছে, কীভাবে এই স্বেচ্ছামূলক চুক্তি কার্যকরী হচ্ছে, তা নিয়ে আইন এবং আইনজ্ঞের মাথাব্যথা নেই। অথচ বিভিন্ন দেশের আইনের মামুলি তুলনা থেকেও আইনজ্ঞ এই স্বেচ্ছামূলক চুক্তির তাৎপর্য নির্ণয় করতে পারেন। জার্মানি, ফরাসী আইনের অনুসারী দেশ ও অন্যত্র যেখানে সন্তানসন্ততি আইনত পিতামাতার সম্পত্তির ভাগীদার এবং তাদের উত্তরাধিকারচ্যুত করা যায় না, সেখানে বিবাহের প্রশ্নে সন্তানসন্ততি মাতাপিতার সম্মতি নিতে বাধ্য। যেসব দেশে ইংরেজী আইন প্রযোজ্য, যেখানে বিবাহে মাতাপিতার সম্মতির কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই, সেখানে সম্পত্তির ব্যাপারে মাতাপিতা উইলের নিরঙ্কুশ অধিকারী এবং ইচ্ছামতো সন্তানসন্ততিকে তারা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে সক্ষম। অতএব এটা স্পষ্ট যে, এ সত্ত্বেও, কিংবা বলা উচিত এজন্যই যেসব শ্রেণী উত্তরাধিকারের মতো সম্পত্তির অধিকারী, ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় তাদের মধ্যে বিবাহের স্বাধীনতা ফ্রান্স বা জার্মানির চেয়ে বিন্দুমাত্রও বেশি নয়।

বিবাহে নারী-পুরুষের আইনগত সমানাধিকারের ক্ষেত্রেও অবস্থা এর চেয়ে উন্নততর নয়। পূর্বতন সামাজিক অবস্থা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত উভয়ের আইনগত অসম অধিকার স্ত্রীলোকের ওপর অর্থনৈতিক পীড়নের কারণ নয়, ফল। পুরানো সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালীতে যেখানে বহু দম্পতি ও তাদের সন্তানসন্ততি থাকত সেখানে গৃহস্থালীর ব্যবস্থা নারীর উপর ন্যস্ত ছিল, সে কাজ পুরুষের খাদ্য আহরণের মতোই সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় বৃত্তি বলে গণ্য হত। পিতৃপ্রধান পরিবার উদ্ভবের সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল এবং একগামী একক পরিবারে তাতে আরও বেগ সঞ্চারিত হল। গৃহস্থালীর কাজকর্মের সামাজিক চারিত্র্য তখন অপসৃত। এটি আর সমাজ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার রইল না, হয়ে দাঁড়াল **ব্যক্তিগত সেবাবৃত্তি**; সামাজিক উৎপাদনক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃতা স্ত্রী-ই হল প্রথম গৃহদাসী। কেবলমাত্র আধুনিক বৃহৎ শিল্পই আবার তাদের সামনে সামাজিক উৎপাদনের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করেছে, অবশ্য তা কেবলমাত্র প্রলেতারীয় নারীর জন্যই। কিন্তু তা করেছে এমনভাবে যে, যখন নারী পারিবারিক ব্যক্তিগত সেবাকর্মে রত তখন সে সামাজিক উৎপাদনবহিস্থ ও উপার্জন-অক্ষম; এবং যখন সে সামাজিক শ্রমের অংশভাগী হিসেবে স্বাধীন জীবিকান্বেষী তখন সে

পারিবারিক কর্তব্য পালনে অক্ষম। কারখানার নারীকর্মীর ক্ষেত্রে যা সত্য তা অন্য সর্বত্র, এমন কি চিকিৎসা ও আইনের পেশাতেও প্রযোজ্য। আধুনিক একক পরিবার নারীর প্রকাশ্য অথবা পরোক্ষ গার্হস্থ্য দাসত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমান সমাজ এসব একক পরিবারেরই অণুসমষ্টি। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, অন্ততপক্ষে বিত্তবান শ্রেণীগুলিতে পুরুষই উপার্জনকারী, পরিবারের ভরণপোষণের কর্তা এবং তাই তার আধিপত্য, যেজন্য কোনো বিশেষ আইনগত সুবিধা নিষ্প্রয়োজন। পারিবারিক গণ্ডীতে সে বুর্জোয়া আর স্ত্রী প্রলেতারিয়েতের প্রতিভূ। যাহোক, শিল্পজগতের যে অর্থনৈতিক শোষণে প্রলেতারিয়েত পিষ্ট, তার বিশেষ প্রকৃতি সমগ্র তীক্ষ্ণতায় তখনই ফুটে ওঠে যখন পুঁজিপতি শ্রেণীর আইনগত সমস্ত বিশেষ সুবিধাদি বাতিল হয় এবং আইনের চক্ষে উভয় শ্রেণীর পূর্ণ সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়; গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে উভয় শ্রেণীর বিরোধ লোপ পায় না; পক্ষান্তরে, সংগ্রাম মাধ্যমে সেই বিরোধ অবসানের জন্য সে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ঠিক একইভাবে আধুনিক পরিবারে স্ত্রীর উপর স্বামীর আধিপত্যের স্বকীয় চারিত্র্য এবং উভয়ের মধ্যে সত্যকার সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ও পদ্ধতি তখনই প্রকটিত হবে যখন আইনের চক্ষে উভয়ের অধিকার সম্পূর্ণত সমান বলে স্বীকৃত হবে। সামাজিক উৎপাদনে সমগ্র নারীজাতির পুনঃপ্রতিষ্ঠাই যে নারীমুক্তির প্রথম শর্ত শুধু তখনই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে, এবং সমাজের অর্থনীতির একক হিসেবে একক পরিবারের যে গুণটি রয়েছে তার বিলোপসাধন এজন্য অপরিহার্য বিবেচিত হবে।

* * *

আমরা তাহলে বিবাহের তিনটি মূল রূপ দেখতে পাচ্ছি, যা মনুষ্যজাতির ক্রমবিকাশের তিনটি মূল স্তরের মোটামুটি সদৃশ। বন্যাবস্থায় সমষ্টি-বিবাহ, বর্বরযুগের জোড়বাঁধা বিবাহ, সভ্যযুগের গণিকাবৃত্তি ও ব্যভিচার সম্পূরিত একগামিতা। বর্বরতার ঊর্ধ্বস্তরে জোড়বাঁধা বিবাহ ও একগামিতার মাঝামাঝি ক্রীতদাসীদের উপর পুরুষের কর্তৃত্ব এবং বহুপত্নী প্রথা অনুপ্রবিষ্ট।

আমাদের সমগ্র বিশ্লেষণে পর্যায়ক্রমিক এই অগ্রগতির আনুষঙ্গিক একটি অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ে যে কেবল নারীরাই ক্রমাগত সমষ্টি-বিবাহের যৌনস্বাধীনতা হারাচ্ছে, পুরুষরা নয়। বস্তুত পুরুষদের জন্য আজও সমষ্টি-বিবাহ অটুট রয়েছে। নারীর পক্ষে যা অপরাধ এবং যেজন্য আইন ও সামাজিক বিচারে সে কঠোর শাস্তিভোগী, পুরুষের ক্ষেত্রে তাই সম্মানজনক, বড়জোর সানন্দে বহনযোগ্য চাঁদের কলঙ্কমাত্র। আমাদের যুগে পুঁজিবাদী পণ্যোৎপাদন প্রণালীর ফলে অতীতকালের প্রথাগত হেটায়ারিজম যতই বদলাচ্ছে ও তার সঙ্গে অভিযোজিত হচ্ছে তথা এটি নগ্ন গণিকাবৃত্তির রূপ নিচ্ছে, এর নৈতিক কুপ্রভাব ততই বাড়ছে। আর এতে নারী অপেক্ষা পুরুষের অধঃপতনের মাত্রাই অধিকতর। নারীসমাজে বেশ্যাবৃত্তির কবলগ্রস্তা দুর্ভাগিনীদের শুধু অধঃপতন ঘটে, এবং তারাও, যতটা সাধারণত মনে করা হয় ততটা অধঃপাতে যায় না। পক্ষান্তরে, এতে গোটা পুরুষজাতিরই নৈতিক অধঃপতন ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দশটির মধ্যে নয়টি ক্ষেত্রেই দীর্ঘ পূর্বরাগ কার্যত দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাসহানির একটি প্রস্তুতিমূলক পাঠে পর্যবসিত হয়।

আমরা এমন একটি সমাজবিপ্লবের লক্ষ্যে অগ্রসরমান যখন বর্তমান একগামিতার সম্পূরক গণিকাবৃত্তির অর্থনৈতিক ভিত্তির মতোই তারও অর্থনৈতিক ভিত্তির নিশ্চিত অবলুপ্তি ঘটবে। একই ব্যক্তির, অর্থাৎ একজন পুরুষের অধিকারে কেন্দ্রীভূত প্রচুর সম্পদ এবং অন্য কারও পরিবর্তে কেবলমাত্র নিজ সন্তানসন্ততিকেই তার উত্তরাধিকার দানের বাসনা — এ থেকেই একগামিতার উদ্ভব। তাই নারীর পক্ষেই একগামিতা বাধ্যতামূলক, পুরুষের জন্য নয়; অতএব স্ত্রীলোকদের একগামিতায় পুরুষের গোপন বা প্রকাশ্য বহুগামিতা প্রহত হয় নি। উত্তরাধিকারযোগ্য স্থাবর সম্পদের অন্তত অধিকাংশ অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়কে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত ক'রে আসন্ন সমাজবিপ্লব উত্তরাধিকারের এসব দুশ্চিন্তাকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবনত করবে। যেহেতু একগামিতা অর্থনৈতিক কারণসঞ্জাত তাই সেসব কারণের অপসৃতির সঙ্গে কি এরও বিলোপ ঘটবে না?

সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে, প্রথাটি লোপ না পেয়ে বরং এর পূর্ণতর প্রতিষ্ঠাই শুরু হবে। কারণ, উৎপাদনের উপায়গুলি সমাজের সম্পত্তি হওয়ায়

মজুরি-শ্রম, প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্ব লোপ পাবে এবং সেইসঙ্গে সমাজের কিছুসংখ্যক নারীর (গণনাযোগ্য) পক্ষে অর্থের জন্য আত্মদানের আবশ্যকতাও আর থাকবে না। গণিকাবৃত্তি লুপ্ত হবে; আর একগামিতা ক্ষয় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তা পুরুষদের পক্ষেও সত্য হয়ে উঠবে।

মোটের উপর, পুরুষের অবস্থার এভাবে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে, **সমস্ত** নারীর ক্ষেত্রেও অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হবে। উৎপাদনের উপায় সমাজের সম্পত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিগত পরিবারগুলি আর সমাজের অর্থনীতির একক থাকবে না। ব্যক্তিগত গৃহস্থালী পরিণত হবে সামাজিক শ্রমক্ষেত্রে। শিশুর পরিচর্যা ও শিক্ষা সামাজিক ব্যাপার হয়ে উঠবে। শিশু বিবাহজাত অথবা বিবাহবহিস্থ, সে যেমনই হোক, সমাজ তাদের সকলের সমান দায়িত্ব নেবে। সুতরাং 'ভবিষ্যৎ ফলাফলের' দুশ্চিন্তা যা নীতিগত ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কারণ এবং যেজন্য একটি নারী ভালবাসার মানুষের কাছে অবাধে আত্মদানে অক্ষম, সেই কারণ আর থাকবে না। এটা কি অধিকতর অবাধ যৌনসঙ্গমের ক্রমিক উদ্ভব এবং আনুষঙ্গিক কৌমার্যের মর্যাদা ও নারীর লাজলজ্জা সম্পর্কে শিথিলতর একটি জনমত উদ্ভবের কারণ ঘটাবে না? এবং সর্বশেষে, বর্তমান জগতে একগামিতা ও গণিকাবৃত্তি সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও যে উভয়টি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বৈপরীত্য, একই সামাজিক শৃঙ্খলার দুটি মেরু, এটা কি আমরা দেখি নি? তাই একগামিতা বিলুপ্ত না করে কি গণিকাবৃত্তি লোপ পেতে পারে?

এখানে একটি নতুন কারণ কার্যকরী হয়ে উঠবে, যা একগামিতার সূচনাকালে বড়জোর ভ্রূণাকারে ছিল, যথা, ব্যক্তিগত যৌনপ্রেম।

মধ্যযুগের আগে ব্যক্তিগত যৌনপ্রেম বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। একথা স্পষ্ট যে, ব্যক্তিগত সৌন্দর্য, অন্তরঙ্গ সাহচর্য, সমধর্মী প্রবণতা, ইত্যাদি অবশ্য তখনও নরনারীর মধ্যে যৌনসঙ্গমের কামনা জাগাত এবং তখনও এই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক কার সঙ্গে পাতানো হচ্ছে সে বিষয়ে নরনারী একেবারে নির্বিকার থাকত না। কিন্তু একালের যৌনপ্রেম থেকে এর তারতম্য আকাশ-পাতাল। প্রাচীন যুগে সর্বদা মাতাপিতাই বিবাহ স্থির করতেন;

পাত্রপাত্রীরা মাথা পেতে তা মেনে নিত। প্রাচীনকালে যেটুকু দাম্পত্য প্রেম জ্ঞাত ছিল তাতে মোটেই ব্যক্তিগত কোনো আবেগ ছিল না, ছিল বাস্তব কর্তব্য পালন; সেটা বিবাহের কারণ নয়, তার অনুষঙ্গ। প্রাচীনকালে আধুনিক অর্থে যদি কোনো প্রেম থেকেও থাকে তবে তা ছিল সরকারী সমাজের গণ্ডীবহির্ভূত। যে মেষপালকদের প্রেমের সুখদুঃখের গান থিওক্রিটাস ও মোসাস রচনা করেছেন অথবা লঙ্গোসের রচনার নায়ক ড্যাফনিস ও ক্লয়া, — এরা নিতান্তই ক্রীতদাস, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, স্বাধীন নাগরিকদের জীবন ও কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে যাদের কোনোই সংযোগ ছিল না। দাসদের মধ্যে ছাড়াও যে প্রেমসম্পর্ক পাওয়া যেত তা ছিল ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীন জগতের ভাঙনের ফলশ্রুতি, আর এর পাত্রী ছিল সমাজবহির্ভূতা নারী, হেটায়ার অর্থাৎ বিদেশিনী বা মুক্তিপ্রাপ্তা কোনো ললনা: এথেন্সের অবনতির প্রাক্কালে এবং রোম সম্রাটদের আমলে। স্বাধীন নাগরিক নরনারীর মধ্যে কখনও প্রেম হলে তা হত কেবল ব্যভিচার হিসেবেই। আর আমাদের যুগের অর্থে যৌনপ্রেম প্রাচীনকালের চিরায়ত প্রেমের কবি এনাক্রিয়নের কাছে এতই অবান্তর ছিল যে, তাঁর প্রিয়পাত্রটির যৌনচারিত্র্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকতেন।

প্রাচীন যুগের সহজ যৌনকামনা বা কাম আমাদের যৌনপ্রেম থেকে বাস্তব অর্থেই আলাদা। প্রথমত, এতে প্রেমিকদের পারস্পারিক ভালবাসা পূর্বাহ্নেই ধরে নেওয়া হয়; এতে নারী-পুরুষ সমানাধিকারী; কিন্তু প্রাচীনকালের কামে নারীর সম্মতি অপরিহার্য ছিল না। দ্বিতীয়ত, যৌনপ্রেম তীব্রতা এবং স্থায়ীত্বে এমন এক পর্যায়ে উত্তীর্ণ যে, প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে না পাওয়া অথবা বিচ্ছেদকে সর্বাধিক না হলেও বৃহৎ এক দুর্ভাগ্য বলে মনে করে; পরস্পরকে পাবার জন্য তারা প্রাণের ঝুঁকি নেয়, এমন কি জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করে যা প্রাচীনকালে বড়জোর ঘটত কেবল ব্যভিচারের ক্ষেত্রে। সর্বশেষে, যৌনসঙ্গমের ব্যাপারে এক নতুন নৈতিক মানদণ্ড উদ্ভূত হয়; এধরনের সঙ্গম বৈধ বা অবৈধ সে প্রশ্ন শুধু এ সম্পর্কেই নয়, সেটা পারস্পারিক ভালবাসাজাত কি না, সে সম্পর্কেও। বলা বাহুল্য, সামন্ত অথবা বুর্জোয়া আচরণে অন্যান্য সব নৈতিক মানদণ্ডের চেয়ে এই নতুন মানদণ্ডটি মোটেই উন্নততর নয়, — এটি স্রেফ উপেক্ষিত। তবে অন্যান্য

মানদণ্ডের তুলনায় এটি নিম্নমাত্রিক হিসেবেও বিবেচিত হয় না। অপরগুলির মতো এটিও তত্ত্ব হিসেবে কাগজে কলমে স্বীকৃত এবং আপাতত এর চেয়ে অধিকতর প্রত্যাশা নিরর্থক।

যৌনপ্রেমের সূচনাতেই যেখানে তার সঙ্গে প্রাচীন যুগের বিচ্ছেদ ঘটল মধ্যযুগ শুরু হল সেখান থেকেই, অর্থাৎ ব্যাভিচার থেকে। আমরা ইতিপূর্বেই প্রভাত সঙ্গীতের উৎস—শিভালরি প্রেমের বর্ণনা দিয়েছি। যে প্রেমের লক্ষ্য বিবাহবন্ধন ভাঙা আর যে প্রেম বিবাহবন্ধনের ভিত্তি, এ দুইয়ের দুস্তর ব্যবধান শিভালরি যুগে সম্পূর্ণভাবে ভরাট হয় নি। এমন কি লঘুচরিত্র রোমান জাতি ছেড়ে ধর্মপ্রাণ জার্মানদের দিকে তাকালে 'নিবেলুং গাথা'য় আমরা দেখতে পাব যে, ক্রিম্‌হিল্ড ও জিগ্‌ফ্রিড পরস্পরকে গোপনে সমান গভীরভাবে ভালবাসলেও গুন্থার যখন একজন অনামী নাইটকে তার জন্য বাগ্‌দান করেছেন জানালেন, তখন জবাবে ক্রিম্‌হিল্ড শুধু বললেন:

'আমাকে জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন; আপনি যাই আদেশ করবেন, আমি তা করব; হে প্রভু, আপনি যাকেই আমার স্বামী মনোনীত করবেন আমি তাকেই বরণ করব।'*

তাঁর প্রেম যে এখানে কোনো বিবেচ্য হেতু, কথাটি তাঁর মনে কখনই স্থান পায় নি। গুন্থার আগে কখনও না দেখেও ব্রুন্‌হিল্ডের পাণিপ্রার্থনা করলেন আর এট্‌জেলও ক্রিম্‌হিল্ডের ক্ষেত্রে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটালেন। 'গুড্‌রুন'এ (১৯) একই ব্যাপার দেখা যায়। এখানে আয়ার্ল্যান্ডের জিগেবান্ট নরওয়ের উটে'র, হেগেলিং-এর হেটেল আয়ার্ল্যান্ডের হিল্‌ডে'র এবং সবশেষে মরল্যান্ডের জিগ্‌ফ্রিড, অর্মানের হার্টমুট্‌ এবং জীল্যান্ডের হারভিগ গুড্‌রুনের পাণিপ্রার্থনা করলেন, আর এখানেই সর্বপ্রথম দেখা গেল যে, গুড্‌রুন স্বেচ্ছায় শেষোক্তের পক্ষেই মত দিলেন। তরুণ রাজপুত্রের পিতামাতা পাত্রী ঠিক করবেন, এই ছিল নিয়ম; এঁদের অবর্তমানে পাত্র অধীনস্থ উচ্চতম সর্দারদের পরামর্শ নিতেন এবং তাঁদের কথায় সর্বদাই যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। অন্যতর কিছু এখানে অসম্ভব। কারণ, নাইট অথবা ব্যারনের মতো স্বয়ং রাজপুত্রের পক্ষেও বিবাহ ছিল একটি রাজনৈতিক কর্ম, নতুন সম্পর্কস্থাপন মারফৎ শক্তিবৃদ্ধির একটি সুযোগ; এর নির্ধারক

* 'নিবেলুং গাথা', দশম গীত দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

ছিল বংশের স্বার্থ, ব্যক্তিগত প্রবণতা নয়। এখানে প্রেম কি করে বিবাহের চূড়ান্ত হেতুর মর্যাদা পাবে?

মধ্যযুগীয় নগরগুলির গিল্ড মালিকদের মধ্যেও একই ব্যাপার দেখা যায়। বিশেষ শর্তবন্দী গিল্ড-সনদ এবং অন্যান্য গিল্ড, সহযোগী গিল্ড-মালিক নিজ শিক্ষানবীস ও মজুরদের থেকে পৃথককারী কৃত্রিম বিধান, ইত্যাকার যে সুবিধাবলি তার আইনী রক্ষাকবচ, তাতে তার যোগ্য পাত্রী সংগ্রহের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ত। এই জটিল ব্যবস্থায় যোগ্যতমা পাত্রী নির্ণয় নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত পছন্দনির্ভর ছিল না, ছিল পারিবারিক স্বার্থভিত্তিক।

অতএব মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত সুবিপুল ক্ষেত্রেই বিবাহ প্রারম্ভিক যুগেই থেকে গিয়েছিল যেখানে পাত্রপাত্রীর কোনো নির্ধারক ভূমিকাই ছিল না। আদিকালে জন্মমুহূর্তেই বিবাহ বিপরীত লিঙ্গের গোটা সমষ্টির সঙ্গেই নির্ধারিত হয়ে থাকত। সমষ্টি-বিবাহের পরবর্তী ধাপগুলিতে বিবাহের পরিধি ক্রমশ সংকুচিত হলেও সম্পর্কটা সম্ভবত পূর্বানুরূপই ছিল। জোড়বাঁধা বিবাহে মায়েরাই সাধারণত ছেলেমেয়েদের বিয়ে ঠিক করত; এখানেও গোত্রসংগঠন ও উপজাতির মধ্যে নতুন কুটুম্বিতা সূত্রে দম্পতির সম্ভাব্য প্রতিপত্তি বৃদ্ধির বিবেচনাই নির্ধারক হেতু ছিল। এবং পরে যখন সাধারণ সম্পত্তির তুলনায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রাধান্য এবং উত্তরাধিকারের স্বার্থে পিতৃ-অধিকার ও একগামিতা প্রতিষ্ঠিত হল, তখন বিবাহ সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক বিচারবিবেচনার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। ক্রয়-বিবাহের **প্রথাটি** লোপ পেল, কিন্তু বেচাকেনার ক্রমবর্ধমান ব্যাপারটা এমন এক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হল যখন শুধু মেয়েদেরই নয়, পুরুষেরও মূল্য যাচাই হত ব্যক্তিগত গুণে নয়, সম্পত্তিতে। পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক অনুরাগকে বিবাহের চূড়ান্ত যুক্তিস্বরূপ গণ্য করার ধারণাটি শুরু থেকেই শাসক শ্রেণীগুলির কাছে অশ্রুতপূর্ব ছিল। এরকম ঘটনা ঘটত বড়জোর প্রেমের কাহিনীতে অথবা নিপীড়িত শ্রেণীগুলির মধ্যে, যা ধর্তব্য নয়।

পুঁজিবাদী উৎপাদনের সূচনায় এই ছিল অবস্থা, যখন ভৌগোলিক আবিষ্কার যুগের পর পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য ও কারখানা-শিল্প মারফৎ তা দুনিয়া জয়ে প্রবৃত্ত হল। মনে হতে পারে যে উপরোক্ত ধরনের বিবাহই ছিল

এর পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী এবং কার্যত তা-ই হল। তবুও বিশ্ব ইতিহাসের পরিহাস অফুরন্ত—পুঁজিবাদী উৎপাদনের ফলেই এই প্রথায় চূড়ান্ত ফাটল ধরল। সবকিছুকে পণ্যে পরিণত করে এই পদ্ধতি পুরানো ঐতিহ্যগত সকল সম্পর্ক ভেঙে ফেলল এবং বংশানুসৃত প্রথা ও ঐতিহাসিক অধিকারকে কেনাবেচা ও 'স্বাধীন' চুক্তি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করল। পূর্ববর্তী যুগগুলির তুলনায় আমাদের সমগ্র অগ্রগতি from status to contract*—বংশানুসৃত অবস্থা থেকে স্বেচ্ছামূলক চুক্তিতে উত্তরণেই পরিমাপ্য—একথা বলেই ইংরেজ আইনবিদ হেনরি মেইন ভেবেছিলেন যে, তিনি বিরাট কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছেন। অথচ উক্তিটির যেটুকু নির্ভুল, তা অনেক আগেই 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে' উল্লিখিত হয়েছিল।**

চুক্তির পূর্বশর্তস্বরূপ এমনসব লোক প্রয়োজন যারা নিজ ব্যক্তিত্ব, আচরণ ও সম্পত্তি স্বাধীনভাবে লেনদেন করতে এবং সমান শর্তে পরস্পরের সম্মুখীন হতে সক্ষম। এরূপ 'স্বাধীন' ও 'সমানাধিকারী' মানুষ সৃষ্টিই পুঁজিবাদী উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কাজ। যদিও গোড়ার দিকে কাজটি কেবলমাত্র অর্ধসচেতনভাবে এবং ধর্মের আবরণে সম্পন্ন হয়েছে, তবুও লুথারপন্থী ও কালভাঁপন্থী ধর্মসংস্কার আন্দোলনের (রিফর্মেশন) (২০) সময় থেকেই এটি একটি বদ্ধমূল নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, মানুষ তখনই কেবল তার কাজের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী যখন কাজ করার সময় তার ইচ্ছার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, আর নৈতিক দায়িত্ব হল অনৈতিক কর্মের জন্য সকল জবরদস্তি প্রতিরোধ করা। কিন্তু ব্যাপারটির সঙ্গে পূর্বপ্রচলিত বিবাহ প্রথার সাযুজ্য কোথায়? বুর্জোয়া ধারণা অনুযায়ী বিবাহ একটি চুক্তি, একটি আইনী ব্যাপার, তদুপরি তা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে দুটি মানুষের শরীর ও মন সারা জীবনের জন্যই বিকিয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, কাগজে কলমে চুক্তিটি স্বেচ্ছামূলকভাবেই সম্পাদিত হয়; পাত্রপাত্রীর সম্মতি ছাড়া এ কাজ হয় না। কিন্তু কি করে সম্মতি আদায় করা হয় এবং আসলে কারা বিবাহটি ঘটায় তা সকলেরই ভালভাবে জানা। অথচ অপর সব চুক্তির ক্ষেত্রে যখন সিদ্ধান্তের সত্যকার স্বাধীনতা দাবী করা হচ্ছে তখন

* স্থিতাবস্থা থেকে চুক্তি। — সম্পাঃ

** এই সংস্করণের প্রথম খণ্ডে ১২৮-১৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

এখানে তা হবে না কেন? যে তরুণতরুণী জোড় বাঁধতে যাচ্ছে, নিজেদের ও নিজ দেহের উপর তাদের অবাধ এক্তিয়ার নেই? শিভালরির দরুন কি যৌনপ্রেম ফ্যাশন হয়ে ওঠে নি এবং নাইটদের ব্যভিচারী প্রেমের বিপরীতে স্বামীস্ত্রীর ভালবাসা কি তার সঠিক বুর্জোয়া রূপ নয়? কিন্তু পারস্পরিক প্রেম যদি বিবাহিতদের কর্তব্য হয়, তাহলে আর কাউকে নয়, শুধু পরস্পরকে বিবাহ করাই কি প্রেমিকদের কর্তব্য দাঁড়ায় না? পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি চিরাচরিত ঘটকঘটকীদের অপেক্ষা প্রেমিক-প্রেমিকার এই অধিকার কি অগ্রগণ্য নয়? যদি গির্জা ও ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের বেপরোয়া অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে, তাহলে তরুণ পুরুষের দেহমন, অর্থসম্পত্তি, সুখদুঃখের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে বয়োজ্যেষ্ঠদের অসহ্য দাবীর সামনেই-বা তা চুপ করে থাকবে কেন?

যে যুগ সমস্ত পুরানো সামাজিক বন্ধন শিথিল করে দিয়েছিল এবং সমস্ত চিরাচরিত প্রত্যয়ের ভিত্তি নড়িয়ে দিয়েছিল, সে যুগে এসব প্রশ্ন উত্থাপন অবশ্যম্ভাবী। একটি আঘাতেই দুনিয়ার পরিধি প্রায় দশগুণ হয়ে উঠল। একটি গোলার্ধের এক-চতুর্থাংশের জায়গায় পশ্চিম ইউরোপীয়দের কাছে গোটা পৃথিবীই উন্মুক্ত হল এবং এই বাকি সাত-চতুর্থাংশ ভাগ দখলের জন্য তাদের মধ্যে তাড়াহুড়া পড়ে গেল। জন্মভূমির ভেঙে পড়া সাবেকী সংকীর্ণ গন্ডীর মতো মধ্যযুগীয় চিন্তাপ্রণালী আরোপিত হাজার বছরের পুরানো সব প্রতিবন্ধও ভেঙে পড়ল। মানুষের অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টির সামনে একটি অসীম বিস্তৃত দিগন্ত উন্মোচিত হল। যে তরুণ ভারতের দৌলত এবং মেক্সিকো ও পটোসির সোনারূপার খনিতে প্রলুব্ধ, তার কাছে সাবেকী সম্ভ্রমের শুভেচ্ছা এবং বংশানুক্রমে পাওয়া সম্মানীয় গিল্ড-অধিকারের দাম কতটুকু? এ ছিল বুর্জোয়াদের ভ্রাম্যমাণ নাইটবৃত্তির যুগ; এরও ছিল নিজস্ব রোমান্স এবং নিজস্ব প্রণয়ের স্বপ্ন; কিন্তু তা বুর্জোয়াভিত্তিক এবং শেষ বিচারে বুর্জোয়া লক্ষ্যেরই অনুসারী।

বিশেষত প্রটেস্টান্ট দেশগুলি, যেখানে চলতি সমাজব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি নাড়া খেয়েছিল, সেখানে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রমেই বিবাহের ক্ষেত্রেও চুক্তির স্বাধীনতা মেনে নিল এবং উল্লিখিতভাবে তা চালু করল। বিবাহ এখনও শ্রেণীগত বিবাহই থাকল, কিন্তু শ্রেণীর চৌহদ্দির মধ্যে

পাত্রপাত্রীরা কিছুটা নির্বাচনী স্বাধীনতা পেল। এবং প্রত্যেকটি বিবাহ পারস্পরিক যৌনপ্রেমের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে এবং তার পিছনে নারী-পুরুষের সত্যকার স্বাধীন সম্মতি না থাকলে, সে বিবাহ কাগজে কলমে, নীতিতত্ত্ব ও কাব্যে যতটা অটলভাবে নীতিহীন বলে প্রমাণিত হল তার তুলনা মেলা ভার। সংক্ষেপে, প্রেমের বিবাহ মানবাধিকার হিসেবে ঘোষিত হল এবং শুধু droit de l'homme* নয়, পরন্তু, ব্যতিক্রমস্বরূপ droit de la femme** হিসেবেও ঘোষিত হল।

কিন্তু এক বিষয়ে এই মানবাধিকারের সঙ্গে অন্য সব তথাকথিত মানবাধিকারের পার্থক্য ছিল। কার্যত শেষোক্ত অধিকারগুলি শাসক শ্রেণী— বুর্জোয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল, নিপীড়িত শ্রেণী — প্রলেতারিয়েত ছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত, এবং এখানে আর একবার দেখা গেল ইতিহাসের সেই পরিহাস। শাসক শ্রেণী জ্ঞাত অর্থনৈতিক প্রভাবের অধীন বিধায় কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই কেবল তাদের মধ্যে যথার্থ স্বেচ্ছামূলক বিবাহ ঘটে; পক্ষান্তরে আমরা আগেই দেখেছি যে, নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে স্বেচ্ছামূলক বিবাহই নিয়ম।

সুতরাং, বিবাহের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা সাধারণভাবে তখনই কার্যকরী হতে পারে, যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন এবং তারই সৃষ্ট মালিকানা সম্পর্ক বিলুপ্তিক্রমে বিবাহসঙ্গী নির্বাচনে বর্তমানের শক্তিশালী গৌণ অর্থনৈতিক বিবেচনাগুলিকে অপসারণ করা সম্ভব হবে। তখন পারস্পরিক ভালোবাসা ছাড়া এক্ষেত্রে অন্যতর কোনো কারণ থাকবে না।

যেহেতু প্রকৃতিতে যৌনপ্রেম অবিমিশ্র—যদিও বর্তমানে কেবল নারীর ক্ষেত্রেই অবিমিশ্রতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত—সেজন্য যৌনপ্রেমের বিবাহ প্রকৃতিগতভাবেই একগামিতা হিসেবে বিবেচ্য। সমষ্টি-বিবাহ থেকে একক বিবাহে উত্তরণকে প্রধানত নারীকীর্তি হিসেবে চিহ্নিত করে বাখোফেন যে নির্ভুল সিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়েছিলেন তা আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি; জোড়বাঁধা বিবাহ থেকে একগামিতায় উত্তরণই কেবল পুরুষের কীর্তি এবং

* শব্দার্থ নিয়ে খেলা: 'droit de l'homme' অর্থ হল 'মানব-অধিকার' ও সেইসঙ্গে 'পুরুষের অধিকার'। — সম্পাঃ

** 'নারী-অধিকার'। — সম্পাঃ

ঐতিহাসিকভাবে এতে নারীজাতির অবস্থা ক্রমাবনত হয়েছে এবং পুরুষের বিশ্বাসহানির সুযোগ বেড়েছে। তাই নিজেদের জীবনযাত্রা এবং ততোধিক সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ, ইত্যাকার যেসব অর্থনৈতিক কারণে পুরুষের নিত্যকার বিশ্বাসহানি সহ্য করতে নারী বাধ্য, তা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই নারী যে সমতা অর্জন করবে তার ফলে সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, নারী বহুগামিনী না হয়ে বরং পুরুষই আরও কার্যকরীভাবে সত্যই একগামী হবে।

কিন্তু একগামিতার সেসব চারিত্র্যের নিশ্চিত অবলুপ্তি ঘটবে যা পুরানো মালিকানা প্রথা থেকে উদ্ভবের জন্য এর উপর মুদ্রিত হয়েছিল; এগুলি—প্রথমত, পুরুষের আধিপত্য এবং দ্বিতীয়ত, বিবাহবন্ধনের অচ্ছেদ্যতা। বিবাহ ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্য তার আর্থিক আধিপত্যেরই প্রত্যক্ষ ফল এবং আর্থিক আধিপত্য লোপের সঙ্গে সঙ্গে এর আত্মলুপ্তিও অবধারিত। বিবাহবন্ধনের অচ্ছেদ্যতার উদ্ভব অংশত একগামিতা উৎপাদক অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে এবং অংশত, এমন একটি যুগরীতি থেকে যখন এসব অর্থনৈতিক অবস্থা ও একগামিতার যোগাযোগ সঠিকভাবে বোঝা যায় নি এবং ধর্মে তা অতিরঞ্জিত ছিল। বর্তমানেও বিবাহবন্ধন হাজার বার লঙ্ঘিত। যদি প্রেমভিত্তিক বিবাহই শুধু নীতিসিদ্ধ হয়, তাহলে বিবাহ ততক্ষণই নীতিসিদ্ধ যতক্ষণ তা প্রেমপৃক্ত। ব্যক্তিগত যৌনপ্রেমের অনুভূতির স্থায়িত্ব কিন্তু ব্যক্তিভেদে, বিশেষত পুরুষদের মধ্যে খুবই বিভিন্ন হয়, তাই প্রেমের অবলুপ্তি অথবা নতুনতর প্রেমাবেগে তার প্রতিস্থাপন ঘটলে স্বামীস্ত্রী উভয়ের এবং সমাজের পক্ষেও বিচ্ছেদ আশীর্বাদস্বরূপ। প্রয়োজন শুধু বিবাহবিচ্ছেদ মামলার অযথা কাদা মাড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের রেহাই।

অতএব পুঁজিবাদী উৎপাদনের আসন্ন বিলোপের পর কীভাবে যৌনসম্পর্ক পরিচালিত হবে, সে বিষয়ে আমরা এখানে যে আন্দাজ করতে পারি সেটা প্রধানত নেতিমূলক চরিত্রের, কেবলমাত্র কী কী লোপ পাবে আতেই তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু এতে নতুন কী কী যুক্ত হবে? তা দেখা যাবে নতুন পুরুষ গড়ে ওঠার পর, এমনসব পুরুষ যাদের কখনও পয়সা বা অন্য কোনো সামাজিক ক্ষমতা দিয়ে নারী ক্রয়ের কারণ ঘটে নি, আর এমনসব

নারী যারা সত্যকার প্রেমের অনুভূতি ছাড়া আর কোনো কারণে পুরুষের কাছে আত্মদানে কখনও বাধ্য হয় নি, অথবা যাদের কোনো অর্থনৈতিক পরিণতির ভয়ে প্রণয়পাত্রের কাছে আত্মদানে বিরত হতেও হয় নি। একবার এধরনের মানুষ জন্মালে আজ তাদের যথাকর্তব্য সম্পর্কে আমাদের ভাবনায় তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না; তারা নিজেদের আচার এবং তদুপরি ব্যক্তি আচরণের পক্ষে উপভোগ্য জনমত চালু করবে,—এবং এটুকুই।

এবার মর্গানের রচনায় ফেরা যাক, যেখান থেকে আমরা অনেকটা দূরে সরে এসেছি। সভ্যযুগে যেসব সামাজিক সংস্থার উদ্ভব হয়েছে সেগুলির ঐতিহাসিক পর্যালোচনা তাঁর রচনার গণ্ডীভুক্ত নয়। তাই তিনি এযুগের একগামিতার নিয়তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তিনিও একগামী পরিবারের বিকাশকে, স্ত্রীপুরুষের পূর্ণ সমানাধিকার অর্জনকে একটি অগ্রগতি বলেই মনে করেছেন, যদিও এই লক্ষ্যে পেঁছিনো গেছে বলে তিনি মনে করেন নি। তিনি লিখেছেন কিন্তু—

'যখন এটি স্বীকৃত সত্য যে, পরিবার পর পর চারটি রূপ অতিক্রম করেছে এবং এখন তার পঞ্চম রূপ চলছে, তখন বর্তমান রূপের ভবিষ্যৎ স্থায়ীত্ব সম্পর্কে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে। এর একমাত্র উত্তর: অতীতের মতো সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে এরও অগ্রগতি হবে এবং সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে এরও পরিবর্তন ঘটবে। এটি সমাজব্যবস্থারই সৃষ্টি এবং এতে তারই অগ্রগতি প্রতিফলিত হবে। সভ্যতার সূচনার পর, এবং বিশেষত আধুনিক কালে, যখন একগামী পরিবারের অনেক উন্নতি হয়েছে তখন একথা অন্তত অনুমেয় যে, নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তার অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। সুদূর ভবিষ্যতে একগামী পরিবার সমাজের প্রয়োজনানুগ না হলে, এর স্থলবর্তীর প্রকৃতি কী হবে সে সম্বন্ধে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা এখন অসম্ভব।'

৩

ইরকোয়াস গোত্রসংগঠন

এবার আমরা মর্গানের অন্যতর একটি আবিষ্কারে আসছি যা অন্তত আত্মীয়তা বিধি থেকে পরিবারের প্রাগৈতিহাসিক রূপ পুনর্গঠনের অনুরূপ

সমান গ্রুত্বপূর্ণ। মর্গান প্রমাণ করেছেন যে, আমেরিকার ইন্ডিয়ান উপজাতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন পশুর নামধারী আত্মীয়মণ্ডলীগুলি মূলত গ্রীকদের genea এবং রোমানদের gentes থেকে অভিন্ন; আমেরিকার এই রূপটিই আদি রূপ এবং গ্রীক ও রোমানদের রূপগুলি পরবর্তী ও তদ্ভূত; গ্রীক ও রোমানদের আদিকালে গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির সমগ্র সমাজসংগঠনের একটি নিখুঁত সমান্তরাল রূপ আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মধ্যে দেখা যায়; সভ্যতায় প্রবেশ অবধি, এমন কি তারপরেও সমস্ত বর্বরদের মধ্যে গোত্র প্রথা যে একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান (অদ্যাবধি প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী) ছিল তা প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ও রোমানদের আদি ইতিহাসের দুর্বোধ্যতম একটি অধ্যায় মুহূর্তে পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল; একই সঙ্গে এই আবিষ্কারটি **রাষ্ট্রের** সূচনাকালের পূর্ববর্তী প্রাচীন সমাজসংগঠনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির উপর অপ্রত্যাশিতভাবে আলোকপাত করল। জানার পর যতই সোজা মনে হোক, মর্গান খুব সম্প্রতি এটি আবিষ্কার করেন; ১৮৭১ সালে প্রকাশিত তাঁর পূর্ববর্তী রচনায়* এই গূঢ় তথ্যটি তিনি আঁচ করতে পারেন নি, যার আবিষ্কারে ইংরেজদের মতো সাধারণত অতি আত্মবিশ্বাসী প্রাগৈতিহাস বিষয়ক পণ্ডিতরাও কিছুদিনের জন্য মূষিকের স্তব্ধতা অবলম্বনে বাধ্য হন।

এই রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়মণ্ডলীর জন্য মর্গান সাধারণ আখ্যা হিসেবে ল্যাটিন ভাষার gens শব্দটি ব্যবহার করেছেন; এটি গ্রীক প্রতিশব্দ genos-এর মতোই তাদের সাধারণ আর্য মূল gan থেকে উদ্ভূত (জার্মান ভাষায় আর্য ভাষার g-এর জায়গায় যেখানে সাধারণত k ব্যবহৃত হয়, সেখানে এটি হয় kan), যার অর্থ 'জনন'। Gens, genos, সংস্কৃত ভাষার 'জনস্', পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী গথদের kuni, প্রাচীন নর্ডিক ও অ্যাংলোস্যাক্সনদের kyn, ইংরেজীর kin, মধ্য জার্মানির উচ্চভূমির künne, এসমস্ত শব্দ গোত্র ও বংশের দ্যোতক। কিন্তু ল্যাটিন শব্দ gens আর গ্রীক শব্দ genos এমনসব রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়মণ্ডলীর জন্য ব্যবহৃত যেগুলি একই বংশোদ্ভূত বলে গর্বিত (এক্ষেত্রে একই সাধারণ পুরুষ থেকে উদ্ভূত),

---

* এই খণ্ডের ১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

এবং কয়েকটি বিশিষ্ট সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্থা মারফৎ এগুলি একটি বিশেষ গোষ্ঠী হিসেবে পরস্পরযুক্ত, যদিও এতকাল পর্যন্ত আমাদের সমস্ত ঐতিহাসিকদের কাছে এর উৎপত্তি ও প্রকৃতি অস্পষ্ট ছিল।

গোত্রের আদি রূপ কীভাবে সংগঠিত পুনালুয়া পরিবার সম্পর্কিত পূর্বের আলোচনায় আমরা তা দেখেছি। যে সমস্ত লোক পুনালুয়া বিবাহের ফলে এবং অনিবার্যভাবেই সেখানকার প্রচলিত মুখ্য ধারণানুযায়ী একজন নির্দিষ্ট গোত্র প্রতিষ্ঠাত্রীর বংশধররূপে পরিগণিত, তাদের নিয়েই এ গোত্র। এরূপ পরিবারে পিতৃত্ব অনিশ্চিত বিধায় মাতৃধারাই একমাত্র প্রামাণ্য। যেহেতু ভাইরা নিজ বোনদের বিবাহ করতে পারে না তারা অন্য বংশের মেয়েদের বিবাহ করতে বাধ্য, তাই এই শেষোক্ত মেয়েদের সন্তানসন্ততি মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী গোত্রবহিস্থ। অতএব প্রত্যেক প্রজন্মের শুধু কন্যাদের সন্তানরাই আত্মীয়মন্ডলীর অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং ছেলেদের সন্তানসন্ততি তাদের মায়ের গোত্রভুক্ত হয়। অতএব একই উপজাতির মধ্যে, অনুরূপ ধরনের বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে এই রক্তসম্পর্কিত গোষ্ঠীটি যে পৃথক হয়ে যাচ্ছে, তার রূপ তখন কী হয়?

মর্গানের কাছে আদি গোত্রের চিরায়ত রূপ হিসেবে ইরকোয়াস গোত্র, বিশেষত সেনেকা উপজাতির গোত্রই চিহ্নিত হয়েছে। এই উপজাতির বিভিন্ন পশুর নামধারী গোত্র আটটি: ১) নেকড়ে, ২) ভল্লুক, ৩) কচ্ছপ, ৪) বীবর, ৫) হরিণ, ৬) কাদাখোঁচা, ৭) বক, ৮) বাজপাখি। প্রত্যেকটি গোত্রে নিম্নলিখিত আচার প্রচলিত:

১। এরা একজন সাচেম (শান্তিকালীন প্রধান ব্যক্তি) এবং একজন সর্দার (যুদ্ধকালীন প্রধান ব্যক্তি) নির্বাচন করে। গোত্রের মধ্য থেকে সাচেম নির্বাচনই নিয়ম এবং তার পদ গোত্রের মধ্যে বংশানুক্রমিক এই অর্থে যে, পদটি শূন্য হলে তৎক্ষণাৎ তা পূরণ করতে হয়; সর্দার গোত্রের বাইরে থেকেও নির্বাচিত করা চলত এবং পদটি কখন শূন্যও থাকতে পারত। পূর্বতন সাচেমের পুত্র কখনও তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারত না, কারণ ইরকোয়াসদের মধ্যে মাতৃ-অধিকার প্রচলিত ছিল এবং সেইজন্য ছেলে অন্য গোত্রভুক্ত হত; কিন্তু ভাই অথবা ভাগিনেয় প্রায়ই এ পদে নির্বাচিত হত। পুরুষ ও নারী সকলেই নির্বাচনে ভোট দিত। কিন্তু এই নির্বাচন অপর

সাতটি গোত্রের অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল এবং কেবল তখনই নির্বাচিত ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করা হত, আর সেটা হত সমগ্র ইরকোয়াস উপজাতি সম্মিলনীর সাধারণ পরিষদ দ্বারা। পরে এর তাৎপর্য স্পষ্টতর হবে। গোত্রের মধ্যে সাচেমের কর্তৃত্ব ছিল পিতৃসুলভ ও নিছক নৈতিক চারিত্র্যের; বলপ্রয়োগের কোনো ক্ষমতা তার হাতে থাকত না। নিজ পদাধিকারে সে ছিল সেনেকা উপজাতি পরিষদের একজন সভ্য তথা ইরকোয়াস সম্মিলনীর সাধারণ পরিষদেরও সভ্য। সর্দার কেবলমাত্র যুদ্ধাভিযানের সময় হুকুম দিতে পারত।

২। গোত্র ইচ্ছামতো সাচেম ও সর্দারকে পদচ্যুত করতে পারত। এটাও নারী ও পুরুষ উভয়েই মিলিতভাবে স্থির করত। অতঃপর পদচ্যুত ব্যক্তি অপর সকলের মতো সাধারণ যোদ্ধা ও সাধারণ ব্যক্তি বলে পরিগণিত হত। উপজাতি পরিষদ গোত্রের মতের বিরুদ্ধেও সাচেমকে পদচ্যুত করতে পারত।

৩। কোনো লোকই নিজের গোত্রের মধ্যে বিয়ে করতে পারত না। এটাই গোত্রের মূল নিয়ম, এ বন্ধনেই গোত্র সংসক্ত; যে অতি ইতিবাচক রক্তসম্পর্কের জোরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা একত্রে সত্যকার গোত্র গড়ে তোলে, এটি তার নেতিবাচক প্রকাশ। মর্গান এই সহজ ব্যাপারটি আবিষ্কার করে সর্বপ্রথম গোত্রের প্রকৃতি প্রকাশ করলেন। ইতিপূর্বে গোত্রের প্রকৃতি যে কত কম জানা ছিল, বন্য ও বর্বরদের সম্পর্কে ইতিপূর্বের বিবরণ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়; সেখানে গোত্রসংগঠনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীকে অজ্ঞতার সঙ্গে নির্বিচারে উপজাতি, গোষ্ঠী, গোত্র, প্রভৃতি বলা হয়েছে; এদের সম্পর্কে আবার কখন কখন বলা হয়েছে, এরকম গোষ্ঠীর ভিতরে বিবাহ নিষিদ্ধ। এতে এমন একটি অসম্ভব তালগোলের সৃষ্টি হয় যেখানে ম্যাক-লেনানের নেপোলিয়নসদৃশ হস্তক্ষেপে শৃঙ্খলা আসে এই ফতোয়ায়: সমস্ত উপজাতি দুই ভাগে বিভক্ত, এক দলের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ (বহির্বৈবাহিক) এবং অন্য দলে নিজেদের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত (অন্তর্বৈবাহিক)। এভাবে সমস্ত ব্যাপারটিকে একেবারে গুলিয়ে দিয়ে তাঁর সৃষ্ট দুটি আজব শ্রেণী — বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহের মধ্যে কোনটি আগে ও কোনটি পরে তা নিয়ে গভীর গবেষণায় তিনি মেতে উঠতে পারলেন। রক্তসম্পর্কিত গোত্র এবং সেহেতু গোত্র সভ্যদের মধ্যে বিবাহের অসম্ভাব্যতা

আবিষ্কারের পরে এই অর্থহীন চেষ্টা আপনা-আপনিই থেমে গেল।—স্পষ্টতই ইরকোয়াসদের আমরা বিকাশের যে স্তরে দেখি, তাতে গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষেধের নিয়ম দৃঢ়ভাবে পালিত হত।

৪। মৃত ব্যক্তিদের সম্পত্তি গোত্রের বাকি সভ্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত,—এই সম্পত্তি গোত্রের মধ্যে রাখা অপরিহার্য ছিল; যেহেতু একজন ইরকোয়াস তেমন বেশি কিছু রেখে যেতে পারত না, তাই এই উত্তরাধিকার গোত্রের নিকটতম আত্মীয়দের মধ্যেই ভাগ করা হত; পুরুষের মৃত্যুতে তা পেত সহোদর ভাইবোন ও নিজ মাতুলরা; স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে তা যেত নিজ ছেলেমেয়ে ও সহোদর বোনদের কাছে, কিন্তু ভাইদের কাছে নয়। ঠিক এ কারণেই স্বামী বা স্ত্রী একে অন্যের এবং ছেলেমেয়েরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত না।

৫। গোত্রের সভ্যরা পরস্পরের সাহায্য ও প্রতিরক্ষায়, বিশেষত বাইরের কেউ কোনো ক্ষতি করলে তার প্রতিশোধ নিতে বাধ্য ছিল। নিজ নিরাপত্তার জন্য ব্যক্তিবিশেষ গোত্রের রক্ষণাবেক্ষণের উপর নির্ভর করত এবং করতে পারত; ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি সমগ্র গোত্রের ক্ষতি হিসেবেই বিবেচিত হত। এথেকে অর্থাৎ গোত্রের রক্তবন্ধন থেকেই রক্তের প্রতিহিংসা নেবার দায়িত্বের উদ্ভব; ইরকোয়াসরা শর্তহীনভাবে এটি মানত। গোত্রের বাইরের কেউ গোত্রের কোনো সভ্যকে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির গোটা গোত্র প্রতিশোধের শপথ নিতে বাধ্য ছিল। প্রথমত মিটমাটের চেষ্টা হত; হত্যাকারীর গোত্র পরিষদের অধিবেশন বসত এবং নিহত ব্যক্তির গোত্র পরিষদের কাছে ব্যাপারটি শান্তিতে মীমাংসার জন্য প্রধানত দুঃখপ্রকাশ করে ও দামী জিনিস উপহার দিয়ে প্রস্তাব পাঠানো হত। প্রস্তাবটি গৃহীত হলে ব্যাপারটি সেখানে মিটে যেত। অন্যথা নিহত ব্যক্তির গোত্রের এক বা একাধিক ব্যক্তির উপর প্রতিশোধের ভার দেওয়া হত, তাদের কর্তব্য হত হত্যাকারীর পিছনে লেগে থেকে তাকে হত্যা করা। কাজটি সম্পন্ন হলে নিহত ব্যক্তির গোত্রের অভিযোগ করার কোনো অধিকার থাকত না; ধরে নেওয়া হত যে, ব্যাপারটি মিটে গেল।

৬। গোত্রের একটি বা একপ্রস্থ নির্দিষ্ট নাম থাকে, যা সমস্ত উপজাতির মধ্যে কেবলমাত্র এরাই ব্যবহার করতে পারে, যাতে একজনের নাম থেকেই

তার গোত্রপরিচয় বোঝা সম্ভব হয়। গোত্রনামের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে গোত্রের অধিকারগুলিও জড়িত।

৭। গোত্র বিজাতীয়দেরও নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে এবং তার ফলে এই বিজাতীয়রা গোটা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হয়। যেসব যুদ্ধবন্দীদের মেরে ফেলা হত না তাদের এভাবে কোনো গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করে সেনেকা উপজাতির সভ্য করা হত এবং ফলে তারা উপজাতি ও গোত্রের পূর্ণ অধিকার লাভ করত। গোত্র সদস্যদের ব্যক্তিগত প্রস্তাবে এদের গ্রহণ করা হত: পুরুষরা বহিরাগতকে ভাই বা বোন বলে এবং নারীরা সন্তান বলে গ্রহণ করত; ব্যবস্থাটি পাকাপোক্ত করবার জন্য গোত্র কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হত। যেসব গোত্রের জনসংখ্যা বিশেষ কোনো অবস্থার জন্য হ্রাস পেত তারা অপর কোনো গোত্র থেকে তার সম্মতিক্রমে নিজেদের মধ্যে ব্যাপকভাবে লোক গ্রহণ করত। ইরকোয়াসদের ভেতর উপজাতি পরিষদের প্রকাশ্য সভায় গোত্রে লোক গ্রহণের অনুষ্ঠান হত যা কার্যত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রূপ নিত।

৮। ইণ্ডিয়ান গোত্রের মধ্যে বিশেষ ধর্মীয় আচারের প্রমাণ পাওয়া শক্ত, কিন্তু তবুও ইণ্ডিয়ানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি কমবেশি গোত্রসংশ্লিষ্ট। ইরকোয়াসদের বার্ষিক ছয়টি ধর্মোৎসবে এক-একটি গোত্রের সাচেম ও সর্দারদের পদাধিকারবলে 'ধর্মরক্ষক' হিসেবে গণ্য হত এবং তারা পুরোহিতের কাজ করত।

৯। গোত্রের একটি সাধারণ সমাধিস্থান থাকত। নিউ ইয়র্ক রাজ্যের যে ইরকোয়াসরা শ্বেতাঙ্গদের বেষ্টনীর মধ্যে পড়েছে, তাদের এখন এই সমাধিস্থান লোপ পেলেও তা আগে ছিল। অন্যান্য ইণ্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে এটা এখনও আছে, দৃষ্টান্ত হিসেবে ইরকোয়াসদের অতি ঘনিষ্ঠ একটি উপজাতি টুস্কারোরাসের কথা উল্লেখ্য। এরা খৃস্টান হয়ে গেলেও এখনও এদের সমাধিস্থানে প্রত্যেকটি গোত্রের জন্য এক-একটি পৃথক সারি আছে, যেখানে একই সারিতে মা ও সন্তানসন্ততিদের কবর দেওয়া হয়, কিন্তু পিতাকে নয়। ইরকোয়াসদের মধ্যেও গোত্রের সমস্ত সদস্যই অন্ত্যেষ্টিতে অংশগ্রহণ করে কবর তৈরিতে শরিক হয় এবং অন্ত্যেষ্টি ভাষণ দেয়, ইত্যাদি।

১০। গোত্রের একটি পরিষদ — গোত্রের সমস্ত পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও

নারীদের সমানাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত একটি গণতান্ত্রিক সভা থাকত। এই পরিষদ সাচেম ও সর্দারদের এবং একইভাবে অন্যান্য 'ধর্মরক্ষক'ও নির্বাচন ও খারিজ করত; এই পরিষদ গোত্রের নিহত সদস্যদের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দানদক্ষিণা (wergild) অথবা রক্তপ্রতিশোধের সিদ্ধান্ত নিত, বাইরের লোকদের গোত্রে গ্রহণ করত। সংক্ষেপে এটি গোত্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা।

এই হল একটি সাধারণ ইণ্ডিয়ান গোত্রের ক্ষমতার বর্ণনা।

'একটি ইরকোয়াস গোত্রের সকল সদস্য ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন এবং পরস্পরের স্বাধীনতা রক্ষায় বাধ্য; ব্যক্তিগত অধিকারের দিক দিয়ে তারা সমান, সাচেম ও সর্দারদের কোনো সুযোগসুবিধা নেই; তারা রক্তবন্ধনে আবদ্ধ একটি ভ্রাতৃমণ্ডলী। কদাচ সূত্রবদ্ধ করা না হলেও মুক্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ছিল গোত্রের মৌলিক নীতি; আবার গোত্র একটি সমাজব্যবস্থার একক যা ইণ্ডিয়ানদেরও সংগঠিত সমাজের বুনিয়াদ। ইণ্ডিয়ানদের চরিত্রের সর্বজনস্বীকৃত বৈশিষ্ট্য—স্বাধীনতাবোধ ও ব্যক্তিগত মর্যাদাজ্ঞানের ব্যাখ্যা এর থেকেই পাওয়া যায়।'

আমেরিকা আবিষ্কারের সময়ে সমগ্র উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা মাতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্রে সংঘবদ্ধ ছিল। ডাকোটার মতো কয়েকটিমাত্র উপজাতির মধ্যে গোত্র তখন অবক্ষয়িত এবং ওজিবোয়া ও ওমাহা প্রভৃতি অন্য কয়েকটি উপজাতির মধ্যে পিতৃ-অধিকারভিত্তিক গোত্র সংগঠিত হয়েছিল।

সংখ্যাবহুল যেসব ইণ্ডিয়ান উপজাতির পাঁচ বা ছয়ের বেশি গোত্র ছিল, সেগুলির মধ্যে তিনটি, চারটি বা ততোধিক গোত্রসমবায়ে গঠিত একটি বিশিষ্ট সমষ্টি দেখা যায়। ইণ্ডিয়ান ভাষার হুবহু গ্রীক অনুবাদে মর্গান এর নাম দেন ফ্রাত্রী (ভ্রাতৃত্ব)। তদনুসারে সেনেকা উপজাতির দুটি ফ্রাত্রী আছে, প্রথমটিতে এক থেকে চার এবং দ্বিতীয়টিতে পাঁচ থেকে আট নম্বর গোত্র রয়েছে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, এই ফ্রাত্রীগুলি প্রধানত সেসব আদি গোত্র যাতে উপজাতিটি শুরুতে বিভক্ত ছিল; কারণ, অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ হবার পর প্রত্যেকটি উপজাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পক্ষে অন্তত দুটি গোত্রের অস্তিত্ব অপরিহার্য ছিল। উপজাতির লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রত্যেকটি গোত্র আবার দুই বা ততোধিক গোত্রে বিভক্ত হয় এবং এরা প্রত্যেকে একটি স্বতন্ত্র গোত্রের রূপ নেয় আর আদি

গোত্রটি সন্ততি গোত্রগুলি নিয়ে ফ্রাত্রীর রূপ গ্রহণ করে। সেনেকা ও অন্য অধিকাংশ ইণ্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে একটি ফ্রাত্রীর অন্তর্ভুক্ত গোত্রগুলি ভ্রাতৃ গোত্র, অপরপক্ষে অন্য ফ্রাত্রীর গোত্ররা তাদের 'কাজিন' গোত্র। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের আত্মীয়তা বিধির এই নামকরণের যে অতি বাস্তব এবং অর্থব্যঞ্জক তাৎপর্য আছে তা আমরা আগেই দেখেছি। প্রথমে কোনো সেনেকা নিজের ফ্রাত্রীর মধ্যে বিবাহ করতে পারত না; কিন্তু নিষেধটি অনেককাল আগেই প্রত্যাহৃত হয়ে এখন কেবল তা গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। সেনেকাদের লোককাহিনী অনুযায়ী 'ভল্লুক' ও 'হরিণ' দুটি আদি গোত্র এবং অবিশিষ্টরা এদের শাখাপ্রশাখা। এধরনের নতুন সংগঠন দৃঢ়মূল হবার পরেই প্রয়োজনমতো এর পরিবর্তন ঘটানো হত। কোনো ফ্রাত্রীর গোত্রগুলি নিশ্চিহ্ন হলে ভারসাম্য রক্ষার জন্য অন্য ফ্রাত্রীর মধ্য থেকে কখন কখন সম্পূর্ণ গোত্রকে এই ফ্রাত্রীতে স্থানান্তরিত করা হত। বিভিন্ন উপজাতির ফ্রাত্রীগুলিতে একই নামের গোত্রের বিভিন্ন সন্নিবেশ এভাবেই ব্যাখ্যেয়।

ইরকোয়াস ফ্রাত্রীর কাজ অংশত সামাজিক এবং অংশত ধর্মীয়।— ১) দুটি ফ্রাত্রীর মধ্যে বল খেলা হয়; প্রতিটি ফ্রাত্রী নিজ শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের আনে এবং ফ্রাত্রীর বাকি সদস্যরা দর্শক হয়ে ফ্রাত্রী অনুযায়ী স্থান নেয় এবং নিজ নিজ ফ্রাত্রীর জয়লাভের জন্য বাজি ধরে।— ২) উপজাতি পরিষদের অধিবেশনে প্রত্যেকটি ফ্রাত্রীর সাচেম ও সর্দাররা দুটি দলে মুখোমুখি হয়ে একত্রে বসে এবং প্রত্যেক বক্তা প্রতিটি ফ্রাত্রীর প্রতিনিধিদের পৃথক সংস্থা হিসেবে সম্ভাষণ করে।— ৩) যদি উপজাতির মধ্যে কোনো লোক নিহত হয় এবং নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারী একই ফ্রাত্রীর সভ্য না হয়, তাহলে নিহতের গোত্র নিজ ভ্রাতৃ গোত্রগুলির কাছে আবেদন জানায় এবং এরা ফ্রাত্রী পরিষদ ডেকে গোটা সংস্থা হিসেবে অন্য ফ্রাত্রীর কাছে ব্যাপারটি মীমাংসার জন্য সেই ফ্রাত্রীর পরিষদ আহ্বান করতে বলে। এখানেও আবার ফ্রাত্রী আদি গোত্র রূপেই আবির্ভূত এবং এর সন্তানস্বরূপ দুর্বল একক গোত্রের চেয়ে তার পক্ষে সফল হওয়ার সম্ভাবনা অধিকতর। — ৪) পদস্থ কোনো ব্যক্তির মৃত্যুতে অপর ফ্রাত্রী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধির ব্যবস্থা করে এবং মৃতের ফ্রাত্রীর লোকেরা শোকযাত্রী হিসেবে তার অনুগামী হয়। কোনো সাচেমের মৃত্যুতে অপর ফ্রাত্রী ইরকোয়াসদের সম্মিলনী

পরিষদকে এই শূন্য পদ সম্পর্কে অবহিত করে। — ৫) সাচেম নির্বাচনের সময় ফ্রাত্রী পরিষদের পুনরাবির্ভাব ঘটে। নির্বাচনে ভ্রাতৃ গোত্রের সমর্থন প্রায় অবধারিত হলেও অন্য ফ্রাত্রীর গোত্রগুলি বিরোধিতা করতে পারত। এমতাবস্থায় প্রথম ফ্রাত্রী পরিষদের বৈঠক হত এবং তারা বিরোধীদের সমর্থন করলে নির্বাচন বাতিল হয়ে যেত। — ৬) আগেকার দিনে ইরকোয়াসদের বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় গুহ্যাচার ছিল যেগুলিকে শ্বেতাঙ্গরা medicine-lodges* আখ্যা দিয়েছিল। নতুন সদস্য গ্রহণের জন্য নিয়মিত দীক্ষানুষ্ঠানের জন্য সেনেকাদের মধ্যে প্রতি ফ্রাত্রী থেকে এক-একটি করে দুটি ধর্মীয় ভ্রাতৃমণ্ডলী দ্বারা এধরনের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হত। — ৭) দেশজয়ের সময় (২১) যে চারটি lineages (বংশধারা) ট্‌লাস্কালা'র চারটি এলাকা অধিকার করেছিল তারা যদি চারটি ফ্রাত্রী হয়ে থাকে, যা প্রায় নিশ্চিত, তাহলে প্রমাণিত হয় যে এই ফ্রাত্রীগুলি গ্রীক অথবা জার্মানদের সমজাতীয় আত্মীয়গোষ্ঠীর মতো সামরিক একক হিসেবেও কাজ করত; এই চারটি lineages পৃথক সৈন্যদল হিসেবে নিজ উর্দি ও পতাকা নিয়ে এবং নিজ নেতার অধীনে যুদ্ধে যেত।

যেমন কয়েকটি গোত্র নিয়ে একটি ফ্রাত্রী, তেমনই গোত্র প্রথার চিরায়ত রূপ হিসেবে কয়েকটি ফ্রাত্রী মিলে একটি উপজাতি গঠিত হত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু উপজাতির এই মধ্যন্তর বা ফ্রাত্রী দেখা যায় না। আমেরিকায় ইন্ডিয়ান উপজাতিগুলির বৈশিষ্ট্য কি কি?

১। নিজ ভূখণ্ড ও নিজ নামের অস্তিত্ব। প্রত্যক্ষ বসবাসের এলাকা ছাড়াও প্রত্যেকটি উপজাতির দখলে মাছ ধরা ও পশু শিকারের জন্য যথেষ্ট বিস্তীর্ণ অঞ্চল থাকত। তা পেরিয়ে প্রতিবেশী উপজাতির দখলী অঞ্চল অবধি বেশ বিস্তৃত নিরপেক্ষ ভূখণ্ড থাকত; দুটি প্রতিবেশী উপজাতির ভাষা সমগোত্রীয় হলে এই নিরপেক্ষ ভূখণ্ড অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ, এবং অন্যথা তা বিস্তৃততর হত। এরকম নিরপেক্ষ ভূখণ্ডই ছিল জার্মানদের সেই সীমান্ত অরণ্য, সিজারের সুয়েভ (Suev) সৃষ্ট নিজ ভূখণ্ডের চারপাশের ঊষরভূমি, দিনেমার ও জার্মানদের মধ্যবর্তী îsarnholt (ডেনিশ—

---

* ওঝা সভা। — সম্পাঃ

jarnved, limes Danicus), জার্মান ও স্লাভদের সীমান্তবর্তী স্যাক্সন অরণ্য এবং branibor (স্লাভ ভাষায় — 'প্রতিরক্ষা অরণ্য') যা থেকে ব্রান্ডেনবুর্গ নামের উদ্ভব। এভাবে অস্পষ্ট সীমানার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডটি ছিল উপজাতির সাধারণ ভূমি যা প্রতিবেশী উপজাতিরা স্বীকার করত এবং উপজাতিও বহিরাক্রমণ থেকে ভূমিটি রক্ষা করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যধিক জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রেক্ষিতেই শুধু এই অনিশ্চিত সীমানা নিয়ে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হত। — উপজাতির নামকরণ চিন্তাপ্রসূত বলে মনে হয় না, সম্ভবত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি আকস্মিকতার ফল। কালক্রমে এমনটি প্রায়ই ঘটত যে, কোনো উপজাতি প্রতিবেশী উপজাতিকে তাদের একটি নিজস্ব নামের বদলে অন্য নাম দিয়েছে। জার্মানরাই (die Deutschen) এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এদের প্রথম ব্যাপক ঐতিহাসিক 'জার্মান' (Germanen) নামটি কেল্টদেরই দেওয়া।

২। একটি উপজাতির একটি বিশেষ **উপভাষা**। বস্তুত উপজাতি ও উপভাষা মোটামুটি সন্নিপাতী। অল্প কিছুকাল আগেও আমেরিকায় বিভাগের মধ্যে নতুন নতুন উপজাতি ও উপভাষা সৃষ্টির প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল এবং মনে হয় এখনও তা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয় নি। যেখানে দুটি ক্ষয়িষ্ণু উপজাতির মিলনে একটি উপজাতি গড়ে ওঠে, সেখানে ব্যতিক্রম হিসেবে একই উপজাতির মধ্যে দুটি ঘনিষ্ঠ উপভাষার ব্যবহার দেখা যায়। এক-একটি আমেরিকান উপজাতির জনসংখ্যা গড়ে দুই হাজারের কম। চেরোকী উপজাতির লোকসংখ্যা কিন্তু প্রায় ২৬,০০০ — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানদের মধ্যে এরাই সর্বাধিক সংখ্যক যারা একই উপভাষাভাষী।

৩। গোত্রগুলি দ্বারা নির্বাচিত সাচেম ও সর্দারদের সাড়ম্বরে ক্ষমতাভিষিক্ত করার অধিকার।

৪। গোত্রের মতের বিরুদ্ধে হলেও উপরোক্তদের অপসারণের অধিকার। যেহেতু সাচেম ও সর্দারেরা উপজাতি পরিষদেরও সদস্য, সেজন্য তাদের উপর উপজাতির এই অধিকার স্বব্যাখ্যেয়। যেখানে অনেক উপজাতি মিলে একটি সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রত্যেক উপজাতিই সম্মিলনী পরিষদে প্রতিনিধি পাঠায়, সেখানে উক্ত অধিকার এই শেষোক্ত পরিষদের উপরই ন্যস্ত হয়।

৫। একটি সাধারণ ধর্মীয় ধ্যানধারণা (পুরাকথা) ও পূজাপদ্ধতির অস্তিত্ব।

'বর্বরদের ধরন অনুযায়ী আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরাও ছিল ধর্মপ্রাণ।'*

তাদের পুরাকথা সম্পর্কে এখনও কোনোভাবেই কোনো বিচার-বিশ্লেষণ হয় নি। তারা ধর্মের ধারণাগুলিকে নানা ধরনের ভূতপ্রেতের আকারে মানবীয় রূপ দান করেছিল — কিন্তু বর্বরতার নিম্নস্তরে থাকায় তাদের মধ্যে তখনও মূর্তি রচনা, তথাকথিত দেবমূর্তির প্রচলন শুরু হয় নি। এ ছিল বহু-ঈশ্বরবাদের লক্ষ্যে বিকাশমান প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক শক্তির পূজা। বিভিন্ন উপজাতির নিজস্ব বিশিষ্ট পূজা প্রথা — যথা, নাচ ও খেলাধূলা সম্বলিত নিয়মিত ধর্মোৎসব ছিল; প্রত্যেকটি ধর্মোৎসবে বিশেষত নৃত্য অপরিহার্য অঙ্গ ছিল; প্রতিটি উপজাতির নিজস্ব এ উৎসব পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হত।

৬। সাধারণ ব্যাপার নিষ্পত্তির জন্য একটি উপজাতি পরিষদ। এতে থাকত প্রত্যেকটি গোত্রের সাচেম ও সর্দাররা; এরাই ছিল গোত্রের প্রকৃত প্রতিনিধি, কারণ এদের যেকোনো সময়ে পদচ্যুত করা যেত। অন্যান্য সদস্যবেষ্টিত অবস্থায় প্রকাশ্যভাবে পরিষদের অধিবেশন বসত, আলোচনায় অংশগ্রহণ ও মতামত ব্যক্ত করার অধিকার সাধারণের ছিল; পরিষদই সিদ্ধান্ত করত। নিয়মানুসারে উপস্থিত প্রত্যেকেই পরিষদে ভাষণদানের অধিকারী ছিল, এমন কি নারীরাও তাদের পছন্দমতো কোনো মুখপাত্র মারফৎ নিজেদের অভিমত প্রকাশ করতে পারত। জার্মান মার্ক-গোষ্ঠীগুলির অনেক সিদ্ধান্তের মতো ইরকোয়াসদের কোনো কোনো প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলির ক্ষেত্রে সর্বসম্মতি অপরিহার্য ছিল। বিশেষত, অন্যান্য উপজাতির সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারগুলি উপজাতি পরিষদের দায়িত্বে নিষ্পন্ন হত; এরা দূত গ্রহণ ও দূত প্রেরণ করত, যুদ্ধ ঘোষণা ও সন্ধি করত। যুদ্ধ শুরু হলে প্রধানত স্বেচ্ছাসেবকরাই যুদ্ধ চালাত। সুস্পষ্ট সন্ধিবহির্ভূত সকল উপজাতির মধ্যেই নীতিগতভাবে যুদ্ধাবস্থা বর্তমান থাকত। কয়েক জন অনন্যসাধারণ

---

* L. H. Morgan. 'Ancient Society', London, 1877, p. 115. — সম্পাঃ

যোদ্ধাই সাধারণত এধরনের শত্রুদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান সংগঠন করত; তারা একটি যুদ্ধনৃত্যের ব্যবস্থা করত; এই নৃত্যে যোগদানসাপেক্ষে অভিযানে অংশগ্রহণের সম্মতি নির্ধারিত হত। তখনই একটি সৈন্যদল গঠিত হত এবং অনতিবিলম্বে তারা যুদ্ধযাত্রা করত। উপজাতির এলাকা আক্রান্ত হলে একইভাবে প্রধানত স্বেচ্ছাসেবকরাই প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করত। এই ধরনের দলের যাত্রা ও প্রত্যাবর্তনে সর্বদাই একটি সামাজিক উৎসবের উপলক্ষ সৃষ্টি হত। এধরনের অভিযানের জন্য উপজাতীয় পরিষদের মতগ্রহণ নিষ্প্রয়োজন ছিল। এমন সম্মতি চাওয়া বা দেওয়া হত না। এগুলি ছিল ঠিক সেই ট্যাসিটাস বর্ণিত জার্মান বাহিনীগুলির বেসরকারী অভিযানের মতো, কেবল পার্থক্য এই যে, জার্মানদের বাহিনীগুলি ইতিমধ্যেই অধিকতর স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করেছিল এবং শান্তিকালে একটি শক্তিশালী কেন্দ্র সংগঠিত হয়েছিল যার চারপাশে যুদ্ধকালে স্বেচ্ছাসৈনিকেরা সমবেত হত। দৈবাৎ এধরনের যোদ্ধৃবাহিনী সৈন্যসংখ্যায় শক্তিশালী হত। ইন্ডিয়ানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযান, এমন কি যেগুলি বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে যেত, সেখানেও সৈন্যসংখ্যা নগণ্য ছিল; কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কয়েকটি বাহিনী একত্র হলে প্রত্যেক দল কেবল নিজ সর্দারকেই মেনে চলত; অভিযান পরিকল্পনার সমন্বয় বিধানের দায়িত্ব এসব সর্দারদের পরিষদের উপরই ন্যস্ত ছিল। আমিয়ানাস মার্সেলিনাস বর্ণিত চতুর্থ শতাব্দীতে রাইন নদীর ঊর্ধ্বাংশের আলামান্নিরা এ ধরনেই যুদ্ধনীতিই অনুসরণ করত।

৭। কোনো কোনো উপজাতির মধ্যে অতি সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন একজন সর্বোচ্চ সর্দার দেখা যায়। সে সাচেমদেরই অন্যতম। সঙ্কটকালে পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সাময়িকভাবে দ্রুত কার্য সম্পাদনের দায় তার উপর ন্যস্ত ছিল। এটি কার্যনির্বাহী ক্ষমতাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা সৃষ্টির দুর্বল প্রচেষ্টা, কিন্তু পরবর্তী বিকাশ থেকে দেখা গেছে যে, এই প্রচেষ্টা সাধারণত উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত; বস্তুত দেখা যাবে যে, কার্যক্ষেত্রে প্রধান সেনাপতিই সর্বত্র না হলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরূপ কার্যনির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠত।

আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের বৃহত্তম অংশ উপজাতি মিলনের স্তর থেকে আর অগ্রসর হয় নি। পরস্পর থেকে বিস্তীর্ণ সীমান্তে বিচ্ছিন্ন, অবিরাম

যুদ্ধের ফলে দুর্বল, বিশাল অঞ্চলাধিকারী এসব সংখ্যাল্প উপজাতিগুলির লোকবল ছিল অল্প। সাময়িক সংকটকালে এখানে-ওখানে ঘনিষ্ঠ উপজাতিগুলির মধ্যে যে জোট দেখা দিত, বিপদ কেটে গেলে তা ভেঙে যেত। কিন্তু আদিতে আত্মীয় এবং পরে বিভক্ত হয়ে যাওয়া উপজাতিগুলি অঞ্চলবিশেষে স্থায়ী সম্মিলনীতে পুনর্মিলিত হত, এভাবে জাতি গঠনের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ চিহ্নিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইরকোয়াসদের মধ্যে এরূপ সম্মিলনীর প্রাগ্রসরতম রূপ লক্ষণীয়। মিসিসিপি নদীর পশ্চিমে — সম্ভবত যেখানে তারা সুবৃহৎ ডাকোটা আত্মীয় গোষ্ঠীর একটি শাখা ছিল, — সেখানকার আদি বাসভূমি থেকে উদ্বাস্তু হয়ে দীর্ঘ যাযাবর জীবনের পর তারা স্থায়ীভাবে যেখানে বসবাস করে সেটিই বর্তমান নিউ ইয়র্ক রাজ্য। তাদের মধ্যে উপজাতি ছিল পাঁচটি: সেনেকা, কায়ুগা, ওনন্ডাগা, ওনেইডা এবং মোহক। মাছ ধরা, পশু শিকার ও খুব প্রাথমিক পর্যায়ের কৃষিকর্মে তারা জীবনধারণ করত; প্রায়ই কাঠের বেষ্টনী-ঘেরা গ্রামে বাস করত। তাদের সংখ্যা কখনই বিশ হাজারের বেশি ছিল না এবং পাঁচটি উপজাতির মধ্যেই কয়েকটি সাধারণ গোত্র দেখা যেত; তারা একই ভাষার অন্তর্গত ঘনিষ্ঠ উপভাষায় কথাবার্তা বলত এবং পাঁচটি উপজাতির মধ্যে বিভক্ত একই অখন্ড এলাকায় বসবাস করত। ভূখন্ডটি সদ্য দখলীকৃত বিধায় বিজিত উপজাতিদের বিরুদ্ধে এদের মধ্যে অভ্যস্ত সহযোগিতা খুবই স্বাভাবিক ছিল। অন্তত ১৫শ শতকের শুরুতে তা একটি রীতিমতো 'চিরস্থায়ী সম্মিলনী' বা কন্‌ফেডারেসীর রূপ নেয় ও সদ্যলব্ধ নিজ ক্ষমতার চেতনায় আক্রমণকারীর চারিত্র্য গ্রহণ করে এবং ১৬৭৫ সাল নাগাদ ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছে চারপাশের বিস্তীর্ণ ভূখন্ড দখলক্রমে কোথাও অধিবাসীদের তাড়িয়ে দেয় কোথাও-বা তাদের করদানে বাধ্য করে। ইরকোয়াস সম্মিলনী ছিল বর্বরতার নিম্নস্তর অনুত্তীর্ণ ইন্ডিয়ানদের (অর্থাৎ মেক্সিকান, নব-মেক্সিকান ও পেরুবাসী ব্যতীত), পরিণততম সামাজিক সংগঠন। এই সম্মিলনীর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:

১। সম্পূর্ণ সমানাধিকার এবং উপজাতির অভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপারে স্বাধীনতার ভিত্তিতে পাঁচটি রক্তসম্পর্কিত উপজাতির চিরস্থায়ী সম্মিলনী।

রক্তসম্পর্কই ছিল এর সত্যকার ভিত্তি। পাঁচটি উপজাতির মধ্যে তিনটিকে পিতৃ উপজাতি বলা হত এবং এগুলি পরস্পর ভ্রাতৃপদবাচ্য ছিল; অবশিষ্ট দুটিকে পুত্র উপজাতি বলা হত এবং এগুলিও একইভাবে পরস্পর ভ্রাতৃসম্পর্কিত ছিল। প্রাচীনতম গোত্রত্রয়ের জীবিত প্রতিনিধিদের পাঁচটি উপজাতির মধ্যেই এবং অন্যতর গোত্রত্রয়ের সভ্যদের তিনটি উপজাতির মধ্যে দেখা যেত। এসব গোত্রের লোকেরা সমগ্র পাঁচটি উপজাতির মধ্যেই পরস্পর ভ্রাতৃসম্পর্কিত ছিল। নিতান্ত উপভাষার কিছু পার্থক্যসহ এদের সাধারণ ভাষাই ছিল তাদের অভিন্ন বংশজনির প্রকাশ ও প্রমাণ।

২। সম্মিলনীর সংস্থা একটি সম্মিলনী পরিষদ, তাতে একই পদমর্যাদা ও অধিকার সম্পন্ন পঞ্চাশজন সাচেম থাকত; সম্মিলনী সংক্রান্ত ব্যাপারে এই পরিষদই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত।

৩। সম্মিলনী গঠনকালে এই পঞ্চাশজন সাচেমকে নতুন পদাধিকারী হিসেবে উপজাতি ও গোত্রগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয়; এ পদগুলি বিশেষত সম্মিলনীর উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই তৈরি। শূন্যপদ গোত্রগুলিই নতুন লোক নির্বাচনক্রমে পূরণ করত এবং সবসময়ই তাকে অপসারিত করা যেত; কিন্তু সাচেমকে পদাধিষ্ঠিত করার অধিকার ছিল কেবল সম্মিলনী পরিষদের।

৪। সম্মিলনী পরিষদের সাচেমরা নিজ নিজ উপজাতিরও সাচেম ছিল এবং প্রত্যেকেরই উপজাতি পরিষদে একটি আসন ও একটি ভোট ছিল।

৫। সম্মিলনী পরিষদের সমস্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হওয়াই নিয়ম ছিল।

৬। উপজাতি পরিসরে ভোট হত, ফলে বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তার আগে প্রত্যেক উপজাতি ও তার পরিষদের সমস্ত সভ্যের একমত হওয়া প্রয়োজন হত।

৭। পাঁচটি উপজাতি পরিষদের যেকোনোটি সম্মিলনী পরিষদ আহ্বান করতে পারত, কিন্তু সম্মিলনী পরিষদের স্বেচ্ছায় সভা আহ্বানের ক্ষমতা ছিল না।

৮। সমবেত জনতার উপস্থিতিতে পরিষদের অধিবেশন বসত। যেকোনো ইরকোয়াসেরই সেখানে কথা বলার অধিকার ছিল, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত কেবলমাত্র পরিষদ।

৯। সম্মিলনীর সরকারীভাবে কোনো শীর্ষব্যক্তি অথবা কোনো প্রধান কর্মকর্তা থাকত না।

১০। কিন্তু সম্মিলনীর দুজন সমানাধিকার ও ক্ষমতাবিশিষ্ট সর্বোচ্চ সর্দার ছিল (স্পার্টার দুজন 'রাজা' ও রোমের দুজন কন্সাল)।

এই হল গোটা সামাজিক ব্যবস্থা যা নিয়ে ইরকোয়াসরা চার শ' বছর কাটিয়েছে এবং আজও কাটাচ্ছে। আমি মর্গানের বিবরণ অনুসারে একটু বিশদ করেই এই ব্যবস্থা বর্ণনা করেছি এজন্য যে, এখানে আমরা এমন একটি সমাজসংগঠন পর্যালোচনার সুযোগ পাচ্ছি যেখানে তখন পর্যন্ত কোনো **রাষ্ট্র** দেখা দেয় নি। রাষ্ট্র বলতে একটি বিশেষ সামাজিক কর্তৃপক্ষ বোঝায় যা প্রাধিকারীর স্থায়ী উপাদানগুলির সমগ্রতা থেকে পৃথক; মাউরার নির্ভুলভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে জার্মান মার্কের গঠনতন্ত্র রাষ্ট্র থেকে মূলগতভাবে পৃথক, এটি একটি বিশুদ্ধ সামাজিক সংগঠন যদিও পরে এটিই অনেকাংশে রাষ্ট্রের ভিত্তি নির্মাণের কাজ করেছিল। মার্ক, গ্রাম, মহাল (manors) ও নগরগুলির মূল গঠনতন্ত্র থেকে তথা তার পাশাপাশি কীভাবে সরকারী কর্তৃপক্ষের ক্রমিক উদ্ভব ঘটল মাউরার তাঁর সমস্ত রচনায় তাই সন্ধান করেছেন। উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের থেকে দেখা যায়: আদিতে সংঘবদ্ধ একটি উপজাতি ক্রমান্বয়ে কীভাবে এক বিশাল মহাদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে; কীভাবে উপজাতিগুলি বিভক্ত হয়ে জনসমষ্টি, উপজাতি দলগুলিতে রূপান্তরিত হয়েছে; কীভাবে ভাষা ক্রমপরিবর্তনের মধ্যে শুধু পরস্পরের অবোধ্যই হয় নি, পরন্তু তাদের আদি ঐক্যের চিহ্নাবধি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে; এবং কীভাবে একই সময়ে উপজাতির অভ্যন্তরীণ বিশিষ্ট গোত্রগুলি বহুধা বিভক্ত হয়েছে; কীভাবে আদি মাতৃ গোত্রগুলি ফ্রাত্রীরূপে টিকে থেকেছে অথচ প্রাচীনতম এই গোত্রের নামগুলি আজও বহুদূর ও বহুকাল বিচ্ছিন্ন উপজাতিগুলির মধ্যে অটুট আছে—'নেকড়ে' ও 'ভল্লুক' আজও অধিকাংশ ইন্ডিয়ান উপজাতির গোত্রের নাম। সাধারণভাবে বলা যায় যে, উল্লিখিত গঠনতন্ত্র তাদের সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; ব্যতিক্রম শুধু এই যে, এগুলির অনেকেই আত্মীয় উপজাতিগুলির সম্মিলনী স্তরে পৌঁছয় নি।

কিন্তু আমরা এও দেখি যে, গোত্রকে সমাজের মূল একক ধরলে প্রায়

অনিবার্য আবশ্যিকতায়—কারণ, তা স্বাভাবিকই—এই একক থেকে গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির গোটা ব্যবস্থাটির উদ্ভব ঘটে। এই তিন জনসমষ্টির প্রত্যেকটিই বিভিন্ন পর্যায়ের রক্তসম্পর্কের প্রতিনিধি, প্রত্যেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রত্যেকেই নিজ কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপক, কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে পরস্পরের পরিপূরকও। বর্বরতার নিম্নস্তরের লোকদের সমগ্র সামাজিক কর্মপরিমণ্ডলই তাদের উপর উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত হয়েছিল। অতএব যেখানেই আমরা গোত্রকে মানুষের সামাজিক এককরূপে দেখতে পাব সেখানেই উপরোক্ত উপজাতিসংগঠনের মতো একটি সংস্থা খুঁজে পাওয়া যাবে; এবং তথ্যসমৃদ্ধ ক্ষেত্র, যেমন গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে, শুধু এ সংগঠনই খুঁজে পাওয়া যায় না এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ও জন্মে যে, তথ্যবিহীন ক্ষেত্রেও আমেরিকার সমাজসংগঠনের সঙ্গে তুলনা করলেই সমস্ত জটিল প্রশ্ন ও ধাঁধার সমাধান মিলবে।

এবং শিশুসুলভ সারল্য সত্ত্বেও কী আশ্চর্য এই গোত্রসংগঠন! সব ব্যাপারই অনায়াসে চলছে সৈন্য, সেপাই, পুলিস ছাড়া; চলছে অভিজাত, রাজা, শাসক, নগরপাল অথবা বিচারক ছাড়াই; নেই কারাগার, নেই মামলা-মকদ্দমা। সমস্ত বিবাদ ও বিরোধ নিষ্পত্তি করে সংশ্লিষ্ট সংস্থা—গোত্র, উপজাতি অথবা একাধিক গোত্র মিলিত হয়ে। রক্তপ্রতিশোধ কেবল চূড়ান্ত, কদাচিৎ প্রযুক্ত ব্যবস্থা—আমাদের সমাজের মৃত্যুদণ্ড যার সভ্যরূপ এবং যাতে সভ্যতার সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই বিবৃত। যদিও বর্তমানের তুলনায় অধিকসংখ্যক কাজ সমবেতভাবেই চলত—গৃহস্থালী মিলিতভাবে এবং সাম্যতন্ত্রী ভিত্তিতে কয়েকটি পরিবার চালাত, ভূমি ছিল উপজাতির সম্পত্তি, কেবল ক্ষুদ্র বাগান ঘরোয়া ভিত্তিতে সাময়িকভাবে বরাদ্দ হত, তবুও আমাদের বিশাল ও জটিল প্রশাসন যন্ত্রের কোনো বালাই তাদের ছিল না। সংশ্লিষ্টরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শতাব্দীর পুরানো রীতিতে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হত। কেউই গরীব ও অভাবগ্রস্ত থাকত না, সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালী এবং গোত্রসংগঠন বৃদ্ধ, রুগ্ণ ও যুদ্ধপঙ্গুদের দায়িত্ব নিত। নারী সমেত সকলেই ছিল স্বাধীন ও সমানাধিকারসম্পন্ন। তখনও পর্যন্ত দাসের কোনো স্থান ছিল না অথবা সাধারণভাবে অপর কোনো উপজাতিকেও অধীন করা হত না। যখন ১৬৫১

সাল নাগাদ ইরকোয়াসরা এরি এবং 'নিরপেক্ষ উপজাতি' (২২) জয় করল, তখন তারা এদের সমানাধিকারের ভিত্তিতে সম্মিলনীতে যোগ দিতে বলেছিল; বিজিতদের অস্বীকৃতির পরই কেবল তাদের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করা হয়। এবং অপাপবিদ্ধ ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সংস্পর্শে আসা সকল শ্বেতাঙ্গ এই বর্বরদের যে আত্মসম্ভ্রমবোধ, অকপটতা, চরিত্রের দৃঢ়তা ও সাহসের প্রশংসা করেছেন তা থেকে এই সমাজ কী ধরনের নরনারী সৃষ্টি করেছিল আমরা তার ইঙ্গিত পাই।

অতি সম্প্রতি আমরা আফ্রিকায়ও এই বীরত্বের দৃষ্টান্ত দেখেছি। কয়েক বছর আগে কাফির-জুলু এবং তেমনই মাসকয়েক মাত্র আগে নুবিয়ানরা— যে উপজাতিদুটির মধ্যে গোত্রসংগঠন এখনও লোপ পায় নি—তারা যা করেছে তা যেকোনো ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনীর অসাধ্য (২৩)। শুধুমাত্র কোঁচ ও বর্শা নিয়ে, কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াই তারা ব্রিচ্‌লোডার বন্দুকের অজস্র গুলিবর্ষণের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসে একেবারে ব্রিটিশ পদাতিকদের সঙ্গিনের মুখে। কিন্তু ঘনিষ্ঠ পঙ্‌ক্তিবন্দী ব্রিটিশ পদাতিকদের সর্বজনজ্ঞাত বিশ্বশ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও তাদের এরা বিশৃঙ্খল করে দেয় ও একাধিকবার পিছু হটতে বাধ্য করে, যদিও সমরসজ্জায় আকাশ-পাতাল তফাৎ ছিল, সমরসেবা বলে এদের কিছু ছিল না এবং সামরিক অনুশীলন বলতেও তারা কিছুই জানত না। তাদের ক্ষমতা ও সহ্যশক্তি ইংরেজদের এই নালিশ থেকেই ভালোভাবে বোঝা যায় যে, একজন কাফির-জুলু চব্বিশ ঘণ্টায় একটি ঘোড়ার চেয়ে দ্রুততর অধিক দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম। একজন ইংরেজ চিত্রকর বলেছেন, 'এদের ক্ষুদ্রতম পেশীটিও ইস্পাতকঠিন, চাবুকের দড়ির মতো তা চোখে পড়ে।'

শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার আগে এ-ই ছিল মানবজাতি ও তার সমাজের চেহারা। এবং যদি এদের সঙ্গে আজকের দিনের অধিকাংশ সভ্য মানুষের অবস্থার তুলনা করি, তাহলে বর্তমানের প্রলেতারীয় ও গরীব কৃষকদের সঙ্গে প্রাচীন গোত্রের স্বাধীন সদস্যদের বিরাট পার্থক্য চোখে পড়বে।

এটি ছবির একটি দিক মাত্র। একথা ভুললে চলবে না যে এই সংগঠনের ধ্বংস অনিবার্য ছিল। উপজাতির অধিকতর কোনো বিকাশ আর ঘটে নি; উপজাতিগুলির সম্মিলনীতে ইতিমধ্যেই এই সংগঠনের পতন সূচিত যা

আমরা পরে দেখব, এবং অন্যদের পরাধীন করার জন্য ইরকোয়াসদের প্রচেষ্টার মধ্যে তা প্রকটিত হয়েছিল। যাই উপজাতিবহিস্থ তা আইন-বহির্ভূতও। যেখানে স্পষ্ট কোনো সন্ধি অনুপস্থিত সেখানেই উপজাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধ চলত; আর সেই যুদ্ধ ছিল এমন নিষ্ঠুরতাপূর্ণ যেজন্য মানুষ পশুজগৎ থেকে বিশিষ্ট এবং যে নিষ্ঠুরতা পরবর্তীকালে কেবল বৈষয়িক স্বার্থবুদ্ধির খাতিরেই নম্রতর হয়েছে। সেই পূর্ণ বিকশিত গোত্রসংগঠন যার নিদর্শন আমরা আমেরিকায় দেখেছি, তার অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ একটি অতি অপরিণত উৎপাদনপদ্ধতি, অর্থাৎ একটি বিরাট ভূখণ্ডে অল্পসংখ্যক মানুষের বাস এবং এজন্য তার উপর অনাত্মীয়, প্রতিকূল ও অবোধ্য বাহ্য প্রকৃতির প্রায় পরিপূর্ণ প্রভুত্ব যা তার শিশুসুলভ সরল ধর্মীয় ধারণায় প্রতিফলিত। যেমন বহিরাগতের তেমনি নিজের পক্ষেও উপজাতিই ছিল মানুষের সীমানা: উপজাতি, গোত্র ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়, প্রকৃতিনির্দিষ্ট একটি উচ্চতর শক্তি যার কাছে অনুভূতি, চিন্তা ও কর্মে ব্যক্তিবিশেষ ছিল সম্পূর্ণ অধীন। এই যুগের মানুষ আপাতদৃষ্টিতে যতই আকর্ষণীয় হোক, তাদের মধ্যে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, মার্কসের কথায় তারা ছিল তখনও আদিম গোষ্ঠীর নাড়ির সঙ্গে বাঁধা। এই আদিম গোষ্ঠীর আধিপত্য ভাঙা অনিবার্য ছিল এবং তা ভাঙাও হল। কিন্তু যেসব প্রভাবের ফলে এটি ভাঙল, সেগুলো আমাদের কাছে প্রাচীন গোত্রসমাজের সহজ নৈতিক গরিমা থেকে একটি অধোগতি, পতন হিসেবেই প্রতীয়মান হয়। হীনতম স্বার্থাবলি—নিকৃষ্ট লোভ, পাশবিক কামনাবৃত্তি, জঘন্য লালসা, সাধারণ সম্পদের স্বার্থপর লুণ্ঠনই নতুন সভ্য সমাজ, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অভ্যুদয়কে চিহ্নিত করেছে; ঘৃণ্যতম উপায়—চৌর্য, ধর্ষণ, প্রবঞ্চনা ও বেইমানি শ্রেণীহীন প্রাচীন গোত্রসংগঠনের ভিত্তি দুর্বল করে তাকে ধ্বংস করল। এবং এই নতুন সমাজ তার আড়াই হাজার বছর অস্তিত্বের মধ্যে বৃহত্তম জনসংখ্যার শোষণ ও উৎপীড়নের বিনিময়ে একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুর বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়; এবং আজ তা আরও অনেক বেশি সত্য।

৪

গ্রীক গোত্র

পেলাস্‌জিয়ান এবং একই উপজাতি উদ্ভূত অন্যান্য জনসমষ্টির মতো গ্রীকরাও প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আমেরিকানদের মতোই একই সংস্থাপর্যায়ক্রমে গড়ে উঠেছিল: গোত্র, ফ্রাত্রী, উপজাতি এবং উপজাতিসমূহের সম্মিলনী। কোথাও, যেমন ডোরিয়ানদের মধ্যে, হয়ত ফ্রাত্রী ছিল না; সকল ক্ষেত্রেই উপজাতিগুলির সম্মিলনী গড়ে ওঠে নি; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে গোত্রই ছিল মূল একক। গ্রীকরা যখন ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হল তখন তারা সভ্যতার প্রবেশমুখে। বীরযুগের গ্রীকরা ইরকোয়াসদের তুলনায় এতখানি প্রাগ্রসর ছিল যে, গ্রীক ও আমেরিকার উপরোক্ত উপজাতিগুলির মধ্যে পরিণতির ব্যবধান প্রায় পুরো দুটি যুগের। এজন্যই গ্রীক গোত্রে ইরকোয়াস গোত্রের আদিম বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল না; তখন সমষ্টি-বিবাহের ছাপ সেখানে বহুলাংশে বিলুপ্তপ্রায়। মাতৃ-অধিকার পিতৃ-অধিকারে প্রতিস্থাপিত; তন্মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিগত সম্পদ গোত্র প্রথায় প্রথম ভাঙন আনল। স্বভাবতই দ্বিতীয় একটি ভাঙন প্রথমটির অনুসরণ করল: পিতৃ-অধিকার প্রবর্তনের পর ধনী উত্তরাধিকারিণীর সম্পত্তি বিবাহসূত্রে তার স্বামীতে অর্সায় অর্থাৎ গোত্রান্তরিত হয়; তাই গোত্রসংগঠনের সমস্ত আইনকানুনের ভিত্তিই ভেঙে পড়ে এবং এক্ষেত্রে সম্পত্তি গোত্রের মধ্যে রাখার জন্য পাত্রীকে শুধু অনুমতি দেওয়া নয়, পরন্তু নিজ গোত্রে বিবাহে **বাধ্য** করা হয়।

গ্রোট রচিত 'গ্রীসের ইতিহাস' অনুসারে বিশেষত এথেন্স গোত্রের সংহতি নিম্নলিখিতভাবে রক্ষা করা হত:

১। সাধারণ ধর্মোৎসব এবং বিশেষ একটি দেবতার পূজারী পুরোহিতদের বিশেষ অধিকারসমূহ, এই দেবতাকে গোত্রের আদিম জনক মনে করা হত এবং এই হিসেবে তাঁর একটি বিশেষ নাম ছিল।

২। একটি সাধারণ সমাধিস্থান (ডেমোস্থিনিসের 'ইউবুলিডিস' তুলনীয়)।

৩। পারস্পরিক উত্তরাধিকার।

৪। বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে পারস্পরিক সাহায্য, রক্ষা ও সমর্থনের বাধ্যবাধকতা।

৫। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গোত্রের মধ্যেই বিবাহ করার পারস্পরিক অধিকার ও বাধ্যবাধকতা; মাতৃপিতৃহীনা বা ধনী পাত্রীদের সম্পর্কে এটি সবিশেষ প্রযোজ্য।

৬। অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পত্তি এবং একজন archon (প্রধান) ও নিজস্ব খাজাঞ্চী।

কয়েকটি গোত্র নিয়ে এক-একটি ফ্রাত্রী গঠিত হলেও তা তত ঘনিষ্ঠ নয়, তবু এখানেও একই ধরনের পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব, বিশেষত কয়েকটি ধর্মাচরণের ব্যাপারে মিলিত কাজকর্ম এবং ফ্রাত্রীর নিহত ব্যক্তির শাস্তিদানের অধিকারে সহজলক্ষ্য। অধিকন্তু অভিজাতদের (ইউপেট্রাইডিস) মধ্য থেকে বাছাইকৃত ফিলবেসিলিয়াস উপাধিধারী একজন উপজাতি প্রধানের সভাপতিত্বে একটি উপজাতিভুক্ত সমস্ত ফ্রাত্রী নিয়মিতভাবে কয়েকটি সাধারণ ধর্মোৎসব পালন করত।

কথাটি গ্রোটের এবং মার্কস এতে যোগ করেছেন: 'তবু গ্রীক গোত্রেও বন্য মানুষ (যেমন ইরকোয়াস) স্পষ্টতই সহজলক্ষ্য।' আরও কিছুদূর অনুসন্ধানেই একেবারে তার নির্ভুল অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

কারণ, গ্রীক গোত্রগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যও ছিল:

৭। পিতৃ-অধিকার অনুসারে বংশপরম্পরা।

৮। উত্তরাধিকারিণী ব্যতীত গোত্র বিবাহের নিষেধ। এই ব্যতিক্রম এবং এজন্য সৃষ্ট বিধান স্পষ্টত পুরানো নিয়মের অস্তিত্বই প্রমাণ করে। আরও একটি সর্বজনমান্য নিয়ম থেকেও এটি প্রমাণ হয়, যখন একজন নারী বিবাহ করে, তখন সে নিজ গোত্রের ধর্মীয় আচার ত্যাগ ক'রে স্বামীর গোত্রাচার গ্রহণ করে এবং স্বামীর ফ্রাত্রীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই এবং ডিসিয়ার্কাসের একটি বিখ্যাত অনুচ্ছেদ থেকে গোত্রবহিস্থ বিবাহের রীতিই প্রমাণিত হয়। 'চারিকল্‌স'এ বেক্কের গোত্রে অন্তর্বিবাহ সর্বৈব নিষিদ্ধ বলেই ধরে নিয়েছিলেন।

৯। গোত্রে বহিরাগত গ্রহণের অধিকার; কোনো এক পরিবারে

পোষ্যগ্রহণ মাধ্যমেই তা করা হত কিন্তু প্রকাশ্য অনুষ্ঠান মারফৎ এবং ব্যতিক্রম হিসেবে।

১০। প্রধানদের নির্বাচন ও বাতিল করার অধিকার। আমরা জানি যে প্রত্যেক গোত্রেই প্রধান থাকত, কিন্তু এই পদ গুটিকয়েক পরিবারের মধ্যে বংশানুক্রমিক অধিকারে পর্যবসিত হবার কথা কোথাও শোনা যায় না। বর্বরযুগ শেষ না হওয়া অবধি সম্ভাবনাটি সর্বদাই কঠোর বংশানুক্রমিকতার বিরুদ্ধেই ছিল, অন্যথা গোত্রের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের নির্বিশেষ সমানাধিকার সে অবস্থায় বেমানান ঠেকত।

শুধু গ্রোটই নন, উপরন্তু নিয়েবুর, মম্‌জেন এবং অপর সমস্ত প্রাচীন যুগের ইতিহাসবিদরাও গোত্র সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হন। এর বহুবিধ মৌল বৈশিষ্ট্যের নির্ভুল সনাক্তী সত্ত্বেও তাঁরা সর্বদাই একে **কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি** ভেবেছেন এবং এজন্যই গোত্রের প্রকৃতি ও উৎপত্তি অনুধাবন তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। গোত্র প্রথায় পরিবার কখনই সাংগঠনিক একক ছিল না এবং তা সম্ভবও ছিল না, কারণ স্বামী ও স্ত্রী অনিবার্যভাবেই দুটি পৃথক গোত্রের লোক হত। গোত্র সমগ্রভাবে ফ্রাত্রীর এবং ফ্রাত্রী উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু পরিবারের ক্ষেত্রে অর্ধেক স্বামীর এবং বাকি অর্ধেক স্ত্রীর গোত্রভুক্ত হত। রাষ্ট্রও সরকারী আইনে (public law) পরিবারকে স্বীকার করে না, আজও পর্যন্ত কেবল দেওয়ানী আইনেই এর স্বীকৃতি মেলে। অথচ আজ পর্যন্ত আমাদের সমস্ত লিখিত ইতিহাস এই অসম্ভব ধারণা নিয়েই শুরু করেছে (যা বিশেষত ১৮শ শতকে অলঙ্ঘ্য হয়ে ওঠে) যে, প্রতিষ্ঠান হিসেবে সভ্যতার অল্পাধিক বয়স্ক একগামী পরিবারবিশেষকে কেন্দ্র করেই নাকি সমাজ ও রাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে কেলাসিত হয়েছে।

মার্কস মন্তব্য করেছেন: 'মিঃ গ্রোট অনুগ্রহ করে খেয়াল রাখুন যে, গ্রীকরা পুরাকথার মধ্যে তাদের গোত্র সন্ধান করলেও গোত্রগুলি **তাদের নিজেদেরই** সৃষ্ট দেবতা ও অর্ধদেবতা সম্বলিত পুরাণের চেয়েও প্রাচীনতর।'

প্রামাণ্য ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য সাক্ষী হিসেবে গ্রোট থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া মর্গান পছন্দ করতেন। গ্রোট আরও বর্ণনা করেছেন যে, স্বনামখ্যাত নিজ পূর্বপুরুষ অনুযায়ী এথেন্সের প্রত্যেকটি গোত্রের একটি নাম থাকত; সলোন যুগের পূর্বাবধি সাধারণ নিয়ম হিসেবে এবং পরে উইলহীন মৃত্যুর

ক্ষেত্রে গোত্রভুক্ত লোকেরাই (gennêtes) সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত; এবং কেউ নিহত হলে হত্যাকারীকে আদালতে অভিযুক্ত করার অধিকার ও কর্তব্য ছিল প্রথমে আত্মীয়দের তারপর গোত্রীয়দের এবং শেষে নিহত ব্যক্তির ফ্রাত্রীভুক্তদের:

'প্রাচীনতম এথেন্স আইন বিষয়ে আমরা যা-কিছু শুনেছি তা গোত্র ও ফ্রাত্রী বিভাগের ভিত্তিতেই গড়া।'

এক পূর্বপুরুষ থেকে গোত্রের উৎপত্তি 'স্কুল-পড়ুয়া অর্বাচীনদের' (মার্কসের কথায়) কাছে এক অবোধ্য ধাঁধাবিশেষ। এটিই স্বাভাবিক, কারণ পূর্বপুরুষদের নিছক পৌরাণিক মনে করায়, আদিতে সম্পূর্ণ অনাত্মীয়, পৃথক ও স্বতন্ত্র পরিবারগুলি থেকে কীভাবে গোত্রের উৎপত্তি হল, তা তাদের কাছে দুর্বোধ্যই ঠেকবে; তবু অন্তত গোত্রগুলির অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য হলেও এই ধাঁধার সমাধান তাদের পক্ষে অপরিহার্য। সুতরাং তারা কথার ঘূর্ণিতে পাক খেতে লাগল এবং এই আপ্তবাক্য অতিক্রম করতে পারল না: বংশবৃত্তান্ত অবশ্য পুরাকথামাত্র, কিন্তু গোত্র তো বাস্তব। এবং শেষ পর্যন্ত গ্রোট বলছেন (বন্ধনীভুক্ত মন্তব্যগুলি মার্কসের):

'এই বংশবৃত্তান্তের কথা আমরা কদাচিৎ শুনতে পাই, কারণ কয়েকটি বিশিষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত ক্ষেত্রেই শুধু এই কথা জনসমক্ষে উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু বিখ্যাত গোত্রগুলির মতোই স্বল্পখ্যাত গোত্রগুলিরও সাধারণ পূজানুষ্ঠান ছিল' (নয় কি, মিঃ গ্রোট!) 'এবং তাদেরও সাধারণ অতিমানব পূর্বপুরুষ ও বংশবৃত্তান্ত থাকত' (**স্বল্পখ্যাত** গোত্রগুলিতে এটা কি বিস্ময়কর নয়, মিঃ গ্রোট!) 'পরিকল্প ও আদর্শ ভিত্তি' (হায় পণ্ডিতপ্রবর, ideal নয়, carnal বা আমাদের ভাষায়—**রক্তমাংসের**!) 'সকলের ক্ষেত্রেই অভিন্ন ছিল।'

এই বক্তব্যে মর্গানের জবাবকে মার্কস এভাবে গ্রথিত করেছেন: 'আদি গোত্রের প্রতিষঙ্গী আত্মীয়তা বিধি যা অন্য সব মরমানবের মতো একদা গ্রীকদেরও ছিল,—তারই মধ্যে গোত্রের সকল সদস্যের পরস্পর সম্পর্কের জ্ঞান বেঁচে থেকেছে। তাদের পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটি তারা আশৈশব আচার-ব্যবহারের মাধ্যমেই শিক্ষা করত। একগামী পরিবার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই তা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। গোত্রনাম এমন একটি

বংশবৃত্তান্ত সৃষ্টি করেছিল যার তুলনায় একগামী পরিবারবিশেষের বংশধারাকে তুচ্ছ মনে হয়। এই গোত্রনামে এবার নামধারীদের অভিন্ন আদি পুরুষের অস্তিত্ব সত্যাখ্যাত ছিল। কিন্তু গোত্রের বংশবৃত্তান্ত অতীতের এত দূরত্বে প্রসারিত যে, সাম্প্রতিকতর অভিন্ন পূর্বপুরুষের সীমিতসংখ্যক কয়েকটি দৃষ্টান্ত ছাড়া এর অন্তর্ভুক্ত সভ্যরা তাদের পরস্পর আত্মীয়তার সত্যকার কোনো প্রমাণ দর্শাতে পারত না। নামই ছিল অভিন্ন বংশজনির প্রমাণ এবং পোষ্যগ্রহণের ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া তা-ই চূড়ান্ত প্রমাণ। গোত্র সদস্যদের আত্মীয়তা সম্পর্ক কার্যত অস্বীকার করলে—যেমনটি গ্রোট ও নিয়েবুর করেছেন—গোত্র একটি অলীক কপোল-কল্পনায় পর্যবসিত হয়; এরূপ কাজ শুধু 'আদর্শ' বিজ্ঞানী অর্থাৎ কুনো গ্রন্থকীটদেরই সাজে। যেহেতু বংশপরম্পরাগত গ্রন্থি বিশেষত একগামিতা উদ্ভবের পর দূরস্থ হয়ে পড়ে এবং অতীতের বাস্তবতা পুরাকথার উদ্ভট কল্পনায় প্রতিফলিত হয়, তাই ভালমানুষ কূপমন্ডূকেরা সিদ্ধান্ত করলেন এবং এখনও করছেন যে, আজগবী বংশবৃত্তান্তই গোত্রগুলির বাস্তব উৎস।'

আমেরিকানদের মতো এখানেও **ফ্রাত্রীই** জননী গোত্র, এটিই কয়েকটি সন্ততি গোত্রে খণ্ডিত হয় ও সেসঙ্গে শেষোক্তগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং প্রায়ই এগুলির অভিন্ন জন্মসূত্রের পথ নির্দেশ করে। যেমন, গ্রোটের কথায়,

> 'হেকাটেয়াস ফ্রাত্রীর সমসাময়িক সমস্ত সদস্য একই দেবতাকে ষোলো পুরুষ আগের আদিম জনক বলে মনে করত।'

তাই এই ফ্রাত্রীভুক্ত সমস্ত গোত্রই আক্ষরিকভাবে ভ্রাতৃ গোত্র। হোমার অবধি ফ্রাত্রীকে, সেই বিখ্যাত অনুচ্ছেদটিতে, সামরিক একক বলে উল্লেখ করেছেন যেখানে নেস্টর আগামেম্ননকে উপদেশ দিচ্ছেন: ফ্রাত্রী ও উপজাতি অনুযায়ী সৈন্য সাজাও যাতে ফ্রাত্রী ফ্রাত্রীকে এবং উপজাতি উপজাতিকে সাহায্য করতে পারে।*—কোনো সদস্যের হত্যাকারীর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা ফ্রাত্রীর আরও একটি অধিকার ও কর্তব্য; যা থেকে বোঝা যায়, পূর্বতন যুগে রক্তপ্রতিশোধ নেবার দায়িত্বও এর উপর ন্যস্ত ছিল। অধিকন্তু, এর ছিল সাধারণ তীর্থস্থান এবং উৎসব; আর্যদের ঐতিহ্যগত প্রাচীন প্রকৃতি পূজা

* হোমার, 'ইলিয়ড', দ্বিতীয় গাথা। — সম্পাঃ

থেকে উদ্ভূত গ্রীকদের সমগ্র পুরাকথার বিকাশ ঘটেছিল মূলত গোত্র ও ফ্রাত্রীর জন্যই এবং তন্মধ্যেই। ফ্রাত্রীর একজন প্রধান (phratriarchos) এবং, দ্য কুলাঁজের মতে, বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারসম্পন্ন সভা, ট্রাইব্যুন্যাল ও প্রশাসন থাকত। এমন কি পরবর্তীকালীন রাষ্ট্র গোত্রকে অগ্রাহ্য করলেও ফ্রাত্রীর প্রশাসনিক চারিত্র্যের কিছু সামাজিক কর্মকাণ্ডের অধিকার অব্যাহত রেখেছিল।

কয়েকটি আত্মীয়তা সম্পর্কিত ফ্রাত্রী মিলে একটি উপজাতি গঠিত হত। অ্যাটিকার চারটি উপজাতির প্রত্যেকটিতে তিনটি ফ্রাত্রী এবং প্রতি ফ্রাত্রীতে ত্রিশটি গোত্র ছিল। এরূপ নিখুঁত ভাগাভাগি দেখে মনে হয় যে, সমাজব্যবস্থার স্বতঃস্ফূর্ত ধারাকে একটি সচেতন ও পরিকল্পিত ব্যবস্থা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। কীভাবে, কখন ও কেন তা করা হয়েছিল, তার কোনো সন্ধান গ্রীক ইতিহাসে মেলে না, কারণ গ্রীকরাই প্রাক্-বীরযুগের স্মৃতি রক্ষা করে নি।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর ভূখণ্ডে ঘন বসতির মধ্যে বসবাস করায় গ্রীকদের মধ্যে উপভাষার পার্থক্য ততটা সুস্পষ্ট হয় নি, যতটা আমেরিকার বিস্তীর্ণ বনভূমিতে দেখা দিয়েছিল; তবু এখানেও আমরা দেখি যে, একই প্রধান উপভাষা ব্যবহারকারী উপজাতিগুলিই কেবল বৃহত্তর জনসমষ্টিতে একত্র হয়; এবং ক্ষুদ্র অ্যাটিকারও নিজস্ব উপভাষা ছিল যা পরে গ্রীক গদ্যের সাধারণ ভাষা হয়ে ওঠে।

হোমারের মহাকাব্যে আমরা সাধারণত দেখি যে, গ্রীক উপজাতিগুলি তখনই মিলিত হয়ে ছোট-ছোট অধিজাতি সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু সেই জাতির অভ্যন্তরে গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতিগুলির পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ইতিমধ্যেই তারা প্রাচীরবেষ্টিত নগরে বাস করছিল; পশুযূথের বৃদ্ধি, চাষবাসের বিস্তার এবং হস্তশিল্পের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই জনসংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটেছিল; এসঙ্গে সম্পদের পার্থক্য বেড়ে ওঠে এবং ফলত স্বাভাবিকভাবে গড়ে-ওঠা প্রাচীন গণতন্ত্রের মধ্যে একটি অভিজাত উপাদানের উন্মেষ দেখা দেয়। বিভিন্ন ক্ষুদ্র অধিজাতি সেরা ভূমি দখল এবং সামরিক লুণ্ঠনের জন্য অবিরত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকত; ইতিমধ্যেই যুদ্ধবন্দীদের দাসে পরিণত করা একটি স্বীকৃত প্রথায় পরিণত হয়েছিল।

এসব উপজাতি ও অধিজাতিগুলির শাসনতন্ত্র ছিল নিম্নরূপ:

১। পরিষদই (bulê) স্থায়ী কর্তৃপক্ষ। সূচনাকালে খুব সম্ভব গোত্র প্রধানদের নিয়ে, কিন্তু পরে তাদের অত্যধিক সংখ্যাবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এদের মধ্য থেকে নির্বাচনক্রমে এটি গঠিত হত এবং এতে অভিজাত উপাদানটির বিকাশ ও শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ ঘটেছিল; ডায়োনিসিউস স্পষ্টত বলেছেন যে, বীরযুগের পরিষদগুলি অভিজাতদের (kratistoi) নিয়ে গঠিত হত। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এই পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত; এস্কাইলাসের রচনায় দেখা যায়: থিব্‌সের পরিষদ সেক্ষেত্রে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, ইটিওক্লিসের দেহ পূর্ণ সম্মানের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হবে এবং পলিনিসিসের দেহ কুকুরভোজ্য হিসেবে ফেলে দেওয়া হবে।* পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিষদ সিনেটে রূপান্তরিত হয়।

২। **জনসভা** (agora)। ইরকোয়াসদের মধ্যে আমরা দেখেছি যে, স্ত্রী-পুরুষ মিলে জনতা পরিষদের অধিবেশনকে ঘিরে দাঁড়াত, শৃঙ্খলানুযায়ী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করত এবং এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করত। হোমারের সমকালীন গ্রীকদের এই প্রথা যাকে সাবেকী জার্মান আইনের ভাষায় 'ঘিরে দাঁড়ানো' (Umstand) বলা হয়, তা একটি পুরোপুরি জনসভায় পরিণত হয়েছিল, যেমনটি প্রাচীন জার্মানদের মধ্যেও ঘটত। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিষদ এই জনসভা আহ্বান করত; প্রত্যেক পুরুষেরই কথা বলার অধিকার ছিল। হস্ত উত্তোলনক্রমে (এস্কাইলাসের 'প্রার্থিনী' রচনায় উল্লিখিত) অথবা ধ্বনি মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। সিদ্ধান্তটি ছিল সার্বভৌম ও চূড়ান্ত, কারণ শ্যেমান তাঁর 'গ্রীসের প্রাচীন কথা'য় যেমনটি বলছেন:

> 'যেসব ক্ষেত্রে এমন কোনো বিষয় আলোচনা হত যা কার্যকরী করতে জনগণের সহযোগিতা দরকার, সেসব ক্ষেত্রে জনগণকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জোর করে তা করানোর কোনো ইঙ্গিত হোমার আমাদের জন্য রেখে যান নি।'

কেননা, এই সময় যখন উপজাতিটির প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই যোদ্ধা, তখন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এমন কোনো সামাজিক কর্তৃপক্ষ ছিল

* এস্কাইলাস, 'থিব্‌সের বিপক্ষে সাতজন'। — সম্পাঃ

না যাকে জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো সম্ভব। তখনও আদিম গণতন্ত্র পূর্ণবিকশিত এবং পরিষদ ও basileus'এর মর্যাদা ও ক্ষমতার বিচার এ সূত্র থেকে শুরু করা প্রয়োজন।

৩। **সেনাপতি** (basileus)। এই বিষয়ে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি মার্কসের: 'ইউরোপীয় পণ্ডিতকুল যাঁদের অধিকাংশই আজন্ম রাজারাজড়াদের ভৃত্য, তাঁরা বেসিলিয়াসকে আধুনিক অর্থে স্বৈরশাসকে রূপান্তরিত করেন। প্রজাতন্ত্রী ইয়াঙ্কি মর্গান এতে জোর আপত্তি করেছেন। তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে কিন্তু যথার্থভাবেই তিনি তৈলাক্ত গ্ল্যাড্স্টোন ও তাঁর 'বিশ্বের কৈশোর' গ্রন্থের কথা বলেছেন:

> 'মিঃ গ্ল্যাড্স্টোন যিনি পাঠকদের কাছে বীরযুগের গ্রীক নায়কদের উপর ভদ্রলোকী গুণারোপক্রমে রাজা মহারাজা হিসেবে উপস্থিত করতে চেয়েছেন তিনিও মানতে বাধ্য হয়েছেন যে, মোটের উপর জ্যেষ্ঠাধিকারের যে রীতি বা আইনটি আমরা পাই তা যথেষ্ট হলেও আত্যন্তিক স্পষ্টতায় সংজ্ঞায়িত নয়।'

বস্তুত মিঃ গ্ল্যাড্স্টোনের নিজেরই এটা বোঝার কথা, যে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথা যথেষ্ট হলেও অস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত, তা প্রায় মূল্যহীন।

ইরকোয়াস ও অন্যান্য ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে প্রধানদের পদের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিকতার ব্যাপার ঠিক কী ছিল তা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। যেহেতু সমস্ত পদাধিকারীই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোত্রের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হত, তাই সেই সংখ্যক পদই গোত্রের মধ্যে বংশানুক্রমিক ছিল। ক্রমে ক্রমে শূন্য স্থান পূর্ণ করবার জন্য প্রাক্তন পদাধিকারীর নিকটতম আত্মীয় — তার ভাই অথবা ভাগিনেয়কেই অগ্রাধিকার দেওয়া হত, যদি না তাকে বাদ দেবার কোনো বিশেষ কারণ থাকত। পিতৃ-অধিকার আমলে গ্রীসে বেসিলিয়াসের পদ সাধারণত পিতা থেকে পুত্রে বা অন্যতম পুত্রের উপর অর্সাত যা শুধু এই ইঙ্গিতই দেয় যে, সামাজিক নির্বাচন মারফৎ পদাধিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুত্রেরই অনুকূলে অর্সাত; কিন্তু সামাজিক নির্বাচন ছাড়াই বৈধ উত্তরাধিকার অর্সানো এতে মোটেই বোঝায় না। এখানেই ইরকোয়াস ও গ্রীকদের গোত্রে বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারগুলির প্রাথমিক ভ্রূণের উন্মেষ এবং গ্রীকদের ক্ষেত্রে তাছাড়াও ভবিষ্যতের বংশানুক্রমিক প্রধান বা রাজার ভ্রূণাবস্থা লক্ষ্য করা যায়। অতএব অনুমেয় যে, গ্রীকদের মধ্যে বেসিলিয়াস

হয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত অথবা তার পদগ্রহণে জনগণের স্বীকৃত সংস্থা হিসেবে পরিষদ অথবা আগোরার সম্মতি দরকার হত, যেমনটি রোমানদের 'রাজার' (rex) ক্ষেত্রে ঘটত।

'ইলিয়ড'এ 'নরশাসক' আগামেম্নন গ্রীকদের মহারাজা রূপে উপস্থিত নন, তিনি একটি অবরুদ্ধ নগরীর সামনে সম্মিলিত সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি রূপেই পরিদৃষ্ট। যখন গ্রীকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল, তখন অডিসিউস তাঁর এই গুণেরই উল্লেখ করেছেন সেই বিখ্যাত অনুচ্ছেদে: অধিক সেনাপতি ভাল নয়, একজন মাত্র সর্বাধিনায়ক দরকার, ইত্যাদি (তারপর রাজদণ্ড বিষয়ক জনপ্রিয় শ্লোক আছে, কিন্তু সেটা যুক্ত হয়েছে পরে)।* 'এখানে অডিসিউস সরকারের রূপ নিয়ে বক্তৃতা করেন নি, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়কের কাছে অধীনতার দাবী জানিয়েছেন। ট্রয় নগরীর সামনে যে গ্রীকরা এসেছে কেবল সৈন্যবাহিনী হিসেবে, তাদের আগোরার আচরণবিধি যথেষ্ট গণতান্ত্রিক: উপহার অর্থাৎ লুণ্ঠিত সম্পদের বণ্টনের কথা বলার সময় আকিলিস কখনও আগামেম্নন অথবা অপর কোনো বেসিলিয়াসকে বণ্টনকর্তা বলেন নি, সর্বদাই তিনি উল্লেখ করছেন 'এখিয়ান্সদের পুত্রগণ' অর্থাৎ জনগণকে। 'জিউস পুত্র', 'জিউস কর্তৃক লালিত' প্রভৃতি বিশেষণগুলি কোনো কিছুই প্রমাণ করে না, কারণ প্রত্যেকটি গোত্রই কোনো না কোনো দেবতার বংশসম্ভূত এবং উপজাতি প্রধানের গোত্র আবার জনৈক 'অভিজাত' দেবতা, এ ক্ষেত্রে জিউসের বংশোদ্ভূত। এমন কি 'অডিসি'তে, সুতরাং 'ইলিয়ড'এর অনেক পরের যুগেও শূকরপালক ইউমেন, প্রভৃতি গোলামরাও 'দিব্য' জন (dioi বা theioi)। একইভাবে আমরা 'অডিসি'তে দূত মুলিয়স ও অন্ধ চারণ ডেমোডোকাসকেও 'বীর' আখ্যায় ভূষিত দেখি। সংক্ষেপে বলা যায়, basileia নামক যে শব্দটি গ্রীক লেখকরা হোমারের তথাকথিত রাজক্ষমতার অর্থে ব্যবহার করেন (যেহেতু সামরিক নেতৃত্বই এর মূল বৈশিষ্ট্য) যদিও তার পাশাপাশি পরিষদ ও জনসভা আছে, তবু এর অর্থ সামরিক গণতন্ত্র' (মার্কস)।

সামরিক কার্যকলাপ ছাড়াও বেসিলিয়াসের পুরোহিত ও বিচারকের

---

* হোমার, 'ইলিয়ড', দ্বিতীয় গাথা। — সম্পাঃ

দায়িত্ব ছিল; এই শেষোক্ত দায়িত্ব সুচিহ্নিত নেই, কিন্তু প্রথমটি তিনি উপজাতি অথবা উপজাতি সম্মিলনীর সর্বোচ্চ প্রতিনিধি হিসেবে পালন করতেন। কোথাও বেসামরিক, প্রশাসনিক অধিকারের উল্লেখও দেখা যায় না, কিন্তু তিনি পদাধিকারবলে সম্ভবত পরিষদের সভ্য ছিলেন। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে তাই 'বেসিলিয়াসকে' জার্মান অনুবাদে 'König' বলা খুবই নির্ভুল, কারণ 'König' (Kuning) কথাটি Kuni, Künne থেকে উদ্ভূত এবং তাতে 'গোত্র প্রধান'এর অর্থ বিধৃত। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক শব্দ 'বেসিলিয়াস' কোনোক্রমেই আধুনিক অর্থে 'König' (রাজা) শব্দের সমার্থবোধক নয়। থুসিডাইডিস স্পষ্টই পুরাতন basileiaকে — patrikê অর্থাৎ গোত্রজ বলে উল্লেখ করেছেন এবং বলছেন যে, এর নির্দিষ্ট সুতরাং সীমাবদ্ধ অধিকার ছিল। আর আরিস্টটল basileiaকে বীরযুগের স্বাধীন মানুষদের নেতৃত্ব এবং বেসিলিয়াসকে সমরনায়ক, বিচারক ও প্রধান পুরোহিত বলে চিহ্নিত করেছেন; অতএব পরবর্তীকালীন অর্থে বেসিলিয়াসের কোনো শাসনক্ষমতা ছিল না।*

এভাবে আমরা বীরযুগের গ্রীকদের সংবিধানে প্রাচীন গোত্রসংগঠনের পূর্ণোদ্যম অস্তিত্ব লক্ষ্য করি; কিন্তু তার বিলুপ্তির সূত্রপাতও সহজদৃষ্ট: পিতৃ-অধিকার এবং সন্তানসন্ততি কর্তৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার, যা পারিবারিক সম্পদ সঞ্চয়ে সাহায্য করেছে এবং পরিবারকে গোত্রের বিরোধী শক্তিতে পরিণত করেছে; ধনের অসমতা বংশানুক্রমিক অভিজাতকুল ও রাজতন্ত্রের ভ্রূণাঙ্কুর সৃষ্টিক্রমে সামাজিক ব্যবস্থার উপর ফিরতি প্রভাব বিস্তার করল; যে দাস প্রথা প্রথমে যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তা ইতিমধ্যেই

* গ্রীক বেসিলিয়াসের মতো আজটেক সমরনায়ককে ভুল করে আধুনিক অর্থে রাজা হিসেবে দেখানো হয়েছিল। স্পেনীয়রা প্রথমে ভুল বুঝে ও অতিশয়োক্তি করে এবং পরে ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ঘটিয়ে যে বিবরণ দেয় তার প্রথম ইতিহাসক্রমিক সমালোচনা করে মর্গান দেখান যে, মেক্সিকানরা বর্বরতার মধ্যস্তরে হলেও নিউ মেক্সিকোর পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে কিছুটা উন্নত পর্যায়ে অবস্থিত ছিল এবং বিকৃত বিবরণগুলি থেকে যতটা বোঝা যায় তদনুসারে তাদের সামাজিক পদ্ধতিও ছিল সেরকম: তিনটি উপজাতির সম্মিলনী — এদের অধীন কয়েকটি করদ উপজাতি; শাসন চালাত একটি সম্মিলনী পরিষদ আর সম্মিলনীর জনৈক সমরনায়ক যাকে স্পেনীয়রা 'সম্রাটে' রূপান্তরিত করেছিল। (এঙ্গেলসের টীকা।)

উপজাতির অন্যান্য ব্যক্তি, এমন কি স্বগোত্রজদেরও দাসত্ববন্ধনের পথ প্রশস্ত করছিল; প্রাচীন আন্তঃ-উপজাতীয় যুদ্ধ অতঃপর জীবিকা নির্বাহের জন্য গবাদি পশু, দাস ও সম্পদ জলস্থলে লুণ্ঠনের নিয়মিত হামলায় অধঃপতিত হয়েছিল; সংক্ষেপে—ধনের প্রশস্তি, তাকেই শ্রেষ্ঠ কল্যাণ বলে সম্মান প্রদর্শন এবং বলপূর্বক ধনলুণ্ঠন সমর্থনের জন্য গোত্রের সাবেকী বিধিবিধানকে বিকৃত করা হল। কেবলমাত্র একটি জিনিসের তখনও অভাব ছিল: একটি সংস্থা যা নবলব্ধ ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে গোত্রব্যবস্থার সাম্যতন্ত্রী ঐতিহ্য থেকে শুধু যে বাঁচাবে তাই নয়, এতদিন যাকে হেয় জ্ঞান করা হত সেই ব্যক্তিগত মালিকানাকে পবিত্র করবে, সেই পবিত্রকরণকে মানবসমাজের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলে ঘোষণা করবে এবং শুধু তাই নয়, অধিকন্তু সম্পত্তি আহরণের একটার পর একটা বিকাশমান নতুন রূপগুলির উপর ও ফলত দ্রুতবর্ধমান ধনসঞ্চয়ের উপর সাধারণ সামাজিক অনুমোদন মুদ্রিত করবে; এমন একটি সংস্থা যা সমাজের উদীয়মান শ্রেণীবিভাগই শুধু নয়, পরন্তু বিত্তশালী শ্রেণী কর্তৃক বিত্তহীন শ্রেণীগুলিকে শোষণ করার অধিকার, বিত্তহীনদের উপর বিত্তবানদের শাসনও চিরস্থায়ী করবে।

এবং সে সংস্থা এল। উদ্ভাবিত হল **রাষ্ট্র**।

৫

এথেন্স রাষ্ট্রের উৎপত্তি

রাষ্ট্র কীভাবে বিকশিত হল, নতুন নতুন সংস্থার আগমনে গোত্র প্রথার কোনো কোনো সংস্থা রূপান্তরিত হল, কোনো কোনো সংস্থা স্থানচ্যুত হল এবং শেষ পর্যন্ত সবই উৎখাত করল একটি সত্যকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ, আর গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির মাধ্যমে আত্মরক্ষাপরায়ণ আসল 'সশস্ত্র জনগণের' জায়গায় এল সেই কর্তৃপক্ষের অধীনতা, সুতরাং জনগণের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য একটি সশস্ত্র 'সরকারী ক্ষমতা',—এসব কিছু, অন্তত প্রাথমিক অবস্থায়, প্রাচীন এথেন্সের মতো স্পষ্টভাবে আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই

পরিবর্তনের রূপগুলি প্রধানত মর্গানই বিবৃত করেছেন; যেসব অর্থনৈতিক কারণে এ সম্ভব হয়েছিল তার অধিকাংশ আমিই যোগ করেছি।

বীরযুগের চারটি এথেন্সীয় উপজাতি তখনও অ্যাটিকার নিজ নিজ অঞ্চলে বাস করত। এমন কি যে বারোটি ফ্রাত্রী নিয়ে তারা গঠিত ছিল সেগুলিও সম্ভবত কেক্রপ্‌সের বারোটি নগরে তখনও পৃথকভাবে অধিষ্ঠিত ছিল। এদের শাসনতন্ত্র ছিল বীরযুগের মতো: জনসভা, জনপরিষদ ও একজন বেসিলিয়াস। লিখিত ইতিহাস থেকে আমরা দেখি যে, ভূমি তখনই বিভক্ত হয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে যা বর্বরতার ঊর্ধ্বস্তরের শেষ পর্যায়ের পণ্যোৎপাদনের অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা এবং তদুপযোগী পণ্যবাণিজ্যের প্রতিষঙ্গী। খাদ্যশস্য ছাড়া সুরা এবং তৈলও উৎপন্ন হত। ইজিয়ান সাগরের বণিজ্য ক্রমেই ফিনিশীয়দের কাছ থেকে অ্যাটিকার গ্রীকদের হস্তগত হয়। জমি কেনাবেচা এবং কৃষি ও হস্তশিল্প, বাণিজ্য ও নৌচালনায় ক্রমবর্ধিত শ্রমবিভাগের জন্য বিভিন্ন গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির সদস্যরা অচিরে মিশ্রিত হয়ে যায়; একটি ফ্রাত্রী বা উপজাতির বাসভূমিতে এমন সব অধিবাসী এল যারা একই দেশের লোক হলেও এগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং সেজন্য নিজ বাসভূমিতেই তারা পরবাসী হয়ে রইল। কেননা শান্তিকালে প্রত্যেকটি ফ্রাত্রী ও উপজাতি এথেন্সের জনপরিষদ অথবা বেসিলিয়াসের অপেক্ষা না করেই নিজেদের এলাকার কাজকর্ম চালাত। কিন্তু এলাকার যেসব অধিবাসীরা ফ্রাত্রী বা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা স্বাভাবিকভাবে শাসনকার্যে কোনো অংশ গ্রহণ করতে পারত না।

এর ফলে গোত্র প্রথার সংস্থাগুলির নিয়মিত কাজে এত বিশৃঙ্খলা ঘটল যে, বীরযুগেই এর প্রতিকার অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এজন্য একটি শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয় যা থিসিউসের নামের সঙ্গে যুক্ত। এই পরিবর্তনের মূল বৈশিষ্ট্য এথেন্সে একটি কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ যেসব কার্যাদি এতদিন উপজাতিগুলি স্বাধীনভাবে চালিয়ে এসেছিল তার কতকগুলিকে সাধারণ বিষয় ঘোষণা করে এথেন্সে অবস্থিত একটি সাধারণ পরিষদের কাছে হস্তান্তরিত করা। এভাবে আমেরিকার যেকোনো আদিম অধিবাসীদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেল এথেন্সীয়রা: প্রতিবেশী উপজাতিগুলির একটি সরল সম্মিলনীর জায়গায় এখানে সমস্ত উপজাতি

পরস্পরের মধ্যে বিলীন হয়ে একটি মাত্র জাতি তৈরি করল। এর ফলে সর্বজনীন এক এথেন্সীয় আইনের উদ্ভব ঘটল যা উপজাতি ও গোত্রগুলির আইনী প্রথার ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হল ; এতে প্রত্যেক এথেন্সবাসী নিজ উপজাতি এলাকার বাইরেও নির্দিষ্ট অধিকার ও অতিরিক্ত আইনী নিরাপত্তার সুবিধা লাভ করল। কিন্তু এটিই গোত্র প্রথার ভিত্তিহানির প্রথম পদক্ষেপ; কেননা অ্যাটিকার সমস্ত উপজাতির কাছেই যারা বিজাতীয়, এথেন্সীয় গোত্র প্রথার যারা বাইরে ছিল, পরবর্তীকালে তাদের নাগরিকভুক্ত করার এটিই প্রথম পদক্ষেপ। দ্বিতীয় যে কীর্তিটি থিসিউসের নামে প্রচলিত, সেটি সমগ্র জনগণকে গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতি নির্বিশেষে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করল: ইউপেট্রাইডিস (eupatrides) অথবা অভিজাত, জিওমোরই (geomoroi) বা জমির চাষী ও ডেমিয়ার্গি (demiurgi) বা হস্তশিল্পী এবং কেবল অভিজাতদেরই সরকারী পদের অধিকার দেওয়া হল। কথাটি সত্য যে, অভিজাতদের পদাধিকার দেওয়া ছাড়া অন্য বিষয়ে এই শ্রেণীবিভাগে কোনো ফল ফলে নি, কারণ তা শ্রেণীগুলির মধ্যে অধিকারগত আর কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে নি। কিন্তু এটি গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, অলক্ষিতে উদ্ভূত সামাজিক উপাদানগুলি এর মাধ্যমেই প্রকটিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, গোত্রের কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সমাজের পদবণ্টন প্রচলিত রীতির স্তর ছাড়িয়ে এই পরিবারগুলির বিশেষ অধিকার পর্যবসিত হয়েছে এবং তা প্রায় নির্বিবাদে; ইতিমধ্যে বিত্তসঞ্চয়ক্রমে শক্তিশালী এই পরিবারগুলি গোত্রবহিস্থ একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীরূপে মিলিত হতে শুরু করল এবং অংকুরিত রাষ্ট্র তাদের এই জবরদখলকে আশীর্বাদ জানাল। অধিকন্তু, এতে আরও দেখা যাচ্ছে যে, কৃষক ও কুটিরশিল্পীর মধ্যে প্রকট শ্রমবিভাগ প্রতিষ্ঠার ফলে গোত্র ও উপজাতির পুরানো বিভাগের সামাজিক গুরুত্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হচ্ছে। সর্বশেষে এতে ঘোষিত হল যে, গোত্রভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরোধ মীমাংসাতীত; প্রতি গোত্রের সভ্যদের সুবিধাভোগী ও বঞ্চিত, এবং শেষোক্তদের আবার পেশাগতভাবে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে ও এভাবে পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত করে গোত্রীয় সম্পর্কে ভাঙন সৃষ্টির মাধ্যমেই রাষ্ট্রগঠনের প্রথম প্রয়াস চিহ্নিত হয়েছিল।

সলোন যুগের অব্যবহিত আগে এথেন্সের পরবর্তী রাজনৈতিক

ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। বেসিলিয়াসের পদ তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছিল। অভিজাতদের মধ্য থেকে নির্বাচিত archons বা প্রধানরা রাষ্ট্রের মাথা হয়ে উঠল। অভিজাতদের বর্ধমান ক্ষমতা খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ সহ্যসীমা অতিক্রম করল। গণমুক্তি দমনের মূল হাতিয়ার ছিল অর্থ ও মহাজনি। অভিজাতরা সাধারণত এথেন্স বা তার আশেপাশে বসবাস করত এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য ও তখনও মাঝে মাঝে অনুসৃত জলদস্যুতায় তাদের ধনদৌলত বাড়ত এবং হাতে অর্থসম্পদ কেন্দ্রীভূত হত। এই থেকেই বিকাশমান মুদ্রাব্যবস্থা ক্ষারী দ্রাবকের মতো প্রাক্-পণ্যবিনিময় অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য জনসমষ্টিগুলির চিরাচরিত জীবনযাত্রায় অনুপ্রবিষ্ট হল। গোত্র প্রথা মুদ্রাব্যবস্থার সঙ্গে মোটেই সহবাসক্ষম নয়; অ্যাটিকার ক্ষুদ্র কৃষিজীবিদের ধ্বংস তাদের রক্ষক সাবেকী গোত্রবন্ধনের শৈথিল্যের সন্নিপাতী। পাওনাদারের বিল এবং জমিতে বন্ধকী কবুলিয়ত (এথেন্সীয়রা তখন জমিতে বন্ধকী প্রথাও আবিষ্কার করেছিল) গোত্র অথবা ফ্রাত্রী কোনো কিছুই খাতির করত না। অথচ সাবেকী গোত্র প্রথায় মুদ্রা, দাদন বা আর্থিক ঋণ সবই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তাই অভিজাতদের ক্রমবর্ধমান মুদ্রাশাসন থেকে একটি নতুন প্রথাগত আইন দেখা দিল যা দেনদারের বিরুদ্ধে মহাজনকে রক্ষা করত এবং ধনপতি কর্তৃক ক্ষুদ্র কৃষকের শোষণকে আশীর্বাদ জানাত। অ্যাটিকার ক্ষেতগুলিতে সর্বত্র অসংখ্য বন্ধকী থাম দেখা যেত এবং তাতে বিজ্ঞপ্তি থাকত, যে ভূখণ্ডে এটি রয়েছে তা অমুকের কাছে এত টাকায় বন্ধক আছে। যেসব ক্ষেতে এরকম কোনো চিহ্ন থাকত না, সেগুলির অধিকাংশই অনাদায়ী বন্ধকী ঋণের দরুন অথবা সুদ দিতে না পারায় বিক্রিক্রমে কোনো অভিজাত মহাজনের সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল; প্রজা হিসেবেই কৃষককে খুশী হতে হত এবং নতুন মালিককে খাজনা হিসেবে উৎপন্ন ফসলের **ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ** দিয়ে সে বাকি **এক ভাগে** জীবনযাপন করত। তাছাড়াও জমি বিক্রয়ের টাকা দিয়ে দেনাশোধ না হলে কিংবা দেনাশোধের মতো বন্ধকযোগ্য কিছু না থাকলে দেনদার ছেলেমেয়েদের ক্রীতদাস রূপে বিদেশে বিক্রি করে মহাজনের দাবী মেটাতে বাধ্য হত। পিতা কর্তৃক সন্তান বিক্রি—এই হল পিতৃ-অধিকার ও একগামিতার প্রথম ফল! এবং এতেও যদি রক্তচোষাটি তৃপ্ত না হত, তাহলে

দেনদারকেই সে দাস হিসেবে বিক্রি করতে পারত। এই হল এথেন্সীয় জনগণের মধ্যে সভ্যতার আনন্দোজ্জ্বল অরুণোদয়।

আগে জনগণের গোত্র প্রথা অনুসারী জীবনযাত্রায় এধরনের বিপ্লব সম্ভব ছিল না; কিন্তু এখন কীভাবে এর আবির্ভাব ঘটল, কেউ তা জানতেও পারে নি। ইরকোয়াসদের দিকে বারেক ফিরে তাকানো যাক। এথেন্সীয়দের উপর, বলা যেতে পারে, তাদের কৃতকর্ম ছাড়াই এবং অবশ্যই ইচ্ছার বিরুদ্ধে যা চেপে বসল, তেমন কিছু ইরকোয়াসদের ক্ষেত্রে একেবারে ধারণাতীত। সেখানে জীবনোপকরণের যে অপরিবর্তিত উৎপাদনপদ্ধতি বছরের পর বছর অব্যাহত থাকত তাতে আরোপিত কোনো সংঘর্ষের উন্মেষই ঘটত না; আসত না এই ধনী ও দরিদ্র, শোষক ও শোষিতের বিরোধ। প্রাকৃতিক শক্তিগুলি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইরকোয়াসরা তখন বহুদূর পিছিয়ে কিন্তু প্রকৃতিনির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে তারা ছিল নিজ উৎপাদনের প্রভু। তাদের ছোট ছোট বাগিচার ফসলহানি, হ্রদ ও নদীর মাছ অথবা বনের শিকার দুর্লভ হওয়ার কথা ছেড়ে দিলে জীবিকার্জন পদ্ধতির সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে তাদের পূর্বজ্ঞান থাকত। এর ফলাফল হবে: জীবনোপকরণ, তা পর্যাপ্ত অথবা স্বল্প হোক, কিন্তু অচিন্তিত কোনো সামাজিক উত্থানপতন, গোত্রের বন্ধনচ্ছেদ অথবা গোত্র ও উপজাতির সদস্যদের বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্তিক্রমে পরস্পরসংগ্রাম অসম্ভব ছিল। উৎপাদন অতি সঙ্কীর্ণ গন্ডীতে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু উৎপাদকরাই উৎপন্নের নিয়ন্ত্রক থাকত। বর্বরযুগের উৎপাদনপ্রণালীর এই অপরিসীম সুবিধাটিই সভ্যতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে গেল। প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জের উপর মানুষের বর্তমান অপরিসীম ক্ষমতা এবং বর্তমানের সম্ভাব্য স্বাধীন সমামেলের ভিত্তিতে এই সুবিধার পুনরাধিষ্ঠানই হবে নিকটতম উত্তরপুরুষেরই কর্তব্য।

গ্রীকদের অবস্থা ছিল ভিন্নতর। গবাদি পশুর যূথ ও বিলাসদ্রব্য ভিত্তিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাবের ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময় প্রচলিত হল, উৎপন্ন রূপান্তরিত হল পণ্যে। পরে যে বিপ্লব দেখা দেয় তার সমগ্র মূল এখানেই নিহিত। উৎপাদকরা যখন নিজ উৎপন্ন আর প্রত্যক্ষভাবে ভোগ না করে বিনিময়ের মাধ্যমে তা হাতছাড়া করল, তখনই এর উপর তাদের দখলও খারিজ হয়ে গেল। সেই উৎপন্নের ভবিতব্য সম্পর্কে তারা

আর কিছুই জানতে পারত না। উৎপাদকদের বিরুদ্ধেই যে উৎপন্নকে প্রয়োগ করা হবে, তাদের শোষণ ও পীড়নের মাধ্যমরূপে তা ব্যবহৃত হবে এমন একটি সম্ভাবনা প্রকটিত হল। এজন্যই ব্যক্তিগত লেনদেন উৎখাত ব্যতিরেকে কোনো সমাজব্যবস্থাই দীর্ঘদিন নিজ উৎপন্নের উপর প্রভুত্ব ও উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সামাজিক ফলাফল নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে পারে না।

ব্যক্তিগত বিনিময়ের শুরু ও উৎপন্ন পণ্যে পরিণত হবার পর কত দ্রুত যে উৎপাদকদের উপর পণ্যের প্রভুত্ব দেখা দেয়, এথেন্সীয়রা অচিরেই তা উপলব্ধি করল। পণ্যোৎপাদনের সঙ্গেই এল নিজ বিষয়-আশয় হিসেবে কৃষকদের একক জমিচাষ, অল্প পরেই জমির আনুষঙ্গিক ব্যক্তিগত মালিকানা। তারপর এল মুদ্রা, যে সর্বজনীন পণ্যের বিনিময়ে সব পণ্যই পাওয়া সম্ভব। কিন্তু মুদ্রা আবিষ্কার করার সময় মানুষ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে নি যে, তারা এমন একটি নতুন সামাজিক শক্তি, এমন একটি সার্বিক প্রভাবশালী শক্তি সৃষ্টি করছে যার কাছে সমগ্র সমাজ অবনত হতে বাধ্য হবে। স্রষ্টাদের ইচ্ছা ব্যতীত ও তাদের অজ্ঞাতসারে অকস্মাৎ উদ্ভূত এই নতুন শক্তিকে তার যৌবনসুলভ নিষ্ঠুরতায় এখন এথেন্সীয়রা উপলব্ধি করল।

এমতাবস্থায় কী কর্তব্য? মুদ্রার জয়যাত্রার সামনে সাবেকী গোত্র প্রথার অক্ষমতাই শুধু প্রতিপন্ন হল না, এর কাঠামোয় মুদ্রা, মহাজন, দেনদার এবং বলপূর্বক ঋণ আদায়ের মতো ব্যাপারগুলির স্থান সঙ্কুলানেও সে ছিল একেবারেই অসমর্থ। কিন্তু নতুন সামাজিক শক্তি তখন হাজির, এবং কোনো সদিচ্ছা অথবা সাবেকী সুসময়ে ফিরে যাবার কোনো ব্যাকুলতাতেই মুদ্রা ও মহাজনী প্রথার অস্তিত্ব লোপ পাবার নয়। উপরন্তু, ইতিমধ্যেই গোত্র প্রথায় আরও কয়েকটি গৌণ ভাঙন দেখা দিয়েছিল। অ্যাটিকার সর্বত্র, বিশেষত এথেন্সে বিভিন্ন গোত্র ও ফ্রাত্রীর যথেচ্ছ মিশ্রণ পুরুষানুক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে, যদিও একজন এথেন্সবাসী গোত্রের বাইরে চাষের জোত বিক্রি করতে পারলেও তখনও তার বসত বাড়ি বিক্রি করতে পারত না। উৎপাদনের বিভিন্ন শাখা—কৃষি, হস্তশিল্প, হস্তশিল্পের বহুবিধ রূপভেদ, বাণিজ্য, নৌচালনা, প্রভৃতিতে শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্ক প্রসারের সঙ্গে শ্রমবিভাগ অধিকতর বিকাশলাভ করে; জনসংখ্যা এখন পেশানুযায়ী কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দলে বিভক্ত হল, যাদের প্রত্যেকেরই গোত্র বা ফ্রাত্রীর মধ্যে অনুপস্থিত কতকগুলি

নতুন সাধারণ স্বার্থ ছিল, তাই সেগুলি রক্ষার জন্য নতুন পদ সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিল। ক্রীতদাসদের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সেই সময়, সম্ভবত, তাদের সংখ্যা স্বাধীন এথেন্সীয়দের অতিক্রম করেছিল; গোত্র প্রথার আদি অবস্থায় দাস প্রথা না থাকায় বিপুলসংখ্যক দাসকে বশে রাখার উপায় সম্পর্কেও সে অজ্ঞ ছিল। সর্বশেষে, এখানে সহজ অর্থোপার্জনের জন্য বাণিজ্যলোভী বহু বিদেশী এথেন্সে বসবাস শুরু করে; কিন্তু পুরানো সংবিধান অনুসারে এদেরও কোনো অধিকার এবং আইনগত রক্ষাকবচ ছিল না। তাই ঐতিহ্যগত সহনশীলতা সত্ত্বেও জনগণের মধ্যে এরা একটি ব্যাঘাতকারী বিজাতীয় উপাদান হিসেবেই পরিগণিত হত।

সংক্ষেপে, গোত্র প্রথা তখন ধ্বংসের মুখোমুখি। সমাজ প্রত্যহ একে ক্রমাগত ছাপিয়ে উঠছিল; চোখের সামনে বেড়ে ওঠা চূড়ান্ত পীড়াদায়ক অমঙ্গলগুলির উপশম বা প্রতিকারের ক্ষমতা পর্যন্ত এর ছিল না। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটছিল নিঃশব্দে। প্রথমে গ্রাম ও নগরে এবং পরে নগরাঞ্চলে শিল্পের বিভিন্ন শাখায় শ্রমবিভাগের ফলে যে নতুন জনসমষ্টি দেখা দিয়েছিল তারা নিজ স্বার্থরক্ষার নতুন নতুন সংস্থা সৃষ্টি করল; রকমারি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের সব পদ সৃষ্টি হল। এবং তারপর ছোটখাট যুদ্ধ অথবা বাণিজ্য জাহাজ রক্ষাকল্পে তরুণ রাষ্ট্রের সর্বোপরি প্রয়োজন ছিল নিজস্ব যোদ্ধৃবাহিনী, সমুদ্রযাত্রী এথেন্সবাসীদের মধ্যে প্রথমে যে শক্তি কেবল নৌবাহিনীই হতে পারত। সলোনের পূর্বে কোনো এক অনির্দিষ্ট কালে, প্রত্যেক উপজাতির জন্য বারোটি করে নৌক্রারি (naucrarie), ছোট ছোট আঞ্চলিক জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি নৌক্রারিকে লোকলস্কর ও অস্ত্র সমেত একটি করে যুদ্ধজাহাজ পূর্ণভাবে সজ্জিত করতে এবং অধিকন্তু দুজন অশ্বারোহী দিতে হত। এই ব্যবস্থায় গোত্র প্রথা দুদিক থেকে আক্রান্ত হল: প্রথমত, এতে একটি সামাজিক শক্তি সৃষ্টি হল যা আর পূর্বতন সশস্ত্র জনগণের সামগ্রিকতার সঙ্গে একাত্ম নয়; দ্বিতীয়ত, এই সর্বপ্রথম আত্মীয়তার ভিত্তি পরিহারক্রমে সামাজিক উদ্দেশ্যে **আঞ্চলিকভাবে বাসস্থান** অনুযায়ী জনগণকে বিভক্ত করা হল। এর তাৎপর্য পরে লক্ষ্য করা যাবে।

গোত্র প্রথা শোষিত জনগণকে সাহায্যদানে ব্যর্থ হওয়ায় তারা কেবল অভ্যুদিত রাষ্ট্রেরই মুখাপেক্ষী হত। এবং রাষ্ট্র তাদের সাহায্যে সলোনের

শাসনতন্ত্র উপস্থিত করল ও পুরাতন প্রথার বিনিময়ে নতুন করে নিজ শক্তি বাড়াল। খৃঃ পূঃ ৫৯৪ সালে সলোন কৃত সংস্কার প্রবর্তনের প্রণালী নয়, তিনি মালিকানার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে যে তথাকথিত রাজনৈতিক বিপ্লবগুলি শুরু করেছিলেন, তাই আমাদের আলোচ্য। এযাবৎকাল পর্যন্ত এক ধরনের মালিকানার বিরুদ্ধে আর এক ধরনের মালিকানা রক্ষা করার জন্যই সমস্ত রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটেছে। এতে একটি লঙ্ঘন না করে অপরটি রক্ষা করা যায় না। মহান ফরাসী বিপ্লবে বুর্জোয়া মালিকানা রক্ষার জন্য সামন্ত মালিকানা বলিদত্ত হয়েছিল; সলোনের বিপ্লবে মহাজনের সম্পত্তি ক্ষুণ্ণ করে দেনদারের সম্পত্তি রক্ষা করা হল। দেনা সোজাসুজি বাতিল হয়ে গেল। এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা জানি না; কিন্তু সলোন তাঁর কবিতায় সগর্বে ঘোষণা করেছেন যে, বন্ধকী জমিগুলি থেকে বন্ধকচিহ্নিত থামগুলি তিনি সরিয়ে দেন এবং যারা পলাতক ছিল অথবা দেনার দায়ে বিদেশে বিক্রি হয়েছিল, তারা আবার ঘরে ফিরে আসে। কেবলমাত্র প্রকাশ্যভাবে মালিকানার অধিকার লঙ্ঘন করেই তা করা সম্ভব ছিল। বস্তুত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত তথাকথিত রাজনৈতিক বিপ্লবের লক্ষ্যই **এক** ধরনের সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য **অপর** ধরনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা বলা যায় চুরি করা। তাই কথাটি সর্বৈব সত্য যে, আড়াই হাজার বছর ধরে ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষা করা হয়েছে কেবল মালিকানার অধিকার লঙ্ঘন করেই।

কিন্তু এখন স্বাধীন এথেন্সীয়দের মধ্যে দাসত্বের পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য একটি উপায় উদ্ভাবন অপরিহার্য হয়ে উঠল। প্রথমে কয়েকটি সাধারণ ব্যবস্থা দ্বারা এটি সম্পন্ন করা হল; দৃষ্টান্ত হিসেবে দেনদারের আত্মবন্ধকী চুক্তি নিষিদ্ধকরণ উল্লেখ্য। তাছাড়া, চাষীর জমির ওপর অভিজাতদের সীমাহীন লালসা অন্তত আংশিক খর্ব করার জন্য ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির উচ্চতম সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর এল শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন, যার নিম্নলিখিতগুলি আমাদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ:

প্রত্যেক উপজাতি থেকে এক শ' সদস্য গ্রহণ করে পরিষদের সদস্যসংখ্যা চার শ' করা হল; সুতরাং এ ব্যাপারে উপজাতি তখনও ভিত্তিস্বরূপ কার্যকরী। কিন্তু এটিই ছিল নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থায় আত্মীকৃত পুরানো সংস্থার

একটিমাত্র উপাদান। অন্যত্র সলোন নাগরিকদের জমি ও ফসলের পরিমাণ অনুযায়ী চারটি শ্রেণীতে ভাগ করলেন: প্রথম তিন শ্রেণীর ন্যূনতম আয় ছিল পাঁচ শ', তিন শ' ও দেড় শ' মেডিম্নাস শস্য (এক মেডিম্নাস প্রায় ৪১ লিটার); যাদের জমি এর চেয়ে কম বা ভূসম্পত্তি নেই তারা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত। কেবলমাত্র প্রথম তিনটি শ্রেণীর সদস্যরা পদাধিকারী হতে পারত; উচ্চতম পদগুলি কেবল প্রথম শ্রেণীর লোক দিয়ে পূরণ করা হত। চতুর্থ শ্রেণী জনসভায় কথা বলতে ও শুধু ভোট দিতে পারত; কিন্তু এই জনসভাতেই সমস্ত পদাধিকারীর নির্বাচন, কর্মবিবরণ, সমস্ত আইন প্রণয়ন হত এবং এইখানে চতুর্থ শ্রেণী ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অভিজাতদের বিশেষ সুবিধাগুলি ধনের বিশেষ সুবিধা হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও জনগণের হাতেই চূড়ান্ত ক্ষমতা রইল। শ্রেণীচতুষ্টয় সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনেরও ভিত্তি যোগাল। প্রথম দুটি শ্রেণী অশ্বারোহী বাহিনী সরবরাহ করত; তৃতীয় শ্রেণী করত ভারী অস্ত্রসজ্জিত পদাতিক সৈন্যের কাজ, চতুর্থ শ্রেণী হালকা অস্ত্রসজ্জিত পদাতিক অথবা নৌবাহিনীতে কাজ করত এবং এরা সম্ভবত পারিশ্রমিক পেত।

এভাবে শাসনতন্ত্রে একেবারে নতুন একটি উপাদান—ব্যক্তিগত মালিকানা সংযোজিত হল। রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যের মাত্রা তাদের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ দিয়ে স্থির হত, এবং বিত্তশালী শ্রেণীগুলির বর্ধমান প্রভাবের প্রেক্ষিতে পুরাতন রক্তসম্পর্কিত জনসমষ্টি ক্রমাগত অন্তরালবর্তী হতে লাগল। গোত্র প্রথার আরও একটি পরাজয় ঘটল।

অবশ্য সম্পত্তির পরিমাপে রাজনৈতিক অধিকারের মাত্রানির্ণয় রাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য প্রথা নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ইতিহাসে এর গুরুত্ব থাকলেও বেশ কিছুসংখ্যক রাষ্ট্র, বলতে কি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিণত রাষ্ট্রও এছাড়াই চলছিল। এমন কি এথেন্সেও এর ভূমিকা মোটেই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি; এরিস্টাইডিসের সময় থেকেই সকল নাগরিকের জন্যই সমস্ত পদ উন্মুক্ত ছিল।

পরবর্তী আশি বছরে এথেন্স সমাজের ক্রমানুসৃত পথেই আগামী শতাব্দীগুলিতে তা পরিণততর পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল। সলোনের আগের যুগে যেভাবে জমি নিয়ে মহাজনী কারবারের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, এখন তা

এবং সেসঙ্গে ভূসম্পত্তির সীমাহীন কেন্দ্রীভবন সংযত হল। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রমবর্ধিত পরিমাণে দাসশ্রমভিত্তিক হস্তশিল্প ও কারুশিল্প মূল পেশা হয়ে উঠল। জ্ঞানচর্চায়ও অগ্রগতি ঘটল। আগের মতো নিজেদের সহনাগরিকদের নির্মম শোষণ না করে এখন এথেন্সীয়রা প্রধানত দাস ও বিদেশী ক্রেতাদের শোষণ করতে থাকল। অস্থাবর সম্পত্তি, অর্থ, ক্রীতদাস ও জাহাজ রূপে সম্পদ ক্রমেই বাড়তে লাগল; কিন্তু পূর্বতন কূপমণ্ডূকতা ও সীমাবদ্ধতার যুগে এগুলিকে জমি কেনার উপায়মাত্র মনে করার বদলে এখন এই সঞ্চয়ই লক্ষ্য হয়ে উঠল। এতে একদিকে যেমন পুরাতন অভিজাতদের ক্ষমতার সঙ্গে এক নতুন শ্রেণী—ধনী শিল্পপতি ও বণিকের সফল প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব হল, অপরদিকে এতে পুরাতন গোত্র প্রথা তার শেষ ভিত্তি হারাল। গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির সভ্যরা এখন অ্যাটিকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সকলে একেবারে মিশ্রিতভাবে বসবাস করত, এগুলি তাই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে একেবারে অব্যবহার্য হয়ে পড়েছিল। এথেন্সীয় নাগরিকদের এক বৃহৎ সংখ্যা কোনো গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল না; এরা বিদেশাগত, নাগরিক হিসেবে গৃহীত হলেও রক্তসম্পর্কিত কোনো সাবেকী গোষ্ঠীর মধ্যে গৃহীত হয় নি; এরা ছাড়াও কেবলমাত্র পোষ্য বিদেশাগতদের সংখ্যাও কেবলই বেড়ে চলেছিল (২৪)।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন পক্ষের সংগ্রাম এগিয়ে চলছিল। অভিজাতরা পুরানো সুবিধা ফিরে পাবার চেষ্টা করে এবং অল্প কালের জন্য প্রাধান্য লাভ করে। পরে ক্লিস্টিনিসের বিপ্লব (খৃঃ পূঃ ৫০৯ সাল) তাদের চূড়ান্ত পতন ঘটাল এবং এদের পতনের সঙ্গেই গোত্র প্রথার অবশেষটিও ধ্বসে পড়ল।

ক্লিস্টিনিস তাঁর নতুন শাসনতন্ত্রে গোত্র ও ফ্রাত্রীর ভিত্তিতে গঠিত পুরানো চারটি উপজাতিকে উপেক্ষা করলেন। তার জায়গায় এল সম্পূর্ণ নতুন একটি সংগঠন যাতে নাগরিকদের বাসস্থানের ভিত্তিতে ভাগ করা হল, ইতিপূর্বে নৌক্রারিতে যার চেষ্টা হয়েছিল। কোনো রক্তসম্পর্কিত গোত্রের সম্মিলনী নয়, স্থায়ী বাসস্থানই এখন চূড়ান্ত ব্যাপার। এখন আর জনগণ নয়, পরন্তু, বিভক্ত হল ভূখণ্ড; রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিবাসীরা কেবল অঞ্চলবিশেষের পরিপূরক হিসেবেই পরিগণিত হল।

সমগ্র অ্যাটিকা এক শ' স্বশাসিত অঞ্চল বা ডেম'এ (dem) বিভক্ত

হল। এক-একটি ডেমের নাগরিকরা (demot) নিজেদের একজন প্রধান (demarch), একজন খাজাঞ্চী এবং ছোট ছোট মামলা চালানোর ক্ষমতাসম্পন্ন ত্রিশ জন বিচারক নির্বাচিত করত। তারা তাদের নিজস্ব একটি মন্দির এবং একজন রক্ষক দেবতা অথবা বীর পেত যার পুরোহিতরাও নির্বাচিত হত। ডেমের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল ডেমটদের সভার উপর। এটিই যে আমেরিকার স্বশাসিত পৌরসভার আদিরূপ, মর্গানের এই মন্তব্যটি নির্ভুল। যে একক আধুনিক রাষ্ট্রের চূড়ান্ত পরিণতিস্বরূপ এথেন্সের উদীয়মান রাষ্ট্রের তা-ই ছিল আরম্ভ।

এরকম দশটি একক ডেম নিয়ে একটি উপজাতি গঠিত হয়; কিন্তু গোত্রভিত্তিক পুরাতন উপজাতি থেকে সুচিহ্নিত করে এর নামকরণ হল অঞ্চলভিত্তিক উপজাতি। আঞ্চলিক উপজাতি শুধু স্বশাসিত রাজনৈতিক সংস্থাই নয়, এটি আবার সামরিক সংস্থাও বটে। এরা নির্বাচন করত একজন ফাইলার্ক* অথবা উপজাতি প্রধান, যিনি অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক, একজন ট্যাক্সিয়ার্ক যিনি পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক এবং একজন স্ট্রাটেগাস যিনি উপজাতির এলাকায় সংগঠিত সমস্ত সামরিক শক্তির অধিনায়ক ছিলেন। অধিকন্তু সংস্থাটিকে লোকলস্কর ও কম্যান্ডার সমেত পাঁচখানি করে সজ্জিত জাহাজ দিতে হত; এবং সে পেত অঞ্চলের রক্ষক দেবতা হিসেবে একটি অ্যাটিকা বীরকে, যাঁর নামে সংস্থা পরিচিত হত। সর্বশেষে সংস্থাটি এথেন্সের পরিষদের জন্য পঞ্চাশ জন সদস্য নির্বাচিত করত।

এরই চূড়ান্ত রূপ এথেন্স রাষ্ট্র, যা দশটি উপজাতি থেকে নির্বাচিত পাঁচ শ' সদস্যের পরিষদ এবং শেষ অবধি জনসভা কর্তৃক শাসিত হত, এবং যে জনসভায় প্রত্যেক এথেন্সীয় নাগরিক উপস্থিত থাকতে ও ভোট দিতে পারত; এর সঙ্গে আর্খন ও অন্যান্য পদাধিকারীরা শাসনকার্যের বিভিন্ন বিভাগ ও আদালতের কাজ চালাতেন। এথেন্সে নির্বাহী ক্ষমতার কোনো প্রধান ছিল না।

এই নতুন শাসনতন্ত্রের ফলে এবং পোষ্য অংশত বিদেশাগত ও অংশত মুক্ত দাসদের মধ্য থেকে এক বৃহৎ সংখ্যার অসমানাধিকারী অধিবাসীকে

---

* প্রাচীন গ্রীক শব্দ 'ফাইলা' — 'উপজাতি' থেকে। — সম্পাঃ

গ্রহণ করার ফলে সামাজিক কর্মক্ষেত্র থেকে পুরাতন গোত্রসংস্থাগুলোর অপসারণ ঘটল। এগুলি গৌণ সমিতি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্তরে অবনমিত হল। কিন্তু তাদের পুরানো গোত্রভিত্তিক যুগের নৈতিক প্রভাব, ঐতিহ্যগত ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী দীর্ঘদিন টিকে থাকল এবং শেষ অবধি কেবল ধীরে ধীরেই বিলুপ্ত হল। পরবর্তী একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তা প্রকটিত হয়ে উঠেছিল।

সাধারণ জনগণ থেকে স্বতন্ত্র একটি সরকারী ক্ষমতা যে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য তা আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি। ঐ সময় এথেন্সের মাত্র জনবাহিনী ও নৌবাহিনী ছিল যাতে জনগণই সরাসরি লোক ও উপকরণ যোগাত; এ দিয়ে বহিঃশত্রু থেকে আত্মরক্ষা ও তখনই জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ হয়ে ওঠা দাসদের সংযত রাখা হত। নাগরিকদের কাছে এই সামাজিক শক্তিটি প্রথমে কেবল পুলিস বাহিনী রূপে প্রকটিত ছিল, এবং তা রাষ্ট্রের সমবয়সী বিধায় ১৮শ শতাব্দীর সাদামাঠা সরল ফরাসীরা এদের সভ্য জাতি না বলে পুলিস (শাসিত) জাতি (nations policées)* বলত। এভাবে রাষ্ট্র পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এথেন্সবাসীরা পদাতিক ও অশ্বারোহী তীরন্দাজদের রীতিমতো সান্ত্রীবাহিনী নিয়ে — যাকে দক্ষিণ জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে বলা হত Landjäger — একটি পুলিস বাহিনীও প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু এই সান্ত্রীবাহিনী গঠিত ছিল **দাসদের** নিয়ে। স্বাধীন নাগরিক পুলিসের কাজকে এতই নীচ মনে করত যে, সে নিজে তেমন অপমানজনক কাজ করার চেয়ে একজন সশস্ত্র দাসের হাতে গ্রেপ্তার হওয়াও বেশি পছন্দ করত। এটা সেই সাবেকী গোত্রীয় মনোভাবেরই অব্যাহত অভিব্যক্তি। পুলিস ছাড়া রাষ্ট্র বাঁচতে পারে না, কিন্তু তখনও রাষ্ট্র নেহাৎ নতুন এবং তার নৈতিক মর্যাদা ততখানি উন্নত হয় নি যাতে পুরানো গোত্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে জঘন্য বিবেচিত এই পেশা সম্মানীয় হয়ে উঠবে।

অধুনা পূর্ণাঙ্গ এই নতুন রাষ্ট্রটি এথেন্সীয় সমাজের নতুন অবস্থার কতখানি উপযোগী হয়েছিল তার অর্থসম্পদ, বাণিজ্য ও শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধি থেকেই তা সহজবোধ্য। যে শ্রেণীবিরোধকে ভিত্তি করে সামাজিক ও

* শব্দার্থ নিয়ে খেলা: 'policé' — 'সভ্য' এবং 'police' — 'পুলিস'। — সম্পাঃ

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি দাঁড়িয়েছিল, সেটি আর অভিজাত ও সাধারণ নাগরিকদের বিরোধ ছিল না, তা দাস ও স্বাধীন মানুষ, পোষ্য অধিবাসী ও নাগরিকদের বিরোধে পর্যবসিত হয়েছিল। এথেন্সের সর্বাধিক শ্রীবৃদ্ধির সময়ে নারী ও শিশু সমেত স্বাধীন নাগরিকদের সংখ্যা ছিল ৯০,০০০-এর কাছাকাছি; স্ত্রীপুরুষ দাসদের সংখ্যা ছিল ৩,৬৫,০০০ এবং বিদেশাগত ও মুক্ত দাসদের নিয়ে পোষ্য অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ৪৫,০০০। অতএব প্রত্যেক সাবালক পুরুষ নাগরিক পিছু কমপক্ষে আঠারো জন দাস ও দুজনেরও বেশি পোষ্য ব্যক্তি ছিল। দাসদের বৃহৎ সংখ্যার কারণ ছিল এই যে, তাদের অনেকে বড় বড় ঘরে অবস্থিত হস্তশিল্প কারখানায় পরিদর্শকের অধীনে কাজ করত। বাণিজ্য ও শিল্প বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অল্প কয়েক জনের হাতে ধন সঞ্চিত ও কেন্দ্রীভূত হল; স্বাধীন নাগরিকদের ব্যাপক সংখ্যা নিঃস্ব হতে থাকল এবং হেয় ও ঘৃণ্য বিবেচিত হস্তশিল্পে নেমে দাসশ্রমের প্রতিযোগিতায় অনিশ্চিত সাফল্যে আত্মসমর্পণ অথবা তার বিকল্প হিসেবে নিঃস্বতা গ্রহণ ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর ছিল না। তখনকার প্রচলিত অবস্থায় শেষোক্তটিই অনিবার্যভাবে ঘটত এবং এদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে তারা সমগ্র এথেন্স রাষ্ট্রের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনল। গণতন্ত্রের জন্য এথেন্সের পতন ঘটে নি, যদিও রাজরাজড়াদের পদলেহী ইউরোপীয় কট্টর শিক্ষকরা আমাদের এই কথা বিশ্বাস করাতে চেয়েছে, এর পতন হয়েছে দাস প্রথার ফলে, যে প্রথা স্বাধীন নাগরিকের শ্রমকে হেয় করে তুলেছিল।

এথেন্সীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রের উদ্ভব মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রগঠনের একটি সাধারণ দৃষ্টান্তস্বরূপ; কারণ, একদিকে এটি বহিস্থ অথবা অভ্যন্তরীণ হিংস্র হস্তক্ষেপ (পিসিস্ট্রেটাসের অল্পস্থায়ী ক্ষমতাদখল কোনো চিহ্ন রেখে যায় নি) ছাড়াই একটি বিশুদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে; অপরদিকে এটি ছিল রাষ্ট্রের একটি অত্যুন্নত রূপ, একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যা সরাসরি গোত্রভিত্তিক সমাজ থেকে উদ্ভূত; এবং সর্বশেষে, এক্ষেত্রে সমস্ত মৌলিক খুঁটিনাটির পর্যাপ্ত বিবরণ সহজলভ্য।

৬

রোমে গোত্র ও রাষ্ট্র

রোম প্রতিষ্ঠার উপকথা অনুযায়ী একটি উপজাতিতে মিলিত কয়েকটি ল্যাটিন গোত্র (উপকথায় এদের সংখ্যা এক শ') এখানে প্রথম বসতি স্থাপন করে, তাদের একটু পরেই আসে একটি সাবেলিয়ান উপজাতি যাদের গোত্র সংখ্যাও নাকি এক শ' ছিল এবং সর্বশেষে বিভিন্ন জনসমষ্টি নিয়ে গঠিত এক শ' গোত্রের তৃতীয় উপজাতি এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এই গোটা কাহিনী থেকে এক নজরেই প্রকাশ পায় যে, গোত্র ছাড়া অন্যতর কিছুই আর এখানে স্বাভাবিক নয় এবং বহুক্ষেত্রে গোত্রগুলিও ছিল পুরাতন বাসভূমিতে তখনও অবস্থিত কোনো আদি মাতৃ-গোত্রের শাখাপ্রশাখা। উপজাতিগুলি কৃত্রিমভাবে গঠিত হওয়ার চিহ্ন বহন করত; তবুও সেগুলি আত্মীয় ব্যক্তিবর্গ নিয়েই প্রধানত গড়ে উঠেছিল এবং তারা পুরানো, স্বাভাবিকভাবে বিকশিত উপজাতিগুলির ছাঁচেই সংগঠিত ছিল, কৃত্রিমভাবে নয়; এবং এটা আদৌ অসম্ভব নয় যে, এই তিনটি উপজাতিই কোনো প্রাচীন, অবিমিশ্র উপজাতিকেন্দ্র থেকে উদ্ভূত। এদের মধ্যবর্তী যোগসূত্র, দশটি গোত্রসমন্বিত ফ্রাত্রীর নাম ছিল কিউরিয়া; অতএব মোট ফ্রাত্রী সংখ্যা ছিল ত্রিশ।

রোম গোত্র যে গ্রীক গোত্রানুসারী একটি অভিন্ন প্রতিষ্ঠান তা স্বীকৃত সত্য; গ্রীক গোত্র যদি মার্কিন লাল চামড়াদের ক্ষেত্রে দৃষ্ট সামাজিক এককের আদি রূপ থেকে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তাহলে স্বভাবতই তা রোম গোত্রের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। তাই আলোচনাটি আমরা সংক্ষিপ্ত করতে পারি।

অন্তত নগরের একেবারে আদিকালে রোম গোত্রের গঠন ছিল নিম্নরূপ:

১। গোত্রভুক্তের মৃত্যুতে সম্পত্তির পারস্পরিক উত্তরাধিকার; সম্পত্তি গোত্রের মধ্যেই থাকত। যেহেতু গ্রীক গোত্রের মতো রোম গোত্রেও পিতৃ-অধিকার ইতিমধ্যে প্রচলিত ছিল, সেজন্য কন্যাপক্ষীয় সন্তানসন্ততি

উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হত। আমাদের জানা রোমের প্রাচীনতম লিপিবদ্ধ আইন, বারো ফলকের আইন (২৫) অনুযায়ী সন্তানসন্ততি সম্পত্তির প্রথম উত্তরাধিকারী হত; নিঃসন্তান অবস্থায় এগ্‌নেটরা (পুরুষপক্ষীয় নিকটতম জ্ঞাতি) এবং এদেরও অবর্তমানে গোত্রের সদস্যরা উত্তরাধিকার লাভ করত। সকল ক্ষেত্রেই সম্পত্তি গোত্রের মধ্যেই থাকত। এখানে আমরা গোত্রীয় রীতিনীতিতে সম্পত্তি বৃদ্ধি ও একগামিতার ফলে উদ্ভূত নতুন আইনী ব্যবস্থার ক্রমান্বিত অন্তর্প্রবেশ লক্ষ্য করি: উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে গোত্র সভ্যদের আদি সমানাধিকারকে প্রথমে সঙ্কুচিত করে কার্যত তা এগ্‌নেটদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়, পূর্বোক্ত এই ঘটনাটি সম্ভবত খুব আদিম কালের ব্যাপার, এবং তারপর সন্তানসন্ততি আর তাদের পুরুষপক্ষীয় ছেলেমেয়েদের উপর তা অর্সাল; অবশ্য, বারো ফলকের আইনে এটি বিপরীতক্রমে প্রকাশিত।

২। একটি সাধারণ সমাধিস্থান। ক্লডিয়াস আশরাফ গোত্র রেজিলি থেকে এসে রোমে বসবাস করতে শুরু করলে তাদের জন্য ভূমিখণ্ড ও নগরেই একটি সাধারণ সমাধিস্থান দেওয়া হয়। এমন কি অগাস্টসের সময়ে ভেরস যখন টিউটোবুর্গের অরণ্যে মারা যান, তখন তাঁর মাথা রোমে এনে gentilitius tumulus-এ* সমাহিত করা হয়; অতএব তাঁর কুইঙ্কটিলিয়া গোত্রের তখনও নিজস্ব বিশেষ সমাধিস্তূপ ছিল।

৩। সাধারণ ধর্মোৎসব। এই sacra gentilitia** সুপরিচিত।

৪। গোত্রের মধ্যে বিবাহ না করবার বাধ্যবাধকতা। রোমে এটি কখনও আইন রূপে লিপিবদ্ধ হয়েছিল বলে মনে হয় না, কিন্তু রীতিটি অনুসৃত ছিল। রোমের বিবাহিত দম্পতিদের যে অসংখ্য নাম আজ পর্যন্ত আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে এমন একটি দৃষ্টান্তও নেই যেখানে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের গোত্রনাম অভিন্ন। উত্তরাধিকার আইনও এই নিয়মই প্রমাণ করে। বিবাহের পরে নারী তার এগ্‌নেটিক অধিকার হারাত, নিজের গোত্র পরিত্যাগ করত এবং সে অথবা তার ছেলেমেয়েরা তার পিতা অথবা পিতৃব্যের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না, কারণ এতে পিতৃ-গোত্রের সম্পত্তিহানি ঘটত।

* গোত্রীয় সমাধিস্তূপ। — সম্পাঃ

** গোত্রীয় পবিত্র উৎসব। — সম্পাঃ

নারী নিজ গোত্রে বিবাহ করতে পারত না এই তথ্যের স্বীকৃতি সাপেক্ষেই শুধু নিয়মটি বোধগম্য।

৫। জমির যৌথ মালিকানা। আদি যুগে উপজাতি জমির প্রথম ভাগাভাগি শুরু পর্যন্ত এই মালিকানাই সর্বদাই প্রচলিত ছিল। ল্যাটিন উপজাতিগুলির মধ্যে আমরা দেখি যে, জমি অংশত উপজাতি, অংশত গোত্র এবং অংশত পরিজনবর্গের দখলে থাকত যা দৈবাৎ একক পরিবারের প্রতিনিধি হয়ে উঠত। শোনা যায়, রমুলাসই প্রথম ব্যক্তিবিশেষ অনুসারে মাথাপিছু এক হেক্টর (দুই জুগেরা) করে জমি বণ্টন করেছিলেন। তথাপি, রাষ্ট্রীয় জমির কথা ছেড়ে দিলেও পরবর্তীকালেও গোত্রের সাধারণ জমিও আমরা দেখতে পাই যাকে কেন্দ্র করে প্রজাতন্ত্রের সমগ্র অভ্যন্তরীণ ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে।

৬। গোত্র সভ্যদের পারস্পরিক সাহায্য ও অন্যায় প্রতিকারে বাধ্যবাধকতা। লিখিত ইতিহাসে এর সামান্য লুপ্তাবশেষ পাওয়া যায়; সূচনা থেকেই রোম রাষ্ট্রে এত পরাক্রমশালী শক্তির প্রকাশ ঘটে যে, অন্যায় প্রতিকারের দায়িত্ব এতেই অর্সিয়েছিল। অ্যাপিয়াস ক্লডিয়াস গ্রেপ্তার হলে ব্যক্তিগত শত্রু সমেত তাঁর সমগ্র গোত্র শোক প্রকাশ করেছিল। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের (২৬) সময় গোত্রাধীন বন্দীদের মুক্তিক্রয়ের জন্য গোত্রগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়; সিনেট এই কাজ **নিষিদ্ধ করে।**

৭। গোত্রনাম ব্যবহারের অধিকার। এইটি সম্রাটযুগের পূর্বাবধি প্রচলিত ছিল। মুক্তিপ্রাপ্ত দাসরা প্রাক্তন প্রভুর গোত্রনাম নিতে পারত, অবশ্য তারা গোত্রের কোনো অধিকার লাভ করত না।

৮। বিদেশীদের গোত্রভুক্ত করার অধিকার। পরিবারবিশেষে অন্তর্ভুক্তি মাধ্যমে (যেমন রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে) কাজটি সম্পন্ন হত, এতে ব্যক্তিটি গোত্রভুক্ত হত।

৯। প্রধানদের নির্বাচন বা পদচ্যুতির অধিকারের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু যেহেতু রোমের অস্তিত্বের প্রথম যুগে নির্বাচিত রাজা থেকে অধস্তন সমস্ত সরকারী পদই নির্বাচন অথবা নিয়োগ দ্বারা পূরণ করা হত এবং যেহেতু কিউরিয়াগুলিও তাদের পুরোহিতদের নির্বাচিত করত, সেজন্য ধরে নেওয়া চলে যে, গোত্র প্রধান (principes) সম্বন্ধেও একই প্রণালী

প্রচলিত ছিল — একই পরিবার থেকে প্রার্থী বাছাই করার রীতি ততদিনে যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হোক না কেন।

এই ছিল রোম গোত্রের ক্ষমতাবলি। শুধুমাত্র পূর্ণ পিতৃ-অধিকারে উত্তরণ ব্যতীত এটি ইরকোয়াস গোত্রের কর্তব্য ও অধিকারেরই যথাযথ প্রতিচ্ছবি। অর্থাৎ এখানেও 'স্পষ্টতই ইরকোয়াসরা উপস্থিত'।

আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যেও রোম গোত্র প্রথার প্রকৃতি সম্পর্কে যে কত ভুল ধারণা আজও রয়েছে, তা নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তেই লক্ষণীয়: প্রজাতন্ত্র এবং অগাস্টস যুগের রোমান নামকরণ প্রথা সম্পর্কিত রচনায় ('রোম বিষয়ক গবেষণা', বার্লিন, ১৮৬৪, ১খণ্ড) মম্‌জেন লিখছেন:

'গোত্রনাম শুধু গোত্রের সকল পুরুষ, দাস ব্যতিরেকে, সকল গোত্রভুক্ত পোষ্যরাই ব্যবহার করত না, পরন্তু নারীরাও করত... উপজাতি' (মম্‌জেন কৃত gens কথাটির অনুবাদ) 'বাস্তব অথবা কল্পিত আর এমন কি উদ্ভাবিত একই সাধারণ বংশোদ্ভূত একটি জনসমষ্টি এবং তা সাধারণ পূজোপদ্ধতি, সমাধিস্থান ও উত্তরাধিকার সূত্রে ঐক্যবদ্ধ। সমস্ত স্বাধীন ব্যক্তিবর্গ, অতএব নারীরাও এর তালিকাভুক্ত হতে পারত এবং হতে হত। কিন্তু বিবাহিতা নারীর গোত্রনাম স্থির করা কঠিনতর। বস্তুত স্বগোত্রের বাইরে নারীর বিবাহ নিষিদ্ধ থাকাকালীন এমনটি ছিল না; এবং একথা স্পষ্ট যে, অনেকদিন পর্যন্ত মেয়েদের পক্ষে স্বগোত্র অপেক্ষা অন্য গোত্রে বিবাহ করা অনেক বেশি শক্ত ছিল। ভিন্ন গোত্রে বিবাহের এই অধিকার — অর্থাৎ gentis enuptio — ষষ্ঠ শতাব্দীতেও ব্যক্তিগত সুবিধা ও পুরস্কার হিসেবে দান করা হত... কিন্তু যেখানেই বহির্বিবাহ ঘটত, সেখানেই আদিমতম যুগে নারীকে সম্ভবত তার স্বামীর উপজাতিভুক্ত হতে হত। পুরানো ধর্মীয় বিবাহের ফলে নারীকে যে গোষ্ঠী ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে স্বামীর আইনগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠীতে যোগ দিতে হত, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। একথা কে না জানে যে, বিবাহিতা নারী স্বগোত্রে উত্তরাধিকারের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সমস্ত অধিকার হারায় এবং স্বামী, ছেলেমেয়ে ও সাধারণত এদের স্বগোত্রজদের উত্তরাধিকারভিত্তিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এবং তার স্বামী তাকে যখন পোষ্য হিসেবে নিজের পরিবারে গ্রহণ করে, তখন তার পক্ষে কীভাবে স্বামীর গোত্রের বাইরে থাকা সম্ভব?' (৮-১১ পৃঃ)।

এভাবে মম্‌জেন দাবী করেছেন যে, কোনো একটি গোত্রের রোমান নারী গোড়ার দিকে কেবলমাত্র গোত্রের **মধ্যেই** বিবাহ করতে পারত; অতএব তাঁর মতে রোম গোত্র অন্তর্বৈবাহিক, বহির্বৈবাহিক নয়। এই মতটি অন্য সকল জাতির অভিজ্ঞতার বিরোধী, এবং তা পুরো না হলেও মুখ্যত

লিভিয়াসের রচনার (৩৯ গ্রন্থ, ১৯ অনুচ্ছেদ) একটি মাত্র তর্কাধীন উদ্ধৃতিভিত্তিক যাতে বলা হচ্ছে যে, রোম প্রতিষ্ঠার পর ৫৬৮ সালে অথবা খৃঃ পূঃ ১৮৬ সালে সিনেট নির্দেশ দেয় যে,

'uti Feceniae Hispalae datio, deminutio, gentis enuptio, tutoris optio item esset quasi ei vir testamento dedisset; utique ei ingenuo nubere liceret, neu quid ei qui eam duxisset, ob id fraudi ignominiaeve esset,' — 'ফেসেনিয়া হিস্পালা তার সম্পত্তি বিলিবন্দোবস্ত করা, তা কমানো, গোত্রের বাইরে বিবাহ করা, অভিভাবক মনোনীত করার অধিকারগুলি যেন' (মৃত) 'স্বামীর উইল অনুসারে তার উপর অর্পিত হয়েছে; সে যেকোনো জন্মস্বাধীন নাগরিককে বিবাহ করতে পারবে এবং যাকে সে বিবাহ করবে সেই ব্যক্তির এজন্য কোনো দোষ বা সম্মানহানি হবে না।'

সন্দেহ নেই ফেসেনিয়া নামক মুক্তিপ্রাপ্ত দাসী এখানে গোত্রের বাইরে বিবাহের অনুমতি পাচ্ছে। এবং এই বিবরণ অনুযায়ী স্বামী যে উইল করে তার মৃত্যুর পর স্ত্রীকে গোত্রের বাইরে বিবাহের অধিকার দিতে পারত তাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। কিন্তু **কোন** গোত্রের বাইরে?

যদি একজন নারীকে স্বগোত্রেই বিবাহ করতে হয়, যেমনটি মম্‌জেন ধরে নিয়েছেন, তাহলে বিবাহের পরও সে গোত্রের মধ্যেই থাকে। কিন্তু প্রথমত, গোত্র যে অন্তর্বৈবাহিক ছিল এর প্রমাণ প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, নারী গোত্রের মধ্যে বিবাহ করলে পুরুষকেও তাই করতে হত, অন্যথা সে পাত্রী পাবে কোথায়? অতএব আমরা এমন একটি অবস্থায় পেঁাছেছি যেখানে একজন পুরুষ উইলক্রমে স্ত্রীকে যে অধিকার দিতে পারত, তার নিজের ক্ষেত্রে যা বর্তায় না, আইনের চোখে এ তো একেবারেই অর্থহীন; মম্‌জেনও ব্যাপারটি বোঝেন, তাই অনুমান করেন:

'সম্ভবত গোত্রবহিস্থ বিবাহে শুধুমাত্র অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির আইনগত সম্মতি নয়, উপরন্তু, গোত্রের সকলের সম্মতি দরকার হত' (১০ পৃঃ, টীকা)।

প্রথমত, এটি অত্যন্ত দুঃসাহসী অনুমান এবং দ্বিতীয়ত, এটা উদ্ধৃতির সুস্পষ্ট পাঠের বিরোধী। সিনেট **স্বামীর প্রতিভূ হিসেবে** তাকে এই অধিকার দিচ্ছে; তার স্বামী তাকে যা দিতে পারত এতে সুস্পষ্টভাবেই তাই দেওয়া হচ্ছে, তার কমও নয়, বেশিও নয়। কিন্তু সে যে অধিকার পেল তা **অনপেক্ষ** অধিকার, যা সকল বাধামুক্ত, সুতরাং সে তা ব্যবহার করলে তার নতুন

স্বামী এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না; সিনেট আবার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কন্সাল ও প্রেটরদের নির্দেশ দেয় যেন এই অধিকার ব্যবহারে তার কোনো ক্ষতি না হয়। অতএব মম্‌জেনের অনুমান একেবারেই অচল মনে হয়।

অতঃপর ধরা যাক, একজন নারী ভিন্ন গোত্রের একজন পুরুষকে বিবাহ করল, কিন্তু সে স্বগোত্রেই রইল। তাহলে উপরোক্ত উদ্ধৃতি অনুযায়ী স্ত্রীর গোত্রের বাইরে তাকে বিবাহ করতে বলার অধিকার তার স্বামীর থাকবে। অর্থাৎ স্বামী আদৌ যে গোত্রের সভ্য নয়, তার ব্যাপারেও ব্যবস্থা করার অধিকার তার থাকবে। এটি এতই অযৌক্তিক যে, এই বিষয়ের পুনরালোচনা নিরর্থক।

এখন শুধু এই অনুমানটুকুই বাকি রইল যে, পূর্বোক্ত নারীর প্রথম বিবাহ তার গোত্রবহিস্থ পুরুষের সঙ্গে হয়েছিল এবং সেজন্য সে নিঃসন্দেহে তার স্বামীর গোত্রভুক্ত হয়েছিল, এরকম ক্ষেত্রে মম্‌জেনও যা মেনে নিয়েছেন। সমগ্র ব্যাপারটি এখন স্বতঃবোধ্য; বিবাহ মাধ্যমে প্রাক্তন স্বগোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন এই নারী স্বামীর গোত্রভুক্ত হয় এবং এই নতুন গোত্রে একটি বিশেষ অবস্থানে আসীন থাকে। সে এই গোত্রের সদস্য, কিন্তু রক্তসম্পর্কিত আত্মীয় নয়; যেভাবে সে এই গোত্রভুক্ত হয়েছে, তাতে এই বিবাহজনিত কারণে গোত্রে তার বিবাহের উপর সমস্ত নিষেধ গোড়াতেই নাকচ হয়ে যায়; অধিকন্তু সে এই গোত্রের বিবাহগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে স্বামীর মৃত্যুতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার অর্থাৎ গোত্রের একজন সভ্যের সম্পত্তি লাভ করছে। ঐ সম্পত্তি যাতে গোত্রের মধ্যেই থাকে সেজন্যে তার প্রথম স্বামীর কোনো স্বগোত্রীয়কেই যে সে বিবাহ করতে বাধ্য হবে তার চেয়ে বেশি স্বাভাবিক আর কী হতে পারে? তা সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যতিক্রম করতে হয়, তবে সম্পত্তিদাতা তার সেই প্রথম স্বামীর চেয়ে ও অধিকার দেবার যোগ্যতর ব্যক্তি আর কে হতে পারে? যখন সে তার সম্পত্তির একাংশ স্ত্রীকে দান করছে ও যুগপৎ সে স্ত্রীকে বিবাহ দ্বারা অথবা বিবাহের ফলে ঐ সম্পত্তি অন্য গোত্রে হস্তান্তর করবার অনুমতি দিচ্ছে, তখনও সে ঐ সম্পত্তির মালিক থাকছে; সুতরাং সে যথার্থই নিজ সম্পত্তিই বিতরণ করছে। আর সেই নারী এবং স্বামীর গোত্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ধরলে স্বামীই নিজ স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ দ্বারা স্ত্রীকে স্বগোত্রে এনেছিল; অতএব এটা

খুবই স্বাভাবিক যে, সে-ই আবার অপর একটি বিবাহ দ্বারা স্ত্রীকে তার গোত্র ত্যাগ করার অধিকার দেবে। সংক্ষেপে বলা যায়, রোমান গোত্রের আজগুবি অন্তর্বৈবাহিক ধারণাটি পরিত্যাগ করে মর্গানের মতানুযায়ী আদিতে একে বহির্বৈবাহিক বলে গণ্য করলেই ব্যাপারটি সরল ও স্বতঃস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সর্বশেষে আরও একটি অভিমত আছে এবং তার অনুগামীর সংখ্যা সম্ভবত সর্বাধিক; এতে লিভিয়াসের উদ্ধৃতিটির অর্থ কেবলমাত্র এরূপ যে,

> 'মুক্ত ক্রীতদাসীরা (libertae) বিশেষ অনুমতি ছাড়া e gente enubere' (গোত্রবহিস্থ বিবাহ) 'করতে অথবা অন্য এমন কোনো কিছু করতে পারে না যা capitis diminutio minima-র* সঙ্গে জড়িত থাকায় libertaটির গোত্রীয় গোষ্ঠী পরিত্যাগের হেতু হতে পারে' (লাঙ্গে, 'রোমের প্রাচীন কথা', বার্লিন, ১৮৫৬, ১ খণ্ড, ১৯৫ পৃঃ, যেখানে লিভিয়াসের উদ্ধৃতি নিয়ে হুশ্‌কে'র লেখার উপর মন্তব্য করা হয়েছে)।

এই অনুমান যদি সঠিক হয়, তাহলে উদ্ধৃতিটি জন্মস্বাধীন রোমান নারীর অবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছুই প্রমাণ করে না এবং স্বগোত্রে তাদের বিবাহের বাধ্যবাধকতার পক্ষেও কোনো সঙ্গত কারণ দর্শায় না।

Enuptio gentis বাক্যাংশটি লিভিয়াসের মাত্র এই একটি জায়গাতেই আছে এবং সমগ্র রোম সাহিত্যের অন্য কোথাও তা পাওয়া যায় না; enubere শব্দটি যার অর্থ বহির্বিবাহ, এটিও লিভিয়াসে মাত্র তিন জায়গায় পাওয়া যায়, এবং তা গোত্র প্রসঙ্গে নয়। রোমান নারী যে কেবল গোত্রের মধ্যেই বিবাহ করতে পারে এই আজগুবি ধারণাটি শুধু এই একটি মাত্র উদ্ধৃতিতেই রয়েছে। কিন্তু তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ, হয় উদ্ধৃতিটি মুক্ত দাসীদের উপর বিশেষ বিধিনিষেধ সম্পর্কিত যা জন্মস্বাধীন নারী (ingenuae) সম্পর্কে কিছুই প্রমাণ করে না, অথবা এটি জন্মস্বাধীন নারীদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হলে বরং এতে প্রমাণই হয় যে, তারা নিয়মমতো বহির্গোত্রেই বিবাহ করত এবং বিবাহের ফলে স্বামীর গোত্রভুক্ত হত। অতএব উদ্ধৃতিটি মমজেনের বিরুদ্ধে এবং মর্গানের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

---

* পারিবারিক অধিকার হরণ। — সম্পাঃ

রোম প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন শ' বছর পরও গোত্রবন্ধন এতই শক্ত ছিল যে, ফেবিয়ান নামে একটি আশরাফ গোত্র সিনেটের অনুমতি নিয়ে নিজেরাই প্রতিবেশী ভিয়ি নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেছিল। কথিত আছে, ৩০৬ জন ফেবিয়ান অভিযানে অংশ গ্রহণ করে এবং শত্রুর ফাঁদে নিহত হয়। একটি মাত্র বালকই শুধু অবশিষ্ট রইল এবং সে-ই গোত্রের বংশধারা অব্যাহত রাখল।

আমরা আগেই বলেছি যে, দশটি গোত্র নিয়ে একটি ফ্রাত্রী গঠিত হত, যাকে এরা বলত কিউরিয়া এবং গ্রীক ফ্রাত্রীর তুলনায় এর গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব ছিল অনেক বেশি। প্রত্যেক কিউরিয়ার নিজের ধর্মানুষ্ঠান, পূতবস্তু এবং পুরোহিত থাকত; শেষোক্তরা একত্রে রোমানদের একটি পুরোহিতমণ্ডলী গঠন করত। দশটি কিউরিয়া নিয়ে একটি উপজাতি গঠিত হত যারও সম্ভবত প্রথম দিকে নিজস্ব নির্বাচিত প্রধান — সেনাপতি ও প্রধানতম পুরোহিত থাকত — যেমনটি অন্য সব ল্যাটিন উপজাতির ছিল। তিনটি উপজাতির সমবায়ে গঠিত ছিল রোমান জাতি — populus romanus।

অতএব রোম জাতির সদস্য কেবল তারাই হতে পারত যারা ছিল কোনো গোত্রের সভ্য এবং সেজন্য কোনো একটি কিউরিয়া ও উপজাতির সভ্য। এই জাতির প্রথম শাসনতন্ত্র ছিল নিম্নরূপ। সামাজিক কাজকর্ম পরিচালনা করত সিনেট যার সম্পর্কে নিয়েবুরই প্রথমে নির্ভুল বিবরণ দিয়েছেন যে, এটি তিন শ' গোত্র প্রধানদের নিয়ে গঠিত; গোত্রের প্রধান হিসেবে এই ব্যক্তিদের পিতা (patres) বলে এবং সমবেতভাবে সিনেট (প্রধানদের পরিষদ, senex কথাটি থেকে, যার মানে বৃদ্ধ) বলে সম্ভাষণ করা হত। এখানেও গোত্রের একই পরিবার থেকে প্রধান নির্বাচনের রীতি থেকে প্রথম গোত্রীয় আভিজাত্যের উদ্ভব ঘটল; এই পরিবারগুলি নিজেদের আশরাফ আখ্যা দিল এবং সিনেটে আসন লাভের বিশেষ অধিকার ও সকল সরকারী পদের সর্বৈব অধিকার দাবী করল। জনগণ যে কালক্রমে এই দাবী মেনে নেয় এবং তার ফলে এটি একটি সত্যিকার অধিকার হয়ে দাঁড়ায়, তা রমুলাস কর্তৃক প্রথম সিনেটর ও তাদের বংশধরদের আশরাফ পদমর্যাদা ও সুবিধা দানের কিংবদন্তীতে প্রকটিত। যেমন এথেন্সীয় bulê তেমনি সিনেটেরও বহু

ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ছিল এবং তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাগুলি, বিশেষত নতুন আইনের প্রাথমিক আলোচনা করত। এই আইনগুলি comitia curiata (কিউরিয়াগুলির সভা) নামক জনসভায় গৃহীত হত। সমবেত জনগণ কিউরিয়া অনুযায়ী এবং প্রত্যেক কিউরিয়ায় সম্ভবত আবার গোত্র অনুযায়ী স্থান গ্রহণ করত; সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ত্রিশটি কিউরিয়ার প্রত্যেকের একটি করে ভোট থাকত। কিউরিয়াগুলির এই সভা আইন গ্রহণ বা বর্জন, rex সমেত (তথাকথিত রাজা) সমস্ত ঊর্ধ্বতন পদাধিকারীদের নির্বাচন, যুদ্ধ ঘোষণা (কিন্তু সন্ধি করত সিনেট) এবং সর্বোচ্চ আদালত রূপে রোমান নাগরিকদের প্রাণদণ্ডের সমস্ত মামলার সংশ্লিষ্ট পক্ষদের আপীল নিষ্পত্তি করত। — সর্বশেষে সিনেট ও জনসভার পাশেই ছিল ঠিক গ্রীকদের বেসিলিয়াসের অনুরূপ rex এবং তিনি মোটেই একচ্ছত্র রাজা* ছিলেন না, যেমনটি মম্‌জেন দেখিয়েছেন। তিনিও যুদ্ধে সেনাপতি, প্রধান পুরোহিত এবং কোনো কোনো বিচারালয়ের সভাপতি ছিলেন। সেনাপতি হিসেবে শৃঙ্খলাবিধান অথবা আদালতের প্রধান বিচারপতি রূপে রায় কার্যকরী করার শক্তি থেকে যেটুকু অধিকার বর্তাত তাছাড়া বেসামরিক প্রশাসনে তাঁর কোনো অধিকার অথবা নাগরিকদের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির ব্যাপারে তাঁর কোনো ক্ষমতা ছিল না। রেক্সের পদ বংশগত ছিল না; বরং তাঁকে, সম্ভবত বিদায়ী রেক্সের মনোনয়নক্রমে, প্রথমে কিউরিয়াগুলির সভা নির্বাচিত করত এবং পুনরায় দ্বিতীয় সভায়

---

* ল্যাটিন rex শব্দ কেল্ট-আইরিশ righ (উপজাতির প্রধান) এবং গথদের reiks শব্দের সমার্থজ্ঞাপক; শেষ শব্দটি যে জার্মান Fürst-এর মতো (ইংরেজী first ও ডেনিশ förste শব্দ, অর্থাৎ 'প্রথম') শুরুতে বোঝাত গোত্র বা উপজাতির প্রধান, সেটা সুস্পষ্ট হয় এই তথ্য থেকে যে, গথরা চতুর্থ শতাব্দীতে পরবর্তীকালের রাজা, সমগ্র জনগণের সেনাপতি বোঝাবার জন্য ইতিমধ্যে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করত: যথা, thiudans। আলফিলার অনূদিত বাইবেলে আর্টাক্সেরক্সের ও হেরড'কে কখনই reiks বলা হয় নি, পরন্তু কেবল thiudans বলা হয়েছে এবং সম্রাট টাইবেরিয়াসের শাসিত দেশকে reiki নয়, পরন্তু thiudinassus বলা হয়েছে। গথদের thiudans অথবা ভুল অনুবাদ করে আমরা যে নাম দিয়েছি সেই রাজা Thiudareiks, Theodorich অর্থাৎ Dietrich দুটো নামই একসঙ্গে মিলে যায়। (এঙ্গেলসের টীকা)।

বিধিমতো তাঁর পদাভিষেক নিষ্পন্ন হত। তাঁকে যে পদচ্যুত করা যেত, তা টার্ক্‌ভিনিয়স সুপার্বাসের ভাগ্য থেকেই প্রমাণিত হয়।

বীরযুগের গ্রীকদের মতোই তথাকথিত রাজাদের সময়কার রোমানরা গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতি ভিত্তিক একটি সামরিক গণতন্ত্রে বসবাস করত, যা থেকে এর বিকাশ ঘটে। যদিও কিউরিয়া ও উপজাতিগুলি অংশত কৃত্রিমভাবে সংগঠিত হয়েও থাকে, তবু যে সমাজে তাদের উদ্ভব এবং যাতে তখনও তারা চারিদিকে বেষ্টিত, সেই সমাজেরই খাঁটি ও স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত আদর্শের ছাঁচেই তাদের গড়া হয়েছিল। যদিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত আশরাফ অভিজাতরা ইতিমধ্যেই তাদের অটল পদভূমির আশ্রয় লাভ করেছিল এবং রেক্সরা ক্রমে ক্রমে নিজেদের অধিকারবৃদ্ধিতে সচেষ্ট ছিল, তবুও এতে শাসনব্যবস্থার আদি মৌলিক চরিত্র বদলে যায় না এবং এটাই আসল কথা।

ইতিমধ্যে রোম নগরী এবং দেশজয়ের ফলে প্রসারিত রোম প্রদেশের জনসংখ্যা অংশত বহিরাগতদের জন্য এবং অংশত বিজিত অঞ্চলগুলি, বিশেষত ল্যাটিন জেলাগুলির জনগণ মারফৎ বাড়তে থাকে। এসব নতুন প্রজারা (এখনকার মতো আমরা আশ্রয়াধীনদের কথা আলোচনা করছি না) পুরাতন গোত্র, কিউরিয়া ও উপজাতির বাহিরের লোক এবং সেজন্য এরা populus romanus বা যথার্থ রোমান জাতির অন্তর্গত নয়। এঁরা ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন ছিল, এরা জমির মালিক হতে পারত, এদের খাজনা দিতে হত এবং যুদ্ধের কাজ করারও দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তারা সরকারী পদ পেতে এবং কিউরিয়াগুলির সভায় অংশ নিতে কিংবা বিজিত রাষ্ট্রের ভূমিবণ্টনেরও অংশভাগী হতে পারত না। তারাই সমস্ত রাষ্ট্রীয় অধিকারবঞ্চিত আতরাফ। অবিরাম সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সামরিক শিক্ষা ও অস্ত্রসজ্জার জন্য তারা পুরাতন populus-এর কাছে — এখন বহিরাগতদের নিয়ে যাদের সংখ্যাবৃদ্ধির সমস্ত পথ কঠোরভাবে বন্ধ করা হয়েছিল — ত্রাসের কারণ হয়ে উঠল। উপরন্তু মনে হয়, populus ও আতরাফদের মধ্যে জমির মালিকানা একরকম সমভাবেই বণ্টন করা হয়েছিল, কিন্তু বাণিজ্য ও শিল্পজাত সম্পদ তখনও তত প্রচুর না হলেও প্রধানত তা আতরাফদের হাতেই ছিল।

একেই তো রোমের ঐতিহাসিক সূচনাপর্বের কিংবদন্তিগত উৎপত্তির সবই ঘন অন্ধকারে আবৃত; তার উপর আবার তাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে সমস্ত যুক্তিনিষ্ঠ প্রয়োগবাদী চেষ্টা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে আইনী শিক্ষাপ্রাপ্ত লেখকরা আমাদের কাছে মূল গ্রন্থস্বরূপ যে সমস্ত রচনা রেখে গেছেন, তার ফলে এই অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়েছে; এই কারণেই কখন, কোন পথে, কী কী কারণে বিপ্লব এসে পুরানো গোত্র প্রথার অবসান ঘটিয়েছিল সে সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থিত করা অসম্ভব। তবে আতরাফ এবং populus-এর মধ্যেকার সংঘর্ষের ভেতরই যে এই সমস্ত কারণ নিহিত সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত।

রেক্স সার্ভিয়াস টুলিয়াসের নামে প্রচলিত নতুন শাসনতন্ত্র অনেকটা গ্রীক ধাঁচের, বিশেষত সলোনের শাসনতন্ত্রের ঘনিষ্ঠ; এর সৃষ্ট নতুন জনসভায় আশরাফ ও আতরাফ শুধু সামরিক দায়িত্ব পালন করে কি না এই নিরিখেই সমভাবে তার অন্তর্ভুক্ত হল অথবা বাদ পড়ল। সামরিক দায়িত্ব পালনে বাধ্য সমস্ত পুরুষ জনসংখ্যাকে সম্পত্তি অনুযায়ী ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হল। প্রথম পাঁচটি শ্রেণীর ন্যূনতম সম্পদমূল্য ছিল: প্রথম — ১,০০,০০০, দ্বিতীয় —৭৫,০০০, তৃতীয় —৫০,০০০, চতুর্থ —২৫,০০০ এবং পঞ্চম —১১,০০০ অ্যাসেস (asses)। দ্যুরো দ্য লা মালের হিসাবে ঐ পরিমাণগুলি যথাক্রমে ১৪,০০০, ১০,৫০০, ৭,০০০, ৩,৬০০ এবং ১,৫৭০ মার্ক। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছিল প্রলেতারীয়রা যাদের ধনসম্পত্তি ছিল আরও কম এবং যাদের সামরিক দায়িত্ব ছিল না ও কর দিতে হত না। সেণ্টুরিয়াগুলির নতুন সভায় (comitia centuriata) নাগরিকরা সৈন্যদের কায়দায়, এক শ' লোকের এক-একটি বাহিনীতে (সেণ্টুরিয়া) সংঘবদ্ধ হত এবং প্রত্যেক সেণ্টুরিয়ার একটি করে ভোট থাকত। প্রথম শ্রেণী যোগাত ৮০, দ্বিতীয় শ্রেণী —২২, তৃতীয় —২০, চতুর্থ —২২ ও পঞ্চম —৩০ এবং ষষ্ঠ শুধু লোকদেখানোর একটি সেণ্টুরিয়া। মূলত সর্বাপেক্ষা ধনীদের সমবায়ে গঠিত ১৮ সেণ্টুরিয়া অশ্বারোহী এর সঙ্গে যোগ করা হত; সবসুদ্ধ এই সংখ্যা ছিল ১৯৩ সেণ্টুরিয়া। সংখ্যাধিক্যের জন্য ৯৭ ভোট দরকার হত; কিন্তু কেবল প্রথম শ্রেণী ও অশ্বারোহীদের একত্রে ৯৮ ভোট অর্থাৎ

সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল; তারা একমত হলে অন্য শ্রেণীর অমতেই তারা বৈধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত।

এই নবগঠিত সেঞ্চুরিয়ার উপর সেসব রাজনৈতিক অধিকার অর্সাল যা পূর্বতন কিউরিয়া সভার হাতে ছিল (নামমাত্র কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া); এর ফলে এথেন্সের মতো এখানেও কিউরিয়া ও এগুলির অন্তর্ভুক্ত গোত্রগুলি অধঃপতিত হয়ে কেবল ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় সংগঠনে পর্যবসিত অবস্থায় সেভাবে বহুদিন টিকেছিল, কিন্তু কিউরিয়া সভার অচিরেই বিলোপ ঘটল। তিনটি পুরানো গোত্রভিত্তিক উপজাতিকেও রাষ্ট্র থেকে অপসারণের জন্য চারটি অঞ্চলভিত্তিক উপজাতি গঠন করা হল — এরা নগরের এক-একটি পাড়ায় বাস করত এবং কিছু রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করত।

এভাবে রোমেও ব্যক্তিগত রক্তবন্ধনের ভিত্তিতে পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থা তথাকথিত রাজ প্রথা অবসানের আগেই ধ্বংস হয়ে গেল এবং আঞ্চলিক বিভাগ ও সম্পত্তির তারতম্যের ভিত্তিতে একটি নতুন রীতিমতো রাষ্ট্রব্যবস্থা তার স্থলবর্তী হল। এখানে সৈন্যদলে বাধ্যতামূলকভাবে কর্মরত নাগরিকদের হাতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল এবং এই ক্ষমতা শুধু দাসদের বিরুদ্ধেই নয়, অধিকন্তু সামরিক দায়িত্ব ও অস্ত্রবহনের অধিকারবঞ্চিত তথাকথিত প্রলেতারীয়দের বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হত।

সত্যিকার রাজক্ষমতা দখলকারী সর্বশেষ রেক্স, টার্কভিনিয়স সুপার্বাসকে বহিষ্কার করার পর, রেক্সের স্থলে (ইরকোয়াসদের মতো) সমক্ষমতাসম্পন্ন দুজন সামরিক অধিনায়কের (কন্সাল) ব্যবস্থা করে নতুন শাসনতন্ত্র আরও বিকশিত হয়েছিল মাত্র। এই শাসনতন্ত্রের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলেছিল রোম প্রজাতন্ত্রের সমগ্র ইতিহাস: প্রশাসনে প্রবেশ ও সরকারী জমিতে যোগদানের জন্য আশরাফ ও আতরাফদের সংগ্রাম ও সংঘাত, এবং বৃহৎ ভূপতি ও ধনপতিদের নতুন এক শ্রেণীতে শেষ পর্যন্ত আশরাফ অভিজাততন্ত্রের বিগলন; যারা সামরিক বৃত্তিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষকদের ক্রমে আত্মসাৎকৃত সমস্ত জমি দিয়ে তৈরি বিরাট বিরাট ভূখন্ড ক্রীতদাসদের হাতে চাষ করবার ব্যবস্থা করেছিল, ইতালিকে জনশূন্য করে দিয়েছিল এবং এভাবে কেবল সাম্রাজ্য শাসনেরই নয়, তার অনুগামী জার্মান বর্বরদের দ্বারও অবারিত করে দিয়েছিল।

৭

কেল্ট ও জার্মানদের মধ্যে গোত্র

বর্তমান যুগের বিভিন্ন বন্য ও বর্বর জাতিগুলির মধ্যে অল্পাধিক বিশুদ্ধরূপে যেসব গোত্রসংঘটন পাওয়া গিয়েছে, অথবা এশিয়ার সভ্য জাতিগুলির প্রাচীন ইতিহাসে এই ধরনের সংগঠনের যেসব চিহ্ন আছে, স্থানাভাবের জন্য তা নিয়ে আলোচনা করা গেল না। কোনো না কোনো ধরনে এগুলি সর্বত্রই সহজদৃষ্ট। এজন্য কয়েকটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। গোত্র যথাযথভাবে সনাক্ত হবার আগেই যিনি একে প্রাণপণে ভুল বুঝাতে চেয়েছেন সেই ম্যাক-লেনানই তার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন এবং কাল্মিক, চেরকেশীয়, সাময়েদ* এবং তিনটি ভারতীয় উপজাতি — ওয়ারালি, মাগার ও মণিপুরীদের মধ্যে এর মূল রূপরেখায় সঠিক বিবরণ দেন। মাক্সিম কভালেভ্স্কি সম্প্রতি প্শাভ, খেভ্সুর, স্ভান ও অন্যান্য ককেশীয় উপজাতির মধ্যে একে আবিষ্কার করে এর বিবরণ উপস্থাপিত করেন। এখানে আমরা কেল্ট ও জার্মানদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যেই নিজেদের সীমিত রাখব।

আমাদের কাল অবধি অব্যাহত কেল্টদের প্রাচীনতম আইনগুলিতে গোত্রের অস্তিত্ব পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত; আয়ার্ল্যান্ডে ইংরেজ কর্তৃক বলপূর্বক এই প্রথা নষ্ট করার পরও তা অন্তত স্বতঃচেতনা রূপে জনমানসে আজও বেঁচে আছে; গত শতাব্দীর মাঝামাঝিও স্কটল্যান্ডে এটি সুপ্রকট ছিল এবং এখানেও কেবল ইংরেজদের অস্ত্র, আইন ও আদালতের সামনেই তাকে পরাজিত হতে হয়েছিল।

একাদশ শতাব্দীর পরে নয়, ইংরেজদের বিজয়লাভের (২৭) অনেক শতাব্দী আগে রচিত ওয়েল্সের প্রাচীন আইনগুলিতে দেখা যায় যে, তখনও গোটা গ্রামে সমবেত চাষবাস চলছে, যদিও সেটা ছিল ব্যতিক্রম এবং পূর্ববর্তী সর্বজনীন প্রথার লুপ্তাবশেষ; প্রত্যেক পরিবারের পাঁচ একর নিজস্ব চাষের জোত ছিল; আরও একটি ভূখণ্ডে একসঙ্গেই সকলে সমবেতভাবে চাষ করত

* নেনেৎস জাতিসত্তার পূর্বতন রুশী নাম। — সম্পাঃ

এবং ফসল ভাগাভাগি করত। আইরিশ ও স্কটিশ দৃষ্টান্তগুলি বিচার করে দেখলে আর কোনো সন্দেহই থাকে না যে, এই গ্রাম্য গোষ্ঠীগুলি ছিল গোত্র বা গোত্রের অনুবিভাগ; যদিও ওয়েল্সের আইন পুনরানুসন্ধানে — যা সময়াভাবে আমার দ্বারা সম্ভব নয় (আমার নোটগুলি ১৮৬৯ সালের [২৮]) এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলবে না। কিন্তু ওয়েল্স ও আইরিশদের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটি প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে একাদশ শতাব্দীতেও কেল্টদের মধ্যে জোড়বাঁধা পরিবার তখনও একগামিতাকে বিশেষ জায়গা ছেড়ে দেয় নি। ওয়েল্সে বিবাহ সাত বছর উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অচ্ছেদ্য বিবেচিত হত না অথবা বলা ভাল বিচ্ছেদের নোটিস দেওয়া চলত। এমন কি সাত বছর পূর্ণ হতে মাত্র তিন রাত্রি বাকি থাকলেও বিবাহিত দম্পতি পৃথক হতে পারত। তারপর তারা নিজেদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগাভাগি করত: স্ত্রী ভাগ করত এবং পুরুষ নিজের অংশ বেছে নিত। অত্যন্ত হাস্যকর কতকগুলি নিয়মানুযায়ী আসবাবপত্র ভাগ করা হত। পুরুষের পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ হলে তাকে বিবাহের যৌতুক ও অন্য কয়েকটি জিনিস স্ত্রীকে ফেরত দিতে হত আর স্ত্রী বিচ্ছেদ চাইলে তার ভাগে কিছু কম পড়ত। সন্তানসন্ততির মধ্যে পুরুষ দুটি এবং স্ত্রী একটি, যথা মেজো সন্তানটি পেত। যদি বিবাহবিচ্ছেদের পরে স্ত্রী আবার বিবাহ করত এবং তার প্রথম স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে আসত, তাহলে নারীটি তার প্রথম স্বামীর অনুসরণ করতে বাধ্য হত, এমন কি ইতিমধ্যে নতুন স্বামীর শয্যায় **এক** পা বাড়িয়ে থাকলেও। কিন্তু দুজনে সাত বছর একসঙ্গে থাকলে আনুষ্ঠানিক বিবাহ ছাড়াই তারা স্বামীস্ত্রী বলে বিবেচিত হয়। বিবাহের পূর্বে নারী মোটেই কড়াকড়িভাবে কৌমার্য রক্ষা করত না এবং এরকম দাবীও করা হত না; এই বিষয়ে বিধিনিষেধ ছিল নিতান্ত তুচ্ছ ধরনের এবং তা বুর্জোয়া নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। কোনো নারী ব্যভিচারলিপ্ত হলে স্বামী তাকে প্রহার করতে পারত (যা তিনটি উপলক্ষ্যের একটি যখন স্বামী প্রহার করলেও তার কোনো শাস্তি হত না) কিন্তু প্রহারের পরে সে অন্য কোনোই প্রতিকার দাবী করতে পারত না; কারণ,

'একটি অপরাধের জন্য হয় প্রায়শ্চিত্ত নয় প্রতিশোধ, কিন্তু দুটি অবশ্যই অচল।'*

---

* 'ওয়েল্সের প্রাচীন আইন ও নির্দেশাবলি', ১ খন্ড, ১৮৪১, ৯৩ পৃঃ। — সম্পাঃ

যেসব কারণে একজন নারী বিবাহচ্ছেদের দাবী করলে সম্পত্তি বণ্টনের সময়ে তার কোনো অধিকার ক্ষুণ্ণ হত না, সেগুলি নানা ধরনের: পুরুষের মুখের দুর্গন্ধই এজন্য যথেষ্ট বিবেচিত হত। উপজাতি প্রধান অথবা রাজাকে প্রথম রাত্রির অধিকারের বদলে যে মুক্তিপণ (gobr merch, এ থেকে মধ্যযুগীয় প্রতিশব্দ marcheta, ফরাসী — marquette) দিতে হত, আইনসংহিতায় তার একটি বৃহৎ ভূমিকা ছিল। নারীর জনসভায় ভোট দেবার অধিকার ছিল। এসঙ্গেই বলা যায় যে, আয়ার্ল্যাণ্ডেও অনুরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে; সেখানেও মেয়াদী বিবাহের প্রথা সুপ্রচলিতই ছিল এবং বিচ্ছেদের সময় নারী সুনির্দিষ্ট কিছু সুযোগসুবিধা, এমন কি গার্হস্থ্য কাজের পারিশ্রমিক পর্যন্ত পেত; অন্যান্য স্ত্রীর সঙ্গে এখানে একজন 'প্রথমা স্ত্রী' থাকত এবং মৃতের সম্পত্তিভাগের সময় বৈধ ও অবৈধ সন্তানদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হত না। এভাবে আমরা জোড়বাঁধা পরিবারের যে ছবি পাই তার তুলনায় উত্তর আমেরিকায় প্রচলিত বিবাহকে অনেক বেশি কঠোর মনে হবে; কিন্তু সিজারের যুগে যাদের মধ্যে সমষ্টি-বিবাহ প্রচলিত ছিল, একাদশ শতাব্দীতে তাদের এই অবস্থা বিশেষ আশ্চর্যজনক কিছু নয়।

প্রাচীন আইনপুস্তকেই শুধুমাত্র আইরিশ গোত্র (sept, এখানে উপজাতিকে বলা হত clainne, ক্ল্যান) প্রমাণিত ও উল্লিখিত হয় নি, উপরন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে যে ইংরেজ আইনজ্ঞরাও ক্ল্যানের জমিগুলিকে ইংলণ্ডের রাজার দখলে আনার জন্য সমুদ্রের ওপারে প্রেরিত হয়েছিল তারাও এর বিবরণ দিয়েছেন। সর্দাররা ইতিমধ্যেই যেখানে জমিকে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন করে নি সেখানে তখন পর্যন্ত জমি ক্ল্যান অথবা গোত্রের যৌথ সম্পত্তি ছিল। গোত্রের কোনো লোক মারা গেলে যখন একটি সংসার বন্ধ হয়ে যেত তখন গোত্রের প্রধান (ইংরেজ আইনজ্ঞরা তার নাম দিয়েছে caput cognationis) অবশিষ্ট পরিবারগুলির মধ্যে গোত্রের সমস্ত জমি পুনর্বণ্টন করতেন। সম্ভবত এই পুনর্বণ্টনের সাধারণ নিয়মটি জার্মানিতে দেখা যায়। এখনও আমরা কিছু কিছু গ্রাম পাই, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে যেগুলি বহুসংখ্যক ছিল, যেখানে ক্ষেতগুলি তথাকথিত rundale বিধির মধ্যে পড়ে। ইংরেজ বিজয়ীরা গোত্রের যৌথ জমি বেদখল করার পর থেকে

সে জমির কৃষকরা স্বতন্ত্র প্রজা হিসেবে তার নিজস্ব জোতের জন্য খাজনা দেয় বটে, কিন্তু তারা সমস্ত আবাদী জমি ও মাঠ একত্র করে গুণ ও অবস্থানানুসারে ফালি ফালি ভাগক্রমে তা বণ্টন করে দেয়; মোসেল অঞ্চলে এই ফালির নাম Gewanne, এবং সেখানে প্রত্যেকেই এক-এক ফালির ভাগীদার; জলাজমি ও চারণভূমি যৌথভাবে ব্যবহৃত। মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও মাঝে মাঝেই, কখনও কখনও বছরে বছরে পুনর্বণ্টন হত। এরকম একটি rundale গ্রামের ছবি মোসেল অথবা হোক্‌ভাল্ড অঞ্চলের জার্মান কৃষক গৃহস্থালি গোষ্ঠীগুলির অবিকল প্রতিলিপি, গোত্রগুলি এখন 'factions'-এর* মধ্যেও টিকে রয়েছে। আইরিশ কৃষকরা অনেক সময় এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অনুসারে দলবদ্ধ হয় যা একধারে বিদ্‌ঘুটে ও অর্থহীন এনং ইংরেজদের সম্পূর্ণ অবোধ্য। এই সব দলের একমাত্র উদ্দেশ্য যেন সগাম্ভীর্যে পরস্পরকে পিটিয়ে মারার জন্য একটি জনপ্রিয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে জড় হওয়া। এগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত গোত্রের কৃত্রিম পুনরুজ্জীবন ও পরে তার বদলি গ্রহণ যাতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গোত্রীয় প্রবৃত্তির ক্রমানুবর্তন স্বকীয় উদ্ভট বৈশিষ্ট্যে প্রদর্শিত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, কোনো কোনো জায়গায় গোত্রের সদস্যরা প্রায় একসঙ্গে তাদের পুরানো এলাকাতে বসবাস করত; দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিরিশের দশকে মনাখান কাউণ্টি উল্লেখ্য। এর অধিকাংশ অধিবাসী তখনও মাত্র চারিটি পারিবারিক নাম ব্যবহার করত অর্থাৎ সেগুলি চারটি গোত্র অথবা ক্ল্যানের উত্তরাধিকারী ছিল।**

---

* পার্টিগুলি। — সম্পাঃ

** আমি আয়ার্ল্যাণ্ডে (২৯) অল্প কয়েক দিন থাকার সময় আবার উপলব্ধি করি যে, সেখানকার গ্রাম্য জনসংখ্যা তখনও কী পরিমাণে গোত্রযুগের ধ্যানধারণার মধ্যে বসবাস করছিল। কৃষক যে জমিদারের প্রজা তাকে সে এখনও ক্ল্যান প্রধানের মতো মনে করে, যে সবার স্বার্থে চাষবাস তদারক করে, কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা হিসেবে করের অধিকারী হলেও, যে আপদে-বিপদে কৃষককে সাহায্য করতে বাধ্য। ঐ একইভাবে মনে করা হয় যে, প্রত্যেকটি সচ্ছল লোক দরিদ্র বিপন্ন প্রতিবেশীকে সাহায্য করতে বাধ্য। এই সাহায্য ভিক্ষাদান নয়; ধনী সদস্য অথবা ক্ল্যানের সর্দারের কাছ থেকে এটি ক্ল্যানের দরিদ্র সদস্যদের অধিকার হিসেবেই প্রাপ্য। অর্থনীতিবিদ ও আইনজ্ঞরা কেন অনুযোগ করে যে, আইরিশ কৃষকের মাথায় আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তির ধারণা প্রবেশ করানো

১৭৪৫ সালের বিদ্রোহ দমনের সময় থেকেই স্কটল
পতন দেখা যায় (৩০)। এই প্রথার মধ্যে স্কটিশ ক্ল্যানের
তা অনুসন্ধানসাপেক্ষ, তবে নিঃসন্দেহে তা প্রথার একটি
স্কটের উপন্যাসগুলি স্কটল্যান্ডের মালভূমি ক্ল্যানের ছবি
সামনে জীবন্ত করে তুলেছে। এ বিষয়ে মর্গান বলছেন:

'এটি সংগঠন ও মনোবৃত্তির দিক থেকে গোত্রের একটি
সদস্যদের উপর গোত্রবদ্ধ জীবনযাত্রার প্রতাপের একটি অত্যুৎকৃষ্ট দৃ
ও রক্তের বদলা, স্থানীয় এলাকায় তাদের অধিষ্ঠান, জমির যৌথ ব্যব
প্রতি সভ্যদের আনুগত্য এবং সভ্যদের পরস্পর আনুগতা, এগুলির
সমাজের দুর্মর বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই... বংশক্রম ছিল পিতৃ-অধিক
সন্তান ক্ল্যানের মধ্যে থাকত এবং নারীর সন্তান তাদের পিতৃ-ক্ল্যানে প

আগে। স্কটল্যান্ডে মাতৃ-অধিকার যে প্রচলিত ছিল ত
যায় পিক্টস্ রাজ পরিবারে যেখানে, বেডের কথায়, নারীধা
প্রচলিত ছিল। এমন কি মধ্যযুগ পর্যন্ত স্কটিশ ও ওয়েল্স্
পুনালুয়া পিরবারের আভাস মেলে প্রথম রাত্রির অধিকার থে
ক্ল্যানের সর্দার অথবা রাজা প্রাক্তন যৌথ স্বামীদের সব
হিসেবে মুক্তিপণ না পেলে প্রত্যেক পাত্রীর কাছে সেই অ
করতে পারত।

অসম্ভব, এতেই তা অর্থবহ; মালিকানার যে শুধু অধিকার আছে,
তা বোঝার ক্ষমতা আইরিশ কৃষকের নেই। তাই যখন দেখি যে, গানে
এই ধরনের সরল গোত্রীয় ধারণাবলি নিয়ে সহসা ইংলণ্ড বা আ
নগরে এসে সেখানকার জনসংখ্যার একেবারে পৃথক নৈতিক ও আইন
তাদের নীতি ও ন্যায়বিচার একেবারে গুলিয়ে ফেলে এবং সমস্ত নি
ব্যাপকভাবে নীতিহীনতায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়, তখন আর
(১৮৯১ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

* L. H. Morgan. 'Ancient Society', London, 1877,
সম্পাঃ

* * *

জাতিগুলির দেশান্তরণ শুরু হবার সময় পর্যন্ত জার্মানরা যে গোত্রবদ্ধ ছিল, সে কথা অকাট্য। সম্ভবত তারা খৃস্টাব্দের মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে ডানিউব, রাইন, ভিস্টুলা ও উত্তুরে সাগরগুলির মাঝখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করত; কিম্‌ব্রি ও টিউটনরা তখনও পূর্ণমাত্রায় ভ্রাম্যমাণ এবং সিজারের পূর্বাবধি সুয়েভরাও স্থায়ী বসতি স্থাপন করে নি। সিজার স্পষ্টত বলেছেন যে, শেষোক্তরা গোত্র ও আত্মীয় গোষ্ঠী (gentibus cognationibusque) বসতি স্থাপন করেছিল, এবং gens Julia-র* একজন রোমানের মুখের gentibus কথার যে সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে তার অপব্যাখ্যা সম্ভব নয়। সমস্ত জার্মানদের সম্পর্কেই কথাটি প্রযোজ্য; এমন কি বিজিত রোমক প্রদেশগুলিতে তাদের বসতি স্থাপনও তখন গোত্র হিসেবেই চলেছিল বলে অনুমিত হয়। 'আলেমান ন্যায়' প্রমাণ করে যে, ডানিউবের দক্ষিণে দখলীকৃত ভূখণ্ডে জনগণ গোত্র (genealogiae) রূপেই বসবাস করত (৩১); genealogiae কথাটি ঠিক সে অর্থেই ব্যবহৃত যে অর্থে পরে মার্ক অথবা গ্রাম্য গোষ্ঠী ব্যবহৃত হয়েছে। সম্প্রতি কভালেভ্‌স্কি মত প্রকাশ করেছেন যে, এই genealogiae ছিল বৃহৎ গৃহস্থালী গোষ্ঠী, যেগুলির মধ্যে জমি ভাগ করা হত এবং যা থেকে পরে গ্রাম্য গোষ্ঠীগুলি দেখা দিয়েছিল। Fara সম্পর্কেও ঐ একই কথা সম্ভবত খাটে; এই শব্দটি বুর্গাণ্ডি ও লাঙ্গোবার্ডরা — অর্থাৎ একটি গথিক ও একটি হার্মিনোনিয়ান বা উত্তর জার্মান উপজাতি — একেবারে এক অর্থে না হলেও প্রায় ঠিক তাই বোঝাত, যাকে 'আলেমান ন্যায়'এ genealogia বলা হত। এটি ঠিক গোত্র অথবা গৃহস্থালী গোষ্ঠী, কোনটিকে বুঝাত তা আরও অনুসন্ধানসাপেক্ষ।

ভাষার সাক্ষ্য থেকে আমাদের সন্দেহ রয়ে যায় যে, জার্মানদের মধ্যে গোত্র বোঝাবার মতো একটিমাত্র সাধারণ প্রতিশব্দ ছিল কি না এবং থাকলে সে শব্দটি কী। ব্যুৎপত্তির দিক দিয়ে গ্রীক genos, ল্যাটিন gens হল গথিক kuni, মধ্য উত্তর জার্মান künne-এর অনুরূপ এবং একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা আবার এই তথ্য থেকে মাতৃ-অধিকার যুগের নির্দেশ পাই যে,

* জুলিয়স গোত্র। — সম্পাঃ

নারী শব্দটিও একই মূল থেকে উৎপন্ন: গ্রীক gyne, স্লাভ žena, গথিক gvino, প্রাচীন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান kona, kuna। — আগেই বলা হয়েছে যে, লাঙ্গোবার্ড ও বুর্গান্ডদের মধ্যে আমরা fara শব্দটি পাই; গ্রিম অনুমান করেন যে, fara শব্দটির কল্পিত মূল fisan অর্থাৎ প্রজনন। আমার মতে এটি এসেছে সুস্পষ্টতর মূল faran থেকে, যার অর্থ যাওয়া*, ভ্রমণ করা, ফিরে আসা; এটি যাযাবর দলের একটি সুনির্দিষ্ট অংশকে বোঝাত যারা নিঃসন্দেহেই আত্মীয় গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হত; বহু শতাব্দী ধরে প্রথমে পূর্ব দিকে ও পরে পশ্চিমে ভ্রমণের পর এই শব্দটি ক্রমে গোত্রীয় গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে থাকল। — তারপর গথিক শব্দ sibja, অ্যাংলোস্যাক্সন sib, প্রাচীন উত্তর জার্মান sippia, sippa, — আত্মীয়**। প্রাচীন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ভাষায় আছে শুধু বহুবচনাত্মক শব্দ sifjar মানে আত্মীয়স্বজন; একবচন শব্দটি কেবল একটি দেবীর নাম সিফ [sif]। — সর্বশেষে আর একটি শব্দ 'হিল্‌ডেব্রাণ্ডের গাথা'য় (৩২) পাওয়া যায়, যেখানে হিল্‌ডেব্রাণ্ড হাডুব্রাণ্ডকে জিজ্ঞাসা করছেন:

'এই জনসম্প্রদায়ের পুরুষদের মধ্যে কে তোমার পিতা... অথবা কী তোমার গোত্র?' (eddo huêlîhhes *cnuosles* du sîs)

যদি জার্মান ভাষায় গোত্রের কোনো সাধারণ প্রতিশব্দ থেকে থাকে, তাহলে সেটি খুব সম্ভব গথিক kuni শব্দের মতো উচ্চারণ করা হত যা শুধু ঘনিষ্ঠ ভাষাগুলিতে একই সমার্থজ্ঞাপক প্রতিশব্দ থেকেই চিহ্নিত হচ্ছে না, এই তথ্য থেকেও যে, kuning — রাজা***, আদিতে যা গোত্র বা উপজাতির প্রধানকে বোঝাত, তাও এই শব্দটি থেকেই উদ্ভূত। Sibja — আত্মীয় — শব্দটি সম্ভবত বিবেচ্য নয়; অন্তত প্রাচীন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ভাষায় sifjar বলতে শুধু রক্তসম্পর্কিত আত্মীয় নয়, পরন্তু বৈবাহিক সম্বন্ধযুক্তদেরও বোঝাত; অতএব এতে অন্তত সংশ্লিষ্ট **দুটি গোত্রের** সদস্য ছিল এবং সেজন্য sif শব্দটি নিশ্চয়ই গোত্রের প্রতিশব্দ ছিল না।

মেক্সিকান ও গ্রীকদের মতো জার্মানদের মধ্যেও যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারোহীদের

* জার্মান — fahren। — সম্পাঃ

** জার্মান। — Sippe। — সম্পাঃ

*** জার্মান — König। — সম্পাঃ

এবং কীলকাকারে সন্নিবিষ্ট পদাতিক সৈন্যবাহিনীকেও গোত্র অনুযায়ী যুদ্ধসারিতে সাজানো হত; ট্যাসিটাস যখন বলেছিলেন: পরিবার ও আত্মীয়তা অনুযায়ী, তখন তাঁর ভাষায় যে অনির্দিষ্টতা থাকছে তার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, তাঁর সময়ে রোমে বহুপূর্বেই প্রাণবন্ত সংগঠন হিসেবে গোত্রের অবসান ঘটেছিল।

ট্যাসিটাসের একটি উদ্ধৃতি চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ যেখানে তিনি বলছেন: মাতুল ভাগিনেয়কে নিজ পুত্র হিসেবে দেখে; কেউ কেউ এও বলেন যে, মাতুল ও ভাগিনেয়ের রক্তসম্পর্ক পিতাপুত্রের রক্তসম্পর্কের চেয়ে পবিত্রতর ও ঘনিষ্ঠতর, সেজন্য, শর্তবন্দী ব্যক্তির জামিন হিসেবে নিজ পুত্রের চেয়ে তার ভাগিনেয়ই শ্রেষ্ঠতর। এখানে আমরা মাতৃ-অধিকারের এবং সেইহেতু আদি গোত্রেরও একটি জীবন্ত চিহ্ন দেখতে পাই, এবং তা জার্মানদের অন্যতম স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।* এমন গোত্রের সদস্য নিজের কোনো দায়ের জন্য পুত্রকে জামিন রাখলে এবং পিতার বিশ্বাসভঙ্গের জন্য পুত্রের আত্মবলি দিতে হলে, তা ছিল একমাত্র বাপেরই ভাবার ব্যাপার। কিন্তু বোনের ছেলে শিকার হলে, গোত্রের পবিত্র আইনই লঙ্ঘিত হত; এখানে ঐ বালক বা যুবককে রক্ষা করা তার যে নিকটতম আত্মীয়ের সর্বোপরি দায়িত্ব সেই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী; তার উচিত বালকটিকে জামিন রাখা থেকে বিরত করা অথবা

---

* গ্রীকরা কেবলমাত্র বীরযুগের পুরাকথা থেকেই মাতুল ও ভাগিনেয়ের সম্পর্কের প্রকৃতিগত বিশেষ ঘনিষ্ঠতার কথা শুনেছে, এটি বহু জাতির মধ্যে মাতৃ-অধিকারের লুপ্তাবশেষরূপে পাওয়া যায়। ডাইয়োড্রস (৪ গ্রন্থ, ৩৪ অনুচ্ছেদ) অনুসারে মিলিয়েগার থেস্টিয়াসের পুত্রদের হত্যা করেন, এরা তাঁর মা অ্যাল্‌থিয়ার ভাই। অ্যাল্‌থিয়ার মতে এটি এত জঘন্য অপরাধ যে, তিনি হত্যাকারী নিজ পুত্রকেই অভিশাপ দেন এবং তাঁর মৃত্যু প্রার্থনা করেন। বিবরণে আছে যে, 'দেবতারা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করলেন এবং মিলিয়েগারের মৃত্যু হল।' ঐ একই গ্রন্থকারের মতে (ডাইয়োড্রস, ৪ গ্রন্থ, ৪৩ এবং ৪৪ অনুচ্ছেদ) হারকিউলিসের নেতৃত্বে অ্যার্গোনটরা (৩৩) থ্রেসিয়ায় নেমে সেখানে দেখল যে, ফিনিয়াস তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর প্ররোচনায় তাঁর পরিত্যক্ত প্রথমা স্ত্রীর দুটি পুত্রের প্রতি নির্লজ্জভাবে নির্মম আচরণ করছেন। এই প্রথমা স্ত্রী ক্লিওপেট্রা ছিলেন একজন বোরেয়াড। অ্যার্গোনটদের মধ্যেও কয়েকজন ছিলেন বোরেয়াড, ক্লিওপেট্রার ভাই -- অর্থাৎ নিপীড়িতদের মাতুল। তাঁরা তৎক্ষণাৎ ভাগিনেয়দের সাহায্যে এগিয়ে আসেন, তাঁদের মুক্ত করেন ও রক্ষীদের মেরে ফেলেন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

চুক্তির শর্ত মিটিয়ে দেওয়া। জার্মানদের মধ্যে গোত্র সংগঠনের আর কোনো চিহ্ন না পেলেও এই একটি উদ্ধৃতিই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

দেবতাদের গোধূলি এবং পৃথিবীর অবসান নিয়ে 'Völuspâ' প্রাচীন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান গাথার একটি অনুচ্ছেদ অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটি রচিত হয়েছে আরও আট শ' বছর পরে। এই যে 'অন্তর্দর্শিনীর বাণী'তে বাং ও বুগে সম্প্রতি খৃস্টধর্মের বিভিন্ন উপাদানের বিজড়নও আবিষ্কার করেছেন তাতে আছে প্রলয়ের পূর্ববর্তী সর্বজনীন নীতিবিভ্রাট ও অধঃপতনের বিবরণের নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি:

'Broedhr munu berjask ok at bönum verdask, munu *systrungar* sifjum spilla.'

'ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা করবে, পরস্পরকে হত্যা করবে, **বোনের ছেলেরা** আত্মীয়তার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলবে।'

Systrungar মানে মাসীর ছেলে এবং কবির চোখে পারস্পরিক রক্তসম্পর্ক লঙ্ঘন ভ্রাতৃহত্যা অপরাধের তুলনায় ঘোরতর। অপরাধের ঘোরত্বের নিদর্শন হল systrungar, এতে মাতৃপক্ষীয় আত্মীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে; যদি syskina-börn অর্থাৎ ভাই ও বোনের সন্তান অথবা syskina-synir অর্থাৎ ভাই ও বোনের পুত্রেরা শব্দটি ব্যবহৃত হত, তাহলে প্রথম পঙ্‌ক্তির বিপরীতে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি তীব্র না হয়ে খাদে অবনমিত হত। অতএব দেখা যাচ্ছে, এমন কি ভাইকিংদের সময়ে যখন 'Völuspâ' রচিত হয়, তখনও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় মাতৃ-অধিকারের স্মৃতি মুছে যায় নি।

অপরাপর বিষয় সম্পর্কে ট্যাসিটাসের সময়ে, অন্তত তাঁর সুপরিচিত সেই জার্মানদের মধ্যে মাতৃ-অধিকার পিতৃ-অধিকারে এসে স্থানচ্যুত হয়েছিল; সন্তান পিতার উত্তরাধিকারী হত; নিঃসন্তান অবস্থায় ভাই অথবা পিতৃব্য ও মাতুলদের উপর তা অর্সাত। মাতুলের উত্তরাধিকার স্বীকৃতির পিছনে পূর্বোল্লিখিত রীতিরই সংরক্ষণ প্রকটিত এবং এতে তদানীন্তন জার্মানদের মধ্যে তখনও পিতৃ-অধিকার যে কত সদ্যোজাত, তাও প্রমাণিত। এমন কি মধ্যযুগের শেষ পর্বেও মাতৃ-অধিকারের চিহ্ন দেখা যায়। এই যুগের পিতৃত্ব তখনও অনিশ্চিত, বিশেষত ভূমিদাসদের মধ্যে এবং একজন সামন্ত ভূস্বামী যখন নগরের কাছে পলাতক ভূমিদাস প্রত্যর্পণের দাবী জানাত, তখন

অগসবুর্গ, বাসেল ও কাইজের্সলাউটের্নের মতো স্থানে ঐ ব্যক্তির ভূমিদাসত্ব কেবলমাত্র মাতৃপক্ষীয় ছয় জন নিকটতম রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়ের সাক্ষ্যেই নির্ধারিত হত। (মাউরার, 'নাগরিক শাসনতন্ত্র', ১ খণ্ড, ৩৮১ পৃঃ)।

মাতৃ-অধিকারের তৎকালীন অন্যতর একটি অপসৃয়মান লুপ্তাবশেষ নারীর প্রতি জার্মানদের শ্রদ্ধা যা রোমানদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী প্রায় অবোধ্য ছিল। অভিজাত পরিবারের কন্যাদেরই জার্মানদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের শ্রেষ্ঠ জামিন বলে গণ্য করা হত; স্ত্রী ও কন্যারা বন্দী দাস রূপে বিক্রি হবে, এই ভীষণ চিন্তা যুদ্ধক্ষেত্রে যতখানি সাহস জাগাত, আর কিছুতেই তেমনটি হত না; তারা নারীকে পবিত্র মনে করত, দেবীপ্রতিম ভাবত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও তাদের উপদেশ গ্রহণ করত; সিভিলিসের নেতৃত্বাধীন জার্মান ও বেলজিয়ানদের যে ব্যাটাভিয়ান অভ্যুত্থানে গল প্রদেশে (৩৪) রোমান শাসনের ভিত্তি পর্যন্ত নড়ে উঠেছিল, তার প্রাণস্বরূপ ছিলেন লিপে নদীর তীরবর্তী ব্রুকটেরিয়ান নারী-পুরোহিত ভেলেডা। গৃহস্থালিতে সম্ভবত নারীর অপ্রতিহত আধিপত্য ছিল; ট্যাসিটাস বলেন যে, বৃদ্ধ ও শিশুদের সাহায্যে নারীকেই সমস্ত কাজ করতে হত, কারণ পুরুষরা শিকারে বেরুত, মদ খেত ও আড্ডা দিত; কিন্তু তিনি অবশ্য বলেন নি কারা চাষ করত এবং যেহেতু তাঁর বিবরণে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, দাসেরা কেবল কর দিত, কিন্তু কোনো বাধ্যতামূলক পরিশ্রম করত না, সেজন্য মনে হয়, যে সামান্য চাষবাসের প্রয়োজন হত, তা প্রাপ্তবয়স্ক অধিকাংশ পুরুষদের উপরই ন্যস্ত ছিল।

আগেই বলা হয়েছে, বিবাহের রূপ ছিল একগামিতার লক্ষ্যে অগ্রসরমান জোড়বাঁধা পরিবার। তখনও কঠোর একগামিতার উদ্ভব ঘটে নি, কারণ অভিজাতদের মধ্যে বহুপত্নী প্রথা স্বীকৃত ছিল। মোটের উপর এরা কন্যাদের কঠোর কৌমার্যরক্ষার উপর জোর দিত (কেল্টদের বিপরীতে)। ট্যাসিটাস সাগ্রহে জার্মানদের বিবাহবন্ধনের অচ্ছেদ্যতার কথা বলেছেন। নারীর ব্যভিচারকেই তিনি বিবাহবিচ্ছেদের একমাত্র কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এখানে তাঁর বিবরণ ফাটলকীর্ণ এবং অধিকন্তু এতে লম্পট রোমানদের সামনে অতি খোলাখুলিভাবে ধর্মের ছবি উপস্থাপিত। অন্তত এটা নিশ্চিত যে, নিজ অরণ্যে জার্মানরা যদি এমন অসাধারণ নীতিনিষ্ঠার আদর্শ হয়েও

থাকে, তাহলেও বহির্জগতের সামান্য সংস্পর্শই তাদের অপরাপর গড়পড়তা ইউরোপীয়দের স্তরে অবনমনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। রোম জীবনের আবর্তে নীতিনিষ্ঠার শেষ চিহ্নটি জার্মান ভাষালুপ্তির অনেক আগেই মুছে গিয়েছিল। এ বিষয়ে গ্রেগর অব টুর্সের গ্রন্থপাঠই যথেষ্ট। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, জার্মানির আদিম অরণ্যে রোমের অতি মার্জিত লাম্পট্য সম্ভব ছিল না এবং তাই সেদিক দিয়েও রোম জগতের চেয়ে তারা উন্নততর ছিল এবং তা দৈহিক সংযম চাপাবার প্রয়োজন ব্যতিরেকেই, যা কোনোকালেই সমগ্র একটি জাতির মধ্যেই প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় নি।

গোত্র প্রথা থেকেই পিতা ও আত্মীয়দের শত্রুতা ও বন্ধুত্ব উত্তরাধিকারের নৈতিক বাধ্যবাধকতা উদ্ভূত এবং নিহত বা ক্ষতিগ্রস্ত করলে রক্তাক্ত প্রতিশোধের বদলে জরিমানা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার ভেরগেল্ড প্রথাও তাই। এক প্রজন্ম আগেও ভেরগেল্ড প্রথাকে একান্তই জার্মান প্রথা বলে মনে করা হত; কিন্তু অতঃপর প্রমাণিত হয়েছে যে, গোত্রব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত রক্তপ্রতিশোধের এই নম্রতর রূপটি শত শত জাতির মধ্যে আচরিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, আতিথ্যের বাধ্যবাধকতার মতো এটিও আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও দেখা যায়। ট্যাসিটাস অতিথি সৎকারের যে বিবরণ দিয়েছেন ('জার্মানিয়া', ২১ অনুচ্ছেদ) তা খুঁটিনাটি ব্যাপারেও মর্গান প্রদত্ত ইণ্ডিয়ানদের বিবরণের সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায়।

ট্যাসিটাসের সময়ে জার্মানরা চাষের জমি চূড়ান্তভাবে ভাগ করে নিয়েছিল কি না এবং সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিগুলিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, তা নিয়ে উত্তপ্ত ও অবিরত বিতর্কটি আজ অতীতের ব্যাপার। এটা এখন প্রমাণিত যে, সমস্ত জাতির মধ্যেই চাষের জমি প্রথমে গোত্র এবং পরে সাম্যতন্ত্রী পারিবারিক গোষ্ঠী কর্তৃক যৌথভাবে কর্ষিত হত যার অস্তিত্ব সিজার সুয়েভদের মধ্যে তখনও লক্ষ্য করেছিলেন; এবং পরে পরিবারগুলির মধ্যে জমি বণ্টিত ও কিছুকাল অন্তর পুনর্বণ্টিত হত, এবং এই চাষের জমির পর্যায়ক্রমিক পুনর্বণ্টন যে আজও জার্মানির কোনো কোনো অংশে রয়েছে, তা নিয়ে অতঃপর কালক্ষেপ নিরর্থক। সিজার স্পষ্টভাবে সুয়েভদের সম্পর্কে বলেছেন যে, এদের কোনো খণ্ডিত অথবা ব্যক্তিগত জোত নেই, তাই জার্মানরা যদি ১৫০ বছরে এই ধরনের যৌথ চাষবাস থেকে ট্যাসিটাসের

যুগে জমির বার্ষিক পুনর্বণ্টন ও ব্যক্তিগত চাষবাসে পেঁছে থাকে, তাহলে তাকে যথেষ্ট উন্নতি বলাই সঙ্গত; এত অল্প সময়ে এবং বাইরের কোনোই হস্তক্ষেপ ছাড়া যৌথ চাষবাস থেকে জমির সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানায় আসা একেবারে অসম্ভব মনে হয়। অতএব ট্যাসিটাসের বক্তব্যকে তাঁর কথাগুলি দিয়েই বুঝতে হবে: তারা প্রতি বছর চাষের জমি বদল বা পুনর্বণ্টন করে এবং এই প্রণালীতে যথেষ্ট যৌথ জমি অবশিষ্ট থাকে। এটা চাষবাস এবং ভূমি দখলের ঠিক সেই স্তর যা তদানীন্তন জার্মানদের গোত্র প্রথার সঙ্গে যথার্থই সাযুজ্যপূর্ণ।

আমি আগের অনুচ্ছেদটি পূর্বতন সংস্করণ অনুযায়ী সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রাখছি। ইতিমধ্যে প্রশ্নটি অন্যতর একটি দৃষ্টিকোণ পরিগ্রহ করেছে। যখন কভালেভ্স্কি দেখালেন যে, (পূর্বের ৪৪ পৃঃ দ্রঃ*) মাতৃ-অধিকার সম্বলিত সাম্যতন্ত্রী পরিবার ও আধুনিক বিচ্ছিন্ন পরিবারের সংযোগসূত্র, পিতৃপ্রধান গৃহস্থালী গোষ্ঠী সর্বব্যাপ্ত না হলেও ব্যাপক ছিল তখন প্রশ্নটি আর এই থাকে না যে, জমির সাধারণ সম্পত্তি নাকি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল, যা নিয়ে মাউরার থেকে ভেইট্স পর্যন্ত আলোচনা চলছিল, পরন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায় সাধারণ সম্পত্তি কী রূপ নিয়েছিল? সিজার যুগে সুয়েভরা শুধু জমির যৌথ মালিকই ছিল না, পরন্তু তারা যে সাধারণ স্বার্থে যৌথভাবেও তা চাষ করত এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। গোত্র, গৃহস্থালী গোষ্ঠী, মাঝামাঝি কোনো সাম্যতন্ত্রী আত্মীয়মণ্ডলী তাদের অর্থনৈতিক একক ছিল, নাকি স্থানবিশেষে ভূমি অবস্থার তারতম্যের ফলে এরা তিন ধরনেরই ছিল, এই প্রশ্নগুলি এখনও বহুদিন বিতর্কমূলক থাকবে। কিন্তু কভালেভ্স্কি বলছেন যে ট্যাসিটাস বর্ণিত অবস্থা মার্ক অথবা গ্রাম্য গোষ্ঠীতে নয় গৃহস্থালী গোষ্ঠীতে প্রযোজ্য, যা অনেক পরে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে গ্রাম্য গোষ্ঠীতে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে রোমানদের সময় যেসব অঞ্চলে জার্মানরা ছিল এবং যে অঞ্চলগুলি পরে তারা রোমানদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়, সেখানকার বসতিগুলি নিশ্চয় গ্রাম ছিল না, ছিল কয়েক পুরুষের বৃহৎ

* এই খণ্ডের ৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

পরিবারভিত্তিক গোষ্ঠী যারা আনুষঙ্গিক এক বৃহৎ ভূখণ্ডে চাষাবাদ এবং চারপাশের বুনো জমি প্রতিবেশীদের সঙ্গে সাধারণ মার্ক হিসেবে ব্যবহার করত। চাষের জমি পরিবর্তন সম্পর্কে ট্যাসিটাসের উদ্ধৃতিটি তখন সত্যি একটি কৃষিমূলক তাৎপর্য লাভ করে, যথা ঐ গোষ্ঠী প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ড চাষ করত এবং আগের বছরের ব্যবহৃত জমি পতিত রাখা হত কিংবা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হত। জনসংখ্যার স্বল্পতার জন্য এত অধিক উদ্বৃত্ত অনাবাদী জমি থাকত যে, জমি দখল নিয়ে কলহ নিষ্প্রয়োজন ছিল। বহু শতাব্দী পরই কেবল যখন গৃহস্থালী গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতিতে যৌথ চাষবাস অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, তখনই সম্ভবত গৃহস্থালী গোষ্ঠী ভেঙে পড়ে; পূর্বতন যৌথ জমি ও মাঠ তখন থেকে বর্তমানের সুপরিচিত পদ্ধতিতে অধুনাগঠিত বিভিন্ন একক পরিবারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, যা প্রথমে সাময়িক এবং পরে চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে, কিন্তু বনভূমি, চারণভূমি এবং জলাশয়গুলি সাধারণ সম্পত্তি থেকে যায়।

রাশিয়ার ক্ষেত্রে বিকাশের এই ধারাটি ঐতিহাসিকভাবে সম্পূর্ণ প্রমাণিত। জার্মানি এবং দ্বিতীয়ত অন্যান্য জার্মান দেশগুলির ক্ষেত্রে যে বহু বিষয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গী মূল উৎসগুলির উন্নততর ব্যাখ্যা দান করে এবং ট্যাসিটাসের সময় পর্যন্ত গ্রাম্য গোষ্ঠী অবধি অনুসরণের পূর্বতন ধারণার চেয়ে সহজতরভাবে সংকট সমাধান করে, তা অনস্বীকার্য। প্রাচীনতম দলিলগুলি, যথা Codex Laureshamensis (৩৫), এগুলির ব্যাখ্যা, গ্রাম্য মার্ক-গোষ্ঠীর তুলনায় গৃহস্থালী গোষ্ঠী মাধ্যমে মোটামুটি সহজতর। পক্ষান্তরে, এতে নতুন জটিলতা ও নতুন সমস্যা দেখা দেয় যেগুলির সমাধান অপরিহার্য হয়ে ওঠে। প্রাগ্রসর গবেষণায়ই শুধু এর মীমাংসা সম্ভব। কিন্তু জার্মানি, স্ক্যান্ডিনেভিয়া এবং ইংলণ্ডে গৃহস্থালী গোষ্ঠীও যে মধ্যবর্তী স্তর ছিল তার আত্যন্তিক সম্ভাবনা আমার পক্ষে অনস্বীকার্য।

সিজার যুগে জার্মানরা অংশত সদ্য স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে এবং অংশত করতে চাইছে, কিন্তু ট্যাসিটাসের সময় তাদের স্থায়ী বসবাসের পুরো শতাব্দী অতিক্রান্ত; ফলত জীবনযাত্রার উপকরণ উৎপাদনে সন্দেহাতীতভাবে উন্নতি ঘটেছিল। তারা কাঠের বাড়িতে বাস করত, তাদের পোশাকপরিচ্ছদ

তখনও আদিম অরণ্যবাসীর: অমসৃণ পশমের আলখাল্লা ও ‹
নারী ও গণ্যমান্যদের সূতি অন্তর্বাস। তারা দুধ, মাংস, বু‹
প্লিনির বিবরণ অনুযায়ী যবের তৈরী পরিজ খেত (অদ্যাবধি
পরিজ আয়ার্ল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে জাতীয় কেল্টিক খাদ্য)। ত
গবাদি পশু ছিল নিকৃষ্ট জাতের, ক্ষুদ্রাকৃতি, কুৎসিত ও
ঘোড়াগুলি ছিল ছোট টাটু, খুব জোরে দৌড়াতে পারত না।
একমাত্র রোমান মুদ্রা, তা ছিল অল্প আর কদাচিৎ ব্যবহৃত হত।
বা রুপোর তৈজস তৈরি করত না এবং এসব ধাতুকে বিশেষ ‹
না, লোহা দুষ্প্রাপ্য ছিল, অন্তত রাইন ও ডানিউব তীরবর্তী উপ‹
মধ্যে; মনে হয় তা স্থানীয় আকরিকে তৈরি হত না, সবটাই আ‹
হত। রুনিক লিপি (গ্রীক ও ল্যাটিন অক্ষরমালার অনুকরণ) ‹
সঙ্কেত হিসেবে এবং একমাত্র ধর্মীয় যাদুবিদ্যায় ব্যবহার্য ছিল
তখনও প্রচলিত ছিল। সংক্ষেপে, এরা বর্বরতার মধ্যস্তর থেকে তখ
ঊর্ধ্বস্তরে পৌঁছেছিল। কিন্তু যখন রোমানদের ঘনিষ্ঠ সংস্প‹
উপজাতিগুলির ক্ষেত্রে রোমানদের শিল্পজাত পণ্যের সহজ আমদ
তাদের নিজস্ব লৌহ ও বস্ত্রশিল্প গড়ে তোলা ব্যাহত হয়, ত‹
পূর্বে, বল্টিক সমুদ্রের তীরবর্তী উপজাতিগুলি নিঃসন্দেহে এ‹
গড়ে তুলেছিল। শ্লেজ্‌ভিগের জলাভূমিতে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্রের ‹
একটি লম্বা লোহার তলোয়ার, একটি ধাতব বর্ম, একটি রৌপ্য
প্রভৃতি এবং তারই সঙ্গে দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের রোম মু‹
দেশান্তরগামী জনসংখ্যার দ্বারা বিক্ষিপ্ত স্বকীয় সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্যে
জার্মানদের ধাতব তৈজস, এমন কি রোমান ছাঁচের অনুকরণে
জিনিসগুলি উল্লেখ্য। সভ্য রোম সাম্রাজ্যে বসবাসের সঙ্গে সঙ্গেই,
ইংলন্ড ছাড়া সর্বত্রই এই জাতীয় শিল্পের বিনষ্টি ঘটে। এই
সুসম উৎপত্তি ও বিকাশের প্রকৃষ্ট প্রমাণ, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্রোঞ্জ
চিহ্নিত; বুর্গান্ডি, রুমানিয়া ও আজভ সাগরের উপকূলে যেস‹
পাওয়া গিয়েছে তা ব্রিটিশ অথবা সুইডিশদের কারখানা থেকেও
হতে পারত এবং অধিকন্তু তা সন্দেহাতীতভাবে জার্মানিক উৎসজাত

তাদের শাসনতন্ত্র বর্বরতার ঊর্ধ্বস্তরের সাযুজ্যলগ্ন ছিল। ট্যা‹

মতে সর্বত্র প্রধানদের (principes) একটি পরিষদ থাকত যারা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণগুলি জনসভার উত্থাপনের ব্যবস্থা করত; এই শেষোক্ত সভা বর্বরতার নিম্নস্তরে, অন্ততপক্ষে আমেরিকানদের মতো যেসব ক্ষেত্রে আমরা এর সঙ্গে পরিচিত, সেখানে এটি কেবল গোত্রেই থাকত, উপজাতি অথবা উপজাতি সম্মিলনীতে তখনও নয়। ঠিক ইরকোয়াসদের মতোই তখনও পরিষদ প্রধানরা (principes) সেনাপতি (duces) থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা। প্রথমোক্তরা তখনই অংশত উপজাতির সদস্যদের কাছ থেকে গরু, শস্য, প্রভৃতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত; আমেরিকার মতো এখানেও এরা সাধারণত একই পরিবার থেকে নির্বাচিত হত; পিতৃ-অধিকারে উত্তরণের ফলে গ্রীস ও রোমের মতোই নির্বাচিত পদ ক্রমে ক্রমে বংশগত হয়ে ওঠার অনুকূলে প্রত্যেক গোত্রেই অভিজাত পরিবারের উদ্ভব ঘটল। বিভিন্ন জাতিগুলির দেশান্তর যাত্রার সময়ে অথবা তার অব্যবহিত পরেই উপজাতিগুলির এই তথাকথিত প্রাচীন অভিজাতদের অধিকাংশেরই বিলুপ্তি ঘটে। সেনাপতিরা শুধু নিজ গুণে, বংশমর্যাদা নির্বিশেষে নির্বাচিত হত। তাদের ক্ষমতা ছিল অল্প, দৃষ্টান্ত দেখানোই ছিল একমাত্র নির্ভর; ট্যাসিটাস স্পষ্টতই বলেছেন যে, সৈন্যদলে সত্যকার শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষমতা ছিল পুরোহিতদের। জনসভাই ছিল সত্যকার ক্ষমতাধারী। রাজা অথবা উপজাতি প্রধান সভাপতিত্ব করতেন এবং জনগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত: গুঞ্জনে — 'না' এবং উচ্চধ্বনি ও অস্ত্রের ঝঙ্কারে 'হ্যাঁ' ব্যক্ত হত। জনসভা আবার বিচারসভাও ছিল। এখানে অভিযোগ উঠত এবং তার নিষ্পত্তি হত; মৃত্যুদণ্ডও এখান থেকেই দেওয়া হত এবং কেবলমাত্র কাপুরুষতা, বিশ্বাসঘাতকতা অথবা অস্বাভাবিক লাম্পট্যের ক্ষেত্রে। গোত্র ও অন্যান্য বিভাগগুলিতেও সভাই বিচার করত, গোত্র প্রধান হত তার সভাপতি, সমস্ত আদি জার্মান বিচারালয়ের মতো সে শুধু বিচারকার্য পরিচালনা এবং প্রশ্ন উত্থাপন করত; জার্মানদের মধ্যে সর্বদা ও সর্বত্র রায় দিত সমগ্র জনসমষ্টি।

সিজারের সময় থেকে উপজাতি সম্মিলনীর উদ্ভব ঘটে; কয়েকটিতে তখনই তাদের রাজা ছিল; সর্বোচ্চ সেনাপতি গ্রীক ও রোমানদের মতো এখানেও স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী হতে চাইত, এবং কখন কখন

সে সফলকাম হত। এই সফল ক্ষমতা দখলকারীরা অবশ্য কখনই একচ্ছত্র শাসক ছিল না; তবুও তারা গোত্র প্রথার শৃঙ্খলে ভাঙন শুরু করে। মুক্ত দাসরা কোনো গোত্রের সভ্য না হওয়ায় তাদের অবস্থা অনুন্নততর ছিল বটে, কিন্তু নতুন রাজাদের প্রিয় পাত্র হিসেবে তারা প্রায়ই পদ, ধনসম্পত্তি ও সম্মান লাভ করত। রোম সাম্রাজ্যের বিজয়ের পর সামরিক নেতারা বড় বড় দেশের রাজা হয়ে বসলে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ফ্রাঙ্কদের মধ্যে, রাজার দাস ও মুক্ত অনুচরদের প্রথমে রাজদরবারে এবং পরে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা ছিল; নতুন অভিজাতদের এক প্রধান অংশ ছিল এদেরই বংশজাত।

রাজতন্ত্র অভ্যুদয়ের বিশেষ অনুকূল ছিল একটি প্রতিষ্ঠান — যোদ্ধৃবাহিনী। আমেরিকার লাল চামড়ার মানুষদের মধ্যে কীভাবে গোত্রের পাশাপাশি শুধু নিজেদের উদ্যোগে যুদ্ধ চালাবার জন্য ব্যক্তিগত সংগঠন গড়ে উঠল, তা আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি। জার্মানদের মধ্যে এই ব্যক্তিগত সংগঠনগুলি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। খ্যাতিমান কোনো সেনাপতিকে ঘিরে লুণ্ঠনকামী একদল তরুণ যোদ্ধা পারস্পরিক ব্যক্তিগত আনুগত্যের ভিত্তিতে একত্র হত। সে তাদের ভরণপোষণ করত, উপহার দিত এবং ক্রমোচ্চ পর্যায়ে তাদের সংঘবদ্ধ করত; ছোটখাট অভিযানে শরীররক্ষা দল আর যুদ্ধের জন্য সদাপ্রস্তুত একটি বাহিনী, বৃহত্তর অভিযানের জন্য সুশিক্ষিত অফিসার দল তার থাকত। এই যোদ্ধৃবাহিনীর দুর্বলতা অবশ্যম্ভাবী হলেও এবং যথা, পরে ইতালিতে অডোয়েকারের সৈনাপত্যে, তা বস্তুত প্রমাণিত হলেও, তবু তাদের মধ্যে জনগণের পুরাতন স্বাধীনতা ধ্বংসের ভ্রূণ নিহিত ছিল এবং জাতিগুলির দেশান্তর যাত্রার সময় ও পরে তার যাথার্থ্য প্রকটিত হয়েছিল। কারণ, প্রথমত তারা রাজশক্তির অভ্যুদয়ের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছিল; দ্বিতীয়ত, ট্যাসিটাসের নিরীক্ষানুসারে এই যোদ্ধৃবাহিনীকে কেবল অবিরাম যুদ্ধ ও লুণ্ঠনাভিযান দ্বারাই সংসক্ত রাখা সম্ভব ছিল। লুণ্ঠনই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে উঠল। নিকটস্থ অঞ্চলে সুযোগের অভাব ঘটলে দলপতি বাহিনী নিয়ে ভিনদেশে যেত, যেখানে যুদ্ধ চলত ও লুটপাটের সুযোগ মিলত। যেসব জার্মান সাহায্যবাহিনী রোম পতাকার অধীনে এমন কি বহুলাংশে জার্মানদেরই বিরুদ্ধে লড়াই

করত, তারা অংশত ছিল এই ধরনের যোদ্ধ্বাহিনী। তারাই ছিল জার্মানদের লজ্জা ও অভিশাপ, সেই ভাড়াটে সৈন্যব্যবস্থার জীবাণু। রোম সাম্রাজ্য জয়ের পর রাজাদের এই যোদ্ধ্বাহিনী, রোমের গোলাম ও দরবারী ভৃত্যদের সমবায়েই পরবর্তী যুগের অভিজাতদের দ্বিতীয় মূল গড়ে উঠেছিল।

সাধারণভাবে তখন জার্মান উপজাতিগুলির মিলনে গড়ে ওঠা জাতির শাসনতন্ত্র ছিল গ্রীকদের বীরযুগের এবং রোমানদের তথাকথিত রাজন্যযুগের শাসনতন্ত্রের প্রতিরূপ: জনসভা, গোত্র প্রধানদের পরিষদ এবং ইতিমধ্যেই সত্যকার রাজকীয় ক্ষমতাভিলাষী সেনাপতি। এটিই ছিল গোত্রব্যবস্থায় একমাত্র সম্ভাব্য সর্বোচ্চ বিকশিত শাসনতন্ত্র যা বর্বরতার ঊর্ধ্বস্তরের প্রেক্ষিতে আদর্শস্বরূপ ছিল। যে সামাজিক কাঠামোয় এই শাসনব্যবস্থা যথোচিত ছিল, সমাজ তা অতিক্রম করা মাত্রই গোত্রব্যবস্থার অবসান ঘটল; বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন এর স্থলবর্তী হল রাষ্ট্র।

৮

জার্মানদের রাষ্ট্রের উৎপত্তি

ট্যাসিটাসের মতে জার্মানরা ছিল জনবহুল জাতি। বিভিন্ন জার্মান জাতির জনসংখ্যার একটা মোটামুটি হিসাব সিজার দিয়েছেন: যারা রাইন নদীর বাম তীরে উপস্থিত হয়েছিল, সেই উসিপেটান ও টেঙ্ক্টারানদের জনসংখ্যা তাঁর মতে নারী ও শিশু সহ ছিল ১,৮০,০০০। অর্থাৎ একটি জাতিতে প্রায় ১,০০,০০০ লোক*, সংখ্যাটি ইরকোয়াসদের উন্নতির স্বর্ণযুগের চেয়ে অনেক বেশি, যখন শেষোক্তরা কুড়ি হাজারের কম হয়েও

* এখানে উল্লিখিত সংখ্যাটি গল কেল্টদের সম্পর্কে ডাইয়োড্রসের একটি অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রমাণিত হয়: 'গল প্রদেশে অসমান জনসংখ্যার বহু অধিজাতি বাস করে। তাদের মধ্যে বৃহত্তম জাতির জনসংখ্যা প্রায় ২,০০,০০০ এবং ক্ষুদ্রতমের ৫০,০০০' (Diodorus Siculus, V, 25,)। এথেকে গড় সংখ্যা হয় সওয়া লক্ষ। আলাদা আলাদা গল জাতি উন্নততর হওয়ায় তাদের সংখ্যা জার্মানদের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি ছিল বলে ধরা উচিত। (এঙ্গেলসের টীকা।)

গ্রেট লেক্‌স থেকে অহাইয়ো এবং পটোমাক পর্যন্ত গোটা দেশের ভীতি হয়ে উঠেছিল। রাইন অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগুলিকে যদি আমরা একটি মানচিত্রে দেখাবার চেষ্টা করি, বিবরণ থেকেই যারা আমাদের অধিকতর পরিচিত, তাহলে আমরা দেখব যে, গড়ে এক-একটি জাতি বর্তমান প্রাশিয়ার একটি প্রশাসনিক জেলার মতো আয়তন অর্থাৎ প্রায় ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার অথবা ১৮২ ভৌগোলিক বর্গ মাইল অধিকার করে ছিল। কিন্তু ভিস্টুলা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত রোমানদের Germania Magna* আয়তনে ছিল ৫,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। গড়ে একটি জনসম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ১,০০,০০০ ধরলে বৃহত্তর জার্মানির সমগ্র জনসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষে দাঁড়ায়, যা বর্বর গোষ্ঠীর জনসম্প্রদায়গুলির পক্ষে বড় অঙ্কেরই, যদিও প্রত্যেক বর্গ কিলোমিটারে ১০ জন তথা প্রত্যেক ভৌগোলিক বর্গ মাইলে ৫৫০ জন হিসাবে এটি বর্তমানের তুলনায় খুবই নগণ্য। কিন্তু এই সংখ্যায় সেকালের সমস্ত জার্মানদের ধরা হয় নি। আমরা জানি যে, কার্পেথিয়ান পর্বতমালা বরাবর ডানিউবের মোহানা পর্যন্ত অঞ্চলে বাস্টার্নিয়ান, পিউকিনিয়ান ও অন্যান্য গথ বংশজাত জার্মান জাতি বাস করত; এগুলি এত জনবহুল ছিল যে, প্লিনি তাদের জার্মানদের পঞ্চম প্রধান উপজাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন; খৃঃ পূঃ ১৮০ সালেই তারা ম্যাসিডোনিয়ার রাজা পেরসিয়সের ভাড়াটে সৈন্যের কাজ করত এবং অগাস্টসের রাজত্বের গোড়ার দিকে তারা আদ্রিয়ানপোল নগরীর কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। যদি আমরা ধরে নিই যে, তাদের সংখ্যা দশ লক্ষ মাত্র ছিল, তাহলে খৃস্টাব্দের সূচনায় জার্মানদের সংখ্যা সম্ভবত ষাট লক্ষের কম ছিল না।

জার্মানিতে বসতি পত্তনের পর জনসংখ্যা নিশ্চয়ই দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল; পূর্বোক্ত শিল্পোন্নতিই এর প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। শ্লেজ্‌ভিগ জলাভূমিতে প্রাপ্ত দ্রব্যসম্ভারের অন্তর্গত রোম মুদ্রাগুলির বিচারে তারিখটির শুরু তৃতীয় শতাব্দী থেকে। অতএব ঐ সময়ে বল্টিক অঞ্চলে ধাতু ও বস্ত্রশিল্প যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল, রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে রীতিমতো ব্যবসা-বাণিজ্য চলত এবং বিত্তশালী শ্রেণীর লোকেরা কিছুটা বিলাসের মধ্যে থাকত — এসবই

* বৃহত্তর জার্মানি। — সম্পাঃ

জনসংখ্যার আত্যন্তিক ঘনাঙ্কের সাক্ষ্য। এই সময়ই জার্মানরা রাইন নদীর সমগ্র রেখা, রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রাচীর এবং ডানিউব বরাবর অর্থাৎ উত্তর সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত রেখা বরাবর তাদের সাধারণ যুদ্ধাভিযান শুরু করে, যা বহির্গমনেচ্ছু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তিন শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামে গথিক জনসম্প্রদায়গুলির প্রায় সমগ্র মূল অংশ (স্ক্যান্ডিনেভিয়ার গথ এবং বুর্গান্ডিয়ানরা ব্যতীত) দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয় এবং বহুবিস্তীর্ণ আক্রমণরেখার বাম অংশ গঠন করে; এই রেখার কেন্দ্রে উত্তুরে জার্মানরা (হার্মিনোনিয়ান) ডানিউব নদীর উজান অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং ইস্টিভোনিয়ানরা যাদের বর্তমানে ফ্রাঙ্ক বলা হয়, তারা দক্ষিণ পার্শ্বে রাইন নদী ধরে এগোতে থাকে; ইঙ্গিভোনিয়ানদের ভাগ্যে পড়ে ব্রিটেন জয়ের দায়। বিপর্যস্ত, নিরক্ত ও অসহায় রোম সাম্রাজ্য পঞ্চম শতাব্দীর শেষে হানাদার জার্মানদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা প্রাচীন গ্রীক ও রোম সভ্যতার শৈশব প্রত্যক্ষ করেছি। এখন আমরা তার অন্তিমে উপস্থিত। রোমানদের বিশ্বশক্তি ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ দেশগুলিকে বহু শতাব্দী ধরে সমপৃষ্ঠ করে চলেছিল। যেখানে গ্রীক ভাষা কোনো প্রতিরোধ সৃষ্টি করে নি সেখানে সমস্ত জাতীয় ভাষা পথ ছেড়ে দিয়েছিল এক ধরনের বিকৃত ল্যাটিনের কাছে; এখন আর জাতিগত কোনো পার্থক্য ছিল না, কেউই আর গল, আইবিরিয়ান, লিগুরিয়ান, নরিকান ছিল না — সকলেই তখন রোমান। রোম শাসন এবং রোম আইন সর্বত্রই পুরাতন গোত্র সম্মিলনী ভেঙে দিয়েছিল এবং স্থানীয় ও জাতীয় আত্মপ্রকাশের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত ধ্বংস করেছিল। নবজাত রোমান সত্তা এই ক্ষতিপূরণ করতে পারে নি; কোনো জাতীয়তা নয়, এতে প্রকটিত হত শুধু জাতীয়তার অভাব। সর্বত্রই নতুন জাতি তৈরির উপাদান ছিল; বিভিন্ন প্রদেশের ল্যাটিন উপভাষাগুলিতে ক্রমেই অধিকতর ব্যবধান প্রকটিত হতে থাকে; যে স্বাভাবিক সীমানাগুলি অতীতে ইতালি, গল, স্পেন ও আফ্রিকাকে স্বতন্ত্র অঞ্চল করেছিল, সেগুলি তখনও ছিল, এবং এগুলির অস্তিত্ব তখনও অনুভূত হত। কিন্তু এসব উপাদানকে একত্র করে নতুন জাতি গড়ে তোলার মতো শক্তি কোথাও ছিল না; ছিল না কোথাও বিকাশের বিন্দুমাত্র কোনো ক্ষমতা কিংবা প্রতিরোধের কোনো শক্তি, আর সৃজনশীল

শক্তি তো অবান্তর কথা। এই সুবৃহৎ ভূখণ্ডের অগণিত জনসংখ্যাকে যে একটিমাত্র বন্ধন ধরে রেখেছিল, তা রোম রাষ্ট্র; এবং কালক্রমে এটিই তাদের জঘন্য শত্রু ও উৎপীড়ক হয়ে উঠেছিল। প্রদেশগুলি রোমকে সর্বস্বান্ত করেছিল; রোম নিজেও অপরাপর নগরগুলির মতো একটি প্রাদেশিক নগর হয়ে পড়ে, এবং কিছু সুযোগসুবিধা সত্ত্বেও সে আর শাসক ছিল না, ছিল না পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের কেন্দ্র, সম্রাট ও উপসম্রাটদের রাজধানীও, কারণ তারা তখন কনস্টানটিনোপ্‌ল, ট্রিভস এবং মিলানের অধিবাসী। রোম রাষ্ট্র তখন প্রজাদের শোষণের জন্য পরিকল্পিত একটি বিরাট জটিল যন্ত্রমাত্র। খাজনা, বাধ্যতামূলক সরকারী কাজ এবং বিভিন্ন ধরনের আদায়ে জনসাধারণ তখন গভীরতম দারিদ্র্যে নিক্ষিপ্ত। স্থানীয় শাসক, তহশীলদার এবং সৈন্যদের অবৈধ শোষণের চাপ তার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বিশ্বাধিপত্য নিয়ে রোম রাষ্ট্র এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল: এর অস্তিত্বের আধিকারিক ভিত্তি ছিল দেশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এবং বহিস্থ বর্বরদের থেকে প্রতিরক্ষা। কিন্তু এর শৃঙ্খলা ছিল নিকৃষ্টতম বিশৃঙ্খলার চেয়েও নিকৃষ্টতর এবং রাষ্ট্র যে বর্বরদের হাত থেকে নাগরিকদের রক্ষা করার দাবী করত নাগরিকরা নিজ মুক্তিদাতা হিসেবে সেই বর্বরদেরই পথ চেয়েছিল।

সামাজিক অবস্থাও কিছু কম চরমে পৌঁছয় নি। প্রজাতন্ত্রের শেষ বছরগুলিতে বিজিত প্রদেশগুলির নির্মম শোষণই রোম শাসনের ভিত্তি হয়ে উঠেছিল; সাম্রাজ্য এই শোষণ তুলে দেয় নি, পরন্তু এটিকেই নিয়ম করে তুলেছিল। সাম্রাজ্যের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গেই কর এবং বাধ্যতামূলক কাজের মাত্রা বাড়তে থাকে এবং সরকারী কর্মচারীরা নির্লজ্জতর ভাবে জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন ও অপহরণ করে চলে। সকল জাতির উপর কর্তৃত্বকারী রোমানরা কখনই শিল্প ও বাণিজ্যের কাজ করত না। কেবল মহাজনীতেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে তাদের জুড়ি ছিল না। কোনোক্রমে কিছুকাল টিকে থাকা ব্যবসা-বাণিজ্যও সরকারী জবরদস্তি আদায়ের ফলে ধ্বংস পায়; শুধু অবশিষ্টটুকু সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে, গ্রীসে টিকে থাকে, কিন্তু এটি আমাদের আলোচ্য নয়। সর্বজনীন দারিদ্র্য, ব্যবসা, হস্তশিল্প, চারুকলার অবনতি, জনসংখ্যা হ্রাস, নগরগুলির অবক্ষয়, নিম্নস্তরে কৃষির অধঃপতন — এই হচ্ছে বিশ্বব্যাপ্ত রোম আধিপত্যের চূড়ান্ত পরিণতি।

যে কৃষি সমগ্র প্রাচীন যুগ জুড়ে উৎপাদনের নির্ধারক শাখা ছিল, এখন তার এই গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেল। ইতালির পুঞ্জিত বৃহদাকার জমিদারীগুলি (ল্যাটিফুণ্ডিয়া) যা প্রজাতন্ত্র অবসানের পর থেকে দেশের প্রায় সমগ্র ভূখণ্ড ছেয়ে ফেলেছিল, সেগুলিকে দু'ভাবে কাজে লাগানো হত: চারণভূমি হিসেবে, সেখানে জনসংখ্যা ভেড়া ও গরু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল যেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অল্প কয়েক জন ক্রীতদাসই যথেষ্ট ছিল; অথবা গ্রামীণ জমিদারী হিসেবে, সেখানে বহুসংখ্যক দাসের সাহায্যে ব্যাপকভিত্তিক ফলচাষ চলত, যা অংশত মালিকদের বিলাসোপকরণ যোগাত এবং অংশত শহরের বাজারে বিক্রীত হত। বড় বড় চারণভূমি সংরক্ষিত হয়েছিল, এমন কি সম্ভবত সেগুলি আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। কিন্তু গ্রামীণ জমিদারী এবং সেখানকার বাগানও মালিকদের দারিদ্র্য ও শহরগুলির ক্ষয়িষ্ণুতার জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ক্রীতদাসদের শ্রমভিত্তিক ল্যাটিফুণ্ডিয়ার অর্থনীতি আর লাভজনক ছিল না; কিন্তু তখনকার দিনে এটিই ছিল বৃহদাকার কৃষির একমাত্র সম্ভাব্য রূপ। ক্ষুদ্র খামার পুনরায় লাভজনক কৃষি হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করল। মহালের পর মহাল খণ্ড খণ্ড করে ছোট জোত হিসেবে বনেদী প্রজাদের মধ্যে বিলি-ব্যবস্থা করা হল যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিত অথবা তা partiariiগুলিকে* দেওয়া হল যারা প্রজা নয়, যাদের জোতদার বলাই সঙ্গত। এরা তাদের কাজের জন্য বছরে ফসলের ষষ্ঠাংশ, এমন কি নবমাংশ মাত্র পেত। মূলত কিন্তু এই ছোট জোতগুলি coloniদের (কলোনিদের) মধ্যে বিলি করা হত, যারা বৎসরে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিত, জমিতে বাঁধা থাকত এবং জমির সঙ্গে তাদেরও বিক্রি করা চলত; এরা দাস ছিল না বটে, কিন্তু স্বাধীনও ছিল না; এরা স্বাধীন নাগরিকদের বিবাহ করতে পারত না এবং এদের নিজেদের মধ্যে বিবাহও বৈধ বিবেচিত হত না, যেমন দাসদের ক্ষেত্রে তেমনই এখানেও একে শুধুমাত্র সহবাস (contubernium) মনে করা হত। এরাই মধ্যযুগের ভূমিদাসদের পূর্বসূরী।

প্রাচীন যুগের দাস প্রথা অচল হয়ে উঠল। গ্রামাঞ্চলের বৃহদায়তন

---

* ভাগচাষী। — সম্পাঃ

কৃষি অথবা শহরের কারখানা, কোথাও প্রথাটি আর মালিককে লাভ যোগাত না — এদের উৎপন্ন জিনিসের বাজারই লোপ পেয়েছিল। ক্ষুদ্রায়তন কৃষিখামার ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে অবনমিত সাম্রাজ্যের সেই সমৃদ্ধির যুগের বৃহদায়তন উৎপাদনে এখন অসংখ্য ক্রীতদাসের কোনো স্থান ছিল না। সমাজে তাদের স্থান নির্দিষ্ট হল ধনীদের বিলাসসেবী ও গৃহদাস হিসেবে। কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু দাস প্রথার তখন যতখানি প্রাণশক্তি ছিল তাতে যেকোনো শ্রমকেই গোলামের কাজ মনে হত, যে কাজ স্বাধীন রোমানদের মানমর্যাদার অনুপযোগী ছিল এবং তখন সকল নাগরিকই স্বাধীন রোমান হয়ে উঠেছিল। এজন্য একদিকে যেমন বোঝাস্বরূপ অপ্রয়োজনীয় ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলা হল, তেমনি অপরপক্ষে কলোনি এবং নিঃস্ব হয়ে পড়া স্বাধীন নাগরিকের সংখ্যাও (আমেরিকায় প্রাক্তন দাস রাজ্যগুলির poor whites* লোকদের মতো) বাড়তে থাকল। পুরাকালীন দাস প্রথার এই ক্রমাবক্ষয়ে খৃস্টধর্মের কৃতিত্ব শূন্য। রোম সাম্রাজ্যে বহু শতাব্দী ধরে খৃস্টধর্ম দাস প্রথার ফল ভোগ করেছে এবং পরবর্তীকালে তা খৃস্টানদের, উত্তরে জার্মানদের অথবা ভূমধ্যসাগর তীরের ভেনিশিয়ান দাসব্যবসা অথবা আরও অনেক পরে নিগ্রোদের নিয়ে দাসব্যবসা,** — কোনোটিই বন্ধ করার চেষ্টা করে নি। দাস পথা আর লাভজনক না থাকায়ই তা লোপ পেল। কিন্তু মুমূর্ষু দাস প্রথা স্বাধীন মানুষের পক্ষে উৎপাদনী শ্রমকে হেয় চিহ্নিত করে সমাজে তার বিষাক্ত দংশন রেখে গেল। রোম জগৎ এই কানাগলির মধ্যেই আটকে গেল: দাস প্রথা অর্থনৈতিক কারণে অচল, কিন্তু স্বাধীন মানুষের শ্রমও নীতিবিরুদ্ধ। সামাজিক উৎপাদনের উৎস হিসেবে প্রথমটি অশক্ত এবং দ্বিতীয়টি তখনও সক্রিয় হয়ে ওঠে নি। একটি আমূল বিপ্লবই শুধু কাজটি সম্পন্ন করতে পারত।

প্রদেশগুলির অবস্থাও উন্নততর ছিল না। আমাদের অধিকাংশ বিবরণীই গল সম্পর্কিত। কলোনিদের পাশাপাশি তখনও সেখানে স্বাধীন

---

* গরিব শ্বেতাঙ্গরা। — সম্পাঃ

** ক্রিমোনার বিশপ লিউতপ্রান্দের ভাষায় দশম শতাব্দীতে ভেরদেং-তে, অর্থাৎ পবিত্র জার্মান সাম্রাজ্যের (৩৬) মধ্যে, প্রধান শিল্প ছিল খোজা তৈরি যাদের স্পেনে মুরদের হারেমে মোটা লাভে চালান দেওয়া হত। (এঙ্গেলসের টীকা।)

ক্ষুদ্র কৃষক ছিল। সরকারী কর্মচারী, বিচারক ও মহাজনদের অত্যাচার থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য এরা প্রায়ই ক্ষমতাশালীর সমর্থন ও আশ্রয় চাইত; এবং তা এককভাবে নয়, পরন্তু গোটা গোটা গোষ্ঠী তা করত, সেজন্য চতুর্থ শতাব্দীর সম্রাটরা বারবারই ব্যবস্থাটি নিষিদ্ধ করে হুকুম জারি করত। আশ্রয় চেয়ে এদের কী সুবিধা হত? রক্ষাকর্তা শর্ত হিসেবে জমির দখলী স্বত্ব নিজে নিত এবং প্রতিদানে সে কৃষককে আজীবন জমিচাষের নিরাপদ অধিকার দিত। হোলি চার্চ নবম ও দশম শতাব্দীতে ভগবানের গৌরব ও অবাধে নিজেদের জমিদারী বাড়াবার জন্য এই কৌশলটি রপ্ত করেও মনোযোগ সহকারে তা প্রয়োগ করে। যা হোক তখন, আনুমানিক ৪৭৫ সালে, বিশপ সাল্‌ভিয়েনস অব মার্সাই এই দস্যুবৃত্তির তীব্র নিন্দা করেন এবং তাঁর বিবরণে বলেন যে, রোমান কর্মচারী ও বড় জমিদারদের অত্যাচার এতই অসহ্য হয়ে ওঠে যে, অনেক 'রোমান' বর্বরদের দখলী অঞ্চলে পালিয়ে যায় এবং সেখানে বসতকারী রোমানরা পুনরায় রোম শাসনের কবলিত হওয়ার চেয়ে আর কিছুকেই বেশি ভয় করত না। গরিব পিতামাতা তখন যে প্রায়ই সন্তানসন্ততিকে দাস হিসেবে বিক্রি করত, তার প্রমাণ একটি আইনে উল্লিখিত যাতে কাজটি নিষিদ্ধ ঘোষিত ছিল।

নিজ রাষ্ট্রের হাত থেকে রোমানদের মুক্তি দেওয়ার বিনিময়ে জার্মান বর্বররা তাদের সমস্ত জমির তিন ভাগের দুই ভাগ দখল করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এই ভাগ ছিল গোত্র প্রথা অনুযায়ী; বিজেতাদের আপেক্ষিক সংখ্যা কম ছিল বলে বৃহৎ অবিভক্ত ভূখন্ড অংশত সমগ্র জনগণের এবং অংশত আলাদা আলাদা উপজাতি অথবা গোত্রের সম্পত্তি হয়ে থাকল। প্রত্যেক গোত্রে চাষের জমি ও চারণভূমি বিভিন্ন গৃহস্থালীর মধ্যে সমানভাবে এক ধরনের লটারি ব্যবস্থায় ভাগ করে দেওয়া হত। তখন বারবার জমি পুনর্বণ্টন হত কি না আমরা জানি না; অন্তত রোম প্রদেশগুলিতে ব্যবস্থাটি শীঘ্রই পরিত্যক্ত হয় এবং অংশবিশেষগুলি হয়ে ওঠে হস্তান্তরযোগ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি — অ্যালোডিয়াম। বনভূমি ও চারণভূমি সাধারণ ব্যবহারের জন্য অবিভক্ত থাকে; এরই ব্যবহার ও বিভক্ত জমি চাষের ধরন প্রাচীন রীতিনীতি এবং সমগ্র গোষ্ঠীর সিদ্ধান্তক্রমে নিয়ন্ত্রিত হত। গোত্রগুলি যত বেশি দিন নিজ গ্রামে থাকত এবং কালক্রমে যত বেশি জার্মান ও রোমানদের মিশ্রণ

ঘটত আঞ্চলিক বন্ধন ততই আত্মীয়তা বন্ধনের স্থলবর্তী হত। গোত্রগুলি মার্ক-গোষ্ঠীতে বিলুপ্ত হচ্ছিল, অবশ্য সেখানেও সভ্যদের মধ্যে আদিম আত্মীয়তার বহু চিহ্ন দেখা যেত। এভাবে, অন্ততপক্ষে যেসব দেশে, ফ্রান্সের উত্তরে, ইংলন্ড, জার্মানি ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় মার্ক-গোষ্ঠী বেঁচে রইল, সেখানে গোত্রীয় সংগঠন অলক্ষ্যে আঞ্চলিক সংগঠনে রূপান্তরিত হয় এবং এভাবে রাষ্ট্রে অভিযোজিত হবার যোগ্যতা লাভ করে। তথাপি সমগ্র গোত্র প্রথার যা বৈশিষ্ট্য, সেই স্বতোদ্ভূত গণতান্ত্রিক চারিত্র্য এতে অব্যাহত রইল এবং পরবর্তীকালে তার উপর আরোপিত অবনতির মধ্যেও গোত্রীয় প্রথার জীবন্ত উপাদানগুলি টিকেছিল। ফলত নিপীড়িতদের হাতে এই হাতিয়ারটি রইল যা আধুনিক যুগেও ব্যবহার্য।

গোত্রের রক্তসম্পর্কের দ্রুত অবলুপ্তির কারণ এই যে, জয়লাভের ফলে উপজাতি ও সমগ্র জাতির মধ্যে গোত্র সংস্থাগুলিরও অধঃপতন ঘটেছিল। আমরা জানি, পরাধীন জাতির উপর শাসনাধিকার গোত্র প্রথার সঙ্গে একেবারেই সাযুজ্যহীন। এখানে তা বৃহদাকারে পরিলক্ষিত। রোম প্রদেশগুলির দখলদার হিসেবে জার্মান জাতিগুলির পক্ষে তাদের বিজয়লাভকে সংহত করা প্রয়োজন ছিল; কিন্তু রোমের জনগণকে গোত্র সংগঠনে আত্মীভূত করা কিংবা শেষোক্তগুলির সাহায্যে তাদের শাসন করা, এ দুটিই অসম্ভব ছিল। প্রথমে তখনকার বহুলাংশে সক্রিয়, রোমানদের স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির শীর্ষে রোম রাষ্ট্রের বদলে তার একটি বিকল্প প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন ছিল এবং শুধু অন্য একটি রাষ্ট্রই তা হতে পারত। এভাবে গোত্র প্রথার প্রশাসনিক সংস্থাগুলিকে রাষ্ট্রসংস্থায় রূপান্তরণ এবং অবস্থার চাপে তার দ্রুত বাস্তবায়ন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। বিজয়ী জাতির প্রথম প্রতিনিধি ছিল তার সেনাপতি। বিজিত এলাকার অভ্যন্তরীণ ও বহির্নিরাপত্তার প্রয়োজনে সেনাপতির ক্ষমতাবৃদ্ধি জরুরী হয়ে ওঠে। তাই সেনাপতির রাজন্যে রূপান্তরিত হবার কাল আসন্ন হল এবং তা বাস্তবায়িত হল।

ফ্রাঙ্ক রাজত্বের কথাই ধরা যাক। এখানে শুধু রোম রাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ জমিই নয়, পরন্তু আরও যেসব বৃহৎ ভূখন্ড যা ছোটবড় এলাকা [Gau] ও মার্ক-গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয় নি, বিশেষত সমস্ত বৃহৎ বনভূমি,

তা বিজয়ী সালিয়ান ফ্রাঙ্কদের নিরঙ্কুশ অধিকারে এল। সাধারণ সর্বোচ্চ সেনাপতি থেকে খাঁটি রাজন্যে পরিণত হয়ে ফ্রাঙ্কদের রাজা প্রথমে যে কাজটি করলেন তা হল: জাতির এই সম্পত্তিকে রাজকীয় জমিদারীতে রূপান্তরিত করা, জনসম্পত্তি হরণক্রমে যোদ্ধ্বাহিনীর মধ্যে তা দান, অথবা মঞ্জুরি দেওয়া। শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সামরিক দলবল এবং সৈন্যবাহিনীর অবশিষ্ট উপনায়কদের নিয়ে গঠিত এই যোদ্ধ্বাহিনীটি অচিরেই তার সংখ্যাবৃদ্ধি করল শুধু রোমানদের অর্থাৎ লেখাপড়া, বিদ্যাবত্তা, রোমান কথ্য ভাষা ও সাধু ল্যাটিন ভাষা এবং সেদেশের আইনকানুনের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য অপরিহার্য বিবেচিত রোমান সংস্কৃতিসম্পন্ন গল্‌দের দিয়েই নয়, পরন্তু ক্রীতদাস, ভূমিদাস ও মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যাদের নিয়ে রাজদরবার গঠিত হয়েছিল এবং যাদের মধ্য থেকেই তিনি প্রিয়পাত্র নির্বাচন করতেন তাদের দিয়েও। এদের সকলকেই জাতীয় জমির অংশটুকু দেওয়া হল প্রথমে প্রধানত দান হিসেবে এবং পরে বেনেফিসিয়াম রূপে — গোড়ার দিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র রাজার জীবৎকালের জন্য (৩৭)। এভাবে জনতার ব্যয়ে স্থাপিত হল এক নতুন অভিজাত শ্রেণীর ভিত্তি।

কিন্তু এ-ই শেষ নয়। পুরানো গোত্র প্রথায় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন অসম্ভব ছিল; এমন কি যদি অনেককাল আগেই অচল হয়ে না পড়ত, তাহলেও প্রধানদের পরিষদ ডাকার এখন আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না এবং তা শীঘ্রই রাজার স্থায়ী পরিষদবর্গে প্রতিস্থাপিত হল। পুরাতন জনসভাকে তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল, কিন্তু ক্রমশই এটি রাজার অধীনস্থ উপসেনাপতি ও নতুন উদীয়মান অভিজাতদের সভা হয়ে উঠল। জমির মালিক স্বাধীন কৃষক, ফ্রাঙ্ক জাতির জনসাধারণ তখন অবিরাম গৃহযুদ্ধ ও দেশজয়ের যুদ্ধে, বিশেষত শার্লেমেনের আমলের শেষোক্তগুলিতে, অবসন্ন ও নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল, — ঠিক যেমনটি প্রজাতন্ত্রের শেষদিকে রোমের কৃষকদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। এই কৃষক যাদের নিয়ে প্রথমে গোটা সৈন্যবাহিনী গঠিত হয় এবং ফ্রাঙ্ক দেশের ভূখণ্ড জয়ের পরে যারা ছিল সৈন্যবাহিনীর প্রাণকেন্দ্র, তারা নবম শতাব্দীর সূচনায় এত দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, পাঁচ জনের মধ্যে একজনের পক্ষেও তখন যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম জোটানোই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। রাজার প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীন মুক্ত কৃষকদের

পূর্বতন সৈন্যবাহিনীর স্থলবর্তী হল সদ্যোত্থিত অভিজাত বশংবদদের নিয়ে গঠিত একটি বাহিনী। এই বশংবদদের মধ্যে পরাধীন কৃষকও ছিল, যাদের পূর্বপুরুষরা আগে রাজা ছাড়া কোনো মনিব এবং আরও আগে কোনো মনিবকেই, এমন কি রাজাকেও জানত না। শার্লেমেনের উত্তরাধিকারীদের আমলে অন্তর্দ্বন্দ্ব, রাজকীয় শক্তির দুর্বলতা, এবং আনুষঙ্গিক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ যাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় শার্লেমেন নিযুক্ত এলাকার কাউন্টরা [Gaugrafen] (৩৮) এবং যারা নিজেদের পদাধিকার বংশানুক্রমিক করবার জন্য ব্যগ্র, তাদের জবরদখল এবং সর্বশেষে নরমানদের হামলার ফলেই ফ্রাঙ্ক কৃষকদের সর্বনাশ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। শার্লেমেনের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্য নরমানদের পদতলে তেমনি অসহায় হয়ে পড়ল যেমনি রোম সাম্রাজ্য ফ্রাঙ্কদের পদদলিত হয়েছিল চার শ' বছর আগে।

শুধু বাহিস্থ অক্ষমতাই নয়, পরন্তু সমাজের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, বা বলা ভাল অব্যবস্থাও ছিল প্রায় অনুরূপ। স্বাধীন ফ্রাঙ্ক কৃষকদের ক্ষেত্রে তাদের পূর্ববর্তী রোমান কলোনিদের অবস্থাই পুনরাবৃত্ত হল। যুদ্ধ ও লুণ্ঠনে সর্বস্বান্ত হয়ে তারা সদ্যোত্থিত অভিজাত অথবা গির্জার আশ্রয় নিতে বাধ্য হত, কারণ রাজশক্তি তাদের রক্ষার পক্ষে তখন অত্যন্ত দুর্বল; এই সংরক্ষণের জন্য তাদের অত্যধিক মূল্য দিতে হয়। পূর্ববর্তীকালীন গল কৃষকদের মতো তারাও নিজ জমিজমার অধিকার পৃষ্ঠপোষকের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হল এবং সেই জমি তারা বিভিন্ন ও পরিবর্তিত প্রজাস্বত্ব হিসেবে ফিরে পেল, কিন্তু সর্বদাই বেগার খাটা ও খাজনার শর্তে; এধরনের অধীনতায় তাড়িত হয়ে তারা ক্রমেই নিজ ব্যক্তিস্বাধীনতা হারাল; কয়েক প্রজন্মে তাদের অধিকাংশই ভূমিদাস হয়ে উঠল। কত দ্রুত যে স্বাধীন কৃষকদের অধঃপতন ঘটে তার নমুনা সাঁ জার্ম্যাঁ দ্য প্রে মঠের জমি সংক্রান্ত ইর্মিনোঁ নথিপত্রে চোখে পড়ে; তখন জায়গাটি প্যারিসের কাছে ছিল, এখন ঐটি প্যারিসের মধ্যেই। এমন কি শার্লেমেনের জীবিতকালেই এই মঠের বহুদূর বিস্তৃত ভূসম্পত্তির মধ্যে ২,৭৮৮টি গৃহস্থালী ছিল, যাদের প্রায় সকলেই জার্মান নামধারী ফ্রাঙ্ক; তাদের ২,০৮০টি ছিল কলোনি, ৩৫টি লিটি, ২২০টি দাস এবং কেবল ৮টি মাত্র স্বাধীন জোতের মালিক! যে পদ্ধতিতে পৃষ্ঠপোষক শুধুমাত্র কৃষকের আজীবন ব্যবহারের শর্তে তার জমি নিজে দখল করত, যে

পদ্ধতি সাল্‌ভিয়েনস কর্তৃক ঈশ্বরবিরোধী বলে নিন্দিত, সেটিই এখন কৃষকদের ক্ষেত্রে গির্জা কর্তৃক সর্বত্রই অনুসৃত হচ্ছিল। যে বেগার খাটুনি এখন ক্রমশ প্রচলিত হয়ে পড়ল, তা ছিল রোম আঙ্গারি অর্থাৎ রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক সেবা (৩৯), তথা জার্মান মার্ক সদস্যদের পুল, রাস্তা নির্মাণ ও অন্যান্য গোষ্ঠীকর্মে ব্যয়িত শ্রমের ছাঁচে গড়া। অতএব মনে হয়, চার শ' বছর পর সাধারণ মানুষ সেখানেই আবার ফিরে এসেছে যেখান থেকে একদা তারা যাত্রা শুরু করেছিল।

এতে কেবলমাত্র দুটি তথ্যই প্রমাণিত হয়: প্রথমত, রোম সাম্রাজ্যের অবনতির সময় সমাজের স্তরবিভাগ ও সম্পত্তির বণ্টন ছিল কৃষি ও শিল্পে তৎকালীন উৎপাদনস্তরের সম্পূর্ণ উপযোগী, অতএব তা ছিল অপরিহার্য; এবং দ্বিতীয়ত, পরবর্তী চার শ' বছরে এই স্তর থেকে উৎপাদন স্তরের তেমন কিছু উন্নতি বা অবনতি হয় নি এবং সেজন্য, তেমনি অবশ্যম্ভাবী রূপে এতে একই ধরনের সম্পত্তির বণ্টন এবং জনসংখ্যার মধ্যে একই রকম শ্রেণীবিভাগ দেখা দেয়। রোম সাম্রাজ্যের শেষ কয়েক শতাব্দীতে গ্রামাঞ্চলের উপর নগরের পুরাতন আধিপত্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং জার্মান শাসনের প্রথম শতাব্দীগুলিতেও এটি ফিরে আসে নি। এতে কৃষি এবং আনুষঙ্গিক শিল্প বিকাশের নিম্নস্তর অবধারিত ছিল। এরকম সাধারণ অবস্থায় বড় বড় শাসক জমিদার এবং তাদের অধীনস্থ ছোট ছোট কৃষকের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। এমন সমাজের সঙ্গে ক্রীতদাসের শ্রমচালিত রোম ল্যাটিফুণ্ডিয়ার অর্থনীতি অথবা ভূমিদাসের শ্রমনির্ভর নতুনতর বৃহদাকার ব্যবস্থা জুড়ে দেওয়া যে কীরকম অসম্ভব ছিল, তার প্রমাণ মেলে শার্লেমেনের সুবিদিত রাজকীয় মহাল নিয়ে তাঁর ব্যাপক পরীক্ষামূলক চেষ্টায়, যা প্রায় কোনো চিহ্ন না রেখেই লোপ পেয়েছে। পরবর্তীকালে কেবল মঠেই এই পরীক্ষাটি চলে এবং সেগুলি কেবল তাদের পক্ষেই ফলপ্রসূ হয়; কিন্তু মঠগুলি ছিল ব্রহ্মচর্যভিত্তিক অস্বাভাবিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এগুলি এই ব্যতিক্রমী ফল ফলাতে পেরেছিল, কিন্তু সেই কারণেই এগুলির নিজেদেরও ব্যতিক্রমী হিসেবেই থাকতে হয়েছিল।

তথাপি, এই চার শ' বছরেও অগ্রগতি ঘটেছিল। যদিও সূচনাকালের সেই প্রধান শ্রেণীগুলিক যুগশেষে প্রায় হুবহু অপরিবর্তিত দেখালেও

এগুলির ভিতরকার মানুষ ততদিনে বদলে গিয়েছিল। প্রাচীন দাস প্রথা অবলুপ্ত; গরিব হয়ে পড়ে যেসব স্বাধীন মানুষ শ্রমকে গোলামীর মতো ঘৃণা করত তারাও উধাও। রোমান কলোনি এবং নতুন ভূমিদাস — এই দুইয়ের মাঝামাঝি ছিল স্বাধীন ফ্রাঙ্ক কৃষক। ক্ষয়িষ্ণু রোম জগতের 'প্রয়োজনহীন স্মৃতি এবং নিষ্ফল সংঘাত' তখন মৃত ও সমাধিস্থ। নবম শতাব্দীর সামাজিক শ্রেণীগুলি কোনো ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার বদ্ধজলায় জন্মায় নি, জন্মেছে নতুন সভ্যতার প্রসবযন্ত্রণার মধ্যে। রোম পূর্বসূরীদের তুলনায় এই নতুন জাতি তার প্রভু তথা ভৃত্য নিয়ে ছিল মানুষের জাতি। শক্তিশালী জমিদার ও অধীন কৃষকের যে সম্পর্ক রোমে প্রাচীন দুনিয়ার আশাহীন পতনের পথরেখা তৈরি করেছিল, তাই এখন একটি নতুন বিকাশের সূত্রপাত ঘটাল। উপরন্তু, এই চার শ' বছর যতই নিষ্ফলা মনে হোক, তবু এই বছরগুলি রেখে গেল এক মহৎ ফল: আধুনিক জাতিসত্তাসমূহ, আসন্ন ইতিহাসের জন্য পশ্চিম ইউরোপীয় মানবসমাজের নতুন সংবিন্যাস ও সন্নিবেশ। বস্তুত, জার্মানরা ইউরোপে নতুন জীবন সঞ্চার করল; এবং সেজন্যই জার্মান যুগে রাষ্ট্র ভাঙনের পরিণামে নরমান ও সারাসিনদের বিজয় অর্জিত হয় নি, হয়েছে বেনেফিসিয়াম ও অভিভাবক সম্পর্ক (commendation [৪০]) থেকে সামন্ততন্ত্রে উত্তরণ এবং জনসংখ্যার এমন এক প্রচন্ড বিস্ফোরণ, যেজন্য মাত্র দুই শতাব্দী পরবর্তী ক্রুশেডের রক্তক্ষয়ও বিনা ক্ষতিতেই সহ্য করা সম্ভব হয়েছিল।

কী রহস্যময় যাদুমন্ত্রে জার্মানরা মুমূর্ষু ইউরোপে নতুন প্রাণ সঞ্চার করল? যেকথা আমাদের জাতিদম্ভী ইতিহাসবিদরা বলে থাকে, এটা কি জার্মান জাতির কোনো অন্তর্নিহিত যাদুশক্তি? আদৌ না। জার্মানরা সেসময় আর্য উপজাতির অতি গুণসমৃদ্ধ একটি শাখা, বিশেষত তখন তারা ব্যাপক বিকাশোন্মুখ। কিন্তু তাদের কোনো বিশেষ জাতিগত গুণ ইউরোপকে নবজীবন দেয় নি, দিয়েছে নিতান্তই তাদের বর্বরতা, তাদের গোত্র প্রথা।

তাদের ব্যক্তিগত গুণ ও সাহস, তাদের মুক্তিপিপাসা এবং গণতন্ত্রী প্রবৃত্তি যাতে সমস্ত সামাজিক ব্যাপার নিজ বিষয় হিসেবে বিবেচিত, সংক্ষেপে সেইসব গুণ যা রোমানরা হারিয়ে ফেলেছিল এবং কেবলমাত্র

যেগুলি রোম দুনিয়ার পঙ্ক থেকে নতুন রাষ্ট্র গঠন করতে এবং নতুন জাতিসত্তাগুলিকে টেনে তুলতে পারত — এগুলি ঊর্ধ্বস্তরের বর্বরদের বৈশিষ্ট্য, তাদের গোত্র প্রথার ফল ছাড়া আর কী?

যদি জার্মানরা একগামিতার প্রাচীন রূপকে পরিবর্তিত করে, পরিবারে পুরুষের আধিপত্যকে সংহত করে নারীকে প্রাচীন যুগের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত একটি উচ্চতর মর্যাদা দিয়ে থাকে, তবে সেটা তাদের বর্বরতা, তাদের গোত্রীয় রীতিনীতি, তাদের মধ্যে তখনও জীবন্ত মাতৃ-অধিকার যুগের উত্তরাধিকার ছাড়া আর কীসের জোরে তারা করতে পেরেছিল?

যদি তারা অন্তত তিনটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দেশ — জার্মানি, উত্তর ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে মার্ক-গোষ্ঠী আকারে সত্যিকার গোত্র প্রথার একটি ভগ্নাংশ বাঁচিয়ে তা সামন্ততন্ত্রী রাষ্ট্রের মধ্যে পেঁছিতে সক্ষম হয় এবং এভাবে মধ্যযুগের ভূমিদাস প্রথার নিদারুণ নির্মমতার মধ্যেও শোষিত শ্রেণী, কৃষকদের স্থানীয় ঐক্য ও প্রতিরোধের উপায় নির্দেশ করে থাকে যা প্রাচীনকালের ক্রীতদাস অথবা বর্তমানের প্রলেতারীয় শ্রেণী হাতের কাছে তৈরি জিনিস হিসেবে পায় নি — তবে বর্বরতা, গোত্রানুযায়ী বসতি স্থাপনের একান্ত বর্বরযুগীয় পদ্ধতি ছাড়া আর কীসের জোরে তারা এটি পেরেছিল?

এবং সর্বশেষে, তারা যদি নিজেদের মধ্যে প্রচলিত পরাধীনতার একটি নম্রতর রূপ বিকশিত ও সর্বত্র তা প্রবর্তন করে থাকে, যেটি ক্রমে ক্রমে রোম সাম্রাজ্যেও দাস প্রথার স্থলবর্তী হয়েছিল এবং যার প্রসঙ্গে ফুরিয়ে সর্বপ্রথম বলেন যে, এটি **শ্রেণী হিসেবে** নিপীড়িতদের সামনে ক্রমশ মুক্তিলাভের একটি উপায় প্রদান করে (fournit aux cultivateurs des moyens d'affranchissement *collectif et progressif**),— এবং এজন্য যেটি দাস প্রথার চেয়ে বহুগুণ ভাল, কারণ দাস প্রথায় মুক্তি শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে এবং অন্তর্বর্তী স্তর ব্যতিরেকেই সম্ভবপর ছিল (প্রাচীন যুগে সফল বিদ্রোহ দ্বারা দাস প্রথা অবসানের কোনো দৃষ্টান্ত নেই), অপরপক্ষে মধ্যযুগের ভূমিদাস ধাপে ধাপে সত্যিই শ্রেণী হিসেবে মুক্তিলাভ করেছে — তবে এর কারণ তাদের বর্বরতা ছাড়া আর কী, যার কল্যাণে তাদের মধ্যে তখনও পূর্ণ-

---

* কৃষকদের সামনে **যৌথভাবে** ও **ক্রমান্বয়ে** মুক্তিলাভের উপায় প্রদান করে।— সম্পাঃ

মাত্রায় দাস প্রথা, প্রাচীন যুগের শ্রমদাসত্বও কিংবা প্রাচ্যের গার্হস্থ্য দাসত্বও দেখা দেয় নি?

জার্মানরা রোম জগতে প্রাণবান ও সঞ্জীবনী যা-কিছু সঞ্চার করল, তা হল এই বর্বরতা। বস্তুত, মুমূর্ষু এক সভ্যতার জরাজীর্ণ এক জগতে কেবল বর্বররাই নবজীবন সঞ্চারে সক্ষম। এবং জাতিসমূহের দেশান্তর যাত্রার প্রাক্কালে জার্মানরা বর্বরতার যে ঊর্ধ্বস্তরে পেঁছেছিল ঠিক সেই স্তরটিই এই প্রক্রিয়ার সর্বাধিক অনুকূল। এতেই সবকিছু ব্যাখ্যাত।

৯

বর্বরতা ও সভ্যতা

আমরা তিনটি প্রধান পৃথক দৃষ্টান্তে গোত্র প্রথা ধ্বংসের প্রণালী দেখেছি: গ্রীক, রোমান এবং জার্মান। কোন কোন সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা বর্বরতার ঊর্ধ্বস্তরেই সমাজের গোত্র সংগঠনকে দুর্বল করে দেয় এবং সভ্যতার আবির্ভাবের সঙ্গে একেবারে এর বিলোপ ঘটায় আমরা উপসংহারে তার সন্ধান করব। এজন্য মর্গানের রচনার মতো মার্কসের 'পুঁজি'ও অপরিহার্য।

বন্য অবস্থার মধ্যস্তর থেকে উদ্ভূত, ঊর্ধ্বস্তরে বিকশিত হয়ে গোত্র প্রথা, যতদূর আমরা প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে বিচার করতে পারি, বর্বরতার নিম্নস্তরে পরিণতির শীর্ষে উত্তীর্ণ হয়। তাই এই স্তর থেকেই আমরা অনুসন্ধান শুরু করব।

এই স্তর, যেজন্য আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা আমাদের অপরিহার্য দৃষ্টান্ত, সেখানে গোত্র প্রথার পূর্ণ পরিণতি লক্ষণীয়। একটি উপজাতি কয়েকটি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুটি গোত্রে বিভক্ত হত; জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে এই মূল গোত্রগুলি আবার কয়েকটি সন্ততি গোত্রে বিভক্ত হত যাদের সঙ্গে মাতৃ গোত্রের সম্পর্ক ছিল দৃশ্যত ফ্রাত্রীর মতো; উপজাতিও বিভক্ত হত কয়েকটি উপজাতিতে, যাদের প্রত্যেকের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরানো গোত্রগুলির সাক্ষাৎ মিলত। অন্তত কোনো কোনো ক্ষেত্রে আত্মীয় উপজাতিগুলি মিলিত হয়ে সম্মিলনী গঠন করত। এই সরল সংগঠন যে সামাজিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত, এটি ঠিক তার উপযোগী ছিল; এটি একটি বিশেষ ধরনের স্বাভাবিক

জোটবন্ধনের বেশি কিছু নয়, যা এভাবে সংগঠিত সমাজের সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ বিরোধ সমাধানে সমর্থ। যুদ্ধেই বহিস্থ বিরোধের নিষ্পত্তি হত এবং পরিণতিতে একটি উপজাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হতে পারত তবু কখনও তাদের দাস বানানো হত না। গোত্র প্রথার মহিমা এবং তার আনুষঙ্গিক সীমাবদ্ধতা এই যে, এতে আধিপত্য ও দাসত্বের কোনো স্থান ছিল না। গোত্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে তখনও কোনো পার্থক্য তৈরি হয় নি; সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ, রক্তপ্রতিশোধ অথবা ক্ষতিপূরণ — অধিকার না কর্তব্য, ইণ্ডিয়ানরা এমন প্রশ্ন নিয়ে কখনই বিব্রত বোধ করে নি; আহার, নিদ্রা বা শিকার — অধিকার না কর্তব্য ঠিক এই প্রশ্নের মতো সেটাও তাদের কাছে অবান্তর মনে হত। তেমনি কোনো উপজাতি অথবা গোত্র বিভিন্ন শ্রেণীতেও বিভক্ত হতে পারত না। এখান থেকেই এই অবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তির সন্ধানে আমাদের যাত্রারম্ভ।

জনসংখ্যা তখন অত্যন্ত বিরল; শিকারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং তারপর অন্যান্য উপজাতি থেকে নিরপেক্ষ অরণ্যের রক্ষাবেষ্টনীতে উপজাতির বসতি অঞ্চলেই কেবল তার সংখ্যাধিক্য ছিল। শ্রমবিভাগ নিতান্তই প্রকৃত চারিত্র্যের, কেবলমাত্র নারী-পুরুষের শ্রমবিভাগেই সীমিত। পুরুষ যুদ্ধে যেত, শিকার করত, মাছ ধরত, কাঁচা খাবার যোগাড় করত এবং এসব আহরণের উপযোগী হাতিয়ার যোগাত। নারী গৃহস্থালী দেখত এবং খাদ্য ও বস্ত্র তৈরি করত — তারা রাঁধত, কাপড় বুনত এবং সেলাই করত। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই কর্তা — পুরুষ অরণ্যে, নারী গৃহে। পুরুষ বা নারী নিজ তৈরি ও ব্যবহৃত হাতিয়ারের মালিক ছিল: অস্ত্রশস্ত্র এবং শিকার ও মাছ ধরার হাতিয়ার পুরুষদের এবং ঘরের জিনিস ও তৈজসপত্র নারীর মালিকানাধীন ছিল। গৃহস্থালী তখন সাম্যতন্ত্রী, একই গৃহে কয়েকটি এবং প্রায়ই বহু পরিবার থাকত।* যা-কিছু সমবেতভাবে উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হত তাই ছিল সাধারণ সম্পত্তি: বাড়ি, বাগান, নৌকা। এখানে এবং কেবলমাত্র এখানেই

---

* বিশেষত আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে, — বানক্রফ্‌ট দ্রষ্টব্য — কুইন শার্লট দ্বীপের হাইডা'দের মধ্যে কোনো কোনো আচ্ছাদনের নিচে সাত শ' জন পর্যন্ত লোক থাকত। নুট্‌কা'দের মধ্যে গোটা উপজাতিই থাকত একই আচ্ছাদনের নিচে। (এঙ্গেলসের টীকা।)

আমরা সেই 'নিজ শ্রমে অর্জিত সম্পত্তি' দেখি, যা আইনজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদদের মিথ্যা ভাষণে সভ্য সমাজের উপর আরোপিত হয়েছে; এই আইনগত শেষ মিথ্যা অজুহাতের উপরই আধুনিক পুঁজিবাদী মালিকানা দণ্ডায়মান।

কিন্তু মানুষ সর্বত্রই এই স্তরে থেমে থাকে নি। এশিয়ায় সে এমন সব পশুর খোঁজ পেল যেগুলি পোষ মানানো এবং এই অবস্থায় প্রজনন সম্ভব। বন্য মাদী মহিষকে শিকার করতে হয়, পোষা হলে সে বছরে একটি করে বাচ্চা এবং তার উপর দুধও দেয়। সবচেয়ে অগ্রগামী কয়েকটি উপজাতি — আর্য, সেমিট এবং সম্ভবত তুরানীরাও — বন্যজন্তু পোষ মানানো এবং পরে গবাদি পশুর প্রজনন ও প্রতিপালন তাদের মূল পেশা করে তুলেছিল। পশুপালক উপজাতিগুলি সাধারণ বর্বরদের থেকে পৃথক হয়ে পড়ে: এটিই **প্রথম বিরাটাকার সামাজিক শ্রমবিভাগ**। এই পশুপালক উপজাতিগুলি অবশিষ্ট বর্বরদের চেয়ে শুধু অধিক পরিমাণ খাদ্যই উৎপাদন করত না, পরন্তু তাদের উৎপন্ন জীবনোপকরণও ভিন্নতর ছিল। অন্যদের চেয়ে অধিক পরিমাণে শুধু দুধ, দুগ্ধজাত সামগ্রী এবং মাংসই নয়, পরন্তু তাদের ছিল চামড়া, পশম, ছাগলোম এবং ক্রমবর্ধমান কাঁচা মাল সরবরাহের ফলে সাধারণের ব্যবহার্য হয়ে ওঠা তন্তুবস্ত্র। এ-ই সর্বপ্রথম নিয়মিত বিনিময় সম্ভব করল। পূর্ববর্তী স্তরগুলিতে দৈবাৎ বিনিময় চলত; অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি নির্মাণে অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্য সাময়িক শ্রমবিভাগ হয়ত দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, নব্যপ্রস্তরযুগে পাথুরে হাতিয়ার কারখানার অবিসংবাদিত চিহ্নও বহু জায়গায় পাওয়া গিয়েছে; এসব কারখানায় যাদের নৈপুণ্য অধিকতর ছিল সেই সব কারিগর খুব সম্ভব সমগ্র গোষ্ঠীর জন্যই কাজ করত, যেমনটি আজও গোত্রভিত্তিক ভারতীয় গোষ্ঠীগুলির স্থায়ী কারিগররা করে থাকে। সে যাইহোক, ঐ স্তরে উপজাতির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিনিময় ছাড়া অন্য কোনো বিনিময়ের উদ্ভব সম্ভব ছিল না এবং তাও ব্যতিক্রম হিসেবে। পশুপালক উপজাতি দানা বাঁধার পর কিন্তু বিভিন্ন উপজাতির লোকের মধ্যে বিনিময় এবং স্থায়ী প্রতিষ্ঠান রূপে এর উত্তরোত্তর বিকাশ ও সংহতির অনুকূল অবস্থা দেখা দেয়। সূচনাকালে নিজ নিজ গোত্র প্রধানদের মারফৎ একটি উপজাতি অন্যটির সঙ্গে বিনিময় চালাত; কিন্তু যখন পশুযূথগুলি

স্বতন্ত্র সম্পত্তিতে পরিণত হতে লাগল, তখন থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে বিনিময় ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং শেষ অবধি এটাই একমাত্র ধরন হয়ে ওঠে। পশুপালক উপজাতিগুলি বিনিময়ের জন্য প্রতিবেশীর কাছে যে প্রধান পণ্যটি আনত, সেটি গবাদি পশু; গবাদি পশু এমন একটি পণ্য হয়ে উঠল যা দিয়ে অপর সব পণ্যের মূল্য পরিমাপ করা হত এবং সর্বত্র এর বিনিময়ে সহজেই অপরাপর পণ্য পাওয়া যেত; সংক্ষেপে, গবাদি পশু মুদ্রার কাজ করতে শুরু করল এবং সেই স্তর থেকেই মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হল। এই প্রয়োজন ও দ্রুতির তাড়নায় পণ্য-বিনিময়ের একেবারে সূচনাতেই মুদ্রাপণ্যের চাহিদা বাড়তে থাকে।

সম্ভবত এশিয়াবাসী বর্বরদের নিম্নস্তরে চাষ অজানা ছিল; এটি তাদের মধ্যে অন্তত বর্বরতার মধ্যস্তরে চাষাবাদের পুরোগামী হিসেবে দেখা দেয়। দীর্ঘস্থায়ী কঠোর শীতকালের জন্য পশুখাদ্যের যথেষ্ট যোগান না থাকলে তুরান মালভূমির জলবায়ুতে পশুপালন সম্ভব হত না। এজন্যই তৃণভূমি রক্ষা ও শস্যচাষ সেখানে অপরিহার্য ছিল। কৃষ্ণ সাগরের উত্তর দিকের স্তেপাঞ্চল সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। তবে পশুর জন্য উৎপন্ন শস্যদানা অচিরেই মানুষের খাদ্য হয়ে ওঠে। চাষের জমি তখনও উপজাতির সম্পত্তি এবং প্রথমে তা গোত্রের জন্য, পরে গোত্র কর্তৃক গৃহস্থালী গোষ্ঠীগুলির জন্য এবং সর্বশেষে ব্যক্তিবিশেষকে বরাদ্দ করা হয়; এদের আংশিক দখলীস্বত্ব থাকা সম্ভব হলেও তার বেশি কিছুই ছিল না।

শিল্প ক্ষেত্রে এই স্তরের দুটি কৃতিত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রথমটি বুনবার তাঁত, দ্বিতীয়টি আকরিক ধাতু-গলন ও ধাতুকর্ম। তামা, টিন এবং উভয়টির সংকর ব্রোঞ্জই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাতু; ব্রোঞ্জ দিয়ে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হত; কিন্তু এটি তখনও পাথুরে উপকরণ হটাতে পারে নি। কেবল লোহাই কাজটি করতে পারত, কিন্তু তখনও লোহার উৎপাদন অজ্ঞাত। গহনা ও অলঙ্কারের জন্য সোনা ও রুপার ব্যবহার শুরু হয়েছিল এবং সম্ভবত ইতিমধ্যেই এদের মূল্য তামা ও ব্রোঞ্জকে বহুগুণ অতিক্রম করেছিল।

পশুপালন, কৃষি, গৃহশিল্প — সমস্ত শাখায় উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে মানুষের শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি

উপকরণ তৈরি সম্ভব হল। গোত্র অথবা গৃহস্থালী গোষ্ঠী অথবা একক পরিবারের সমস্ত সদস্যের দৈনিক কাজের পরিমাণও এতে তখনই বৃদ্ধি পেল। নতুন শ্রমশক্তি সরবরাহ বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠল। এটি যোগাল যুদ্ধ: যুদ্ধবন্দীদের দাস বানানো আরম্ভ হল। ঐ বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় প্রথম বৃহৎ সামাজিক শ্রমবিভাগ, শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি ও ফলত সম্পদ বাড়িয়ে এবং উৎপাদনী কর্মক্ষেত্রকে প্রসারিত করে তার পিছু পিছু অনিবার্যভাবেই দাস প্রথাকে টেনে আনল। প্রথম বৃহৎ সামাজিক শ্রমবিভাগ থেকে প্রথম বৃহৎ সামাজিক বিভাগ মাধ্যমে এল দুটি শ্রেণী: মালিক ও ক্রীতদাস, শোষক ও শোষিত।

কী করে এবং কবে পশুযূথগুলি উপজাতি বা গোত্রের যৌথ সম্পত্তি থেকে বিভিন্ন পরিবার প্রধানদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হল তা আজও অজ্ঞাত। কিন্তু মোটের উপর ঘটনাটি এই স্তরে অবশ্যই ঘটেছিল। পশুযূথ ও অন্যান্য নতুন ধনসামগ্রী পরিবারে একটি বিপ্লব আনল। জীবিকার্জন সবসময়ই পুরুষের কাজ বিধায় সে জীবিকার উপকরণগুলি তৈরি করত ও দখলে রাখত, পশুযূথ এখন জীবিকার নতুন উপায় হয়ে উঠল এবং গোড়ায় এগুলির পোষ মানানো ও পরে প্রতিপালন তার কাজ হল। এজন্য গবাদি পশু এবং তাদের বিনিময়ে পাওয়া পণ্য ও ক্রীতদাসের মালিক হল পুরুষ। উৎপাদনের সমস্ত উদ্বৃত্তই পুরুষের ভাগে গেল; নারী ছিল শুধুমাত্র তা ভোগের অংশীদার, মালিকানার অংশীদার আর নয়। 'বন্য' যোদ্ধা ও শিকারী ঘরের মধ্যে গৌণ ভূমিকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত এবং নারীর প্রাধান্য মানত। 'অপেক্ষাকৃত নম্র' রাখাল তার সম্পত্তির জোরে প্রথম স্থান দখল করল এবং নারীকে গৌণ ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য করল এবং এতে নারীর অভিযোগের কিছু ছিল না। পরিবারের শ্রমবিভাগই পুরুষ ও নারীর সম্পত্তি বণ্টন নিয়ন্ত্রিত করত। এই শ্রমবিভাগ পরিবর্তিত হল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন এতে আগেকার পারিবারিক সম্পর্কের ওলটপালট ঘটল শুধু এজন্য যে, পরিবারের বাইরের শ্রমবিভাগের ধরন বদলে গিয়েছিল। অতীতে যে কারণে অর্থাৎ গৃহকর্মের জন্য নারী সংসারে সর্বেসর্বা ছিল এখন ঠিক সেই কারণেই সংসারে পুরুষের আধিপত্য সুনিশ্চিত হল; জীবিকার্জনে পুরুষের কাজের তুলনায় নারীর গৃহকর্ম তাৎপর্যহীন হয়ে

পড়ল; প্রথমজনের কাজটিই সব, দ্বিতীয়টির অবদান তুচ্ছ। এখানেই আমরা নারী মুক্তি এবং পুরুষের সঙ্গে তার সমানাধিকারের অসম্ভাব্যতা লক্ষ্য করি এবং যতদিন নারী সামাজিক উৎপাদন থেকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত গৃহস্থালীতে সীমাবদ্ধ থাকবে ততদিন তা আর ঘুচবে না। নারী মুক্তি তখনই সম্ভব যখন সে ব্যাপক সামাজিক পরিসরে উৎপাদনে অংশ নিতে পারবে এবং যখন গৃহস্থালীর কাজে তার প্রয়োজন গৌণ হয়ে উঠবে। এবং এটি কেবল আধুনিক বৃহৎ শিল্পের ফলেই সম্ভব হয়েছে; এতে বিপুলসংখ্যক নারীর উৎপাদনে অংশ গ্রহণ শুধু সম্ভবই নয়, আসলে তা আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে এবং উপরন্তু গৃহস্থালীর ব্যক্তিগত কাজকেও সামাজিক শিল্পে সংযোজনার উত্তরোত্তর চেষ্টা বৃদ্ধি পায়।

সংসারে বাস্তব প্রভুত্ব লাভ পুরুষের একাধিপত্যের শেষ প্রতিবন্ধকটি অপসৃত করে। মাতৃ-অধিকারের উৎখাত, পিতৃ-অধিকার প্রবর্তন এবং জোড়বাঁধা পরিবার থেকে একগামিতায় ক্রমপরিণতির ফলে এই একাধিপত্য সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে। এতে প্রাচীন গোত্রব্যবস্থায় ফাটল ধরল: একক পরিবার একটি শক্তিতে পরিণত হয়ে গোত্রকে বিপন্ন করে তুলল।

পরবর্তী পর্যায়ে আমরা বর্বরতার উর্ধ্বস্তরে এসে পৌছই, যে পর্বটি সমস্ত সভ্য জাতিই তাদের বীরযুগের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে: এটি লৌহ তরবারির যুগ এবং আনুষঙ্গিক লোহার লাঙ্গল ও কুঠারেরও। লোহা হল মানুষের ভৃত্য এবং আলু বাদ দিলে ইতিহাসে বিপ্লবী ভূমিকা পালনকারী সমস্ত কাঁচা মালের মধ্যে এটিই সর্বশেষ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। লোহা ব্যাপক পরিসরে চাষবাস এবং চাষের জন্য বৃহৎ বনভূমির আবাদ সম্ভব করল; কারিগরের হাতে লোহা এমন শক্ত ও ধারাল একটি হাতিয়ার তুলে দিল যার কাছে পাথর বা অন্য যেকোনো পরিচিত ধাতুই হার মানত। এসবই ঘটেছে ক্রমে ক্রমে; প্রথম প্রস্তুত লোহা প্রায়ই ব্রোঞ্জের চেয়েও নরম ছিল। ফলত পাথরের হাতিয়ার লোপ পেল কিন্তু ধীরে ধীরে; 'হিল্‌ডেব্রান্ডের গাথা'য় শুধু নয়, ১০৬৬ সালে হ্যাস্টিংসের যুদ্ধেও পাথরের কুঠার ব্যবহৃত হয়েছে (৪১)। কিন্তু প্রগতি এখন অপ্রতিরোধ্য, স্বল্পব্যাহত এবং দ্রুততর হয়ে উঠল। মিনার ও পাথরের প্রাচীর ঘেরা পাথর অথবা ইটের বাড়ি সমেত নগরই হল উপজাতি বা উপজাতি সম্মিলনীর কেন্দ্রপীঠ। এতে বাস্তুকলা-

বিদ্যার বিরাট ও দ্রুত উন্নতির নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়, তবে আনুষঙ্গিক বিপদবৃদ্ধি ও আত্মরক্ষার আবশ্যিকতারও লক্ষণ দেখা দিল। সম্পত্তির দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু তা ব্যক্তিবিশেষের ধনসম্পত্তি। বয়ন, ধাতুকর্ম ও অন্যান্য যেসব কারুশিল্প এখন বিশিষ্টতর হয়ে উঠেছিল, তাদের উৎপাদনে অধিকতর বৈচিত্র্য ও শিল্পসূক্ষ্মতা দেখা গেল; কৃষি থেকে এখন শুধু খাদ্য শস্য, ডাল ও ফল নয়, তেল এবং মদও মিলছিল, তার উৎপাদনপদ্ধতি জানা হয়ে গিয়েছিল। এত বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম একই ব্যক্তির দ্বারা চালানো আর সম্ভব ছিল না; সম্পন্ন হল **দ্বিতীয় বিরাট শ্রমবিভাগ**: কুটিরশিল্প কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন হল। উৎপাদনের অবিরাম প্রসার এবং সেসঙ্গে শ্রমের অধিকতর উৎপাদনশীলতার ফলে মানুষের শ্রমশক্তির মূল্য বাড়ল, পূর্ববর্তী স্তরে যা ছিল একটি সদ্যোজাত ও আপতিক ব্যাপার, সেই দাস প্রথাই এখন সামাজিক ব্যবস্থার একটি মূল অঙ্গ হয়ে উঠল; দাসরা এখন আর সাহায্যকারীমাত্র থাকল না, পরন্তু তাদের দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে ক্ষেত ও কর্মশালায় কাজে লাগানো হল। উৎপাদনকে দুটি প্রধান শাখা, কৃষি ও কুটিরশিল্পে ভাগ করার ফলে প্রত্যক্ষ বিনিময়ভিত্তিক উৎপাদন — পণ্যোৎপাদন শুরু হল, এবং এল আনুষঙ্গিক বাণিজ্য, শুধু উপজাতির অভ্যন্তরে এবং তার সীমানা বরাবর নয়, পরন্তু সমুদ্রপারেও। এসবই তখনও খুবই অপরিণত; সর্বজনীন মুদ্রাপণ্য হিসেবে বরধাতুগুলি সমাদৃত হলেও তখনও মুদ্রা তৈরি হয় নি এবং তার বিনিময় হত কেবল ওজনের ভিত্তিতে।

এখন স্বাধীন নাগরিক ও দাসের তারতম্যে ধনী ও দরিদ্রের তারতম্য যোগ হল; নতুন শ্রমবিভাগের সঙ্গে দেখা দিল বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের নতুন বিভাগ। তখনও যে পুরানো সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালী গোষ্ঠীগুলি টিকে ছিল বিভিন্ন পরিবার প্রধানদের ধনসম্পদে অসাম্যের ফলে সেগুলিও চৌচির হয়ে গেল; এবং সেই সঙ্গে গোষ্ঠীভিত্তিক জমির যৌথ চাষবাসও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কর্ষিত জমি বিভিন্ন পরিবারের ব্যবহারের জন্য, প্রথমে সাময়িকভাবে এবং পরে চিরস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হল; জমির পরিপূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানায় উত্তরণ ক্রমে ক্রমে এবং জোড়বাঁধা পরিবার থেকে একগামিতায় উত্তরণের সমান্তরালে ঘটেছিল। এক-একটি পরিবারই সমাজের অর্থনৈতিক একক হয়ে উঠতে লাগল।

জনসংখ্যার ঘনত্ববৃদ্ধির ফলে ভিতর ও বাহিরে নিবিড়তর ঐক্যের প্রয়োজন দেখা দিল। সর্বত্রই আত্মীয় উপজাতিগুলির সম্মিলনী এবং অব্যবহিত পরই এমন কি তাদের মিশ্রণ অপরিহার্য হয়ে উঠল, অতঃপর বিভিন্ন উপজাতির পৃথক পৃথক ভূখণ্ডের মিলনে সমগ্র জাতির একক ভূখণ্ড তৈরি হয়। জনগণের সামরিক নেতা —rex, basileus, thiudans— হলেন এক প্রয়োজনীয় ও স্থায়ী পদাধিকারী। জনসভা যেখানে ছিল না সেখানে তার উদ্ভব ঘটল। সেনাপতি, পরিষদ এবং জনসভা — এরা হল গোত্রসমাজ থেকে বিকশিত সামরিক গণতন্ত্রের সংস্থা। সামরিক গণতন্ত্র এজন্য যে, এখন জনজীবনে যুদ্ধ ও যুদ্ধমুখী সংগঠন নিয়মিত ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। প্রতিবেশীর ধনসম্পত্তিতে অপরাপর জাতি প্রলুব্ধ হত, এরা ধন সংগ্রহকেই জীবনের অন্যতম মূল লক্ষ্য বলে ভাবতে শুরু করল। এরা ছিল বর্বর: উৎপাদনমূলক কাজকর্মের চেয়ে লুণ্ঠনই এদের কাছে সহজতর, এমন কি অধিকতর সম্মানজনক মনে হল। একদা যুদ্ধ ছিল শুধু আক্রমণের প্রতিশোধ অথবা নিজেদের ক্ষুদ্রতর ভূখণ্ডের সীমানাবৃদ্ধির উপায়; এখন তা হল লুণ্ঠনসর্বস্ব এবং এটি নিয়মিত পেশা হয়ে উঠল। নতুন সংরক্ষিত নগরের চারপাশে দুর্ভেদ্য দেওয়াল অকারণেই তোলা হল না: এর প্রসারিত পরিখাগুলি গোত্র প্রথার কবরে পর্যবসিত হল এবং মিনারগুলি ইতিমধ্যেই সভ্যতাকে স্পর্শ করেছিল। সমাজের অভ্যন্তরেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটল। লুণ্ঠনমূলক যুদ্ধ সর্বোচ্চ সেনাপতি ও তার অধস্তন উপসেনাপতিদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলল; একই পরিবার থেকে পদাধিকারী নির্বাচনের প্রথা ক্রমে ক্রমে, বিশেষত পিতৃ-অধিকার প্রতিষ্ঠার পরে, উত্তরাধিকারে পরিণত হল; প্রথমে এটি সহ্য করা হত, পরে এটি দাবী হয়ে উঠল এবং সর্বশেষে সবলে দখল করা হল; বংশানুক্রমিক রাজত্ব ও আভিজাত্যের ভিত্তি স্থাপিত হল। এভাবে জাতি, গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির মধ্যে তাদের যে শিকড় ছিল সেখান থেকে গোত্র প্রথার বিভিন্ন সংস্থার মূলোচ্ছেদ করা হল এবং বিপরীত সত্তায় সমগ্র গোত্র প্রথার রূপান্তরণ ঘটল: উপজাতিগুলির নিজ স্বাধীন কাজকর্ম পরিচালনার সংগঠন থেকে এটি প্রতিবেশীদের লুণ্ঠন ও পীড়নের সংগঠন হয়ে উঠল; এবং আনুষঙ্গিকভাবে এর বিভিন্ন সংস্থাগুলি গণইচ্ছার হাতিয়ার থেকে স্বীয় জনগণের বিরোধী শাসন ও পীড়নের স্বতন্ত্র সংস্থায় পরিণত

হল। ধনলালসা গোত্রের সভ্যদের ধনী ও দরিদ্রে বিভক্ত না করলে এমনটি ঘটত না; যদি না 'একই গোত্রের মধ্যে সম্পত্তিভেদের ফলে গোত্র সভ্যদের স্বার্থের ঐক্য বিরোধে পরিণত হত' (মার্কস) এবং যদি না দাস প্রথার বিকাশ ইতিমধ্যেই জীবিকার্জনের শ্রম দাসোচিত এবং লুণ্ঠন অপেক্ষা অধিকতর অপমানজনক বলে চিহ্নিত না করত।

* * *

এখন আমরা সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত। শ্রমবিভাগের উন্নততর পর্যায় এই পর্বের সূচক। নিম্নস্তরে মানুষ নিজের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন পূরণের জন্য উৎপাদন করত; আকস্মিক উদ্বৃত্তের আপতিক ক্ষেত্রেই শুধু বিনিময় সীমাবদ্ধ ছিল। বর্বরতার মধ্যস্তরে পশুপালক জাতিগুলির মধ্যে আমরা দেখি যে, গবাদি পশুর মধ্যে এমন একধরনের সম্পত্তি আছে যাতে পশুযূথ যথেষ্ট বড় হলে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ হয়েও এতে নিয়মিতভাবে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে; পশুপালক এবং পশুযূথহীন অনুন্নত উপজাতিগুলির মধ্যে একটি শ্রমবিভাগও আমরা লক্ষ্য করি; এতে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি বিভিন্ন স্তরের উৎপাদনে নিয়মিত বিনিময়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বর্বরতার ঊর্ধ্বস্তরে আরও একটি শ্রমবিভাগ, কৃষি ও হস্তশিল্পের শ্রমবিভাগ ঘটল এবং ফলত ক্রমবর্ধমান পরিমাণে শ্রমের পণ্য উৎপন্ন হতে থাকল প্রত্যক্ষ বিনিময়ের জন্য এবং এজন্য বিভিন্ন উৎপাদকদের মধ্যে বিনিময় এমন এক পর্যায়ে পেঁছিল যাতে এটি সমাজজীবনের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠল। সভ্যতা এসব পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শ্রমবিভাগকে শক্তিশালী করল ও তাকে বাড়িয়ে তুলল, বিশেষত গ্রাম ও নগরের বৈপরীত্য বাড়িয়ে (হয় নগর গ্রামের উপর অর্থনৈতিক আধিপত্য খাটাত, যেমন প্রাচীন যুগে, অথবা গ্রাম নগরের উপর আধিপত্য করত, যেমন মধ্যযুগে), এবং তৃতীয় একটি শ্রমবিভাগ যোগ করল, যেটি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ: সভ্যতা এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করল যা উৎপাদনে অংশগ্রহণ করত না, শুধু পণ্যবিনিময়ে ব্যাপৃত থাকত — এরা **বণিক**। পূর্বে শ্রেণী সৃষ্টির সমস্ত প্রবণতা একান্তই উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল; এতে উৎপাদনে নিযুক্ত লোকেরা পরিচালক ও কর্মীতে অথবা ব্যাপকভিত্তিক

উৎপাদক ও সীমিত উৎপাদকে বিভক্ত হয়। এই প্রথম এমন একটি শ্রেণী দেখা দিল যারা উৎপাদনে কোনোই অংশ না নিয়েও গোটা উৎপাদনের পরিচালনা ভার দখল করল এবং অর্থনৈতিকভাবে সমস্ত উৎপাদককে নিজ শাসনাধীনে আনল; এই শ্রেণী যেকোনো দুই উৎপাদক দলের প্রত্যেকের পক্ষেই অপরিহার্য মধ্যস্থ হয়ে উঠল এবং উভয়কেই শোষণ করতে থাকল। বিনিময়ের কষ্ট ও ঝুঁকি থেকে উৎপাদকদের বাঁচানো, দূরদূরান্তে তাদের পণ্যের বাজার খোঁজা এবং এভাবে সমাজে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠার অজুহাতে দেখা দিল একটি পরজীবী শ্রেণী, সর্বৈব সামাজিক পরাশ্রিত একটি শ্রেণী, যারা আসলে নিজের অতি তুচ্ছ কাজের দক্ষিণা হিসেবে দেশের ও বিদেশের উৎপাদনের সার অংশটুকু দখল করত, দ্রুত জমিয়ে তুলত প্রভূত ধনসম্পত্তি এবং সেই অনুপাতে সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং শুধু এই কারণেই সভ্যযুগে তাদের পক্ষে নতুন নতুন সম্মান এবং উৎপাদনের উপর ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি অর্জন অবশ্যম্ভাবী ছিল, যতদিন না তারা অবশেষে স্বকীয় উৎপাদ — পর্যায়ক্রমিক বাণিজ্য সংকট সৃষ্টি করছে।

বিকাশের যে স্তরের কথা আমরা আলোচনা করছি, তখন তরুণ বণিক সম্প্রদায়ের ধারণাও ছিল না যে, ভবিষ্যতে কী বৃহৎ কর্মকাণ্ড তাদের ভাগ্যে ঘটবে। কিন্তু এই সম্প্রদায়টি গঠিত হল, নিজেদের অপরিহার্য করে তুলল এবং তাই যথেষ্ট। তারই সঙ্গে কিন্তু **ধাতব মুদ্রা,** টাঁকশালে তৈরী মুদ্রা প্রচলিত হল এবং ধাতব মুদ্রার সঙ্গে এল উৎপাদক ও তার উৎপাদনের উপর অনুৎপাদকের আধিপত্যের নতুন উপায়। সকল পণ্যের সেরা পণ্য, যার মধ্যে অন্য সব পণ্যই লুকানো, তাই আবিষ্কৃত হল; আবিষ্কৃত হল সেই যাদু যা ইচ্ছামাত্র নিজেকে যেকোনো বাঞ্ছনীয় বা বাঞ্ছিত জিনিসেই পরিণত করতে পারে। যার হাতে তা আছে, সে-ই উৎপাদন জগতে আধিপত্য করে; এবং কার হাতে এটি সবচেয়ে বেশি? বণিকের। তার হাতেই মুদ্রাপুজো নিরাপদ। সে এটি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিতে চাইল যে, সমস্ত পণ্য, সুতরাং সকল পণ্য-উৎপাদক অর্থের সামনে ধুলায় গড়াগড়ি দিতে বাধ্য। সে কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করল যে, অন্য সবরকমের ধনদৌলত সম্পদের এই মূর্তিমান রূপের কাছে ছায়ামাত্র। অর্থের ক্ষমতা তার এই প্রথম তারুণ্যে যতখানি স্থূল ও হিংস্রভাবে প্রকট হয়েছিল তেমন আর কখনও হয় নি। অর্থের বিনিময়ে

পণ্যবিক্রয়ের পর এল আর্থিক ঋণদান এবং আনুষঙ্গিক সুদ ও মহাজনি। এবং আর কোথাও পরবর্তীকালের আইনবিধি দেনদারকে সুদখোর মহাজনের পায়ের তলায় এত নির্মম ও অসহায়ভাবে ফেলে দেয় নি যেমনটি প্রাচীন এথেন্স ও রোমে দিয়েছিল; এই দু'জায়গায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাধারণ আইন হিসেবেই এটি দেখা দিয়েছিল এবং তার পিছনে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা ছাড়া অন্যতর কোনো কারণ ছিল না।

পণ্য ও ক্রীতদাস রূপে সম্পদ এবং মুদ্রাসম্পদ ছাড়াও জমিরূপী সম্পদও দেখা দিল। আদিতে বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য গোত্র বা উপজাতি কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমিজমার উপর এখন ব্যক্তিস্বত্ব এত সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে, সেগুলি তাদের বংশানুসৃত সম্পত্তি হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময়ের আগে মানুষ এই জমিজমাকে গোত্রীয় গোষ্ঠীর দাবিদাওয়া থেকে মুক্ত করার জন্য সর্বাধিক চেষ্টা করেছিল, কারণ এ দাবিদাওয়াটি তাদের পক্ষে একটি প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা এই বন্ধন থেকে মুক্তি পেল, কিন্তু অল্পকাল পর তাদের নতুন ভূসম্পত্তি থেকেও তারা মুক্ত হল। জমির উপর পূর্ণ ও স্বাধীন মালিকানার অর্থ শুধু অবাধ ও অবিচ্ছিন্ন ভোগদখল নয়, পরন্তু এতে জমি হস্তান্তরের সম্ভাবনাও নিহিত। জমি গোত্রের সম্পত্তি থাকাকালীন এ সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু যখন জমির নতুন মালিক গোত্র ও উপজাতির সার্বভৌম স্বত্বের শৃংখল ছিন্ন করল, তখনই যে বন্ধন তাকে অচ্ছেদ্যভাবে জমির সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল তাও সে ছিঁড়ে দিল। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সমকালে উদ্ভূত অর্থই এর তাৎপর্য স্পষ্ট করে দিল। জমি এখন বিক্রেয় ও বন্ধকযোগ্য একটি পণ্য হয়ে উঠল। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা দিতে না দিতেই বন্ধক দেওয়া আবিষ্কার হল (৪২) (এথেন্স দেখুন)। একগামিতালগ্ন হেটায়ারিজম ও বেশ্যাবৃত্তির মতো জমির মালিকানাতেও এখন বন্ধকী প্রথা সেঁটে বসল। পূর্ণ, স্বাধীন ও হস্তান্তরযোগ্য জমি মালিকানা পেতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল। এই তো, নে না: tu l'as voulu, George Dandin!*

---

* 'এটাই তুই চেয়েছিলি, জর্জ ডান্ডিন!' (মলিয়েরের, 'জর্জ ডান্ডিন', প্রথম অঙ্ক, নবম দৃশ্য)। —সম্পাঃ

বাণিজ্যের প্রসার, অর্থ, তেজারতি, ভূসম্পত্তি এবং বন্ধকী প্রথার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে চলল মুষ্টিমেয় একটি শ্রেণীর হাতে ধনসম্পত্তির দ্রুত সঞ্চয় ও কেন্দ্রীভবন এবং অপরদিকে এল জনগণের ক্রমবর্ধমান নিঃস্বতা ও দরিদ্রদের সংখ্যাবৃদ্ধি। অর্থশালী এই নতুন অভিজাতরা যেখানে শুরু থেকেই উপজাতির পুরাতন অভিজাতদের সঙ্গে অভিন্ন ছিল না সেখানেই তারা এই শেষোক্তদের চিরকালের জন্য পেছনে হঠিয়ে দিয়েছে (এথেন্সে, রোমে, জার্মানদের মধ্যে)। এবং ধন অনুযায়ী স্বাধীন নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের সঙ্গেই, বিশেষত গ্রীসে, ক্রীতদাস সংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি ঘটল,* এদেরই বাধ্যতামূলক শ্রমের ভিতে গড়ে উঠল সমগ্র সমাজের উপরিকাঠামো।

এই সমাজবিপ্লবের ফলে গোত্র প্রথায় কী হল তাই এখন দেখা যাক। এর সাহায্য ব্যতিরেকে উদ্ভূত নতুন উপাদানগুলির সামনে প্রথাটি অক্ষম হয়ে পড়ল। প্রথাটি এই পূর্বশর্তের উপর নির্ভরশীল ছিল যে, একই গোত্র অথবা উপজাতির লোকেরা একই ভূখণ্ডে একত্রে বসবাস করবে এবং তারাই হবে সেখানকার একমাত্র অধিবাসী। বহুকাল আগেই এটি অচল হয়ে পড়ে। গোত্র ও উপজাতি সর্বত্রই পরস্পর মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল; সর্বত্রই স্বাধীন নাগরিকদের মধ্যে ক্রীতদাস, পরাশ্রিত এবং বিদেশীরা বসবাস করত। বর্বরতার মধ্যস্তরের অন্তিম পর্বে যে স্থানীভিত্তিক বসতি গড়ে উঠেছিল তা বারবার ব্যাহত হয় ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশাবদল ও জমিহস্তান্তর জনিত স্থানান্তরণ বা বাসভূমির পরিবর্তনে। গোত্র সম্মিলনীর সদস্যরা নিজেদের সাধারণ সমস্যা মোকাবিলায় আর একত্র হতে পারত না; কেবল অপেক্ষাকৃত নগণ্য বিষয়, যথা ধর্মোৎসব, তখনও পালিত হত, তবে তাও যেমন-তেমনভাবে। গোত্রের বিভিন্ন সংস্থা যেসব প্রয়োজন ও স্বার্থরক্ষার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল এবং যে যোগ্যতাও তাদের ছিল, এখন জীবিকার্জনে বিপ্লব আসায় এবং তজ্জনিত সমাজকাঠামোর পরিবর্তনে নতুন সব প্রয়োজন ও স্বার্থ দেখা

---

* এথেন্সে ক্রীতদাসদের সংখ্যা এই পুস্তকে ১১৭ পৃঃ দ্রঃ [এই খণ্ডের ১৩১ পৃঃ দ্রঃ। — সম্পাঃ] করিন্থ নগরীর সর্বাধিক প্রস্ফুরণের সময় ক্রীতদাসদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪,৬০,০০০ এবং ইজাইনায় প্রায় ৪,৭০,০০০ উভয়তেই স্বাধীন নাগরিক সংখ্যার দশগুণ। (এঙ্গেলসের টীকা।)

দিল; এই শেষোক্তগুলি পুরাতন গোত্র প্রথার কাছে শুধু বিজাতীয়ই নয়, পরন্তু এরা সর্বতোভাবে তার বিরোধীও। শ্রমবিভাগের ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন দলের হস্তশিল্পীদের স্বার্থ এবং গ্রামের প্রতিপক্ষে নগরগুলির বিশেষ চাহিদার জন্য নতুন নতুন সংস্থার প্রয়োজন হল; কিন্তু এই প্রতিটি দলের মধ্যেই ছিল বিভিন্ন গোত্র, ফ্রাত্রী ও উপজাতির লোক, এমন কি পরদেশীও। এজন্য নতুন সংস্থাগুলি অপরিহার্যভাবে গড়ে ওঠে গোত্র প্রথার বাইরেই, তার সমান্তরালে, আবার বিরুদ্ধেও। — পক্ষান্তরে, একই গোত্র ও উপজাতির মধ্যে ধনী ও দরিদ্র, মহাজন ও দেনদার থাকায় প্রত্যেকটি গোত্র সম্মিলনীর মধ্যে এই স্বার্থের বিরোধ প্রকট হয় এবং চরমে ওঠে। — একদিকে সেখানে এসেছিল নতুন বাসিন্দারা, যারা গোত্রীয় গোষ্ঠীবহিস্থ লোক এবং, রোমের মতো, যারা দেশের একটি বিশিষ্ট শক্তি হতে পারত, তাছাড়া সংখ্যায় তারা এত বেশি ছিল যে, রক্তসম্পর্কিত গোত্র ও উপজাতির মধ্যে তাদের ক্রমমিশ্রণও আর সম্ভবপর ছিল না; এদের কাছে গোত্রীয় গোষ্ঠীগুলি রুদ্ধদ্বার, সুবিধাভোগী সংস্থাবিশেষ; সূচনায় যা ছিল স্বভাবসিদ্ধ গণতন্ত্র তাই এখন একটি ঘৃণিত আভিজাত্যে পরিণত হল। — সর্বশেষে, গোত্র প্রথা এমন একটি সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যেখানে কোনো অভ্যন্তরীণ বিরোধ ছিল না, এবং এই প্রথা কেবলমাত্র এরূপ সমাজেরই উপযোগী ছিল। জনমত ছাড়া এর আর কোনো বলপ্রয়োগ শক্তি ছিল না। কিন্তু এখন এমন একটি সমাজের অভ্যুদয় ঘটল যেখানে জীবনযাত্রার সমগ্র অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে সমাজসত্তা বিভক্ত হল স্বাধীন নাগরিক ও ক্রীতদাসে, ধনী শোষক ও শোষিত দরিদ্রে; এই সমাজ শুধু এই বিরোধগুলির সমাধানে অক্ষমই ছিল না, পরন্তু এগুলিকে ক্রমান্বয়ে চরম পর্যায়ে ঠেলে নিতেও বাধ্য ছিল। এমন একটি সমাজ টিকে থাকতে পারে কেবল এসব শ্রেণীগুলির মধ্যে নিরন্তর প্রকাশ্য সংগ্রামের পরিবেশে অথবা তৃতীয় একটি শক্তির শাসনাধীনে, যে শক্তি বাহ্যত পরস্পর সংগ্রামরত শ্রেণীগুলির ঊর্ধ্বে থেকে এগুলির প্রকাশ্য সংগ্রাম দমন করবে এবং বড়জোর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, তথাকথিত আইনসম্মত রূপে একটা শ্রেণীসংগ্রাম চলতে দেবে। গোত্র প্রথা সম্পূর্ণত সেকেলে হয়ে পড়েছিল। শ্রমবিভাগ এবং তার পরিণামস্বরূপ সমাজের শ্রেণীবিভাগ একে বিধ্বস্ত করল। এর স্থলবর্তী হল **রাষ্ট্র**।

* * *

গোত্র প্রথার ধ্বংসস্তূপের উপরে যে তিনটি মূল ধরনের রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল আমরা উপরে পৃথকভাবে তার আলোচনা করেছি। এথেন্স এর শুদ্ধতম ও অবিকল চিরায়ত রূপ: এখানে রাষ্ট্র উদ্ভবের প্রত্যক্ষ ও প্রধান উৎস ছিল খোদ গোত্রসমাজের গর্ভে বিকাশমান শ্রেণীবিরোধ। রোমে গোত্রসমাজ একটি আত্মবদ্ধ আভিজাত্য হয়ে উঠেছিল যার চারদিকে ছিল এ সমাজের বহিস্থ বিরাটসংখ্যক অধিকারহীন আতরাফ যাদের ছিল শুধু কর্তব্য; আতরাফদের জয়লাভে পুরাতন গোত্র প্রথা ভেঙে পড়ল এবং তার ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠল রাষ্ট্র, যাতে গোত্রের আভিজাত্য এবং আতরাফ উভয়ই অচিরে সম্পূর্ণ আত্মীকৃত হল। সর্বশেষে, রোম সাম্রাজ্যের বিজেতা জার্মানদের রাষ্ট্রের উদ্ভব হল, বিশাল বিদেশী ভূখণ্ড জয়ের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে এগুলিকে শাসন করার কোনো উপায় গোত্র প্রথার ছিল না। যেহেতু এই জয়লাভের জন্য পূর্বতন অধিবাসীদের সঙ্গে তেমন কোনো গুরুতর সংগ্রাম করতে হয় নি অথবা এতে উন্নততর কোনো শ্রমবিভাগ প্রয়োজন হয় নি এবং যেহেতু বিজিত ও বিজেতারা অর্থনৈতিক বিকাশের প্রায় একই স্তরে ছিল এবং তার ফলত সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিও পূর্বাবস্থায়ই থাকল, সেহেতু কয়েক শতাব্দী ধরে গোত্র প্রথা এখানে বেঁচে থাকতে পেরেছিল একটা পরিবর্তিত আঞ্চলিক রূপে, মার্কব্যবস্থায়, এমন কি পরবর্তীকালের অভিজাত ও আশরাফ পরিবার তথা কৃষক পরিবারগুলির মধ্যে কিছুকালের জন্য দুর্বল রূপে এর পুনরুজ্জীবনও ঘটে, যথা ডিট্‌মার্শেনে (৪৩)।

অতএব রাষ্ট্র কোনোক্রমেই সমাজের উপর বাইরে থেকে আরোপিত কোনো শক্তি নয়; যেমনটি হেগেলের দাবী অনুসারে একে 'নৈতিক ধারণার বাস্তবতা' অথবা 'হেতুর প্রতিমূর্তি ও বাস্তবতা' বলাও যায় না।* পরন্তু বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে এটি সমাজ থেকেই উদ্ভূত; সমাজ যে সমাধানহীন স্ববিরোধের মধ্যে একেবারে জড়িয়ে পড়েছে, এমন অনপনেয় অন্তর্দ্বন্দ্বে সে বিভক্ত যার নিরাকরণে সে অক্ষম, রাষ্ট্র তারই স্বীকৃতি। কিন্তু

* হেগেল, 'বিধির দর্শনের ভিত্তি', অনুচ্ছেদ ২৫৭ ও ৩৬০। — সম্পাঃ

এসব অন্তর্দ্বন্দ্ব, পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলি যাতে একে অন্যকে এবং সমাজকেও নিষ্ফলা সংগ্রামে গ্রাস করে না ফেলে, সেজন্য দরকার হল এমন একটি শক্তি যা আপাতদৃষ্টিতে সমাজের ঊর্ধ্বেই থেকে এই সংগ্রামকে সংযত করবে, একে 'শৃঙ্খলার' চৌহদ্দির মধ্যে সংযত রাখবে। এবং যে শক্তি সমাজ থেকে উদ্ভূত কিন্তু তার ঊর্ধ্বে স্বপ্রতিষ্ঠ এবং সমাজ থেকে ক্রমবিযুক্তমান, তা-ই রাষ্ট্র।

পুরাতন গোত্র সংগঠনের প্রতিপক্ষে রাষ্ট্র, প্রথমত, প্রজাদের **আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভাগ করে**। আমরা আগে দেখেছি যে, রক্তবন্ধনে প্রতিষ্ঠিত এবং সংহত পুরাতন গোত্রীয় সম্মিলনী বহুলাংশে অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল এজন্যে যে, এগুলির পূর্বশর্ত, এক নির্দিষ্ট অঞ্চলের সঙ্গে গোত্র সভ্যদের বন্ধন, অনেক আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ভূখন্ড স্থবিরই রইল কিন্তু জনগণ সচল হয়ে উঠল। তাই অঞ্চলভিত্তিক বিভাগই হল সূচনাবিন্দু এবং নাগরিকরা যেখানেই বসবাস করুক না কেন, গোত্র অথবা উপজাতি নির্বিশেষে সেখানেই তাদের সামাজিক অধিকার ও কর্তব্য তারা পালন করতে পারল। নাগরিকদের এমন অঞ্চলভিত্তিক সংগঠনই সমস্ত রাষ্ট্রের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এজন্যই এটি আমাদের কাছে স্বাভাবিক মনে হয়; কিন্তু আমরা দেখেছি যে, কত কঠোর ও দীর্ঘ সংগ্রামের পরে এথেন্স ও রোমে তা পুরাতন গোত্রভিত্তিক সংগঠনের স্থলবর্তী হতে পেরেছিল।

দ্বিতীয়ত, একটি **সরকারী ক্ষমতা** প্রতিষ্ঠা যা আর প্রত্যক্ষভাবে **সশস্ত্র** বাহিনী রূপে আত্মসংগঠনক্ষম জাতির সন্নিপাতী নয়। এই বিশেষ সরকারী ক্ষমতার প্রয়োজন ছিল, কারণ সমগ্র জনগণের স্বতঃকর্মক্ষম সৈন্যবাহিনী শ্রেণীবিভাগের সময় থেকে আর সম্ভব ছিল না। জনসংখ্যার মধ্যে ক্রীতদাসও ছিল; ৩,৬৫,০০০ ক্রীতদাসের প্রতিপক্ষে তখন এথেন্সের ৯০,০০০ নাগরিক শুধু একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী। এথেন্স গণতন্ত্রের গণফৌজ ছিল ক্রীতদাসের বিরুদ্ধে আভিজাত্যের সরকারী ক্ষমতা যা দাসদের সংযত রাখত; কিন্তু নাগরিকদেরও সংযত রাখার জন্য যে একটি পুলিস বাহিনীরও প্রয়োজন ছিল, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। প্রত্যেক রাষ্ট্রই এই সরকারী ক্ষমতার অধিকারী; এতে শুধুমাত্র সশস্ত্র লোক থাকে না, থাকে আরও নানা বৈষয়িক অনুষঙ্গ, জেলখানা ও বলপ্রয়োগের নানাবিধ প্রতিষ্ঠান, — যার কিছুই

গোত্রভিত্তিক সমাজে ছিল না। যেসব সমাজে শ্রেণীবিরোধ তখনও অপরিণত, সেখানে এবং বিচ্ছিন্ন কোনো কোনো এলাকায়, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোথাও মাঝে মাঝে এই সরকারী ক্ষমতা অতি নগণ্য, অলক্ষ্যপ্রায় হতে পারে। রাষ্ট্রের মধ্যে শ্রেণীবিরোধের তীব্রতা এবং সন্নিহিত রাষ্ট্রগুলির আয়তন ও জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতেই এর শক্তি বাড়ে। বর্তমান ইউরোপের দিকে তাকালেই তা দেখা যায়; এখানে শ্রেণীবিরোধ এবং দেশজয়ের প্রতিযোগিতা সরকারী ক্ষমতাকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছে যে এটি এখন সমগ্র সমাজ, এমন কি রাষ্ট্রকেও গ্রাস করার হুমকি হয়ে উঠেছে।

এই সরকারী ক্ষমতা বাঁচিয়ে রাখার জন্য নাগরিকদের চাঁদা বা **কর** প্রয়োজন। গোত্রসমাজে এসব একেবারে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু আজকের দিনে আমরা এর অস্তিত্ব হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এই কর অপ্রতুল হয়ে ওঠে; রাষ্ট্র তখন মেয়াদী হুণ্ডি চালু করে, ঋণ করে, **রাষ্ট্রীয় ঋণ**। বয়োবৃদ্ধা ইউরোপ থেকেও এ সম্পর্কে অনেক সাক্ষ্য পাওয়া সম্ভব।

সরকারী ক্ষমতা ও কর ধার্য করবার অধিকারের বলে এখন রাজকর্মচারীরা সমাজের সংস্থা হিসেবে সমাজের **ঊর্ধ্বে** উঠল। গোত্র প্রথার বিভিন্ন সংস্থা যে স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা পেত, এরা তা পেলেও তাতে আর তুষ্ট থাকত না; ক্রমেই সমাজের কাছে বিজাতীয় হয়ে ওঠা ক্ষমতার বাহন হিসেবে শ্রদ্ধা আদায়ের জন্য তাদের পক্ষে ব্যতিক্রমী আইনের আশ্রয় অপরিহার্য ছিল, যার বদৌলতে তারা বিশেষ পবিত্রতা ও অলঙ্ঘনীয়তার সুবিধা ভোগ করত। সভ্য রাষ্ট্রের সবচেয়ে আনাড়ী পুলিস কর্মচারীর 'কর্তৃত্ব'ও গোত্রসমাজের সমস্ত সংস্থার চেয়েও বেশি; কিন্তু সভ্যযুগে সর্বশক্তিমান রাজা এবং উচ্চাধিষ্ঠিত রাষ্ট্রনায়ক অথবা সেনাপতিও সেই নগণ্য গোত্র প্রধানের প্রতি ঈর্ষা বোধ করবে যে পীড়ন ব্যতিরেকেই অম্লান ও অবিসংবাদিত শ্রদ্ধা লাভ করত। শেষোক্তদের এক জন সমাজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, প্রথমোক্তরা এর বহিস্থ এবং ঊর্ধ্বস্থ কিছুর বাধ্যতামূলক প্রতিনিধিত্বে চেষ্টমান।

যেহেতু শ্রেণীবিরোধকে সংযত করবার প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব,

এবং যেহেতু এটি ঐ সংঘর্ষের মধ্যেই উৎপন্ন, সেজন্য এটি সাধারণত সবচেয়ে পরাক্রমশালী ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর রাষ্ট্র, যারা রাষ্ট্রের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আধিপত্যকারী শ্রেণী হয়ে ওঠে এবং ফলত নিপীড়িত শ্রেণীর দমন এবং তার শোষণে নতুন হাতিয়ার লাভ করে। এভাবে প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র ছিল সর্বোপরি ক্রীতদাস দমনের জন্য দাসমালিকদের রাষ্ট্র, যেমন সামন্ততন্ত্রী রাষ্ট্র ছিল ভূমিদাস ও পরাশ্রিত কৃষকদের বশে রাখার জন্য অভিজাতদের সংস্থা এবং আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র পুঁজি কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণের হাতিয়ার। ব্যতিক্রম হিসেবে অবশ্য এমন সময়ও আসে যখন সংগ্রামরত শ্রেণীগুলির ভারসাম্য এতই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে, রাষ্ট্রীয় শক্তি তখন বাহ্যিক মধ্যস্থ হিসেবে সাময়িকভাবে উভয় থেকেই আংশিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। ১৭শ এবং ১৮শ শতকের একচ্ছত্র রাজতন্ত্রই এর দৃষ্টান্ত যা আভিজাত্য ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করত; এই ছিল প্রথম ও ততোধিক দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের যুগে বোনাপার্টতন্ত্র, যা বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতকে এবং প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াকে লেলিয়ে দিত। এধরনের কেরামতির শেষ দৃষ্টান্ত বিস্মার্ক জাতির নতুন জার্মান সাম্রাজ্য যেখানে শাসক ও শাসিত উভয়েই সমান হাস্যকর: এখানে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের পারস্পরিক বিরোধে ভারসাম্য রক্ষিত এবং প্রাশিয়ার নিঃস্ব হয়ে পড়া মফঃস্বলী য়ুঙ্কারদের স্বার্থে উভয়েই সমান প্রতারিত।

ইতিহাসে জ্ঞাত অধিকাংশ রাষ্ট্রেই দেখা যায় যে, নাগরিকদের অধিকার ধনসম্পত্তির অনুপাতে নির্ণীত এবং এতে রাষ্ট্র যে বিত্তহীন শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিত্তশালী শ্রেণীর একটি আত্মরক্ষামূলক সংগঠন তা প্রত্যক্ষভাবে প্রকটিত হয়। এথেন্স ও রোমে সম্পত্তিভিত্তিক বর্গবিভাগে এটি সহজলক্ষ্য। মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রী রাষ্ট্রেও তাই ঘটেছে, সেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারা ছিল মালিকানাধীন জমির পরিমাণভিত্তিক। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রে ভোটাধিকার যোগ্যতার মধ্যেও এটি লক্ষণীয়। অথচ সম্পত্তিভেদের এই রাজনৈতিক স্বীকৃতি মোটেই অপরিহার্য নয়। বরং এটি রাষ্ট্র বিকাশের একটি নিম্নস্তরেরই বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রূপ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, আমাদের সমাজের আধুনিক অবস্থায় যে রূপটি ক্রমান্বয়ে অপরিহার্য হয়ে

উঠছে এবং কেবল যে রাষ্ট্ররূপের মধ্যেই শ্রমিক শ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর চূড়ান্ত সংগ্রামের নিষ্পত্তি সম্ভব, সেই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে আনুষ্ঠানিক সম্পত্তিভেদের ব্যাপারটি অনুক্ত। ধনের শক্তি এখানে পরোক্ষ, কিন্তু নিশ্চিততর: একদিকে সরকারী কর্মচারীদের সরাসরি হাত করে, যার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমেরিকা, অপরদিকে সরকার ও স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে রফা করে, যা রাষ্ট্রীয় ঋণবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং যত বেশি পরিমাণে স্টক এক্সচেঞ্জকে কেন্দ্র করে জয়েণ্ট স্টক নিজেদের হাতে যানবাহন ছাড়াও উৎপাদনেরই বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রীভূত করে, ততই এটি সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সাম্প্রতিকতম ফরাসী প্রজাতন্ত্র এর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত, এবং সুভদ্র সুইজারল্যাণ্ডেরও এক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ অবদান আছে। কিন্তু সরকার ও স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে এই সৌহার্দ্যের জন্য গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যে অপরিহার্য নয়, তার প্রমাণ ইংলণ্ড এবং তাছাড়া নতুন জার্মান সাম্রাজ্য, যেখানে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ফলে বিস্‌মার্ক না ব্লাইখ্‌রোডার বেশি বড় হয়েছে, তা বলা শক্ত। এবং সর্বশেষে, বিত্তশালী শ্রেণী সরাসরি সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে শাসন করে। যতদিন পর্যন্ত শোষিত শ্রেণী অর্থাৎ আমাদের ক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েত, নিজ মুক্তির জন্য পরিণত না হচ্ছে ততদিন এই শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য বর্তমান সমাজব্যবস্থাকেই একমাত্র সম্ভবপর ব্যবস্থা বলে মেনে নেবে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে পুঁজিপতি শ্রেণীর লেজুড়, এর চরম বামপন্থী অংশ হয়ে থাকবে। কিন্তু আত্মমুক্তির জন্য এই শ্রেণীর পরিণতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে এরা নিজেদের পার্টিতে সংঘবদ্ধ হয় এবং পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন না করে নিজ প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে। সর্বজনীন ভোটাধিকার শ্রমিক শ্রেণীর পরিপক্কতার মাপকাঠি। বর্তমান রাষ্ট্রে উন্নততর আর কিছু হতে পারে না, কদাচ হবেও না; কিন্তু এ-ই যথেষ্ট। যেদিন সর্বজনীন ভোটাধিকারের তাপমানযন্ত্রে শ্রমিকদের স্ফুটনাঙ্ক চিহ্নিত হবে সেদিন পুঁজিপতিদের মতো শ্রমিক শ্রেণীও নিজ কর্তব্য জানতে পারবে।

অতএব রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অনন্তকালীন নয়। এমন সমাজ ছিল যা রাষ্ট্র ছাড়াই চলত, যার রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কোনো ধারণাই ছিল না। অর্থনৈতিক বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে যখন সমাজে শ্রেণীবিভাগ অবধারিত, তখন এই বিভাগের জন্যই রাষ্ট্র অপরিহার্য হয়ে পড়ল। এখন

আমরা দ্রুত উৎপাদন বিকাশের এমন একটি স্তরে পৌঁছাচ্ছি যখন এসব শ্রেণীর অস্তিত্ব শুধু যে অপরিহার্য থাকবে না তাই নয়, পরন্তু এরা উৎপাদনের প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধ হয়েই উঠবে। পূর্ববর্তী স্তরে যেমন অনিবার্যভাবে শ্রেণীসমূহের উদ্ভব হয়েছিল, তেমনি এগুলির অনিবার্য পতন ঘটবে এবং পতন ঘটবে এগুলির আনুষাঙ্গিক রাষ্ট্রেরও। উৎপাদকদের স্বাধীন ও সমান সম্মিলনের ভিত্তিতে যে সমাজ উৎপাদনকে পুনর্গঠিত করবে, সে সমাজ সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে পাঠাবে তার যোগ্য স্থানে: পুরাদ্রব্য-সংগ্রহশালায়, চরকা ও ব্রোঞ্জ কুড়ুলের পাশে।

* * *

অতএব পূর্বালোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অপরিহার্য হয়ে ওঠে যে, সভ্যতা সমাজবিকাশের সেই স্তর যখন শ্রমবিভাগ, তজ্জনিত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিনিময় এবং উভয়টির সংযোগকারী পণ্যোৎপাদন উন্নতির শিখরে উঠে পূর্বতন সমগ্র সমাজে আমূল রূপান্তর ঘটায়।

সমাজবিকাশের পূর্ববর্তী সকল স্তরে উৎপাদন ছিল বস্তুত সমষ্টিগত এবং তদনুরূপ ভোগদখলও ছিল সাম্যতন্ত্রী বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীর মধ্যে উৎপন্নের প্রত্যক্ষ বণ্টনভিত্তিক। এই সমষ্টিগত উৎপাদনের আত্যন্তিক সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধতা সত্ত্বেও উৎপাদকরা তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং উৎপন্নের মালিক ছিল। তারা উৎপন্নের ভবিতব্য জানত: নিজেরাই উৎপন্ন ভোগ করত, এগুলি তাদের হাতছাড়া হত না, এবং যতদিন উৎপাদন এই ভিত্তিতে চলে, ততদিন তা উৎপাদকদের নিয়ন্ত্রণাতীত হতে পারে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো বিজাতীয় ভৌতিক শক্তিও দাঁড় করাতে পারে না, যা সভ্যযুগের নিয়মিত এবং অনিবার্য ঘটনা।

কিন্তু ধীরে ধীরে উৎপাদনের এই প্রক্রিয়ায় শ্রমবিভাগের অনুপ্রবেশ ঘটল। এতে উৎপাদন ও ভোগদখলের সমষ্টিগত চারিত্র্য ক্ষুণ্ন হল, ব্যক্তিগত দখলই প্রাধান্য লাভ করল এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময়ের উদ্ভব হল, যার উদ্ভবপ্রক্রিয়া আমরা আগেই দেখেছি। ক্রমশ পণ্যোৎপাদনেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পণ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন আর নিজ ভোগের জন্য নয় বিনিময়েরই জন্য এবং উৎপন্ন দ্রব্য প্রয়োজনমতো হস্তান্তরযোগ্য পণ্য হয়ে ওঠে। বিনিময়ে উৎপন্নের সঙ্গে উৎপাদকের বিচ্ছেদ ঘটে; অতঃপর এর কী ঘটল তা আর তার জানা হয় না। যখনই অর্থ ও সেসঙ্গে বণিক উৎপাদকদের মধ্যে মধ্যস্থের ভূমিকাসীন হল, তখন বিনিময় প্রক্রিয়া জটিলতর এবং উৎপন্নের শেষ ভবিতব্য অনিশ্চিততর হয়ে উঠল। বণিকরা বহুসংখ্যক এবং তারা পরস্পরের কাজ সম্পর্কে অজ্ঞ। পণ্য এখন শুধু হস্তান্তরিতই হয় না অধিকন্তু বাজার থেকে বাজারেও ঘোরে; উৎপাদকরা নিজ জীবনযাত্রার মোট উৎপাদনের উপর আধিপত্য হারিয়ে ফেলে এবং বণিকরাও তা আয়ত্ত করতে পারে না। উৎপন্ন এবং উৎপাদন আপাতিকতার ক্রীড়নকে পর্যবসিত হয়।

কিন্তু আপতিকতা এই পারম্পর্যের একটি মেরুমাত্র, এর অপর মেরুকে আবশ্যিকতা বলা হয়। প্রকৃতিতে আপাতদৃষ্ট আপতিকতার আধিপত্য যে প্রতি ক্ষেত্রেই অন্তর্নিহিত আবশ্যিকতা ও নিয়মেরই প্রকাশ তা বহু আগেই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতি সম্পর্কে যা সত্য তা সমাজ সম্পর্কেও মিথ্যা নয়। কোনো এক সামাজিক কর্মকান্ড, একপ্রস্ত সামাজিক প্রক্রিয়া যতই সচেতন মানবিক নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে যায়, এদের ক্ষমতাবহিস্থ হয়, যতই এগুলিকে নিছক আপতিকতার আওতাভুক্ত মনে হয়, ততই তার বিশিষ্ট অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি এই আপতিকতার গন্ডী ভেদ করে প্রাকৃতিক আবশ্যিকতায় নিজের পথ তৈরি করে নেয়। পণ্যোৎপাদন ও পণ্যবিনিময়ের সমস্ত আপতিকতাও এধরনের নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত: আলাদা আলাদা উৎপাদক ও বিনিময়কারীর সামনে এই নিয়মাবলি বিজাতীয় এবং প্রথমে অজ্ঞাত শক্তিরূপেই দেখা দেয় যেগুলির প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন ও অনুধাবন আবশ্যকীয়। উৎপাদনের এই ধরনের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে পণ্যোৎপাদনের অর্থনৈতিক নিয়মাবলি পরিবর্তিত হয়; কিন্তু সামগ্রিকভাবে সভ্যতার সমস্ত যুগটাই এসব নিয়মের অধীন। আজও উৎপন্নই উৎপাদকদের প্রভু; আজও সমাজের সমগ্র উৎপাদন সমষ্টিগতভাবে তৈরি কোনো পরিকল্পনায় নিয়ন্ত্রিত হয় না, তা অন্ধ নিয়মাবলির অধীন যেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিতে এবং শেষ মীমাংসায় পর্যায়ক্রমিক বাণিজ্য সংকটে প্রকটিত হয়।

কীভাবে মানুষের শ্রমশক্তি উৎপাদন বিকাশের প্রথম সূচনাতেই উৎপাদকের জীবনধারণের প্রয়োজনের বহুগুণ বেশি উৎপাদনে সক্ষম হয়ে ওঠে এবং যে মূলত বিকাশের এই স্তরটিতে শ্রমবিভাগ এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিনিময়ের আবির্ভাব হয়, তা আমরা দেখেছি। অতঃপর এই মহৎ 'সত্য' আবিষ্কারে খুব বেশি দেরী হল না যে, মানুষও একটি পণ্য হয়ে উঠতে পারে: মানুষকে দাসে পরিণত করে মনুষ্যশক্তির বিনিময় ও ভোগ সম্ভব। বিনিময় শুরু করতে না করতেই মানুষ নিজেই বিনিময় বস্তুতে পর্যবসিত হল। কর্তা কর্ম হয়ে উঠল, মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নির্বিশেষে।

সভ্যযুগে সর্বাধিক বিকাশপ্রাপ্ত দাস প্রথার প্রথম উন্মেষ থেকেই শোষক ও শোষিতে সমাজের শ্রেণীভেদ ঘটে। এই বিভেদ পুরো সভ্যযুগ জুড়েই অব্যাহত রয়েছে। শোষণের প্রথম রূপ দাস প্রথা প্রাচীন জগতের বৈশিষ্ট্য; এর পরবর্তী: মধ্যযুগে ভূমিদাস প্রথা এবং আধুনিক যুগের মজুরি-শ্রম। এগুলিই সভ্যতার তিনটি মহৎ যুগের বৈশিষ্ট্যসূচক পরাধীনতার তিনটি মহৎ রূপ; সম্প্রতিকালে ছদ্মবেশী হলেও অনাবৃত দাসত্বই এর নিত্যসঙ্গী।

সভ্যতার সূত্রপাত পণ্যোৎপাদনের যে স্তরে তার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হল: ১) ধাতব মুদ্রা এবং আনুষঙ্গিক আর্থিক মূলধন, সুদ ও তেজারতির প্রবর্তন; ২) উৎপাদকদের মধ্যস্থ রূপে বণিকের অভ্যুদয়; ৩) জমির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং বন্ধকী প্রথার উদ্ভব এবং ৪) উৎপাদনের প্রধান রূপ হিসেবে দাসশ্রমের প্রচলন। সভ্যতার অনুষঙ্গী ও এই আমলে সুপ্রতিষ্ঠ পরিবারের নতুন রূপ — একগামিতার প্রাধান্যের চূড়ান্ত অধিষ্ঠান, নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য, সমাজের অর্থনৈতিক একক হিসেবে একক পরিবার। সভ্য সমাজে রাষ্ট্রই সমাজকে সংহত রাখে এবং প্রত্যেকটি বিশিষ্ট পর্বেই এটি একমাত্র শাসক শ্রেণীরই রাষ্ট্র এবং সকল ক্ষেত্রেই তা হল মূলত শোষিত, নিপীড়িত শ্রেণী দমনের যন্ত্র। সভ্যতার অন্যতর লক্ষ্য: একদিকে, সমাজের সমগ্র শ্রমবিভাগের ভিত্তি হিসেবে শহর ও গ্রামের বৈপরীত্যের সুপ্রতিষ্ঠা; অপরদিকে, উইল প্রচলন মাধ্যমে সম্পত্তি মালিককে এমন কি মৃত্যুর পরও তার বিষয়-আশয় নিয়ন্ত্রণের অধিকার দান। এই প্রথা পুরাতন গোত্র প্রথার প্রত্যক্ষ বিরোধী; এই প্রথা সলোনের আগে পর্যন্ত এথেন্সে অজ্ঞাত ছিল; রোমে প্রথাটি একেবারে শুরুতেই দেখা দেয়, কিন্তু ঠিক কোন সময় তা আমরা

জানি না;* জার্মানদের মধ্যে পুরোহিতরা এই ব্যবস্থাটি এই উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করে যাতে সুভদ্র জার্মান বিনা বাধায় গির্জার নামে নিজ সম্পত্তি দান করতে পারে।

এই ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত সভ্যতা যেসব কাজ করেছে, পুরাতন গোত্র সমাজের পক্ষে তা কোনোদিনই সম্ভবপর হত না। কিন্তু এজন্য মানুষের ঘৃণ্যতম প্রবৃত্তি ও আবেগগুলিকে সক্রিয় করে এবং অন্য সব গুণ খর্বিত করে এগুলিকেই বিকশিত করা হয়েছে। সভ্যতার প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত নগ্ন লোভই তার চালিকা শক্তি; ধনদৌলত, আরও ধনদৌলত, আরও বেশি ধনদৌলত, সামাজিক নয়, কুৎসিৎ ব্যক্তিগত ধনদৌলতই তার একমাত্র নির্ধারক লক্ষ্য। যদি এই লক্ষ্যসাধনের পথে তার ভাগ্যে বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ এবং পুনঃপুনঃ চারুকলার পূর্ণতম স্ফুটনের যুগ এসেও থাকে, তাহলে তার একমাত্র কারণ এই যে, ঐগুলি ছাড়া ধনসঞ্চয়ের আধুনিক বিরাট কৃতিত্ব অসম্ভব হত।

যেহেতু এক শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর শোষণই সভ্যতার ভিত্তি, সেজন্য এর সমগ্র বিকাশ অবিরাম বিরোধ-কণ্টকিত। উৎপাদনের প্রত্যেকটি অগ্রপদক্ষেপমাত্রেই একই সঙ্গে নিপীড়িত শ্রেণী অর্থাৎ বিরাট সংখ্যাধিক্যের অবস্থার পশ্চাদ্‌গতির সঙ্গে অন্বিত। একজনের পক্ষে যাই আশীর্বাদ অপরের পক্ষে তাই অনিবার্য অভিশাপ, একটি শ্রেণীর প্রতিটি নতুন মুক্তির অর্থই অপর এক শ্রেণীর উপর নতুন উৎপীড়ন। এর সবচেয়ে চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত

* লাসাল রচিত 'অর্জিত অধিকারসমূহের প্রণালী'র দ্বিতীয় খণ্ডে প্রধানত এই প্রতিপাদ্য ধরা হয়েছে যে, রোম উইল রোমের মতোই পুরানো, রোমের ইতিহাসে কখনও 'এমন সময় ছিল না যখন উইল ছিল না', রোমপূর্ব যুগে প্রেতাচার থেকেই উইলের উদ্ভব। সাবেকী ধারার গোঁড়া হেগেলবাদী হওয়ায় লাসাল রোমানদের সামাজিক সম্পর্ক থেকে রোমান আইনের ধারাগুলির উদ্ভব নির্ণয় করেন নি, করেছেন তার 'কাল্পনিক প্রত্যয়' থেকে এবং তদ্দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ উপরোক্ত উক্তিতে পৌঁছেছেন। যে পুস্তকেই ঐ একই কাল্পনিক ধারণা থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, সম্পত্তির হস্তান্তর রোমানদের উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় একটি নিতান্ত গৌণ ব্যাপার, তার লেখকের পক্ষে এটা আশ্চর্যের কিছু নয়। লাসাল যে শুধু রোমান আইনজ্ঞদের, বিশেষত আদিযুগীয়দের মোহগুলি বিশ্বাস করেন তাই নয়, তাদেরও ছাড়িয়ে গেছেন। (এঙ্গেলসের টীকা।)

যন্ত্রপাতির প্রচলন, যার পরিণাম আজ সুবিদিত। এবং বর্বরদের মধ্যে অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য যেখানে ছিল না, যা আমরা দেখেছি, সেক্ষেত্রে একটি শ্রেণীকে প্রায় সব অধিকার দিয়ে এবং অপর শ্রেণীর ঘাড়ে প্রায় সব কর্তব্যের বোঝা চাপিয়ে সভ্যযুগে এদের পার্থক্য ও বিচ্ছেদ নির্বোধ লোকের কাছেও সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

কিন্তু এমনটি হওয়া অনুচিত। শাসক শ্রেণীর পক্ষে যা ভাল তা সমগ্র সমাজের পক্ষেও ভাল হওয়া উচিত, কারণ শাসক শ্রেণী সমাজের সঙ্গে নিজেদের অবিচ্ছেদ্য মনে করে। অতএব সভ্যতা যতই অগ্রসর হয় ততই অনিবার্যরূপে সৃষ্ট নিজ নেতিবাচকতাগুলিকে প্রেমের আবরণে ঢাকতে, বার্নিশ করতে অথবা এগুলির অস্তিত্বই অস্বীকার করতে সভ্যতা বাধ্য; সংক্ষেপে, প্রচলিত ভণ্ডামি যা সমাজের পূর্ববর্তী স্তরগুলিতে, এমন কি সভ্যতার সূচনাতেও অজ্ঞাত ছিল, সভ্যতা তাই প্রবর্তন করে, এবং শেষত, নিঃসন্দেহে ঘোষণা যার চূড়ান্ত নজির: শোষক শ্রেণী নিপীড়িত শ্রেণীকে শোষণ করে নিতান্ত ও শুধুমাত্র শোষিত শ্রেণীরই স্বার্থে; যদি শোষিত শ্রেণী এটি বুঝতে না পারে এবং এমন কি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তাহলে এতে উপকারী অর্থাৎ শোষকদের প্রতি নিতান্ত হীন কৃতঘ্নতাই প্রকাশিত হয়।*

এবং এখন উপসংহারে সভ্যতা সম্পর্কে মর্গানের মন্তব্য:

'সভ্যতার উদ্ভবে সম্পত্তির অতিবৃদ্ধি এত বিপুল, এর রূপগুলি এত বিচিত্র, এর প্রয়োগ এতই দূরপ্রসারী এবং মালিকদের স্বার্থে এর পরিচালনা এতই কৌশলকীর্ণ যে, এটা গণবিরোধী এক অনতিক্রম্য শক্তি হয়ে উঠেছে। মানবচিত্ত তার নিজ সৃষ্টির সামনে

* প্রথমে আমি চেয়েছিলাম শার্ল ফুরিয়ে'র রচনায় সভ্যতার যে চমৎকার সমালোচনা নিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, সেটিকে মর্গান ও আমার সমালোচনার পাশাপাশি উল্লেখ করব। দুঃখের কথা, এই কাজ করার মতো যথেষ্ট সময় নেই। কেবল এটুকুমাত্রই আমি মন্তব্য করতে চাই যে, ইতিপূর্বেই ফুরিয়ে একগামিতা ও জমির ব্যক্তিগত মালিকানাকে সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে সনাক্ত করেন এবং তাকে তিনি দরিদ্রের বিরুদ্ধে ধনীর লড়াই বলে উল্লেখ করেন। তাঁর রচনায় আরও দেখি, তিনি ইতিমধ্যেই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, পরস্পরবিরোধে জর্জরিত সকল অপরিণত সমাজেই এক-একটি পরিবারই (les familles incohérentes) অর্থনৈতিক একক। (এঙ্গেলসের টীকা।)

আজ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাহলেও এমন সময় আসবে যখন মানববুদ্ধি এই সম্পত্তির উপর আধিপত্য করার পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবে এবং রাষ্ট্র যে সম্পত্তি রক্ষা করছে তার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধ তথা মালিকদের অধিকার ও দায়িত্বের সীমানা নির্দেশ করবে। সমাজের স্বার্থ ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের ঊর্ধ্বে এবং এগুলির মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। শুধুমাত্র সম্পত্তিশিকারই মানুষের চরম ভবিতব্য নয়, অবশ্য যদি অতীতের মতো ভবিষ্যতও প্রগতির নিয়মানুসারী হয়। সভ্যতার সূচনা থেকে অদ্যাবধি অতিক্রান্ত সময় মানবজাতির অতীত অস্তিত্বের তথা তার আসন্ন যুগেরও একটি ভগ্নাংশমাত্র। সম্পত্তি আহরণ যার একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সেই পর্বের পতনে সমাজের বিলুপ্তিও অবধারিত, কারণ এই পর্বের মধ্যেই নিহিত তার আত্মধ্বংসের বীজ। পরিচালনব্যবস্থায় গণতন্ত্র, সমাজের অন্তর্গত ভ্রাতৃত্ব, অধিকার ও সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য, এবং সর্বজনীন শিক্ষা সমাজের পরবর্তী উচ্চতর স্তরটিকে আশীর্বাদপূত করে যেদিকে মানুষের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও জ্ঞান অবিচলিতভাবে অগ্রসরমান। **এ হলে প্রাচীন গোত্রগুলির মুক্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের এক উচ্চতর পুনরুজ্জীবন'** (মর্গান, 'প্রাচীন সমাজ', ৫৫২ পৃঃ)।

১৮৮৪ সালের মার্চ মাসের শেষ থেকে ২৬ মে তারিখের মধ্যে লিখিত

১৮৮৪ সালে জুরিখে পৃথক পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত

চতুর্থ জার্মান সংস্করণ (১৮৯১)-এর পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত

মূল রচনা জার্মান ভাষায়

টীকা

(১) **'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'** — মার্কসবাদের অন্যতম মৌলিক রচনা। এই রচনায় মানবজাতির বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়গুলোতে মানবজাতির ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে; আদি গোষ্ঠীগত সমাজের পতনের প্রক্রিয়া এবং ব্যক্তিগত মালিকানার উপর স্থাপিত শ্রেণীগত সমাজের গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে; এই সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো দেখানো হয়েছে; ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পারিবারিক সম্পর্কের বিকাশের বিশেষত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে; রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও সারমর্ম আবিষ্কৃত হয়েছে এবং শ্রেণীহীন সাম্যতন্ত্রী সমাজের চূড়ান্ত বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রের বিলোপের ঐতিহাসিক অনিবার্যতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। পৃঃ ৭

(২) *Contemporanul* ('সমসাময়িক পত্রিকা') — সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার রুমানিয়ার পত্রিকা। ১৮৮১-১৮৯০ সালে ইয়াস্‌সি শহরে প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১১

(৩) **ট্রয় যুদ্ধ** — হোমারের 'ইলিয়ড' ও 'অডিসি' রচনাদ্বয় অনুযায়ী ট্রয়ের বিরুদ্ধে মাইসিনি-র রাজা আগামেম্নোনের নেতৃত্বে আখেইয়ার রাজাদের জোটের ১০ বছর ব্যাপী যুদ্ধ। আখেইয়ার যোদ্ধারা ট্রয় দখল করে। ট্রয় শহর জায়গা খনন করার ফলে জানা গেছে যে আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১২৬০ সালে শহরটি বহুদিনের অবরোধে বিধ্বস্ত হয়, তাই গ্রীক উপকথার তথ্য প্রমাণিত হয়েছে। পৃঃ ১৩

(৪) এঙ্গেলস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় সফর করেন ১৮৮৮ সালের অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে। পৃঃ ২২

(৫) **পুয়েব্লো** — উত্তর আমেরিকার এক ইন্ডিয়ান উপজাতি গোষ্ঠীর নাম; বসবাস করত নিউ মেক্সিকোর এলাকায় (বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম ও মেক্সিকোর উত্তরাংশ) এবং একই ইতিহাস ও সংস্কৃতির বন্ধনে মিলিত ছিল।

তাদের গ্রামগুলির বিশেষ চরিত্র দেখে স্পেনীয় শব্দ pueblo (জন, বসত, গোষ্ঠী) থেকে আসা এই নামটা তাদের দেয় বিজয়ী স্পেনীয়রা। এইসব গ্রামগুলি ছিল পাঁচ-ছয় তলার বড় বড় সাধারণ গৃহকেল্লার মতো, তাতে বাস করত হাজার খানেক লোক; এইসব উপজাতিদের বসত সম্বন্ধেও কথাটা প্রযুক্ত হত।
পৃঃ ২৮

(৬) মার্কসের এই পত্রটি নিখোঁজ। পৃঃ ৪১

(৭) স্ক্যান্ডিনেভিয়ার লোকগাথা 'এড্ডা' এবং জার্মান লোকগাথা 'নিবেলুং গাথা' অবলম্বনে সুরকার রিখার্ড ভাগনারকৃত ওপেরার নাট্যলিপি উল্লিখিত।
পৃঃ ৪১

(৮) **'এড্ডা'** এবং **'ওগিসড্রেকা'** — স্ক্যান্ডিনেভিয়ার জাতিগুলির পুরাকথা ও বীরগাথার সঙ্কলন। পৃঃ ৪১

(৯) **আস'রা** এবং **ভান'রা** — স্ক্যান্ডিনেভিয়ার পুরাকথার দুই দেবসম্প্রদায়।

'ইংলিঙ্গা সাগা' — নরওয়ের রাজাদের নিয়ে ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত এবং আইসল্যান্ড ও নরওয়ের গোত্রীয় গাথাগুলির ভিত্তিতে ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে সঙ্কলিত মধ্যযুগীয় আইসল্যান্ড কবি ও ইতিবৃত্ত লেখক স্নরি স্টুর্লুসনের 'পার্থিব চক্র' ('Heimskringla') বইটির প্রথম গাথা। পৃঃ ৪১

(১০) অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ উপজাতিই যে বিবাহ-শ্রেণী বা উপদলে বিভক্ত ছিল, এখানে তাই উল্লিখিত। প্রত্যেকটি দলের পুরুষ নির্দিষ্ট অন্য এক দলের নারীকেই কেবল বিবাহ করতে পারত; প্রতিটি উপজাতিতে এমন ৪ থেকে ৮টি দল ছিল।
পৃঃ ৪৬

(১১) **স্যাটার্ন উৎসব** — শনি (স্যাটার্ন) দেবতার সম্মানে প্রাচীন রোমে কৃষি কাজের সমাপ্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উৎসব। স্যাটার্ন উৎসবের দিন অবাধ যৌনসঙ্গমের রেওয়াজও ছিল। ফলত 'স্যাটার্ন উৎসবে' উদ্দাম খানাপিনা ও মাতলামির অর্থ প্রযুক্ত। পৃঃ ৫৫

(১২) ক্যাটালনিয়ার কৃষক বিদ্রোহের চাপে স্পেনের রাজা পঞ্চম ফার্ডিন্যান্ড ক্যাথলিক ১৪৮৬ সালের ২১ এপ্রিল আপোস মীমাংসায় বাধ্য হন; তখন রাজা বিদ্রোহী কৃষক ও সামন্তদের মধ্যস্থতা করেন। মীমাংসানুযায়ী জমির সঙ্গে কৃষকদের আবদ্ধ করার প্রথা তুলে দেওয়া এবং কৃষকদের কাছে অতি ঘৃণ্য সামন্তদের একাধিক বিশেষ সুযোগসুবিধা, যথা প্রথম রাত্রি যাপনের অধিকার, বাতিল করা হয়; তবে সেজন্য কৃষকরা মোটা টাকার দণ্ড দিতে বাধ্য ছিল। পৃঃ ৫৮

(১৩) **ইয়ারোস্লাভের 'প্রাভদা'** — প্রাচীন রুশদেশে সমকালীন সাধারণ বিধির ভিত্তিতে

১১-১২শ শতকে উদ্ভূত তৎকালীন সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের অভিব্যক্তি — 'রুস্কায়া প্রাভ্দা' (রুশী ন্যায়) নামক তখনকার রাশিয়ার প্রাচীনতম আইনসংহিতার প্রথম ভাগ।

ডাল্মেশীয় আইনবিধি —১৫-১৭শ শতকে ডাল্মেশিয়ার এক অংশ পোলিসায় প্রচলিত আইনসংকলন, পোলিসার বিধি (statut) নামে তা পরিচিত। পৃঃ ৬৫

(১৪) Calpullis — স্পেন কর্তৃক বিজিত হবার সময় মেক্সিকোর পারিবারিক গোষ্ঠী (কালপুলি); কালপুলি'র সব সদস্য একই পরিবারভুক্ত ছিল, প্রতি কালপুলি'র জমিও ছিল যৌথ মালিকানাধীন এবং তা উত্তরাধিকারীদের বিভাজ্য ছিল না। পৃঃ ৬৬

(১৫) *Das Ausland* ('ভিন্নদেশ') — ভূগোল, নৃকুলবিদ্যা ও প্রকৃতিবিদ্যা সম্পর্কিত জার্মান সাপ্তাহিক। ১৮২৮ সাল থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত। ১৮৭৩ সাল থেকে স্টুট্গার্ট থেকে প্রকাশিত হত। পৃঃ ৬৬

(১৬) ১৮০৪ সালে প্রথম নেপোলিয়নের রাজত্বকালে অনুমোদিত 'Code Civil' (নাগরিক আইন)-এর ২৩০ অনুচ্ছেদের কথা উল্লিখিত। পৃঃ ৬৮

(১৭) **স্পার্টাবাসীরা** — প্রাচীন স্পার্টার পূর্ণ স্বাধিকারসম্পন্ন নাগরিক।
হেলোট — প্রাচীন স্পার্টার অধিকারবিহীন অধিবাসী; এরা জমির সঙ্গে আবদ্ধ ছিল এবং ভূস্বামী-স্পার্টাবাসীদের কাছে এদের নির্দিষ্ট দায়দায়িত্ব থাকত। পৃঃ ৭০

(১৮) **হায়েরোডুল** — প্রাচীন গ্রীস ও তার উপনিবেশে মন্দিরের দাস বা দাসী। বহু অঞ্চলে বিশেষত নিকট এশিয়া ও করিন্থ শহরে মহিলা হায়েরোডুলরা মন্দিরমহলে গণিকাবৃত্তি করত। পৃঃ ৭৩

(১৯) **'গুড্রুন'** — ত্রয়োদশ শতকের মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য। পৃঃ ৮৫

(২০) **ধর্মসংস্কার আন্দোলন** (রিফর্মেশন) — ১৬শ শতকে জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সম্প্রসারিত ক্যাথলিক গির্জার বিরোধী ব্যাপক ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলন। রিফর্মেশনের বিজয়ের ধর্মীয় ফলাফল হিসেবে ইংলন্ড, স্কটল্যান্ড, নেদার্ল্যান্ডস্, জার্মানির একাংশ এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোতে কয়েকটি নতুন তথাকথিত প্রটেস্টান্ট গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

লুথার ও কালভাঁ হলেন রিফর্মেশনের দুই তাত্ত্বিক। পৃঃ ৮৭

(২১) ১৫১৯-১৫২১ সালে স্পেনের কন্‌কিস্টাডর কর্তৃক মেক্সিকো বিজয়ের কথা বলা হচ্ছে এখানে। পৃঃ ৯৯

(২২) **'নিরপেক্ষ উপজাতি'** — এরি হ্রদের উত্তর উপকূলের বাসিন্দা ইরকোয়াসদের সমগোত্রীয় কয়েকটি উপজাতির সামরিক জোটকে ১৭শ শতকে এই নাম দেওয়া হয়েছিল। নামটি ফরাসী উপনিবেশিকদের দেওয়া; কারণ, স্বয়ং ইরকোয়াস ও গুরোঁ উপজাতিদুটির মধ্যে যুদ্ধ বাধলে উপরোক্ত জাতিগুলি কারও পক্ষ নিত না। পৃঃ ১০৭

(২৩) ব্রিটিশ উপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে ১৮৭৯-১৮৮৭ সালে জুলু ও নুবিয়ানদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের কথা এখানে উল্লিখিত।

মুসলমান যাজক মোহম্মদ-আহমদের নেতৃত্বে নুবিয়ান, আরব ও সুদানের অন্যান্য অধিজাতির জাতীয় মুক্তিবিদ্রোহ শুরু হয় ১৮৮১ সালে। বিদ্রোহ চলাকালে একটা স্বতন্ত্র কেন্দ্রীভূত 'মেহেদি' রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। কেবল ১৮৯৯ সালেই ব্রিটিশরা সুদান জয় করতে সমর্থ হয়। পৃঃ ১০৭

(২৪) অ্যাটিকায় স্থায়ী বসবাসকারী তথাকথিত মিটেকদের (দেশান্তরী) কথা উল্লিখিত। স্বাধীন হলেও এথেন্সের নাগরিকের অধিকার তাদের ছিল না। এরা প্রধানত কুটিরশিল্পী ও বণিক ছিল, বিশেষ কর দিতে বাধ্য ছিল এবং পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত নাগরিকদের মধ্যে তাদের 'পৃষ্ঠপোষক' থাকা প্রয়োজন ছিল; শেষোক্তদের মাধ্যমে তারা শাসক সংস্থায় আবেদন করতে পারত। পৃঃ ১২৮

(২৫) **বারো ফলকের আইন** — রোমের আইনবিধির প্রাচীনতম নিদর্শন। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি অভিজাতদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সংগ্রামের ফলে নির্ণীত আইনটি রীতিভিত্তিক আইনের পরিবর্তে প্রবর্তিত হয়; আইনটিতে রোম সমাজে মালিকানাভিত্তিক প্রকারভেদ, দাস প্রথার বিকাশ ও দাস প্রথাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া প্রকটিত। আইনটি ১২টি ফলকে লিপিবদ্ধ ছিল। পৃঃ ১৩৩

(২৬) **দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ** (খৃঃ পূঃ ২১৮-২০১) — পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন, নতুন নতুন এলাকা দখল ও ক্রীতদাস আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে প্রাচীনকালের দুটি বৃহত্তম দাস প্রথাভিত্তিক রাষ্ট্র — রোম ও কার্থেজের — মধ্যে যেসব যুদ্ধ বাধে, সেগুলির অন্যতম। যুদ্ধটির অবসান ঘটে কার্থেজের পরাজয়ে। পৃঃ ১৩৪

(২৭) ইংরেজ কর্তৃক ওয়েল্‌স্‌ বিজয় ১২৮৩ সালে সমাপ্ত হয়। তবু তারপরও

ওয়েল্‌সের স্বায়ত্তশাসন বজায় থাকে; ১৬শ শতকের মাঝামাঝি তা পুরোপুরি ইংলন্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। পৃঃ ১৪৪

(২৮) ১৮৬৯-১৮৭০ সালে আয়ার্ল্যান্ডের ইতিহাস সম্পর্কে বড় একটি রচনা নিয়ে এঙ্গেলস কাজ করেন; রচনাটি সমাপ্ত হয় নি। কেল্ট ইতিহাস অধ্যয়নকালে তিনি প্রাচীন ওয়েল্‌সের আইন নিয়েও গবেষণা করেন। পৃঃ ১৪৫

(২৯) ১৮৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এঙ্গেলস স্কটল্যান্ড ও আয়ার্ল্যান্ড পরিভ্রমণ করেছিলেন। পৃঃ ১৪৭

(৩০) নিপীড়ন ও জমিচ্যুত করার বিরুদ্ধে স্কটল্যান্ডের মালভূমির ক্ল্যানগুলি ১৭৪৫-১৭৪৬ সালে বিদ্রোহ করে। ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ডের অভিজাত ও বুর্জোয়াদের স্বার্থে জমি বেদখল করা হয়। পার্বত্য সম্প্রদায় প্রাচীন গোত্র প্রথা সংরক্ষণের জন্য সংগ্রাম করে। বিদ্রোহ দমনের ফলে স্কটল্যান্ডের মালভূমিতে ক্ল্যান প্রথা ভেঙে দেওয়া, গোত্রীয় জমি মালিকানার অবশেষ বিলুপ্ত করা, জমি থেকে স্কটিশ চাষীদের বিতাড়ন প্রক্রিয়া জোরালো করা এবং কোনো কোনো গোত্রীয় রীতিনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। পৃঃ ১৪৮

(৩১) **'আলেমান ন্যায়'** — এখনকার অ্যালসেস, অধুনা পূর্ব সুইজারল্যান্ড ও দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানিতে পঞ্চম শতক থেকে বসবাসকারী জার্মান আলেমান (আলামান) উপজাতিগুলির সঙ্ঘের রীতিগত আইনসংকলন। আইনটি ষষ্ঠ শতকের শেষ, সপ্তম শতকের আরম্ভ ও অষ্টম শতকেও চালু ছিল। এঙ্গেলস এখানে 'আলেমান ন্যায়'এর ৮১ম (৮৪ম) আইনের কথা উল্লেখ করেছেন। পৃঃ ১৪৯

(৩২) **'হিল্‌ডেব্রান্ডের গাথা'** — বীরকাব্য, অষ্টম শতকের প্রাচীন জার্মান গদ্যের নিদর্শন। এর অংশবিশেষই শুধু অবশিষ্ট রয়েছে। পৃঃ ১৫০

(৩৩) **অ্যার্গোনটরা** — গ্রীক পুরাকথার বীররা যারা 'অ্যার্গো' নামে জাহাজে করে স্বর্ণ-মেষচর্মের জন্য কলখিদায় গমন করেন। পৃঃ ১৫১

(৩৪) রোম রাজের বিরুদ্ধে ৬৯-৭০ সালে (মতান্তরে ৬৯-৭১ সালে) সিভিলিসের পরিচালনায় জার্মান ও গলের উপজাতিগুলির বিদ্রোহ গল প্রদেশের প্রধান অংশ ও রোমের অধীনস্থ জার্মান এলাকাগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল; এসব অঞ্চল রোমের হাতছাড়া হবার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিল। প্রথম দিকের সাফল্যাদির পর বিদ্রোহীরা কয়েকটি পরাজয় স্বীকার ক'রে রোমের সঙ্গে সন্ধি সম্পাদনে বাধ্য হয়। পৃঃ ১৫৩

(৩৫) 'Codex Laureshamensis' ('লর্শের কোড-সঙ্কলন') লর্শ মঠের প্রদত্ত পুরস্কারপত্র ও সুবিধাদির নকলসমূহের সঙ্কলন। দ্বাদশ শতকে তৈরি সঙ্কলনটি ৮-৯ম শতকে কৃষক ও সামন্ত জমি মালিকানার ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। পৃঃ ১৩৬

(৩৬) **জার্মান জাতির পবিত্র রোম সাম্রাজ্য** — ৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত মধ্য যুগের সাম্রাজ্য, জার্মানির ভূখণ্ড ও ইতালির একাংশ যার অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীকালে কোনো কোনো ফরাসী ভূখণ্ড, চেক, অস্ট্রিয়া, নেদার্ল্যাণ্ডস্ ও অন্যান্য দেশও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাম্রাজ্য কেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্র ছিল না। তা ছিল সম্রাটের কর্তৃত্ব মেনে-নেওয়া সামন্ত রাজত্ব ও স্বাধীন শহরগুলোর দুর্বল সম্মিলন। ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হাপ্‌সবুর্গ বংশ পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটের উপাধি ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার পর ১৮০৬ সালে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। পৃঃ ১৬৫

(৩৭) **বেনেফিসিয়াম** (beneficium — আক্ষরিক অর্থ 'মঙ্গলসাধন') — জমি প্রদানের প্রথা। অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে ফ্রাঙ্ক রাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বেনেফিসিয়াম রূপে আবদ্ধ চাষী সহ জমি দেওয়া হত এবং গ্রাহক আজীবন তা ভোগ করত। এর বিনিময়ে গ্রাহক জমিদাতার বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত হত (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সামরিক সেবা)। বেনেফিসিয়াম প্রথা সামন্ত শ্রেণী, বিশেষ করে অল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের উদ্ভব, চাষীদের ভূমিদাস বানানো, প্রজা-প্রভু সম্পর্ক ও সামন্ততন্ত্রী স্তরায়ণ (হায়েরার্কি) বিকাশে উৎসাহ দেয়। পরে বেনেফিসিয়াম বংশানুসৃত জমিদারীতে (ফিউড) পরিণত হয়। পৃঃ ১৬৮

(৩৮) **এলাকার কাউণ্ট** (Gaugrafen)— ফ্রাঙ্ক রাষ্ট্রে এলাকার (gau) পরিচালনায় নিযুক্ত রাজদরবারের আমলা। নিজ এলাকায় বিচার, কর আদায় ও সৈন্যদল গঠনের ক্ষমতা প্রত্যেক কাউণ্টের ছিল। যুদ্ধের সময় কাউণ্টই নিজ সৈন্যের অধিনায়ক হত। নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য এই এলাকায় প্রাপ্ত রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ সে ভোগ করত এবং তাকে জমিজমা প্রদান করা হত। পরে কাউণ্টরা ক্রমে ক্রমে রাজদরবার নিযুক্ত আমলা থেকে স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী বড় বড় সামন্ত মালিকে পরিণত হয় (বিশেষত ৮৭৭ সালের পর সরকারীভাবে নতুন কাউণ্টের পদ বংশানুক্রমিক করার পর)। পৃঃ ১৬৯

(৩৯) **আঙ্গারি** — রোম সাম্রাজ্যে একরকম দায়। তার অধীনে প্রজারা সরকারী শকটের জন্য ঘোড়া ও কুলিদের বন্দোবস্ত করতে বাধ্য ছিল। পরবর্তীকালে দায়টি

ব্যাপক আকার ধারণ করে ও দেশবাসীদের উপর বড় বোঝার রূপ নেয়।
পৃঃ ১৭০

(৪০) Commendation — নির্দিষ্ট শর্তে কৃষক কর্তৃক সামন্তদের এবং ছোট ছোট সামন্ত কর্তৃক বড় সামন্তদের 'অভিভাবকত্ব' স্বীকারের প্রথাবিশেষ ('অভিভাবকের' জন্য সামরিক সেবা, অন্যান্য দায়দায়িত্ব পালন, তার হাতে নিজের জমি তুলে দিয়ে শর্তাধীন ভোগস্বত্ব রূপ তা ফিরে পাওয়া)। ৮-৯ম শতক থেকে ইউরোপে এটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। প্রায়ই বলপূর্বক কৃষকদের কাছ থেকে এই স্বীকৃতি আদায় করা হত; কৃষকদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হরণ এবং অল্পবিত্ত সামন্তদের অধীনতা স্বীকার হিসেবেই তা প্রকটিত হত। কমেন্ডেশন একদিকে কৃষকদের ভূমিদাস বানানো ও অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক স্তরায়ণ দৃঢ়তর করায় উৎসাহ দিত।
পৃঃ ১৭১

(৪১) হ্যাস্টিংসে ১০৬৬ সালে ডিউক অব নর্ম্যান্ডি ভিলহেল্মের সৈন্য (ইংলণ্ডে প্রবেশ করেছিল) এবং অ্যাংলোস্যাক্সন সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। শেষোক্তদের সামরিক প্রতিষ্ঠানে গোষ্ঠীব্যবস্থার অবশেষ তখনও বজায় ছিল। এদের যুদ্ধাস্ত্র ছিল আদিম ধরনের। অ্যাংলোস্যাক্সনরা পরাজয় স্বীকার করে, এদের রাজা হ্যারল্ড লড়াইয়ে নিহত হয়। ভিলহেল্ম ইংলণ্ডের রাজা হয়ে ১ম ভিলহেল্ম বিজেতার নাম গ্রহণ করে।
পৃঃ ১৭৮

(৪২) **বন্ধক** — দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্থাবর সম্পত্তি (জমি, বাড়ি) বন্ধক দেওয়ার ব্যবস্থা।
পৃঃ ১৮৩

(৪৩) **ডিট্‌মার্শেন** — আধুনিক শ্লেজ্‌ভিগ-হল্‌শটাইনের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি প্রদেশ। প্রাচীনকালে সেখানে স্যাক্সনরা থাকত; অষ্টম শতকে শার্লেমেন এ অঞ্চল জয় করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধর্মীয় ও অ-ধর্মীয় সামন্তরা সেখানে রাজত্ব করে। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ডিট্‌মার্শেনের বাসিন্দারা (স্বাধীন কৃষকদের সংখ্যা এদের মধ্যে সর্বাধিক ছিল) ক্রমে ক্রমে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে আরম্ভ করে এবং ১৩শ শতকের সূচনা থেকে ১৬শ শতকের মাঝামাঝি অবধি কার্যত স্বাধীন হয়ে যায়। স্বাধীনতার কালপর্যায়ে ডিট্‌মার্শেন ছিল স্বশাসিত কৃষক গোষ্ঠীগুলির সমষ্টি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কৃষক গোষ্ঠীর ভিত্তি ছিল প্রাচীন কৃষক গোত্র। ১৪শ শতক অবধি ডিট্‌মার্শেনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ছিল জমির স্বাধীন মালিকদের সভার হাতে। তারপর ক্ষমতা তিনটি নির্বাচনী কলিজিয়মের হস্তগত হয়। ১৫৫৯ সালে ডেনমার্কের রাজা

দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ও হল্‌শ্টাইনের ডিউকদ্বয় ইয়োহান ও আডল্ফ ডিট্‌মার্শেনের বাসিন্দাদের প্রতিরোধ ভেঙে ফেলে অঞ্চলটি বিজয়ীরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। কিন্তু গোষ্ঠীর গড়ন ও আংশিক স্বশাসন ডিট্‌মার্শেনে ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বজায় থাকে। পৃঃ ১৮৬

নামের সূচি

অ

অগাস্টস (খৃঃ পূঃ ৬৩-১৪ খৃঃ) — রোমান সম্রাট (রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ২৭-১৪ খৃঃ)। —১৩৩, ১৩৫, ১৬১

অডোয়েকার (আঃ ৪৩৪-৪৯৩) — জার্মান সৈন্যদলগুলির অন্যতম নেতা, ৪৭৬ সালে রোমান সম্রাটকে উৎখাত করে ইতালির ভূখণ্ডে প্রথম 'বর্বর' রাজ্যের রাজা হন। —১৫৯

অ্যাপিয়াস ক্লডিয়াস (মৃত্যু আঃ খৃঃ পূঃ ৪৪৮)— রোম রাষ্ট্রনায়ক ও কন্সাল; বারো ফলকের আইন নির্ণায়ক ডিসেম্বিরদের কমিশনের অন্যতম সদস্য। —১৩৪

আ

আগাসিজ (Agassiz), **লুই জাঁ রুদোল্‌ফ** (১৮০৭-১৮৭৩) — সুইস প্রাণিবিদ ও ভূতত্ত্ববিদ; প্রকৃতিবিদ্যায় অতি প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন। —৫৬

আনাক্সানদ্রিদাস (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতক) — স্পার্টার রাজা, রাজত্বকালের শুরু খৃঃ পূঃ ৫৬০ সাল থেকে, এরিস্টোনিসের সহশাসক। —৬৯

আমিয়ানাস মার্সেলিনাস (আঃ ৩৩২-৪০০) — রোমান ইতিহাসবিদ, তাঁর 'ইতিহাস' গ্রন্থে ৯৬-৩৭৮ বর্ষক্রমে রোম ইতিহাসের বর্ণনা দিয়েছেন। —৭৬, ১০২

আরিস্টটল (খৃঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) — প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ও বিজ্ঞানী, তৎকালীন অধিগম্য সমস্ত জ্ঞানে পণ্ডিত; দর্শনে ভাববাদ ও বস্তুবাদে দোদুল্যমান। —১১৪

আর্টাক্সেরক্স — অহমেনিদ বংশের তিনজন প্রাচীন পারসিক রাজার নাম। —১৪০

আলফিলা (আঃ ৩১১-৩৮৩) — পশ্চিম গথদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মী, গথদের মধ্যে খৃস্টধর্ম সম্প্রসারণ করেন। —১৪০

আলেকজান্ডার মেসিডোনিয়ার (খৃঃ পূঃ ৩৫৬-৩২৩) — প্রাচীন জগতের বিখ্যাত সেনাপতি ও রাষ্ট্রনায়ক। —৬৬

গ

জ

ট

ড

থ

সাহিত্য ও পৌরাণিক চরিত্র

অডিসিউস — হোমারের 'ইলিয়ড' ও 'অডিসি' কাব্যের নায়ক, ইথাকা দ্বীপের পুরাকথার রাজা, ট্রয় যুদ্ধের সময় গ্রীক সৈন্যদলের অন্যতম সেনাপতি; সাহসিকতা, চাতুরী ও বাগ্মিতা তার বৈশিষ্ট্য। —১১৭

অ্যাপোলো — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার সূর্য ও আলোর দেবতা, ললিতকলার পৃষ্ঠপোষক। —১৩, ১৪

অ্যাফ্রোদিত — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী। —৭৩

অ্যাব্রাহাম — বাইবেল অনুসারে প্রাচীন ইহুদিদের পিতৃপুরুষ। —৫৯

আর্গোনট — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার স্বর্ণলোম সংগ্রহের উদ্দেশে কল্‌খিদাযাত্রী 'আর্গো' জাহাজের বীরদের নাম। স্বর্ণলোমকে অজগর পাহারা দিত। —১৫১

আল্‌থিয়া — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার রাজা থেস্টিয়াসের কন্যা, মিলিয়েগারের জননী। —১৫১

আকিলিস — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার ট্রয় অবরোধকারী গ্রীক বীরদের মধ্যে সাহসিকতম; হোমারের 'ইলিয়ড'এর অন্যতম প্রধান নায়ক। —৬৮, ১১৭

আগামেম্নন — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার আর্গসের রূপকথাতুল্য রাজা, 'ইলিয়ড'এর অন্যতম নায়ক, ট্রয় যুদ্ধে গ্রীক সেনাধিনায়ক; এস্কাইলাসের সমনাম ট্র্যাজেডির নায়ক। —১৩, ৬৮, ৬৯, ১১৭

আনাইটিস — প্রাচীন ইরানীয় পুরাকথার জলসম্পদ ও উর্বরতার দেবী আনাহিটার প্রাচীন গ্রীক নামান্তর। —৫৬, ৭৩

আয়ার্ল্যান্ডের জিগেবাণ্ট — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা ১৩শ শতকের মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য 'গুড্‌রুন'এর নায়ক; আয়ার্ল্যান্ডের রাজা। —৮৫

ইউমেন — হোমারের 'অডিসি'র অন্যতম নায়ক; ইথাকা দ্বীপে অডিসিউসের শূকর পালক, নিজ প্রভুর সুদীর্ঘ পর্যটনকালে প্রভুর বিশেষ অনুগত। —১১৭

ইটিওক্লিস — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার থিব্‌সের রাজা ইডিপের পুত্র; নিজের ভাই পলিনিসিসের সঙ্গে থিব্‌সের রাজত্বের অংশভাগী; ভ্রাতৃযুদ্ধে উভয়েই নিহত; এস্কাইলাস রচিত 'থিব্‌সের বিরুদ্ধে সাত জন' ট্র্যাজেডি এরই অনুসৃতি। —১১৫

ইরিনিয়া — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথায় প্রতিশোধ গ্রহণকারী ভূত; এরা নারীসদৃশ, এবং মাথায় চুল অসংখ্য সাপে প্রতিস্থাপিত। —১৩, ১৪

এজিস্থাস — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথা অনুসারে ক্লাইটেম্নেস্ট্রার প্রেমিক, আগামেম্ননের হত্যার অংশভাগী। এস্কাইলাসের নাট্যত্রয় 'ওরেস্টিয়া'র প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের নায়ক। —১৩

এট্‌জেল — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য 'নিবেলুং গাথা'র নায়ক, হুণদের রাজা। —৮৫

ওরেস্ট — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার আগামেম্নন ও ক্লাইটেম্নেস্ট্রার পুত্র; মা ও এজিস্থাসের উপর পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করে; এস্কাইলাসের 'ওরেস্টিয়া' ট্র্যাজেডির নায়ক। —১৩, ১৪

কাসান্ড্রা — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার ট্রয় রাজা প্রায়েমাসের কন্যা; অন্তর্দর্শিনী; ট্রয় বিজিত হলে দাসী রূপে আগামেম্ননের অনুগামিনী; এস্কাইলাসের 'আগামেম্নন' ট্র্যাজেডির অন্যতম নায়িকা। —৬৯

ক্রিম্‌হিল্ড — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য 'নিবেলুং গাথা'র নায়িকা, বুর্গান্ডদের রাজা গুন্থারের বোন, জিগ্‌ফ্রিডের কনে ও পরে স্ত্রী; জিগ্‌ফ্রিডের মৃত্যুবরণের পর হুন রাজা এট্‌জেলের স্ত্রী। —৮৫

ক্লয়া — লঙ্গস (২-৩ খৃস্টাব্দ) রচিত প্রাচীন গ্রীক উপন্যাস 'ড্যাফনিস ও ক্লয়া'র নায়িকা। প্রেমিকা রাখালিনির চরিত্র। —৮৪

ক্লাইটেম্নেস্ট্রা — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার আগামেম্ননের পত্নী, ট্রয় যুদ্ধ থেকে প্রত্যাগত স্বামীর হত্যাকারী; এস্কাইলাসের ট্র্যাজেডির 'ওরেস্টিয়া'র নায়িকা। —১৩

ক্লিওপেট্রা — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথায় উত্তুরে হাওয়ার দেবতা বোরেয়াসের কন্যা। —১৫১

গুড্‌রুন (কুড্‌রুন) — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা ১৩শ শতকের মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্যের নায়িকা, হেগেলিংদের রাজা হেটেল ও আয়ার্ল্যান্ডের হিল্‌ডে'র কন্যা, জীল্যান্ড হারভিগের বাগদত্তা; অরমানীর (নর্ম্যান্ডি) হার্টমুট তাকে অপহরণ করে কিন্তু ১৩ বছর বন্দী থেকেও তার স্ত্রী হতে রাজী হয় নি; হারভিগ তাকে উদ্ধার ও বিবাহ করে। —৮৫

গুন্থার — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য 'নিবেলুং গাথা'র নায়ক, বুর্গান্ডিয়ানদের রাজা। —৮৫

গ্যানিমেড — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার অপরূপ সুন্দর যুবক; দেবতারা একে অপহরণ করে অলিম্পাসে নিয়ে যায় এবং সেখানে সে জিউসের মদ্যসেবক হয়। —৭১

জর্জ ডান্ডিন — মলিয়েরের হাস্যরসাত্মক 'জর্জ ডান্ডিন, অথবা বোকা-বানানো স্বামী' নাটকের নায়ক, ধনী অথচ অতি সরলবিশ্বাসী চাষীর প্রতীক; দেউলিয়া অভিজাত নারীর সুকৌশলে প্রতারিত স্বামী। —১৮৩

জিউস — প্রাচীন গ্রীকপুরাকথার দেবরাজ। —১১৭

জিগফ্রিড — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য 'নিবেলুং গাথা'র অন্যতম প্রধান নায়ক। —৮৫

টিউক্রস — হোমারের 'ইলিয়ড' মহাকাব্যের অন্যতম নায়ক, ট্রয়যোদ্ধা। —৬৯

টেলামন — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার অন্যতম বীর, ট্রয়ের বিরুদ্ধে অভিযানে যোগদানকারী। —৬৯

টেলিমেকাস — হোমারের 'অডিসি' মহাকাব্যের অন্যতম নায়ক; ইথাকা দ্বীপের রাজা অডিসিউসের পুত্র। —৬৮

ডেমোডোকাস — হোমারের 'অডিসি'র নায়কদের অন্যতম; পুরাকথার থিয়াকদের রাজা আল্কিনয়াসের দরবারের অন্ধ গায়েন। —১১৭

ড্যাফনিস — লঙ্গস (২-৩ খৃস্টাব্দ) রচিত প্রাচীন গ্রীক উপন্যাস 'ড্যাফনিস ও ক্লয়া'র নায়ক। প্রেমিক রাখালের প্রতীক। —৮৪

থিসিউস — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার প্রধানতম বীর বিশেষ; পুরাকথা অনুসারে এথেন্সের রাজা, এবং নিজেই এথেন্স রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। —১২০, ১২১

থেস্টিয়াস — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথা অনুসারে ইথোলিয়াস্থ প্লিউরনের রাজা। —১৫১

নরওয়ের উটে — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা ১৩শ শতকের মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য 'গুড্রুন'এর নায়িকা। —৮৫

নিয়োর্ড — প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভীয় পুরাকথার উর্বরতার দেবতা, প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভীয় বীরগাথা 'জ্যেষ্ঠা এড্ডা'র নায়ক। —৪১, ৪২

নেস্টর — প্রাচীন গ্রীক রূপকথায় ট্রয় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, প্রবীণতম ও বিচক্ষণতম বীর। —১১৩

পলিনিসিস — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার থিব্স রাজ ইডিপের অন্যতম পুত্র; ভাইয়ের সঙ্গে থিব্সের রাজত্বের অংশভাগী; যুদ্ধে ভ্রাতৃহন্তা এবং নিজেও নিহত; এই পুরাকথার অনুকরণে এস্কাইলাসের 'থিব্সের বিরুদ্ধে সাত জন' ট্র্যাজেডি রচিত। —১১৫

পাল্লাস এথেনা — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার অন্যতম প্রধান দেবী, যুদ্ধের দেবী ও প্রাজ্ঞতার প্রতিমূর্তি; এথেন্স রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষক বলে মনে করা হত। —১৩, ১৪

ফিনিয়াস — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার অন্ধ দেবদূত। দ্বিতীয় স্ত্রীর উস্কানিতে নিজ ও বোরেয়াসের কন্যা তার প্রথমা স্ত্রী ক্লিওপেট্রার সন্তানদের প্রহারকারী এবং সেজন্য দেবদণ্ডপ্রাপ্ত। —১৫১

ফ্রেইয়া — প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভীয় পুরাকথায় উর্বরতা ও ভালবাসার দেবী, প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভীয় লোকগাথা 'জ্যেষ্ঠা এড্ডা'র নায়িকা, সহোদর দেবতা ফ্রেইয়ার স্ত্রী। —৪১

বোরেয়াড — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার উত্তুরে হাওয়ার দেবতা বোরেয়াস এবং এথেন্সের রাজকন্যা ওরেস্টিকার সন্তানদের নাম। —১৫১

ব্রুনহিল্ড — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য 'নিবেলুং গাথা'র নায়িকা, আইসল্যাণ্ডের রাণী, পরে বুর্গাণ্ডিয়ানদের রাজা গুন্থারের পত্নী। —৮৫

মরল্যাণ্ডের জিগফ্রিড — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা ১৩শ শতকের মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্যের 'গুড্রুন'এর অন্যতম নায়ক; গুড্রুনের পাণিপ্রার্থী কিন্তু প্রত্যাখ্যাত। —৮৫

মিলিটা — ব্যাবিলন পুরাকথার ভালবাসা ও উর্বরতার দেবী ইশতারের প্রাচীন গ্রীক নামান্তর। —৪১

মিলিয়েগার — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার ক্যালিডন শহরের রূপকথাসুলভ রাজা ইনিয়াস এবং মাতুল হত্যাকারী অ্যালথিয়ার পুত্র। —১৫১

মুলিয়স — হোমারের 'অডিসি'র অন্যতম নায়ক। —১১৭

মেফিস্টোফিলিস — গ্যেটের 'ফাউস্ট' ট্র্যাজেডির অন্যতম প্রধান নায়ক। —৪১

মোজেস — বাইবেল অনুসারে দেবদূত ও আইনবিধিদাতা, মিসরীয় বন্দী প্রাচীন ইহুদিদের উদ্ধারকর্তা, তাদের আইনবিধিদাতা। —১১, ৫৯

রমুলাস — পুরাকথা অনুসারে প্রাচীন রোমের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম রাজা। —১৩৯

লোকি — প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভীয় পুরাকথার রাক্ষস, অগ্নিদেবতা, প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভীয় বীরগাথা 'জ্যেষ্ঠা এড্ডা'র নায়ক। —৪১

সিফ — প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভীয় পুরাকথায় বজ্রদেবতা থোরের পত্নী, প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভীয় বীরগাথা 'জ্যেষ্ঠা এড্ডা'র অন্যতম নায়িকা। —১৫০

হাডুব্রান্ড — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা 'হিলডেব্রান্ডের গাথা'র অন্যতম নায়ক, গাথাটির প্রধান নায়ক হিলডেব্রান্ডের পুত্র। —১৫০

হারকিউলিস — প্রাচীন গ্রীক পুরাকথার সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়ক, দৈহিক পরাক্রম ও মহাবীর সাধনার জন্য প্রখ্যাত। —১৫১

হার্ভিগ — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা ১৩শ শতকের মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য 'গুড্রুন'এর নায়ক, জীল্যাণ্ডের রাজা, গুড্রুনের বাগদত্ত ও পরে স্বামী। —৮৫

হার্টমুট্ — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা ১৩শ শতকের মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য

'গুড্রুন'এর নায়ক; অর্মান (নর্ম্যান্ডি) রাজার পুত্র, গুড্রুনকে বিবাহ করার প্রস্তাব করেও প্রত্যাখ্যাত হয়। —৮৫

হিল্ডে — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা ১৩শ শতকের মধ্যযুগীয় মহাকাব্য 'গুড্রুন'এর নায়িকা; আয়ার্ল্যান্ডের রাজার কন্যা, পরে হেগেলিংদের রাজা হেটেলের পত্নী। —৮৫

হিল্ডেব্রান্ড — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা 'হিল্ডেব্রান্ডের গাথা'র প্রধান নায়ক। —১৫০

হেটেল — প্রাচীন জার্মান বীরগাথা তথা ত্রয়োদশ শতকের মধ্যযুগীয় জার্মান মহাকাব্য 'গুড্রুন'এর নায়ক, হেগেলিংদের রাজা। —৮৫

কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

খণ্ড

২

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

К. Маркс и Ф. Энгельс

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В XII ТОМАХ

Том 12

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

$М\frac{10101\text{-}948}{014(01)\text{-}82}547\text{—}82$ 0101010000

সূচি

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

ইতিহাসে বলপ্রয়োগের ভূমিকা (১)

আমাদের তত্ত্বকে এখন সমসাময়িক জার্মান ইতিহাস এবং তার বলপ্রয়োগ, তার নির্মম প্রচন্ড শক্তিপ্রয়োগের নীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাক। কেন এই নির্মম প্রচন্ড শক্তিপ্রয়োগের নীতি কিছু কালের জন্য সফল হতে বাধ্য ছিল এবং কেন শেষে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল আমরা এইভাবে তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাব।

১৮১৫ সালে ভিয়েনা কংগ্রেস (২) ইউরোপকে এমনভাবে বিভক্ত ও বিক্রি করে দেয়, যা সারা পৃথিবীর কাছে ক্ষমতাবান ব্যক্তি ও রাষ্ট্রনীতিকদের পরিপূর্ণ অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধ ছিল নেপোলিয়ন যাদের পদদলিত করেছিলেন সেই সমস্ত জাতির জাতীয় মনোভাবেরই প্রতিক্রিয়া। এর জন্য কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে ভিয়েনা কংগ্রেসে নৃপতি ও কূটনীতিকরা সেই জাতীয় মনোভাবকে আরও বেশি অবজ্ঞাপূর্ণভাবে পদদলিত করলেন। ক্ষুদ্রতম রাজবংশকে বৃহত্তম জাতির চাইতে বেশি শ্রদ্ধা দেখানো হল। জার্মানি ও ইতালিকে আবার ছোট ছোট রাষ্ট্রে ভেঙে দেওয়া হল, পোল্যান্ডকে বিভক্ত করা হল চতুর্থবার আর হাঙ্গেরিকে রেখে দেওয়া হল দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ অবস্থায়। এমন কি এ কথাও বলা যায় না যে জাতিসমূহের প্রতি অবিচার করা হয়েছিল: তারা তা সহ্য করল কেন, এবং কেন তারা রুশ জারকে* তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে বরণ করল?

কিন্তু বেশিকাল তা চলতে পারে নি। মধ্য যুগের শেষ থেকে ইতিহাস এগিয়ে চলেছে ইউরোপে বড় বড় জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের দিকে। একমাত্র এরূপ

---

* প্রথম আলেক্সান্দর। — সম্পাঃ

রাষ্ট্রই শাসক ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বাভাবিক রাজনৈতিক কাঠামো এবং, সেই সঙ্গে, জাতিসমূহের মধ্যে সুসমঞ্জস আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপনের এক অপরিহার্য পূর্বশর্ত — যা না-হলে প্রলেতারিয়েতের শাসন অসম্ভব। আন্তর্জাতিক শান্তি সুনিশ্চিত করতে হলে পরিহারযোগ্য সমস্ত জাতীয় সংঘাত অবশ্যই সর্বপ্রথমে দূর করতে হবে, প্রত্যেক জাতিকে অবশ্যই হতে হবে স্বাধীন এবং স্বগৃহে প্রভু। বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পের বিকাশ এবং তার দ্বারা বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক পরাক্রমের বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র জাতীয় মনোভাব জাগ্রত হল এবং বিভক্ত তথা নিপীড়িত জাতিগুলি দাবি করল ঐক্য ও স্বাধীনতা।

তাই ফ্রান্স ছাড়া সর্বত্র ১৮৪৮-এর বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল যেমন মুক্তির দাবি পূরণ, তেমনই জাতীয় দাবি পূরণ। কিন্তু প্রথম আক্রমণে যারা বিজয়ী হয়েছিল সেই বুর্জোয়া শ্রেণীর পিছনে সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করল যারা প্রকৃতপক্ষে বিজয় অর্জন করেছিল সেই প্রলেতারিয়েতের দুর্দান্ত চেহারা এবং বুর্জোয়া শ্রেণীকে তা ঠেলে নিয়ে গেল সদ্যপরাস্ত শত্রুর কোলে — রাজতন্ত্র-সমর্থক, আমলাতান্ত্রিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও সামরিক প্রতিক্রিয়ার কোলে: ১৮৪৯ সালে তারা বিপ্লবকে পরাস্ত করল। হাঙ্গেরিতে ঘটনাটা এরকম ছিল না, সেখানে রুশীয়রা ঢুকে পড়ে বিপ্লবকে চূর্ণবিচূর্ণ করল। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে রুশ জার ওয়ার্‌শ গেলেন, সেখানে তিনি ইউরোপের বিচারক হিসেবে বিচার করতে বসলেন। তিনি তাঁর বশংবদ জীব ক্রিস্টিয়ান গ্লুক্‌স্‌বার্গারকে ডেনমার্কের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করলেন। প্রাশিয়াকে তিনি এমন অপমান করলেন, যেরকম অপমান সে কখনও ভোগ করে নি, এমন কি ঐক্যের জন্য জার্মান আকাঙ্ক্ষা কাজে লাগানোর সামান্যতম বাসনাও তার নিষিদ্ধ করা হল এবং তাকে বাধ্য করা হল পুনরায় বুন্ডেস্টাগ (৩) স্থাপন করতে এবং অস্ট্রিয়ার কাছে নতিস্বীকার করতে। প্রথম নজরে মনে হয়েছিল যে বিপ্লবের একমাত্র ফল হল অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ায় সরকারের এমন এক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, আকৃতিতে সাংবিধানিক হলেও যা মর্মগতভাবে পুরনো, এবং রুশ জার আগেকার যেকোনো সময়ের তুলনায় অধিক পরিমাণে ইউরোপের কর্তা।

প্রকৃতপক্ষে অবশ্য এই বিপ্লব এমন কি খন্ড-বিচ্ছিন্ন দেশগুলিতেও,

বিশেষ করে জার্মানিতে বুর্জোয়া শ্রেণীকে ধাক্কা দিয়ে তার পুরনো পরম্পরাগত বাঁধা-পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। বুর্জোয়া শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতার, যত সামান্যই হোক না-কেন, ভাগ পেল এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিটি রাজনৈতিক সাফল্য ব্যবহৃত হল শিল্পের অগ্রগতিবিধানের জন্য। সফলভাবে কেটে-যাওয়া 'উন্মাদ বছরটি' (৪) বুর্জোয়া শ্রেণীকে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিল যে তাকে পুরনো জড়িমা ও ঔদাস্যের অবসান ঘটাতে হবে চিরতরে। কালিফোর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণবৃষ্টি (৫) এবং অন্যান্য পরিস্থিতির ফলে বিশ্ব বাণিজ্যিক সম্পর্কের এক অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ও ব্যবসায়ে তেজী-ভাব দেখা দিল—ব্যাপারটা ছিল সুযোগ গ্রহণ করা এবং নিজের ভাগ ঠিকমতো বুঝে-নেওয়া। ১৮৩০ সালের পর থেকে এবং বিশেষ করে ১৮৪০ সালের পর থেকে রাইন অঞ্চলে, স্যাক্সনিতে, সাইলেসিয়ায়, বার্লিনে এবং দক্ষিণাঞ্চলের কোনো কোনো শহরে যে বৃহদায়তন শিল্প আত্মপ্রকাশ করেছিল, এখন সেগুলির দ্রুত বিকাশ ও সম্প্রসারণ ঘটানো হল; গ্রামাঞ্চলগুলিতে কুটিরশিল্প ক্রমেই বেশি বহুবিস্তৃত হয়ে উঠল, রেলওয়ে নির্মাণকর্ম ত্বরান্বিত হল, দেশ থেকে চলে গিয়ে বিদেশে বসবাস করা বিপুলভাবে বেড়ে-চলার ফলে সৃষ্টি হল অ্যাটলাণ্টিক-পাড়ি-দেওয়া এক জার্মান জাহাজ-চলাচল ব্যবস্থা, তার কোনো ভরতুকি দরকার হল না। জার্মান বণিকরা আগেকার যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক ব্যাপকভাবে বিদেশের সমস্ত বাণিজ্য-কেন্দ্রে বসতি স্থাপন করল, বিশ্ব বাণিজ্যের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ নিয়ে কারবার করতে লাগল এবং ক্রমে ক্রমে শুধু ইংলণ্ডেরই নয়, জার্মান শিল্পজাত পণ্যও বিক্রির জন্য নিজেদের কর্মোদ্যম দেখাতে শুরু করল।

কিন্তু জার্মানির ছোট ছোট রাষ্ট্রের প্রথা, তাদের অসংখ্য ও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বাণিজ্য ও শিল্পসংক্রান্ত আইনকানুন বলিষ্ঠভাবে ক্রমবর্ধমান শিল্প ও তার সঙ্গে জড়িত বাণিজ্যের উপরে অচিরেই অবশ্যম্ভাবীরূপে এক অসহ্য বেড়ি হয়ে উঠল। কয়েক মাইল অন্তর-অন্তরই বিনিময়-পত্র সংক্রান্ত আলাদা আলাদা আইন ছিল, বাণিজ্যের শর্তও ছিল পৃথক; সর্বত্র, আক্ষরিকভাবেই সর্বত্র ছিল সব ধরনের প্রতারণা, আমলাতান্ত্রিক ও রাজস্ব-সংক্রান্ত ফাঁদ, এবং প্রায়শই ছিল গিল্ড বা বণিক সমবায়-সংঘের প্রতিবন্ধক, যার বিরুদ্ধে এমন

কি পেটেণ্টেও কোনো কাজ হত না! তদ্নপরি ছিল বিভিন্ন স্থানীয় বসতি-সংক্রান্ত আইন এবং বসবাস-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ, যার ফলে পর্নজিপতিদের পক্ষে তাদের আয়ত্ত শ্রম-বাহিনীকে যথেষ্ট সংখ্যায় সেইসব স্থানে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল, যেখানে আকরিক ধাতু, কয়লা, জলসম্পদ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক অবস্থার অস্তিত্ব শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের অন্নকূল! পিতৃভূমির শ্রম-বাহিনীকে দলবদ্ধভাবে ও অবাধে শোষণ করার ক্ষমতাই ছিল শিল্পবিকাশের প্রথম শর্ত, কিন্তু যেখানেই দেশপ্রেমিক পণ্যোৎপাদক সমস্ত প্রান্ত থেকে শ্রমিকদের জড়ো করত, পন্নলিস ও বেচারি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ নবাগতদের বসতি-স্থাপনের বিরোধিতা করত। একটিমাত্র সারা-জার্মান নাগরিক অধিকার ও দেশের সকল নাগরিকের জন্য গতিবিধির পন্র্ণ স্বাধীনতা একটিমাত্র বাণিজ্যিক ও শিল্প-সংক্রান্ত আইন আর আবেগদৃপ্ত ছাত্রদের দেশপ্রেমিক কল্পনামাত্র রইল না, এখন তা হয়ে উঠল শিল্পের জন্য অতি গন্রন্ত্বপন্র্ণ এক শর্ত।

তাছাড়া, প্রতিটি রাষ্ট্রে, তা সে যত ক্ষন্দ্রই হোক, ছিল ভিন্ন মন্দ্রা, ভিন্ন ওজন ও মাপ, এবং প্রায়শই একই রাষ্ট্রে দন্ই বা তিন ধরনের পৃথক পৃথক মন্দ্রা, ওজন প্রভৃতি ছিল। আর অসংখ্য ধরনের এই সব ধাতুমন্দ্রা, ওজন ও মাপের একটিও বিশ্বের বাজারে স্বীকৃত ছিল না। তাই এতে অবাক হওয়ার কিছন নেই যে, পৃথিবীর বাজারে যারা ব্যবসা করত, কিংবা আমদানি-পণ্যের বিরন্দ্ধে যাদের প্রতিযোগিতা করতে হত সেই সব বণিক-ব্যবসায়ী ও পণ্যোৎপাদককে নিজেদের বহন মন্দ্রা, ওজন ও মাপ ছাড়াও বিদেশী মন্দ্রা, ওজন ও মাপও ব্যবহার করতে হত; কাপাস সন্তো রীলে রাখা হত ইংরেজি পাউন্ড ওজনে, রেশম বস্ত্র তৈরি হত মিটারের মাপে, বিদেশী বিল তৈরি করা হত পাউন্ড স্টার্লিংয়ে, ডলারে এবং ফ্রাঁ-তে! এই সব সীমাবদ্ধ মন্দ্রার এলাকায়, যার কোথাও ব্যাঙ্ক-নোট গন্লডেনে, কোথাও প্রন্শীয় টেলারে, তার পাশেই স্পর্ণ-টেলারে, 'নয়া দন্ই-তৃতীয়াংশ' টেলারে, ব্যাঙ্ক মার্কে, চলতি মার্কে, কুড়ি-গন্লডেন প্রথায়, চব্বিশ-গন্লডেন প্রথায় এবং তৎসহ অন্তহীন বিনিময়-সংক্রান্ত হিসাব এবং দরের ওঠা-পড়া চলছে, সেই এলাকায় বড় বড় ঋণদান প্রতিষ্ঠান তৈরি করা যেত কীভাবে?

আর যদি শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত ব্যাপার কাটিয়ে ওঠা যেতও, তাহলে

এই সব বিরোধ-সংঘাতের পিছনে কত প্রচেষ্টা ব্যয় করতে হত, অপচয় হত কত অর্থ আর সময়! শেষ পর্যন্ত, জার্মানিতেও লোকে এবিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিল যে আজকাল সময়ই অর্থ।

তরুণ জার্মান শিল্পের পক্ষে পৃথিবীর বাজারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া দরকার ছিল, তার বৃদ্ধি ঘটতে পারত একমাত্র রপ্তানির মধ্য দিয়েই। এ জন্য বিদেশে তার আন্তর্জাতিক আইনের রক্ষণমূলক আশ্রয় দরকার ছিল। ইংরেজ, ফরাসী ও মার্কিন বণিক স্বদেশের চাইতে বিদেশে অনেক বেশি ঝুঁকি নিতে পারত। তাদের কূটনৈতিক দূতাবাস তাদের পক্ষে হস্তক্ষেপ করত, এবং দরকার হলে কিছু যুদ্ধজাহাজও পাঠানো হত। কিন্তু জার্মান বণিক? পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অস্ট্রিয়ান বণিক তার কূটনৈতিক দূতাবাসের উপরে অন্তত কিছুটা পরিমাণে নির্ভর করতে পারত, অন্যত্র তা তাকে খুব একটা সাহায্য করত না। কিন্তু যখনই বিদেশে কোনো প্রুশীয় বণিক তার প্রতি কোনো অন্যায়-অবিচার সম্পর্কে তার রাষ্ট্রদূতের কাছে অভিযোগ করত, তখনই তাকে অনিবার্যভাবে বলা হত: 'উপযুক্ত শিক্ষা হয়েছে, এখানে তুমি কী চাও, স্বদেশে গিয়ে চুপচাপ থাকো না কেন?' ছোট রাষ্ট্রের প্রজারা সর্বত্র সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। যেখানেই যাওয়া যাক, জার্মান বণিকরা ছিল বিদেশী—ফরাসী, ইংরেজ অথবা মার্কিন—রক্ষণাধীনে, অথবা তা না হলে নতুন দেশে দ্রুত নিজেদের তদুপযোগী করে সেখানকার নাগরিক অধিকার পেত।* তাদের রাষ্ট্রদূতেরা যদি তাদের পক্ষে হস্তক্ষেপ করতে চাইতেনও, তাহলেই বা কী লাভ হত? বিদেশে জার্মান রাষ্ট্রদূতদের জুতোর কালির চাইতে বেশি কিছু বলে গণ্য করা হত না।

এ থেকে দেখা যায় যে ঐক্যবদ্ধ 'পিতৃভূমির' বাসনার অত্যন্ত বৈষয়িক এক পশ্চাৎপট ছিল। তা আর ভার্টবুর্গ উৎসবে (৬), 'যেখানে সাহস ও শক্তি জার্মান অন্তরে উজ্জ্বলন্ত', এবং যেখানে, একটি ফরাসী সুরে নিবদ্ধ গানের ভাষায়, মধ্যযুগের রোমান্টিক রাজকীয় গরিমা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে 'সেই তরুণ পিতৃভূমির জন্য লড়াই করে প্রাণ দেওয়ার উত্তাল আকাঙ্ক্ষায় আত্মহারা

---

* এঙ্গেলস এখানে পৃষ্ঠার পাশে পেন্সিলে লিখেছিলেন 'Weerth'। — সম্পাঃ

হয়ে গিয়েছিল',* সেখানে কোনো জার্মান ছাত্র-সমিতির কোনো সদস্যের অস্পষ্ট অভীপ্সা ছিল না,—যদিও সেই উদ্দাম তরুণ তার প্রবীণতর বয়সে পরিণত হয়েছিল তার নৃপপুঙ্গবের একজন সাধারণ ছদ্ম-পবিত্রতাভিমানী ও সার্বভৌম-ভক্ত অনুচরে। হামবাখ উৎসবের (৭) আইনজীবী ও অন্যান্য বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের অপেক্ষাকৃত বেশি বাস্তবসম্মত ঐক্যের আহবানও তা আর ছিল না, তারা ভাবত নিজেদের জন্যই তারা স্বাধীনতা ও ঐক্য ভালোবাসে, কিন্তু আদৌ লক্ষ করে নি যে সুইশ ধাঁচে জার্মানিকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করা—তাদের মধ্যে যাদের বুদ্ধি সবচেয়ে কম তালগোল পাকানো তাদের আদর্শের অর্থ ছিল এটাই—উপরোক্ত ছাত্রদের 'হোহেনস্টাউফেন সাম্রাজ্যের' মতোই অসম্ভব ছিল। না, তা ছিল বাণিজ্য ও শিল্পের অবাধ বিকাশে প্রতিবন্ধক সমস্ত ঐতিহাসিকভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করার, পৃথিবীর বাজারে প্রবেশ করতে ইচ্ছা হলে জার্মান ব্যবসায়ীকে যে অনাবশ্যক বিরোধ-সংঘাত স্বদেশে কাটিয়ে উঠতে হত, এবং যে ঝামেলার হাত থেকে তার সমস্ত প্রতিযোগীরা মুক্ত ছিল, সেগুলি বিলুপ্ত করার আশু ব্যবসায়িক প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন বণিক ও শিল্পপতির বাসনা। জার্মান ঐক্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল অর্থনৈতিক প্রয়োজন। যারা এখন তা দাবি করছিল তারা জানত কী তারা চায়। তারা শিক্ষা লাভ করেছিল বাণিজ্যে এবং বাণিজ্যের জন্য, তারা দর-কষাকষি করতে জানত এবং দর-কষাকষি করতে ইচ্ছুক ছিল। তারা জানত যে চড়া দাম দাবি করা দরকার, কিন্তু এও জানত যে সেই দাম বদান্যতার সঙ্গে কমানোও দরকার। তারা 'জার্মান পিতৃভূমির' গাথা গাইল, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করল স্টিরিয়াকে, টিরোল এবং 'গরিমায় ও বিজয়ে ধনী অস্ট্রিয়া'-কে,** এবং

মাস থেকে মেমেল
আদিগে নদী থেকে বেল্ট পর্যন্ত

* উদ্ধৃতিগুলি ক. হিংকেলের 'ইউনিয়ন সংগীত' কবিতা থেকে নেওয়া। — সম্পাঃ

** আর্ন্ডট্-এর 'জার্মান পিতৃভূমি' কবিতা থেকে উদ্ধৃত। — সম্পাঃ

ডয়েটশল্যান্ড, ডয়েটশল্যান্ড উবের আলেস,
পৃথিবীতে সবার উপরে —*

কিন্তু নগদ-বিদায়ের জন্য তারা যে পিতৃভূমি আরও-আরও বড় হয়ে ওঠার কথা**, তার উপরে যথেষ্ট বাটা — ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ -- ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল। তাদের একীকরণের পরিকল্পনা ছিল তৈরি এবং অবিলম্বে রূপায়ণসাধ্য।

জার্মানির ঐক্য অবশ্য নিছক জার্মানির প্রশ্ন ছিল না। ত্রিশ বছরের যুদ্ধের (৮) পর থেকে অত্যন্ত লক্ষণীয় বিদেশী হস্তক্ষেপ ছাড়া কোনো সারা-জার্মান বিষয়েরই মীমাংসা হয় নি।*** দ্বিতীয় ফ্রিডরিখ ১৭৪০ সালে সাইলেসিয়া জয় করেছিলেন ফরাসীদের সাহায্য নিয়ে। ১৮০৩ সালে ডেপুটিবৃন্দের সাম্রাজিক কমিটির দ্বারা পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন ঘটেছিল আক্ষরিকভাবেই ফ্রান্স ও রাশিয়ার নির্দেশে (১০)। তার পর, নেপোলিয়ন জার্মানিকে সংগঠিত করেছিলেন নিজের সুবিধা মতো। এবং সবশেষে, ভিয়েনা কংগ্রেসে**** আবারও রাশিয়া এবং দ্বিতীয়ত ইংলন্ড ও ফ্রান্সের দরুনই তাকে দু-শোর বেশি পৃথক পৃথক ছোট-বড় জমির টুকরো সহ ছত্রিশটি রাষ্ট্রে ভাঙা হল, এবং রেগেনসবুর্গে ১৮০২-১৮০৩ সালের রাইখস্টাগে (১১) যেমন ঘটেছিল, জার্মান রাজবংশগুলি সততার সঙ্গেই এতে সাহায্য করেছিল এবং ভাগাভাগি আরও খারাপ করে তুলেছিল। উপরন্তু, জার্মানির কোনো কোনো অংশ তুলে দেওয়া হল বিদেশী সার্বভৌম রাজাদের হাতে। এইভাবে জার্মানি যে শুধু আভ্যন্তরিক বিরোধে দীর্ণ, রাজনৈতিক, সামরিক, এমন কি শিল্পগত অকিঞ্চিৎকরতায় অক্ষম ও নিঃসহায় হয়ে পড়েছিল তাই নয়। তার চাইতেও যেটা আরও খারাপ, ফ্রান্স ও রাশিয়া জার্মানিকে বিভক্ত করার অধিকার বারংবার প্রয়োগ করে অর্জন করেছিল,

---

* হফমান ফন ফালেরস্লেবেন-এর 'জার্মান সংগীত' থেকে উদ্ধৃত। — সম্পাঃ

** আর্ন্ডট-এর 'জার্মান পিতৃভূমি' কবিতা দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

*** এখানে এঙ্গেলস পৃষ্ঠার পাশে পেনসিলে লিখেছিলেন: 'ওয়েস্ট (ফালিয়া) ও টেশ (এন) শান্তি' (৯)। — সম্পাঃ

**** এখানে লাইনের মাঝে এঙ্গেলস পেনসিল দিয়ে লিখেছিলেন: 'জার্মানি — পোল্যান্ড' — সম্পাঃ

ঠিক যেমন ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া নিজেরাই ইতালি যাতে বিভক্ত থাকে সেটা দেখবার ভার নিয়েছিল। এই তথাকথিত অধিকার জার নিকোলাই প্রয়োগ করেছিলেন ১৮৫০ সালে; তখন রূঢ়তম ভঙ্গিতে সংবিধানের ইচ্ছা মতো কোনো পরিবর্তন করতে দিতে অস্বীকার করে তিনি জার্মানির অক্ষমতার সেই অভিব্যক্তি ফেডারেল ডায়েট — বুন্ডেস্টাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বাধ্য করেন।

সুতরাং জার্মানির ঐক্য অর্জন করতে হত শুধু নৃপতিকুল ও অন্যান্য আভ্যন্তরিক শত্রুর বিরুদ্ধেই নয়, বাইরের দেশগুলির বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করে। আর তা না হলে — বাইরে থেকে সাহায্য নিয়ে। বাইরে তখন পরিস্থিতি কী ছিল?

ফ্রান্সে, লুই বোনাপার্ট বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার সংগ্রামকে কাজে লাগিয়েছিলেন কৃষকদের সাহায্য নিয়ে নিজেকে প্রেসিডেন্টের পদমর্যাদায় উন্নীত করার জন্য এবং সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে সিংহাসনে আরোহণের জন্য। কিন্তু, ১৮১৫ সালের ফ্রান্সের সীমানার মধ্যে যাকে সিংহাসনে বসিয়েছে সেনাবাহিনী, এমন এক নতুন নেপোলিয়ন ছিল এক অজাত অসার কল্পনা। পুনর্জাত নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্যের অর্থ রাইন নদী পর্যন্ত ফ্রান্সের বিস্তৃতি, ফরাসী জাত্যভিমানের পুরুষানুক্রমিক স্বপ্নের রূপায়ণ। প্রথমে অবশ্য রাইন ছিল লুই নেপোলিয়নের আওতার বাইরে; সে দিকে যেকোনো প্রয়াসেরই ফল হত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক ইউরোপীয় কোয়ালিশন। অন্য দিকে, পশ্চিম ইউরোপে বৈপ্লবিক কালপর্বের সুযোগ নিয়ে যে-রাশিয়া নিঃশব্দে ডানিউব তীরবর্তী ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে দখল করে নিয়েছিল এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে এক নতুন দখলদারি-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, প্রায় সমস্ত ইউরোপের সঙ্গে বোঝাপড়া করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে ফ্রান্সের মর্যাদা বাড়াবার এবং সেনাবাহিনীর নতুন গৌরব লাভের একটা সুযোগ ছিল। ব্রিটেন ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রীজোটে যোগ দিল, অস্ট্রিয়া উভয়ের জন্যই শুভেচ্ছা দেখাল, একমাত্র বীর প্রাশিয়াই চুম্বন করল রুশ শাসনদণ্ডকে, যে-দণ্ড তাকে কিছুকাল আগেই শাস্তি দিয়েছে; এবং সে রুশীয়দের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলল। কিন্তু ব্রিটেন বা ফ্রান্স কেউই শত্রুর গুরুতর পরাজয় চায় নি, তাই যুদ্ধ শেষ হল

রাশিয়ার পক্ষে সামান্য কিছুটা অবমাননা এবং অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এক রুশ-ফ্রান্স মৈত্রীর মধ্যে*।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ফ্রান্সকে করে তুলল ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় শক্তি এবং

---

* ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১২) ছিল এক বিশাল, অতুলনীয় ভ্রান্তিবিলাস, সেখানে প্রত্যেক নতুন দৃশ্যে ভাবতে হত: এবারে কে প্রতারিত হবে? কিন্তু সেই ভ্রান্তিবিলাসের মূল্য দিতে হয়েছিল অপরিমেয় সম্পদ আর দশ লক্ষাধিক মানুষের জীবন দিয়ে। যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই অস্ট্রিয়া ডানিউব তীরবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি আক্রমণ করল; রুশীয়রা তাদের সামনে পশ্চাদপসরণ করল। এর ফলে, অস্ট্রিয়া যতদিন নিরপেক্ষ থাকছে ততদিন রাশিয়ার সীমান্তে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অসম্ভব হয়ে পড়ল। তবে, অস্ট্রিয়া এই সীমান্তে যুদ্ধে একজন মিত্র হতে ইচ্ছুক ছিল এই শর্তে যে পোল্যান্ড পুনরুদ্ধার করার জন্য এবং রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্ত দীর্ঘকালের জন্য ঠেলে পিছনে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সর্ববিধ গুরুত্বসহকারে এই যুদ্ধ চালাতে হবে। এতে টেনে আনা যেত প্রাশিয়াকেও, যার মারফৎ রাশিয়া তখনও তার আমদানি-সামগ্রী পাচ্ছিল। রাশিয়া তাহলে স্থলপথে ও জলপথে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ত এবং অচিরেই পরাস্ত হত। কিন্তু মিত্রপক্ষের পরিকল্পনায় তা প্রবেশ করে নি। বরং তারা গুরুতর যুদ্ধের বিপদ এড়াতে পেরে আনন্দিতই হয়েছিল। পামারস্টোন সামরিক-তৎপরতা ক্রিমিয়ায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন — রাশিয়া এটাই চাইছিল — এবং লুই নেপোলিয়ন তাতে সানন্দে রাজী হলেন। এখানে যুদ্ধটা একমাত্র সাজানো-যুদ্ধই হতে পারত, তাই প্রধান অংশগ্রহণকারীরা সবাই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু জার নিকোলাইয়ের মাথায় গুরুতর যুদ্ধ চালাবার বুদ্ধি ঢুকল এবং সেই সঙ্গে তিনি একথাও ভুলে গেলেন যে সাজানো-যুদ্ধের পক্ষে সে দেশ অনুকূল, কিন্তু গুরুতর যুদ্ধের পক্ষে প্রতিকূল। আত্মরক্ষায় রাশিয়ার যেটা শক্তি — তার ভূখণ্ডের বিপুল বিস্তৃতি, বিরল জনবসতি, পথঘাটের অভাব এবং আনুষঙ্গিক সম্পদের অভাব — সেটাই কোনো রুশ আক্রমণাত্মক যুদ্ধ হলে রাশিয়ারই বিরুদ্ধে চলে যায় আর তা ক্রিমিয়ার দিকে যতটা বেশি ততটা আর কোথাও নয়। দক্ষিণ রাশিয়ার যে স্তেপভূমি হানাদারদের কবরস্থান হওয়া উচিত ছিল, তা পরিণত হল রুশ সেনাবাহিনীরই কবরস্থানে, নির্মম ও জান্তব মূর্খতায় নিকোলাই একটির পর একটি বাহিনী — সব শেষে শীতকালের মাঝামাঝি সময়ে — পাঠিয়েছিলেন সেভাস্তোপোলে। তাড়াহুড়ো করে সংগ্রহ করা, এলোমেলোভাবে অস্ত্রসজ্জিত এবং আহার্যাদির অব্যবস্থাযুক্ত শেষ বাহিনীর কার্যকর অংশের দুই-তৃতীয়াংশ যখন ধ্বংস হল (তুষার ঝড়ে গোটা একেকটি ব্যাটেলিয়ন ধ্বংস হয়েছিল) এবং বাকিরা যখন শত্রুকে রুশ জমি থেকে বিতাড়িত করতে অক্ষম হল তখন উদ্ধত, নির্বোধ নিকোলাই শোচনীয়ভাবে ভেঙে পড়ে বিষপান করলেন। তারপর থেকে যুদ্ধটা আবার সাজানো-যুদ্ধ হয়ে উঠল এবং অচিরেই শান্তি স্থাপিত হল।

হঠকারী লুই নেপোলিয়ন হলেন তখনকার মহত্তম ব্যক্তি; অবশ্য সত্যি কথা বলতে কি, এতে খুব একটা বেশি কিছু বোঝায় না। যাই হোক, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্সের কোনো ভূখণ্ডগত সম্প্রসারণ ঘটে নি, তাই তার মধ্যে নিহিত ছিল নতুন যুদ্ধের বীজ; এই নতুন যুদ্ধেই লুই নেপোলিয়ন তাঁর প্রকৃত ব্রত, 'সাম্রাজ্য-বর্ধকের' ব্রত উদ্‌যাপন করবেন। এই নতুন যুদ্ধের মতলব আঁটা হয়েছিল প্রথম যুদ্ধ চলার সময়েই, কারণ সার্দিনিয়াকে পশ্চিমী শক্তিগুলির মৈত্রীজোটে যোগ দিতে দেওয়া হয়েছিল রাজতান্ত্রিক ফ্রান্সের তাঁবেদার হিসেবে এবং বিশেষ করে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তার ঘাঁটি হিসেবে; এই যুদ্ধের আরও প্রস্তুতি করা হয়েছিল রাশিয়ার সঙ্গে লুই নেপোলিয়নের শান্তি সম্পাদনের সময়ে (১৩), অস্ট্রিয়াকে শাস্তি দেওয়ার চাইতে বেশি কিছু যার কাম্য ছিল না।

লুই নেপোলিয়ন এখন ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর উপাস্য হয়ে উঠলেন। শুধু এই কারণে নয় যে ২ ডিসেম্বর, ১৮৫১ তারিখে (১৪) তিনি 'সমাজকে রক্ষা' করেছিলেন, কিন্তু তার দ্বারা বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক শাসনকে তিনি ধ্বংস করেছিলেন শুধু তার সামাজিক শাসন রক্ষা করার জন্য। শুধু এই জন্য নয় যে তিনি দেখিয়েছিলেন, অনুকূল অবস্থায় সর্বজনীন ভোটাধিকারকে পরিবর্তিত করে জনসাধারণের নিপীড়নের হাতিয়ারে পরিণত করা যায়। শুধু এই কারণে নয় যে তাঁর শাসনে শিল্প ও বাণিজ্য এবং বিশেষ করে ফাটকাবাজী ও শেয়ার-বাজারের কলকৌশলের অভূতপূর্ব বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল। বরং, প্রথমত ও প্রধানত, এই কারণে যে বুর্জোয়া শ্রেণী তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিল প্রথম 'মহান রাষ্ট্রনীতিককে', যিনি তাদের আত্মার আত্মীয়। তিনি ছিলেন প্রত্যেক খাঁটি বুর্জোয়ার মতো ভুঁইফোড়। 'সমস্ত ঝঞ্ঝা-ঝড় বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন', ইতালিতে তিনি ছিলেন একজন কারবোনারি-পন্থী ষড়যন্ত্রকারী, সুইজারল্যান্ডে গোলন্দাজ বাহিনীর অফিসার, ইংলন্ডে ঋণভার-জর্জরিত বিশিষ্ট পরিশীলিত ভবঘুরে ও বিশেষ কনস্টেবল (১৫), তা সত্ত্বেও সর্বদা সর্বত্র তিনি ছিলেন সিংহাসনের দাবিদার; তাঁর হঠকারিতাপূর্ণ অতীত আর সমস্ত দেশে নৈতিক কলঙ্ক নিয়ে তিনি নিজেকে তৈরি করেছিলেন ফরাসীদের সম্রাটের ভূমিকা এবং ইউরোপের ভাগ্যনিয়ন্তার ভূমিকার জন্য, ঠিক যেমন

দৃষ্টান্তস্থানীয় বুর্জোয়া, একজন মার্কিন কোটিপতির ভূমিকার জন্য নিজেকে তৈরি করে একের পর এক প্রকৃত ও জাল দেউলিয়া অবস্থা দিয়ে। সম্রাট হিসেবে তিনি রাজনীতিকে শুধু পুঁজিবাদী মুনাফা এবং শেয়ার-বাজারের কলকৌশলের স্বার্থেরই সেবায় লাগান নি, পুরোপুরি শেয়ার-বাজারের নিয়ম অনুযায়ী রাজনীতিও অনুসরণ করেছেন এবং 'জাতিসংক্রান্ত নীতি' নিয়ে ফাটকাবাজী করেছেন (১৬)। ফ্রান্সের পুরনো নীতিতে জার্মানি ও ইতালির বিভাজন ছিল ফ্রান্সের অলঙ্ঘ্য মৌলিক অধিকার; লুই নেপোলিয়ন অনতিবিলম্বেই সেই মৌলিক অধিকার একটু-একটু করে বিনিময় করতে শুরু করলেন তথাকথিত ক্ষতিপূরণের জন্য। ইতালি ও জার্মানিকে তাদের বিভাজন দূর করার জন্য সাহায্য করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন এই শর্তে যে জার্মানি ও ইতালিকে জাতীয় ঐক্যের দিকে প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য তাঁকে দাম দিতে হবে জমি ছেড়ে দিয়ে। এর ফলে শুধু যে ফরাসী জাত্যভিমানই তৃপ্ত হয়েছে, ক্রমে ক্রমে সাম্রাজ্য ১৮০১ সালের সীমান্ত (১৭) পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে তাই নয়, অধিকন্তু ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দিয়েছে আলোকপ্রাপ্ত শক্তি ও জাতিসমূহের মুক্তিদাতার অনন্য ভূমিকা এবং লুই নেপোলিয়নকে দিয়েছে নিপীড়িত জাতি-অধিজাতিগুলির রক্ষকের ভূমিকা। আর জাতীয় ধ্যানধারণার জন্য উৎসাহী গোটা আলোকপ্রাপ্ত বুর্জোয়া শ্রেণী — কারণ পৃথিবীর বাজারে ব্যবসার পথে সমস্ত বাধা দূরীকরণে তারা একান্তই আগ্রহী ছিল — এই বিশ্বমুক্তিদায়ক জ্ঞানালোকের দরুন সর্ববাদীসম্মতভাবে উল্লসিত হয়ে উঠল।

সূত্রপাত হয়েছিল ইতালিতে।* অস্ট্রিয়া সেখানে অবিভক্তভাবে শাসন চালিয়েছিল ১৮৪৯ সাল থেকে, আর অস্ট্রিয়া তখন ছিল সারা ইউরোপের বলির পাঁঠা। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অকিঞ্চিৎকর ফলাফলের দায়, যারা শুধুই একটা সাজানো-যুদ্ধ চেয়েছিল সেই পশ্চিমী শক্তিগুলির দ্বিধার উপরে চাপানো হল না, হল অস্ট্রিয়ার অস্থিরসংকল্প মনোভাবের উপরে, যার জন্য খোদ পশ্চিমী দেশগুলির চাইতে আর কেউ বেশি দায়ী ছিল না। ১৮৪৯

* এখানে পৃষ্ঠার পাশে এঙ্গেলস পেনসিলে 'অরসিনি' কথাটি লিখেছিলেন। — সম্পাঃ

সালে হাঙ্গেরিতে রাশিয়ার সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ, প্রুত-এ অস্ট্রিয়ানদের অগ্রগতি রাশিয়াকে এতই ক্ষুব্ধ করেছিল (যদিও সেই অগ্রগতিই রাশিয়াকে বাঁচিয়েছিল) যে অস্ট্রিয়ার উপরে প্রতিটি আক্রমণ সে সহর্ষে অবলোকন করেছে। প্রাশিয়াকে আর গ্রাহ্য করার দরকার ছিল না, প্যারিস সম্মেলনেই (১৮) তার প্রতি en canaille* আচরণ করা হয়েছিল। এইভাবে, 'আদ্রিয়াতিক পর্যন্ত' ইতালির মুক্তির জন্য যুদ্ধের ফন্দি আঁটা হয়েছিল রাশিয়ার অংশগ্রহণে, চালানো হয়েছিল ১৮৫৯-এর বসন্তকালে এবং শেষ হয়েছিল গ্রীষ্মকালে মিনচিও নদীর তীরে। অস্ট্রিয়া ইতালি থেকে বিতাড়িত হল না, ইতালি 'আদ্রিয়াতিক পর্যন্ত মুক্ত' হল না এবং ঐক্যবদ্ধ হল না, সার্দিনিয়া তার এলাকা প্রসারিত করল, কিন্তু ফ্রান্স লাভ করল স্যাভয় ও নীস্ এবং এইভাবে ইতালির সঙ্গে তার ১৮০১ সালের সীমান্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল (১৯)।

কিন্তু ইতালীয়রা এই অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিল না। সেই সময়ে ইতালিতে হস্তশিল্প কারখানারই প্রাধান্য ছিল, বৃহদায়তন শিল্প তখনও শৈশবাবস্থায়। শ্রমিক শ্রেণী তখনও পুরোপুরি দখলচ্যুত ও প্রলেতারীয় হয় নি। শহরে তখনও তার নিজস্ব উৎপাদনের উপায় ছিল, গ্রামাঞ্চলে শিল্প-শ্রম ছিল ছোট ছোট কৃষক-মালিক কিংবা প্রজাদের আনুষঙ্গিক পেশা। সুতরাং বুর্জোয়াদের কর্মোৎসাহ তখনও পর্যন্ত আধুনিক এক শ্রেণীসচেতন প্রলেতারিয়েত-বিরোধিতায় খণ্ডিত হয় নি। এবং যেহেতু ইতালির বিভাজন সেখানে অস্ট্রীয়দের বৈদেশিক শাসনের ফলেই রক্ষিত হয়েছিল এবং তাদেরই আশ্রয়ে রাজন্যরা তাদের কুশাসন চরমে নিয়ে গিয়েছিল, সেই হেতু সম্ভ্রান্ত বৃহৎ ভূস্বামীরা এবং শহরের সাধারণ মানুষ জাতীয় স্বাধীনতার প্রবক্তা হিসেবে বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করল। যাই হোক, ১৮৫৯ সালে ভেনিস ছাড়া বিদেশী শাসন সর্বত্র বিদূরিত হল; ফ্রান্স ও রাশিয়া ইতালিতে অস্ট্রিয়ার ভবিষ্যৎ হস্তক্ষেপ অসম্ভব করে তুলল, এবং তার ভয়ে কেউই আর ভীত থাকল না। গ্যারিবল্ডির মধ্যে ইতালি পেল পুরাকালের মর্যাদাসম্পন্ন এক বীরকে, যিনি অসাধ্যসাধনে সক্ষম এবং প্রকৃতপক্ষে তা করেওছিলেন। এক

* ইতরজন সুলভ। — সম্পাঃ

হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে তিনি সমগ্র নেপ্‌ল্‌স রাজ্য উচ্ছেদ করেন, বস্তুতপক্ষে ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং বোনাপার্টীয় রাজনীতির নিপুণ ঊর্ণা ছিন্নভিন্ন করে দেন। ইতালি মুক্ত এবং সারগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়— যদিও লুই নেপোলিয়নের কূটকৌশলে নয়, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

ইতালির যুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের (২০) বৈদেশিক নীতি কারও কাছে আর গোপন থাকল না। মহান নেপোলিয়নের বিজেতাদের শাস্তি দিতে হবে, কিন্তু l'un après l'autre — একের পর এক। রাশিয়া আর অস্ট্রিয়া তাদের প্রাপ্য পেয়ে গেছে, এর পরে প্রাশিয়ার পালা। আর প্রাশিয়ার প্রতি ঘৃণা ছিল আগেকার চাইতে অনেক বেশি; ইতালীয় যুদ্ধের সময় তার নীতি ছিল কাপুরুষসুলভ ও জঘন্য, ১৭৯৫ সালে বাসেল শান্তির (২১) সময়কার মতোই। সে তার 'খোলা-হাত নীতি' (২২) নিয়ে এমন জায়গায় গিয়ে পেঁছেছিল যেখানে সে ইউরোপে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন, এবং তার ছোট-বড় প্রতিবেশীরা তাকে কিমার মতো টুকরো-টুকরো করে কাটার দৃশ্য দেখার জন্য সানন্দে অপেক্ষা করে ছিল; তার হাত খোলা ছিল একটা জিনিস করার জন্যই — রাইন নদীর বাম তট ফ্রান্সকে ছেড়ে দেওয়া।

বস্তুতপক্ষে, ১৮৫৯ সালের অব্যবহিত পরবর্তী বছরগুলিতে সর্বত্র— এবং রাইন অঞ্চলের চাইতে বেশি আর কোথাও নয় — এই দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে উঠছিল যে বাম তট ফ্রান্সের হাতে চলে যাবে, তা আর পুনরুদ্ধার করা যাবে না। তা যে বিশেষভাবে কাম্য ছিল তা নয়, কিন্তু গণ্য করা হত নিয়তির লিখন হিসেবে, এবং সত্যি বলতে কি, তার জন্য বিশেষ শঙ্কাও ছিল না। ফরাসী আমলে সত্যিই স্বাধীনতা এসেছিল; সেই আমলের পুরনো স্মৃতি জাগ্রত হল কৃষক ও শহুরে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে; বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে অর্থপতি অভিজাততন্ত্র, বিশেষ করে কলোনে, গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়ল প্যারিসের Crédit Mobilier (২৩) এবং অন্যান্য বোনাপার্টপন্থী জুয়াচোর কোম্পানিগুলির চক্রান্তে; তারা উচ্চ কণ্ঠে রাজ্যাধিকার দাবি করতে লাগল।*

* মার্কস ও আমি ঘটনাস্থলে বারবার দেখেছি, রাইন অঞ্চলে সত্যিই এটা ছিল সাধারণ মনোভাব। বাম তটের শিল্পপতিরা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ফরাসী শুল্ক-হারে তাদের শিল্পের অবস্থা কেমন হবে।

কিন্তু, রাইন নদীর বাম তট হাতছাড়া হলে শুধু প্রাশিয়াই নয়, জার্মানিও দুর্বল হত। আর জার্মানি আগেকার যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি বিভক্ত ছিল। ইতালীয় যুদ্ধে প্রাশিয়ার নিরপেক্ষতার দরুন অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে বিচ্ছেদ অনেক বেড়ে গিয়েছিল; ক্ষুদ্র নৃপতিকুল এক নবরূপ-প্রাপ্ত রেনিশ কনফেডারেশনের (২৪) রক্ষক হিসেবে লুই নেপোলিয়নের দিকে তাকিয়ে ছিল আধেক শঙ্কা, আধেক আশার দৃষ্টি নিয়ে—এই ছিল সরকারী জার্মানির অবস্থা। এবং তাও এমন সময়ে যখন একমাত্র সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ শক্তিই অঙ্গচ্ছেদের বিপদ এড়াতে সক্ষম ছিল।

কিন্তু সমগ্র জাতির শক্তি ঐক্যবদ্ধ করা হবে কী করে? ১৮৪৮ সালের প্রচেষ্টা—তার প্রায় সবই ছিল অস্পষ্ট—ব্যর্থ হওয়ার পর এবং ঠিক সেই কারণেই কিছুটা অস্পষ্টতা কেটে যাবার পর খোলা ছিল মাত্র তিনটি পথ।

প্রথমটি ছিল, আলাদা আলাদা সমস্ত রাজ্যের বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে প্রকৃত একীকরণের পথ, অর্থাৎ খোলাখুলি বিপ্লবী পথ। ইতালি এই পথেই সদ্য তার লক্ষ্যে পৌঁছেছে; স্যাভয় রাজবংশ বিপ্লবে যোগ দিয়ে ইতালির রাজমুকুট লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের জার্মান স্যাভয়রা—হয়েনৎসলার্নরা, এমন কি তাঁদের বিসমার্কীয় ভঙ্গির দুঃসাহসিকতম কাভুররাও এরূপ সাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণে একান্তই অক্ষম ছিলেন। জনগণকে নিজেদেরই সব কিছু করতে হত—এবং রাইনের বাম তট নিয়ে যুদ্ধ হলে তারা প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারত। রাইন ছাড়িয়ে প্রুশীয়দের অনিবার্য পশ্চাদপসরণ, রাইন নদীতীরে দুর্গগুলির দীর্ঘ অবরোধ, এবং নিঃসন্দেহে যা দেখা দিত, সেই দক্ষিণ জার্মানির নৃপতিদের বিশ্বাসঘাতকতা একটি জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট হত, যে আন্দোলন সমগ্র রাজবংশীয় প্রথাকে বিদূরিত করতে পারত। সে ক্ষেত্রে, লুই নেপোলিয়নই সর্বপ্রথম তাঁর তরবারি কোষবদ্ধ করতেন। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য শুধু প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলির মধ্যেই বিরোধীদের দেখতে পেত, তাদের ব্যাপারে সে ফরাসী বিপ্লবের ধারাবাহী, জাতিসমূহের মুক্তিদাতার ভঙ্গিতে দাঁড়াতে পারত। বিপ্লব সম্পাদনকারী একটি জাতির বিরুদ্ধে তার কোনো ক্ষমতা থাকত না; বস্তুতপক্ষে, বিজয়ী জার্মান বিপ্লব সমগ্র ফরাসী সাম্রাজ্যের উচ্ছেদের প্রেরণা যোগাতে পারত। তা হত সবচেয়ে

ভালো ব্যাপার; সবচেয়ে খারাপ হত, নৃপতিরা যদি আন্দোলনকে করায়ত্ত করতে পারত, তাহলে রাইনের বাম তীর সাময়িকভাবে ফ্রান্সের হাতে চলে যেত, কিন্তু নৃপতিদের সক্রিয় বা অক্রিয় বিশ্বাসঘাতকতা প্রকট হয়ে পড়ত সারা পৃথিবীর কাছে এবং তা এমন এক বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করত যেখানে বিপ্লবের পথ ছাড়া, সমস্ত নৃপতির উচ্ছেদ ও ঐক্যবদ্ধ এক জার্মান প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ ছাড়া জার্মানির আর কোনো পথ থাকত না।

ঘটনাক্রমে, জার্মানির একীকরণের এই পথ নেওয়া যেত একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই, লুই নেপোলিয়ন যদি রাইন সীমান্তে যুদ্ধ শুরু করতেন। কিন্তু এই যুদ্ধ হয় নি, তার কারণ আমরা শীঘ্রই ব্যাখ্যা করব। ফলে জাতীয় একীকরণের প্রশ্নটিও আর একান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থাকল না, এই প্রশ্ন অবিলম্বে মীমাংসা করা যেত ধ্বংসের বিনিময়ে। আপাতত, জাতি অপেক্ষা করতে পারে।

দ্বিতীয় পথটি ছিল অস্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে একীকরণের পথ। ১৮১৫ সালে অস্ট্রিয়া সুবিন্যস্ত, সুসংলগ্ন ভূখন্ডবিশিষ্ট একটি রাষ্ট্রের অবস্থা ইচ্ছুকভাবেই বজায় রেখেছিল, নেপোলিয়নের যুদ্ধ এই ভূখন্ড তার উপরে চাপিয়ে দিয়েছিল। তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন দক্ষিণ জার্মানিতে তার প্রাক্তন অধিকৃত-অঞ্চলগুলির উপরে সে দাবি জানায় নি। রাজতন্ত্রের তখনও পর্যন্ত বিদ্যমান মূল অংশের সঙ্গে ভৌগোলিকভাবে ও রণনৈতিক দিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ পুরনো ও নতুন এলাকা দখল করেই সে সন্তুষ্ট ছিল। দ্বিতীয় জোসেফের রক্ষণমূলক শুল্ক দিয়ে যার শুরু, ইতালিতে প্রথম ফ্রানজ্ পুলিসি শাসনে যার বৃদ্ধি ঘটে এবং জার্মান সাম্রাজ্যের ভাঙন ও রেনিশ কনফেডারেশন গঠনের দরুন যা চরম অবস্থায় গিয়ে পৌঁছয়—জার্মানির বাকি অংশ থেকে জার্মান অস্ট্রিয়ার সেই পৃথকীকরণ বস্তুতপক্ষে ১৮১৫ সালের পর চলতে থাকে। মেটেরনিখ তাঁর রাষ্ট্র ও জার্মানির মধ্যে রীতিমতো এক চীনের প্রাচীর গড়ে তোলেন। শুল্কমাসুল আটকে রাখে জার্মানির বৈষয়িক সামগ্রীকে, সেন্সর প্রথা আটকে রাখে আত্মিক সামগ্রীকে, অবিশ্বাস্যতম পাসপোর্ট-সংক্রান্ত নিয়মকানুন ব্যক্তিগত যোগাযোগকে ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে আনে। এমন কি জার্মানিতেও যা অনন্যসাধারণ, এমন এক সার্বভৌমপন্থী নিষ্ঠুর শাসনের হাতে দেশ আভ্যন্তরিকভাবে যেকোনো, এমন কি মৃদুতম, রাজনৈতিক

আন্দোলন থেকে সুরক্ষিত ছিল। এইভাবে, জার্মানির সমগ্র বুর্জোয়া-উদারপন্থী আন্দোলন থেকে অস্ট্রিয়া পুরোপুরি সংস্রবহীন হয়ে ছিল। ১৮৪৮ সাল নাগাদ আত্মিক বাধা, অন্তত অনেকখানি পরিমাণে, ছিন্ন হয়েছিল, কিন্তু সেই বছরের ঘটনাবলী ও তার ফলাফল অস্ট্রিয়াকে জার্মানির বাকি অংশের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে নি। বরং, অস্ট্রিয়া এক বৃহৎ শক্তি হিসেবে তার স্বাধীন অবস্থানের উপরে আরও বেশি জোর দিতে লাগল। তার ফলে এই ঘটল যে জার্মান কনফেডারেশনের দুর্গগুলিতে (২৫) অস্ট্রীয় সৈনিকদের সবাই পছন্দ করলেও এবং প্রুশীয়দের ঘৃণা ও উপহাস করলেও, এবং ক্যাথলিক-প্রধান দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের সর্বত্র অস্ট্রিয়া তখনও জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় থাকলেও অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্বে জার্মানির একীকরণের কথা কেউই গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করত না, হয়তো ছোট ও মাঝারি জার্মান রাষ্ট্রগুলির সামান্য কয়েকজন ডিউক ছাড়া।

এর অন্যথা হওয়ার উপায় ছিল না। অস্ট্রিয়া নিজেই এর অন্যরকম কিছু চায় নি, যদিও সে সংগোপনে একটা সাম্রাজ্যের রোমাণ্টিক স্বপ্ন পোষণ করে চলছিল। কালক্রমে অস্ট্রিয়ার শুল্ক-সংক্রান্ত বেড়াই জার্মানির ভিতরে একমাত্র বৈষয়িক বিভাজন-রেখা হয়ে উঠেছিল, তাই তা আরও তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। স্বাধীন বৃহৎ শক্তিসুলভ নীতির কোনো অর্থই হয় না যদি তার দ্বারা বিশেষ করে অস্ট্রীয়, অর্থাৎ ইতালীয়, হাঙ্গেরীয় প্রভৃতি স্বার্থের কাছে জার্মান স্বার্থের বলিদানই না-বোঝায়। বিপ্লবের আগেকার মতো, পরেও অস্ট্রিয়া থাকল জার্মানিতে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র, আধুনিক প্রবণতা অনুসরণে সবচেয়ে অনিচ্ছুক, এবং তাছাড়া একমাত্র অবশিষ্ট বিশেষভাবে ক্যাথলিক বৃহৎ শক্তি। মার্চ-পরবর্তী সরকার (২৬) যতই যাজক ও জেশুইটদের পুরনো ব্যবস্থাপনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে লাগল, জনসমষ্টির এক থেকে দুই-তৃতীয়াংশ যেখানে প্রটেস্ট্যাণ্ট সেই দেশের উপরে তার একাধিপত্য ততই অসম্ভব হয়ে উঠল। আর, সব শেষে, অস্ট্রিয়ার অধীনে জার্মানির একীকরণের পূর্বশর্ত ছিল প্রাশিয়াকে চূর্ণ করা। যদিও এমনিতে জার্মানির পক্ষে এই ঘটনা কোনো বিপর্যয়স্বরূপ হত না, তাহলেও অস্ট্রিয়ার হাতে প্রাশিয়ার চূর্ণ হওয়া, রাশিয়ার বিপ্লবের সমাসন্ন বিজয়ের আগে প্রাশিয়ার হাতে অস্ট্রিয়ার চূর্ণ হওয়ার মতোই সমান

ক্ষতিকর হত (তার পরে তা নিরর্থক হয়ে উঠত, কারণ তখন সেই নিষ্প্রয়োজনীয় অস্ট্রিয়া নিজেই ভেঙে পড়ত)।

সংক্ষেপে, অস্ট্রিয়ার পক্ষপুটে জার্মান ঐক্য ছিল রোমাণ্টিক স্বপ্ন এবং ছোট ও মাঝারি রাষ্ট্রগুলির জার্মান নৃপতিরা ১৮৬৩ সালে যখন অস্ট্রিয়ার ফ্রানজ্ জোসেফকে জার্মানির সম্রাট রূপে ঘোষণা করার জন্য ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মাইন-এ সমবেত হলেন, তখন প্রমাণিত হল তা স্বপ্নই। প্রাশিয়ার রাজা* হাজিরই হলেন না, আর সম্রাট তৈরির মিলনান্ত নাটকটি ব্যর্থ হয়ে গেল।

বাকি ছিল তৃতীয় পথটি: প্রাশিয়ার নেতৃত্বাধীনে একীকরণ। আর যেহেতু প্রকৃতপক্ষে এই পথই নেওয়া হয়েছিল, সেই হেতু মানসিক জল্পনা-কল্পনার ক্ষেত্র থেকে আমরা ব্যবহারিক 'রিয়্যাল পলিটিক'-এর (২৭) দৃঢ়তর, এমন কি রীতিমত নোংরা জমিতে আসতে পারি।

দ্বিতীয় ফ্রিডরিখের সময় থেকে প্রাশিয়া জার্মানিকে এবং পোল্যান্ডকেও গণ্য করত দখল করার অঞ্চল বলে, সেখান থেকে যতটা পাওয়া যায় নিয়ে নিলেই হল, তবে অবশ্য এই কথা জেনে যে অপরের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে হবে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে, বিশেষ করে ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানিকে ভাগাভাগি করে নেওয়া ১৭৪০ সাল থেকেই প্রাশিয়ার 'জার্মান ব্রত' ছিল। 'Je vais, je crois, jouer votre jeu; si les as me viennent, nous partagerons' (আমার মনে হয়, আপনাদের খেলা আমি খেলব; আমি যদি টেক্কাগুলো পাই, আমরা তাহলে সেগুলো ভাগাভাগি করে নেব)—প্রথম যুদ্ধে যাওয়ার সময় (২৮) ফরাসী রাষ্ট্রদূতের কাছে এই ছিল ফ্রিডরিখের বিদায়কালীন উক্তি। এই 'জার্মান ব্রত' অনুযায়ী, বাসেল শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময়ে, ১৭৯৫ সালে জার্মানির প্রতি প্রাশিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করল, ভূখন্ড বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ফ্রান্সকে রাইনের বাম তীর ছেড়ে দিতে অগ্রিম সম্মত হল (৫ অগস্ট, ১৭৯৬-এর চুক্তিতে), এবং বাস্তবিকই রাশিয়া ও ফ্রান্সের নির্দেশে সাম্রাজ্যিক প্রতিনিধি সভার এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার দেশদ্রোহিতার পুরস্কার সংগ্রহ করল। ১৮০৫ সালে নেপোলিয়ন

---

* প্রথম ভিলহেল্ম। — সম্পাঃ

যখন তার সামনে হ্যানোভারকে টোপ হিসেবে আবার তুলে ধরলেন, সে তার মিত্র রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল — এই টোপ সে সব সময়েই গিলতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু নিজের মূঢ় কৌশলে সে এমনভাবে জড়িয়ে গেল যে তাকে বস্তুতই নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হল এবং ইয়েনায় তার প্রাপ্য উপযুক্ত শাস্তি পেল (২৯)। এই আঘাতের কথা মনে রেখে, ১৮১৩ ও ১৮১৪ সালের বিজয়ের পরেও তৃতীয় ফ্রিডরিখ ভিলহেল্ম সমস্ত পশ্চিম জার্মান ঘাঁটি ছেড়ে দিতে, উত্তর-পূর্ব জার্মানি দখলের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে এবং অস্ট্রিয়ার মতো, জার্মানি থেকে যতখানি সম্ভব সরে আসতে ইচ্ছুক ছিলেন — তাতে সমগ্র পশ্চিম জার্মানি রুশ অথবা ফরাসী অভিভাবকত্বে এক নতুন রেনিশ কনফেডারেশনে রূপান্তরিত হত। পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হল: ওয়েস্টফালিয়া ও রেনিশ প্রদেশকে রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর উপরে চাপিয়ে দেওয়া হল এবং সেগুলির সঙ্গে চাপানো হল এক নতুন 'জার্মান ব্রত'ও।

আপাতত, জমি দখলের পালা শেষ হল — ছোট ছোট জমির টুকরো কেনা ছাড়া। স্বদেশে পুরনো আমলাতান্ত্রিক য়ুঙ্কার প্রথার ক্রমে ক্রমে আবার বাড়বাড়ন্ত হতে শুরু করল; অতি দুঃসময়ে জনগণকে দেওয়া সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি নিয়তই ভাঙা হতে থাকল। তবু, এসব সত্ত্বেও, বুর্জোয়া শ্রেণীর উদয় আরও বেশি করে ঘটছিল প্রাশিয়াতেও, কারণ শিল্প ও বাণিজ্য ছাড়া গর্বিত প্রুশীয় রাষ্ট্রও এখন কিছুই নয়। ধীরে ধীরে, অনিচ্ছা সহকারে, হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় বুর্জোয়া শ্রেণীকে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ছেড়ে দিতেই হচ্ছিল। এক দিক দিয়ে, এই সব সুবিধাদান প্রাশিয়ার 'জার্মান ব্রতের' প্রতি সমর্থনের সম্ভাবনা তুলে ধরল: কারণ প্রাশিয়া তার দুটি অংশের মধ্যে বৈদেশিক শুল্কের বেড়া অপসারিত করার জন্য প্রতিবেশী জার্মান রাষ্ট্রগুলিকে একটি শুল্ক ইউনিয়ন গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানাল। এইভাবে সৃষ্টি হল শুল্ক ইউনিয়ন, ১৮৩০ সাল পর্যন্ত সেটি ছিল নিতান্তই ব্যর্থ আশা (তাতে যোগ দিয়েছিল শুধু হেসেন-ডার্মস্টাট), কিন্তু পরে, কিছুটা দ্রুততর হারে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবিকাশের ফলে তা অধিকাংশ অন্তঃ-জার্মান প্রদেশকে অর্থনৈতিকভাবে প্রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করল। অ-

প্রুশীয় তটবর্তী অঞ্চলগুলি ১৮৪৮ সালের পরেও এই ইউনিয়নের বাইরে ছিল।

শুল্ক ইউনিয়ন প্রাশিয়ার পক্ষে বড় একটা সাফল্য। এর অর্থ যে অস্ট্রিয়ার প্রভাবের উপরে জয়লাভ, সেই ঘটনাটি তার সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রধান বিষয়টি এই যে মাঝারি ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীকে তা প্রাশিয়ার পক্ষে টেনে এনেছিল। স্যাক্সনি ছাড়া, এমন কোনো জার্মান রাষ্ট্র ছিল না যার শিল্প এমন কি প্রাশিয়ার কাছাকাছি যাওয়ার মতো মাত্রায় বিকাশলাভ করেছে, এবং তার কারণ শুধু প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক পূর্বশর্তগুলিই নয়, বরং তার বৃহত্তর শুল্ক অঞ্চল ও আভ্যন্তরিক বাজারও। শুল্ক ইউনিয়ন যত প্রসার লাভ করতে লাগল, এবং তা যত বেশি করে ছোট ছোট রাষ্ট্রকে এই আভ্যন্তরিক বাজারে টেনে আনতে লাগল, এই সমস্ত রাষ্ট্রের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী তত বেশি করে প্রাশিয়াকে তার অর্থনৈতিক এবং পরে রাজনৈতিক নেতা বলেও গণ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। আর অধ্যাপকবৃন্দ বুর্জোয়া শ্রেণীর গানের তালে নাচতে লাগলেন। বার্লিনে হেগেলপন্থীরা যে কথা দার্শনিক দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন— যথা, প্রাশিয়ার দায়িত্ব জার্মানির নেতৃপদ বরণ করা — সে কথাই হাইডেলবের্গে শ্লোসারের শিষ্যরা, বিশেষ করে হাউসার ও গারভিনাস ঐতিহাসিক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন। এতে স্বভাবতই পূর্বানুমিত ছিল যে প্রাশিয়া তার সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে, বুর্জোয়া শ্রেণীর তাত্ত্বিকদের চাহিদা সে পূরণ করবে।*

এ সবই যে ঘটেছে, তার কারণ অবশ্য এই নয় যে প্রুশীয় রাষ্ট্রের প্রতি কোনো বিশেষ পক্ষপাত ছিল, যেমনটি ঘটেছিল ইতালীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বেলায় — পিয়েমোঁ প্রকাশ্যভাবে জাতীয় ও সাংবিধানিক আন্দোলনের নেতৃত্বে

---

* ১৮৪২ সালের *Rheinische Zeitung* (৩০) এই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রাশিয়ার প্রভুত্বের প্রশ্নটি আলোচনা করেছিল। অস্টেণ্ডে-তে সেই ১৮৪৩ সালের গ্রীষ্মকালেই গারভিনাস আমাকে বলেন: প্রাশিয়াকে জার্মানির নেতৃত্ব করতেই হবে, তবে এখানে তিনটি শর্ত পূর্বানুমিত: প্রাশিয়াকে অবশ্যই একটি সংবিধান দিতে হবে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে এবং আরও সুনির্দিষ্ট বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করতে হবে।

নিজেকে স্থাপিত করার পর ইতালীয় বুর্জোয়া শ্রেণী পিয়েমোঁকে মেনে নিয়েছিল নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্র বলে। এখানে কিন্তু তা করা হয়েছিল অনিচ্ছাভরে; বুর্জোয়া শ্রেণী প্রাশিয়াকে গ্রহণ করেছিল অপেক্ষাকৃত কম মন্দ হিসেবে, কারণ অস্ট্রিয়া তার বাজারে তাদের প্রবেশাধিকার দেয় নি, এবং কারণ অস্ট্রিয়ার তুলনায় প্রাশিয়ার তখনও কিছুটা বুর্জোয়া চরিত্র ছিল, সেটা যদি শুধু আর্থিক বিষয়ে তার নীচতা হয় তাও। অন্যান্য বৃহৎ শক্তির তুলনায় প্রাশিয়ার দুটি সুবিধা ছিল: সর্বজনীন বাধ্যতামূলক সৈন্যদলে নিয়োগ এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা। চরম প্রয়োজনের সময়ে সে এগুলি প্রবর্তন করেছিল, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সুদিনে সেগুলি অবহেলাভরে বলবৎ করে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করে তাকে অন্তঃসারশূন্য করে তুলেই তুষ্ট ছিল— কোনো কোনো অবস্থায় এই অন্তঃসারটি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু সেগুলির অস্তিত্ব কাগজে থেকেই গিয়েছিল এবং কোনোদিন জনসাধারণের সুপ্ত ক্ষমতাকে এমন এক মাত্রায় অনাবৃত করা যাবে, যা সমানভাবে বিপুল জনসংখ্যাবিশিষ্ট অন্য কোনো জায়গায় অর্জন করা যাবে না—এমন এক সম্ভাবনা প্রাশিয়া পেয়েছিল। বুর্জোয়া শ্রেণী এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিল: ১৮৪০ সাল নাগাদ এক বছরের বাধ্যতামূলক সৈনিকদের পক্ষে, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের ছেলেদের পক্ষে, জাতীয় সেবা থেকে নিজেদের মুক্তি ক্রয় করা সহজ এবং অপেক্ষাকৃত শস্তা ছিল, বিশেষ করে এই জন্য যে খোদ সেনাবাহিনীই বণিক ও শিল্পমহল থেকে আসা ল্যান্ডভের (৩১) অফিসারদের উপরে খুব একটা গুরুত্ব আরোপ করত না। বাধ্যতামূলক শিক্ষার ফলে প্রাশিয়ায় তখনও পর্যন্ত নিঃসন্দেহে কিছুটা প্রাথমিক জ্ঞানসম্পন্ন লোক তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যায় যে পাওয়া যেত, সেটা বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী ছিল; বৃহদায়তন শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তা এমন কি অপ্রতুল হয়ে উঠল।*

---

* 'কুলটুরকাম্‌ফ'-এর (৩২) আমলেও রাইন তীরবর্তী শিল্পপতিরা আমার কাছে অনুযোগ করেছে যে অন্য দিক দিয়ে চমৎকার শ্রমিকদের তারা সুপারভাইজারের পদে উন্নীত করতে পারছে না, কারণ তাদের স্কুলে লব্ধ জ্ঞান যথেষ্ট নয়। ক্যাথলিক অঞ্চলগুলিতে একথাটা বিশেষভাবেই সত্য ছিল।

দুটি প্রতিষ্ঠানের বিরাট খরচ,* যার ফলে প্রচন্ড করভার বৃদ্ধি হচ্ছিল, সে বিষয়ে অভিযোগ করত প্রধানত পেটি বুর্জোয়ারা; ঊর্ধ্বগামী বুর্জোয়ারা হিসাব করে দেখেছিল যে বৃহৎ শক্তি হিসেবে প্রাশিয়ার ভবিষ্যৎ অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত বিরক্তিকর অথচ অনিবার্য ব্যয় অধিকতর মুনাফা দিয়ে ভালোভাবেই পুষিয়ে যাবে।

সংক্ষেপে, প্রুশীয় সদাশয়তা সম্পর্কে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর কোনো মোহ ছিল না। ১৮৪০ সাল থেকে তাদের কাছে প্রুশীয় প্রাধান্যের ধারণা যদি প্রিয় হয়ে থাকে, তবে তা একমাত্র এই জন্য এবং সেই পরিমাণেই যে-পরিমাণে প্রুশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী তার দ্রুততর অর্থনৈতিক বিকাশের দরুন জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল, একমাত্র এই জন্য ও সেই পরিমাণেই, যে-পরিমাণে পুরনো-সাংবিধানিক দক্ষিণাঞ্চলের রটেক ও ভেলকাররা প্রুশীয় উত্তরাঞ্চলের কাম্প্‌হাউজেন, হান্‌জেমান ও মিলডেদের দ্বারা ছায়াবৃত হয়ে গিয়েছিল, এবং আইনজীবী ও অধ্যাপকরা ছায়াবৃত হয়েছিল বণিক ও শিল্পোৎপাদকদের দ্বারা। বস্তুতপক্ষে, ১৮৪৮-এর ঠিক পূর্ববর্তী বছরগুলিতে প্রুশীয় উদারপন্থীদের মধ্যে, বিশেষ করে রাইন অঞ্চলে, এমন এক বিপ্লবী প্রবণতা গড়ে উঠেছিল, সারগতভাবে যা দক্ষিণ জার্মানির অঞ্চল-মণ্ডূক উদারপন্থীদের (৩৩) চাইতে আলাদা। সেই সময়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৬শ শতাব্দীর পরবর্তীকালের দুটি শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক লোকগীতি: একটি গান বুর্গেরমেস্টার ৎশেখ সম্পর্কে এবং অন্যটি — ব্যারনেস ফন ড্রোস্টে-ফিশারিং সম্পর্কে (৩৪), যাঁদের উচ্ছৃঙ্খলতা এখনকার বয়স্ক ব্যক্তিদের আতঙ্কিত করে তোলে; এঁরা ১৮৪৬ সালে হালকা মেজাজে গাইতেন:

আমাদের বেচারা বুর্গেরমেস্টার ৎশেখ
তার মতো দুর্ভাগা আর কে বলো,
দু-হাত থেকে গুলি করল ফ্যাটির গায়ে
তবুও হায়, বুলেট তার ফসকে গেল!

---

* পৃষ্ঠার পাশে এঙ্গেলস লিখেছিলেন: 'বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য মাধ্যমিক স্কুল'। — সম্পাঃ

কিন্তু শীঘ্রই এ সবের পরিবর্তন ঘটতে চলেছিল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরেই এল ভিয়েনায় মার্চের দিনগুলি এবং ১৮ মার্চের বার্লিন বিপ্লব (৩৫)। বুর্জোয়া শ্রেণী জয়যুক্ত হল, গুরুতর কোনো লড়াই তাদের করতে হল না, এমন কি তারা গুরুতর লড়াই চায়ও নি। যে বুর্জোয়া শ্রেণী অল্প কিছুকাল আগেও সে-কালের সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নিয়ে মাতামাতি করেছিল (বিশেষ করে রাইন অঞ্চলে), তারা হঠাৎ লক্ষ করল যে তারা এক-একজন শ্রমিককে লালিত করে নি, করেছে এক শ্রমিক **শ্রেণীকে**—এখনও পর্যন্ত অর্ধ-স্বপ্নালু কিন্তু ক্রমে ক্রমে জাগরণোন্মুখ এবং, তার আন্তর চরিত্রের দরুন, এক বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে। এই প্রলেতারিয়েত সর্বত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য বিজয় এনে দিয়েছে, তারা ইতিমধ্যেই, বিশেষ করে ফ্রান্সে, এমন সব দাবি উপস্থিত করছিল যা সমগ্র বুর্জোয়া ব্যবস্থার সঙ্গেই বেমানান; প্যারিসে দুটি শ্রেণীর মধ্যে সর্বপ্রথম প্রচণ্ড সংগ্রাম হয় ২৩ জুন ১৮৪৮ তারিখে, এবং চার দিনের লড়াইয়ের পর প্রলেতারিয়েত পরাস্ত হয় (৩৬)। তখন থেকে সারা ইউরোপে সাধারণ বুর্জোয়া শ্রেণী প্রতিক্রিয়ার পক্ষ অবলম্বন করেছে এবং শ্রমিকদের সাহায্যে নিয়ে যাদের তারা সবে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল সেই সার্বভৌমপন্থী আমলা, সামন্ত ও যাজকদের সঙ্গেই জোট বেঁধেছে 'সমাজের শত্রু', সেই শ্রমিকদেরই বিরুদ্ধে।

প্রাশিয়ায় তা যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা এই: বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেরাই যাদের নির্বাচিত করেছিল সেই প্রতিনিধিদের অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করল, এবং গোপন অথবা অভিব্যক্ত উল্লাসে নভেম্বর ১৮৪৮-এ সরকারের হাতে তাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে দেখল (৩৭)। একথা সত্যি, যে য়ুঙ্কার-আমলাতান্ত্রিক মন্ত্রিসভা প্রাশিয়ায় গোটা একটি দশকের জন্য নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠ করেছিল, তাকে সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুযায়ীই শাসন করতে হয়েছিল, কিন্তু এই মন্ত্রিসভা এমন কি প্রাশিয়াতেও অভূতপূর্ব ছোটখাট হয়রানি আর ব্যাঘাতসৃষ্টির একটা ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করল, এতে বুর্জোয়া শ্রেণীর চাইতে বেশি কষ্টভোগ আর কেউ করে নি। কিন্তু শেষোক্তরা অনুতাপভরে খোলসের মধ্যে ঢুকে গেল আর তাদের উপরে বর্ষিত লাথি-ঘুষি বিনম্রভাবে মাথা পেতে নিল তাদের পূর্বতন বিপ্লবী কর্মপ্রয়াসের শাস্তি হিসেবে, এবং ক্রমে ক্রমে ভাবতে শিখল ও

পরবর্তীকালে উচ্চকণ্ঠে তা ব্যক্তও করল: হ্যাঁ, ঠিকই, আমরা সত্যিই কুত্তা!

তারপরে এল অন্তর্বর্তীকালের জন্য রাজপ্রতিনিধির কার্যকাল (রিজেন্সি)। সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য প্রমাণের জন্য মানটুফেল আইনসম্মত উত্তরাধিকারী, বর্তমান সম্রাটকে* গুপ্তচর দিয়ে ঘিরে ফেললেন, পুটকামের এখন *Sozialdemokrat* পত্রিকার (৩৮) সম্পাদকীয় দপ্তরকে ঠিক যেমনটি করছেন। আইনসম্মত উত্তরাধিকারী যখন অন্তর্বর্তীকালের জন্য রাজপদে অধিষ্ঠিত (রিজেণ্ট) হন, মানটুফেল সঙ্গে সঙ্গে বিতাড়িত হন, শুরু হয় 'নবযুগ' (৩৯)। কিন্তু এ ছিল শুধু দৃশ্য পরিবর্তন। যুবরাজ রিজেণ্ট প্রসন্ন হয়ে বুর্জোয়াদের আবার উদার হওয়ার অনুমতি দিলেন। বুর্জোয়া শ্রেণী সানন্দে এই অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করল, কিন্তু তারা ভেবেছিল পরিস্থিতি এখন পুরোপুরি তাদেরই আয়ত্তে এবং প্রুশীয় রাষ্ট্রকে তাদেরই সুরের সঙ্গে নাচতে হবে। বশংবদ ভৃত্যসুলভ ভাষায় যাদের 'কর্তৃত্বপূর্ণ মহল' বলা হত, তাদের সেটা আদৌ অভিপ্রেত ছিল না। 'নবযুগের' জন্য উদারপন্থী বুর্জোয়া শ্রেণীকে যে মূল্য দিতে হল, তা হল সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস। প্রকৃতপক্ষে, সর্বজনীন বাধ্যতামূলক সেনাদলে যোগদান ১৮১৬ সাল নাগাদ যতখানি কার্যকর হত, সরকার শুধু ততটুকুরই রূপায়ণ দাবি করেছিল। উদারপন্থী বিরোধীপক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে, এর বিরুদ্ধে একেবারেই এমন কিছু বলার ছিল না যা একই সঙ্গে প্রাশিয়ার কর্তৃত্ব ও তার জার্মান ব্রত সম্পর্কে তাদের নিজেদেরই কথার বিপরীত হত না। কিন্তু উদারপন্থী বিরোধীপক্ষ তাদের সম্মতির একটি শর্ত হিসেবে দাবি করল যে কার্যকালের মেয়াদ আইনত দুই বছরে সীমাবদ্ধ করা হোক। এমনিতে দাবিটা রীতিমতো যুক্তিসংগত; কিন্তু প্রশ্ন হল তা অর্জন করা যেত কি না, উদারপন্থী বুর্জোয়া শ্রেণী শেষ পর্যন্ত এই শর্তের উপরে জোর দিতে প্রস্তুত ছিল কি না, তাদের সম্পত্তি ও জীবন বিপন্ন করার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল কি না। সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে কার্যকালের মেয়াদ তিন বছর করার ব্যাপারে অটল হয়ে রইল, প্রতিনিধি সভা (চেম্বার) জোর দিল দু-বছরের উপরে, ফলে বিরোধ দেখা দিল (৪০)। আর সামরিক প্রশ্ন নিয়ে বিরোধ দেখা দেওয়ায় বৈদেশিক নীতি আরেকবার আভ্যন্তরিক নীতির পক্ষেও নিয়ামক হয়ে উঠল।

* প্রথম ভিলহেল্ম। — সম্পাঃ

আমরা দেখেছি প্রাশিয়া কিভাবে ক্রিমিয়া ও ইতালির যুদ্ধে তার অবস্থানের দরুন তার শেষ যেটুকু মর্যাদা তখনও পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল তাও খুইয়েছে। সেই শোচনীয় নীতির যাথার্থ্য আংশিকভাবে প্রমাণ করা যায় তার সেনাবাহিনীর দুরবস্থা দিয়ে। ১৮৪৮ সালের আগেও যেহেতু তালুকগুলির (এস্টেট) সম্মতি ব্যতিরেকে নতুন কর প্রবর্তন করা যায় নি অথবা নতুন ঋণ ছাড়া যায় নি, এবং যেহেতু কেউই এই উদ্দেশ্যে এস্টেটগুলিকে সমবেত করতে ইচ্ছুক ছিল না, সেই জন্য সেনাবাহিনীর জন্য কখনই যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যায় নি, এই সীমাহীন কার্পণ্যের ফলে সেনাবাহিনীর সর্বনাশ ঘটে। বাকিটা করে তৃতীয় ফ্রিডরিখ ভিলহেল্মের অধীনে বিদ্যমান কুচকাওয়াজ ও সামরিক অনুশীলনের মনোভাব। ১৮৪৮ সালে ডেনমার্কের রণক্ষেত্রগুলিতে এই কুচকাওয়াজি সেনাবাহিনী কী অসহায়তার পরিচয় দিয়েছিল তা কাউণ্ট ভাল্ডারসির লেখায় পড়া যায়। ১৮৫০ সালের সৈন্যসমাবেশ পরিপূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় (৪১): প্রত্যেক জিনিসের অভাব ছিল, যা পাওয়া যাচ্ছিল তাও ছিল অকেজো। একথা সত্যি, এ ব্যাপারে প্রতিনিধি সভার মঞ্জুরীকৃত অর্থ সাহায্য করেছিল, সেনাবাহিনী ধাক্কা খেয়ে সংকীর্ণ নির্দিষ্ট গন্ডীর বাইরে বেরিয়ে এল, অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুচকাওয়াজকে স্থানান্তরিত করত রণক্ষেত্রের তৎপরতা। কিন্তু সংখ্যার দিক দিয়ে সেনাবাহিনী ১৮২০ সাল নাগাদ যে-অবস্থায় ছিল, তখনও ছিল সেই অবস্থাতেই, পক্ষান্তরে অন্য সমস্ত বৃহৎ শক্তি, বিশেষ করে এখন যে প্রধান বিপদস্বরূপ, সেই ফ্রান্সও, তাদের সশস্ত্র সৈন্যবল অনেকখানি বাড়িয়েছিল। অথচ প্রাশিয়ায় ছিল সর্বজনীন বাধ্যতামূলক সেনাদলে যোগদানের নিয়ম, কাগজে প্রত্যেক প্রুশীয় ব্যক্তিই একজন সৈনিক, কিন্তু জনসংখ্যা যেখানে ১ কোটি ৫ লক্ষ (১৮১৭) থেকে বেড়ে হয়েছিল ১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৫০ হাজার (১৮৫৮), সেখানে সেনাবাহিনীর কাঠামো সেনাদলে কাজ করার যোগ্য সমস্ত পুরুষের এক-তৃতীয়াংশের বেশির স্থান-সংকুলান ও প্রশিক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সরকার এখন ১৮১৭ সালের পর থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রায় যথাযথভাবে মিলে যায় সেইভাবে সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির দাবি জানাল। কিন্তু সেই উদারপন্থী প্রতিনিধিরা যাঁরা ক্রমাগত দাবি জানিয়ে আসছিলেন এই বলে যে সরকার জার্মানির নেতৃত্ব গ্রহণ করুক,

বিদেশে তার রাজনৈতিক প্রভাব সুরক্ষিত করুক এবং জাতিসমূহের মধ্যে জার্মানির মর্যাদা পুনরুদ্ধার করুক—সেই একই ব্যক্তিরা দর-কষাকষি করতে লাগলেন এবং কার্যকালের দু-বছর মেয়াদের ভিত্তিতে ছাড়া কোনো কিছু মঞ্জুর করতে অস্বীকার করলেন। তাঁদের যে ইচ্ছার উপরে তাঁরা এত একগুঁয়েভাবে জোর দিচ্ছিলেন, তা বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা কি তাঁদের ছিল? জনগণ কিংবা অন্তত বুর্জোয়া শ্রেণী কি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থেকে তাঁদের সমর্থন করেছিল?

বরং তার উল্টো। বুর্জোয়া শ্রেণী বিসমার্কের সঙ্গে পরমোল্লাসে বাক্‌যুদ্ধ চালিয়ে গেল এবং প্রকৃতপক্ষে এমন এক আন্দোলন সংগঠিত করল না, অচেতনভাবে হলেও, বস্তুতপক্ষে প্রুশীয় প্রতিনিধি সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের নীতির বিরুদ্ধে চালিত। হল্‌স্টাইন সংবিধানের উপরে ডেনমার্কের হস্তক্ষেপ এবং শ্লেজভিগকে বলপূর্বক ডেনমার্কীয় করার চেষ্টায় জার্মান বুর্জোয়া ক্ষুব্ধ হল। বৃহৎ শক্তিবর্গের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পেতে সে অভ্যস্ত; কিন্তু ক্ষুদ্র ডেনমার্ক তাকে লাথি মেরে যাবে এতে তার ক্রোধের উদ্রেক হল। গঠিত হল জাতীয় লীগ (৪২); ছোট ছোট রাষ্ট্রের বুর্জোয়া শ্রেণীই ছিল এর শক্তি। আর হাড়ে-মজ্জায় উদারপন্থী জাতীয় লীগ প্রথমত ও প্রধানত দাবি করল প্রাশিয়ার নেতৃত্বাধীনে জাতীয় একীকরণ, সম্ভব হলে এক উদারপন্থী প্রাশিয়া, মন্দপক্ষে প্রাশিয়া যেমন ছিল তেমন। পৃথিবীর বাজারে জার্মানরা দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেদের মতো যে জঘন্য স্থান অধিকার করে ছিল, অবশেষে তার অবসান ঘটানো, ডেনমার্ককে শাস্তি দেওয়া, শ্লেজভিগ-হল্‌স্টাইনে বৃহৎ শক্তিদের কাছে নিজেদের পরাক্রম দেখানো—এই ছিল জাতীয় লীগের প্রধান প্রধান দাবি। প্রুশীয় কর্তৃত্বের দাবি এখন ১৮৫০ সালের আগে তার উপরে আরোপিত অস্পষ্টতা ও মোহজাল থেকে মুক্ত। এ কথা এখন নিশ্চিতরূপেই জানা গেল যে এর অর্থ জার্মানি থেকে অস্ট্রিয়ার বহিষ্কার, ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্বের প্রকৃত বিলুপ্তি, এবং কোনোটিই গৃহযুদ্ধ এবং জার্মানির বিভাজন ছাড়া অর্জন করা যাবে না। কিন্তু গৃহযুদ্ধের কোনো আশঙ্কা আর ছিল না এবং বিভাজনটা অস্ট্রীয় শুল্ক-সংক্রান্ত বিধিনিষেধের অন্তফলের চাইতে বেশি কিছু নয়। জার্মানির শিল্প ও বাণিজ্য বিকাশের এমন এক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল, পৃথিবীর বাজারকে বেষ্টন করে জার্মান

বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির জাল এত বিস্তীর্ণ ও ঘন হয়ে উঠেছিল যে স্বদেশে ছোট ছোট রাষ্ট্রের ব্যবস্থা আর বিদেশে অধিকার ও রক্ষণমূলক আশ্রয়ের অভাব অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আর, জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর এযাবৎকালের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন যখন বার্লিনের প্রতিনিধিদের প্রতি কার্যত অনাস্থাসূচক ভোট দিল, তখনও শেষোক্তরা কার্যকালের মেয়াদ নিয়ে দরাদরি করে চললেন!

বিসমার্ক যখন বৈদেশিক রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন এই ছিল অবস্থা।

লুই নেপোলিয়নকে হঠকারী ফরাসী সিংহাসনের দাবিদার থেকে প্রুশীয় গ্রামপ্রান্তীয় য়ুঙ্কার এবং জার্মান ছাত্র-সমিতির সদস্যে রূপান্তরিত করলে যা দাঁড়ায়, বিসমার্ক ঠিক তাই। ঠিক লুই নেপোলিয়নের মতো, বিসমার্ক বিরাট বাস্তব বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং উপায়-উদ্ভাবনদক্ষ ব্যক্তি, জন্মগত ও সুচতুর ব্যবসায়ী, ভিন্ন পরিস্থিতিতে যিনি নিউ ইয়র্কের শেয়ার-বাজারে ভ্যান্ডারবিল্ট আর জেই গুল্ডদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতেন; বস্তুতপক্ষে, সুযোগ মতো নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি মন্দ সাফল্য লাভ করেন নি। কিন্তু এই প্রখর বাস্তব বোধশক্তির সঙ্গে প্রায়শই থাকে তদনুরূপ সংকীর্ণমনস্কতা, আর এ ব্যাপারে বিসমার্ক তাঁর ফরাসী পূর্বসূরীকে ছাড়িয়ে গেছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁর ভবঘুরেবৃত্তির বছরগুলিতে নিজেই নিজের 'নেপোলিয়নীয় ধ্যানধারণা' (৪৩) তৈরি করেছিলেন — যার ছাপ সেগুলির উপরে আছে — কিন্তু আমরা দেখতে পাব, বিসমার্ক কখনোই তাঁর নিজস্ব কোনো রাজনৈতিক ধ্যানধারণার ইঙ্গিতটুকু পর্যন্ত লাভ করতে পারেন নি, সর্বদাই অপরের তৈরি ধ্যানধারণা নতুন করে গ্রহণ করেছেন। যাই হোক, এই সংকীর্ণমনস্কতাই ছিল তাঁর সৌভাগ্য। তা না হলে পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসকে সুনির্দিষ্ট প্রুশীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে তিনি কখনই সক্ষম হতেন না; আর এই স্বভাবসিদ্ধ প্রুশীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোথাও যদি এমন কোনো ফাটল থাকত যার মধ্যে দিয়ে দিবালোক প্রবেশ করতে পারে, তাহলে তিনি তাঁর সমগ্র কর্মব্রতে গোলমাল করে ফেলতেন এবং সেটাই হত তাঁর গৌরবহানির কারণ। বাইরে থেকে নির্দেশিত তাঁর বিশেষ ব্রত যখন তিনি তাঁর নিজস্ব কায়দায় উদ্‌যাপন

করেন, সত্যিই, তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, এবং তাঁর যুক্তিসংগত ধ্যানধারণার নিরতিশয় অভাব ও তাঁর নিজের সৃষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতি অনুধাবনে তাঁর অক্ষমতার দরুন তাঁকে বাধ্য হয়ে কোন তুর্কি-নাচন নাচতে হয়েছিল, তা আমরা দেখতে পাব।

লুই নেপোলিয়নের অতীত যেমন তাঁকে শিখিয়েছিল পদ্ধতি-বাছাইয়ের বিন্দুমাত্র বিচার-বিবেচনা না-করতে, বিসমার্ক শিক্ষা নিয়েছিলেন প্রুশীয় নীতি থেকে, বিশেষ করে তথাকথিত মহান নির্বাচকের* এবং দ্বিতীয় ফ্রিডরিখের নীতি থেকে—আরও বেশি অবিবেকী হতে এবং তবুও পিতৃভূমির ঐতিহ্যের প্রতি সৎ থাকার মহৎ ভাব অর্জনে সক্ষম হতে। তাঁর ব্যবসায়-বুদ্ধি তাঁকে শিখিয়েছিল প্রয়োজন হলে তাঁর য়ুঙ্কার প্রবৃত্তি দমন করতে; যখন আর প্রয়োজন নেই তখনই সেগুলি আবার প্রচণ্ডভাবে প্রকট হয়ে উঠত; এটা নিঃসন্দেহে ছিল তাঁর পতনের একটা লক্ষণ। তাঁর রাজনৈতিক পদ্ধতি ছিল ছাত্র-সংঘের একজন সদস্যের মতো, পানশালায় ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তৈরি ছাত্রদের বীয়ার পানের সংকেতবাক্যের মজাদার আক্ষরিক ব্যাখ্যার মতো—এবং তিনি তা অশোভনভাবে প্রতিনিধি সভায় ব্যবহার করেছিলেন প্রুশীয় সংবিধানের ক্ষেত্রে; কূটনীতিতে নতুন যা কিছু তিনি প্রবর্তন করেছেন, সবই ছাত্রাবস্থা থেকে ধার করা। লুই নেপোলিয়ন প্রায়শই চূড়ান্ত মুহূর্তে ইতস্তত করতেন, যেমন ১৮৫১ সালে কু দে'তা-র সময়ে, যখন মর্নিকে রীতিমতো জোর করে তাঁকে দিয়ে তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করাতে হয়েছিল; কিংবা ১৮৭০-এর যুদ্ধের প্রাক্কালে, যখন তাঁর দ্বিধা তাঁর গোটা অবস্থানকেই বিনষ্ট করে দিয়েছিল, কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে বিসমার্কের ক্ষেত্রে তা কখনও ঘটে নি। তাঁর ইচ্ছাশক্তি কখনও তাঁকে পরিত্যাগ করে নি, অচিরেই তা রূপান্তরিত হয়েছে প্রকাশ্য পাশবিকতায়। আর অন্য সব কিছুর তুলনায়, এটাই ছিল তাঁর সাফল্যের গোপন রহস্য। জার্মানির সমস্ত শাসক শ্রেণী, য়ুঙ্কার ও বুর্জোয়ারা এমনভাবে তাদের কর্মোদ্যমের অবশেষতম অংশটুকুও হারিয়েছিল, 'শিক্ষিত' জার্মানিতে ইচ্ছা না-থাকাটাই এমন রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার ফলে তাদের

* ফ্রিডরিখ ভিলহেল্ম। — সম্পাঃ

মধ্যে একমাত্র যে-মানুষটির তখনও ইচ্ছাশক্তি ছিল তিনিই তার দরুন তাদের মধ্যে হয়ে উঠলেন মহত্তম ব্যক্তি এবং তাদের সকলের যদৃচ্ছ শাসক, তাদের কথায় তারা তাদের সুবুদ্ধি ও বিবেকের বিরুদ্ধে যেকোনো কাজ করতে রাজী। একথা সত্যি যে 'অশিক্ষিত' জার্মানিতে অবস্থা এখনও এই জায়গায় এসে দাঁড়ায় নি; শ্রমজীবী জনগণ দেখিয়েছে যে তারা এমন এক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, যার বিরুদ্ধে বিসমার্কের প্রবল ইচ্ছাশক্তিও জয়ী হতে অপারগ।

আমাদের এই ব্রান্ডেন্‌বুর্গ য়ুঙ্কারের সামনে এক উজ্জ্বল কর্মজীবন পড়ে ছিল, শুধু যদি তাঁর সাহস থাকত এবং থাকত নিজেকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার বোধ। লুই নেপোলিয়ন কি বুর্জোয়া শ্রেণীর উপাস্য হয়ে ওঠেন নি ঠিক এই কারণেই যে তাদের মুনাফা বাড়িয়ে দিয়ে তিনি তাদের পার্লামেণ্ট ভেঙে দিয়েছিলেন? আর জাল নেপোলিয়নের মধ্যে যে প্রতিভাকে বুর্জোয়ারা এত শ্রদ্ধা করত, বিসমার্কের কি সেই ব্যবসায়িক প্রতিভা ছিল না? লুই নেপোলিয়ন তাঁর ফুল্দের প্রতি যতটা আসক্ত ছিলেন, তিনি কি তাঁর ব্লাইখরোডারের প্রতি ততটাই আসক্ত ছিলেন না? প্রতিনিধি সভায় যারা কার্পণ্যবশত সামরিক কার্যকালের মেয়াদ কমাবার চেষ্টা করেছিলেন সেই বুর্জোয়া প্রতিনিধিবৃন্দ আর যারা যেকোনো মূল্যে জাতীয় কর্মতৎপরতা, যার জন্য একটি সেনাবাহিনী একান্ত আবশ্যক এমন কর্মতৎপরতা দাবি করেছিল, জাতীয় লীগে সেই বাইরের বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ১৮৬৪ সালে জার্মানিতে কি একটা বিরোধ ছিল না? ১৮৫১ সালে ফ্রান্সে প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতাকে যারা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছিল, প্রতিনিধি সভার ভিতরকার সেই বুর্জোয়ারা এবং যারা যেকোনো মূল্যে নিরুপদ্রব ও শক্তিশালী এক সরকার চেয়েছিল সেই বাইরের বুর্জোয়াদের মধ্যে বিদ্যমান যে বিরোধের মীমাংসা লুই নেপোলিয়ন করেছিলেন পার্লামেণ্টে বিতণ্ডাকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে এবং বুর্জোয়াদের চরম শান্তি দিয়ে, এই বিরোধ কি তারই অনুরূপ ছিল না? জার্মানির পরিস্থিতি কি এক দুঃসাহসিক অভ্যুত্থানের পক্ষে আরও উপযুক্ত ছিল না? সৈন্যবাহিনীর পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনা কি বুর্জোয়া শ্রেণী তৈরি-অবস্থায় সরবরাহ করে নি, এবং তারা কি উচ্চকণ্ঠে এমন একজন উৎসাহী প্রুশীয় রাষ্ট্রনায়কের জন্য আহ্বান জানায় নি, যিনি তাদের পরিকল্পনা রূপায়িত করবেন, অস্ট্রিয়াকে জার্মানি থেকে বহিষ্কৃত করবেন,

এবং প্রাশিয়ার কর্তৃত্বে ছোট ছোট জার্মান রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করবেন? আর এর জন্য যদি প্রুশীয় সংবিধানের উপরে একটু কঠোর আচরণ করা দরকার হত, যদি প্রতিনিধি সভার ভিতরে ও বাইরের তত্ত্বাবাগীশদের যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী ঠেলে সরিয়ে দেওয়া দরকার হত, তাহলে সর্বজনীন ভোটাধিকারের উপরে নির্ভর করা কি সম্ভব ছিল না, লুই বোনাপার্ট যেমনটি করেছিলেন? সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের চাইতে বেশি গণতান্ত্রিক আর কী হতে পারত? লুই নেপোলিয়ন কি প্রমাণ করে দেন নি যে তা পুরোপুরি নিরাপদ — যদি ঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়? আর সেই সর্বজনীন ভোটাধিকারই কি ব্যাপক জনসাধারণের কাছে আবেদন সৃষ্টি করার, বুর্জোয়া শ্রেণী যদি অবাধ্য হয়ে পড়ে তাহলে উদ্ভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে একটু মাখামাখি করার উপায় তৈরি করে দেয় না?

বিসমার্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল লুই নেপোলিয়নের কু দে'তা-র পুনরাবৃত্তি করা, জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে শক্তিসমূহের প্রকৃত সম্পর্ক স্পষ্ট করে দেখানো, জোর করে তাদের উদারপন্থী আত্ম-প্রবঞ্চনা কাটিয়ে দেওয়া, অথচ তাদের জাতীয় দাবিগুলি — প্রাশিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যা মিলে যায় — কার্যকর করা। শ্লেজভিগ-হলস্টাইনই প্রথম এই ব্যবস্থার অজুহাত তৈরি করে দিল। বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল। ১৮৬৩ সালে পোল্যাণ্ডের জল্লাদ (৪৪) হিসেবে বিসমার্ক যে-সেবা করেছিলেন তার ফলে রুশ জারকে* বিসমার্কের পক্ষে টেনে আনা গিয়েছিল; লুই নেপোলিয়নও মার খেয়েছিলেন, তাঁর প্রিয় 'জাতিসত্তাসংক্রান্ত নীতি' দিয়ে তিনি বিসমার্কের পরিকল্পনার প্রতি নীরব সাহায্য না-হোক, উদাসীনতার সাফাই গাইতে পারতেন; পামারস্টোন ছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু তিনি ক্ষুদ্রচেতা লর্ড জন রাসেলকে বৈদেশিক দপ্তরে বসিয়েছিলেন একমাত্র এই উদ্দেশ্যে যে তিনি নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলবেন। কিন্তু জার্মানিতে প্রভুত্বের জন্য অস্ট্রিয়া ছিল প্রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী আর ঠিক এই ব্যাপারেই প্রাশিয়া তাকে ছাপিয়ে যাবে, সে তা হতে দিতে পারে না, বিশেষ করে এই জন্য যে ১৮৫০ ও ১৮৫১ সালে সে শ্লেজভিগ-

* দ্বিতীয় আলেক্সান্দর। — সম্পাঃ

হল্স্টাইনে সম্রাট নিকোলাইয়ের আরক্ষী হিসেবে প্রাশিয়ার চাইতেও বেশি নীচতার পরিচয় দিয়েছিল। পরিস্থিতি অতএব অত্যন্ত অনুকূল ছিল। অস্ট্রিয়াকে বিসমার্ক যতই ঘৃণা করুন না কেন, প্রাশিয়ার উপরে আরেকবার প্রতিশোধ নিতে পারলে অস্ট্রিয়া যতই খুশী হোক না কেন, ডেনমার্কের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া ডেনমার্কের সপ্তম ফ্রেডারিকের মৃত্যুর পর তাদের আর কিছু করার ছিল না—রাশিয়া ও ফ্রান্সের নীরব সম্মতি নিয়ে। যতক্ষণ ইউরোপ নিরপেক্ষ থাকে, সাফল্য আগে থাকতেই সুনিশ্চিত; ইউরোপ নিরপেক্ষ রইল, ডিউকদের জমিদারিগুলি অধিকৃত হল এবং শান্তি চুক্তি অনুযায়ী অপরের হাতে চলে গেল (৪৫)।

এই যুদ্ধে, প্রাশিয়ার আর একটি অতিরিক্ত উদ্দেশ্য ছিল, সেটি হল—১৮৫০ সাল থেকে নতুন নীতি অনুযায়ী সে যে-সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছিল এবং ১৮৬০ সালে যাকে সে পুনর্বিন্যস্ত ও শক্তিশালী করেছিল, সেই সেনাবাহিনীকে শত্রুর বিরুদ্ধে পরীক্ষা করে দেখা। ফলাফল সমস্ত প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং সেটাও সমস্ত সামরিক পরিস্থিতিতে। জুট্ল্যান্ডের কাছে লিঙবির যুদ্ধে প্রমাণিত হল যে গাদা-বন্দুকের চাইতে নীডল-বন্দুক অনেক বেশি উন্নত এবং প্রুশীয়রা তা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে জানে, কারণ ঝোপের আড়াল থেকে ৮০ জন প্রুশীয়র দ্রুত গুলিবর্ষণে তিনগুণ অধিকসংখ্যক ড্যানিশ রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। সেই সঙ্গে এও লক্ষ করা গিয়েছিল যে ইতালির যুদ্ধ এবং ফরাসী যুদ্ধের কৌশল থেকে অস্ট্রীয়রা একটিই শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, তা হল: গুলি করে কোনো কাজ হয় না, প্রকৃত সৈনিককে শত্রু প্রতিহত করতে হবে তার সঙীন দিয়ে; একথা মনে রাখা হয়েছিল, কারণ কামান-বন্দুকের নলের বিরুদ্ধে শত্রু পক্ষের এর চাইতে ভালো রণকৌশল আর কিছু কামনা করা যায় না। অস্ট্রীয়দের যথাশীঘ্র সম্ভব কার্যক্ষেত্রে এ বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়ার সুযোগ দেবার জন্য শান্তি চুক্তিতে ডাচিগুলিকে তুলে দেওয়া হল অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুক্ত সার্বভৌমত্বের হাতে, তার দ্বারা সৃষ্টি করা হল পুরোপুরি সাময়িক এক পরিস্থিতি যার ফলে একের পর এক বিরোধ সৃষ্টি হতে বাধ্য এবং এই পরিস্থিতি এইভাবে পুরোপুরি বিসমার্কের উপরেই ছেড়ে দিল কখন তিনি অস্ট্রিয়ার উপরে তাঁর বিরাট আঘাত হানার জন্য এরূপ বিরোধকে ব্যবহার

করতে চাইবেন তা স্থির করার ভার। যেহেতু অনুকূল পরিস্থিতিকে, হের ফন সিবেলের ভাষায়, 'নির্মমভাবে চরমসীমা পর্যন্ত' ব্যবহার করা প্রুশীয় রাজনৈতিক ঐতিহ্য, সেই জন্য একথা স্বতঃসিদ্ধ যে ড্যানিশ নিপীড়নের হাত থেকে জার্মানদের মুক্ত করার অজুহাতে উত্তর শ্লেজভিগের প্রায় ২লক্ষ ড্যানিশকে জার্মানির অন্তর্ভুক্ত করা হল। যিনি কিছুই পেলেন না, তিনি হলেন শ্লেজভিগ-হল্‌স্টাইন সিংহাসনের জন্য ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির ও জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রার্থী ডিউক ফন অগস্টেনবার্গ।

বিসমার্ক এইভাবেই ডিউকদের জমিদারিগুলিতে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর ইচ্ছা কার্যকর করেছিলেন, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ড্যানিশদের তিনি বহিষ্কৃত করেছিলেন এবং বাইরের দেশগুলিকে অগ্রাহ্য করেছিলেন, কিন্তু শেষোক্তরা কিছুই ব্যবস্থা নেয় নি। কিন্তু মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই ডাচিগুলির সঙ্গে অধিকৃত অঞ্চলের মতো আচরণ করা হতে লাগল, তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্পর্কে তাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করা হল না, সোজাসুজি অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে সাময়িকভাবে ভাগাভাগি করে দেওয়া হল। প্রাশিয়া আরেকবার এক বৃহৎ শক্তি হয়ে উঠেছিল, সে আর ইউরোপীয় রথের পঞ্চম চক্র ছিল না, বুর্জোয়া শ্রেণীর জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের ব্যাপারে ভালো অগ্রগতি হচ্ছিল, কিন্তু যে পথ বেছে নেওয়া হয়েছিল সেটা বুর্জোয়া শ্রেণীর উদারপন্থী পথ নয়। তাই প্রাশিয়ার সামরিক বিরোধ চলতে থাকল, এমন কি আরও বেশি মীমাংসার অযোগ্য হয়ে উঠল। এবারে বিসমার্কের প্রধান রাষ্ট্রীয় তৎপরতার দ্বিতীয় দৃশ্য শুরু করা দরকার।

* * *

ডেনমার্কের যুদ্ধে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার আংশিক পূরণ হয়েছিল। শ্লেজভিগ-হল্‌স্টাইন 'মুক্ত' হয়েছিল, ওয়ার্‌শ ও লণ্ডন প্রটোকল — ডেনমার্কের হাতে জার্মানির অপমানের ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিগুলি যে প্রটোকলে অনুমোদনের ছাপ মেরে দিয়েছিল (৪৬), সেটি টুকরো-টুকরো করে তাদের পায়ে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, তারা একটি শব্দও করে নি। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া আবার একজোট, তাদের সেনাবাহিনী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিজয়ী হয়েছে, কোনো নৃপতিই আর জার্মান ভূখণ্ডে হস্তক্ষেপের কথা চিন্তা করেন

না। রাইনের প্রতি লুই নেপোলিয়নের লোভ পরিতৃপ্ত হওয়ার কোনো সুযোগ আর ছিল না, এযাবৎ তা অন্যান্য বিষয়ের দরুন পিছনে চলে গেছে, যেমন— ইতালীয় বিপ্লব, পোলিশ বিদ্রোহ, ডেনমার্কের জটিলতা, এবং সব শেষে মেক্সিকো অভিযান (৪৭)। একজন রক্ষণশীল প্রুশীয় রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে, বৈদেশিক নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ব পরিস্থিতিতে আর কিছু কাম্য ছিল না। কিন্তু ১৮৭১ সাল পর্যন্ত বিসমার্ক কোনো কালেই রক্ষণশীল ছিলেন না, এখন তো আরও কম, এবং জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী কোনোক্রমেই সন্তুষ্ট ছিল না।

জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী তখনও পুরনো বিরোধে বিড়ম্বিত। এক দিকে, তারা দাবি করছিল স্বতন্ত্রভোগ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজের জন্য, অর্থাৎ প্রতিনিধি সভার উদারপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে থেকে নির্বাচিত এক মন্ত্রিসভা; এবং এই মন্ত্রিসভাকে রাজশক্তিস্বরূপ পুরনো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দশ-বছরের যুদ্ধ চালাতে হত, তার পরে তার নতুন ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হত; তার অর্থ, দশ বছর ধরে আভ্যন্তরিক দুর্বলতা চলবে। অন্য দিকে, তারা দাবি করছিল জার্মানির বৈপ্লবিক পুনর্বিন্যাস, তা কার্যকর করা যেত একমাত্র বলপ্রয়োগ করেই, অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে একনায়কতন্ত্র দিয়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে, ১৮৪৮ সাল থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী বারবার, প্রতিটি চরম মুহূর্তে দেখিয়েছে যে দুটি দাবির কথা দূরে থাক, এর একটি দাবিও অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মশক্তির লেশমাত্র তাদের নেই। রাজনীতিতে মাত্র দুটি নিয়ামক ক্ষমতা আছে: সংগঠিত রাষ্ট্রক্ষমতা, সেনাবাহিনী এবং জনসাধারণের অসংগঠিত, মৌল ক্ষমতা। ১৮৪৮ সাল থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে ভুলে গেছে; তারা সার্বভৌমক্ষমতাকে যতটা ভয় পেত তার চাইতে বেশি ভয় করত জনসাধারণকে। বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে সেনাবাহিনী কোনোমতেই ছিল না, কিন্তু বিসমার্কের ছিল।

সংবিধান নিয়ে চলমান বিরোধে বিসমার্ক বুর্জোয়া শ্রেণীর সংসদীয় দাবিগুলির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করলেন। কিন্তু তাদের জাতীয় দাবিগুলি পূরণের বাসনায় তিনি অধীর হয়ে উঠেছিলেন, কারণ প্রুশীয় নীতির গোপনতম অভিলাষের সঙ্গে তা মিলে যায়। এখন যদি তিনি আরেকবার বুর্জোয়া শ্রেণীর ইচ্ছা কার্যকর করেন তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে,

বুর্জোয়া শ্রেণীর সূত্রায়িত উপায়ে যদি জার্মানির একীকরণ বাস্তবায়িত করেন, বিরোধ তাহলে স্বতই মীমাংসিত হবে, আর বিসমার্ক হয়ে উঠবেন বুর্জোয়া শ্রেণীর পরমপ্রিয় উপাস্য, যেমন তাঁর আদিরূপ লুই নেপোলিয়ন হয়েছিলেন।

বুর্জোয়া শ্রেণী তাঁকে উদ্দেশ্য যোগাল, লুই নেপোলিয়ন দিলেন উদ্দেশ্যসিদ্ধির পদ্ধতি; শুধু রূপায়ণের ভার রইল বিসমার্কের উপর।

প্রাশিয়াকে জার্মানির নেতৃস্থানে স্থাপন করতে হলে শুধু অস্ট্রিয়াকে বলপূর্বক জার্মান কনফেডারেশন (৪৮) থেকে বহিষ্কারই নয়, ছোট ছোট জার্মান রাষ্ট্রগুলিকে পদানত করাও দরকার ছিল। প্রুশীয় রাজনীতিতে জার্মানদের বিরুদ্ধে জার্মানদের এই রকম 'নবশক্তিদায়ক আনন্দময় যুদ্ধ' (৪৯) সর্বদাই অঞ্চল বৃদ্ধির প্রধান উপায় ছিল, কোনো নির্ভীক প্রুশীয়ই তাতে ভয় পেত না। সেই রকমই কম সংশয়ের কারণ ছিল অপর প্রধান উপায়টি: জার্মানদের বিরুদ্ধে অন্যান্য দেশের সঙ্গে মৈত্রী। রাশিয়ার ভাবপ্রবণ আলেক্সান্দরের সর্বাত্মক সমর্থন সুনিশ্চিত ছিল। লুই নেপোলিয়ন কখনোই জার্মানিতে প্রাশিয়ার পিয়েমোঁ ব্রতকে অস্বীকার করেন নি এবং বিসমার্কের সঙ্গে রফায় আসতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি যা চাইতেন সেটা যদি তিনি শান্তিপূর্ণভাবে, ক্ষতিপূরণের ধরনে পেতে পারেন, তাহলে তো খুবই ভালো। তাছাড়া, রাইনের গোটা বাম তীর একসঙ্গে তাঁর পাওয়ার দরকার ছিল না, তিনি যদি তা দফায় দফায়, প্রাশিয়ার প্রতিটি নতুন উদ্যোগের সঙ্গে এক-এক টুকরো করে পান, তাহলে সেটা চোখে পড়বে কম, অথচ একই লক্ষ্য পূরণ হবে। ফরাসী জাত্যভিমানীদের চোখে, রাইন নদীতীরের এক বর্গ মাইল জমির দাম গোটা স্যাভয় আর নীসের সমান। অতএব, লুই নেপোলিয়নের সঙ্গে আলোচনা হল, প্রাশিয়ার অঞ্চলবৃদ্ধি এবং একটি উত্তর জার্মান কনফেডারেশন (৫০) প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর অনুমতি পাওয়া গেল। তাঁকে যে প্রতিদানে রাইন নদীর তীরে এক টুকরো জার্মান জমি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই*; গভোনের সঙ্গে আলোচনায় বিসমার্ক

* এঙ্গেলস এখানে পৃষ্ঠার পাশে পেনসিলে লিখেছিলেন: 'বিভাজন — মাইন নদীর রেখা' (এই খণ্ডের ৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) — সম্পাঃ

রেনিশ ব্যাভেরিয়া ও রেনিশ হেসেনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। পরে তিনি একথা অস্বীকার করেন। কিন্তু, যে-সীমার মধ্যে সত্যের উপরে সামান্য কিছুটা বলাৎকার করা চলে, এবং করতে হয়ও, সে-সম্পর্কে একজন কূটনীতিজ্ঞের, বিশেষ করে প্রুশীয় কূটনীতিজ্ঞের নিজস্ব মতামত আছে। আর যাই হোক, সত্য নারী তো, সুতরাং, যুঙ্কার ধ্যানধারণা অনুযায়ী, সে তা পছন্দই করে। প্রাশিয়ার তরফ থেকে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি ছাড়া প্রুশীয় অঞ্চলবৃদ্ধি করতে দেওয়ার মতো মূর্খ লুই নেপোলিয়ন ছিলেন না; ব্লাইখরোডারও তাহলে অচিরেই সুদ ছাড়াই টাকা ধার দিতেন। কিন্তু প্রুশীয়দের তিনি ভালো করে চেনেন নি, শেষ পর্যন্ত তাই তিনি প্রতারিত হলেন। সংক্ষেপে, তাঁকে কুক্ষিগত করার পর, ইতালির সঙ্গে মৈত্রীজোট গঠন করা হল 'হৃদয়ে ছুরিকাঘাত করার জন্য'।

এই অভিব্যক্তিতে বিভিন্ন দেশের অর্বাচীনরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু নিতান্তই ভুল করে। À la guerre comme à la guerre* এই অভিব্যক্তি একমাত্র এ-কথাই প্রমাণ করে যে ১৮৬৬-র জার্মান গৃহযুদ্ধকে (৫১) বিসমার্ক স্বীকার করেছিলেন তার প্রকৃত স্বরূপে, অর্থাৎ এক **বিপ্লব** বলে, এবং সেই বিপ্লব তিনি সম্পন্ন করতে প্রস্তুত ছিলেন বিপ্লবী পদ্ধতিতে। এবং তা তিনি করেছিলেন। ফেডারেল ডায়েটের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল বৈপ্লবিক। ফেডারেল কর্তৃপক্ষের সংবিধানসম্মত সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার পরিবর্তে তিনি তাদের বিরুদ্ধে ফেডারেল চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ করলেন — পুরোপুরি অজুহাত মাত্র! — সর্বজনীন ভোটাধিকারে নির্বাচিত এক রাইখস্টাগের সংস্থান করে এক নতুন সংবিধান ঘোষণা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মাইন থেকে ফেডারেল ডায়েটকে বহিষ্কৃত করলেন (৫২)। ঊর্ধ্ব সাইলেসিয়ায় তিনি বিপ্লবী জেনারেল ক্লাপকা ও অন্যান্য বিপ্লবী অফিসারদের অধীনে এক হাঙ্গেরীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করলেন, এই বাহিনীর সৈন্যরা ছিল হাঙ্গেরীয় সেনাদলত্যাগী ও যুদ্ধবন্দী, এদের এখন লড়তে হবে নিজেদেরই বৈধ সর্বাধিনায়কের বিরুদ্ধে।** বোহেমিয়া জয়ের পর বিসমার্ক 'গৌরবময়

* যুদ্ধের মতো যুদ্ধে। — সম্পাঃ

** এখানে পৃষ্ঠার পাশে এঙ্গেলস পেনসিলে লিখেছিলেন: 'শপথ!' — সম্পাঃ

বোহেমিয়া রাজ্যের জনসাধারণের উদ্দেশে' এক ঘোষণাবাণী প্রচার করেন, তার বিষয়বস্তুতেও উত্তরাধিকারসূত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্রের সিংহাসনপ্রাপ্তির পরম্পরা সম্পর্কে আপত্তি তোলা হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর একটি মুক্ত নগরী এবং তিনজন বৈধ শাসক— জার্মান কনফেডারেশনের সদস্যদের* সমস্ত সম্পত্তি প্রাশিয়ার হয়ে তিনি অধিকার করে নিলেন, তাঁর খ্রীষ্টান ও উত্তরাধিকারবাদী বিবেক এই জন্য বিন্দুমাত্র দংশন করল না যে প্রাশিয়ার রাজার চাইতে কোনো কম অংশে এরা 'ঈশ্বরের কৃপায়' শাসক ছিলেন্ না। সংক্ষেপে, তা ছিল পরিপূর্ণ বিপ্লব, বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে সম্পাদিত। স্বভাবতই, এর জন্য আমরা তাঁকে কিছুতেই ভর্ৎসনা করতে পারি না। বরং, যে জন্য আমরা তাঁকে তিরস্কার করি তা হল—তিনি যথেষ্ট বিপ্লবী ছিলেন না, উপর থেকে আসা প্রুশীয় বিপ্লবীর অতিরিক্ত কিছু তিনি ছিলেন, একটা গোটা বিপ্লব তিনি শুরু করেছিলেন এমন অবস্থায় যেখানে তিনি শুধু অর্ধেক বিপ্লব সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, রাজ্য-দখলের পথে যাত্রা শুরু করে চারটি দুর্দশাগ্রস্ত ছোট ছোট রাষ্ট্র নিয়েই তিনি তুষ্ট হয়েছিলেন।

তারপর, যখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, তখন ক্ষুদে নেপোলিয়ন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে তাঁর পুরস্কার দাবি করলেন। যুদ্ধ চলাকালীন রাইন নদীতীরস্থ সব কিছুই তাঁর চাহিদা মতো তিনি নিয়ে নিতে পারতেন, কারণ শুধু জমি নয়, দুর্গগুলিও ছিল অরক্ষিত। তিনি ইতস্তত করছিলেন; আশা করছিলেন দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের, যাতে উভয় পক্ষ নিস্তেজ হয়ে পড়বে; তার পরিবর্তে, পর পর কতকগুলি দ্রুত আঘাত এল, অস্ট্রিয়া চূর্ণ হল আট দিনের মধ্যে। জেনারেল গভোনের কাছে সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিসমার্ক যে জায়গাগুলির নাম করেছিলেন—মাইনৎস সহ রেনিশ ব্যাভেরিয়া ও রেনিশ হেসেন—প্রথমে তিনি তা দাবি করলেন। কিন্তু এখন বিসমার্ক তা দিতে পারেন না, এমন কি যদি তা দিতে চাইতেন তাও নয়। যুদ্ধের বিপুল সাফল্য তাঁর উপরে নতুন দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। প্রাশিয়া যে সময়ে

* হানোভার রাজ্য, হেসেন-কাসেল ইলেক্টোরেট, নাসাউ ডাচি ও ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মাইন মুক্ত নগরী। — সম্পাঃ

জার্মানির রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেকে খাড়া করেছে সেই সময়ে মধ্য রাইন অঞ্চলের চাবিকাঠি মাইনৎসকে সে বাইরের একটি দেশের কাছে বিক্রি করতে পারে না। বিসমার্ক তাই রাজী হলেন না। লুই নেপোলিয়ন দর-কষাকষি করতে ইচ্ছুক ছিলেন; এবার তিনি দাবি করলেন শুধু লুক্সেমবুর্গ, লাণ্ডাউ, সারলুই এবং সারব্রুকের কয়লাসমৃদ্ধ অববাহিকা অঞ্চল। কিন্তু বিসমার্ক তাও আর ছেড়ে দিতে পারেন না, অধিকন্তু এই কারণে যে প্রুশীয় ভূখণ্ডও দাবি করা হয়েছে। উপযুক্ত সময়ে, প্রুশীয়রা যখন বোহেমিয়ায় আটকে ছিল তখন লুই নেপোলিয়ন নিজেই তা দখল করে নেন নি কেন? সংক্ষেপে, ফ্রান্সকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে কিছুই হল না। বিসমার্ক জানতেন, এর অর্থ—ভবিষ্যতে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ, কিন্তু ঠিক তাই তিনি চেয়েছিলেন।

শান্তি চুক্তিতে এবারে প্রাশিয়া অনুকূল পরিস্থিতিকে ততটা নির্মমভাবে ব্যবহার করে নি, যতটা সে সাধারণত সাফল্যের মুহূর্তে করত। তার উপযুক্ত কারণও ছিল। স্যাক্সনি আর হেসেন-ডার্মস্টাটকে টেনে আনা হয়েছিল নতুন উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের মধ্যে, এবং অন্তত সেই কারণে হলেও, তারা অব্যাহতি পেয়ে গেল। ব্যাভেরিয়া, ভ্যুর্টেমবের্গ ও বাডেন-এর সঙ্গে প্রশ্রয়সূচক আচরণ করতে হল, কারণ তাদের সঙ্গে গোপন আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করা বিসমার্কের দরকার ছিল। আর অস্ট্রিয়া—যে পরম্পরাগত বন্ধনে সে জার্মানি ও ইতালির সঙ্গে বাঁধা পড়েছিল, তা চূর্ণ করে বিসমার্ক কি তার উপকার করেন নি? শেষ পর্যন্ত তিনি কি তার জন্য এক স্বাধীন বৃহৎ শক্তির বাঞ্ছিত অবস্থান এনে দেন নি? বোহেমিয়ায় তিনি যখন অস্ট্রিয়াকে পরাস্ত করেছিলেন তখন কি প্রকৃতপক্ষে তিনিই অস্ট্রিয়ার চাইতে ভালো জানতেন না কোনটা তার পক্ষে মঙ্গল? ঠিকমতো চালালে, অস্ট্রিয়াকে কি একথা উপলব্ধি করতে হবে না যে দু-দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, পরস্পরজড়িত সম্পর্ক প্রাশিয়া-কর্তৃক ঐক্যবদ্ধ জার্মানিকে তার একান্ত ও স্বাভাবিক মিত্র করে তুলেছে?

এইভাবে, ঘটনাটা দাঁড়াল এই যে, প্রাশিয়া তার অস্তিত্বকালে এই সর্বপ্রথম নিজের চারপাশে বদান্য ঔদার্যের একটা জ্যোতির্বলয় তৈরি করল এবং তার কারণ, রুই-কাতলা জালে ফেলার জন্য সে পুঁটি-মাছ ফেলে দিয়েছিল।

বোহেমিয়ার রণক্ষেত্রে শুধু অস্ট্রিয়াই মার খায় নি — জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীও মার খেয়েছিল। বিসমার্ক তাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে তাদের পক্ষে কোনটা ভালো, তাদের চাইতে তিনিই তা বেশি জানেন। প্রতিনিধি সভার দিক থেকে বিরোধ চালিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ছিল না। বুর্জোয়া শ্রেণীর উদারপন্থী ছল আগামী বহুকালের জন্য কবরস্থ, কিন্তু তাদের জাতীয় দাবিগুলি প্রতিদিন পূর্ণতর মাত্রায় পরিতৃপ্তি লাভ করছিল। বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে বিস্ময়কর দ্রুততা ও যথাযথতায় বিসমার্ক তাদের জাতীয় কর্মসূচি রূপায়িত করলেন এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে in corpore vili — তাদেরই দূষিত নোংরা দেহের উপরে — তাদের মাংসল শিথিলতা ও অবসন্নতা, নিজেদের কর্মসূচি রূপায়ণে পরিপূর্ণ অক্ষমতা প্রমাণ করে তিনিও তাদের প্রতি মহানুভবতার ভঙ্গি করলেন এবং বিরোধের সময়ে সংবিধানবিরোধী শাসনের জন্য শাস্তি এড়ানোর ব্যবস্থা সরকারের ক্ষেত্রে রদ করার জন্য বর্তমানে প্রকৃতপক্ষে নিরস্ত্র প্রতিনিধি সভার কাছে আবেদন করলেন। অশ্রুবর্ষণোন্মুখ, অভিভূত প্রতিনিধি সভা বর্তমানে নির্দোষ এই পদক্ষেপে সম্মত হল (৫৩)।

তা সত্ত্বেও, বুর্জোয়া শ্রেণীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল যে কনিগ্‌গ্রাৎস-এ তারাও পরাভূত হয়েছে (৫৪)। উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের সংবিধান (৫৫) বিরোধের সময়ে প্রামাণ্যভাবে ব্যাখ্যাত প্রুশীয় সংবিধানের ছক অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছিল। করদানে অস্বীকৃতি নিষিদ্ধ হল। ফেডারেল চ্যান্সেলর ও তাঁর মন্ত্রীদের নিযুক্ত করতেন প্রাশিয়ার রাজা, কোনোরূপে সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা-নিরপেক্ষ ভাবে। বিরোধের ফলে সেনাবাহিনী সংসদ থেকে যে স্বতন্ত্রতা আদায় করে নিয়েছিল, রাইখস্টাগের ক্ষেত্রেও তা প্রতিষ্ঠিত হল। প্রতিদানে, রাইখস্টাগের সদস্যরা এই আত্মপ্রসাদমূলক মহৎ চৈতন্য লাভ করলেন যে তাঁরা সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত। তাঁদের মধ্যে দুজন সোশ্যালিস্ট* বসে আছেন, এই দৃশ্যও তাঁদের এই কথাটা অত্যন্ত অপ্রিয়ভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। একটি

---

* আগস্ট বেবেল ও ভিলহেল্ম লিব্‌ক্লেখ্‌ট। — সম্পাঃ

সংসদীয় সংস্থায় এই সর্বপ্রথম প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধি, সমাজতন্ত্রী ডেপুটি আত্মপ্রকাশ করলেন। এ লক্ষণ অশুভ।

প্রথমে এ সবেরই কোনো গুরুত্ব ছিল না। এখন কাজটা ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে সাম্রাজ্যের, অন্তত উত্তরাঞ্চলের নতুন ঐক্য বিকশিত করে তোলা এবং তার দ্বারা দক্ষিণ-জার্মান বুর্জোয়াদের প্রলুব্ধ করে নতুন ফেডারেশনের মধ্যে টেনে আনা। ফেডারেশনের সংবিধানে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের বিষয়টি একক একেকটি রাষ্ট্রের আইনসভার ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নিয়ে ফেডারেশনের কাছে হস্তান্তরিত করা হল: সমগ্র ফেডারেশন জুড়ে অভিন্ন নাগরিক অধিকার ও তার অভ্যন্তরে গতিবিধির স্বাধীনতা, বসবাসের অধিকার, হস্তশিল্প, বাণিজ্য, শুল্ক, নৌচলাচল, মুদ্রা, ওজন ও পরিমাপ, রেলপথ, জলপথ, ডাক ও তার, পেটেণ্ট, ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত আইন, সমগ্র বৈদেশিক নীতি, কনসুলেট, বিদেশে বাণিজ্যের জন্য রক্ষণমূলক ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা-সংক্রান্ত পুলিস, ফৌজদারি দণ্ডবিধি, আইন-আদালত প্রভৃতি। এই সব প্রশ্নের অধিকাংশই এখন আইনত দ্রুত, এবং সাধারণত উদারভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল। এবং তারপরে — অবশেষে দীর্ঘকাল পরে! — বিলুপ্ত করা হল ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রথার কুৎসিততম বিকৃতিগুলি, যেগুলি এক দিকে পুঁজিবাদী বিকাশের পথে সর্বাধিক বাধা দিচ্ছিল এবং অন্য দিকে প্রুশীয় ক্ষমতার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ব্যাহত করছিল। বর্তমানে জাত্যভিমানী হয়ে-ওঠা বুর্জোয়া শ্রেণী যেমনটি ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছিল তেমন কোনো বিশ্ব-ঐতিহাসিক কৃতিত্ব তা ছিল না, বরং সত্তর বছর আগেই ফরাসী বিপ্লব যা করেছিল, এবং সমস্ত সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশ যা বহুকাল আগেই প্রবর্তন করেছিল তারই বহু, বহু কাল আগে করণীয় ও ত্রুটিপূর্ণ অনুকৃতি মাত্র। বড়াই করার বদলে এ জন্য লজ্জিত বোধ করাই যথার্থ হত যে 'অত্যন্ত আলোকপ্রাপ্ত' জার্মানি একাজ করল সবচেয়ে শেষে।

উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের এই সমগ্র কালপর্বে বিসমার্ক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইচ্ছুকভাবেই জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীকে বাধিত করেছেন, এবং, এমন কি সংসদের ক্ষমতা সংক্রান্ত প্রশ্নেও লৌহমুষ্টি দেখিয়েছেন মখমলের দস্তানার আবরণে। এই কালপর্বটি ছিল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাল; কখনও কখনও তাঁর সবিশেষ প্রুশীয় সংকীর্ণমনস্কতা সম্পর্কে, পৃথিবীর ইতিহাসে

সেনাবাহিনী ছাড়াও এবং তাদের উপরে নির্ভর করে কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র ছাড়াও অন্যান্য এবং আরও ক্ষমতাশালী শক্তি যে আছে সে কথা উপলব্ধি করতে তাঁর অক্ষমতা সম্পর্কেও সন্দেহ হতে পারত।

অস্ট্রিয়ার সঙ্গে শান্তির মধ্যে নিহিত আছে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা—একথা বিসমার্ক শুধু যে জানতেন তাই নয়, তিনি তা চাইতেনও। জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী তাঁর কাছে যে প্রুশো-জার্মান সাম্রাজ্য দাবি করছিল, সেই সাম্রাজ্য সৃষ্টির কাজ সম্পূর্ণ করার উপায় যোগাবে এই যুদ্ধ।* কাস্টমস পার্লামেণ্টকে (৫৭) ক্রমে ক্রমে একটি রাইখস্টাগে রূপান্তরিত করে দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে একটু একটু করে উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা বানচাল হয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ জার্মান সদস্যদের উচ্চকণ্ঠ দাবিতে: ক্ষমতা বাড়ানো চলবে না! লড়াইয়ের ময়দানে সদ্য-পরাজিত সরকারগুলির মেজাজও আর অনুকূল ছিল না। প্রুশীয়রা যে শুধু এই সরকারগুলির চাইতে অনেক বেশি পরাক্রমশালী তাই নয়, তাদের রক্ষা করার মতোও যথেষ্ট ক্ষমতাবান শুধু এই রকম একটা নতুন, জাজ্বল্যমান প্রমাণ, অর্থাৎ এক নতুন সারা-জার্মান যুদ্ধই আত্মসমর্পণের মুহূর্তটিকে দ্রুত নিকটতর করতে পারে। তাছাড়া, বিজয়ের পর মনে হতে লাগল যেন বিসমার্ক ও লুই নেপোলিয়ন পূর্বাহ্নেই গোপনে মাইন নদীর উপরে যে বিভাজন রেখাটি (৫৮) সম্পর্কে একমত হয়েছিলেন, সেই রেখাটি শেষোক্ত ব্যক্তি প্রুশীয়দের উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন; সে ক্ষেত্রে, দক্ষিণ জার্মানির সঙ্গে

---

* অস্ট্রীয় যুদ্ধের আগেই, মধ্য-জার্মানির একটি রাষ্ট্র থেকে একজন মন্ত্রী যখন বিসমার্কের বাগাড়ম্বরপূর্ণ জার্মান নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে বিতর্কে বাধা দেন, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে সমস্ত কথাবার্তা সত্ত্বেও, তিনি অস্ট্রিয়াকে জার্মানি থেকে বহিষ্কার করবেন এবং জার্মান কনফেডারেশন ভেঙে দেবেন।—'আর মধ্যাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো, আপনি কি মনে করেন তারা নীরবে তা দেখেই যাবে?'—'আপনারা, মধ্যাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো, আপনারা কিছুই করবেন না।' — 'আর জার্মানদের তাহলে কী হবে?' — 'আমি তখন তাদের প্যারিসে নিয়ে যাব এবং সেখানে গিয়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ করব।' (মধ্যাঞ্চলের রাষ্ট্রের উপরোক্ত মন্ত্রী কর্তৃক প্যারিসে অস্ট্রীয় যুদ্ধের আগে কথিত এবং সেই যুদ্ধের সময়ে *Manchester Guardian* পত্রিকায় [৫৬] তার প্যারিসস্থ সংবাদদাতা মিসেস ক্রফোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত।)

মিলনে জার্মানিকে টুকরো টুকরো করার ব্যাপারে ফরাসীদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত অধিকার লঙ্ঘিত হয়, তার ফলে ন্যায়সংগতভাবেই যুদ্ধের প্রয়োজন ঘটে।

ইতিমধ্যে লুই নেপোলিয়নকে জার্মান সীমান্তের কাছাকাছি কোথাও এক টুকরো জমির সন্ধান করতে হচ্ছিল, যে জমি তিনি সাদোভার (৫৯) জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আত্মসাৎ করতে পারেন। নতুন উত্তর জার্মান কনফেডারেশন যখন গঠিত হয়, তাতে লুক্সেমবুর্গকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, এই রাষ্ট্রটি এখন ব্যক্তিগতভাবে নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু অন্যথায় সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। তাছাড়া, সে অ্যালসেসের মতোই ফরাসী-প্রভাবান্বিত এবং প্রাশিয়ার চাইতে ফ্রান্সের প্রতি আকর্ষণ তার অনেক বেশি ছিল, প্রাশিয়াকে সে রীতিমতো ঘৃণাই করত।

মধ্য যুগের পর থেকে জার্মানির রাজনৈতিক দুর্দশা জার্মান-ফরাসী সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির কী দশা করেছিল, লুক্সেমবুর্গ তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ, আরও জাজ্বল্যমান এই কারণে যে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত লুক্সেমবুর্গ নামতঃ জার্মানিরই ছিল। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত একটি ফরাসী ও একটি জার্মান অংশ নিয়ে তা গঠিত ছিল, কিন্তু জার্মান অংশটি এই গোড়ার দিকেই উন্নততর ফরাসী সংস্কৃতিকে সুযোগ দিয়েছে তাকে বাতিল করে এগিয়ে যেতে। লুক্সেমবুর্গের জার্মান কাইজাররা ভাষা ও শিক্ষা দুদিক দিয়েই ফরাসী ছিলেন। বার্গান্ডি অঞ্চলে তার অন্তর্ভুক্তির পর থেকে (১৪৪০ সাল) লুক্সেমবুর্গ, অন্য সমস্ত নিম্নাঞ্চলীয় দেশের মতোই জার্মানির সঙ্গে পুরোপুরি নামতঃ এক সম্মিলনীতে ছিল; ১৮১৫ সালে জার্মান কনফেডারেশনে তার অন্তর্ভুক্তিতেও কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। ১৮৩০ সালের পর, ফরাসী অংশ এবং জার্মান অংশের বেশ বড় একটা ভাগ বেলজিয়মের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু, বাকি জার্মান লুক্সেমবুর্গে সব কিছু চলতে থাকে ফরাসী প্রথা অনুযায়ী: আদালত, কর্তৃপক্ষ, প্রতিনিধি সভা, সমস্ত কাজকর্ম হত ফরাসীতে; সমস্ত সরকারী ও ব্যক্তিগত দলিল, সমস্ত ব্যবসায়িক হিসাব রাখা হত ফরাসীতে; মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষাদান করা হত ফরাসীতে, ফরাসী ছিল এবং থাকল শিক্ষিতসমাজের ভাষা — অবশ্য স্বভাবতই যে ফরাসী ভাষা দক্ষিণ জার্মান ব্যঞ্জনবর্ণাধিক্যে পীড়িত। সংক্ষেপে,

লুক্সেমবুর্গে দুটি ভাষায় কথা বলা হত: রাইন-ফ্র্যাঙ্কিশ এক জনপ্রিয় স্থানিক ভাষা এবং ফরাসী, আর দক্ষিণ জার্মানি প্রভাবিত জার্মান ভাষা ছিল বিদেশী ভাষা। রাজধানীতে অবস্থিত প্রুশীয় গ্যারিসন অবস্থা ভালোর চাইতে বরং আরও খারাপ করেছিল। জার্মানির পক্ষে তা লজ্জাজনক হতে পারে, কিন্তু তা সত্য। আর লুক্সেমবুর্গের এই স্বতঃপ্রণোদিত ফরাসীকরণ অ্যালসেস ও জার্মান লোরেনে অনুরূপ প্রক্রিয়াকে যথার্থ আলোকে প্রতিভাত করেছিল।

হল্যান্ডের রাজা*, লুক্সেমবুর্গের সার্বভৌম ডিউক নগদ মুদ্রা ব্যবহার করতে জানতেন, তিনি লুই নেপোলিয়নকে ডাচি বিক্রি করতে ইচ্ছুক ছিলেন। লুক্সেমবুর্গের জনগণ তাদের ফ্রান্সে অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে অনুমোদন করত — তার প্রমাণ হল ১৮৭০-এর যুদ্ধে তাদের মনোভাব। আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাশিয়া আপত্তি করতে পারত না, যেহেতু সে নিজেই জার্মানি থেকে লুক্সেমবুর্গের বহিষ্কার ঘটিয়েছে। তার ফৌজ মোতায়েন ছিল রাজধানীতে, ফেডারেল জার্মান দুর্গের ফেডারেল বাহিনী হিসেবে; লুক্সেমবুর্গ যখনই আর ফেডারেল দুর্গ থাকল না, তখনই তাদেরও আর সেখানে কোনো অধিকার ছিল না। তারা স্বগৃহে চলে যায় নি কেন, লুক্সেমবুর্গের অন্যত্র অন্তর্ভুক্তিতে বিসমার্ক রাজী হতে পারলেন না কেন?

কারণ যে-বিরোধে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন তা এখন প্রকট হয়ে উঠছিল। প্রাশিয়ার কথা বলতে গেলে, ১৮৬৬-র **আগে** জার্মানি ছিল শুধু দখল করার মতো ভূখন্ড, বাইরের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তা ভাগাভাগি করে নিতে হত। ১৮৬৬-র **পরে** জার্মানি পরিণত হল প্রাশিয়ার **আশ্রিত রাজ্যে,** বিদেশী নখদন্তের বিরুদ্ধে তাকে রক্ষা করা দরকার। একথা সত্যি, প্রাশিয়ার স্বার্থে নব প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত জার্মানি থেকে গোটা এক-একটি অংশ বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার সমগ্র অঞ্চলের উপরে জার্মান জাতির অধিকার এখন প্রুশীয় রাজ-সিংহাসনের উপরে কর্তব্যভার চাপিয়ে দিল — যাতে প্রাক্তন ফেডারেল ভূখন্ডের এই অংশগুলি বিদেশী রাষ্ট্রগুলির অন্তর্ভুক্ত হতে না-পারে, যাতে নতুন প্রুশীয়-জার্মান রাষ্ট্রে ভবিষ্যৎ আনশ্লুসের জন্য দরজা খোলা রাখা যায়। এই কারণেই ইতালি টিরোলিয়ান সীমান্তে এসে থেমে গিয়েছিল (৬০), এবং লুক্সেমবুর্গকে লুই নেপোলিয়নের হাতে চলে যেতে

* তৃতীয় ভিলহেল্ম। — সম্পাঃ

দেওয়া চলত না। সত্যিকার একটি বিপ্লবী সরকার একথা খোলাখুলি ঘোষণা করত। রাজকীয়-প্রুশীয় বিপ্লবী তা করেন নি, শেষ পর্যন্ত তিনি জার্মানিকে মেটেরনিখের অর্থে এক 'ভৌগোলিক ধারণায়' (৬১) রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন অন্যায় অবস্থানে, আর এই অসুবিধা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় ছিল তাঁর প্রিয় 'কর্পস' বীয়ার-পানশালাসুলভ আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যা।

সেটা করতে গিয়ে তিনি যে নিদারুণ ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠেন নি, তার একমাত্র কারণ, ১৮৬৭-র বসন্তকালে লুই নেপোলিয়ন বড় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। লন্ডন সম্মেলনে মতৈক্য হল। প্রুশীয়রা লুক্সেমবুর্গ ছেড়ে চলে গেল, দুর্গ ভেঙে ফেলা হল, ডাচিটি নিরপেক্ষ বলে ঘোষিত হল (৬২)। যুদ্ধ আবার স্থগিত রাখা হল।

লুই নেপোলিয়ন এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। প্রাশিয়ার অঞ্চলবৃদ্ধি তিনি সহ্য করতে রাজী ছিলেন একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই, যদি তিনি রাইন অঞ্চলে অনুরূপ ক্ষতিপূরণ পেতেন। তিনি অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে ইচ্ছুক ছিলেন, এমন কি সেই অল্পকে ন্যূনতম মাত্রায়ও হয়তো নামিয়ে আনতেন, কিন্তু তিনি কিছুই পান নি, সব কিছু থেকেই তাঁকে প্রবঞ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সে এক বোনাপার্টীয় সাম্রাজ্য টিকে থাকতে পারে একমাত্র তখনই, সে যদি তার সীমান্ত ক্রমে ক্রমে রাইনের দিকে সরিয়ে আনে এবং যদি ফ্রান্স — বস্তুতপক্ষে কিংবা অন্তত কল্পনায় — ইউরোপের সালিস হিসেবে থাকে। সীমান্ত সরিয়ে আনার কাজ সফল হয় নি, সালিস হিসেবে ফ্রান্সের অবস্থান ইতিমধ্যেই বিপন্ন, বোনাপার্টপন্থী সংবাদপত্র তারস্বরে সাদোভার জন্য প্রতিশোধ দাবি করছিল — লুই নেপোলিয়ন তাঁর সিংহাসন রাখতে চাইলে তাঁকে তাঁর ভূমিকার প্রতি যোগ্য মর্যাদা দিতে হত এবং যা তিনি সকল সেবা সত্ত্বেও, আপোসে আদায় করতে পারেন নি তা বাহুবলে আদায় করতে হত।

সুতরাং, উভয় পক্ষ থেকেই যুদ্ধের প্রস্তুতি — কূটনৈতিক ও সামরিক উভয়ত — শুরু করা হল। এমন সময়ে ঘটল নিম্নলিখিত কূটনৈতিক ঘটনাটি।

স্পেন তার সিংহাসনের জন্য একজন প্রার্থীর সন্ধান করছিল। মার্চ মাসে (১৮৬৯) বার্লিনস্থ ফরাসী রাষ্ট্রদূত বেনেদেত্তি এই মর্মে গুজব শুনতে পান যে হয়েনৎসলার্ন-এর প্রিন্স লেওপোল্ড সিংহাসনের জন্য দাবি উপস্থিত করেছেন; প্যারিস থেকে তাঁকে এবিষয়ে অনুসন্ধান করতে বলা হয়। পররাষ্ট্র দপ্তরের উপসচিব ফন টিলে আত্মসম্মানের দোহাই পেড়ে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন যে প্রুশীয় সরকার এবিষয়ে কিছু জানেন না। প্যারিসে একবার সফর করার সময়ে বেনেদেত্তি সম্রাটের অভিমত জানতে পারেন: 'এই প্রার্থীপদ নিতান্তই জাতিবিরোধী, দেশ এতে রাজী হবে না, এ ঠেকাতেই হবে।'

ঘটনাক্রমে, লুই নেপোলিয়ন এর দ্বারা দেখালেন যে তাঁর অবস্থানের প্রচণ্ড অবনতি হচ্ছে। বস্তুতই, স্পেনের সিংহাসনে একজন প্রুশীয় যুবরাজ, তার ফলস্বরূপ অনিবার্য উৎপাত, স্পেনের উপদলগুলির মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাশিয়ার জড়িত হয়ে পড়া, এমন কি হয়তো একটা যুদ্ধ, বামনসদৃশ প্রুশীয় নৌবাহিনীর পরাজয়, আর কিছু না হোক অন্তত ইউরোপের চোখে এক কিম্ভূতমূর্তি প্রাশিয়া — এর চাইতে ভালো 'সাদোভার প্রতিশোধ' আর কী হতে পারত? কিন্তু এই দৃশ্য দেখাবার মতো অবস্থা লুই বোনাপার্টের আর ছিল না। তাঁর আস্থা এমন নাড়া খেয়েছিল যে তিনি এক চিরাচরিত দৃষ্টিকোণ আঁকড়ে রইলেন, এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী স্পেনের সিংহাসনে একজন জার্মান রাজা বসলে ফ্রান্স দু-দিক থেকে বিপদের মধ্যে পড়বে, অতএব তা বরদাস্ত করা যায় না — ১৮৩০ সালের পর নিতান্তই শিশুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি।

আরও খবরাখবর পাওয়ার জন্য এবং ফ্রান্সের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য বেনেদেত্তি বিসমার্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন (১১ মে, ১৮৬৯)। বিসমার্কের কাছ থেকে তিনি চূড়ান্ত কোনো কিছু জানতে পারলেন না। বিসমার্ক কিন্তু যা জানতে চেয়েছিলেন বেনেদেত্তির কাছ থেকে তা জেনে গেলেন। তিনি বুঝলেন যে প্রার্থী হিসেবে লেওপোল্ডের মনোনয়নের অর্থ অবিলম্বে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ। এর ফলে, তাঁর সুবিধামতো যুদ্ধ বাধতে দেওয়ার সম্ভাবনা বিসমার্ক পেয়ে গেলেন।

বস্তুতই, লেওপোল্ডের প্রার্থীপদ আবার জুলাই ১৮৭০-এ সামনে এল এবং ফলে, সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধ বেধে গেল, লুই নেপোলিয়ন তা যতই প্রতিরোধ

করুন না কেন। তিনি শুধু যে দেখতে পেলেন তিনি ফাঁদে পা-দিয়েছেন, তাই নয়, তিনি এও জানতেন যে তাঁর সম্রাটত্ব বিপন্ন; তাঁর বোনাপার্টপন্থী যে বদমাশের দল (৬৩) তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিল যে সৈনিকদের পায়ের পটির শেষ বোতামটি পর্যন্ত সব কিছু একেবারে পরিপাটি করে তৈরি, তাদের বিশ্বস্ততায় তাঁর আস্থা ছিল সামান্যই, এবং ততোধিক কম আস্থা ছিল তাদের সামরিক ও প্রশাসনিক দক্ষতায়। কিন্তু তাঁর নিজেরই অতীতের যুক্তিসংগত পরিণতি তাঁকে নিয়ে গেল বিনাশের দিকে, এমন কি তাঁর দ্বিধা তাঁর সর্বনাশকে ত্বরান্বিত করল।

অন্য দিকে, বিসমার্ক যে সামরিক দিক দিয়ে যুদ্ধের জন্য শুধুমাত্র রীতিমত তৈরি ছিলেন তাই নয়, এবারে প্রকৃতই তিনি জনগণের সমর্থনপুষ্ট ছিলেন; জনগণ উভয় পক্ষের ছড়ানো কূটনৈতিক মিথ্যার পিছনে শুধু একটি জিনিসই দেখতে পেয়েছিল: যথা, এ যুদ্ধ শুধু রাইনের জন্যই নয়, জাতীয় অস্তিত্বের জন্যও। ১৮১৩ সালের পর এই সর্বপ্রথম সংরক্ষিত যোদ্ধারা এবং ল্যান্ডভের আবার একজোট হল, তারা লড়াই করার জন্য আগ্রহী ও উন্মুখ। কী করে সব কিছু ঘটল সেটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, দু-হাজার বছরের পুরনো জাতীয় উত্তরাধিকারের কতখানি বিসমার্ক নিজ দায়িত্বে লুই নেপোলিয়নকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কি দেন নি, তাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল না: আসল কথা হল, বাইরের দেশগুলিকে চিরকালের জন্য শিক্ষা দেওয়া দরকার যে জার্মানদের আভ্যন্তরিক বিষয়ে তারা যেন হস্তক্ষেপ না-করে এবং জার্মান অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে লুই নেপোলিয়নের নড়বড়ে সিংহাসনকে মদত দেওয়া জার্মানির ব্রত নয়। এই জাতীয় অভ্যুত্থানের সামনে সমস্ত শ্রেণী-পার্থক্য অদৃশ্য হল, দক্ষিণ জার্মান রাজসভাগুলির এক রেনিশ কনফেডারেশনের জন্য সমস্ত প্রয়াস, বহিষ্কৃত নৃপতিদের পুনরুদ্ধারের সমস্ত চেষ্টা মিলিয়ে গেল।

উভয় পক্ষই মিত্রের সন্ধান করতে লাগল। অস্ট্রিয়া ও ডেনমার্ক সম্পর্কে, এবং কিছু পরিমাণে ইতালি সম্পর্কে লুই নেপোলিয়ন সুনিশ্চিত ছিলেন। বিসমার্কের পক্ষে ছিল রাশিয়া। কিন্তু অস্ট্রিয়া, চিরকালের মতোই, প্রস্তুত ছিল না এবং ২ সেপ্টেম্বরের আগে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারল না — আর ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে লুই নেপোলিয়ন জার্মানদের হাতে যুদ্ধবন্দী

হলেন; আর রাশিয়া অস্ট্রিয়াকে জানিয়ে দিল যে অস্ট্রিয়া প্রাশিয়াকে আক্রমণ করার পর মুহূর্তেই সে অস্ট্রিয়াকে আক্রমণ করবে। ইতালিতে অবশ্য লুই নেপোলিয়নের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনসিদ্ধির নীতিই তাঁর উপরে প্রতিশোধ নিল: তিনি চেয়েছিলেন জাতীয় ঐক্য চালু করতে, কিন্তু একই সঙ্গে, সেই জাতীয় ঐক্যেরই বিরুদ্ধে পোপকে রক্ষা করতে; যে সৈন্য তাঁর এখন স্বদেশেই দরকার ছিল, তাদের দিয়ে তিনি রোম দখলে রাখলেন, ইতালিকে দিয়ে রোম ও পোপের সার্বভৌমত্বকে মর্যাদা দিতে বাধ্য না-করে তিনি সৈন্যাপসারণ করতে পারেন না; এ জন্য আবার ইতালি তাঁকে সমর্থন করতে পারল না। ডেনমার্ক শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার কাছ থেকে উপযুক্ত আচরণ করার নির্দেশ পেল।

স্পিখার্ন ও ভোর্থ থেকে সেদান (৬৪) পর্যন্ত জার্মান সেনাবাহিনীর দ্রুত আঘাত যুদ্ধকে স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ করে রাখার ব্যাপারে সমস্ত কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার চাইতে বেশি নিয়ামক হয়েছিল। লুই নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী প্রতিটি লড়াইতে পরাজিত হল এবং শেষ পর্যন্ত তার তিন-চতুর্থাংশ জার্মানিতে চলে গেল যুদ্ধবন্দী হিসেবে। সৈনিকদের দোষে এটা হয় নি, তারা যথেষ্ট সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল; দোষ ছিল নেতাদের এবং প্রশাসনের। কিন্তু, লুই নেপোলিয়নের মতো, কেউ যদি একদল বদমাশের সাহায্যে একটা সাম্রাজ্য সৃষ্টি করে থাকত, যদি সেই দলের শোষণের হাতে ফ্রান্সকে ছেড়ে দিয়ে আঠারো বছর ধরে তার উপরে শাসন বজায় রাখা হত, যদি রাষ্ট্রের সমস্ত নিয়ামক গুরুত্বসম্পন্ন পদ সেই দলের লোকজন দিয়ে ভর্তি করা হত এবং সমস্ত অধীনস্থ পদ ভর্তি করা হত তাদের অনুচরদের দিয়ে, তাহলে জীবন-মরণ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়, হলে নিঃসহায় হয়ে পড়ার সমূহ বিপদ থাকবেই। বহু বছর ধরে ইউরোপীয় অর্বাচীনদের বিমুগ্ধ প্রশংসার বস্তু এই সাম্রাজ্যের গোটা ইমারত ভেঙে পড়ল পাঁচ সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে; ৪ সেপ্টেম্বরের বিপ্লব (৬৫) শুধু জঞ্জালের স্তূপ সাফ করেছিল, আর যে-বিসমার্ক যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন একটি ক্ষুদ্র জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপন করার জন্য, তিনি সহসা এক শুভ প্রভাতে আবিষ্কার করলেন তিনি একটি ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হয়ে গেছেন।

বিসমার্কের নিজের ঘোষণা অনুযায়ী, ফরাসী জনগণের বিরুদ্ধে নয়, শুধু লুই নেপোলিয়নের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ চালানো হয়েছিল। তাঁর পতনে, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আর কোনো কারণ নেই। ৪ সেপ্টেম্বরের সরকার, অন্যান্য বিষয়ে তত সরল না হলেও, তাই ভেবেছিল; কিন্তু বিসমার্ক যখন হঠাৎ তাঁর প্রুশীয় য়ুঙ্কারের (৬৬) রূপ প্রকাশ করলেন, তারা অত্যন্ত হতচকিত হয়ে গেল।

প্রুশীয় য়ুঙ্কাররা ফরাসীদের যত ঘৃণা করে ততটা পৃথিবীতে আর কেউ করে না। কারণ, এর আগে-পর্যন্ত কর-মুক্ত য়ুঙ্কাররা ফরাসীদের হাতে শাস্তিলাভের সময়ে (১৮০৬ থেকে ১৮১৩) প্রচন্ড কষ্টভোগ করেছিল, যদিও সে শাস্তি তারা পেয়েছিল তাদেরই ঔদ্ধত্যের দরুন; শুধু তাই নয়, তার চাইতেও যা খারাপ, ঈশ্বরহীন ফরাসীরা তাদের সাংঘাতিক বিপ্লবে জনসাধারণকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করেছিল যে য়ুঙ্কারদের প্রাচীন গরিমা এমন কি পুরনো প্রাশিয়াতেও অনেকাংশে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে, তার সামান্য যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সেটুকু রক্ষা করার জন্য বছরের পর বছর বেচারা য়ুঙ্কারদের কঠোর সংগ্রাম চালাতে হয়েছে, এবং তাদের অনেকেই হীন পরাশ্রয়ী অভিজাততন্ত্রের স্তরে অধঃপতিত হয়েছে। এই জন্য ফ্রান্সের উপরে প্রতিশোধ নেওয়া দরকার ছিল, এবং বিসমার্কের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর য়ুঙ্কার অফিসাররা সে বিষয়ে যত্নবান হল। প্রাশিয়ার কাছ থেকে ফ্রান্স যে যুদ্ধবাবদ অর্থ আদায় করেছিল তার তালিকা তৈরি করা হল এবং ফ্রান্সের বিভিন্ন শহর ও বিভাগের উপরে চাপানো যুদ্ধবাবদ চাঁদার পরিমাণ তদনুযায়ী হিসাব করা হল, স্বভাবতই এই হিসাব করার সময়ে ফ্রান্সের অধিকতর সম্পদের কথা গণ্য করা হয়েছিল। খাদ্যসামগ্রী, ঘোড়া ও গবাদি পশুর খাদ্য, বস্ত্র, জুতো প্রভৃতি আদায় করে নেওয়া হল দর্শনীয় নির্মমতায়। আর্দেন্ অঞ্চলে একজন মেয়র বলেছিলেন যে এসব জিনিস সরবরাহ করতে তিনি অক্ষম, অধিক বাক্য ব্যয় না-করে তাঁকে পঁচিশ-ঘা বেত মারা হয়েছিল — প্যারিস সরকার সরকারীভাবে তা প্রমাণ করে ফ্রাঁ-তিরো-রা (৬৭) ১৮১৩ সালের প্রুশীয় 'লান্ডস্টার্ম সংবিধি' (৬৮) এমনভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে কাজ করেছিল, যেন তারা সেটি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছে; তাদের নির্দয়ভাবে গুলি করে মারা হয়। ঘড়ি স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার কাহিনীও

সত্য, এমন কি *Kölnische Zeitung* (৬৯) পত্রিকাও সে খবর দিয়েছিল। তবে, প্রুশীয় অভিমত অনুযায়ী, ঘড়িগুলো চুরি করা হয় নি, ওগুলোর কোনো মালিক ছিল না, পাওয়া গিয়েছিল প্যারিসের কাছে পরিত্যক্ত বাসভবনগুলিতে এবং সেগুলি দেশে প্রিয়জনদের জন্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এইভাবে, বিসমার্কের নেতৃত্বে য়ুঙ্কাররা এবিষয়ে যত্নবান ছিল যাতে সাধারণ সৈনিক ও বহু অফিসারের অনিন্দনীয় আচরণ সত্ত্বেও, যুদ্ধের সবিশেষ প্রুশীয় চরিত্র বজায় থাকে, এবং য়ুঙ্কারদের হীন অসূয়ার জন্য যারা সমগ্র সেনাবাহিনীকেই দায়ী করেছিল সেই ফরাসীদের মাথায় তা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়।

তা সত্ত্বেও, এই য়ুঙ্কারদেরই ভাগ্যে পড়েছিল ফরাসী জাতিকে ইতিহাসে অতুলনীয় এক সম্মান দেওয়ার ভার। প্যারিসের অবরোধ মুক্ত করতে শত্রুকে বাধ্য করার সমস্ত চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, সবকটি ফরাসী সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত, জার্মান যোগাযোগ ব্যবস্থার উপরে বুরবাকির শেষ বড় প্রতি-আক্রমণ নিষ্ফল হল যখন ইউরোপের সমস্ত কূটনীতি বিন্দুমাত্র অঙ্গুলিহেলন না-করে ফ্রান্সকে ছেড়ে দিল তার নিয়তির হাতে, অনাহারক্লিষ্ট প্যারিসকে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে হল। য়ুঙ্কাররা যখন অবশেষে ঈশ্বরহীন আবাসে বিজয়গর্বে প্রবেশ করে প্যারিসের ঘোরতর বিদ্রোহীদের উপরে পরিপূর্ণ প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে পেরেছিল তখন তাদের হৃদ্‌স্পন্দন হয়ে উঠেছিল দ্রুততর; — এই পরিপূর্ণ প্রতিশোধ নিতে ১৮১৪ সালে রাশিয়ার সম্রাট আলেক্সান্দর এবং ১৮১৫ সালে ওয়েলিংটন নিষেধ করেছিলেন; এখন তারা বিপ্লবের জন্মভূমিকে প্রাণ ভরে শাস্তি দিতে পারল।

প্যারিস আত্মসমর্পণ করল, খেসারত দিল ২০ কোটি মুদ্রা, দুর্গগুলি তুলে দেওয়া হল প্রুশীয়দের হাতে; বিজেতাদের সামনে সৈন্যবাহিনী তাদের অস্ত্রত্যাগ করল এবং হাল্কা কামানগুলিকে তুলে দিল তাদের হাতে; প্যারিসের চারপাশের প্রাচীরে রাখা কামানগুলিকে কামানবাহী শকট থেকে খুলে নেওয়া হল; রাষ্ট্রের হাতে প্রতিরোধের যে-সমস্ত উপায়-উপকরণ ছিল সে সবই একটু একটু করে হস্তান্তরিত করা হল। কিন্তু প্যারিসের যারা প্রকৃত রক্ষক, সেই জাতীয় রক্ষিবাহিনী, প্যারিসের সশস্ত্র জনগণের গায়ে হাত

দেওয়া হয় নি, কারণ কেউই আশা করে নি যে তারা অস্ত্র পরিত্যাগ করবে — রাইফেলও না, কামানও* নয়; সুতরাং সারা পৃথিবীর একথা জানা থাকবে যে বিজয়ী জার্মান সেনাবাহিনী প্যারিসের সশস্ত্র জনগণের সামনে এসে সসম্ভ্রমে থেমে গিয়েছিল, বিজয়ীরা প্যারিসে প্রবেশ করে নি, শুধু তিন দিনের জন্য প্যারিসবাসীর প্রহরীদের দ্বারা সুরক্ষিত, প্রহরাধীন ও চতুর্দিকে বেষ্টিত অবস্থায় একটি সরকারী পার্ক — শাঁজেলিজে দখল করতে পেরেই সন্তুষ্ট ছিল! কোনো জার্মান সৈনিকই প্যারিসের সিটি হল-এ পা দেয় নি অথবা প্রশস্ত বীথিগুলির উপরে পদচার করে নি এবং অল্প যে কয়েকজনকে ল্যুভর-এ সেখানকার শিল্পসম্পদ দেখার জন্য ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল, তাদেরও অনুমতি চাইতে হয়েছিল, অন্যথায় সেটা হত আত্মসমর্পণের শর্ত লঙ্ঘন করা। ফ্রান্স পরাস্ত হয়েছিল, প্যারিস ছিল অনাহারে, কিন্তু প্যারিসের জনগণ তাদের গৌরবময় অতীতের সাহায্যে নিজেদের জন্য **এমন** সম্মান আদায় করে নিয়েছিল, যার ফলে কোনো বিজেতা তাদের নিরস্ত্রীকরণ দাবি করার দুঃসাহস দেখায় নি, একটি বাড়ি তল্লাসী করার কিংবা অনেক বিপ্লবের রণক্ষেত্র সেই রাস্তাগুলিকে বিজয়োৎসবের শোভাযাত্রায় অপবিত্র করার সাহসও কারও ছিল না। যেন ভুঁইফোড় জার্মান সম্রাট** প্যারিসের জীবিত বিপ্লবীদের সামনে মাথার টুপি খুলে দাঁড়িয়েছিলেন, একদা যেমন তাঁর ভাই*** দাঁড়িয়েছিলেন বার্লিনের মৃত মার্চ-সংগ্রামীদের (৭০) সামনে; এবং যেন গোটা জার্মান সেনাবাহিনী তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছিল সম্মান দেখানোর ভঙ্গিতে অস্ত্রধারণ করে।

কিন্তু বিসমার্ককে শুধু এই আত্মত্যাগটুকুই করতে হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে এমন কোনো সরকার ফ্রান্সে নেই —

---

* এই কামানগুলি ছিল জাতীয় রক্ষিবাহিনীর, রাষ্ট্রের নয়, তাই সেগুলো প্রুশীয়দের হাতে অর্পণ করা হয় নি, ১৮ মার্চ ১৮৭১ তারিখে তিয়ের প্যারিসবাসীদের কাছ থেকে এই কামানগুলিই **চুরি করার** নির্দেশ দিয়ে বিদ্রোহের কারণস্বরূপ হয়েছিলেন, যার ফলে উদ্ভব ঘটেছিল কমিউনের।

** প্রথম ভিলহেল্ম। — সম্পাঃ

*** চতুর্থ ফ্রিডরিখ ভিলহেল্ম। — সম্পাঃ

কথাটা ৪ সেপ্টেম্বর ও ২৮ জানুয়ারি, দুদিনই যেমন সত্য ছিল তেমনি মিথ্যাও ছিল — এই অজুহাতে তিনি তাঁর সাফল্যগুলিকে নির্ভেজাল প্রুশীয় ভঙ্গিতে, একেবারে শেষ বিন্দু পর্যন্ত ব্যবহার করলেন, এবং ঘোষণা করলেন যে ফ্রান্স সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হওয়ার পরেই তিনি শান্তি স্থাপন করতে প্রস্তুত। শান্তি চুক্তিতেও, আরও একবার সুপ্রাচীন প্রুশীয় রীতি অনুযায়ী, তিনি 'অনুকূল পরিস্থিতি নির্মমভাবে সদ্ব্যবহার করলেন'। যুদ্ধের খেসারত হিসেবে শুধু যে অশ্রুতপূর্ব পরিমাণ একটা অংক —৫০০ কোটি — আদায় করা হল তাই নয়, দুটি প্রদেশ অ্যালসেস ও জার্মান লোরেন, তৎসহ মেৎস ও স্ত্রাসবুর্গও ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে জার্মানির অন্তর্ভুক্ত করা হল। এই রাজ্য-সংযোজন করে বিসমার্ক সর্বপ্রথম কাজ করলেন একজন স্বাধীন রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে, যিনি আর বাইরে থেকে নির্দেশিত কোনো কর্মসূচি নিজস্ব উপায়ে রূপায়িত করছেন না, বরং কাজে রূপায়িত করছেন তাঁর নিজের মস্তিষ্কজাত চিন্তাকে — এবং সেইখানে তিনি করলেন তাঁর প্রথম বিরাট ভুল।

ত্রিশ বছরের যুদ্ধের সময়ে ফ্রান্সই প্রধানত অ্যালসেস অধিকার করেছিল। রিশল্যু তার দ্বারা চতুর্থ হেনরির সুযুক্তিপূর্ণ নীতিটি পরিত্যাগ করেছিলেন:

> 'স্প্যানিশ ভাষা স্প্যানিয়ার্ডদের থাক, জার্মান ভাষা থাক জার্মানদের, কিন্তু ফরাসী ভাষা যেখানে বলা হয়, তার মালিক আমি।'

এক্ষেত্রে, রিশল্যু অগ্রসর হয়েছিলেন রাইন অঞ্চলের স্বাভাবিক সীমান্ত, পুরনো গল-এর ঐতিহাসিক সীমান্তের নীতি থেকে। তা ছিল মূর্খতা; কিন্তু যে জার্মান সাম্রাজ্য লোরেন ও বেলজিয়ামের ফরাসীভাষী অঞ্চলগুলিকে, এমন কি ফ্রান্শ-কঁতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল, জার্মানভাষী অঞ্চল দখলের জন্য ফ্রান্সকে তিরস্কার করার কোনো অধিকার তার ছিল না। এমন কি যদি ১৬৮১ সালে, শান্তির সময়ে, চতুর্দশ লুই ফরাসীদের সমর্থক একটি দলের সাহায্যে স্ত্রাসবুর্গ দখল করেও থাকেন (৭১), তা নিয়ে প্রাশিয়ার ক্ষুব্ধ হওয়া সমীচীন নয়, যেহেতু সে ১৭৯৬ সালে একই কায়দায় মুক্ত

রাজকীয় ন্যুরেম্‌বার্গ শহরকে লুণ্ঠন করেছিল, যদিও একথা ঠিক কোনো প্রুশীয় দল তাকে আহ্বান জানায় নি, এবং সে সফলও হয় নি।*

ভিয়েনার শান্তি চুক্তি অনুযায়ী ১৭৩৫ সালে অস্ট্রিয়া বিনিময়সূচক লেনদেনে লোরেনকে তুলে দেয় ফ্রান্সের হাতে, এবং ১৭৬৬ সালে সে শেষ পর্যন্ত একটি ফরাসী-অধিকৃত অঞ্চলে পরিণত হয়। বহু শতাব্দী ধরে সে জার্মান সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল শুধু নামেই, তার নৃপতিরা সর্বদিক দিয়েই ছিলেন ফরাসী এবং প্রায় সর্বদাই ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে ছিলেন।

ফরাসী বিপ্লবের আগে ভোজ অঞ্চলে এমন বহু ছোট ছোট রাজ্য ছিল যারা জার্মানির সঙ্গে আচরণ করত শুধু রাজকীয় সরকারের অধীন অঞ্চলের মতো, কিন্তু স্বীকার করত ফ্রান্সের সার্বভৌমত্ব। এই উভলিঙ্গ অবস্থার সুযোগ

---

* যেসব জার্মান অঞ্চল তাঁর ছিল না সেইখানে শান্তির সময়ে তাঁর 'পুনর্মিলন কক্ষ'-কে (৭২) লেলিয়ে দেওয়ার জন্য চতুর্দশ লুই তিরস্কৃত হয়ে থাকেন। প্রুশীয়দের সম্পর্কে যাদের সবচেয়ে বিদ্বেষপূর্ণ ঈর্ষা ছিল, এমন কি তারাও প্রুশীয়দের সম্পর্কে এ কথা বলতে পারতেন না। বরং তার বিপরীত। সাম্রাজ্যিক সংবিধান প্রত্যক্ষভাবে লঙ্ঘন করে ১৭৯৫ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে এক পৃথক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর এবং প্রথম উত্তর জার্মান কনফেডারেশনে তাদের চারপাশের সীমারেখার পিছনে সমান অবিশ্বস্ত ছোট ছোট প্রতিবেশীকে সমবেত করার পর, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে জোট বেঁধে একা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ফলে দক্ষিণ জার্মান রাজকীয় সরকারগুলি যে প্রচন্ড চাপের সম্মুখীন হয়েছিল, তাকে তারা কাজে লাগিয়েছিল ফ্রাঙ্কনিয়ার ভূখন্ড দখলের চেষ্টায়। আনস্‌বাখ ও বেরুথে (এগুলি তখন প্রুশীয় ছিল) লুইয়ের ধাঁচে 'পুনর্মিলন কক্ষ' তৈরি করে তারা অনেকগুলি প্রতিবেশী এলাকার উপরে দাবি জানাল, যার তুলনায় লুইয়ের আইনগত দাবিগুলি ছিল পুরোপুরি বিশ্বাসজনক; এবং জার্মানরা যখন মার খেয়ে পশ্চাদপসরণ করল এবং ফরাসীরা ফ্রাঙ্কনিয়ায় ঢুকে পড়ল, তখন প্রুশীয় রক্ষাকর্তারা নগর প্রাচীর পর্যন্ত উপকণ্ঠ সহ ন্যুরেম্‌বার্গ অঞ্চল দখল করে নিল এবং ভয়ে কম্পিত ন্যুরেম্‌বার্গ কূপমন্ডূকদের দিয়ে কৌশলে এমন চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নিল (২ সেপ্টেম্বর, ১৭৯৬), যার ফলে শহরটি চলে গেল প্রুশীয় শাসনাধীনে, এই শর্তে যে নগর প্রাচীরের ভিতরে ইহুদিদের কখনও ঢুকতে দেওয়া হবে না। তার অব্যবহিত পরেই, আর্চডিউক কার্ল আবার আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর, ১৭৯৬ তারিখে ভুরৎসবুর্গে ফরাসীদের পরাস্ত করেন, এবং ন্যুরেম্‌বার্গ শহরবাসীর মাথায় প্রাশিয়ার জার্মান ব্রতের ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা এইভাবে বিলীন হয়ে যায়।

তারা ভোগ করত, আর জার্মান সাম্রাজ্য যদি এই শাসকদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে তা সহ্য করে থাকে, তাহলে ফ্রান্স যখন তার সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে এই অঞ্চলগুলির জনগণকে বহিষ্কৃত নৃপতিদের বিরুদ্ধে আশ্রয় দিয়েছিল তখন তার অভিযোগ করার কিছু ছিল না।

মোটের উপরে, বিপ্লবের আগে, এই জার্মান অঞ্চলটি কার্যত মোটেই ফরাসী-প্রভাবিত ছিল না। জার্মান ভাষা ছিল স্কুলের এবং সরকারী কাজের ভাষা, অন্তত অ্যালসেসে। ফরাসী সরকার জার্মান প্রদেশগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করত; এই প্রদেশগুলি বহু বছরের যুদ্ধজনিত ধ্বংসের পর এখন, ১৮শ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে তাদের জমিতে আর শত্রুদের দেখতে পায় নি। নিরন্তর আভ্যন্তরিক যুদ্ধে দীর্ণ জার্মান সাম্রাজ্য সত্যিই অ্যালসেসীয়দের আকৃষ্ট করে মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়ে আনার মতো অবস্থায় ছিল না; অন্তত, তারা এখন স্বস্তি আর শান্তি পেয়েছিল, অবস্থাটা কী বুঝত এবং যারা মেজাজটা বেঁধে দেয় সেই অর্বাচীনরা পরমেশ্বরের অজ্ঞেয় লীলা স্বীকার করে নিয়েছিল; অধিকন্তু এই জন্য যে তাদের ভাগ্য অভূতপূর্ব নয়: হল্স্টাইনের জনগণও ছিল বিদেশী, ড্যানিশ শাসনের অধীনে।

এমন সময়ে এল ফরাসী বিপ্লব। অ্যালসেস ও লোরেন জার্মানির কাছ থেকে যা পাওয়ার দুরাশাও কখনো করে নি, ফ্রান্স তাদের তা দিল উপহার হিসেবে। সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল চূর্ণ হল। ভূমিদাস, সামন্ততান্ত্রিক কৃষক হল মুক্ত মানুষ, বহু ক্ষেত্রে তার খামার ও খেতের মুক্ত মালিক। শহরে অভিজাত সম্প্রদায়ের বংশানুক্রমিক শাসন এবং গিল্ডের বিশেষ সুবিধা দূর হল। উচ্চবংশজাত সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় বহিষ্কৃত হল। ছোট ছোট নৃপতি ও প্রভুদের জমিতে কৃষকরা তাদের প্রতিবেশীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল এবং সার্বভৌম কর্তা, সরকারী কক্ষগুলির সদস্য ও সম্ভ্রান্তবংশীয়দের বহিষ্কৃত করে নিজেদের ঘোষণা করল স্বাধীন ফরাসী নাগরিক বলে। ফ্রান্সের অন্য কোনো অংশেই জনগণ জার্মানভাষী অংশের মতো এত উৎসাহ নিয়ে বিপ্লবে যোগ দেয় নি। আর এখন যখন জার্মান সাম্রাজ্য বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, জার্মানরা শুধু যে বশংবদভাবে তাদের শৃঙ্খল বহন করে চলছিল তাই নয়, তারা যখন ফরাসীদের উপরে জোর করে পুরনো দাসত্ব চাপিয়ে দেওয়ার কাজে এবং অ্যালসেসীয় কৃষকদের উপরে তাদের সদ্য-

বহিষ্কৃত সামন্ত প্রভুদের আবার চাপিয়ে দেওয়ার কাজে নিজেদের আরও একবার ব্যবহৃত হতেও দিল, তখন অ্যালসেস ও লোরেনের জনগণের জার্মানপ্রীতি একেবারেই শেষ হয়ে গেল, তখনই তারা জার্মানদের ঘৃণা ও অপছন্দ করতে শিখল; তখনই স্ত্রাসবুর্গে লেখা হল 'মার্সেইয়েজ' (৭৩), তাতে সুর দেওয়া হল আর সর্বপ্রথমে তা গাইল অ্যালসেসীয়রা, এবং জার্মান ফরাসীরা তাদের ভাষা ও অতীত সত্ত্বেও বিপ্লবের সপক্ষে সংগ্রামে শত শত রণক্ষেত্রে ফরাসীদের সঙ্গে লীন হয়ে একটি মাত্র জাতিতে পরিণত হল।

এই মহাবিপ্লব কি ডানকার্কের ফ্লেমিঙ, ব্রিতানির কেল্ট, কর্সিকার ইতালীয়দের ক্ষেত্রেও একই বিস্ময়কর কান্ড ঘটায় নি? আর আমরা যদি অনুযোগ করি যে জার্মানদের ক্ষেত্রেও তা ঘটেছিল, তাহলে তা কি এটাই দেখায় না যে, আমাদের সমগ্র ইতিহাস আমরা বিস্মৃত হয়েছি, যে-ইতিহাসই এ-কাজকে সম্ভব করে তুলেছিল? আমরা কি ভুলে গিয়েছি যে রাইনের গোটা বাম তীর বিপ্লবে শুধু একটা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল, কিন্তু ১৮১৪ সালে জার্মানরা যখন ঢুকে পড়ল, তখনও তা ফরাসীদের প্রতি অনুগত ছিল এবং ফরাসীদের প্রতিই অনুগত থেকে গিয়েছিল ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত, যখন বিপ্লবই রাইনের জনগণের চোখে জার্মানদের পুনর্বাসন ঘটিয়েছিল? আমরা কি ভুলে গিয়েছি যে ফরাসীদের সপক্ষে হাইনে-র উৎসাহ, এমন কি তাঁর বোনাপার্টপন্থাও রাইনের বাম তীরের জনসাধারণের মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি মাত্র?

১৮১৪ সালে মিত্রপক্ষীয়রা যখন ঢুকল, তখন অ্যালসেস ও জার্মান লোরেনেই তারা সবচেয়ে দৃঢ়পণ বৈরি-তৎপরতার, একেবারে জনগণেরই তরফে কঠোরতম প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল; কারণ এখানে আবার জার্মান হবার বিপদটা অনুভূত হয়েছিল। অথচ সেই সময়ে, বলতে গেলে একমাত্র জার্মান ভাষাই সেখানে বলা হত। কিন্তু ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিপদ যখন কেটে গেল, জার্মান রোমান্টিক জাত্যভিমানীদের রাজ্যগ্রাস-লালসার যখন অবসান ঘটানো হল, তখন এই সচেতনতা বাড়ল যে ফ্রান্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর মিশ্রণ ভাষার ব্যাপারেও দরকার, এবং তখনই স্কুলগুলির ফরাসীকরণ প্রবর্তন করা হল, লুক্সেমবুর্গবাসীরা তাদের দেশে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যা প্রবর্তন করেছিল তারই অনুরূপ। তা হলেও, রূপান্তরণ চলেছিল

অতি ধীরে; বুর্জোয়া শ্রেণীর একমাত্র বর্তমান প্রজন্ম সত্যিই ফরাসী-ধারালালিত, অথচ কৃষক ও শ্রমিকরা জার্মান ভাষায় কথা বলে। অবস্থাটা প্রায় লুক্সেমবুর্গেরই মতো: ফরাসী ভাষা সাহিত্যিক জার্মান ভাষাকে স্থানচ্যুত করেছে (অংশত ধর্মপ্রচারবেদী ছাড়া), কিন্তু জার্মান লোক-ভাষা স্থানচ্যুত হয়েছে একমাত্র ভাষাগত সীমান্তে এবং জার্মানির অধিকাংশ স্থানের তুলনায় তা অনেক বেশি মাত্রায় লৌকিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

জাত্যভিমানসূচক রোমাণ্টিকতার পুনরুজ্জীবনে — মনে হয় সমস্ত জার্মান সমস্যার সঙ্গে এই রোমাণ্টিকতা অচ্ছেদ্য — মদত পাওয়া বিসমার্ক ও প্রুশীয় যুঙ্কাররা এই রকম একটি দেশকেই আবার জার্মান করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। 'মার্সেইয়েজের' জন্মভূমি স্ত্রাসবুর্গকে জার্মান করার ইচ্ছা গ্যারিবল্ডির স্বদেশভূমি নীস্‌কে ফরাসী করার মতোই অবাস্তব। কিন্তু নীসে, লুই নেপোলিয়ন অন্তত শোভনতা দেখিয়েছিলেন এবং অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটি ভোটে দিয়েছিলেন — আর সেই চাল সফল হয়েছিল। প্রুশীয়রা এরূপ বৈপ্লবিক ব্যবস্থা যে উপযুক্ত কারণেই অপছন্দ করে তা উল্লেখ না করলেও চলে — কোথাও কখনও এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় নি যেখানে জনসাধারণ প্রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছে — কিন্তু একথা ভালো করেই জানা ছিল যে এখানেই সমগ্র জনসমষ্টি খাশ ফ্রান্সে জাত ফরাসীদের চাইতেও বেশি ঘনিষ্ঠভাবে ফ্রান্সের সঙ্গে সংসক্ত ছিল। আর তাই এই যথেচ্ছ কাজটি সম্পন্ন করা হল পাশব বলপ্রয়োগে। তা ছিল ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক কাজ: বিপ্লবেরই ফলে ফ্রান্সের সঙ্গে লীন হয়ে যাওয়া অন্যতম একটি অঙ্গকে ছিঁড়ে নেওয়া হল।

একথা সত্যি যে সামরিক দিক দিয়ে এই অঞ্চল দখলের পিছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। মেৎস ও স্ত্রাসবুর্গ জার্মানিকে অত্যন্ত প্রবল এক প্রতিরক্ষা ব্যূহ যুগিয়েছিল। বেলজিয়াম ও সুইজারল্যান্ড যতদিন নিরপেক্ষ থাকবে, ততদিন বিপুল আকারে এক ফরাসী আক্রমণাভিযান শুরু হতে পারে একমাত্র মেৎস ও ভোজ-এর মধ্যবর্তী সংকীর্ণ ভূখণ্ডে; আর তাছাড়া কবলেনৎস, মেৎস, স্ত্রাসবুর্গ ও মাইনৎস একসঙ্গে মিলে পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী ও বড় দুর্গ-চতুর্ভুজ। কিন্তু এই দুর্গ-চতুর্ভুজের অর্ধেকটা,

লম্বার্দিতে অস্ট্রীয় দুর্গগুলির মতোই*, রয়েছে শত্রু অঞ্চলে এবং সেখানে তা জনসমষ্টিকে বশে রাখার জন্য নগরদুর্গ হিসেবে কাজ করছে। অধিকন্তু, চতুর্ভুজটিকে সম্পূর্ণ করার জন্য দরকার ছিল জার্মানভাষী সীমান্ত পেরিয়ে এলাকা দখল করা এবং সেই সঙ্গে উপরি-পাওনা হিসেবে আড়াই লাখের মতো দেশীয় ফরাসীকেও অধিকার করা।

এইভাবে, বিরাট রণনৈতিক সুবিধাই একমাত্র কারণ, যার দ্বারা এই রাজ্যদখলের যাথার্থ্য প্রমাণ করা যায়। কিন্তু, যে ক্ষতি তা করেছিল তার সঙ্গে এই লাভের কি কোনো মতে তুলনা করা চলে?

পশুবলই তার নির্দেশক নীতি — প্রকাশ্যে ও অকপটে এই কথা ঘোষণা করে তরুণ জার্মান সাম্রাজ্য নিজেকে যে বিরাট নৈতিক অসুবিধায় ফেলেছিল, প্রুশীয় য়ুঙ্কাররা তা গণ্য করতেই রাজী হয় নি। বরং বলপ্রয়োগে সংযত করে রাখা অবাধ্য প্রজা য়ুঙ্কারদের পক্ষে অত্যাবশ্যক; তারা প্রুশীয় পরাক্রমবৃদ্ধির প্রমাণ; এবং সারগতভাবে, য়ুঙ্কাররা কখনও অন্য কোনো ধরনের প্রজা পায়ও নি। কিন্তু রাজ্যদখলের রাজনৈতিক পরিণতি তারা গণ্য করতে বাধ্য হয়েছিল। এবং তা স্পষ্টতই প্রতীয়মান ছিল। রাজ্যদখল কার্যকর হওয়ার আগেই মার্কস আন্তর্জাতিকের ভাষণে উচ্চকণ্ঠে এই দিকে পৃথিবীর মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিলেন: **'অ্যালসেস ও লোরেন দখল রাশিয়াকে ইউরোপের সালিস করে তোলে'**।** এবং রাইখস্টাগের মঞ্চ থেকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা বহুবার একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন, শেষ পর্যন্ত স্বয়ং বিসমার্কও এই উক্তির সত্যতা স্বীকার করেন তাঁর ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮ তারিখের রাইখস্টাগের বক্তৃতায়, যুদ্ধ ও শান্তির নিয়ন্তা, সর্বশক্তিমান জারের সামনে তাঁর ফোঁপানির মধ্যে।

প্রকৃতপক্ষে, পরিস্থিতি ছিল দিবালোকের মতো স্পষ্ট। ফ্রান্সের কাছ থেকে তার দুটি গোঁড়া দেশপ্রেমিক প্রদেশকে ছিন্ন করে নেওয়ার অর্থ, তাকে এমন কারো হাতে ঠেলে দেওয়া, যে সেগুলি ফিরিয়ে আনার আশা দিতে

* ভেরোনা, লেনাগো, মান্তুয়া ও পেসকেরা। — সম্পাঃ

** কার্ল মার্কস, 'ফ্রান্স-প্রাশিয়া যুদ্ধ প্রসঙ্গে মেহনতি মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় ভাষণ' (এই সংস্করণের ৭ম খণ্ডের ২৯-৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। — **সম্পাঃ**

পারবে, এবং তাকে চিরশত্রু করে তোলা। বিসমার্ক এ ব্যাপারে জার্মান কূপমণ্ডূকদের যোগ্য ও বিবেকী প্রতিনিধি, তিনি দাবি করলেন যে ফরাসীদের শুধু সংবিধানগতভাবেই নয়, নৈতিকভাবেও অ্যালসেস ও লোরেন পরিত্যাগ করতে হবে, এবং অধিকন্তু, বিপ্লবী ফ্রান্সের এই দুটি অংশ যে 'পুরনো পিতৃভূমির কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে' সে জন্য তিনি চাইলেন তারাও খুশী হোক, যদিও অবশ্য তারা এ কথায় কর্ণপাতই করতে চায় নি। দুর্ভাগ্যবশত, নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময়ে রাইনের বাম তীর জার্মানরা যেমন নৈতিকভাবে পরিত্যাগ করে নি, যদিও সেই অঞ্চলটির তাদের কাছে ফিরে যাওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনাও ছিল না, তেমনি ফরাসীরাও তা করছে না। যতদিন পর্যন্ত অ্যালসেস ও লোরেনের জনগণ ফ্রান্সের কাছে ফিরে যেতে চায়, ততদিন তাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য সে অতি অবশ্যই প্রয়াস চালাবে এবং তা অর্জনের জন্য উপায় এবং সেই হেতু মিত্রেরও সন্ধান করবে। আর রাশিয়া হল জার্মানির বিরুদ্ধে তার স্বাভাবিক মিত্র।

পশ্চিম মহাদেশের বৃহত্তম ও সবচেয়ে পরাক্রান্ত জাতিগুলি যদি তাদের হানাহানিতে পরস্পরকে অক্রিয় করে দেয়, এমন কি যদি তাদের মধ্যে এমন এক চিরন্তন কলহের হেতু থাকে যা তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্ররোচনা দেয়, তাহলে সুবিধাটা শুধু রাশিয়ারই, কারণ তার হাত অনেক বেশি মুক্ত; রাশিয়া তার রাজ্যজয়ের প্রয়াসে জার্মানির কাছ থেকে তত কম বিঘ্নিত, যত বেশি করে সে ফ্রান্সের কাছ থেকে নিঃশর্ত সমর্থন আশা করতে পারে। আর বিসমার্কই কি ফ্রান্সকে সেই অবস্থায় এনে ফেলেন নি যেখানে তাকে রাশিয়ার মৈত্রী প্রার্থনা করতে হয়, রাশিয়া যদি ফ্রান্সের হৃত প্রদেশগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে ইচ্ছুকভাবেই রাশিয়ার কাছে কনস্টানটিনোপ্‌ল্‌কে ছেড়ে দিতে হয়? আর এসব সত্ত্বেও যদি সতেরো বছর ধরে শান্তি রক্ষিত হয়ে থাকে, তাহলে এছাড়া তার কি অন্য কারণ আছে যে ফ্রান্স ও রাশিয়ায় প্রবর্তিত আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণসংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বয়ঃগোষ্ঠীর লোক যোগাতে অন্তত ষোল বছর, এবং সাম্প্রতিক জার্মান উন্নতিবিধানের পর এমন কি পঁচিশ বছর দরকার? আর এখন যখন সতেরো বছর ধরে এই রাজ্যদখল সমস্ত ইউরোপীয় রাজনীতিতেই প্রাধান্য সম্পন্ন বিষয়, তখন সেটাই কি যে-সংকট মহাদেশকে যুদ্ধের বিপদে

বিপন্ন করে তুলছে তার প্রধান কারণ নয়? এই একটিমাত্র বিষয়কে অপসারিত করে দেখুন, শান্তি সুনিশ্চিত!

যে অ্যালসেসীয় বুর্জোয়া দক্ষিণ জার্মান বাচনভঙ্গিতে ফরাসী বলে, যে দো-আঁশলা অলীকবাবু ফ্রান্সের দেশীয় ফরাসীর মতো তার ফরাসী আদবকায়দা জাহির করে বেড়ায়, যে গ্যেটেকে হেয়জ্ঞান করে কিন্তু রাসিন সম্পর্কে অত্যুৎসাহী, জার্মান কুলোদ্ভব হওয়ার জন্য যে এখনও তার গোপন বিবেকদংশন কাটিয়ে উঠতে পারে নি এবং ঠিক সেই কারণেই যাকে জার্মান সব কিছুকেই তাচ্ছিল্য করতে হয়, জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে মধ্যস্থের ভূমিকাও যাকে মানায় না, সেই অ্যালসেসীয় বুর্জোয়া সত্যিই এক ঘৃণ্য জীব, তা সে মুলহাউজেনের শিল্পপতি, অথবা প্যারিসের সাংবাদিক যাই হোক না-কেন। কিন্তু জার্মানির গত তিনশো বছরের ইতিহাসই কি তাকে সে যা তাই করে তোলে নি? আর অতি সম্প্রতিকাল পর্যন্তও কি বিদেশে প্রায় সমস্ত জার্মান, বিশেষ করে বণিকরা, খাঁটি অ্যালসেসীয়রা তাদের জার্মান বংশপরিচয় অস্বীকার করে নি, তাদের নতুন বাসভূমিতে পরের জাতিসত্তা গ্রহণ করার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস করে নি এবং এইভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের অ্যালসেসীয়দের চাইতে কি কোনো অংশে কম হাস্যাস্পদ করেছে? অ্যালসেসীয়রা অন্তত পরিস্থিতির দরুন তা করতে অল্পবিস্তর বাধ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংলন্ডে, ১৮১৫ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে দেশত্যাগ করে আসা সমস্ত জার্মান ব্যবসায়ীই ইংরেজদের রীতিনীতি আত্মস্থ করে তাদের অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল, নিজেদের মধ্যে প্রায় একান্তভাবেই ইংরেজিতে কথাবার্তা বলত, এবং এমন কি আজও, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ম্যাঞ্চেস্টার স্টক এক্সচেঞ্জে কিছু বৃদ্ধ জার্মান অর্বাচীন ঘোরাফেরা করে যারা খাঁটি ইংরেজ হিসেবে পরিগণিত হলে তাদের অর্ধেক সম্পদ দিয়ে দিতে রাজী। কিন্তু ১৮৪৮ সালের পরে একটা পরিবর্তন শুরু হয়, এবং ১৮৭০ সাল থেকে, যখন এমন কি সংরক্ষিত বাহিনীর লেফটেনান্টরাও ইংলন্ডে আসে এবং বার্লিন সেখানে তার ছোট বাহিনীগুলিকে পাঠায়, তখন পূর্বতন বশংবদতাকে স্থানচ্যুত করছে প্রুশীয় ঔদ্ধত্য, বিদেশে সেটাও আমাদের কম হাস্যাস্পদ করে তোলে না।

হয়তো ১৮৭১ সালের পর থেকে জার্মানির সঙ্গে মিলন

অ্যালসেসীয়দের কাছে বেশি আকর্ষক হয়ে উঠেছে? বরং, তার বিপরীত। তাদের রাখা হয়েছে একনায়কতন্ত্রের অধীনে, অথচ বাড়ির পাশেই, ফ্রান্সে ছিল প্রজাতন্ত্র। বিচারবুদ্ধিহীন ও অন্যায়ভাবে চাপানো এক প্রুশীয় ল্যান্ডর‍্যাট-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে, যার তুলনায় কঠোর আইনে নিয়ন্ত্রিত, কুখ্যাত ফরাসী প্রিফেক্ট প্রথার হস্তক্ষেপ তো আশীর্বাদ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সমিতির স্বাধীনতার শেষ যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তারও দ্রুত অবসান ঘটানো হয়েছে, বিদ্রোহী নগর-পরিষদগুলি ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং জার্মান আমলাদের মেয়র নিযুক্ত করা হয়েছে। অন্য দিকে কিন্তু, 'উল্লেখযোগ্যদের' অর্থাৎ রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফরাসী-হয়ে-যাওয়া উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বুর্জোয়াদের তোষামোদ চলেছে, এবং কৃষক ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে তাদের শোষক-স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে; অথচ এই কৃষক ও শ্রমিকরা জার্মানি সম্পর্কে খুব একটা ভালো মনোভাব পোষণ না-করলেও অন্তত জার্মানভাষী ছিল, এবং তারাই ছিল একমাত্র শক্তি যাদের সঙ্গে মিলনের চেষ্টা করা সম্ভব ছিল। এর ফল হয়েছে কী? ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭তে, সারা জার্মানি যখন নিজেকে ভীতিবিহ্বল হতে দিয়েছে এবং রাইখস্টাগে বিসমার্ক কার্টেল-এর (৭৪) সংখ্যাগরিষ্ঠতা করে দিয়েছে, তখন অ্যালসেস আর লোরেন নির্বাচিত করেছে শুধু একনিষ্ঠ ফরাসীদের এবং জার্মানদের প্রতি যাদের সামান্যতম সহানুভূতি আছে বলে সন্দেহ করা যায় এমন প্রত্যেককেই বাতিল করেছে।

কিন্তু, অ্যালসেসীয়রা আজ যে-অবস্থায় এসেছে, তা নিয়ে আমাদের ক্রুদ্ধ হওয়ার কি অধিকার আছে? আদৌ না। অন্তর্ভুক্তির প্রতি তাদের বিরোধিতা ঐতিহাসিক সত্য, যার নিন্দা না করে ব্যাখ্যা করা উচিত। এবং আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করার সময় এসেছে: অ্যালসেসে এরূপ মনোভাব সুপ্রতিষ্ঠ হতে পারার আগে কত অসংখ্য, কত বিরাট অন্যায়-অপরাধই না জার্মানি করেছে? এবং, পুনঃ-জার্মানীকরণ প্রচেষ্টার সতেরো বছর পর অ্যালসেসীয়রা যদি একবাক্যে বলে: এ থেকে আমাদের নিষ্কৃতি দাও, তাহলে বাইরে থেকে আমাদের নতুন জার্মান সাম্রাজ্যের চেহারা কিরকম দেখাবে? আমাদের কি এ কথা কল্পনা করার অধিকার আছে যে দুটি সৌভাগ্যপূর্ণ অভিযান আর বিসমার্কের সতেরো বছরের একনায়কতন্ত্র তিনশো বছরের কলঙ্ককর ইতিহাসের ফলাফল দূর করার পক্ষে যথেষ্ট?

বিসমার্ক তাঁর লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিলেন। ভার্সাইতে চতুর্দশ লুইয়ের জমকালো রাষ্ট্রীয় কক্ষে তাঁর নতুন প্রুশীয়-জার্মান সাম্রাজ্য সাধারণ্যে ঘোষিত হয়েছে (৭৫)। অসহায় ফ্রান্স তাঁর পদতলে শায়িত; যাকে তিনি নিজে স্পর্শ করার দুঃসাহস করেন নি সেই অবাধ্য প্যারিসকে তিয়েরে প্ররোচিত করেছেন কমিউন অভ্যুত্থানে এবং তারপর বন্দীদশা থেকে ফিরে আসা প্রাক্তন রাজকীয় সেনাবাহিনীর সৈনিকরা তাকে দমন করেছে। সমস্ত ইউরোপীয় অর্বাচীনরা পঞ্চাশের দশকে বিসমার্কের আদিরূপ লুই নেপোলিয়নকে যেমন ভক্তি করত, তেমন ভক্তি করতে লাগল বিসমার্ককে। রাশিয়ার সাহায্যে জার্মানি হয়ে উঠল ইউরোপের প্রথম শক্তি, আর জার্মানির সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হল একনায়ক বিসমার্কের হাতে। সেই ক্ষমতা দিয়ে তিনি কী করতে পারেন, সব কিছু এখন নির্ভর করছিল তার উপরে। এতদিন তিনি যদি বুর্জোয়া শ্রেণীর একীকরণের পরিকল্পনা বুর্জোয়া পদ্ধতিতে না-হোক, বোনাপার্টীয় পদ্ধতিতেও রূপায়িত করে থাকেন, তাহলে সে কাজ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এখন তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা করা দরকার, দেখানো দরকার তাঁর মাথা থেকে কী চিন্তা বেরোতে পারে, এবং স্পষ্টতই নতুন সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরিক গঠনে তার অভিব্যক্তি থাকা দরকার।

জার্মান সমাজ বৃহৎ ভূস্বামী, কৃষক, বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত; এদের আবার তিনটি প্রধান প্রধান শ্রেণীতে গোষ্ঠীভুক্ত করা যায়।

বৃহৎ ভূসম্পত্তির মালিক হল সামান্য কয়েকজন ধনপতি (বিশেষ করে সাইলেসিয়ায়) এবং এক বৃহৎ সংখ্যক মাঝারি ভূস্বামী, বেশির ভাগই এল্‌ব্‌-এর পূর্বদিকের পুরনো প্রুশীয় প্রদেশগুলিতে। এই সব প্রুশীয় য়ুঙকাররাই সমগ্র শ্রেণীর উপরে অল্পবিস্তর আধিপত্য করে। এরা নিজেরা জোতদার-চাষী, এই জন্য যে তাদের অনেকেই তাদের জোতজমির চাষের ভার ন্যস্ত করে ম্যানেজারদের উপরে এবং এ ছাড়াও তারা প্রায়শই ব্র্যান্ডি ডিস্টিলারি ও বীট-চিনি শোধনাগারের মালিক। যেখানেই সম্ভব, তাদের ভূসম্পত্তি পরিবারে বর্তায় জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকারলাভের বিধি অনুযায়ী। কনিষ্ঠতর পুত্ররা সেনাবাহিনী অথবা উচ্চপদের অসামরিক সরকারী কাজে যোগ দেয়, যার ফলে অফিসার ও উচ্চপদস্থ অসামরিক রাজকর্মচারীদের

নিয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত কম সম্পদশালী এক ক্ষুদে অভিজাততন্ত্র এই ছোট ভূম্যধিকারী ভদ্রসমাজের সঙ্গে সংসক্ত থাকে এবং তদুপরি বুর্জোয়া বংশোদ্ভূত উচ্চপদস্থ অফিসার ও রাজকর্মচারীদের মধ্য থেকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যাপক পদোন্নতির মধ্য দিয়ে তা পরিপুষ্ট হয়। স্বভাবতই সম্ভ্রান্তজনদের এই সমস্ত চক্রের নিচের প্রান্তে এক সংখ্যাবহুল পরাশ্রিত সম্ভ্রান্তসমাজ, এই সম্ভ্রান্ত ছন্নছাড়া প্রলেতারিয়েত (লুম্পেন-প্রলেতারিয়েত) আত্মপ্রকাশ করে, তা বেঁচে থাকে ঋণ, সন্দেহজনক জুয়াখেলা, নাছোড়বান্দা ভিক্ষাবৃত্তি এবং রাজনৈতিক গুপ্তচরবৃত্তির উপরে। এই সমাজের সামগ্রিকতাই হল প্রুশীয় য়ুঙ্কারতন্ত্র এবং পুরনো প্রুশীয় রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। অবশ্য, য়ুঙ্কারতন্ত্রের ভূম্যধিকারী মূলকেন্দ্রটিরই ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। তার মানমর্যাদার উপযুক্ত রূপে বেঁচে থাকার কর্তব্য প্রতিদিন আরও বেশি ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে ওঠে; লেফটেন্যান্ট ও অ্যাসেসর পর্যায়ে কনিষ্ঠতর পুত্রসন্তানদের ব্যয়নির্বাহ, মেয়েদের বিয়ে দেওয়া — এ সবেতেই অর্থ প্রয়োজন; এবং যেহেতু এসবই এমন কর্তব্য, অন্য সমস্ত বিবেচনাকে যা পিছনে সরিয়ে দেয়, সেই জন্য এতে অবাক হবার কিছু নেই যে আয় অপ্রতুল হয়ে যায়, প্রত্যর্থী পত্র স্বাক্ষর করতে হয়, কিংবা বন্ধক দেওয়া পর্যন্ত দরকার হয়। সংক্ষেপে, সমগ্র য়ুঙ্কারতন্ত্র সবসময়েই দাঁড়িয়ে আছে এক অতল গহ্বরের কিনারায়; প্রতিটি দুর্ঘটনা — যুদ্ধই হোক, মন্দ ফসলই হোক অথবা বাণিজ্য সংকটই হোক — তাকে সেই কিনারা থেকে ঠেলে ফেলার বিপদের সম্মুখীন করে; সুতরাং এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে শতাধিক বছর ধরে সে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে একমাত্র সবধরনের রাষ্ট্রীয় সহায়তায় এবং, বস্তুতপক্ষে, এখনও টিকে আছে একমাত্র সেই সহায়তারই কল্যাণে। কৃত্রিমভাবে সংরক্ষিত এই শ্রেণীটির বিলুপ্তি অনিবার্য, কোনো রাষ্ট্রীয় সহায়তাই আর বেশি দিন এর অস্তিত্ব টেনে নিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু তার সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যাবে পুরনো প্রুশীয় রাষ্ট্রও।

কৃষক এমন এক শক্তি যে রাজনৈতিকভাবে সামান্যই সক্রিয়। যেখানে সে নিজেই একজন মালিক, ছোট কৃষকদের প্রতিকূল উৎপাদনের অবস্থার দরুন সে তত বেশি করে ধ্বংসের দিকে চলেছে; পুরনো মার্ক অথবা সম্প্রদায়গত চারণভূমি থেকে বঞ্চিত হয়ে কৃষকরা পশুপালন-প্রজননে ব্যাপৃত

হতে পারে না। প্রজা হিসেবে তার অবস্থা আরও খারাপ। ছোট কৃষকদের উৎপাদনব্যবস্থায় প্রধানত স্বাভাবিক অর্থনীতির প্রাধান্যই পূর্বানুমিত, মুদ্রা অর্থনীতি তার সর্বনাশ করে। তাই, ক্রমবর্ধমান ঋণগ্রস্ততা, বন্ধকের দরুন ব্যাপক দখলচ্যুতি, গার্হস্থ্য-শিল্পের আশ্রয় গ্রহণ, যাতে তার ভিটাজমি থেকে উচ্ছেদ হতে না-হয়। রাজনৈতিকভাবে কৃষকসমাজ প্রধানত উদাসীন অথবা প্রতিক্রিয়াশীল: রাইন অঞ্চলে প্রুশীয়দের প্রতি পুরনো ঘৃণার দরুন তারা পোপের অপ্রতিহত ক্ষমতায় বিশ্বাসী; অন্যান্য অঞ্চলে তারা বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি একান্ত অনুগত অথবা প্রটেস্ট্যান্ট-রক্ষণশীল। এখনও ধর্মীয় মনোভাব এই শ্রেণীর সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বার্থের অভিব্যক্তি হিসেবে কাজ করে।

বুর্জোয়া শ্রেণীর কথা আমরা আগেই বলেছি। ১৮৪৮ সাল থেকে তারা অভূতপূর্ব হারে অর্থনৈতিক অগ্রগতি করেছে। ১৮৪৭-এর বাণিজ্য সংকটের পর শিল্পের বিপুল সম্প্রসারণে জার্মানি ক্রমেই বেশি করে অংশগ্রহণ করেছে, এই সম্প্রসারণ ঘটেছিল সেই সময়ে সমুদ্রপথে বাষ্পীয় জাহাজ-চলাচল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দরুন, রেলপথের বিরাট বিস্তৃতি এবং কালিফোর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় সোনা আবিষ্কারের দরুন। ছোট ছোট রাষ্ট্রের প্রথা থাকার ফলে বাণিজ্যের পক্ষে যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য এবং পৃথিবীর বাজারে বিদেশী প্রতিযোগীদের সমান অবস্থান পাওয়ার জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীর ঐকান্তিক প্রয়াসই বিসমার্কের বিপ্লবে প্রেরণা যুগিয়েছিল। এখন যখন লক্ষ লক্ষ ফরাসী মুদ্রা জার্মানিকে ছেয়ে ফেলছিল, বুর্জোয়া শ্রেণীর সামনে উন্মুক্ত হল প্রচণ্ড উদ্যোগের এক কালপর্ব, এই কালপর্বে জার্মানি -- জাতীয় জার্মান স্তরে এক বিরাট সংকটের মধ্য দিয়ে (৭৬) — সর্বপ্রথম প্রমাণ করল যে সে এক বৃহৎ শিল্পোন্নত জাতিতে পরিণত হয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণী তখনও ছিল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে জনসমষ্টির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী শ্রেণী, তার অর্থনৈতিক স্বার্থ রাষ্ট্রকে মেনে চলতে হত; ১৮৪৮ সালের বিপ্লব রাষ্ট্রকে দিয়েছিল বাহ্যিকভাবে সাংবিধানিক রূপ, যার কাঠামোর মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণী রাজনৈতিকভাবেও শাসন করতে পারত এবং তার আধিপত্য বাড়াতে পারত। অথচ প্রকৃত রাজনৈতিক আধিপত্য থেকে তখনও তারা ছিল বহুদূর। বিরোধে তারা বিসমার্কের

বিরুদ্ধে জয়ী হয় নি; উপর থেকে জার্মানির বৈপ্লবিকীকরণের মধ্য দিয়ে বিরোধের মীমাংসা তাদের এই শিক্ষাও দিয়েছিল যে, আপাতত, কার্যনির্বাহী ক্ষমতা তার উপরে নির্ভর করে বড়জোর অতি পরোক্ষ রূপে, তারা মন্ত্রীদের নিযুক্তও করতে পারবে না, বরখাস্তও না, কিংবা সেনাবাহিনীকেও বাদ দিতে পারবে না। তদুপরি, প্রবলভাবে সক্রিয় এক কার্যনির্বাহী ক্ষমতার সামনে তারা ছিল ভীরু ও দুর্বল; কিন্তু য়ুঙ্কাররাও তাই ছিল, যদিও বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্ষেত্রে তা অধিকতর মার্জনাযোগ্য, কারণ তারা ছিল বিপ্লবী শিল্প-শ্রমিক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক বিরোধিতায়। এবিষয়ে অবশ্য কোনো সন্দেহ ছিল না যে তাদের ক্রমে ক্রমে অর্থনৈতিকভাবে য়ুঙ্কারদের ধ্বংস করতেই হবে, এবং তারাই একমাত্র সম্পত্তিবান শ্রেণী যারা তখনও কিছুটা ভবিষ্যতের দাবি করতে পারত।

পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীতে ছিল প্রথমত, মধ্যযুগীয় কারিগরদের অবশিষ্টাংশ, পশ্চিম ইউরোপের বাকি অংশের তুলনায় পশ্চাৎপদ জার্মানিতে যাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল অনেক বেশি মাত্রায়; দ্বিতীয়ত, সহায়সম্বলহীন বুর্জোয়া; এবং তৃতীয়ত, অ-সম্পত্তিবান জনসমষ্টির মধ্যে যারা ছোট বণিক-ব্যবসায়ীর স্তরে উঠেছে। বৃহদায়তন শিল্পের সম্প্রসারণের সঙ্গে সমগ্র পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব স্থিতিশীলতার শেষ চিহ্নটুকুও হারাল; বৃত্তি পরিবর্তন এবং পর্যায়ক্রমিক দেউলিয়াপনা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল। আগে যে শ্রেণী এত স্থিতিশীল ছিল, যে শ্রেণী ছিল জার্মান কূপমণ্ডূক পণ্ডিতম্মন্যদের প্রাণকেন্দ্র, সেই শ্রেণী তার পরিতৃপ্তি, বশংবদতা, ধর্মনিষ্ঠা ও ভদ্রতা থেকে পতিত হল প্রচণ্ড অবক্ষয় আর তার ঈশ্বর-নির্দিষ্ট ভাগ্যলিপি সম্বন্ধে অসন্তোষের মধ্যে। হস্তশিল্প-কারিগরদের অবশিষ্টাংশ উচ্চকণ্ঠে গিল্ডের বিশেষ সুবিধা পুনঃপ্রবর্তন দাবি করল, কেউ বা মৃদু গণতান্ত্রিক প্রগতিবাদী (৭৭) হয়ে গেল, এমন কি কেউ কেউ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের শরণাপন্ন হল এবং এখানে-ওখানে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে যোগ দিল।

সবশেষে, শ্রমিক। কৃষি শ্রমিকরা, অন্তত পূর্বাঞ্চলের, তখনও বাস করছিল আধা-ভূমিদাস অবস্থায়, সুতরাং তাদের গণ্য করা যেত না। অন্য দিকে, শহুরে শ্রমিকদের মধ্যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির বিরাট অগ্রগতি হয়েছিল এবং বৃহদায়তন শিল্প জনসাধারণকে যেমন প্রলেতারীয় করে তুলছিল এবং

প‌ুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-বিরোধ তীব্র করছিল, সোশ্যাল ডেমোক্রাসির ব‌ৃদ্ধি হচ্ছিল তারই সমান মাত্রায়। যদিও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিকরা তখনকার মতো পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামরত দ‌ুটি পার্টিতে (৭৮) বিভক্ত ছিল, তব‌ুও, মার্কসের 'প‌ুঁজি' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে, তাদের মধ্যেকার মৌলিক মতপার্থক্য প্রায় দ‌ূরই হয়ে গিয়েছিল বলা চলে। গোঁড়া লাসালবাদ সেই সঙ্গে 'রাষ্ট্র কর্তৃক সাহায্য-প্রদত্ত উৎপাদক সমিতির' জন্য তার দাবি ক্রমে ক্রমে ম্রিয়মাণ হয়ে আসছিল এবং দেখা গেল তা একটি বোনাপার্টপন্থী রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টির প্রাণকেন্দ্র গঠনে নিতান্তই অপারগ। এ ব্যাপারে এক-একজন নেতা যে ক্ষতি করেছিলেন, জনসাধারণের কান্ডজ্ঞানই তা সংশোধন করে দিয়েছে। দ‌ুটি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রবণতার যে-মিলন প্রায় একান্তভাবেই ব্যক্তিগত ধরনের প্রশ্নের দর‌ুন বিলম্বিত হয়েছিল, নিকট ভবিষ্যতে সেই মিলন অবশ্যই ঘটতে চলেছিল। কিন্তু এমন কি এই ভাগাভাগির সময়ে এবং তা সত্ত্বেও, শিল্প-ব‌ুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ত্রাস স‌ৃষ্টি এবং সরকারের বির‌ুদ্ধে — সরকার তখনও ব‌ুর্জোয়াদের থেকে স্বতন্ত্র — সংগ্রামে তাদের পঙ্গ‌ু করে দেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল এই আন্দোলন; এবং ১৮৪৮ সালের পর জার্মান ব‌ুর্জোয়া শ্রেণী আর কখনোই লাল জ‌ুজ‌ুর ভয় থেকে ম‌ুক্ত হতে পারে নি।

পার্লামেণ্টে ও ল্যান্ডটাগগ‌ুলিতে পার্টিগত কাঠামোর ম‌ূলে নিহিত ছিল শ্রেণীগত কাঠামো। ব‌ৃহৎ ভূসম্পত্তি ও কৃষকসমাজের একাংশকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল রক্ষণশীলদের গোষ্ঠী; শিল্পভিত্তিক ব‌ুর্জোয়া শ্রেণী দিয়েছিল ব‌ুর্জোয়া উদারপন্থীদের দক্ষিণপন্থী অংশ — জাতীয় উদারপন্থীদের, আর বামপন্থী অংশটি ছিল দ‌ুর্বল গণতান্ত্রিক বা তথাকথিত প্রগতিশীল পার্টি, যার মধ্যে ছিল ব‌ুর্জোয়াদের ও শ্রমিকদের একাংশের সমর্থিত পেটি ব‌ুর্জোয়ারা। শেষ পর্যন্ত, শ্রমিকরা নিজেদের স্বতন্ত্র পার্টি পেল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে, এর মধ্যে কিছ‌ু পেটি ব‌ুর্জোয়াও ছিল।

বিসমার্কের মতো অবস্থায় এবং বিসমার্কের মতো অতীতের অধিকারী, বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছ‌ুটা বোধসম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তিই এই বিষয়টি উপলব্ধি না করে পারতেন না যে তখনকার য‌ুংকাররা টিকে থাকার

ক্ষমতাবিশিষ্ট শ্রেণী নয়, সমস্ত সম্পত্তিবান শ্রেণীর মধ্যে একমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীই ভবিষ্যৎ দাবি করতে পারে (শ্রমিক শ্রেণীর কথা বাদ দিলাম, কারণ তার ঐতিহাসিক ব্রত সম্পর্কে বোধ তাঁর কাছ থেকে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না), সুতরাং, তাঁর নতুন সাম্রাজ্যের একটি আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রে ক্রমান্বিত উত্তরণের প্রস্তুতিতে তিনি যত বেশি সফল হতেন, তাঁর নতুন সাম্রাজ্য তত স্থিতিশীল হতে পারত। সেই পরিস্থিতিতে যা অসম্ভব ছিল তা যেন আমরা তাঁর কাছে প্রত্যাশা না-করি। অবিলম্বে এক পার্লামেণ্টারি সরকারে উত্তরণ, যেখানে নিয়ামক ক্ষমতা রাইখস্টাগে ন্যস্ত (ব্রিটিশ কমন্স সভার মতো), তা সেই মুহূর্তে সম্ভাব্যও ছিল না, যুক্তিযুক্তও ছিল না; পার্লামেণ্টারি ধরনে বিসমার্কের একনায়কতন্ত্র নিশ্চয়ই তাঁর কাছে আপাতত তখনও প্রয়োজন বলে মনে হয়েছিল; তখনকার মতো তা থাকতে দিয়েছেন বলে আমরা তাঁকে বিন্দুমাত্র দোষ দিই না; আমরা শুধু জিজ্ঞাসা করি, কোন উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করার কথা ছিল। এবিষয়ে বড় একটা সন্দেহ থাকতে পারে না যে ব্রিটিশ সংবিধানের অনুরূপ এক ব্যবস্থার জন্য পথ প্রস্তুত করাই ছিল একমাত্র উপায় যা নতুন সাম্রাজ্যের এবং নির্ঝঞ্ঝাট আভ্যন্তরিক বিকাশের দৃঢ় ভিত্তি যোগাতে পারত। য়ুঙ্কারদের পরিত্রাণের কোনোই উপায় ছিল না, তাদের বৃহত্তর অংশটিকে অনিবার্য বিনাশের হাতে ছেড়ে দিয়ে, যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তার সঙ্গে নতুন উপাদান যোগ করে স্বতন্ত্র বৃহৎ ভূস্বামীদের একটি শ্রেণীতে পরিণত করা তখনও হয়তো সম্ভব ছিল; এরা হত বুর্জোয়া শ্রেণীর অলঙ্কারস্বরূপ উপর-মহল; এই শ্রেণীকে, বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতার তুঙ্গে থাকলেও সরকারী রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিত্ব দিতে হত এবং তার সঙ্গে দিতে হত সবচেয়ে মোটা মাইনের পদগুলি এবং প্রভূত প্রভাব। বুর্জোয়া শ্রেণীকে কিছু রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ছেড়ে দিয়ে — কোনোমতেই বেশি দিন তা ঠেকিয়ে রাখা যেত না (অন্তত, সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিটা এরকমই হওয়া উচিত), তাদের এই সুবিধাগুলি ক্রমে ক্রমে, এমন কি ছোট ছোট ও দুর্লভ মাত্রায় দিয়ে নতুন সাম্রাজ্য এমন পথে চালিত হত যার ফলে সে অন্যান্য, রাজনৈতিকভাবে অনেক অগ্রসর পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে ধরে ফেলতে সক্ষম হত, আমলাতন্ত্রের উপরে তখনও যার কব্জা ছিল সেই কূপমণ্ডূক ঐতিহ্য এবং সামন্ততন্ত্রের

সর্বশেষ জের ঝেড়ে ফেলতে পারত, এবং সর্বোপরি, বর্তমানে যৌবনকালোত্তীর্ণ তার নেতারা এই জীবন ত্যাগ করে চলে যাওয়ার মধ্যেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হত।

এ কাজ দুরূহও ছিল না। য়ুঙ্কার বা বুর্জোয়া শ্রেণী কারোই এমন কি সাধারণ, গড়পড়তা কর্মশক্তি ছিল না। য়ুঙ্কাররা তা প্রমাণ করেছে গত ষাট বছরে, এই সময়ে এই ডন্ কুইক্সোটদের (৭৯) বিরোধিতা সত্ত্বেও রাষ্ট্র তাদের জন্য যা সবচেয়ে ভালো ক্রমাগত তা করেছে। দীর্ঘ প্রাক-ইতিহাস যাকে কিছুটা নমনীয় করেছে সেই বুর্জোয়া শ্রেণী তখনও বিরোধজনিত ক্ষতগুলি লেহন করছিল; তখন থেকে বিসমার্কের সাফল্য তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা আরও ভেঙে দিয়েছিল, আর বাকিটা করেছিল ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে-ওঠা শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ভীতি। এমতাবস্থায়, যে ব্যক্তি বুর্জোয়া শ্রেণীর জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে পরিণত করেছিলেন তাঁর পক্ষে তাদের রাজনৈতিক দাবিগুলি রূপায়ণের কাজে তাঁর ইচ্ছামতো গতি বজায় রাখা কঠিন হত না, দাবিগুলি মোটের উপরে ছিল সামান্য। তাঁর পক্ষে দরকার ছিল শুধু লক্ষ্য সম্পর্কে স্বচ্ছদৃষ্টি থাকা।

সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে, এই ছিল একমাত্র যুক্তিযুক্ত পথ। শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে একথা সুস্পষ্ট ছিল যে স্থায়ী বুর্জোয়া

শাসন কায়েম করার পক্ষে ইতিমধ্যেই অনেক দেরি হয়ে
বৃহদায়তন শিল্প এবং তার সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণী ও
হয়েছিল এমন একটা সময়ে যখন প্রলেতারিয়েত প্রায় ব
সঙ্গেই স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে রাজনৈতিক দৃশ্যপটে প্র
অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণী একান্ত অথবা প্রাধান্যপূর্ণ
অধিকার করার আগেই যখন দুটি শ্রেণীর সংগ্রাম শ
বুর্জোয়া শ্রেণীর নিরুপদ্রব ও দৃঢ় শাসনের সময় যদি
হয়ে গিয়েও থাকে, তাহলেও সাধারণভাবে সম্পত্তিবান
১৮৭০ সালে শ্রেষ্ঠ নীতি ছিল এই বুর্জোয়া শাস
অবক্ষয়ী সামন্ততন্ত্রের আমলের যে-অজস্র জের আইনে
বহালতবিয়তে টিকে ছিল, একমাত্র এভাবেই সেগুলি
ছিল; একমাত্র এভাবেই সম্ভব ছিল ফরাসী মহাবিপ্লবে

গেছে। জার্মানিতে
প্রলেতারিয়েত তৈরি
র্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে
বেশ করতে পারত,
রাজনৈতিক ক্ষমতা
রু হয়েছিল। কিন্তু
জার্মানিতে উত্তীর্ণ
শ্রেণীগুলির স্বার্থে,
নর দিকেই যাওয়া।
ও প্রশাসনে তখনও
উচ্ছেদ করা সম্ভব
বর সমস্ত সুকৃতিকে

ক্রমে ক্রমে জার্মানিতে প্রতিরোপণ করা, সংক্ষেপে, তার অতিরিক্ত লম্বা পুরনো কায়দার বেণী কেটে ফেলে আধুনিক বিকাশের পথে সুপরিকল্পিতভাবে ও অপরিবর্তনীয়ভাবে স্থাপন করা, তার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তার শিল্পবিকাশের অনুষঙ্গী করে তোলা। শেষ পর্যন্ত যখন বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে অনিবার্য লড়াই বাধবে, তখন তা অন্তত স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অগ্রসর হবে, তাতে সবাই উপলব্ধি করবে বিষয়টা কী, ১৮৪৮ সালে জার্মানিতে আমরা যেমন দেখেছিলাম সেই রকম বিশৃঙ্খলা, অস্পষ্টতা, পরস্পরবিরোধী স্বার্থ আর কিংকর্তব্যবিহ্বলতার অবস্থায় তা এগোবে না। একমাত্র পার্থক্য থাকবে এই যে এবারে কিংকর্তব্যবিহ্বলতা থাকবে একান্তভাবেই সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির তরফে; শ্রমিক শ্রেণী জানে সে কী চায়।

১৮৭১ সালে জার্মানিতে যে অবস্থা ছিল, বিসমার্কের মতো ব্যক্তি বস্তুতই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সুকৌশলে চলার নীতির উপরে নির্ভরশীল ছিলেন। এবং এ পর্যন্ত তিনি নিন্দনীয় নন। শুধু প্রশ্ন হল, সেই নীতি কোন লক্ষ্য অনুসরণ করেছিল। তার গতি যাই হোক না-কেন যদি তার সচেতন ও দৃঢ়পণ অভীষ্ট শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন হয়ে থাকে, তাহলে তা ছিল ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ততদূর পর্যন্তই যতদূর সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলির অবস্থান থেকে সাধারণভাবে সম্ভব ছিল। তার লক্ষ্য যদি শুধু পুরনো প্রুশীয় রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখা, ক্রমে ক্রমে জার্মানিকে প্রুশীয় করে ফেলা হয়ে থাকে, তাহলে তা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল এবং ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। কিন্তু তার লক্ষ্য যদি শুধু বিসমার্কের শাসন বজায় রাখা হয়ে থাকে, তাহলে তা ছিল বোনাপার্টপন্থী এবং সব বোনাপার্টপন্থার যা পরিণতি, তারও সেই পরিণতি অবধারিত ছিল।

* * *

আশু কাজ ছিল সাম্রাজ্যিক সংবিধান। লভ্য উপকরণের মধ্যে ছিল, এক দিকে, উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের সংবিধান এবং অন্য দিকে দক্ষিণ জার্মান রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে চুক্তিসমূহ (৮০)। সাম্রাজ্যিক সংবিধান প্রণয়নে বিসমার্ককে সাহায্য করার মতো বিষয়গুলি ছিল, এক দিকে, ফেডারেল

পরিষদে (বুন্ডেসরাট) প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত রাজবংশগুলি, এবং অন্য দিকে, রাইখস্টাগে প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত জনগণ। উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের সংবিধান ও চুক্তিগুলি রাজবংশগুলির দাবিকে সীমিত করেছিল। অন্য দিকে, নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশ অনেকখানি বৃদ্ধি জনগণের প্রাপ্য ছিল। তারা রণক্ষেত্রে বিদেশী হস্তক্ষেপ থেকে স্বাধীনতা এবং একীকরণ — যতদূর একীকরণের কথা বলতে পারে — অর্জন করেছিল; সর্বোপরি তাদেরই উপরে পড়েছিল এই স্বাধীনতাকে কোন কাজে লাগানো হবে, এই একীকরণ বিশদভাবে কী করে রূপায়িত করা হবে এবং কীভাবে তা ব্যবহার করা হবে তা স্থির করার ভার। এবং উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের সংবিধান ও চুক্তিগুলির অন্তর্নিহিত আইনগত যুক্তিগুলি জনগণ স্বীকার করলেও, পুরনো সংবিধানের তুলনায় নতুন সংবিধানে তাদের অধিকতর ক্ষমতার ভাগ পাওয়া থেকে তা তাদের কোনোমতেই প্রতিনিবৃত্ত করে নি। রাইখস্টাগই ছিল একমাত্র সংস্থা যা বাস্তবিকই এই নতুন 'ঐক্যের' প্রতিভূ ছিল। রাইখস্টাগের বক্তব্যের ক্ষমতা যত বেশি হত এবং এক-একটি প্রদেশের সংবিধানের তুলনায় সাম্রাজ্যিক সংবিধান যত মুক্ত হত, নতুন রাইখকে তত বেশি সংহত হতে হত, ব্যাভেরীয়, স্যাক্সন ও প্রুশীয় তত বেশি করে জার্মান-এ মিশে যেত।

নিজের নাসাগ্র ছাড়িয়েও যিনি দেখতে পান এমন যেকোনো ব্যক্তির কাছেই একথা স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিসমার্ক ভিন্নমত পোষণ করতেন। তিনি বরং যুদ্ধের পরের দেশপ্রেমিক উন্মাদনাকে ব্যবহার করলেন যাতে রাইখস্টাগে সংখ্যাগরিষ্ঠরা জনগণের অধিকার প্রসারের কথাই শুধু বর্জন নয়, সেই অধিকারের সুস্পষ্ট সংজ্ঞাও পরিত্যাগ করতে রাজী হন এবং উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের সংবিধান ও চুক্তিগুলির অন্তর্নিহিত আইনগত ভিত্তি সাম্রাজ্যিক সংবিধানে শুধু পুনরুদ্ধৃত করার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে রাজী হন। তাতে জনগণের অধিকার ব্যক্ত করার জন্য ছোট পার্টিগুলির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল, এমন কি প্রুশীয় সংবিধানের যেসব ধারায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সমিতির অধিকার এবং গীর্জার স্বাধীনতার নিশ্চিতি দেওয়া আছে, সংবিধানে সেই ধারাগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ক্যাথলিক কেন্দ্রের প্রস্তাবও ব্যর্থ হল। সাম্রাজ্যিক

সংবিধানের চাইতে প্রুশীয় সংবিধান, দু-তিন বার কাটছাঁট করা হলেও, অনেক বেশি উদার ছিল। করের বিষয়টি ভোটে পাস করা হল বাৎসরিকভাবে নয়, 'আইনত' চিরতরে, যার ফলে রাইখস্টাগের পক্ষে কর বাতিল করা অসম্ভব হয়ে গেল। এইভাবে জার্মানিতে প্রযুক্ত হল প্রুশীয় তত্ত্ব, অ-জার্মান সাংবিধানিক পৃথিবীতে যা অকল্পনীয়, যে-তত্ত্ব অনুযায়ী জনগণের প্রতিনিধিদের ব্যয় নামঞ্জুর করার অধিকার ছিল কাগজে, অন্য দিকে, সরকার রাজস্ব আত্মসাৎ করল নগদ মুদ্রায়। এইভাবে রাইখস্টাগকে ক্ষমতার সবচেয়ে কার্যকর উপায় থেকে বঞ্চিত করা হল এবং ১৮৪৯ ও ১৮৫০ সালের সংবিধান সংশোধনে, মানটুফেলবাদ, বিরোধ এবং সাদোভার হাতে চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার পর প্রুশীয় প্রতিনিধি সভার যে দীন দশা হয়েছিল, রাইখস্টাগকে সেই জায়গায় এনে ফেলা হল, অথচ পুরনো ফেডারেল ডায়েট (বুন্ডেস্টাগ) নামেমাত্র যে-ক্ষমতা ভোগ করত, ফেডারেল পরিষদ পুরোপুরি সে-ক্ষমতা ভোগ করে প্রকৃতপক্ষেই, কারণ ফেডারেল ডায়েটকে যা পঙ্গু করে রেখেছিল সেই নিগড় থেকে সে মুক্ত। ফেডারেল পরিষদের, রাইখস্টাগের পাশাপাশি, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শুধু যে নিয়ামক ক্ষমতা আছে তাই নয়, সে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক সংস্থাও বটে, যেহেতু সে সাম্রাজ্যিক আইনকানুন রূপায়ণ সম্পর্কে নির্দেশ দেয় এবং অধিকন্তু, 'সাম্রাজ্যিক আইন রূপায়ণের সময়ে যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দেয়' অর্থাৎ যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি অন্যান্য সভ্য দেশে শুধু নতুন আইন করেই দূর করা যায় সেই সব ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (ধারা ৭, অনুচ্ছেদ ৩, চতুর ছলনার সঙ্গে এর অনেকখানি মিল আছে)।

এইভাবে, বিসমার্ক তাঁর প্রধান সমর্থন পেতে চেয়েছেন জাতীয় মিলনের প্রতিভূ রাইখস্টাগের মধ্যে নয়, বরং বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়পন্থী বিচ্ছেদের প্রতিভূ সেই ফেডারেল পরিষদের মধ্যে। যিনি জাতীয় ধ্যানধারণার রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি জাতির অথবা তার প্রতিনিধিদের পুরোভাগে নিজেকে স্থাপন করার সাহসের অভাব দেখালেন; গণতন্ত্র তাঁর সেবা করত, তাঁকে গণতন্ত্রের সেবা করতে হত না; জনগণের উপরে নির্ভর না-করে তিনি নির্ভর করলেন পর্দার আড়ালে অশুভ গোপন বন্দোবস্তের উপরে, কূটনীতির সাহায্যে, লোভ এবং ভয় দেখিয়ে ফেডারেল পরিষদে, এমন কি

অবাধ্য হলেও, একটা সংখ্যাগরিষ্ঠতা জোগাড় করার ক্ষমতার উপরে। এতে তাঁর ধ্যানধারণার যে অকিঞ্চিৎকরতা, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির যে নীচতা প্রকাশ পায় তা সেই ব্যক্তিটির চরিত্রানুগ — এ পর্যন্ত তাঁকে আমরা যতদূর চিনেছি। তবুও, বিস্ময়ের বিষয়, তাঁর বিরাট বিরাট সাফল্য তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে অতিক্রম করাতে পারে নি।

যাই হোক, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে দরকার ছিল সমগ্র সাম্রাজ্যিক সংবিধানের জন্য একটিমাত্র মূলকেন্দ্র, অর্থাৎ সাম্রাজ্যিক চ্যান্সেলর। ফেডারেল পরিষদকে এমন একটা অবস্থায় আনা দরকার ছিল যেখানে সাম্রাজ্যিক চ্যান্সেলরের ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্বশীল কার্যনির্বাহক ক্ষমতা থাকতে না পারে এবং যা দায়িত্বশীল সাম্রাজ্যিক মন্ত্রীদের নিয়োগ অসম্ভব করে তুলবে। বস্তুতপক্ষে, একটি দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা তৈরি করে সাম্রাজ্যিক প্রশাসনকে স্বাভাবিক করার প্রতিটি প্রচেষ্টাকে ফেডারেল পরিষদের অধিকারের উপরে হস্তক্ষেপ বলে গণ্য করা হল এবং তা দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিরোধের সম্মুখীন হল। অচিরেই অবশ্য আবিষ্কৃত হল যে সংবিধানটি 'বিসমার্কের মাপে কাটা'। তা ছিল রাইখস্টাগে বিভিন্ন পার্টির এবং ফেডারেল পরিষদে বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়পন্থী রাষ্ট্রগুলির ভারসাম্য রক্ষা করে তাঁর অবিভক্ত ব্যক্তিগত শাসনের পথে আরেকটি পদক্ষেপ — বোনাপার্টবাদের পথে আরেকটি পদক্ষেপ।

প্রসঙ্গত, একথা বলা চলে না যে নতুন সাম্রাজ্যিক সংবিধান — ব্যাভেরিয়া ও ভ্যুর্টেমবের্গকে আলাদা-আলাদা কিছু সুবিধা ছেড়ে দেওয়া ছাড়া — প্রত্যক্ষভাবে পিছন দিকে পদক্ষেপ ছিল। কিন্তু সবচেয়ে ভালো এই কথাটুকুই তার সম্বন্ধে বলা যায়। বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক চাহিদা মোটামুটি পূরণ হয়েছিল, তাদের রাজনৈতিক দাবি — যতদূর তারা তখনও করেছিল — বিরোধের সময়কার মতোই সমান বাধার সম্মুখীন হয়েছিল।

যতদূর তারা তখনও রাজনৈতিক দাবি করেছিল! কারণ, একথা অস্বীকার করা যায় না যে জাতীয় উদারপন্থীদের সঙ্গে সঙ্গে এই সব দাবিও সংকুচিত হয়ে খুবই সামান্য আকৃতি নিয়েছে এবং প্রতিদিন তা আরও সংকুচিত হয়ে চলেছে। বিসমার্কের উচিত তাঁর নিজের সঙ্গে সহযোগিতা সহজতর করা — এই দাবি না-করে এই ভদ্রলোকেরা অনেক বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন

যেখানেই সম্ভব, এবং প্রায়শই যেখানে অসম্ভব, কিংবা অসম্ভব হওয়া উচিত ছিল সেখানেও, তাঁর ইচ্ছা পূরণের কাজে। বিসমার্ক তাদের ঘৃণা করতেন এবং সে জন্য কেউই তাঁকে দোষ দিতে পারে না — কিন্তু তাঁর য়ুংকাররা কি এর চাইতে বিন্দুমাত্র ভালো কিংবা আরও সাহসী ছিল?

এর পরের যে ক্ষেত্রটিতে সারা সাম্রাজ্য-জুড়ে ঐক্য প্রবর্তিত করা দরকার ছিল সেটি হল মুদ্রা-ব্যবস্থা — তা স্বাভাবিক করা হল ১৮৭৩ ও ১৮৭৫ সালের মধ্যে পাস-করা মুদ্রা ও ব্যাংক-সংক্রান্ত আইনের সাহায্যে। স্বর্ণমুদ্রার প্রবর্তন ছিল যথেষ্ট বড় অগ্রগতি; কিন্তু তা প্রবর্তন করা হয়েছিল দ্বিধা-দোদুল্যমানতার সঙ্গে এবং আজও পর্যন্ত তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয় নি। গৃহীত মুদ্রা-ব্যবস্থা — 'মার্ক' নামে এক টেলারের এক-তৃতীয়াংশ, দশমিক বিভাগবিশিষ্ট একটি একক — ত্রিশের দশকের শেষে তার প্রস্তাব করেছিলেন ফন স্যোটবের; প্রকৃত একক ছিল সোনার কুড়ি-মার্কের মুদ্রা। প্রায় চোখে না-পড়ার মতো মূল্য পরিবর্তন করলে তাকে ব্রিটিশ সভরিন, সোনার পঁচিশ ফ্রাঁ মুদ্রা অথবা সোনার মার্কিন পাঁচ-ডলার মুদ্রার একেবারে সমান করা যেত, এবং পৃথিবীর বাজারে তিনটি বৃহৎ মুদ্রা-ব্যবস্থার একটির সঙ্গে তাকে যুক্ত করা যেত। পছন্দ করা হল এক পৃথক অর্থ-ব্যবস্থা, তার দ্বারা বাণিজ্য ও বিনিময়ের হিসাবনিকাশ অনাবশ্যকভাবে জটিল করা হল। সাম্রাজ্যিক ট্রেজারি নোট ও ব্যাংক বিষয়ক আইনগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্র ও তাদের ব্যাংকের নিদর্শনপত্র নিয়ে প্রতারণাপূর্ণ লেনদেন সীমিত করেছিল, এবং ইতিমধ্যে সংঘটিত বিরাট সংকটের কথা বিবেচনা করে বলা যায় যে সেই লেনদেনে সুনিশ্চিত ভীরুতার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল — সেটা এক্ষেত্রে তখনও অনভিজ্ঞ জার্মানির পক্ষে প্রশংসনীয়। কিন্তু এখানেও, বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ মোটের উপরে যথোপযুক্তভাবেই রক্ষা করা হয়েছিল।

সবশেষে, সমরূপ আইন সম্পর্কে মতৈক্য দরকার ছিল। বৈষয়িক নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যিক ক্ষমতার বিস্তৃতির বিরুদ্ধে মধ্য জার্মান রাষ্ট্রগুলির প্রতিরোধ জয় করা হল, কিন্তু দেওয়ানি বিধি এখনও তৈরি হচ্ছে, আর দণ্ডবিধি, ফৌজদারি ও দেওয়ানি কার্যপ্রণালী-সংক্রান্ত আইন, বাণিজ্য-সংক্রান্ত আইন, দেউলিয়াপনা-সংক্রান্ত নিয়ম ও বিচার-ব্যবস্থা সর্বত্র

এক করা হয়েছে। ছোট ছোট রাষ্ট্রে বলবৎ বহুবিধ আনুষ্ঠানিক ও বৈষয়িক আইনগত মানের বিলুপ্তিই প্রগতিশীল বুর্জোয়া বিকাশের এক জরুরী চাহিদা ছিল, এবং এই বিলুপ্তিই নতুন আইনের প্রধান গুণ — তাদের অন্তর্বস্তুর চাইতে অনেক বড় গুণ।

ইংরেজ আইনবিদ নির্ভর করে আইনের ইতিহাসের উপরে, যা মধ্য যুগের পরেও পুরনো জার্মান অধিকারগুলির একটা বড় অংশকে বজায় রেখেছে, ১৭শ শতাব্দীর দুটি বিপ্লবে অংকুরেই বিনষ্ট পুলিস রাষ্ট্রের কথা, দু শতাব্দী ধরে নাগরিক অধিকারের অব্যাহত বিকাশের পর যে তার উচ্চতম বিন্দু অর্জন করেছে সেই পুলিস রাষ্ট্রের কথা এই ইতিহাসের অজানা। ফরাসী আইনবিদ নির্ভর করে মহাবিপ্লবের উপরে, যে-বিপ্লব সামন্ততন্ত্র ও সার্বভৌমপন্থী পুলিসি স্বৈরাচার পুরোপুরি ধ্বংস করার পর নবসৃষ্ট আধুনিক সমাজে জীবনের অর্থনৈতিক অবস্থাকে রূপায়িত করেছিল নেপোলিয়ন-ঘোষিত ধ্রুপদী আইনবিধির আইনগত মানের ভাষায়। সে তুলনায় আমাদের জার্মান আইনবিদরা কোন আইনগত ভিত্তির উপরে নির্ভর করে? মধ্যযুগীয় অবশেষগুলির ভাঙনের কয়েক শতাব্দীব্যাপী প্রক্রিয়া, এক নিষ্ক্রিয় ও প্রধানত বাইরের আঘাতে চালিত প্রক্রিয়া, এখনও যা সম্পূর্ণ হয় নি; অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এক সমাজ, যেখানে এখনও সামন্ততান্ত্রিক য়ুঙ্কার আর গিল্ড প্রভুরা নতুন এক দেহে ভর করার সন্ধানে ভূতের মতো হানা দিচ্ছে; এক আইনগত ব্যবস্থা, যার মধ্যে পুলিসি স্বেচ্ছাচার — ডিউকদের পক্ষপাতদুষ্ট বিচার ১৮৪৮ সালে দূরীভূত হলেও — প্রত্যহ নতুন নতুন ছিদ্র সৃষ্টি করছে — এছাড়া আর কিছুর উপরে নয়। নতুন সাম্রাজ্যিক আইনবিধির স্রষ্টারা এসেছে এই সর্বাধিক মন্দ ধারা থেকে, এবং তাদের কাজ তার ছাপ বহন করছে। বিশুদ্ধ আইনগত দিকটি ছাড়াও রাজনৈতিক অধিকার এই সমস্ত আইনবিধিতে খুবই লাঞ্ছিত হয়েছে। শোফেনের আদালতগুলি (৮১) যদি শ্রমিক শ্রেণীকে দমন করার কাজে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীকে সহযোগিতা করার উপায় যুগিয়ে থাকে, তাহলে রাষ্ট্রও জুরিদের আদালতের অধিকার খর্ব করে নতুন বুর্জোয়া বিরোধিতার বিপদের বিরুদ্ধে নিজেকে যথাসম্ভব সুরক্ষিত করে। দণ্ডবিধির রাজনৈতিক অনুচ্ছেদগুলি প্রায়শই এত অস্পষ্ট ও স্থিতিস্থাপক যেন বর্তমান

সাম্রাজ্যিক আদালতের মাপে বিশেষ করে তৈরি এবং সাম্রাজ্যিক আদালত তৈরি তাদের মাপে। স্পষ্টতই, নতুন আইনবিধিগুলি প্রুশীয় অলিখিত আইনের তুলনায় সামনের দিকে একটি পদক্ষেপ — আজ এমন কি স্টোয়েকারও সেই বিধির মতো ভয়াবহ কিছু উদ্ভাবন করতে অপারগ হবেন, এমন কি নিজের মাথাও যদি মুড়োতে রাজী থাকেন, তাও নয়। কিন্তু যে সমস্ত প্রদেশ এই সেদিন পর্যন্তও ফরাসী আইনের আওতায় বাস করত, তারা ধোয়া-মোছা নকল আর ধ্রুপদী আসলটির মধ্যেকার পার্থক্য তীব্রভাবে অনুভব করে। জাতীয় উদারপন্থীরা তাদের কর্মসূচি থেকে চ্যুত হয়েছে বলেই নাগরিক অধিকারের বিনিময়ে রাষ্ট্রক্ষমতার এই শক্তিবৃদ্ধি, এই প্রথম প্রকৃত পশ্চাদ্‌গতি সম্ভব হয়েছে।

সাম্রাজ্যিক সংবাদপত্র আইনের কথাও উল্লেখ করা দরকার। এ সংক্রান্ত বৈষয়িক আইনকে দণ্ডবিধি ইতিমধ্যেই সারগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে; সমগ্র সাম্রাজ্যের জন্য একই রকম আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞার্থের বিশদীকরণ এবং এখানে-ওখানে চালু বণ্ড ও স্ট্যাম্প ডিউটির বিলোপসাধনই অতএব আইনের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল এবং সেই সঙ্গে সেটাই ছিল তার অর্জিত একমাত্র সাফল্য।

প্রাশিয়া যাতে আবার একটি আদর্শ রাষ্ট্র হয়ে উঠতে পারে সে জন্য তথাকথিত স্বশাসন প্রবর্তন করা হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল, সামন্ততন্ত্রের সবচেয়ে আপত্তিজনক অবশেষগুলিকে উচ্ছেদ করা, অথচ, সারগতভাবে, সব কিছু আগের মতোই রেখে দেওয়া। এই উদ্দেশ্য পূরণ করল জেলা অর্ডিন্যান্স (৮২)। য়ুঙ্কারদের জমিদারিতে পুলিসি প্রতাপ একটি কালাসঙ্গতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নামে — সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ সুবিধা হিসেবে — তা বিলুপ্ত করা হল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা পুনঃপ্রবর্তিত হল স্বতন্ত্র গ্রামীণ জেলা [Gutsbezirke] প্রতিষ্ঠায়, যার ভিতরে ভূস্বামী স্বয়ং গ্রামীণ তত্ত্বাবধায়ক [Gutsvorsteher] হিসেবে কাজ করে এবং গ্রাম-সম্প্রদায়ের প্রধানের [Gemeindevorsteher] ক্ষমতা সে ভোগ করে, অথবা সে এই গ্রামীণ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে; তা পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছিল প্রশাসনিক জেলার [Amtsbezirk] সমগ্র পুলিস ক্ষমতা ও পুলিসি এক্তিয়ার জেলা প্রধানের [Amtsvorsteher] কাছে হস্তান্তরিত করে, গ্রামাঞ্চলে এই পদটি প্রায়

একান্তভাবেই বড় ভূস্বামীরা অধিকার করে ছিল; এইভাবে তারা গ্রাম-সম্প্রদায়ের উপরে দৃঢ়মুষ্টি-দখল বজায় রেখেছিল। ব্যক্তিবিশেষের সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ সুবিধা বিলুপ্ত করা হয়েছিল, কিন্তু এই সব সুবিধার সঙ্গে যুক্ত পূর্ণ ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছিল সমগ্র শ্রেণীর হাতে। অনুরূপ ভোজবাজীতেই ইংরেজ বৃহৎ ভূস্বামীরা জাস্টিস অব পীস (শান্তিরক্ষার জন্য নিযুক্ত স্থানীয় নিম্নপদস্থ শাসক — অনুঃ) এবং গ্রামীণ প্রশাসনের কর্তা, পুলিস ও নিম্নতর আদালতের প্রধানে পরিণত হয়েছিল, এবং এক নতুন, আধুনিকীকৃত উপাধির আড়ালে নিজেরা যাতে ক্ষমতার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান আরও ভোগ করতে পারে সে ব্যবস্থা তার দ্বারা সুনিশ্চিত করে, এই অবস্থান পুরনো সামন্ততান্ত্রিক ধরনের অধীনে তারা ধরে রাখতে পারত না। সেটাই অবশ্য ইংরেজি ও জার্মান 'স্বশাসনের' মধ্যে একমাত্র মিল। আমি এরকম একজন ব্রিটিশ মন্ত্রী দেখতে পেলে খুশী হতাম যিনি পার্লামেন্টে সাহস করে এই প্রস্তাব করতে পারেন যে নির্বাচিত স্থানীয় কর্মকর্তারা অনুমোদিত হবে এবং যদি কোনো অবাঞ্ছিত ব্যক্তি নির্বাচিত হয় তাকে রাষ্ট্রনিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে স্থানান্তরিত করা হবে; প্রস্তাব করতে পারেন যে প্রুশীয় ল্যান্ডর‍্যাট, প্রশাসনিক জেলাগুলির প্রধান ও প্রতিভূ-কর্তাদের ক্ষমতাসম্পন্ন সিভিল সার্ভেন্ট (উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা — অনুঃ) রাখা হোক; প্রস্তাব করতে পারেন যে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সংস্থাগুলিকে জেলা অর্ডিন্যান্সে প্রদত্ত অধিকারের মতো সম্প্রদায়, ছোট প্রশাসনিক সংস্থা ও জেলাগুলির আভ্যন্তরিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার এবং ন্যায়বিচারের পথ রোধ করার অধিকার দেওয়া হোক — এ জিনিস সমস্ত ইংরেজিভাষী দেশে এবং ইংরেজ আইনে অশ্রুতপূর্ব, কিন্তু জেলা অর্ডিন্যান্সের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই তা আমরা দেখতে পাই। আর জেলা ডায়েটগুলি [Kreistag] তথা প্রাদেশিক ল্যান্ডটাগগুলি যেখানে এখনও পুরনো সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় তিনটি স্তরের — বৃহৎ ভূস্বামী, শহর ও গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত, সেখানে ইংলন্ডে এমন কি অতি রক্ষণশীল এক মন্ত্রিসভাও কাউন্টির সমস্ত প্রশাসন প্রায় সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত করে একটি আইন গ্রহণ করে (৮৩)।

ছ-টি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের জন্য জেলা অর্ডিন্যান্সের খসড়াটি

(১৮৭১) ছিল প্রথম ইঙ্গিত যে বিসমার্ক প্রাশিয়াকে জার্মানির মধ্যে লীন হয়ে যেতে দেওয়ার কথা চিন্তা পর্যন্ত করেন নি, তিনি পুরনো প্রুশীয়বাদের পুরনো মজবুত ঘাঁটি এই ছ-টি প্রদেশকে আরও শক্তিশালী করতে চেয়েছেন। পরিবর্তিত নামে য়ুঙ্কারদের হাতে তাদের ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলি ছেড়ে দেওয়া হল, আর জার্মানির ভূমিদাসরা (৮৪), এই সমস্ত অঞ্চলের গ্রামীণ শ্রমিকরা — যেমন খেতমজুর ও দিন-মজুররা — থেকে গেল প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের আগের ভূমিদাসত্বের মধ্যে এবং শুধু দুটি সরকারী কাজে তাদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হল: সৈনিক হওয়া এবং রাইখস্টাগে নির্বাচনের সময়ে ভোট দেওয়ার প্রাণী হিসেবে য়ুঙ্কারদের সেবা করা। এর দ্বারা বিসমার্ক বিপ্লবী সোশ্যালিস্ট পার্টির যে উপকার করেছিলেন তা অবর্ণনীয় এবং আন্তরিকতম কৃতজ্ঞতালাভের যোগ্য।

য়ুঙ্কারদের মূর্খতা সম্পর্কে কী আর বলা যায়, যে-জেলা অর্ডিন্যান্স একান্ত তাদেরই স্বার্থে, কিছুটা আধুনিকীকৃত নামে তাদের সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ সুবিধা চিরস্থায়ী করার স্বার্থে প্রণীত হয়েছিল, তারা বখে-যাওয়া শিশুদের মতো তার গায়েই পদাঘাত করল। প্রুশীয় লর্ড সভা, কিংবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, য়ুঙ্কার সভা প্রথমে এই খসড়া — যেটি পেশ করতে ইতিমধ্যেই পুরো এক বছর দেরি হয়ে গেছে — প্রত্যাখ্যান করল এবং ২৪ জন নতুন 'লর্ডকে' খেতাব দিয়ে মনোনীত করার পরই তা গ্রহণ করল। প্রুশীয় য়ুঙ্কাররা আরেকবার প্রমাণ করল যে তারা ক্ষুদ্রমনা, গোঁয়ার, সংশোধনাতীত প্রতিক্রিয়াশীল, জাতির জীবনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারার মতো এক বৃহৎ স্বতন্ত্র পার্টির প্রাণকেন্দ্র গঠন করতে — ব্রিটিশ বৃহৎ ভূম্যধিকারীরা প্রকৃতই যা করে — তারা অক্ষম। তার দ্বারা তারা তাদের পরিপূর্ণ বুদ্ধিহীনতার প্রমাণ দিল; বিসমার্ককে শুধু পৃথিবীর সামনে তাদের সার্বিক চরিত্রহীনতা প্রকাশ করতে হয়েছিল, আর যথাযথভাবে প্রযুক্ত সামান্য একটু চাপই sans phrase* তাদের রূপান্তরিত করল এক বিসমার্ক পার্টিতে। এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে চলেছিল কুলটুরকাম্‌ফ্‌।

প্রুশীয়-জার্মান সাম্রাজ্যিক পরিকল্পনার রূপায়ণে একটা পাল্‌টা-আঘাত

---

* বিনা বাক্যে। — সম্পাঃ

সৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল — আগেকার পৃথক বিকাশের উপরে যারা নির্ভর করত এমন সমস্ত প্রুশীয়-বিরোধী শক্তির একটিমাত্র পার্টিতে মিলিত হওয়া। নানান ধরনের এই শক্তিগুলি আলট্রামনটানিজমের (৮৫) মধ্যে এক অভিন্ন পতাকা খুঁজে পেল। এক দিকে, পোপের অভ্রান্ততা-সংক্রান্ত নতুন মতের বিরুদ্ধে এমন কি অসংখ্য অর্থোডক্স ক্যাথলিকের মধ্যে সুস্থ কাণ্ডজ্ঞানের বিদ্রোহ, অন্য দিকে, পোপশাসিত রাষ্ট্রের বিনাশ এবং রোমে পোপের তথাকথিত বন্দীদশা (৮৬) ক্যাথলিক ধর্মমতের সমস্ত জঙ্গী শক্তিকে সংহত হতে বাধ্য করল। এইভাবে, যুদ্ধের সময়েই, ১৮৭০-এর শরৎ-হেমন্তকালে প্রুশীয় ল্যান্ডটাগে গঠিত হয়েছিল সুনির্দিষ্টভাবে ক্যাথলিক পার্টি অব দি সেণ্টার; ১৮৭১ সালের প্রথম জার্মান রাইখস্টাগে তারা পেয়েছিল মাত্র ৫৭টি আসন, কিন্তু প্রতিটি নতুন নির্বাচনে তারা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল এবং শেষে এদের ১০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি ছিল। এই পার্টি গঠিত ছিল বহু বিভিন্নধর্মী ব্যক্তিদের দিয়ে। প্রাশিয়ায় তার প্রধান শক্তি ছিল তখনও যারা নিজেদের 'বিধিনিষেধ-আরোপিত প্রুশীয়' বলে মনে করত সেই রেনিশ ছোট খামারীরা, মুন্‌স্টার ও পাডেরবর্ণ-এর ওয়েস্টফালীয় বিশপদের এলাকার ক্যাথলিক ভূস্বামী ও কৃষকরা এবং ক্যাথলিক সাইলেসীয়রা। দ্বিতীয় বড় বাহিনীটি ছিল দক্ষিণ জার্মান ক্যাথলিকরা, বিশেষত ব্যাভেরীয়রা। ক্যাথলিক ধর্মই সেণ্টার পার্টির ততটা মূলশক্তি ছিল না, বরং বর্তমানে জার্মানির উপরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দাবিদার প্রুশীয় সব কিছুর বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণের বিদ্বেষের সে প্রতিনিধিত্ব করত, এই ঘটনাটাই ছিল তার আসল শক্তি। এই বিদ্বেষ ক্যাথলিক অঞ্চলগুলিতে বিশেষ জোরালো ছিল; তার পাশাপাশি ছিল বর্তমানে জার্মানি থেকে বহিষ্কৃত অস্ট্রিয়ার প্রতি সহানুভূতি। এই দুটি জনপ্রিয় প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেও, সেণ্টার অবশ্যই ছিল বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ে বিশ্বাসী ও যুক্তরাষ্ট্রবাদী।

সেণ্টার পার্টির এই মূলত প্রুশীয়-বিরোধী চরিত্রকে রাইখস্টাগের অন্যান্য ছোট ছোট উপদল সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পেরেছিল, তারাও প্রুশীয়-বিরোধী ছিল স্থানীয় কারণে, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মতো জাতীয় ও সার্বিক কারণে নয়। শুধু ক্যাথলিক — পোল ও অ্যালসেসীয়রাই নয়,

এমন কি প্রটেস্ট্যান্ট গোয়েল্‌ফরাও (৮৭) সেণ্টার পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে নিজেদের যুক্ত করল। এবং বুর্জোয়া উদারপন্থী উপদলগুলি তথাকথিত আলট্রামনটানদের প্রকৃত চরিত্র কখনোই সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে না পারলেও, তারা যখন সেণ্টারকে 'দেশপ্রেমিক নয়' এবং 'সাম্রাজ্যের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন' অভিধায় ভূষিত করেছিল তখন নিশ্চয়ই প্রকৃত অবস্থা কিছুটা আঁচ করেছিল...*

ডিসেম্বর, ১৮৮৭-র শেষ
এবং মার্চ, ১৮৮৮-র
মধ্যবর্তী সময়ে লিখিত

জার্মান ভাষা থেকে
ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

প্রথম প্রকাশ:
Die Neue Zeit,
খণ্ড ১, সংখ্যা
২২-২৬, ১৮৯৫-১৮৯৬

* পাণ্ডুলিপিটি এখানেই আকস্মিকভাবে শেষ হয়েছে। — সম্পাঃ

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

১৮৯১-এর খসড়া সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কর্মসূচির সমালোচনা প্রসঙ্গে (৮৮)

আগেকার কর্মসূচির (৮৯) সঙ্গে বর্তমান খসড়াটির পার্থক্য রয়েছে ভালোর দিকে। সেকেলে পরম্পরার প্রবল জের — **সুনির্দিষ্ট লাসালীয়** তথা স্থূল সমাজতন্ত্রী ধাঁচের — মোটের উপরে দূর করা হয়েছে, এবং তার তত্ত্বগত দিকটির কথা বলতে গেলে খসড়াটি সামগ্রিকভাবে আজকের দিনের বিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং এই ভিত্তিতেই তা আলোচনা করা যায়।

এটি তিনটি অংশে বিভক্ত: ১। মুখবন্ধ, ২। রাজনৈতিক দাবি, ৩। শ্রমিকদের রক্ষার ব্যবস্থার জন্য দাবি।

১। দশ অনুচ্ছেদে মুখবন্ধ

সাধারণভাবে, যুক্ত করা যায় না এমন দুটি জিনিসকে যুক্ত করার চেষ্টায় তা ভুগছে: একটি কর্মসূচি এবং সেই সঙ্গে কর্মসূচি সম্পর্কে একটি **টীকাভাষ্যও**। ছোট, তীক্ষ্ন অর্থপ্রকাশ যথেষ্ট বোধগম্য হবে না এই ভয়ে ব্যাখ্যা যোগ করতে হয়েছে, ফলে তা হয়ে উঠেছে মাত্রাধিক শব্দবহুল ও দীর্ঘ। আমার মতে কর্মসূচি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও বোধগম্য হওয়া উচিত। তাতে যদি মাঝে মাঝে দু-একটি বিদেশী শব্দ থাকে, কিংবা প্রথম নজরে সম্পূর্ণ তাৎপর্য বোঝা যাচ্ছে না এমন কোনো বাক্য থাকে তাতে ক্ষতি নেই। সভায় মৌখিক ব্যাখ্যা এবং পত্রপত্রিকায় লিখিত ভাষ্য সে কাজটা করতে পারে, আর সংক্ষিপ্ত, অর্থপূর্ণ উক্তি একবার বুঝতে পারলে, স্মৃতিতে দৃঢ়মূল হয়ে থাকে, এবং একটি স্লোগান হয়ে ওঠে, শব্দবহুল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যা কখনোই

ঘটে না। জনপ্রিয়তার খাতিরে খুব বেশি কিছু বিসর্জন দেওয়া উচিত নয়, এবং আমাদের শ্রমিকদের মানসিক ক্ষমতা ও শিক্ষার স্তর খাটো করে দেখা উচিত নয়। সংক্ষিপ্ততম কর্মসূচির চাইতে অনেক বেশি কঠিন জিনিস তারা বুঝেছে; আর সমাজতন্ত্রীবিরোধী জরুরী আইন (৯০) যদি আন্দোলনে যোগদানকারী জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক জ্ঞান প্রসারের কাজকে আরও কঠিন করে থাকে এবং কোথাও কোথাও এমন কি রোধ করেও থাকে, তাহলে এখন যখন আমাদের প্রচারমূলক রচনাদি ঝঞ্ঝাটের ঝুঁকি না-নিয়েও আবার রাখা এবং পড়া যাচ্ছে, তখন যে সময়টুকু নষ্ট হয়েছে তা পুরনো নেতৃত্বের অধীনে অচিরেই পুষিয়ে নেওয়া যাবে।

এই গোটা অংশটিকেই আমি আরও কিছুটা ছোট করার চেষ্টা করব এবং যদি সফল হই তাহলে এই সঙ্গেই সংলগ্ন করে দেব, না হয় পরে পাঠিয়ে দেব। এখন আমি ১ থেকে ১০ সংখ্যাচিহ্নিত অনুচ্ছেদগুলি এক-এক করে আলোচনা করব।

অনুচ্ছেদ ১। ‘পৃথকীকরণ’, ইত্যাদি, ‘খনি, খনিগহ্বর ও খাত’ — একই জিনিসের জন্য তিনটি শব্দ: দুটি বাদ দেওয়া উচিত। আমি রেখে দেব **খনি** [Bergwerke], এই শব্দটি দেশের সমতলতম অংশেও ব্যবহৃত হয়, এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এই শব্দটি দিয়েই তাদের সব-কটিকে অভিহিত করব। অবশ্য, যোগ করব, **‘রেলপথ এবং** যোগাযোগের **অন্যান্য** উপায়’।

অনুচ্ছেদ ২। এখানে আমি ঢোকাবো: **‘তাদের উপযোজকদের** (কিংবা **তাদের মালিকদের**) হাতে শ্রমের **সামাজিক** উপায়সমূহ হল’, এবং অনুরূপভাবে নীচে ‘শ্রমের উপায়সমূহের **মালিকদের** (কিংবা উপযোজকদের) উপরে নির্ভরশীলতা...’ ইত্যাদি।

প্রথম অনুচ্ছেদেই বলা হয়েছে যে এই ভদ্রলোকরা এই সব জিনিস উপযোজন করেছে **‘একান্ত নিজস্ব** সম্পত্তি’ হিসেবে এবং যদি ‘[illegible]একচেটিয়া’ শব্দটি এখানে আনার ওপরে [illegible] জোর দেওয়া হয় একমাত্র তাহলেই ওই কথাটি এখানেই পুনরাবৃত্তি করা দরকার। এই শব্দটি কিংবা অন্য শব্দটি নতুন কোনো অর্থ বোঝায় না। আর কর্মসূচিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু থাকলে তা তাকে **দুর্বল করে ফেলে।**

'সমাজের **অস্তিত্বের** জন্য **প্রয়োজনীয়** শ্রমের উপায়সমূহ'

— এই জিনিসগুলিই হাতের কাছে আছে। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আগে তা ছাড়াই কাজ চালানো সম্ভব ছিল, এখন আমরা পারি না। যেহেতু শ্রমের সমস্ত উপায়ই আজকাল প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে — হয় তাদের গড়নের দরুন না-হয় সামাজিক শ্রম বিভাজনের দরুন — **শ্রমের সামাজিক উপায়সমূহ**, সেই জন্য শব্দগুলিই প্রতিটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে কী পাওয়া যাচ্ছে সেই অর্থটি যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে, সঠিকভাবে এবং বিভ্রান্তিকর কোনো অনুষঙ্গ ছাড়াই প্রকাশ করে।

এই অনুচ্ছেদের শেষ কথা যদি আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলীর মুখবন্ধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করতে চাওয়া হয়, তাহলে আমি বরং চাই তা **সম্পূর্ণরূপে** সংগতিপূর্ণ হোক: 'সামাজিক দুর্দশা' (এ হল ১ নং), 'মানসিক অধঃপতন ও রাজনৈতিক অধীনতার'।* শারীরিক অধঃপতন সামাজিক দুর্দশার অংশ, আর রাজনৈতিক **অধীনতা** একটা বাস্তব ঘটনা, আর রাজনৈতিক **অধিকারের অস্বীকৃতি** একটি অলংকারপূর্ণ কথা, তা শুধু **আপেক্ষিকভাবে** সত্য এবং এই কারণে কর্মসূচিতে স্থান পায় না।

অনুচ্ছেদ ৩। আমার মতে প্রথম বাক্যটি পরিবর্তন করা উচিত।

'একক মালিকদের আধিপত্যের অধীনে।'

প্রথমত, এর পর যা বলা হয় তা এক অর্থনৈতিক ঘটনা, তার ব্যাখ্যা করা উচিত অর্থনৈতিক ভাষায়। 'একক মালিকদের **আধিপত্য**' কথাটি এমন ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে যে সেই ডাকাতের দলের **রাজনৈতিক** আধিপত্যই এর কারণ। দ্বিতীয়ত, এই একক মালিকদের মধ্যে শুধু 'পুঁজিপতি ও বৃহৎ ভূম্যধিকারীরাই' পড়ে না (এর পরে 'বুর্জোয়া' শব্দটির তাৎপর্য কী? তারা কি একক মালিকদের তৃতীয় একটি শ্রেণী? বৃহৎ ভূম্যধিকারীরাও কি 'বুর্জোয়া'? আর, একবার যখন বৃহৎ ভূম্যধিকারীদের প্রসঙ্গে এসেছি

---

* ক. মার্কস, 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ নিয়মাবলী' (এই সংস্করণের ৫ম খণ্ডের ১৮-২২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। — সম্পাঃ

তখন আমাদের কি সামন্ততন্ত্রের বিপুল অবশেষের কথা উপেক্ষা করা উচিত হবে, — যে অবশেষগুলি জার্মান রাজনীতির গোটা নোংরা ব্যাপারটাকেই সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র দিয়েছে?)। **কৃষক** এবং **পেটি বুর্জোয়াও** 'একক মালিক', অন্তত আজও পর্যন্ত; কিন্তু কর্মসূচিতে কোথাও তাদের উল্লেখ নেই, সুতরাং শব্দবিন্যাসে একথা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত যে আলোচ্য একক মালিকদের বর্গের মধ্যে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

'শ্রমের উপায়সমূহের **এবং** শোষিতদের দ্বারা সৃষ্ট সম্পদের সঞ্চয়।'

'সম্পদ' হল ১। শ্রমের উপায়সমূহ, ২। জীবনধারণের উপায়সমূহ। সুতরাং একটিকে বাদ দিয়ে সম্পদের একটি **অংশ** উল্লেখ করা তারপরে **'এবং'**-এর সাহায্যে দুটিকে যুক্ত করে মোট সম্পদের কথা বলা ব্যাকরণগতভাবে ভুল এবং অযৌক্তিক।

'**পুঁজিপতিদের** হাতে ক্রমবর্ধমান দ্রুততায়... বাড়ে...'

উপরোক্ত 'বৃহৎ ভূম্যধিকারী' আর 'বুর্জোয়া শ্রেণীর' কী হল? এখানে যদি শুধু পুঁজিপতিদের কথা বলাই যথেষ্ট হয়, তাহলে উপরেও তাই হওয়া উচিত। অবশ্য যদি নির্দিষ্ট করে বলতে চাওয়া হয় তাহলে সাধারণত শুধু তাদের কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট নয়।

'প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা এবং **দুর্দশা** ক্রমাগত বাড়ে।'

এই রকম চরম-সুস্পষ্ট ভাষায় উপস্থিত করলে, কথাটা ভুল। শ্রমিকদের সংগঠন এবং তাদের নিয়ত বর্ধমান প্রতিরোধ সম্ভবত **দুর্দশা বৃদ্ধি** কিছুটা পরিমাণে রোধ করবে। কিন্তু যেটা **নিশ্চয়ই** বাড়ে তা হল **অস্তিত্বের নিরাপত্তাহীনতা**। এই কথাটা আমি ঢোকাতে চাই।

অনুচ্ছেদ ৪।

'পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিতমূল পরিকল্পনার অভাব'

বিষয়টির যথেষ্ট পরিমার্জনা দরকার। একটি সামাজিক ধরন, কিংবা একটি অর্থনৈতিক পর্যায় হিসেবে পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে আমি

পরিচিত; পুঁজিবাদী **ব্যক্তিগত** উৎপাদন-ব্যবস্থা এমন একটা **ব্যাপার** যা সেই পর্যায়ে কোনো না কোনো ধরনে দেখা যায়। পুঁজিবাদী **ব্যক্তিগত** উৎপাদন-ব্যবস্থা কী? — **পৃথক পৃথক** উদ্যোগপতির দ্বারা উৎপাদন, যা ক্রমেই বেশি করে ব্যতিক্রম হয়ে উঠছে। **জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিগুলির দ্বারা** পুঁজিবাদী উৎপাদন আর **ব্যক্তিগত** উৎপাদন নেই, বরং সম্মিলিত বহুজনের পক্ষে উৎপাদন হয়ে উঠেছে। আমরা যখন জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানি থেকে ট্রাস্টে চলে আসি — যে-ট্রাস্ট শিল্পের এক-একটি গোটা শাখার উপরে আধিপত্য করে এবং একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে — তখন শুধু **ব্যক্তিগত উৎপাদনই** নয়, **পরিকল্পনাহীনতারও অবসান** ঘটে। **'ব্যক্তিগত'** শব্দটি বাদ দিলে বাক্যটি চলতে পারে।

'জনসমষ্টির ব্যাপক স্তরের সর্বনাশ।'

মনে হয় আমরা যেন এখনও বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর ধ্বংসের জন্য দুঃখ করছি, তাই এই অলঙ্কারপূর্ণ কথাটির পরিবর্তে আমি বলব এই সহজ কথাটি: 'শহুরে ও গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, পেটি বুর্জোয়া ও ছোট কৃষকদের ধ্বংস করে যা বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যেকার গহ্বরকে বিস্তৃত (কিংবা গভীর) করে তোলে।'

শেষ দুটি কথায় একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রথম অংশের পরিশিষ্টে আমি একটি খসড়া সংশোধনী দিলাম।*

অনুচ্ছেদ ৫। 'কারণ' শব্দটির পরিবর্তে হওয়া উচিত **'এর** কারণ,' সম্ভবত লেখার সময়ে অনবধানতার দরুনই এটা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ৬। 'খনি, খনিগহ্বর, খাত', উপরে দেখুন, অনুচ্ছেদ ১-এ। **'ব্যক্তিগত** উৎপাদন', উপরে দেখুন। আমি বলতে চাই: 'একক ব্যক্তি বা জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিগুলির তরফে বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদনের সামগ্রিকভাবে সমাজের তরফে এবং পূর্বচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে রূপান্তর, যে রূপান্তরের জন্য, ইত্যাদি... সৃষ্টি করা হয়... এবং একমাত্র এরই দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি ও সেই সঙ্গে

* এই খণ্ডের ৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

ব্যতিক্রমহীনভাবে সমাজের সকল সদস্যের মুক্তি অর্জন করা যাবে।'

অনুচ্ছেদ ৭। প্রথম অংশের পরিশিষ্টে* যে কথা বলেছি, তাই বলতে চাই।

অনুচ্ছেদ ৮। আমাদের মহলে সহজবোধ্য সংক্ষিপ্তরূপ — 'শ্রেণী-সচেতন' কথাটির পরিবর্তে আমি সবাই যাতে সহজে বুঝতে পারে এবং বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করা যায় সেই জন্য এই কথা বলতে চাই: 'নিজেদের শ্রেণী-অবস্থান সম্পর্কে সচেতন শ্রমিকদের সঙ্গে' অথবা ঐরকম কিছু।

অনুচ্ছেদ ৯। শেষ বাক্যটি: '...**রাখে**... এবং তার দ্বারা সেই একই হাতে অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক নিপীড়নকে কেন্দ্রীভূত করে।'

অনুচ্ছেদ ১০। 'শ্রেণী-শাসনের' পর 'এবং শ্রেণীগুলির নিজেদেরই' শব্দগুলি বসানো উচিত। শ্রেণীসমূহের বিলোপসাধন আমাদের মূল দাবি, এ ছাড়া শ্রেণী-শাসনের বিলুপ্তি অর্থনৈতিকভাবে অকল্পনীয়। 'সকলের সমান অধিকারের জন্য'-এর পরিবর্তে আমার প্রস্তাব হল: 'সকলের সমান অধিকার ও **সমান কর্তব্যের** জন্য' ইত্যাদি। আমাদের পক্ষে **সমান কর্তব্য** বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক **সমান অধিকারের সঙ্গে** এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন এবং তা তাদের সুনির্দিষ্ট বুর্জোয়া অর্থের অবসান ঘটায়।

শেষ বাক্যটি: 'তাদের সংগ্রামে... সক্ষম' বাদ দিলেই ভালো হয়। 'সাধারণভাবে **জনগণের** (সেটা কে?) অবস্থার উন্নতিবিধানে সক্ষম এবং...' এই অনির্দিষ্ট ভাষার আওতায় সব কিছু — রক্ষণমূলক শুল্ক ও অবাধ বাণিজ্য, গিল্ড ও উদ্যোগের স্বাধীনতা, ভূসম্পত্তি জমিনের উপরে ঋণ, বিনিময় ব্যাঙ্ক, বাধ্যতামূলক টীকা দান এবং টীকা নিষিদ্ধকরণ, মদ্যাসক্তি ও মাদকবর্জন প্রভৃতি সব কিছুই আসতে পারে। এখানে যেকথা বলা **উচিত,** তা আগেই বলা হয়েছে, এবং একথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা অনাবশ্যক যে সমগ্রের জন্য দাবির মধ্যে প্রতিটি পৃথক অংশও আছে, কারণ, আমার মনে হয়, এতে জোর কমে যায়। অবশ্য যদি এই বাক্যটি এক-একটি দাবির দিকে যাওয়ার যোগসূত্র হিসেবে ভাবা হয়ে থাকে তাহলে এই কথাগুলি বলা যেতে পারে: **'এই লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে** এমন সমস্ত দাবির ...।

---

* এই খণ্ডের ৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

জন্যাই সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি লড়াই করে' ('ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত' পুনরাবৃত্তিমূলক বলে বাদ দেওয়া দরকার)। কিংবা তা না হলে, যেটা আরও ভালো হবে: সরাসরি সবকথা বলা, অর্থাৎ একথা বলা যে বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানে যেতে পারে নি আমাদের সেইখানে গিয়ে পেঁছতে হবে; পরিশিষ্ট ১-এ* আমি এই মর্মে একটি সমাপ্তিসূচক বাক্য অন্তর্ভুক্ত করেছি। পরবর্তী অংশ সম্পর্কে আমার মন্তব্যলিপির প্রসঙ্গে এবং সেখানে আমার উপস্থাপিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বোঝাবার পক্ষে এটা আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।

২। রাজনৈতিক দাবি

খসড়া রাজনৈতিক দাবিগুলির একটা বড় দোষ আছে। যে কথা বলা উচিত ছিল, **ঠিক সেইটিই তাতে নেই**। ১০টি দাবির সবকটিই যদি মঞ্জুর করা হত, তাহলে আমরা বস্তুতই আমাদের প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের বিচিত্রতর উপায় পেতাম, কিন্তু সেই লক্ষ্যটি কোনোমতেই অর্জিত হত না। জনগণ ও তাদের প্রতিনিধিদের অধিকার দেওয়ার প্রসঙ্গে জার্মান সাম্রাজ্যিক সংবিধানটি, যথাযথভাবে বলতে গেলে, ১৮৫০ সালের প্রুশীয় সংবিধানেরই (৯১) প্রতিলিপি, এই সংবিধানের ধারাগুলি অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল এবং সরকারকেই সমস্ত প্রকৃত ক্ষমতা প্রদান করে, কিন্তু প্রতিনিধি সভাগুলিকে এমন কি কর নামঞ্জুর করতেও দেয় না; যে সংবিধান বিরোধের সময়ে (৯২) দেখিয়েছে যে সরকার সেটি নিয়ে যা খুশী করতে পারে। রাইখস্টাগের অধিকার প্রুশীয় প্রতিনিধি সভারই অধিকারের মতো আর সেই জন্যই লিব্‌ক্লেখ্‌ট এই রাইখস্টাগকে অভিহিত করেছেন সার্বভৌমতন্ত্রের নগ্নরূপ ঢাকার ডুমুর পাতা বলে। এই সংবিধান ও তার অনুমোদিত ছোট ছোট রাষ্ট্রের ব্যবস্থার ভিত্তিতে, প্রাশিয়া আর রয়েস-গ্রেইৎস-শ্লেইৎস-লোবেনস্টাইনের (৯৩) মধ্যে 'মিলনের' ভিত্তিতে — যেখানে এক রাষ্ট্রের যত বর্গ ইঞ্চি জমি, আরেক রাষ্ট্রের আছে তত বর্গ মাইল জমি — 'শ্রমের সমস্ত উপকরণকে সাধারণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করার' ইচ্ছা স্পষ্টতই অবাস্তব।

বিষয়টিতে হাত দেওয়া অবশ্য বিপজ্জনক। তা সত্ত্বেও, কোনো না

* এই খণ্ডের ৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

কোনো ভাবে জিনিসটিকে আক্রমণ করা দরকার। এ যে কত প্রয়োজনীয় তা ঠিক বর্তমান সময়েই দেখা যাচ্ছে সুবিধাবাদ থেকে, যে-সুবিধাবাদ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংবাদপত্রজগতের একটা বড় অংশের মধ্যে বেড়ে চলেছে। সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইন নতুন করে চালু হওয়ার ভয়ে, অথবা সেই আইনের শাসনকালে অত্যধিক তাড়াহুড়ো করে বলা নানান ধরনের উক্তির কথা স্মরণ করে এখন তারা চায় যে পার্টি জার্মানির বর্তমান আইনী ব্যবস্থাকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পার্টির সমস্ত দাবি তুলে ধরার পক্ষে উপযুক্ত বিবেচনা করুক। এগুলি হল নিজেকে এবং পার্টিকে একথা বোঝাবার চেষ্টা যে 'বর্তমান সমাজ সমাজতন্ত্র অভিমুখে বিকশিত হচ্ছে', তার দ্বারা তা সমান আবশ্যিকভাবেই পুরনো সামাজিক ব্যবস্থাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে কি না এবং কাঁকড়া যেমন তার খোলস ভেঙে ফেলে তেমনি তাকে বলপ্রয়োগে তার পুরনো খোলস বিদীর্ণ করতে হবে কি না, এবং জার্মানিতে অধিকন্তু তাকে এখনও আধা-সার্বভৌমপন্থী ও তদুপরি অবর্ণনীয়ভাবে জট-পাকানো রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিগড় চূর্ণ করতে হবে কি না — এসব প্রশ্ন না-করেই একথা বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে। কল্পনা করা যেতে পারে, যে-সব দেশে জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, যেখানে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন থাকলে সাংবিধানিক উপায়ে করণীয় কাজ করা যায় সেই সব দেশে পুরনো সমাজ শান্তিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে নতুন সমাজে পরিণত হতে পারে: ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে, ব্রিটেনের মতো রাজতন্ত্রে, যেখানে আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে রাজবংশের আসন্ন ক্ষমতাত্যাগের কথা সংবাদপত্রে প্রত্যহ আলোচিত হয় এবং যেখানে এই রাজবংশ জনগণের বিরুদ্ধে ক্ষমতাহীন। কিন্তু জার্মানিতে, যেখানে সরকার প্রায় সর্বশক্তিমান এবং রাইখস্টাগ ও অন্য সমস্ত প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার প্রকৃত কোনো ক্ষমতা নেই, সেই জার্মানিতে এরকম একটা জিনিসের কথা বলার অর্থ — যখন, অধিকন্তু তা বলার কোনো দরকার নেই — সার্বভৌমতন্ত্রের অঙ্গ থেকে ডুমুর পাতাটি সরিয়ে নিয়ে নিজেই তার নগ্নতা ঢাকার আবরণ হয়ে ওঠা।

শেষ অবধি এরূপ নীতি পার্টিকে একমাত্র বিপথেই চালিত করতে পারে। সাধারণ, বিমূর্ত রাজনৈতিক প্রশ্নগুলিকে সামনে নিয়ে এসে তা

আশু মূর্ত প্রশ্নগুলিকে আড়াল করে রাখে, প্রথম বড় ঘটনা এবং প্রথম রাজনৈতিক সংকটের মুহূর্তেই সেগুলি স্বতই এসে হাজির হয়। এর ফলে, চূড়ান্ত মুহূর্তে হঠাৎ দেখা যায় পার্টি অসহায় এবং অধিকাংশ চরম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আগে কখনও আলোচিত হয় নি বলে, সেই সব প্রশ্নে তার মধ্যে বিরাজ করছে অনিশ্চয়তা ও বিরোধ — এ-ছাড়া আর কী হতে পারে? রক্ষণমূলক শুল্কের ব্যাপারে যা ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি কি ঘটাতেই হবে? — বলা হয়েছিল যে এই শুল্ক শুধু বুর্জোয়া শ্রেণীর ভাবনার ব্যাপার, শ্রমিকদের স্বার্থকে তা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করে না, অর্থাৎ এমন একটি বিষয় যার উপরে প্রত্যেকে ইচ্ছা মতো ভোট দিতে পারে। এখন অনেকে কি চরম বিপরীত প্রান্তে যাচ্ছে না এবং তারা কি রক্ষণমূলক শুল্কে আসক্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর তুলনায় কবডেন ও ব্রাইটের অর্থনৈতিক বিকৃতিগুলিই নতুন করে তৈরি করছে না এবং সেগুলিকে — এই নির্ভেজাল ম্যাঞ্চেস্টারবাদকে (৯৪) বিশুদ্ধতম সমাজতন্ত্র বলে প্রচার করছে না? মহৎ, মূল বিষয়টি এইভাবে বিস্মৃত হওয়া, এখনকার তাৎক্ষণিক স্বার্থকেই প্রধান বিবেচ্য করে তোলা, পরবর্তীকালের পরিণতি-নির্বিচারে এই মুহূর্তের সাফল্যের জন্য এই সংগ্রাম ও প্রয়াস, আন্দোলনের বর্তমানের জন্য তার ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দেওয়া, হয়তো বা 'সততার' সঙ্গেই করা হচ্ছে, কিন্তু তা সুবিধাবাদ এবং এখনও সুবিধাবাদই আছে, আর 'সৎ' সুবিধাবাদ সম্ভবত সব চাইতে বিপজ্জনক!

এই সূক্ষ্ম অথচ অতি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়গুলি কী?

প্রথম। একটা বিষয় যদি সুনিশ্চিত হয়ে থাকে তবে তা এই যে আমাদের পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতায় আসতে পারে একমাত্র এক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আকৃতিতে। এমন কি এটিই হল প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট ধরন, ফরাসী মহাবিপ্লব তা ইতিমধ্যেই দেখিয়েছে। মিকেলের মতো একজন সম্রাটের অধীনে মন্ত্রী হওয়া আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের পক্ষে অকল্পনীয়। মনে হয় আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে একটি প্রজাতন্ত্রের দাবি সরাসরি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হবে না, যদিও ফ্রান্সে লুই ফিলিপের আমলেও তা সম্ভব ছিল এবং এখন সম্ভব ইতালিতে। কিন্তু জার্মানিতে যে একটি প্রজাতন্ত্রীয় পার্টির কর্মসূচি

প্রকাশ্যে উপস্থিত করতে দেওয়া হয় না, এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে একটি প্রজাতন্ত্র, শুধু প্রজাতন্ত্রই নয়, কমিউনিস্ট সমাজও নিরুপদ্রব, শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিষ্ঠা করা যাবে এই বিশ্বাস কত সম্পূর্ণ রূপে ভ্রান্ত।

যাই হোক, প্রজাতন্ত্রের প্রশ্নটিকে সম্ভবত বাদ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমার মতে যা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং করা যায় তা হল **জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার** দাবি। এর চাইতে বেশি দূর এগোনো যদি অসম্ভব হয় তাহলে আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট।

দ্বিতীয়। জার্মানির পুনর্গঠন। একদিকে, ছোট ছোট রাষ্ট্রের ব্যবস্থা অবশ্যই বিলুপ্ত করতে হবে — ব্যাভেরিয়া-ভুর্টেমবের্গ (৯৫) সংরক্ষণ অধিকার রয়েছে, আর আজকের থুরিঙ্গিয়ার মানচিত্র দেখলে দুঃখ হয় — এই অবস্থায় সমাজের বৈপ্লবিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেই দেখুন! অন্য দিকে, প্রাশিয়ার অস্তিত্ব থাকা চলবে না, জার্মানির উপরে সুনির্দিষ্ট প্রুশীয়বাদ আর যাতে বোঝা হয়ে চেপে বসতে না-পারে সে জন্য তাকে অবশ্যই কতকগুলি স্বশাসিত প্রদেশে বিভক্ত করে দিতে হবে। যে বৈপরীত্য এখন জার্মানিকে সাঁড়াশির মতো এ'টে ধরেছে, ছোট ছোট রাষ্ট্রের ব্যবস্থা আর প্রুশীয়বাদ তারই দুটি দিক, সেখানে একটি দিক সর্বদাই অপরটির অস্তিত্বের অজুহাত ও সাফাই হিসেবে কাজ করবে।

কী তার স্থান গ্রহণ করবে? আমার মতে, প্রলেতারিয়েত শুধু এক ও অবিভাজ্য প্রজাতন্ত্রের ধরনটিই ব্যবহার করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুবিশাল এলাকায় ফেডারেল প্রজাতন্ত্র এখনও মোটের উপরে আবশ্যকীয়, যদিও পূর্বাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে তা ইতিমধ্যেই একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে দুটি দ্বীপে চারটি জাতির লোকের বাস এবং একটিমাত্র পার্লামেন্ট সত্ত্বেও পাশাপাশি তিনটি পৃথক আইন প্রণয়ন-ব্যবস্থা আছে, সেই ব্রিটেনে তা হবে সামনের দিকে একটি পদক্ষেপ। ছোট সুইজারল্যান্ডে তা বহুদিন ধরেই এক প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে, কিন্তু তা সহনীয় একমাত্র এই কারণে যে ইউরোপীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার নিতান্ত নিষ্ক্রিয় এক সদস্য হতে পেরেই সুইজারল্যান্ড সন্তুষ্ট। জার্মানির পক্ষে সুইস আদর্শ অনুযায়ী ফেডারেল ব্যবস্থা প্রবর্তন পিছনের দিকে এক বিরাট পদক্ষেপ হবে। দুটি বিষয়

সম্পূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ একটি রাষ্ট্র থেকে একটি অঙ্গ রাজ্যকে পৃথক করে তোলে: প্রথমত, প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের, প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন প্রণয়ন ও নিজস্ব বিচার-ব্যবস্থা থাকে এবং দ্বিতীয়ত, একটি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষের পাশাপাশি একটি ফেডারেল কক্ষও থাকে, ছোট-বড় সমস্ত অঞ্চল তাতে ভোট দেয়। প্রথমটি আমরা সৌভাগ্যক্রমে কাটিয়ে উঠেছি এবং তা পুনঃপ্রবর্তন করার মতো শিশুসুলভ বোকামি আমরা করব না; দ্বিতীয়টি আছে আমাদের বুন্ডেসরাটে এবং সেটি না-থাকলে আমাদের বেশ ভালোই চলত, কারণ আমাদের 'ফেডারেল রাষ্ট্র' সাধারণত এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে উত্তরণস্বরূপ। এবং আমাদের কর্তব্য — ১৮৬৬ ও ১৮৭০ সালের উপর থেকে-আসা বিপ্লবকে অবশ্যই উল্টে দেওয়া নয়, কিন্তু তাকে পরিপুষ্ট ও উন্নত করতে হবে নিচের থেকে এক আন্দোলন দিয়ে।

তাহলে, একটি একীভূত প্রজাতন্ত্র। কিন্তু বর্তমান ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অর্থে নয়, সেটি ১৭৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সম্রাটহীন সাম্রাজ্য ছাড়া আর কিছু নয় (৯৬)। ১৭৯২ থেকে ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত প্রতিটি ফরাসী বিভাগ, প্রতিটি সম্প্রদায়, মার্কিন মডেলে পরিপূর্ণ স্বশাসন ভোগ করত, আমাদেরও তাই চাই। স্বশাসন কীভাবে সংগঠিত করতে হয় এবং আমলাতন্ত্র ছাড়াই আমরা কীভাবে কাজ চালাতে পারি, আমেরিকা ও প্রথম ফরাসী প্রজাতন্ত্র আমাদের তা দেখিয়েছে এবং অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশ আজও দেখাচ্ছে। এই ধরনের এক প্রাদেশিক ও সম্প্রদায়গত স্বশাসন, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, সুইস ফেডারেলতন্ত্র থেকে অনেক বেশি মুক্ত; একথা সত্যি যে সুইস ফেডারেলতন্ত্রে, ফেডারেশনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অঞ্চল খুবই স্বাধীন, কিন্তু জেলা ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তা স্বাধীন। আঞ্চলিক সরকারগুলি জেলা শাসক ও প্রিফেক্টদের নিযুক্ত করে, যা ইংরেজিভাষী দেশগুলিতে অজ্ঞাত এবং আমরা যা এখানে ভবিষ্যতে বিলুপ্ত করতে চাই প্রুশীয় ল্যান্ডর‍্যাট আর রেগিরুঙ্গসরাটের মতোই।

সম্ভবত এই সব বিষয়ের খুব কমই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আমি এগুলি উল্লেখ করছি প্রধানত জার্মানির ব্যবস্থা বর্ণনা করার জন্যও, যেখানে এই সব বিষয় প্রকাশ্যে আলোচনা করা যায় না এবং যারা এরকম একটি ব্যবস্থাকে বৈধ উপায়ে এক কমিউনিস্ট সমাজে রূপান্তরিত করতে

চায় তাদের আত্মপ্রবঞ্চনার উপরে জোর দেওয়ার জন্যও। তদুপরি, আমি পার্টি কার্যনির্বাহীকে একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে আইন প্রণয়ন আর বিনামূল্যে বিচার ছাড়াও — এগুলি না হলেও আমরা শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারব — অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন রয়েছে। সাধারণভাবে অস্থিতিশীল এই অবস্থায় এই প্রশ্নগুলি যেকোনো সময়ে জরুরী হয়ে উঠতে পারে; এগুলি নিয়ে যদি আমরা আগেই আলোচনা না-করে থাকি এবং সে সম্পর্কে যদি মতৈক্য না-হয়ে থাকে, তখন তাহলে কী হবে?

যাই হোক, কর্মসূচিতে যা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং যে কথা সরাসরি বলা যাবে না, অন্তত পরোক্ষভাবে তার ইঙ্গিত হিসেবে কাজ করতে পারে তা হল নিম্নলিখিত দাবি:

'সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের মারফৎ প্রদেশসমূহে, জেলা ও সম্প্রদায়গুলিতে পরিপূর্ণ স্বশাসন। রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত সমস্ত স্থানীয় ও প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের বিলোপসাধন।'

উপরে আলোচিত বিষয়গুলি প্রসঙ্গে অন্যান্য কর্মসূচিগত দাবি সূত্রায়িত করা সম্ভব কি না, সেটা আপনারা ওখানে বসে যতটা বিচার করতে পারবেন, এখানে আমি তার চাইতে কম পারব। কিন্তু বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই পার্টির ভিতরে এই প্রশ্নগুলি নিয়ে বিতর্ক বাঞ্ছনীয় হবে।

১। যথাক্রমে 'নির্বাচনের অধিকার ও ভোটদানের অধিকারের' মধ্যে, 'নির্বাচন ও ভোটদানের' মধ্যে পার্থক্য আমি বুঝতে পারছি না। এরূপ প্রভেদ করা যদি দরকারই হয় তাহলে আরও পরিষ্কার করে তা প্রকাশ করা উচিত কিংবা খসড়ার সঙ্গে সংযোজিত এক ভাষ্যে ব্যাখ্যা করা উচিত।

২। 'জনগণের প্রস্তাব করার ও বাতিল করার অধিকার'। **কী প্রস্তাব করার ও বাতিল করার?** সমস্ত আইন অথবা জনপ্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত — একথা যোগ করা উচিত।

৫। রাষ্ট্র থেকে গির্জার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ। ব্যতিক্রমহীনভাবে সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাষ্ট্র আচরণ করবে ব্যক্তিগত সমিতির মতো। সরকারী তহবিল থেকে কোনোরূপ সমর্থন এবং সর্বসাধারণের স্কুলগুলির*

*ব্যক্তিগত স্কুলের বিপরীতে। — সম্পাঃ

উপরে সমস্ত প্রভাব থেকে তাদের বঞ্চিত করা হবে। (তাদের **নিজেদের** অর্থে **নিজেদের** স্কুল তৈরি করা এবং সেখানে তাদের নিজেদের আবোল-তাবোল শিক্ষা দেওয়া থেকে তাদের নিবৃত্ত করা যায় না।)

৬। সে ক্ষেত্রে 'শিক্ষায়তনের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র' সংক্রান্ত বিষয়টি আর ওঠে না, কারণ এটি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের সঙ্গে সম্পর্কিত।

৮। ও ৯। এখানে আমি নিম্নলিখিত বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই: এই বিষয়গুলি দাবি করে যে রাষ্ট্রকে অধিগ্রহণ করতে হবে এইগুলি: ১) **ওকালতি ব্যবসায়,** ২) **চিকিৎসা-ব্যবস্থা,** ৩) **ঔষধ-প্রস্তুতবিদ্যা, দন্তচিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা, নার্সিং** ইত্যাদি, ইত্যাদি, এবং পরে দাবি তোলা হয় যে শ্রমিকদের বীমাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব করা হোক। এই সমস্ত কাজের ভার কি হের ফন কাপ্রিভির উপরে ন্যস্ত করা যায়? এবং তা কি উপরে কথিত সমস্ত রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র বাতিলের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ?

১০। এখানে আমি বলব: 'তার জন্য যতদূর পর্যন্ত কর দরকার, ততদূর পর্যন্ত রাষ্ট্র, জেলা ও সম্প্রদায়ের সমস্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রগতিশীল... কর। সমস্ত পরোক্ষ রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় কর, শুল্ক প্রভৃতির বিলোপসাধন।' বাকিটা প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাষ্য কিংবা উদ্দেশ্যবর্ণনা, এর অন্তফলকে যা দুর্বল করে ফেলে।

৩। অর্থনৈতিক দাবি

২ নং বিষয়ে। **রাষ্ট্রের** কাছ থেকেও সমিতি গঠনের অধিকারের নিশ্চিতি জার্মানিতে যত বেশি দরকার, তেমনটি আর কোথাও নয়।

শেষ বাক্যাংশটি: 'নিয়ন্ত্রণের জন্য', ইত্যাদি **৪ নং বিষয় হিসেবে** যোগ করা উচিত এবং তদনুরূপ আকার দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে অর্ধেক সংখ্যক শ্রমিক ও অর্ধেক সংখ্যক উদ্যোগপতিদের নিয়ে গঠিত শ্রম চেম্বারগুলিতে আমরা বেশ ভালোভাবেই প্রতারিত হব। আগামী বহু বছর উদ্যোগপতিরা সবসময়েই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে, কারণ শ্রমিকদের মধ্যে একটিমাত্র কুলাঙ্গারই তার জন্য দরকার হবে। এবিষয়ে যদি আগে না-বলা হয় যে বিরোধ হলে **উভয় অর্ধই পৃথক** মতামত ব্যক্ত করবে, তাহলে

উদ্যোগপতিদের একটি কক্ষ এবং **অধিকন্তু শ্রমিকদের এক স্বতন্ত্র কক্ষ** থাকাই অনেক ভালো হবে।

উপসংহারে আমি অনুরোধ করতে চাই যে খসড়াটি আর একবার ফরাসী কর্মসূচির (৯৭) সঙ্গে তুলনা করে দেখা হোক, তাতে মনে হয় বিশেষ করে তৃতীয় অংশের জন্যই আরও ভালো কিছু আছে। সময়াভাবে, দুর্ভাগ্যবশত, স্প্যানিশ কর্মসূচিটি (৯৮) আমি খুঁজতে পারছি না, সেটিও অনেক দিক দিয়ে বেশ ভালো।

প্রথম অংশের পরিশিষ্ট

১। 'খনিগহ্বর, খাত' বাদ — 'রেলপথ ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়' যোগ করা উচিত।

২। শ্রমের সামাজিক উপায়সমূহ তার উপযোজকদের (অথবা তার মালিকদের) হাতে শোষণের উপায় হয়ে উঠেছে। শ্রমের উপায়সমূহের, অর্থাৎ তার দ্বারা শর্তাবদ্ধ, জীবিকার উপায়সমূহের উপযোজক কর্তৃক শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অধীনতাই সবধরনের দাসত্বের: সামাজিক দুর্দশা, মানসিক অধঃপতন ও রাজনৈতিক নির্ভরতার ভিত্তি।

৩। এই শোষণে শোষিতদের দ্বারা সৃষ্ট সম্পদ ক্রমবর্ধমান দ্রুতগতিতে কেন্দ্রীভূত হয় শোষকদের — পুঁজিপতি ও বৃহৎ ভূস্বামীদের হাতে; শোষক ও শোষিতদের মধ্যে শ্রমের উৎপন্ন ফলের বণ্টন আরও বেশি অসম হয়ে ওঠে, এবং প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা ও তার নিরাপত্তাহীনতা আরও বেড়ে যায়, ইত্যাদি।

৪। **'ব্যক্তিগত'** (উৎপাদন-ব্যবস্থা) বাদ... শহুরে ও গ্রামীণ মধ্য স্তর, পেটি বুর্জোয়া ও ছোট কৃষকদের ধ্বংসের দরুন অবনতি হয়, বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যেকার গহ্বরকে আরও বেশি বিস্তৃত (অথবা গভীর) করে তোলে, সাধারণ নিরাপত্তাহীনতাকে সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা করে তোলে এবং প্রমাণ করে যে শ্রমের সামাজিক উপায়সমূহের উপযোজকরা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দক্ষতা ও যোগ্যতা হারিয়েছে।

৫। 'তার' কারণ।

৬। ...এবং ব্যক্তি বা জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানিগুলির তরফে পুঁজিবাদী

উৎপাদনের সামগ্রিকভাবে সমাজের তরফে এবং এক পূর্বচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে রূপান্তর, যে রূপান্তরের জন্য পুঁজিবাদী সমাজ নিজেই বৈষয়িক ও আত্মিক শর্তগুলি সৃষ্টি করে, এবং একমাত্র এরই দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি ও তার সঙ্গে ব্যতিক্রমহীনভাবে সমাজের সকল সদস্যের মুক্তি অর্জন করা যাবে।

৭। শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি শুধু শ্রমিক শ্রেণীরই নিজের কাজ হতে পারে। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে শ্রমিক শ্রেণী তার মুক্তির ভার তার বিরুদ্ধবাদী ও শোষক, পুঁজিপতি ও বৃহৎ ভূস্বামীদের হাতে, কিংবা বড় শোষকদের তরফ থেকে প্রতিযোগিতায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাদের সামনে শোষকদের দলে অথবা শ্রমিকদের দলে যোগ দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না সেই পেটি বুর্জোয়া ও ছোট কৃষকদের হাতে ছেড়ে দিতে পারে না।

৮। ...নিজেদের শ্রেণী-অবস্থান সম্পর্কে সচেতন শ্রমিকদের সঙ্গে, ইত্যাদি।

৯। ...রাখে ...এবং তার দ্বারা সেই একই হাতে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক নিপীড়নকে কেন্দ্রীভূত করে।

১০। ...শ্রেণী-শাসন ও শ্রেণীগুলির নিজেদেরই এবং সকলের সমান অধিকার ও সমান কর্তব্যের জন্য, ...বংশোদ্ভব ছাড়াই ইত্যাদি... (শেষটুকু বাদ)। মানবজাতির ...জন্য তার সংগ্রামে তাকে বাধা দেয় জার্মানির পশ্চাৎপদ রাজনৈতিক অবস্থা। প্রথমত ও প্রধানত, তাকে আন্দোলনের জন্য স্থান অধিকার করে নিতে হবে, সামন্ততন্ত্র ও সার্বভৌমতন্ত্রের সুবিশাল অবশেষ-গুলির বিলুপ্তি ঘটাতে হবে, সংক্ষেপে, জার্মান বুর্জোয়া পার্টিগুলি যে কাজ সম্পন্ন করার পক্ষে অতি কাপুরুষ ছিল এবং এখনও আছে, সেই কাজ করতে হবে। অতএব তাকে, অন্তত বর্তমানে তার কর্মসূচিতে এমন সব দাবিও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, অন্যান্য সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশে যেগুলি বুর্জোয়া শ্রেণী ইতিমধ্যেই রূপায়িত করেছে।

১৮ থেকে ২৯ জুন, ১৮৯১-এর মধ্যে লিখিত

জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

প্রথম প্রকাশ (পরিশিষ্ট ছাড়া):
Die Neue Zeit, খণ্ড ১, সংখ্যা ১,
১৯০১-১৯০২

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বইয়ের ভূমিকা

যে বইটির ইংরেজি অনুবাদ বর্তমানে পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে, জার্মানিতে তা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৫ সালে। লেখক সে সময় ছিলেন তরুণ, ২৪ বছর বয়স, এবং সেই তারুণ্যের ছাপ ভালো এবং মন্দ দিক মিলিয়ে তাঁর লেখায় পরিস্ফুট। এর ভালো বা মন্দ কোনো দিকের জন্যই লেখক লজ্জিত নন। ১৮৮৬ সালে জনৈকা আমেরিকান মহিলা, শ্রীমতী ফ্লোরেন্স কেলি-ভিশ্‌নেভেৎস্কি কর্তৃক বইটি ইংরেজিতে অনূদিত এবং পরের বছর নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত হয়। আমেরিকান সংস্করণটি আটলান্টিকের এপারে খুব ব্যাপকভাবে প্রচারিতও হয় নি, আর তাছাড়া বর্তমানে সেটি নিঃশেষ হয়ে গেছে বললেই হয়, তাই সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের পূর্ণসম্মতিক্রমে বর্তমান সর্বস্বত্বসংরক্ষিত ইংরেজি সংস্করণটি প্রকাশ করা হচ্ছে।

আমেরিকান সংস্করণটির জন্য লেখক ইংরেজি ভাষায় একটি নতুন ভূমিকা এবং একটি পরিশিষ্ট লিখে দেন। প্রথমটির সঙ্গে বইয়ের বিষয়বস্তুর বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না; তাতে তদানীন্তন আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের বিষয় আলোচনা করা হয়েছিল। তাই বর্তমান সংস্করণে অপ্রাসঙ্গিক বোধে সেটি বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি — মূল ভূমিকাটি — অনেকখানি ব্যবহার করা হয়েছে বর্তমান মুখবন্ধে।

ইংলণ্ডের কথা বিচার করলে, এই বইয়ে বর্ণিত অবস্থা বর্তমানে বহুদিক থেকে অতীতে পর্যবসিত হয়েছে। আমাদের কোনো প্রচলিত

পুঁথিতে স্পষ্টভাবে স্বীকার না করলেও আধুনিক অর্থশাস্ত্রে আজ এ নিয়ম বলবৎ যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন যত বৃহদায়তনে চলে, ততই ছোটখাট চুরি-জোচ্চুরির নানা কৌশল — যা তার প্রাথমিক স্তরের বৈশিষ্ট্য, — সেগুলিকে সমর্থন করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ইউরোপে ব্যবসার সর্বনিম্ন স্তরের প্রতিনিধি, পোলীয় ইহুদির যেসব ছ্যাঁচড়া ব্যবসা-কৌশল নিজের দেশে বেশ কার্যকর এবং সাধারণভাবে প্রচলিত, বার্লিন বা হাম্‌বুর্গে এসে সে দেখে সেগুলিই আবার নিতান্ত সেকেলে এবং অকেজো হয়ে পড়েছে। এবং ঠিক তেমনিই আবার, হাম্‌বুর্গ বা বার্লিন থেকে আগত ইহুদি বা খ্রীষ্টান দালালদেরও ম্যাঞ্চেস্টারের শেয়ার-বাজারে কয়েকমাস ঘুরে এ চৈতন্য হয় যে, কাপাসের সুতো বা কাপড় সস্তায় কিনতে হলে তাদেরও ঐসব সামান্য পালিশ করা কিন্তু আসলে হীন ফন্দী-ফিকির ও অপকৌশলগুলি পরিত্যাগ করাই শ্রেয়, যদিও তাদের নিজেদের দেশে এগুলিই বুদ্ধিমত্তার পরাকাষ্ঠা বলে বিবেচিত হয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, কোনো বড়রকমের বাজারে, যেখানে সময়ই টাকা, যেখানে কেবলমাত্র সময় এবং ঝামেলা বাঁচাবার জন্যই ব্যবসাগত নীতির একটা মান অনিবার্যভাবেই গড়ে ওঠে, সেখানে ঐসব কৌশল আর কাজ দেয় না। কারখানা মালিক আর তার মজুরদের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

১৮৪৭ সালের সংকটের পর, ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন থেকে এক নতুন শিল্পযুগের উন্মেষ হয়। ইংলন্ডের শিল্প ও বাণিজ্য যে খোলা জমি চেয়েছিল, শস্য আইন (৯৯) বাতিল ও তার পরবর্তী বিভিন্ন আর্থিক সংস্কারের ফলে তা পেয়ে গেল। তারপরই একের পর এক দ্রুতগতিতে এল কালিফোর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণখনি আবিষ্কার। বিভিন্ন ঔপনিবেশিক বাজারে ইংলন্ডের শিল্পজাত পণ্য গ্রহণের ক্ষমতা দ্রুতহারে বেড়ে চলল। ভারতে লক্ষ লক্ষ তন্তুবায় অবশেষে ল্যাংকাশায়ারের যন্ত্রচালিত তাঁতের দ্বারা ধ্বংস হয়ে গেল। ক্রমেই বেশি করে উন্মুক্ত হতে থাকল চীন। সর্বোপরি, যে যুক্তরাষ্ট্র তখনও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে ঔপনিবেশিক বাজার মাত্র, কিন্তু সবচেয়ে বড় বাজার, সেখানে এই দ্রুতবিকাশশীল দেশের

পক্ষেও বিস্ময়কর এক অর্থনৈতিক উন্নতি দেখা দিল। এবং অবশেষে, পূর্ববর্তী যুগে প্রবর্তিত নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলি — রেলপথ ও সমুদ্রগামী স্টিমার — এখন আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সংগঠিত হল; তারই ফলে, এতদিন যে বিশ্ববাজারের সুপ্ত সম্ভাবনামাত্র ছিল তা বাস্তবিক রূপ নিল। গোড়াতে এই বিশ্ববাজার ছিল একটি শিল্পকেন্দ্র ইংলন্ডকে ঘিরে কয়েকটি প্রধানত বা সম্পূর্ণত কৃষিপ্রধান দেশ নিয়ে গঠিত। ইংলন্ডই এদের উদ্বৃত্ত অপরিমার্জিত পণ্যের বেশির ভাগটা নিত এবং পরিবর্তে এদের শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার অধিকাংশও সরবরাহ করত। তাই শিল্পক্ষেত্রে ইংলন্ডের যে এমন বিপুল ও অতুলনীয় অগ্রগতি হল, যার তুলনায় ১৮৪৪-এর অবস্থাও আজ আমাদের কাছে আদিম ও তুচ্ছ মনে হচ্ছে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এবং যে-অনুপাতে এই অগ্রগতি হল, বৃহদায়তন শিল্পও ততই নীতিনিষ্ঠ হয়ে উঠল বলে মনে হল। মজুরদের কাছ থেকে ছ্যাঁচড়া চুরি করে মালিকে মালিকে প্রতিযোগিতায় আর কোন লাভ রইল না। টাকা করার এই হীন পথকে ব্যবসা ইতিমধ্যে অতিক্রম করে এসেছে; লক্ষপতি মালিকের আর এসব কাজ পোষায় না, যেকোনো রকমে এক-আধ পয়সা করে নিতে পারলেই যেসব ছোট ব্যবসায়ীরা সন্তুষ্ট, তাদেরই মধ্যে প্রতিযোগিতা জীইয়ে রাখা ছাড়া এসবের আর কোনো উপযোগিতা রইল না। এইভাবে মাল দিয়ে শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধের প্রথা [truck-system] দমন করা হল, দশ ঘণ্টা কাজের আইন পাশ হল (১০০), আরও একাধিক ছোটখাট সংস্কার প্রবর্তিত হল। এ ব্যবস্থাগুলি অবাধ বাণিজ্য ও বল্গাহীন প্রতিযোগিতার একান্ত বিরোধী, কিন্তু ঠিক সেই পরিমাণেই কম সৌভাগ্যশালী ভাইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অতিকায় পুঁজিপতির অনুকূল। উপরন্তু, প্রতিষ্ঠান যত বড়, এবং তার সঙ্গে কর্মরত লোকের সংখ্যা যত বেশি, মালিক ও মজুরের মধ্যে প্রতিটি বিরোধে ক্ষতি ও অসুবিধার পরিমাণও ততই বেশি। আর এইভাবেই মালিকদের মধ্যে, বিশেষত বড় মালিকদের মধ্যে এক নতুন মনোভাব দেখা দিল, তারা অপ্রয়োজনীয় বিবাদ-বিসংবাদ এড়াতে, ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব ও ক্ষমতা মেনে নিতে এবং শেষ পর্যন্ত, সুবিধামতো সময়ে হলে এমন কি ধর্মঘটের মধ্যেও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির

শক্তিশালী উপায় আবিষ্কার করতে শিখল। গোড়ার দিকে যে বৃহত্তম শিল্পপতিরাই ছিল শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নায়ক তারাই এবার শান্তি ও সামঞ্জস্য প্রচারে অগ্রণী হয়ে উঠল। তার কারণও ছিল। ন্যায় ও হিতৈষার বেদীমূলে এতসব ত্যাগ প্রকৃতপক্ষে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ত্বরান্বিত করার উপায় ছাড়া এবং তাদের যেসব ছোট ছোট প্রতিযোগীরা এই ধরনের উপরি পাওনা ছাড়া আয়ব্যয়ের সমতারক্ষা করতে পারে না, তাদের আরও সহজে এবং নিরাপদে চূর্ণ করার উপায় ছাড়া আর কিছু নয়। এদের কাছে আগেকার মতো যৎসামান্য অতিরিক্ত জবরদস্তি আদায়ের কোনো গুরুত্ব আর রইল না, বরং সেগুলো বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এইভাবে, প্রথম দিকে যেসব ছোটখাট অভাব-অভিযোগ শ্রমিকদের অবস্থাকে আরও বিষময় করে তুলত, সেগুলি দূর করার পক্ষে পুঁজিবাদী ভিত্তিতে উৎপাদন বিকাশটাই যথেষ্ট বলে দেখা গেল, অন্তত প্রধান প্রধান শিল্পের ক্ষেত্রে, কেননা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব পূর্ণ শাখায় অবস্থাটা মোটেই অনুরূপ নয়। এবং শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশার কারণ যে এই ছোটখাট অভাব-অভিযোগের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যাবে **পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই মধ্যে,** এই মহৎ কেন্দ্রীয় সত্যটা এইভাবেই ক্রমে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মজুরি-শ্রমিক দৈনিক একটা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে পুঁজিপতির কাছে তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করে। কয়েক ঘণ্টা কাজের পরই সে সেই অর্থের মূল্য পুনরুৎপাদন করে ফেলে; কিন্তু শ্রমদিন পূরণ করার জন্য তাকে পরপর আরও কয়েক ঘণ্টা কাজ করতে হবে, এই হচ্ছে তার চুক্তির সারকথা, এবং এই উদ্বৃত্ত শ্রমের অতিরিক্ত ঘণ্টাগুলিতে সে যে মূল্য উৎপাদন করে সেটাই হচ্ছে উদ্বৃত্ত মূল্য, এর জন্য পুঁজিপতিকে কোনো দাম দিতে হয় না, অথচ এটা তার পকেটে যায়। যে ব্যবস্থা সভ্য সমাজকে এক দিকে উৎপাদন ও জীবনধারণের সমস্ত উপায়ের মালিক, মুষ্টিমেয় কয়েক জন রথ্‌সচাইল্ড ও ভ্যান্ডারবিল্ট এবং অন্য দিকে নিজেদের শ্রমশক্তি ছাড়া আর কিছুরই মালিক নয় এমন অগণিত মজুরি-শ্রমিকের মধ্যে বিভক্ত করে দিচ্ছে, এই হচ্ছে সেই ব্যবস্থার ভিত্তি। ১৮৪৭ সাল থেকে ইংলন্ডে পুঁজিবাদের বিকাশ এই সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে যে, এ কোনো ছোটখাট অভাব-অভিযোগের ফল নয়, ব্যবস্থারই ফল।

আবার, কলেরা, টাইফাস, বসন্ত প্রভৃতি মহামারির বারবার প্রাদুর্ভাব ব্রিটিশ বুর্জোয়াকে শিখিয়েছে যে, নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে এইসব রোগের কবল থেকে বাঁচাতে হলে তার ছোটবড় শহরগুলির জন্য স্বাস্থ্যরক্ষা-ব্যবস্থার জরুরী প্রয়োজন। তাই এই বইয়ে বর্ণিত সবচেয়ে তীব্র অনাচারগুলি হয় অদৃশ্য হয়েছে, নয়তো তেমন চোখে পড়ে না। জলনিকাশ ব্যবস্থার প্রবর্তন বা উন্নয়ন হয়েছে; আমি যেসব অতিজঘন্য বস্তির বিবরণ দিতে বাধ্য হয়েছিলাম, তার অনেকগুলির উপর দিয়ে চওড়া রাস্তা পাকা হয়েছে। 'ছোট আয়র্ল্যান্ড' অদৃশ্য হয়েছে এবং উচ্ছেদ তালিকায় এরপরই 'সেভেন ডায়ালসের' (১০১) স্থান। কিন্তু তাতে কী হল? ১৮৪৪-এ যেসব পাড়াকে আমি কাব্যময় বলে বর্ণনা করতে পেরেছিলাম, শহরের কলেবরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেসব পাড়ার অনেকগুলিই আজ সেই একই জীর্ণতা, অসুবিধা ও দুর্দশার মধ্যে নেমে এসেছে। তফাৎ কেবল এই যে, আজকাল আর শুয়োর বা আবর্জনার স্তূপ বরদাস্ত করা হয় না। শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশাকে ঢাকা দেবার কৌশলে বুর্জোয়া শ্রেণী আরও অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর বাসস্থানের ব্যাপারে বিশেষ কোনো উন্নতি যে হয় নি তা 'গরিবদের গৃহ-ব্যবস্থা সম্পর্কে' ১৮৮৫-এর রাজকীয় কমিশনের রিপোর্টেই বেশ প্রমাণিত হয়েছে। অন্যান্য ব্যাপারেও সেই একই অবস্থা। পুলিসী বিধি নির্দেশের খুবই ছড়াছড়ি, কিন্তু তা দিয়ে শ্রমিকদের দুরবস্থাকে বেড়াবন্দী করে রাখা যেতে পারে, দূর করা যায় না।

পুঁজিবাদী শোষণের যৌবনের যে বর্ণনা আমি দিয়েছি, ইংলণ্ড এইভাবে তাকে অতিক্রম করে গেলেও অন্যান্য দেশ সবেমাত্র সে স্তরে পৌঁছেছে। ফ্রান্স, জার্মানি এবং বিশেষত আমেরিকা আজ বিপজ্জনক প্রতিযোগী, — ১৮৪৪ সালেই আমি এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, — তারা শিল্পজগতে ইংলণ্ডের একাধিপত্যকে ক্রমেই বেশি করে ভেঙে দিচ্ছে। ইংলণ্ডের তুলনায় এদের শিল্প নবীন, কিন্তু সে শিল্প বাড়ছে ইংলণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত হারে; এবং লক্ষণীয় এই যে, ঠিক বর্তমানে তারা ১৮৪৪-এর ইংরেজ শিল্পের প্রায় সমপর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আমেরিকার কথা ধরলে, এই তুলনা সত্যই খুব চোখে লাগে। একথা সত্য যে, আমেরিকায় শ্রমিক শ্রেণী

যে বহিঃপরিবেশের মধ্যে আছে তা অনেক স্বতন্ত্র, কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই একই অর্থনৈতিক নিয়ম কাজ করে চলেছে, তার ফলও সর্ববিষয়ে একেবারে এক না হলেও মোটামুটি একধরনের হতে বাধ্য। তাই আমরা আমেরিকায়ও দেখছি হ্রস্বতর শ্রমদিনের জন্য, আইনের দ্বারা কাজের সময়, বিশেষত কারখানায় নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের বেলায়, বেঁধে দেওয়ার জন্য সেই একই সংগ্রাম চলেছে; ট্রাক-সিসটেমের পূর্ণ বিকাশ দেখা যাচ্ছে এবং 'কর্তারা' শ্রমিকদের উপর আধিপত্য বিস্তারের উপায় হিসেবে গ্রামাঞ্চলে 'কুটির প্রথার' (১০২) সুযোগ নিচ্ছে। ১৮৮৬ সালে, কনেলস্‌ভিল জেলায় ১২,০০০ পেনসিলভানিয়ান কয়লা খনি-শ্রমিকের বিরাট ধর্মঘটের (১০৩) বিবরণ সংবলিত আমেরিকান সংবাদপত্রগুলি পেয়ে আমার মনে হল যেন উত্তর ইংলন্ডের কয়লা-শ্রমিকদের ১৮৪৪-এর ধর্মঘট সম্পর্কে আমার নিজেরই লেখা বিবরণ পড়ছি।* ভুল বাটখারার সাহায্যে শ্রমজীবী মানুষকে ঠকাবার সেই একই ব্যবস্থা; সেই একই ট্রাক-সিসটেম; শ্রমিকদের বাসগৃহ থেকে, অর্থাৎ কোম্পানির মালিকানাধীন কুটিরগুলি থেকে উচ্ছেদ — মালিকদের এই শেষ, কিন্তু অমোঘ হাতিয়ার প্রয়োগ করে খনি-শ্রমিকদের প্রতিরোধ চূর্ণ করার সেই একই প্রচেষ্টা।

বর্তমান অনুবাদে বইটিকে আমি সময়োপযোগী করার বা ১৮৪৪-এর পর যেসব পরিবর্তন ঘটেছে তা বিশদে বিবৃত করার কোনো চেষ্টা করি নি। করি নি দুটি কারণে: প্রথমত, তা ভালো করে করতে গেলে বইখানির কলেবর দ্বিগুণ বেড়ে যাবে, এবং দ্বিতীয়ত, কার্ল মার্কস রচিত 'পুঁজি' বইটির প্রথম খণ্ডে, তার একটা ইংরেজি অনুবাদ বাজারে আছে, তাতে ১৮৬৫ সাল নাগাদ, অর্থাৎ ব্রিটিশ শিল্প সমৃদ্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে বেশ অনেকখানি বর্ণনা রয়েছে। ফলে, মার্কসের বিখ্যাত বইটিতে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে আমার আবার সেই সব বিষয়ই আলোচনা করতে হত।

একথা উল্লেখের বোধহয় বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই যে, এই বইয়ে সাধারণ তাত্ত্বিক — দার্শনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক — যে দৃষ্টিভঙ্গি

---

* ফ. এঙ্গেলস, 'ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা'। — সম্পাঃ

প্রকাশ পেয়েছে, তার সঙ্গে আমার আজকের দৃষ্টিভঙ্গির সর্বত্র মিল নেই। আধুনিক আন্তর্জাতিক যে সমাজতন্ত্র, প্রধানত মার্কসের প্রায় একক চেষ্টার ফলে, বিজ্ঞানরূপে পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে, তার অস্তিত্ব ১৮৪৪-এ ছিল না। আমার এই বইখানি তারই ভ্রূণাবস্থার এক পর্যায় মাত্র; এবং মানব-ভ্রূণের প্রথমাবস্থায় যেমন তার মৎস্য পূর্বপুরুষদের ফুলকোর বেষ্টনী অস্থি পুনরাবির্ভূত হয়, তেমনি আধুনিক সমাজতন্ত্রের অন্যতম পূর্বপুরুষ — জার্মান দর্শন থেকে উদ্ভবের চিহ্নও এই বইয়ে সর্বত্র পরিস্ফুট। যেমন, কমিউনিজম শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিগত মতবাদমাত্র নয়, বরং পুঁজিপতি শ্রেণী সমেত সমস্ত সমাজের বর্তমান সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে মুক্তির একটি তত্ত্ব — এই কথার ওপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। কথাটা বিমূর্তভাবে দেখলে নিশ্চয়ই ঠিক, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে অর্থহীন এবং অনেক সময় তার চেয়েও খারাপ। বিত্তবান শ্রেণীগুলি যতদিন মুক্তির প্রয়োজন অনুভব না করে, উপরন্তু শ্রমিক শ্রেণীর নিজ মুক্তি সাধনে প্রাণপণে বাধা দেয়, ততদিন শ্রমিক শ্রেণীকে একাই সমাজবিপ্লবের প্রস্তুতি এবং সংগ্রাম করতে হবে। ১৭৮৯ সালে ফরাসী বুর্জোয়ারাও ঘোষণা করেছিল যে, বুর্জোয়াদের মুক্তিই সমগ্র মানবসমাজের মুক্তি; কিন্তু অভিজাতরা এবং পাদ্রীরা সেকথা বুঝতে চায় নি; সাময়িকভাবে, সামন্ততন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপাদ্যটি বিমূর্ত ঐতিহাসিক সত্য হলেও অল্পদিনের মধ্যে তা নিতান্তই ভাবপ্রবণতায় পরিণত হল এবং বিপ্লবী সংগ্রামের আগুনে একেবারেই মিলিয়ে গেল। আর বর্তমানে, যেসব লোক নিজেদের উঁচু দৃষ্টিভঙ্গির 'নিরপেক্ষতা' থেকে শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-স্বার্থ ও শ্রেণী-সংগ্রামের বহু ঊর্ধ্বে দণ্ডায়মান এবং উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীর স্বার্থকে মহত্তর মানবতার মধ্যে মিলিয়ে দেবার জন্য সচেষ্ট এক সমাজতন্ত্রের বাণী প্রচার করে, তারা হয় নিতান্তই আনাড়ী এবং তাদের অনেক কিছু শেখার বাকি, নয়তো তারা শ্রমিকের নিকৃষ্ট শত্রু — ভেড়ার ছদ্মবেশে নেকড়ে বাঘ।

লেখার মধ্যে মহা শিল্প-সংকটের পুনরাবৃত্তিকাল পাঁচ বছর বলা হয়েছে। ১৮২৫ থেকে ১৮৪২-এর ঘটনাবলীর বিচারে বাহ্যত এইরকমই মনে হয়েছিল, কিন্তু ১৮৪২ থেকে ১৮৬৮-এর শিল্প-ইতিহাস প্রমাণ

করেছে যে, আসল পুনরাবৃত্তিকাল হচ্ছে ১০ বছর; অন্তর্বর্তীকালীন ধাক্কাগুলি ছিল গৌণ এবং ক্রমে আরও মিলিয়ে যাবার দিকেই তাদের ঝোঁক। ১৮৬৮ সালের পর আবার পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। সে সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা করা যাবে।

এই লেখায় যৌবনসুলভ উৎসাহবশে আমি একাধিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, তার মধ্যে একটি ছিল ইংলন্ডে সমাজবিপ্লবের আসন্নতা সম্পর্কে; বর্তমান সংস্করণে সেগুলি যাতে বাদ না পড়ে সেবিষয়ে আমি নজর রেখেছি। ভবিষ্যদ্বাণীর বেশ কয়েকটিই যে ভুল প্রমাণিত হয়েছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, বরং তার মধ্যে এতগুলি যে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে এবং ইউরোপের মূল ভূখন্ডের, বিশেষত আমেরিকার প্রতিযোগিতার ফলে ইংলন্ডের বাণিজ্যে সংকট দেখা দেবে বলে আমি যে কথা বলেছিলাম তা যে, তত দ্রুত না হলেও, বাস্তবে পরিণত হয়েছে, এইটাই আশ্চর্যের কথা। এই প্রসঙ্গে লন্ডনের *Commonweal* (১০৪) পত্রিকার ১ মার্চ, ১৮৮৫, সংখ্যায় '১৮৪৫ ও ১৮৮৫-এর ইংলন্ড' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি আমি প্রকাশ করেছিলাম সেটি এখানে উপস্থিত করে বর্তমান লেখাটিকে সময়োপযোগী করা সম্ভব এবং একান্ত কর্তব্য। ঐ প্রবন্ধে ইংলন্ডের শ্রমিক শ্রেণীর এই ৪০ বছরের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রও পাওয়া যাবে। প্রবন্ধটি নিচে দেওয়া হল:

'৪০ বছর আগে ইংলন্ড এক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, সব কিছু দেখে মনে হচ্ছিল যে বলপ্রয়োগ ছাড়া সে সংকটের সমাধান অসম্ভব। শিল্প-উৎপাদনের বিপুল ও দ্রুত বিকাশ তখন বিদেশী বাজারের বিস্তার ও চাহিদার বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রতি দশ বছর অন্তর একটা সর্বব্যাপী বাণিজ্য বিপর্যয় শিল্পের অগ্রগতি প্রচন্ড ব্যাহত করেছিল, তাকে অনুসরণ করে আসছিল কয়েক বছরের একটানা মন্দার পর সামান্য কয়েক বছরের সমৃদ্ধি এবং প্রতিবারই তার পরিণামে উন্মত্ত অতিরিক্ত উৎপাদন এবং তার ফলে নূতনতর ভাঙন। পুঁজিপতি শ্রেণী শস্যে অবাধ বাণিজ্য প্রবর্তনের জন্য কলরব করছিল এবং শহরের বুভুক্ষু জনতাকে তারা যেখান থেকে এসেছিল সেই গ্রামাঞ্চলে, জন ব্রাইটের ভাষায় অন্নের

ভিখারী নিঃস্বরূপে নয়, শত্রুদেশ দখলকারী সেনাদলের মতো, ফেরৎ পাঠিয়ে জোর করে ঐ দাবি প্রতিষ্ঠার হুমকি দিচ্ছিল। শহরের শ্রমজীবী জনতা দাবি করল রাজনৈতিক ক্ষমতায় তাদের ভাগ — জনগণের সনদ (১০৫); তাদের সমর্থন করল ছোট ব্যবসায়ী শ্রেণীর অধিকাংশ, দুপক্ষের মধ্যে মতভেদ ছিল শুধু এই বিষয়ে যে, শারীরিক বলপ্রয়োগে সনদ হাসিল করা হবে, না নৈতিক বলপ্রয়োগে। তারপর এল ১৮৪৭-এর বাণিজ্য বিপর্যয়, আয়ার্ল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষ এবং এ-দুয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের সম্ভাবনা।

'১৮৪৮-এর ফরাসী বিপ্লব ইংরেজ মধ্য শ্রেণীকে বাঁচিয়ে দিল। বিজয়ী ফরাসী শ্রমিকদের সমাজতন্ত্রী ঘোষণাবলী ইংলণ্ডের ছোট মধ্য শ্রেণীকে ভয় পাইয়ে দিল এবং ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর সংকীর্ণতর কিন্তু বেশি ব্যবহারিক আন্দোলনকে বিশৃঙ্খল করে দিল। যে সময় সর্বশক্তিতে চার্টিস্ট মতবাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা করার কথা, ঠিক সেই সময়, ১৮৪৮-এর ১০ এপ্রিল তারিখের বাহ্য মৃত্যুর আগেই (১০৬) তার অভ্যন্তরীণ মৃত্যু ঘটল। শ্রমিক শ্রেণীর কর্মতৎপরতা পিছনে সরে গেল। গোটা রণসীমান্ত জুড়ে জয় হল পুঁজিপতি শ্রেণীর।

'১৮৩১-এর রিফর্ম বিলে (১০৭) ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণীর উপর সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর জয় সূচিত হয়েছিল। শস্য আইন প্রত্যাহার কেবল ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে নয়, ব্যাঙ্ক মালিক, ফাটকা দালাল, লভ্যাংশজীবী প্রভৃতি পুঁজিপতি শ্রেণীর যেসব অংশ জমিসংশ্লিষ্ট স্বার্থের সঙ্গে কমবেশি জড়িত, তাদের বিরুদ্ধেও **শিল্প**-পুঁজিপতিদের জয়ের নিদর্শন। এই শিল্প-পুঁজিপতিরাই তখন জাতির প্রতিভূ। অবাধ বাণিজ্যের অর্থ দাঁড়াল এই শিল্প-পুঁজিপতিদের স্বার্থে ইংলণ্ডের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য ও আর্থিক নীতির আমূল পুনর্বিন্যাস, এবং সোৎসাহে সেই পথে তারা অগ্রসর হল। শিল্প-উৎপাদনের পথে সমস্ত বাধা নির্মমভাবে অপসারিত হল। শুল্ক ও সমগ্র কর-ব্যবস্থায় বিপ্লবী পরিবর্তন সাধিত হল। সমস্ত কাঁচা উৎপাদন দ্রব্য, বিশেষত শ্রমিক শ্রেণীর জীবিকার উপকরণগুলি সুলভ করা, কাঁচামালের দাম কমানো এবং শ্রমিকদের মজুরি তখনও পর্যন্ত

কমাতে না পারলেও অন্তত আর বাড়তে না দেওয়া — শিল্প-পুঁজিপতির পক্ষে অত্যাবশ্যক এই অনন্য লক্ষ্যসাধনে সব কিছুকে অধীনস্থ করা হল। ইংলণ্ডের হওয়া চাই 'সারা দুনিয়ার শিল্পশালা', ইতিমধ্যেই ইংলণ্ডের জন্য আয়ার্ল্যান্ড যা হয়ে উঠেছিল, অন্য সব দেশও হবে ঠিক তাই, অর্থাৎ হবে তার শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার এবং বিনিময়ে তারা তাকে কাঁচামাল ও খাদ্য সরবরাহ করবে। ইংলন্ড — এক কৃষিপ্রধান বিশ্বের মহান শিল্পকেন্দ্র, ক্রমেই আরও বেশি সংখ্যক শস্য ও কাপাস উৎপাদনকারী আয়ার্ল্যান্ডদের দ্বারা প্রদক্ষিত শিল্পসূর্য। কী গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ!

'ইউরোপের মূলখণ্ডের বেশি সংকীর্ণমনা সহযাত্রীদের তুলনায় অনেক প্রবল কাণ্ডজ্ঞান এবং প্রচলিত রীতিনীতি সম্পর্কে অবজ্ঞা বরাবরই ইংলণ্ডের শিল্প-পুঁজিপতিদের বৈশিষ্ট্য, তাই নিয়ে তারা তাদের এই মহান লক্ষ্যসাধনে আত্মনিয়োগ করল। চার্টিস্ট মতবাদ তখন মুমূর্ষু। ১৮৪৭-এর ধাক্কা মন্দীভূত হয়ে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্যে যে সমৃদ্ধি ফিরে এল, তাকে দেখানো হল একমাত্র অবাধ বাণিজ্যের ফল বলে। এই দুই কারণ মিলে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিকভাবে শিল্পমালিকদের নেতৃত্বাধীন 'মহান উদারনৈতিক পার্টির' লেজুড়ে পরিণত করল। একবার যখন এই সুবিধা পাওয়া গেল তখন তা স্থায়ী করা দরকার। চার্টিস্টপন্থীরা অবাধ বাণিজ্যের বিরোধিতা করে নি, কিন্তু তাকেই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নে পরিণত করার বিরোধিতা করেছিল, এর থেকে শিল্প-পুঁজিপতিদের এ শিক্ষা হয়েছিল এবং ক্রমশই আরও বেশি করে হচ্ছিল যে, শ্রমিক শ্রেণীর সাহায্য ছাড়া মধ্য শ্রেণীরা কখনও সারা জাতির উপর তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। এইভাবে এই দুই শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা ক্রমিক পরিবর্তন ঘটল। কারখানা আইনগুলি একসময় ছিল প্রত্যেক শিল্পমালিকের চক্ষুশূল। এখন সেই আইনের কাছে শুধু যে স্বেচ্ছায় নতিস্বীকার করা হল তাই নয়, প্রায় প্রত্যেক শিল্পে প্রযোজ্য রূপে সেগুলির পরিবর্ধনও সহ্য করা হল। এতদিন ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে স্বয়ং শয়তানের আবিষ্কার মনে করা হত, এখন সেগুলি সম্পূর্ণ আইনসম্মত সংগঠন এবং শ্রমিকদের মধ্যে

সুষ্ঠু অর্থনৈতিক মতবাদ প্রচারের কার্যকর উপায় বলে আদর ও আনুকূল্য পেতে লাগল। ১৮৪৮ পর্যন্ত ধর্মঘটের মতো পাপাচার আর কিছু ছিল না, এখন ক্রমে তারও কালবিশেষে সবিশেষ উপযোগিতা আবিষ্কৃত হতে লাগল, বিশেষত যেসব ক্ষেত্রে মালিকরাই, তাদের নিজেদের সুযোগমতো, উস্কানি দিয়ে সেই ধর্মঘট লাগিয়ে দিচ্ছে। যেসব বিধিবদ্ধ আইন মালিকের চেয়ে শ্রমিককে নিচের স্তরে বা অসুবিধাজনক স্থানে রেখেছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিকটু আইনগুলি অন্তত প্রত্যাহৃত হল। এবং যে শিল্পপতিরা শেষ পর্যন্ত জনগণের সনদের বিরোধিতা করেছিল, সেই অসহনীয় 'সনদটি' কার্যত তাদেরই রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পরিণত হল। **'সম্পত্তি শর্তের অবসান'** ও **'ব্যালটে ভোটগ্রহণ'** আজ দেশের আইনের অঙ্গীভূত। ১৮৬৭ এবং ১৮৮৪-এর সংস্কার আইন (১০৮) — **'সর্বজনীন ভোটাধিকারের'** অন্তত জার্মানিতে তা যেভাবে এখন বর্তমান, তার কাছাকাছি পৌঁছেছে, বর্তমানে পার্লামেন্টের বিবেচনাধীন পুনর্বিন্যাস আইনের খসড়ায় **সমান নির্বাচকমণ্ডলীর** ব্যবস্থা হচ্ছে যা অন্তত জার্মানির তুলনায় বেশি অসমান নয়; **সদস্যদের জন্য ভাতা** এবং একেবারে **বাৎসরিক পার্লামেন্ট** না হোক অন্তত আরও ঘনঘন পার্লামেন্টের সম্ভাবনা দূরে দেখা যাচ্ছে — তবু এমন কিছু লোক আছে যারা বলে বেড়ায় যে, চার্টিস্ট মতবাদের মৃত্যু হয়েছে।

'পূর্বগামী আরও অনেক বিপ্লবেরই মতো ১৮৪৮-এর বিপ্লবেরও অদ্ভুত অদ্ভুত সহযোগী এবং উত্তরাধিকারী দেখা গেছে। এই বিপ্লবকে যারা দমন করল তারাই, মার্কসের ভাষায়, তার উইলের নির্দেশপালক।* লুই নেপোলিয়নকে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইতালি সৃষ্টি করতে হল, বিসমার্ককে জার্মানির বৈপ্লবীকরণ এবং হাঙ্গেরির স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হল, আর ইংরেজ শিল্প-মালিকদের জনগণের সনদকে আইন-বিধিবদ্ধ করতে হল।

'ইংলণ্ডের পক্ষে, গোড়ার দিকে শিল্প-পুঁজিপতিদের এই প্রাধান্যের ফল হল চাঞ্চল্যকর। ব্যবসা-বাণিজ্যে পুনরুজ্জীবন দেখা দিল এবং আধুনিক

* ক. মার্কস, '১৮৫৯-এ এরফুর্টপনা'। — সম্পাঃ

শিল্পের এই জন্মস্থানের পক্ষেও অশ্রুতপূর্ব মাত্রায় তা বিস্তার লাভ করল; ১৮৫০ থেকে ১৮৭০ এই কুড়ি বছরে অভাবনীয় উৎপাদনের পাশাপাশি, আমদানি ও রপ্তানি, পুঁজিপতিদের হাতে সঞ্চিত সম্পদ ও বড় বড় শহরে কেন্দ্রীভূত মানব শ্রমশক্তির বিহ্বলকর পরিমাণের সঙ্গে তুলনায় পূর্ববর্তী যুগের বাষ্প ও যন্ত্রের বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলিও অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল। এই অগ্রগতি অবশ্য, আগেকারই মতো, দশ বছর অন্তর, ১৮৫৭ এবং ১৮৬৬ সালে, সংকটের দ্বারা বিঘ্নিত হয়; কিন্তু এ ধাক্কাগুলিকে স্বাভাবিক, অপরিহার্য ঘটনা বলেই ধরে নেওয়া হল, যাকে ভবিতব্য হিসেবে মেনে নিতেই হবে এবং শেষ পর্যন্ত তা সর্বদা আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যায়।

'আর এই যুগে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা কী? ব্যাপক শ্রমিক জনতার অবস্থায় পর্যন্ত সাময়িক উন্নতি ঘটল। কিন্তু বিপুল সংখ্যক বেকার মজুত বাহিনীর প্রবাহ, ক্রমাগত নতুন নতুন যন্ত্র দ্বারা শ্রমিকের স্থান অধিকার, এবং কৃষিতেও ক্রমেই বেশি হারে যন্ত্র প্রয়োগের ফলে স্থানচ্যুত কৃষিজীবী জনতার আগমনের ফলে এই উন্নতিও সর্বদাই আগেকার স্তরে নেমে যেত।

'শ্রমিক শ্রেণীর দুটি 'সুরক্ষিত' অংশের বেলায়ই কেবল স্থায়ী উন্নতি লক্ষ করা যায়। প্রথমত, কারখানার শ্রমিকদের ক্ষেত্রে; পার্লামেন্টের আইনের দ্বারা এদের কাজের ঘণ্টা অপেক্ষাকৃত যুক্তিসম্মত সীমার মধ্যে বেঁধে দেওয়ায় তাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার ঘটেছে ও একটা নৈতিক শক্তি পেয়েছে তারা, স্থানীয় কেন্দ্রীকরণের ফলে যা আরও বেড়ে গেছে। ১৮৪৮-এর আগেকার তুলনায় তারা যে ভালো আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যে, যত ধর্মঘট তারা করে তার দশটির মধ্যে ন-টির ক্ষেত্রেই মালিকরা নিজেরাই উৎপাদন কমাবার একমাত্র উপায় হিসেবে উস্কানি দিয়ে ধর্মঘট বাধায়। কারখানায় তৈরি মাল যতই অবিক্রীত থাক না-কেন, শ্রমদিন হ্রাসে মালিকদের কখনও রাজী করানো যায় না; কিন্তু শ্রমিকদের দিয়ে ধর্মঘট করাও, অমনি বিনা ব্যতিক্রমে প্রত্যেক মালিক কারখানা বন্ধ করে দেবে।

'দ্বিতীয়ত, বড় বড় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ক্ষেত্রে; যেসব বৃত্তিতে **প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের** শ্রমই প্রধান বা একমাত্র প্রযোজ্য, এগুলি সেইসব বৃত্তির সংগঠন। এইসব বৃত্তিতে স্ত্রীলোক ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিযোগিতা

বা যন্ত্রের প্রতিযোগিতা এখনও তাদের সংগঠিত শক্তিকে দুর্বল করতে পারে নি। যন্ত্র নির্মাণের মজুর, ছুতার-মিস্ত্রী, আসবাব-মিস্ত্রী, রাজ-মিস্ত্রী — এই প্রত্যেকটি অংশই এতটা করে শক্তির অধিকারী যে, যেমন রাজমিস্ত্রী ও তার সহকারী মজুরদের ক্ষেত্রে, তারা যন্ত্র প্রবর্তনে পর্যন্ত সফলভাবে বাধা দিতে পারে। ১৮৪৮-এর পর থেকে এদের অবস্থা যে লক্ষণীয়ভাবে উন্নত হয়েছে সেবিষয়ে কোনো সন্দেহেরই অবকাশ নেই, এবং তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, আজ ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে তাদের মালিকরাই যে কেবল তাদের সঙ্গে বেশ ভালো সম্পর্ক বজায় রেখেছে তাই নয়, তারাও মালিকদের সঙ্গে খুবই ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে এসেছে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এরা এক অভিজাত গোষ্ঠী হয়ে উঠেছে; নিজেদের জন্য অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা তারা জোর করে চালু করতে পেরেছে এবং সেই অবস্থাকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিয়েছে। এরাই হচ্ছে লেওন লেভি ও গিফেন মহাশয়দের আদর্শ শ্রমিক এবং সত্যিই বিশেষ করে যেকোনো বিবেচক পুঁজিপতি এবং সাধারণভাবে সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর কাছে এরা আজকাল বড় চমৎকার লোক।

'কিন্তু শ্রমজীবী জনতার বিপুল অংশ আজ যে দুর্দশা ও অনিরাপত্তার মধ্যে বাস করছে তা আগের তুলনায় বেশি নিচু না হলেও, অন্তত সমান নিচু। লন্ডনের ইস্ট এন্ড (১০৯) হচ্ছে রুদ্ধস্রোত দারিদ্র্য ও হতাশার, কর্মহীনতার কালে অনাহার আর কর্মরত কালে শারীরিক ও নৈতিক অধঃপতনের এক ক্রমবিস্তারমান বদ্ধ জলার মতো। শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ সুবিধাভোগী অল্পাংশকে বাদ দিলে প্রত্যেক বড় শহরেরও এই অবস্থা, এবং ছোটখাট শহর ও কৃষি অঞ্চলগুলিতেও তাই। যে নিয়মে শ্রমশক্তির মূল্য পরিণত হয় প্রাণধারণের অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপকরণের মূল্যে এবং অপর যে-নিয়ম শ্রমশক্তির গড়পড়তা দরকে সেই অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপকরণগুলির সর্বনিম্ন মাত্রায় নামিয়ে আনে — এই দুই নিয়ম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের অদম্য শক্তি নিয়ে তাদের উপর প্রযুক্ত হয় এবং চাকার নিচে তাদের গুঁড়িয়ে দেয়।

'এই হল, তাহলে, ১৮৪৭-এর অবাধ বাণিজ্য নীতি এবং শিল্প-পুঁজিপতিদের বিশ বছরের শাসনের ফল। কিন্তু এর পর এক পরিবর্তন ঘটল। ১৮৬৬-এর বিপর্যয়ের পর অবশ্য ১৮৭৩-এ এক সামান্য ও স্বল্প-

কালস্থায়ী পুনরুজ্জীবন দেখা দিয়েছিল, কিন্তু বেশি দিন টেকে নি। প্রত্যাশিত সময়ে, ১৮৭৭ বা ১৮৭৮-এ আমাদের অবশ্য পূর্ণ সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হয় নি, কিন্তু ১৮৭৬ থেকেই শিল্পের সমস্ত প্রধান প্রধান শাখায় একটানা অচল অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। পূর্ণ বিপর্যয় যেমন আসে না, সে বিপর্যয়ের আগে ও পরে আকাঙ্ক্ষিত সমৃদ্ধির যে পর্যায় আমাদের পাবার কথা তাও তেমনি আসে না। একটা নিস্তেজ মন্দা, সমস্ত ব্যবসায়ে সমস্ত বাজারমালের একটানা বাহুল্য, এই অবস্থার মধ্যেই আমরা প্রায় দশ বছর চলেছি। কেন এমন হল?

'অবাধ বাণিজ্য তত্ত্ব দাঁড়িয়েছিল এই অনুমানের উপর: ইংলন্ড হবে এক কৃষিপ্রধান বিশ্বের একমাত্র বিপুল শিল্পকেন্দ্র। আর বাস্তব ঘটনা দাঁড়িয়েছে এই যে, অনুমানটি এক অবিমিশ্র ভ্রান্তি বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেখানেই জ্বালানি, বিশেষত কয়লা আছে সেখানেই আধুনিক শিল্পের পরিস্থিতি, বাষ্পশক্তি ও যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এবং ইংলন্ড ছাড়া অন্য দেশে — ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি, আমেরিকা, এমনকি রাশিয়ায় কয়লা আছে। এবং সেখানকার লোকেরা ইংরেজ পুঁজিপতিদের সম্পদ ও গৌরব বাড়াবার জন্য আইরিশ নিঃস্ব কৃষকে পরিণত হবার সুবিধাটা হৃদয়ঙ্গম করে নি। তারা দৃঢ় সংকল্পে শিল্প-উৎপাদনে লেগে গেল, কেবল নিজেদের জন্য নয়, বাকি দুনিয়ার জন্যও; আর তার ফল হল এই যে, ইংলন্ড প্রায় শতাব্দীকাল ধরে শিল্প-উৎপাদনে যে একাধিপত্য ভোগ করে আসছিল, সেটা চিরকালের মতো ভেঙে গেল।

'অথচ শিল্প-উৎপাদনে এই একাধিপত্যই হচ্ছে ইংলন্ডের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ভর-কেন্দ্র। সে একাধিপত্য যখন বজায় ছিল তখনও পণ্যের বাজার ইংরেজ শিল্পের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না; ফলে দশ বছর অন্তর সংকট দেখা দিচ্ছিল। আর আজ তো নতুন বাজার প্রতিদিন আরও দুর্লভ হয়ে উঠছে এবং এতই দুর্লভ হয়ে উঠছে যে, এবার কঙ্গোর নিগ্রোদেরও ম্যাঞ্চেস্টারের ছিট-কাপড়, স্ট্যাফোর্ডশায়ারের পটারি আর বার্মিংহামের লোহার জিনিস রূপী সভ্যতায় সবলে সামিল করে নিতে হচ্ছে। এর পর যখন ইউরোপের মহাদেশ, বিশেষত আমেরিকা থেকে জিনিসপত্র ক্রমেই বেশি পরিমাণে আসতে আরম্ভ করবে,

আজও ব্রিটিশ শিল্প-মালিকদের হাতেই যে প্রধান অংশটা রয়েছে সেটা বছরের পর বছর যখন কমতে থাকবে, তখন অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? সর্বরোগহর হে অবাধ বাণিজ্য, জবাব দাও!

'এ কথাটা আমিই প্রথম বলি নি। ১৮৮৩ সালেই ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের (১১০) সাউথপোর্ট অধিবেশনে অর্থনীতি বিভাগের সভাপতি মিঃ ইঙ্গলিস পালগ্রেভ স্পষ্ট বলেছিলেন যে:

> 'ইংলণ্ডে বিপুল ব্যবসাগত মুনাফার দিন শেষ হয়েছে, এবং শিল্প-উদ্যোগের একাধিক বৃহৎ শাখার অগ্রগতিতে ছেদ পড়েছে। **প্রায় একথাই বলা যায় যে, দেশ এক প্রগতিহীন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।'**

'কিন্তু তার ফল কী হবে? পুঁজিবাদী উৎপাদন থামতে **পারে না**। তাকে বাড়তেই হবে, বিস্তৃততর হতেই হবে, নইলে তার মৃত্যু। ইতিমধ্যেই, বিশ্বের বাজারে সরবরাহের ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের সিংহভাগটা হ্রাস পাওয়ার অর্থই হল রুদ্ধস্রোত অবস্থা, দুর্দশা, কোথাও পুঁজির আধিক্য, কোথাও বা বেকার শ্রমিকের আধিক্য। বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধি যখন একেবারেই থেমে যাবে তখন অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

'এইখানেই পুঁজিবাদী উৎপাদনের ভেদ্য স্থান, একিলিসের গোড়ালি। নিরবচ্ছিন্ন বিস্তারের আবশ্যিকতা তার ভিত্তি এবং সেই নিরবচ্ছিন্ন বিস্তারই আজ অসম্ভব হয়ে পড়ছে। ফলে দেখা দিচ্ছে এক অচল অবস্থা। এক এক বছর যাচ্ছে আর ইংলণ্ড আরও বেশি এই প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে: হয় দেশ, নয়তো পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা, একটাকে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে হবে। কোনটা যাবে?

'আর শ্রমিক শ্রেণী? ১৮৪৮ থেকে ১৮৬৮-এর অভূতপূর্ব বাণিজ্য ও শিল্প বিস্তারের মধ্যেও যদি তাদের এত দৈন্য সহ্য করতে হয়ে থাকে; সেদিনও তাদের মধ্যে এক অতি সামান্য, বিশেষ সুবিধাভোগী, 'সুরক্ষিত' সংখ্যালঘু অংশ স্থায়ীভাবে উপকৃত হলেও অধিকাংশের অবস্থায় যদি বড়জোর অস্থায়ী উন্নতিমাত্র হয়ে থাকে, তাহলে এই চোখ-ধাঁধানো যুগ অনিবার্যভাবে যেদিন শেষ হবে, যেদিন আজকের এই নিরানন্দ রুদ্ধস্রোত অবস্থা কেবল তীব্রতরই হবে না, এ বদ্ধাবস্থা সেই তীব্রতররূপেই ইংরেজ

ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থায়ী, স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হবে, সেদিন পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে?

'সত্য কথাটা এই: শিল্পক্ষেত্রে ইংলণ্ডের একাধিপত্যের যুগে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীও কিছু পরিমাণে সেই একাধিপত্যের সুফলের অংশ পেয়েছে। এই সুফল তাদের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে খুবই অসমানভাবে: বিশেষ সুবিধাভোগী সংখ্যাল্প অংশ তার বেশির ভাগটাই আত্মসাৎ করেছে, কিন্তু বৃহত্তর শ্রমিকসাধারণও, অন্তত সাময়িকভাবে, কখনও কখনও তার ভাগ পেয়েছে। এবং এই কারণেই ওয়েনবাদের অবলুপ্তির পর ইংলণ্ডে আর কোনো সমাজতন্ত্র দেখা দেয় নি। সেই একাধিপত্য ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীও বিশেষ সুবিধাভোগীর স্থান হারাবে; এবং দেখতে পাবে যে, তারা সাধারণভাবে — বিশেষ সুবিধাভোগী এবং নেতৃত্বকারী অল্পসংখ্যকরাও তার থেকে বাদ পড়বে না — অপরাপর দেশের শ্রমিকদের সঙ্গে এক স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে। আর এই কারণেই ইংলণ্ডে আবার সমাজতন্ত্র দেখা দেবে।'

১৮৮৫ সালে যেমন মনে হয়েছিল সেইভাবে বিষয়টির যে বর্ণনা আমি এখানে দিয়েছি তার পর আর বলার বিশেষ কিছু নেই। বলা বাহুল্য, আজ সত্যই 'ইংলণ্ডে আবার সমাজতন্ত্র দেখা দিয়েছে' এবং বেশ যথেষ্ট পরিমাণেই দেখা দিয়েছে সর্ববর্গের সমাজতন্ত্র: সজ্ঞান এবং অজ্ঞান সমাজতন্ত্র, গদ্যময় ও কাব্যিক সমাজতন্ত্র, শ্রমিক শ্রেণীর এবং মধ্য শ্রেণীর সমাজতন্ত্র, কারণ, সত্যই সেই জঘন্য থেকে জঘন্যতম জিনিস সমাজতন্ত্রটা কেবল যে জাতে উঠেছে তাই নয়, উপরন্তু, তার গায়ে সত্যিই সান্ধ্য পোশাক চড়েছে এবং ড্রইং রুমের আরাম কেদারায় অলসভঙ্গিতে আরামে সে গা এলিয়ে দিয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনমত নামক 'সমাজের' সেই ভয়ংকর স্বেচ্ছাচারী প্রভুটি কতটা চঞ্চল, এবং বিগত এক যুগের সমাজতন্ত্রী আমরা যে সেই জনমতকে অবজ্ঞা করে এসেছিলাম, তার ন্যায্যতাও আর একবার প্রমাণিত হচ্ছে। তাহলেও এ লক্ষণ দেখে আমাদের চটবার কারণ নেই।

মৃদু জোলো সমাজতন্ত্রের যে ভাব দেখানো বুর্জোয়া মহলে সাময়িক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার চেয়ে, এমন কি ইংলণ্ডে সাধারণভাবে

সমাজতন্ত্রের সত্যই যে অগ্রগতি হয়েছে, তার চেয়েও যে ঘটনাকে আমি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি তা হচ্ছে লণ্ডনের ইস্ট এণ্ডের পুনরুজ্জীবন। দুর্দশার এই বিপুল লীলাভূমি আজ আর ছয় বছর আগেকার মতো বদ্ধ ডোবা নয়। সে তার অসাড় হতাশা ঝেড়ে ফেলে আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে এবং আজকাল যাকে 'নয়া ইউনিয়নবাদ' বলা হয় তার, অর্থাৎ 'অদক্ষ' শ্রমিকদের বিপুল জনগণের সংগঠন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই সংগঠন বহুল পরিমাণে পুরাতন 'দক্ষ' শ্রমিকদের ইউনিয়নেরই চেহারা নিতে পারে, কিন্তু চরিত্রগতভাবে তা মূলত পৃথক। পুরাতন ইউনিয়নগুলি যে সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সময়কার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে, এবং মজুরি-প্রথাকে তারা এমন এক চিরস্থায়ী, চূড়ান্ত ব্যাপার বলে মনে করে, যা বড়জোর ইউনিয়নের সদস্যদের স্বার্থে খানিকটা সংস্কৃত করতে পারা যায়। নতুন ইউনিয়নগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন এক সময় যখন মজুরি-প্রথার অনন্ত অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসের উপর রূঢ় আঘাত পড়েছে। এগুলির প্রতিষ্ঠাতারা ও পরিচালকেরা সচেতনভাবে বা আবেগের দিক দিয়ে সমাজতন্ত্রী; যে জনতার আনুগত্য এগুলিকে শক্তি জোগাল তারা ছিল অমার্জিত, অবহেলিত, শ্রমিক শ্রেণীর অভিজাত অংশ তাদের দেখত তাচ্ছিল্যের চোখে; কিন্তু এই দিক থেকে তাদের বিপুল সুবিধা ছিল যে, **তাদের মন ছিল অকর্ষিত জমির** মতো, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যেসব 'ভদ্র' বুর্জোয়া কুসংস্কার অপেক্ষাকৃত সচ্ছল 'পুরাতন' ইউনিয়ন-পন্থীদের মস্তিষ্কে বাধা জন্মায় তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর যখন আমরা দেখছি যে, এই নতুন ইউনিয়নগুলিই সাধারণভাবে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং সমৃদ্ধ ও গর্বিত 'পুরাতন' ইউনিয়নগুলিকে ক্রমেই নিজেদের পেছনে টেনে আসছে।

ইস্ট এণ্ডের কর্মীরা অনেক বড় বড় ভুল করেছে তাতে সন্দেহ নেই, এ ধরনের ভুল তাদের পূর্বগামীরাও করেছে, আর তাদের যারা 'ছিঃ ছিঃ' করে সেই মতবাগীশ সমাজতন্ত্রীরাও করে থাকে। একটা বৃহৎ জাতির মতো একটা বৃহৎ শ্রেণীও নিজের ভুলের পরিণাম ভুগে যত তাড়াতাড়ি এবং ভালোভাবে শেখে, অন্য কোনোভাবে তা শেখে না। এবং অতীতে, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে যত ভুলই হোক না কেন, লণ্ডনের ইস্ট এণ্ডের

পুনরুজ্জীবন আজও এই fin de siècle*-র বৃহত্তম ফলবান ঘটনা এবং এই ঘটনা দেখে যেতে পারলাম বলে আমি আনন্দিত ও গর্বিত।**

ফ. এঙ্গেলস

১১ জানুয়ারি, ১৮৯২

'ইংলন্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' বইটির ১৮৯২ সালে লন্ডনে প্রকাশিত ইংরেজি সংস্করণের জন্য এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত

মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ

---

* শতাব্দীর শেষ। — সম্পাঃ

** 'ইংলন্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার' দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধে এঙ্গেলস উপরোক্ত ইংরেজি মুখবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেন এবং তার পর পরিসমাপ্তিতে নিম্নলিখিত অংশ যোগ করে দেন:

'ছ-মাস আগে আমি উল্লিখিত অংশ লেখার পর ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন আবার বড় এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে। এই সেদিন অনুষ্ঠিত পার্লামেন্টারী নির্বাচন আনুষ্ঠানিকভাবে রক্ষণশীল ও উদারনীতিক এই উভয় পার্টিকে জানিয়ে দিয়েছে যে, এর পর থেকে তৃতীয় পার্টি, শ্রমিক দলের কথা তাদের হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে। শ্রমিকদের এই পার্টি সবেমাত্র গড়ে উঠছে, এবং তার উপাদানগুলি এখনও সর্বপ্রকার চিরাচরিত সংস্কার — বুর্জোয়া, পুরাতন ট্রেড ইউনিয়ন-পন্থী, এমন কি মতবাগীশ সমাজতন্ত্রী সংস্কারগুলিও ঝেড়ে ফেলার কাজে ব্যাপৃত, যাতে তারা শেষ পর্যন্ত সকলের গ্রহণযোগ্য ভিত্তিতে একত্র হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ হবার যে সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী তারা চলেছে তা ইতিমধ্যেই এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, তারই ফলে ইংলন্ডের পক্ষে অশ্রুতপূর্ব নির্বাচনী ফলাফল দেখা গেল। লন্ডনে দুজন শ্রমিক নির্বাচনে দাঁড়ান [জেমস কেয়র হার্ডি ও জন বার্নস। — সম্পাঃ] এবং তাও সরাসরি সমাজতন্ত্রী হিসেবে: উদারনীতিকরা তাঁদের বিরুদ্ধে কাউকে দাঁড় করাতেই সাহস পেল না এবং সমাজতন্ত্রী দুজন বিপুল ও অপ্রত্যাশিত ভোটাধিক্যে জয়লাভ করলেন। মিডলসবরোতে শ্রমিকদের একজন প্রার্থী [জোসেফ শেভলক উইলসন। — সম্পাঃ] একজন রক্ষণশীল ও একজন উদারনীতিক প্রার্থীর সঙ্গে একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ঐ দুজনের বাধা সত্ত্বেও নির্বাচিত হন। অপর দিকে, শ্রমিকদের নতুন প্রার্থীদের মধ্যে যারা উদারনীতিকদের সঙ্গে সমঝোতা করেছিল, তাদের মাত্র একজন ছাড়া সকলেই নৈরাশ্যজনকভাবে পরাজিত হয়। আগেকার তথাকথিত শ্রমিক প্রতিনিধিদের, অর্থাৎ যারা শ্রমিক শ্রেণীর লোক হয়েও ক্ষমা পায় একমাত্র এই কারণে যে, তারা নিজেরাই

উদারনীতিবাদের মহাসাগরে নিজেদের শ্রমিক চরিত্রকে ডুবিয়ে দিতে প্রস্তুত, তাদের মধ্যে পুরাতন ইউনিয়নবাদের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রতিনিধি হেনরি ব্রডহার্স্ট বন্যার মুখে তৃণখণ্ডের মতো ভেসে গেলেন, কারণ তিনি ৮ ঘণ্টা রোজের বিরোধিতা করেছিলেন। গ্লাস্গোতে ২টি, সলফোর্ডে ১টি এবং আরও একাধিক নির্বাচন-কেন্দ্রে শ্রমিকদের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা দুটি পুরাতন পার্টিরই প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তারা অবশ্য হেরে গেছে, কিন্তু উদারনীতিক প্রার্থীরাও জিততে পারে নি। এককথায়, একাধিক বড় শহরে এবং শিল্পপ্রধান নির্বাচনী এলাকায় শ্রমিকরা সুনিশ্চিতভাবেই পুরাতন পার্টিগুলির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং তারই ফলে এমন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাফল্য অর্জন করেছে যা আগেকার কোনো নির্বাচনে দেখা যায় নি। আর তারই জন্য মেহনতী জনতার মধ্যে আনন্দ উন্দাম। ভোটাধিকারকে নিজ শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার করলে কী করা যায় তা এই প্রথম তারা দেখল এবং অনুভব করল। 'মহান উদারনীতিক পার্টি' সম্পর্কে কুসংস্কারগত বিশ্বাসের যে মোহ প্রায় ৪০ বছর ধরে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তা আজ ভেঙেছে। একাধিক চাঞ্চল্যকর উদাহরণ থেকে তারা বুঝেছে যে, তারা, শ্রমিকরাই হল ইংলণ্ডে চূড়ান্ত শক্তি, শুধু যদি তারা চায়, আর কী চায় সেটা জানে। ১৮৯২-এর নির্বাচন থেকে সেই জানা ও চাওয়ার সূত্রপাত। বাকি যা করার, ইউরোপ মহাদেশের শ্রমিকদের আন্দোলন তার ব্যবস্থা করবে। জার্মান ও ফরাসী শ্রমিকদের পার্লামেণ্টে ও স্থানীয় কাউন্সিলগুলিতে বহুসংখ্যায় প্রতিনিধি রয়েছে, তারা আরও সাফল্য অর্জনের মধ্য দিয়ে ইংরেজদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব উপযুক্ত মাত্রায় চালু রাখবে। এবং অদূর ভবিষ্যতে যদি দেখা যায় যে, এই নতুন পার্লামেণ্ট মিঃ গ্ল্যাডস্টোনকে নিয়ে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারছে না আর মিঃ গ্ল্যাডস্টোনও এই পার্লামেণ্টকে নিয়ে কিছু করে উঠতে পারছেন না, তাহলে ইংরেজ শ্রমিক পার্টি ততদিনে নিশ্চয়ই এতটা সংগঠিত হয়ে উঠবে যাতে পুরাতন দুই পার্টি যেভাবে একের পর এক সরকারের আসনে বসে আসছে এবং ঠিক এই কায়দায় বুর্জোয়াদের শাসন চিরস্থায়ী করে রাখছে, তাদের সেই নাগরদোলা খেলার দ্রুত অবসান ঘটাতে পারবে।' — সম্পাঃ

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

ভবিষ্যৎ ইতালীয় বিপ্লব ও সোশ্যালিস্ট পার্টি (১১১)

ইতালির পরিস্থিতি আমার মনে হয় এই রকম:

জাতীয় মুক্তির সময়ে এবং পরে ক্ষমতায় এসে বুর্জোয়া শ্রেণী তার বিজয় সম্পূর্ণ করতে সক্ষমও হয় নি, ইচ্ছুকও নয়। সামন্ততন্ত্রের অবশেষগুলিকে তারা ধ্বংস করে নি, জাতীয় উৎপাদনকে আধুনিক বুর্জোয়া আদলে পুনর্বিন্যস্তও করে নি। দেশকে পুঁজিবাদী শাসনের আপেক্ষিক ও সাময়িক সুফলগুলির ভাগ দিতে অপারগ এই বুর্জোয়া শ্রেণী সেই ব্যবস্থার সমস্ত বোঝা, সমস্ত অসুবিধা তার উপরে চাপিয়ে দিয়েছে। আর, তাতেও যেন যথেষ্ট হয় নি, যেটুকু মর্যাদা ও কৃতিত্ব তারা ভোগ করছিল, নোংরা ব্যাংক জালিয়াতি করে সেটুকুও তারা চিরতরে খুইয়েছে।

ফলত শ্রমজীবী জনগণ — কৃষক, কারিগর, কৃষি ও শিল্প শ্রমিক — দেখছে, তারা এক দিকে শুধু সামন্ত যুগ থেকেই নয়, এমন কি সুপ্রাচীন কাল থেকে আসা পুরনো অন্যায়-অবিচারে (mezzadria*, দক্ষিণে লাতিফুন্ডিয়া**, গবাদি-পশু যেখানে মানুষকে স্থানচ্যুত করে) নিষ্পেষিত; অন্য দিকে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার উদ্ভাবিত সবচেয়ে অতিগ্রাসী রাজস্ব-সংক্রান্ত আইনে নিষ্পেষিত। এটা এমন একটা দৃষ্টান্ত যেখানে সহজেই মার্কসের সঙ্গে বলা যেতে পারে: 'আমরা, পশ্চিম ইউরোপের বাকি সকলের মতোই, শুধু পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশের জন্যই নয়, বরং সেই বিকাশের অসামর্থ্যের জন্যও ভুগছি। আধুনিক মন্দগুলির পাশাপাশি, উত্তরাধিকারসূত্রে

---

* ভাগ চাষ-প্রথা। — সম্পাঃ

** বড় বড় জোত জমির প্রথা। — সম্পাঃ

আসা অজস্র মন্দ আমাদের ভারাক্রান্ত করছে — সেগুলি উদ্ভূত হয়েছে উৎপাদনের সেকেলে প্রণালীর অক্রিয় জের থেকে, তার সঙ্গে আছে সামাজিক ও রাজনৈতিক কালাসঙ্গতির অবশ্যম্ভাবী ধারা। আমরা শুধু জীবিতের কাছ থেকেই কষ্ট পাচ্ছি না, পাচ্ছি মৃতের কাছ থেকেও। Le mort saisit le vif!* (মৃত ব্যক্তি মরণফাঁসে বেঁধে রেখেছে জীয়ন্তকে! — অনুঃ)

পরিস্থিতি একটা সংকটের দিকে চলেছে। উৎপাদনকারী জনসাধারণ সর্বত্র বিক্ষুব্ধ; এখানে-ওখানে তারা সমুত্থিত হচ্ছে। এই সংকট আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?

স্পষ্টতই, সোশ্যালিস্ট পার্টি এত তরুণ এবং, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দরুন, এত দুর্বল যে সমাজতন্ত্রের আশু বিজয়ের আশা করতে সে সক্ষম নয়। সারা দেশ জুড়ে নাগরিক জনসমষ্টির তুলনায় কৃষিনির্ভর জনসমষ্টির পাল্লা অনেক বেশি ভারী। শহরগুলিতে সামান্যই উন্নত শিল্প আছে, তাই আদর্শ বৈশিষ্ট্যমূলক প্রলেতারীয়রা বিরল; কারিগর, ছোট দোকানদার ও শ্রেণীচ্যুত ব্যক্তিরাই — পেটি বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে তরঙ্গায়িত এক জনপুঞ্জ — সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ হল ক্ষয় ও ভাঙনের পথে মধ্য যুগের পেটি ও মধ্য বুর্জোয়া শ্রেণী, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতের প্রলেতারীয়, কিন্তু এখনও বর্তমানের প্রলেতারীয় নয়। সর্বদা অর্থনৈতিক সর্বনাশের সম্মুখীন এবং এখন মরীয়া অবস্থায় উপনীত একমাত্র এই শ্রেণীই এক বিপ্লবী আন্দোলনের যোদ্ধৃসাধারণ ও নেতা — দুই-ই যোগাতে সক্ষম হবে। এই পথে তাকে অনুসরণ করবে কৃষকরা, যারা তাদের জমি অত্যধিক ইতস্তুতবিক্ষিপ্ত হওয়ায় এবং তাদের নিরক্ষরতার দরুন কোনোরূপ কার্যকর উদ্যোগ প্রদর্শন করতে পারে না বটে, কিন্তু যাই ঘটুক না-কেন, তারা হবে শক্তিশালী ও অপরিহার্য মিত্র।

অল্পবিস্তর শান্তিপূর্ণ সাফল্যের ক্ষেত্রে, মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটবে, আর 'পরিবর্তিত' প্রজাতন্ত্রীরা (১১২), কাভালোত্তি প্রমুখেরা ক্ষমতায় আসবেন; বিপ্লব ঘটলে এক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র হবে।

---

* 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম জার্মান সংস্করণে মার্কসের ভূমিকা (এই সংস্করণের ষষ্ঠ খণ্ডের ৭-১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। — সম্পাঃ

এই সম্ভাব্য ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে সোশ্যালিস্ট পার্টির কর্তব্য কী?

১৮৪৮ সাল থেকে যে রণকৌশল সমাজতন্ত্রীদের সর্বাধিক সাফল্য দিয়েছে তা হল **'কমিউনিস্ট ইশতেহারে'** লিপিবদ্ধ রণকৌশল:

'বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইকে যে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলতে হয়, তাতে সমাজতন্ত্রীরা* সর্বদা ও সর্বত্র সমগ্র আন্দোলনের স্বার্থটাকে তুলে ধরে... শ্রমিক শ্রেণীর আশু লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য, উপস্থিত স্বার্থ হাসিল করার জন্য সমাজতন্ত্রীরা লড়াই করে থাকে, কিন্তু বর্তমানের আন্দোলনের মধ্যে তারা সেই আন্দোলনের ভবিষ্যতের প্রতিনিধি, সেটার রক্ষক।'**

তারা তাই দুটি শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামের বিকাশের প্রত্যেক পর্যায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, কিন্তু এই বিষয়টি কখনও বিস্মৃত হয় না যে এই পর্যায়গুলি নিতান্তই কতকগুলি স্তর মাত্র, যার শেষে আছে চরম মহৎ লক্ষ্য: সমাজ পুনর্বিন্যাসের উপায় হিসেবে প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক ক্ষমতা জয়। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে আশু সুফল লাভ করার জন্য যারা লড়াই করছে তাদেরই পাশে তাদের স্থান। এই সমস্ত রাজনৈতিক বা সামাজিক উপকার তারা গ্রহণ করে বটে, তবে নিতান্তই **অগ্রিম অর্থ প্রদান হিসেবে।** প্রতিটি বিপ্লবী বা প্রগতিশীল আন্দোলনকে তারা তাই গণ্য করে তারা নিজেরা যে দিকে চলেছে সেই দিকেই একটি পদক্ষেপ বলে। তাদের বিশেষ ব্রত হল অন্যান্য বিপ্লবী পার্টিকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের মধ্যে একটি যদি জয়ী হয় তাহলে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ রক্ষা করা। এই রণকৌশল সুমহান লক্ষ্যের কথা কখনোই বিস্মৃত হয় না, এবং সমাজতন্ত্রীদের তা নিষ্কৃতি দেয় হতাশা থেকে, যে-হতাশা অবশ্যম্ভাবীরূপেই অন্যান্য, অপেক্ষাকৃত কম স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন পার্টির ক্ষেত্রে দেখা দেবে, তা তারা বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রী অথবা ভাবপ্রবণ সমাজতন্ত্রী যাই হোক না-কেন; — যেটি নিতান্তই একটি স্তর মাত্র তাকে তারা ভুল করে তাদের অগ্রযাত্রার শেষ প্রান্ত বলে।

---

* 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' থেকে উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে এঙ্গেলস কমিউনিস্টরা শব্দটির জায়গায় সমাজতন্ত্রীরা শব্দটি বসিয়েছেন। — সম্পাঃ

** এই সংস্করণের ১ম খণ্ডের ১৫৭ আর ১৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

এসব কথাই ইতালির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাক।

ভাঙনোন্মুখ পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী ও কৃষকসমাজের বিজয় তাই হয়তো 'পরিবর্তিত' প্রজাতন্ত্রীদের এক মন্ত্রিসভা এনে দেবে। তাহলে আমরা পাব সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং আন্দোলনের অনেক বেশি স্বাধীনতা (সংবাদপত্র, সমাবেশ, সমিতির স্বাধীনতা ammonizione*-এর অবসান ইত্যাদি) — এগুলি নতুন অস্ত্র, তাচ্ছিল্য করার মতো নয়।

কিংবা আমাদের জন্য তা নিয়ে আসবে একটা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র, তাতে থাকবেন একই ব্যক্তিরা এবং তাঁদের মধ্যে কিছু মাৎসিনিপন্থী। আমাদের স্বাধীনতা ও আমাদের কর্মক্ষেত্রকে তা অনেকখানি বাড়াবে, অন্তত উপস্থিত কালের মতো। আর মার্কস বলেছেন যে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রই একমাত্র রাজনৈতিক ধরন যার মধ্যে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেকার সংগ্রাম জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত লড়া যায়।** আর ইউরোপে এর যা প্রতিক্রিয়া হবে, সে কথা তো বলাই বাহুল্য।

অতএব, বর্তমান বিপ্লবী আন্দোলনের জয় আমাদের আরও শক্তিশালী করে তুলতে এবং আমাদের অনুকূলতর ambiente*** নিয়ে আসতে বাধ্য। আমরা যদি একপাশে দাঁড়িয়ে থাকি, 'affini'**** পার্টিগুলির মুখোমুখি আমাদের আচরণে আমরা যদি নিছক নেতিবাচক সমালোচনার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখি তাহলে সবচেয়ে বড় ভুল করব। এমন ক্ষণ আসতে পারে যখন আমাদের কর্তব্য হবে তাদের সঙ্গে ইতিবাচকভাবে সহযোগিতা করা। সেই ক্ষণটি কী হতে পারে?

আমরা যে-শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করি, যথার্থভাবে বলতে গেলে ঠিক সেই শ্রেণীর আন্দোলন নয় এমন কোনো আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে তৈরি করা স্পষ্টতই আমাদের কাজ নয়। প্রজাতন্ত্রী ও র‍্যাডিক্যালরা যদি মনে করে যে সংগ্রামের সময় সমুপস্থিত, তাহলে তারা তাদের আবেগের তাড়নাকে

---

* পুলিসি নজর। — সম্পাঃ

** ক. মার্কস, 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' (এই সংস্করণের ৪র্থ খণ্ডের ২২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। — সম্পাঃ

*** পরিবেশ। — সম্পাঃ

**** 'সংশ্লিষ্ট'। — সম্পাঃ

বল্‌গাহীন করুক। আমাদের কথা বলতে গেলে, এই সব ভদ্রলোকের গালভরা প্রতিশ্রুতিতে আমরা এত ঘন ঘন প্রবঞ্চিত হয়েছি, যে আরেকবার নিজেদের প্রতারিত হতে দিতে চাই না। তাঁদের উদ্‌ঘোষণা কিংবা তাঁদের ষড়যন্ত্র কোনো কিছুতেই আমাদের বিন্দুমাত্র বিচলিত হওয়া দরকার নেই। আমরা যদি প্রতিটি **প্রকৃত** গণ আন্দোলন সমর্থন করতে বাধ্য হই, তাহলে আমাদের প্রলেতারীয় পার্টির সবেমাত্র গঠিত প্রাণকেন্দ্রটি যাতে অযথা বিসর্জিত না হয় এবং নিষ্ফল স্থানীয় বিদ্রোহে প্রলেতারিয়েত যাতে হীনবল না হয় সেদিকে নজর দিতেও আমরা কম বাধ্য নই।

কিন্তু বিপরীতপক্ষে, আন্দোলন যদি প্রকৃতই জাতীয় হয় তাহলে আমাদের লোকেরা লুকিয়েও থাকবে না, তাদের সংকেতবাক্যেরও দরকার হবে না, এই আন্দোলনে আমাদের অংশগ্রহণ এক স্বাভাবিক ঘটনা। তবে সেরকম সময়ে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে, এবং আমাদের অবশ্যই একথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে যে আমরা অংশগ্রহণ করছি **এক স্বতন্ত্র পার্টি হিসেবে,** র‍্যাডিক্যাল ও প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আমরা মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি বটে, কিন্তু তাদের থেকে আমরা পুরোপুরি পৃথক; জয়লাভ হলে সংগ্রামের ফল সম্পর্কে আমরা আদৌ কোনো মোহ পোষণ করি না; আমাদের সন্তুষ্ট করা তো দূরের কথা, আমাদের কাছে এই ফলের অর্থ শুধু হবে বিজিত আরেকটি স্তর, অধিকতর বিজয়ের জন্য কর্মতৎপরতার এক নতুন ঘাঁটি; বিজয়ের দিনটিতেই আমাদের পথ হয়ে যাবে আলাদা; সেই দিন থেকে আমরা হব নতুন সরকারের **নতুন বিরোধীপক্ষ,** সেই বিরোধীপক্ষ প্রতিক্রিয়াশীল নয়, প্রগতিশীল, চরম বাম শক্তির বিরোধীপক্ষ, ইতিমধ্যেই অর্জিত ক্ষেত্রগুলির সীমা পেরিয়ে যে চাপ দিয়ে নিয়ে যাবে নতুন নতুন দিগ্বিজয়ে।

অভিন্ন বিজয়ের পর আমাদের হয়তো নতুন সরকারে কিছু আসন দিতে চাওয়া হবে, কিন্তু সেগুলি সবসময়েই হবে **সংখ্যালঘিষ্ঠ। সেটাই সবচেয়ে বড় বিপদ।** ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পর ফরাসী সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রীরা (*La Réforme*-এর [১১৩], — লেদ্রু-রলাঁ, লুই ব্লাঁ, ফ্লকোঁ প্রভৃতি) এরূপ পদ গ্রহণ করার ভুলটি করেছিলেন (১১৪)। সরকারের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়ায় তাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীদের

নিয়ে গঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠের সমস্ত দুষ্কৃতি ও বিশ্বাসঘাতকতার দায়িত্ব স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন, আর সরকারে তাঁদের উপস্থিতি পুরোপুরি পঙ্গু করে ফেলেছিল শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী তৎপরতাকে, যে-শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের দাবিদার ছিলেন তাঁরা।

উপরের সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে আমি আপনাকে শুধু আমার নিজস্ব অভিমত জানালাম; আপনি আমার কাছে তা জানতে চেয়েছেন বলে, আর আমি তা করেছি প্রচণ্ডতম দ্বিধা নিয়ে। সাধারণ রণকৌশলের কথা বলতে গেলে, আমার সারা জীবনে আমি সেগুলির ফলপ্রদতা দেখতে পেয়েছি। আমাকে সেগুলি কখনও হতাশ করে নি। কিন্তু ইতালিতে বর্তমান অবস্থায় তার প্রয়োগের বিষয়টা আলাদা; সেটা স্থির করতে হবে অকুস্থলে, করতে হবে তাদেরই যারা রয়েছে ঘটনাবলীর কেন্দ্রস্থলে।

২৬ জানুয়ারি, ১৮৯৪ তারিখে লিখিত

ইতালীয় ভাষায় *Critica Sociale* পত্রিকার ৩য় সংখ্যা, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪ তারিখে প্রকাশিত

ফরাসী থেকে ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

ফ্রান্স ও জার্মানির কৃষক সমস্যা (১১৫)

সর্বত্র সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে কৃষক সমস্যা আজ হঠাৎ কেন আশু আলোচ্যের মধ্যে স্থান পেয়েছে তা নিয়ে বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল পার্টিগুলির মধ্যে খুবই বিস্ময় সঞ্চার হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, অনেকদিন আগেই এই আলোচনা শুরু হয় নি বলেই তাদের বিস্মিত হওয়া উচিত ছিল। আয়ার্ল্যান্ড থেকে সিসিলি, আন্দালুসিয়া থেকে রাশিয়া ও বুলগেরিয়া পর্যন্ত কৃষকরা জনসমষ্টি, উৎপাদন ও রাজনৈতিক ক্ষমতার এক অতি অপরিহার্য উপাদান। ব্যতিক্রম শুধু পশ্চিম ইউরোপের দুটো অঞ্চল। খাস গ্রেট ব্রিটেনে বড় বড় ভূসম্পত্তি ও বৃহদায়তন কৃষি-ব্যবস্থা স্ব-নির্ভর কৃষকের স্থান সম্পূর্ণ দখল করে নিয়েছে; এল্‌ব্‌ নদীর পূর্বতীরের প্রাশিয়ায় কয়েক শতাব্দী ধরে এই প্রক্রিয়া চলে আসছে; এখানেও কৃষককে ক্রমেই বেশি সংখ্যায় 'বিতাড়িত' করা হচ্ছে বা অন্তত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে পিছনে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

এতদিন পর্যন্ত কৃষক কেবল তার অনীহার মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক ক্ষমতার কারিকারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রাম্য জীবনের বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই তার সেই অনীহার মূল নিহিত। জনসমষ্টির বিপুল অংশের এই অনীহা প্যারিস ও রোমে পার্লামেণ্টী দুর্নীতিরই শুধু নয়, রুশ স্বৈরতন্ত্রেরও দৃঢ়তম স্তম্ভ। অথচ এ অনীহা মোটেই দুর্লঙ্ঘ্য নয়। পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষত যে-সব অঞ্চলে ছোট কৃষক মালিকানার প্রাধান্য, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের অভ্যুত্থানের পর থেকে কৃষকদের চোখে সমাজতন্ত্রী শ্রমিকদের সন্দেহভাজন ও বিরাগভাজন করে তোলা বুর্জোয়াদের পক্ষে

খুব কঠিন হয় নি; কৃষকদের কাছে সমাজতন্ত্রী শ্রমিকদের এমনভাবে দেখানো হয়েছে যেন এরা হল কুঁড়ে, লোভী একদল শহুরে লোক, যারা কৃষকদের সম্পত্তির উপর নজর দিয়েছে, partageux, যারা চায় কৃষকদের সম্পত্তি ভাগবাঁটোয়ারা করে নিতে। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারির বিপ্লবের ধোঁয়াটে সমাজতন্ত্রী আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অতি দ্রুত সমাধি দেওয়া হয় ফরাসী কৃষকদের প্রতিক্রিয়াশীল ভোটের জোরেই; কৃষক মানসিক শান্তি চেয়েছিল, তার সযত্নে রক্ষিত স্মৃতিকোষ থেকে সে কৃষকের সম্রাট নেপোলিয়নের কিংবদন্তী বের করে আনল, এবং দ্বিতীয় সাম্রাজ্য (১১৬) সৃষ্টি করল। কৃষকদের এই একটা কৃতিত্বের কী মূল্য ফরাসী জনগণকে দিতে হয়েছে তা আমরা সবাই জানি; সে দুর্ভোগের জের আজও চলছে।

কিন্তু তারপর অনেক কিছুই বদলে গেছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশের ফলে কৃষিতে ক্ষুদ্র উৎপাদনের জীবনসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে; ক্ষুদ্র উৎপাদন অনিবার্য গতিতে ধ্বংসের দিকে চলছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ভারতের প্রতিযোগীরাও সস্তা শস্যে ইউরোপের বাজার ভাসিয়ে দিয়েছে, সে শস্য এত সস্তা যে ইউরোপের কোনো উৎপাদক তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। বড় বড় ভূস্বামী আর ছোট কৃষক উভয়েই আজ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। উভয়েই জমির মালিক এবং উভয়েই গ্রামবাসী, তাই বড় ভূস্বামীরা ছোট কৃষকদের স্বার্থের রক্ষক বলে নিজেদের জাহির করছে এবং ছোট কৃষকরাও তাদের সেইভাবে মোটের উপর স্বীকার করছে।

ইতিমধ্যে পশ্চিমাংশে এক শক্তিশালী সোশ্যালিস্ট শ্রমিক পার্টি গড়ে উঠেছে এবং বিকাশ লাভ করেছে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময়কার অস্পষ্ট সব ধারণা ও অনুভূতি আজ পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে, বিস্তৃততর ও গভীরতর হয়েছে এবং সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন-সম্মত এক কর্মসূচির আকার নিয়েছে, যার মধ্যে স্থান পেয়েছে একাধিক নির্দিষ্ট বাস্তব দাবি; ক্রমবর্ধমানসংখ্যক সমাজতন্ত্রী প্রতিনিধিরা জার্মান, ফরাসী ও বেলজিয়ান পার্লামেণ্টে এই সব দাবি নিয়ে সংগ্রাম করছেন। সোশ্যালিস্ট পার্টির দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল আজ আর সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার নয়। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হলে এই পার্টিকে প্রথমে শহর থেকে গ্রামে

প্রবেশ করতে হবে, গ্রামাঞ্চলে একটা শক্তি হয়ে উঠতে হবে। অন্য সকলের তুলনায় এই পার্টির এই একটা বিশেষ সুবিধা রয়েছে যে, অর্থনৈতিক কারণ এবং রাজনৈতিক পরিণতি এই দুইয়ের অন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে তার স্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি আছে এবং তাতে করে কৃষকের নাছোড়বান্দা বন্ধু এই সব বড় বড় ভূস্বামীদের মেষচর্মাবৃত নেকড়ের স্বরূপ সে অনেকদিন আগেই ধরে ফেলেছে। এই পার্টির পক্ষে কি সম্ভব ভাগ্যহত কৃষককে তার কপট রক্ষাকর্তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া, যাতে শেষ পর্যন্ত কৃষক শিল্প-শ্রমিকের নিষ্ক্রিয় বিরোধী থেকে সক্রিয় বিরোধীতে পরিণত হয়? এই প্রসঙ্গেই আমরা কৃষক সমস্যার একেবারে কেন্দ্রীয় কথায় পৌঁছচ্ছি।

১

গ্রামের যে জনসমষ্টির দিকে আমরা মনোনিবেশ করতে পারি তাদের মধ্যে অনেকরকমের ভাগ আছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলেও তার সবিশেষ বিভিন্নতা দেখা যায়।

পশ্চিম জার্মানিতে, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামেরই মতো ছোট জোতের মালিক কৃষকদের ক্ষুদ্রায়তন কৃষিরই প্রাধান্য। এদের মধ্যে অধিকসংখ্যকই নিজ নিজ জমিখন্ডের মালিক এবং অল্পাংশ সে জমি ইজারায় নিয়েছে।

উত্তর-পশ্চিমে — নিম্ন স্যাক্সনি ও শ্লেজভিগ-হল্‌স্টাইনে — বড় এবং মাঝারি চাষীর প্রাধান্য দেখতে পাই। পুরুষ এবং স্ত্রী খেতমজুর তো বটেই, এমন কি দিন-মজুর ছাড়াও এদের চলে না। ব্যাভেরিয়ার একাংশ সম্পর্কেও একথা খাটে।

এল্‌ব্‌ নদীর পূর্বতীরের প্রাশিয়ায় এবং মেক্‌লেনবুর্গে দেখা যায় বড় বড় ভূসম্পত্তি এবং চাকরবাকর, খেতমজুর ও দিন-মজুর দিয়ে বৃহদায়তন চাষের অঞ্চল, আর তাদেরই মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্রমক্ষীয়মাণ সংখ্যায় ছোট ও মাঝারি কৃষক।

মধ্য জার্মানিতে উৎপাদন ও ভূসম্পত্তির মালিকানার এই সব রূপই ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে মিশে আছে দেখা যায়। কোনো বড় অঞ্চল জুড়ে কোনো একটা বিশেষ রূপের সুস্পষ্ট প্রাধান্য নেই।

এগুলি ছাড়াও ছোট-বড় এমন সব অঞ্চল আছে যেখানে নিজস্ব বা ইজারায় নেওয়া আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ পরিবারের জীবিকা নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট নয়, সে পরিমাণ জমি কেবল পারিবারিক কোনো বৃত্তিরই ভিত্তি হতে পারে এবং তারই সাহায্যে সে বৃত্তি অন্যথা অকল্পনীয় কম মজুরি দিতে পারে, ফলে সমস্ত বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও তার উৎপন্ন মালের নিয়মিত বিক্রি সুনিশ্চিত থাকে।

এই গ্রাম্য জনতার কোন কোন অংশকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি স্বপক্ষে আনতে পারে? আমরা অবশ্য খুবই মোটামুটিভাবে এই প্রশ্নের আলোচনা করব; সুনির্দিষ্ট রূপগুলিই কেবল আমরা বেছে নেব। মধ্যবর্তী স্তর বা মিশ্রিত গ্রামীণ জনসমষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করার মতো স্থান এখানে নেই।

ছোট কৃষককে নিয়েই শুরু করা যাক। পশ্চিম ইউরোপে সাধারণভাবে সমস্ত কৃষকের মধ্যে এই ছোট কৃষকই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেবল তাই নয়, সমগ্র প্রশ্নটির যে মীমাংসা করে সে সেই চরম ব্যাপারটিও বটে। একবার নিজেদের মনে ছোট কৃষকদের সম্পর্কে মনোভাব আমরা ঠিক করে নিতে পারলে গ্রামীণ জনসমষ্টির অন্যান্য অংশ সম্পর্কে আমাদের মত স্থির করার প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য আমাদের হাতে এসে যায়।

নিজে এবং নিজ পরিবারের সাহায্যেই যতটা চাষ করা যায়, তার চেয়ে বড় নয়, এবং যতটুকু থেকে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলে, তার চেয়ে ছোট নয়, ছোট কৃষক বলতে এখানে আমরা সেইরকম এক খণ্ড জমির মালিক বা ইজারাদার, বিশেষত প্রথমোক্তকেই, বোঝাচ্ছি। ঠিক ছোট হস্তশিল্পীদের মতো এই ছোট কৃষকও অতএব একজন শ্রমজীবী, আধুনিক প্রলেতারীয়ের সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে, সে এখনও তার শ্রমের হাতিয়ারের মালিক, এবং সেইজন্যই সেটা এক বিগত উৎপাদন-পদ্ধতির জের। ভূমিদাস, অধীন চাষী কিংবা, অতি ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে, খাজনা দিতে ও সামন্ত দায় পালনে বাধ্য, মুক্ত কৃষক — এই সব পূর্বপুরুষদের সঙ্গে ছোট কৃষকের পার্থক্য তিনদিক থেকে। প্রথম পার্থক্য এইখানে যে, ভূস্বামীর কাছে তার যে সামন্ততান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা ও প্রদেয় ছিল তা

থেকে ফরাসী বিপ্লব তাকে মুক্ত করেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে, অন্তত রাইন নদীর বামতীরে, তারই হাতে নিজস্ব স্বাধীন সম্পত্তিরূপে তার কৃষি জোত তুলে দিয়েছে। দ্বিতীয় পার্থক্য এইখানে যে, স্বয়ংশাসিত মার্ক গোষ্ঠীর আশ্রয় সে হারিয়েছে এবং তাই আগেকার এজমালি জমি ভোগদখলের অধিকারে তার অংশ থেকেও সে বঞ্চিত হয়েছে। এজমালি মার্ককে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে অংশত আগেকার সামন্ত প্রভুরা এবং অংশত রোমান আইনের আদর্শে রচিত উদারনীতিক আমলাতান্ত্রিক আইনকানুন। এর ফলে, পশু খাদ্য না কিনেই ভারবাহী পশুদের খাওয়াবার যে সুযোগ ছিল তা থেকে আধুনিক কালের ছোট কৃষক বঞ্চিত হল। অবশ্য অর্থনৈতিকভাবে সামন্ত বাধ্যবাধকতা উঠে যাওয়ার ফলে যে লাভ হয়েছে তার চেয়ে মার্কের উপর অধিকার হারিয়ে তার লোকসান হয়েছে অনেক বেশি। নিজস্ব ভারবাহী পশু রাখতে পারে না এমন কৃষকের সংখ্যা অনবরত বেড়ে চলছে। তৃতীয়ত, আজকের কৃষক আগেকার উৎপাদনী কার্যকলাপের অর্ধেক হারিয়েছে। আগে সে আর তার পরিবার মিলে, তার নিজেরই উৎপন্ন কাঁচামাল থেকে নিজের প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্যের অধিকাংশ উৎপাদন করত; অবশিষ্ট প্রয়োজন মেটাত তার প্রতিবেশীরা, এরাও চাষবাসের পাশাপাশি কোনো না কোনো একটি বৃত্তি অনুসরণ করত এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মূল্য পেত দ্রব্য বিনিময় করে বা প্রতিদানমূলক কাজ মারফৎ। প্রতিটি পরিবার, বিশেষ করে প্রতিটি গ্রাম ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ; নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছুই তারা নিজেরাই উৎপাদন করত। সে ছিল প্রায় অবিমিশ্র স্বভাব অর্থনীতি; অর্থের প্রায় কোনো প্রয়োজনই ছিল না। পুঁজিবাদী উৎপাদন এই অবস্থার অবসান ঘটাল মুদ্রা অর্থনীতি ও বৃহদায়তন শিল্পের দ্বারা। কিন্তু এজমালি জমি যদি কৃষকের অস্তিত্বের প্রথম মূল শর্ত বলে ধরা হয়, তবে শিল্পগত এই গৌণ বৃত্তি তার দ্বিতীয় শর্ত। এবং এইভাবেই কৃষক আরও গভীরে ডুবতে থাকে। করভার, শস্যহানি, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা আর মামলা মকদ্দমা একজনের পর একজন কৃষককে মহাজনের কবলে ঠেলে দেয়; ঋণগ্রস্ততা ক্রমেই আরও সর্বজনীন হয়ে ওঠে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রমাগত বেড়ে চলে — সংক্ষেপে,

বিগত উৎপাদন-পদ্ধতির অন্য সব অবশেষের মতোই, আমাদের ছোট কৃষকও অসহায়ভাবে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। সে একজন ভবিষ্যৎ প্রলেতারীয়।

এইদিক থেকে সমাজতন্ত্রী প্রচারে তার সাগ্রহেই সাড়া দেওয়া উচিত। কিন্তু তার দৃঢ়মূল সম্পত্তিবোধ তাকে সাময়িকভাবে বাধা দিচ্ছে। তার বিপন্ন জমিটুকু রক্ষা করা যতই কঠিন হয়ে ওঠে, ততই সে আরও মরীয়া হয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে, আর যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা সমস্ত ভূসম্পত্তি সমগ্র সমাজের হাতে তুলে দেবার কথা বলে, তাদেরকে সে মহাজন আর উকিলদের মতোই বিপজ্জনক শত্রু বলে ভাবতে থাকে। তাদের এই প্রতিকূল ধারণাকে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি কীভাবে কাটিয়ে উঠতে পারে? নিজেদের প্রতি অসৎ না হয়েও ধ্বংসোন্মুখ ছোট কৃষককে সে কী দিতে পারে?

এই প্রসঙ্গে মার্কসীয় প্রবণতাবিশিষ্ট ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের কৃষি কর্মসূচি থেকে আমরা একটি ব্যবহারিক নির্ভরবিন্দু পাই; ছোট কৃষক অর্থনীতির চিরায়ত দেশ থেকে এসেছে বলেই এই কর্মসূচিটি আরো অনুধাবনযোগ্য।

১৮৯২-এ অনুষ্ঠিত **মার্সাই** কংগ্রেসে পার্টির প্রথম কৃষি কর্মসূচি গৃহীত হয়। তাতে সম্পত্তিহীন গ্রামীণ **শ্রমিকদের** (অর্থাৎ দিন-মজুর ও চাকরবাকরদের) জন্য দাবি করা হয়: ট্রেড ইউনিয়ন ও গোষ্ঠীর পরিষদগুলি দ্বারা নির্ধারিত সর্বনিম্ন মজুরি; গ্রামীণ বৃত্তি-আদালত, যার অর্ধেক সভ্য হবে শ্রমিক; গোষ্ঠীর জমি বিক্রয় নিষিদ্ধ করা এবং রাষ্ট্রীয় জমি গোষ্ঠীর কাছে ইজারা দেওয়া, এই গোষ্ঠীগুলো সমস্ত জমি — তা সে জমি নিজেদের হোক বা ইজারা নেওয়াই হোক — মিলিত চাষের জন্য সম্পত্তিহীন খেতমজুর পরিবারদের নিয়ে গঠিত সমিতিকে ইজারা দেবে এই শর্তে যে, তারা মজুরি-শ্রমিক নিয়োগ করতে পারবে না, গোষ্ঠী তাদের ওপর তদারক করবে; বার্ধক্য ও অশক্ত অবস্থার জন্য পেনশন, তার খরচ চালানো হবে বড় বড় ভূসম্পত্তির উপর বিশেষ কর বসিয়ে।

ইজারাদার ও ভাগচাষীদের (métayers) কথাও বিশেষ বিবেচনা করে,

কর্মসূচিতে **ছোট কৃষকদের** জন্য এই দাবি করা হয়েছে: গোষ্ঠী চাষের যন্ত্রপাতি কিনে সেগুলি পড়তা খরচায় কৃষকদের কাছে ইজারা দেবে; সার, পয়ঃপ্রণালীর পাইপ, বীজ প্রভৃতি ক্রয় এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য কৃষকদের সমবায় সমিতি গঠন; ৫,০০০ ফ্রাঁর বেশি মূল্যের ভূসম্পত্তি না হলে তার উপর থেকে হস্তান্তর কর তুলে নেওয়া; অতিরিক্ত খাজনা কমাবার জন্য এবং যে ইজারাদার বা ভাগচাষী (métayers) জমি ছেড়ে দিচ্ছে তার শ্রমের মধ্য দিয়ে জমির উন্নতির দরুন তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আইরিশ আদর্শে সালিশী কমিশন; Code civil*-এর যে ২১০২ নং ধারা জমিদারদের হাতে ফসল ক্রোক করার অধিকার দিয়েছে সেই ধারা রদ এবং কেটে তোলার আগে মাঠের ফসল বন্ধকী দখলের যে ক্ষমতা মহাজনদের আছে তার অবসান; নির্দিষ্ট পরিমাণ চাষের যন্ত্রপাতি এবং ফসল, বীজ, সার, ভারবাহী পশু, এককথায় কাজ চালাবার জন্য চাষীর একান্ত প্রয়োজনীয় সব কিছুতে বন্ধকী দখল নিষিদ্ধ করা; বহুদিন থেকেই অচল হয়ে পড়া সাধারণ মোকররী তালিকার সংশোধন, এবং যতদিন তা না হয় ততদিন প্রতি গোষ্ঠীতে স্থানীয় সংশোধন; সর্বশেষে, চাষ সম্পর্কে বিনামূল্যে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা এবং পরীক্ষামূলক কৃষিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

দেখা যাচ্ছে যে, কৃষকদের জন্য যেসব দাবি করা হয়েছে -- শ্রমিকদের জন্য দাবিগুলি আপাতত আমাদের আলোচ্য নয় — সেগুলি খুব সুদূরপ্রসারী নয়। এর একাংশ ইতিমধ্যেই অন্যান্য কোনো কোনো দেশে প্রচলিত হয়েছে। ইজারাদারদের সালিশী আদালত যে আইরিশ আদর্শ থেকে নেওয়া হয়েছে, সেকথা তো স্পষ্ট। কৃষকদের সমবায় সমিতি রাইন প্রদেশে আগে থেকেই আছে। মোকররী তালিকার সংশোধন সারা পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত উদারপন্থী, এমন কি আমলাদেরও চিরকালের সাধু ইচ্ছা। অন্যান্য দাবিগুলিও বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গুরুতর কোনো হানি না করে কার্যে পরিণত করা যায়। কর্মসূচিটির চরিত্র বর্ণনা করার জন্যই এত আলোচনা, তিরস্কার এর উদ্দেশ্য নয়, বরং ঠিক তার বিপরীত।

ফ্রান্সের অতি বিভিন্ন ধরনের সব অঞ্চলে এই কর্মসূচি নিয়ে পার্টি

* দেওয়ানি বিধি (১১৭)। — সম্পাঃ

এত চমৎকার কাজ করেছে যে, কৃষকদের রুচির সঙ্গে এটিকে আরও খাপ খাইয়ে নেবার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে লাগল, কেননা খেতে পেলেই ক্ষিদে বাড়ে। সেইসঙ্গে অবশ্য এও বোঝা গেল যে, এতে বিপজ্জনক পথে পা দেওয়া হবে। সাধারণ সমাজতন্ত্রী কর্মসূচির মূলনীতিগুলি লঙ্ঘন না করে কৃষককে, ভবিষ্যৎ প্রলেতারীয় রূপে নয়, আজকের সম্পত্তি-মালিক কৃষককে কি সাহায্য করা সম্ভব? এই আপত্তি খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে নতুন ব্যবহারিক প্রস্তাবগুলির আগে একটি তত্ত্বগত মুখবন্ধ যোগ করে দেওয়া হল, তাতে প্রমাণ করার চেষ্টা হল যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্তির হাত থেকে ছোট কৃষকের সম্পত্তি রক্ষা করা সমাজতন্ত্রের নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, যদিও একথা ভালো করেই জানা আছে যে, সে ধ্বংস অনিবার্য। এ বছর সেপ্টেম্বর মাসে নান্ত কংগ্রেসে গৃহীত এই মুখবন্ধটি এবং তার সঙ্গে দাবিগুলিও এবার আরও একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করা যাক।

মুখবন্ধটি শুরু হয়েছে এইভাবে:

'যে-হেতু, পার্টির সাধারণ কর্মসূচি অনুসারে উৎপাদকেরা মুক্ত হতে পারে কেবল উৎপাদন-উপায়ের উপর তাদের মালিকানা বর্তালে;

'যে-হেতু, শিল্পক্ষেত্রে এই সমস্ত উৎপাদন-উপায় ইতিমধ্যেই পুঁজিবাদী কেন্দ্রীকরণের এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, একমাত্র যৌথ বা সামাজিক রূপেই সেগুলি উৎপাদকদের হাতে প্রত্যর্পণ করা যায়, অথচ কৃষির ক্ষেত্রে — অন্তত বর্তমান ফ্রান্সে — অবস্থা মোটেই সেরকম নয়, কেননা, উৎপাদন-উপায়, অর্থাৎ জমি বহু অঞ্চলে এখনও এক একজন উৎপাদকের হাতে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে বর্তমান;

'যে-হেতু, ক্ষুদ্রায়তন মালিকানা যার বৈশিষ্ট্য সেই বর্তমান ব্যবস্থার ধ্বংস অনিবার্য হলেও (est fatalement appelé à disparaître) সে ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করা সমাজতন্ত্রের কাজ নয়, কেননা শ্রমের কাছ থেকে সম্পত্তি বিচ্ছিন্ন করা তার কর্তব্য নয়, বরং তার বিপরীত, সর্বপ্রকার উৎপাদনের এই দুই উপাদানকে একই হাতে ন্যস্ত করে এক করে দেওয়াই তার কর্তব্য — প্রলেতারীয়ে পরিণত শ্রমিকের দাসত্ব ও দারিদ্র্য এই দুই উপাদানের **বিচ্ছিন্নতারই ফল;**

'যে-হেতু, এক দিকে, যেমন বড় বড় ভূসম্পত্তির বর্তমান অলস মালিকদের উচ্ছেদ করে সেই সমস্ত ভূসম্পত্তির উপরে কৃষক প্রলেতারীয়দের যৌথ বা সামাজিক মালিকানার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সমাজতন্ত্রের কর্তব্য, অপর দিকেও, তেমনি যে কৃষক নিজ

ভূমিখণ্ডের দখল রেখে নিজেই চাষ করে তাকে করভার, সুদখোর মহাজন এবং নতুন গজিয়ে ওঠা বড় বড় জমিদারদের কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখাও সমাজতন্ত্রের কম জরুরী কর্তব্য নয়;

'যে-হেতু, যেসব উৎপাদনকারী ইজারাদার বা ভাগচাষী (métayers) হিসেবে অন্য মালিকের জমি চাষ করে এবং যারা নিজেরা দিন-মজুরদের শোষণ করলেও সেটা করতে খানিকটা বাধ্য হয় তারা নিজেরাও শোষিত হয় বলেই, তাদেরও জন্য উপরোক্ত রক্ষা-ব্যবস্থা প্রযোজ্য হওয়া যুক্তিযুক্ত, —

'তাই শ্রমিক পার্টি', যে পার্টি নৈরাজ্যবাদীদের মতো সমাজ-ব্যবস্থা রূপান্তরের জন্য দারিদ্র্যের বৃদ্ধি ও বিস্তারের উপর নির্ভর করে না, বরং বিশ্বাস করে যে, শহর ও গ্রামের মেহনতীদের সংগঠন ও মিলিত প্রচেষ্টায়, সরকার ও আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা স্বহস্তে অধিকার করার মাধ্যমেই কেবলমাত্র শ্রম ও সমাজের মুক্তিলাভ সম্ভব,— সেই শ্রমিক পার্টি নিম্নলিখিত কৃষি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যাতে গ্রামীণ উৎপাদণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত অংশকে, ভিন্ন ভিন্ন অধিকার ও পাট্টার বলে যেসব বৃত্তিতে জাতীয় ভূমি-সম্পদ ব্যবহার করা হয় সেই সব বৃত্তিকে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে, ভূস্বামী সামন্ত-প্রথার বিরুদ্ধে একই সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করা যায়।'

এবার এই সব 'যে-হেতু' আর একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করা যাক।

প্রথমত, উৎপাদকদের মুক্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে উৎপাদন-উপায়ের উপর তাদের অধিকার, ফরাসী কর্মসূচির এই উক্তিটির সঙ্গেই জড়িত পরের কথাগুলি যোগ করে নেওয়া একান্ত দরকার যে, উৎপাদন-উপায়ের উপর অধিকার মাত্র দুটি রূপে সম্ভব, হয় ব্যক্তিগত অধিকাররূপে, সমস্ত উৎপাদকদের ক্ষেত্রে একইরূপে এই অধিকার কখনও কোথাও ছিল না এবং শিল্প-প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রোজই তা আরও অসম্ভব হয়ে উঠছে; নতুবা সাধারণের অধিকাররূপে, পুঁজিবাদী সমাজের নিজস্ব বিকাশের মধ্য দিয়েই এই ধরনের অধিকারের বৈষয়িক ও মানসিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে; এবং সেই জন্যই, প্রলেতারিয়েতকে তার ক্ষমতাধীন সমস্ত উপায় দিয়ে উৎপাদন-উপায়ের উপর **যৌথ** অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

এইভাবে, উৎপাদন-উপায়গুলির উপর যৌথ অধিকার প্রতিষ্ঠাই এখানে একমাত্র প্রধান লক্ষ্য বলে উপস্থিত করা হচ্ছে, যারই জন্য লড়াই করতে হবে। ইতিমধ্যেই যার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে সেই শিল্পক্ষেত্রেই কেবল তা নয়, সর্বত্রই, সুতরাং কৃষিক্ষেত্রেও। কর্মসূচি অনুসারে সব উৎপাদকের ক্ষেত্রে

কখনও কোথাও ব্যক্তিগত অধিকার একইরূপে থাকে নি, আর ঠিক সেই কারণেই, এবং তাছাড়াও শিল্প-প্রগতি যখন শেষ পর্যন্ত এর অবসান ঘটাবেই, তখন একে বজায় রাখায় সমাজতন্ত্রের কোনো আগ্রহ নেই, বরং এর অপসারণেই তার আগ্রহ, কেননা এই ধরনের অধিকার যেখানে যতটা পরিমাণে বর্তমান সেখানে ততটা পরিমাণে যৌথ অধিকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে কর্মসূচির উল্লেখ করতে হলে সমস্ত কর্মসূচির উল্লেখ করা দরকার। তাতে নান্ত-এ উদ্ধৃত প্রতিপাদ্যটা বেশ কিছুটা বদলে যায়, কেননা তাতে করে অভিব্যক্ত সাধারণ ঐতিহাসিক সত্যটাকে সেই শর্তসাপেক্ষ করা হচ্ছে, যা থাকলে তবেই তা আজ পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় সত্য হতে পারে।

নিজ উৎপাদন-উপায়ের উপর অধিকার থাকলেই একজন উৎপাদক প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে, সে অবস্থা আর নেই। শহরাঞ্চলে হস্তশিল্প তো ইতিমধ্যেই ধ্বংস পেয়েছে, লন্ডনের মতো মহানগরীগুলিতে তা একেবারেই অন্তর্হিত হয়েছে, তার স্থান নিয়েছে বৃহদায়তন শিল্প, রক্ত-নিংড়ানো কারখানা-ব্যবস্থা আর সেই হতভাগা প্রবঞ্চকদের দল, দেউলিয়াপনার প্রসাদে যাদের জীবনযাপন ঘটে। স্ব-নির্ভর ছোট কৃষকের নিজের ছোট জমির ফালিটুকুর উপর অধিকারও নিরাপদ নয়, স্বাধীনতাও তার নেই। তার ঘরবাড়ি, তার খামার, তার সামান্য কয়েক টুকরো জমি এবং তার সঙ্গে সে নিজে পর্যন্ত মহাজনের সম্পত্তি; তার জীবিকা প্রলেতারীয়ের চেয়েও অনিশ্চিত, প্রলেতারীয় তবু মাঝে মাঝে দু-একটা দিন শান্তিতে থাকতে পায়, চিরলাঞ্ছিত ঋণদাস সেটুকুও কখনও পায় না। দেওয়ানি বিধির ২১০২ নং ধারা তুলে দিন, আইনে ব্যবস্থা করে দিন যাতে কৃষকের চাষের সরঞ্জাম ও ভারবাহী পশু ক্রোক থেকে অব্যাহতি পাবে, তবু তাকে সেই নিরুপায় অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারবেন না, যখন সে 'স্বেচ্ছায়' তার গোরু-বলদ বেচতে বাধ্য হবে, মহাজনের কাছে দেহমন লিখে দিয়ে সাময়িক রেহাই পেয়ে খুশী হবে। ছোট কৃষককে তার সম্পত্তিতে টিকিয়ে রাখার জন্য আপনাদের এই চেষ্টায় তার স্বাধীনতা রক্ষা পায় না, কেবল তার দাসত্বের বিশেষ রূপটিই বজায় থাকে; শুধু জীবন্মৃত অবস্থাই চালিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তার বাঁচারও উপায় নেই, মরারও উপায় নেই। সুতরাং,

আপনাদের বক্তব্যের সমর্থনে আপনাদের কর্মসূচির প্রথম অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা এখানে একান্তই অপ্রাসঙ্গিক।

মুখবন্ধে বলা হয়েছে, আজকের ফ্রান্সে উৎপাদনের উপায়, অর্থাৎ জমি, অনেক অঞ্চলেই এখনও এক একজন উৎপাদকের হাতে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে রয়েছে; এবং শ্রমের কাছ থেকে সম্পত্তি বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া সমাজতন্ত্রের কর্তব্য নয়, বরং সমস্ত উৎপাদনের এই দুই উপাদানকে এক হাতে ন্যস্ত করে মিলিত করাই তার কর্তব্য। — ইতিপূর্বেই দেখানো হয়েছে যে, শেষোক্তটা এইরকম সাধারণ রূপে, কোনোক্রমেই সমাজতন্ত্রের কর্তব্য নয়। প্রকৃতপক্ষে তার কর্তব্য হচ্ছে কেবল উৎপাদন-উপায়গুলিকে উৎপাদকদের কাছে **সাধারণ মালিকানা** হিসেবে হস্তান্তরিত করা। এই কথাটি ভুলে গেলেই উক্তিটি সরাসরি বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে, কেননা তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ছোট কৃষকের নিজ জমির উপর বর্তমানে যে ভুয়া অধিকার আছে তাকে প্রকৃত অধিকারে পরিণত করা, অর্থাৎ ছোট ইজারাদারকে মালিকে পরিণত করা এবং ঋণগ্রস্ত মালিককে ঋণমুক্ত মালিকে রূপান্তরিত করাই সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য। কৃষক মালিকানার এই ভুয়া আপাতদৃশ্যের অবসান সমাজতন্ত্র নিশ্চয়ই চায়, কিন্তু এভাবে নয়।

সে যাই হোক, এত দূর পর্যন্ত যখন এগিয়ে আসা গেল তখন কর্মসূচির মুখবন্ধ এবার সরাসরি ঘোষণা করতে পারে যে, সমাজতন্ত্রের কর্তব্য, শুধু কর্তব্য নয়, অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হচ্ছে,

> 'যে কৃষক নিজ ভূমিখণ্ডের দখল রেখে নিজেই চাষ করে তাকে করভার, সুদখোর মহাজন এবং নতুন গজিয়ে ওঠা বড় বড় জমিদারদের কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখা।'

এইভাবে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে যা অসম্ভব বলে ঘোষণা করা হল, এখানে মুখবন্ধে সেই কাজই অবশ্যপালনীয় কর্তব্য বলে সমাজতন্ত্রের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কৃষকের ক্ষুদ্রায়তন কৃষি-ব্যবস্থাকে 'বজায় রাখার' ভার দেওয়া হচ্ছে, অথচ এই মুখবন্ধেই বলা হয়েছে যে, এই ধরনের মালিকানার 'ধ্বংস অনিবার্য'। পুঁজিবাদী উৎপাদন যেসব হাতিয়ারে এই অনিবার্য ধ্বংস সংঘটিত করে তা এই করভার, সুদখোর মহাজন এবং নতুন গজিয়ে ওঠা বড়

বড় জমিদাররা ছাড়া আর কী? এই 'ত্রিমূর্তি'র' কবল থেকে কৃষককে রক্ষার জন্য 'সমাজতন্ত্র' কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেটা আমরা নিচে দেখতে পাব।

কিন্তু কেবল ছোট কৃষকের সম্পত্তিকে রক্ষা করলেই হবে না।

'যেসব উৎপাদনকারী ইজারাদার বা ভাগচাষী (métayers) হিসেবে অন্য মালিকের জমি চাষ করে এবং যারা নিজেরা দিন-মজুরদের শোষণ করলেও সেটা করতে খানিকটা বাধ্য হয় তারা নিজেরাও শোষিত হয় বলেই, তাদেরও জন্য উপরোক্ত রক্ষা-ব্যবস্থা প্রযোজ্য হওয়া যুক্তিযুক্ত।'

এবার আমরা সত্যই বিচিত্র জায়গায় এসে পড়লাম। সমাজতন্ত্র বিশেষভাবে মজুরি-শ্রমের শোষণের বিরোধী। অথচ এখানে আক্ষরিকভাবে এই ভাষায় ঘোষণা করা হচ্ছে যে, ফরাসী ইজারাদাররা যখন 'দিন-মজুরদের **শোষণ করে'** তখনও তাদের রক্ষা করা সমাজতন্ত্রের একান্ত কর্তব্য! আর তার কারণ এই যে, 'নিজেরাও শোষিত হয় বলেই' তারা এই শোষণ করতে অনেকটা বাধ্য হয়!

ঢালুতে একবার নামতে শুরু করলে গড়িয়ে যাওয়াটাই কত সহজ আর আরামদায়ক! এবার যখন জার্মানির বড় ও মাঝারি কৃষকরা এই অনুরোধ নিয়ে ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের কাছে আসবে যে, তাদের পুরুষ ও মেয়ে খেতমজুরদের শোষণের ব্যাপারে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি তাদের যাতে রক্ষা করে তার জন্য জার্মান পার্টির কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে তাঁরা যেন একটু অনুরোধ করেন, এবং সেই বক্তব্যের সমর্থনে দেখাবে যে মহাজন, কর-আদায়কারী, শস্য-ফাটকাবাজ এবং পশু ব্যবসায়ীদের দ্বারা 'তারাও শোষিত হয়', তখন ফরাসী সমাজতন্ত্রীরা কী জবাব দেবেন? আমাদের বড় বড় ভূস্বামীরাও যে কাউণ্ট কানিৎসকে (ইনিও শস্য আমদানির ব্যাপারে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের অনুরূপ এক প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন) ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের কাছে পাঠিয়ে গ্রামীণ শ্রমিক শোষণ-ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে বলবে না এবং এই কথার সমর্থনে ফাটকাবাজার, মহাজন ও শস্য-ফাটকাবাজদের দ্বারা 'তারা নিজেরাও শোষিত হয়' এই যুক্তি হাজির করবে না, তারই কি কোনো নিশ্চয়তা আছে?

শুরুতেই বলে রাখা ভালো যে, আমাদের ফরাসী বন্ধুদের উদ্দেশ্য যতটা খারাপ মনে হচ্ছে ততটা খারাপ নয়। জানা গেল যে, উপরের উক্তিটি কেবল একটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য, সে ক্ষেত্রটি হচ্ছে এই: আমাদের যেসব অঞ্চলে চিনি-বীট চাষ করা হয় সেই সব অঞ্চলেরই মতো উত্তর ফ্রান্সেও বীট চাষ করতেই হবে, এই বাধ্যবাধকতায় ও অত্যন্ত কঠোর শর্তে কৃষকদের জমি ইজারা দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট কোনো কারখানায় তারই দ্বারা নির্দিষ্ট মূল্যে তাদের সেই বীট সরবরাহ করতে হবে, নির্দিষ্ট বীজ কিনতে হবে, জমিতে নির্দিষ্ট সার নির্দিষ্ট পরিমাণে দিতে হবে এবং তারপর ফসল পেঁছে দেবার সময় প্রচণ্ডভাবে ঠকতে হবে। জার্মানিতেও আমরা এই ধরনের ব্যবস্থার সঙ্গে খুবই পরিচিত। কিন্তু এই ধরনের কৃষককে রক্ষা করার কথাই যদি হয়, তবে সে কথা স্পষ্টভাবে খোলাখুলি বলাই উচিত। বাক্যটি এখন যেভাবে আছে তার সেই সাধারণ অ-সীমাবদ্ধ রূপে কেবল যে ফরাসী কর্মসূচিরই বিরোধিতা করা হয় তাই নয়, সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের মূলনীতিও লঙ্ঘন করা হয়, ফলে বিভিন্ন মহল থেকে যদি তাঁদের অভিপ্রায়ের বিপরীতে অসাবধান সম্পাদনার এই নিদর্শনটি তাঁদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয় তাহলেও রচয়িতাদের পক্ষ থেকে নালিশ করার উপায় থাকবে না।

মুখবন্ধের শেষ কথাটিরও কদর্থ হওয়া সম্ভব। সেখানে বলা হচ্ছে যে,

> 'গ্রামীণ উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত অংশকে, ভিন্ন ভিন্ন অধিকার ও পাট্টার বলে যেসব বৃত্তিতে জাতীয় ভূমি-সম্পদ ব্যবহার করা হয় সেই সব বৃত্তিকে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে, ভূস্বামী সামন্ত-প্রথার বিরুদ্ধে একই সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করা'

শ্রমিক সোশ্যালিস্ট পার্টির কর্তব্য।

গ্রামের প্রলেতারিয়েত এবং ছোট কৃষক ছাড়াও, মাঝারি ও বড় কৃষক, এমন কি বড় বড় মহালের ইজারাদার, পুঁজিবাদী পশু-প্রজনন ব্যবসায়ী এবং জাতির ভূমি-সম্পদের অন্যান্য পুঁজিবাদী ব্যবহারকারীদেরও নিজেদের মধ্যে নিয়ে নেওয়া শ্রমিক সোশ্যালিস্ট পার্টির কর্তব্য হতে পারে, একথা আমি সরাসরি অস্বীকার করি। ভূস্বামী সামন্ততন্ত্র এদের সবারই কাছে শত্রুরূপে দেখা দিতে পারে। কোনো কোনো প্রশ্নে আমরা এদের সঙ্গে

সমস্বার্থ হতে বা নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য সাধনের জন্য কখনও কখনও পাশাপাশি লড়াই করতেও পারি। সমাজের যেকোনো শ্রেণী থেকে আগত ব্যক্তিবিশেষকে আমরা পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, কিন্তু পুঁজিপতি, মাঝারি বুর্জোয়া বা মাঝারি কৃষক স্বার্থের প্রতিনিধিত্বমূলক কোনো গোষ্ঠীতে আমাদের কোনোই প্রয়োজন নেই। অবশ্য এক্ষেত্রেও, এঁদের আসল উদ্দেশ্য যতটা খারাপ দেখাচ্ছে ততটা খারাপ নয়। স্পষ্টতই, কর্মসূচির রচয়িতারা এসব দিক সম্পর্কে বিশেষ ভাবেনই নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সাধারণ উক্তির উৎসাহে তাঁরা গা ভাসিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং তাঁরা মুখে ঠিক যা বলছেন সেই ভাবেই সেটা নিলে তাঁদের বিস্মিত হওয়া উচিত নয়।

মুখবন্ধের পরই আসে কর্মসূচিরই নতুন সংযোজনীর কথা। এখানেও সেই মুখবন্ধের মতোই অসাবধান সম্পাদনার পরিচয় পাওয়া যায়।

যে ধারায় বলা হয়েছিল যে, গোষ্ঠীকেই চাষের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে হবে এবং সেগুলি পড়তা খরচায় কৃষকদের কাছে ইজারা দিতে হবে, সেটিকে বদলে এইভাবে দাঁড় করানো হয়েছে যে, প্রথমত, গোষ্ঠী এর জন্য রাষ্ট্র থেকে অর্থ সাহায্য পাবে এবং দ্বিতীয়ত, যন্ত্রপাতি ছোট কৃষককে দেওয়া হবে বিনামূল্যে। এই অতিরিক্ত সুবিধায়ও ছোট কৃষকের বিশেষ কোনো উপকার হবে না, কেননা তার খেত ও উৎপাদন-পদ্ধতি এমনই যে সেখানে যন্ত্রপাতির ব্যবহার অতি সামান্যই সম্ভব।

তারপর,

> 'বর্তমান সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের পরিবর্তে ৩,০০০ ফ্রাঁর বেশি সমস্ত আয়ের উপর ক্রমবর্ধমান হারে একটিমাত্র আয়কর প্রবর্তন।'

প্রায় প্রত্যেক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কর্মসূচিতেই বহু বছর ধরে এই ধরনের একটা দাবি স্থান পেয়ে আসছে। কিন্তু এখানে দাবিটিকে যে ছোট কৃষকদের বিশেষ স্বার্থে তোলা হয়েছে সেটা সত্যই অভিনব, এবং তাতে বোঝা যায় যে, এই দাবির বাস্তব তাৎপর্য কত কম বিবেচনা করা হয়েছে। গ্রেট ব্রিটেনের উদাহরণই ধরা যাক। সেখানে রাষ্ট্রের বাৎসরিক বাজেটের পরিমাণ ৯ কোটি পাউন্ড স্টার্লিং। তার মধ্যে ১ কোটি ৩৫ লাখ থেকে ১ কোটি ৪০ লাখ আসে আয়কর থেকে। বাকি ৭ কোটি ৬০ লাখের

একটা ক্ষুদ্রতর অংশ আসে কারবারের উপর শুল্ক থেকে (ডাক ও তার-ব্যবস্থা থেকে আদায়, স্ট্যাম্প শুল্ক); কিন্তু বৃহত্তম অংশই আসে সর্বসাধারণের ভোগ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক থেকে, দেশবাসীর, বিশেষত তার দরিদ্র অংশের প্রত্যেকের আয় থেকে প্রতিবারে যৎসামান্য, অননুভবনীয় একটু করে কেটে কেটে নিয়ে, যার মোট পরিমাণ দাঁড়ায় কোটি কোটি পাউন্ড। বর্তমান সমাজে রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহ করার অন্য কোনো পথ নেই বললেই চলে। ধরে নেওয়া যাক, গ্রেট ব্রিটেনে যাদের আয় ১২০ পাউন্ড স্টার্লিং (৩,০০০ ফ্রাঁ) বা তার বেশি তাদের সকলের উপর প্রত্যক্ষ ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর বসিয়ে এই ৯ কোটির বোঝা সবটাই চাপিয়ে দেওয়া হল। গিফেনের মতে, গড় জাতীয় সঞ্চয়, সর্বমোট জাতীয় সম্পদের বাৎসরিক বৃদ্ধি ১৮৬৫-১৮৭৫-এ ছিল ২৪ কোটি পাউন্ড স্টার্লিং। ধরে নেওয়া যাক বর্তমানে তার পরিমাণ বাৎসরিক ৩০ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে; ৯ কোটি ট্যাক্সের ভার এই সর্বমোট সঞ্চয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গ্রাস করবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, সমাজতন্ত্রী সরকার ছাড়া অন্য কোনো সরকার এরকম একটা কাজে হাত দিতে পারে না। আর সমাজতন্ত্রীরা যখন রাষ্ট্রের হাল ধরবে তখন তাদের এমন বহু কাজই করতে হবে যার কাছে কর-ব্যবস্থার এই সংস্কার নিতান্তই, ও রীতিমতো তাৎপর্যহীন, তাৎক্ষণিক বন্দোবস্ত বলে মনে হবে, এবং ছোট কৃষকদের সামনে তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে।

কর্মসূচির রচয়িতাদের, বোধ হয়, একথা খেয়াল ছিল যে, কর-ব্যবস্থার এই সংস্কারের জন্য কৃষককে বেশ দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে। তাই 'অন্তর্বর্তীকালে' (en attendant) তাদের এই পরিপ্রেক্ষিত দেওয়া হচ্ছে:

> 'নিজ শ্রমে জীবিকা নির্বাহকারী সমস্ত কৃষকের ভূমিকর থেকে অব্যাহতি এবং সমস্ত বন্ধকী জমির উপর এই করভার হ্রাস।'

এই দাবির শেষার্ধ শুধু **বৃহত্তর** জোত নিয়েই সম্ভব, যেগুলির কেবলমাত্র নিজ পরিবার দ্বারা চাষ হয় না; সুতরাং, এই ব্যবস্থাও সেই সব কৃষকের অনুকূলে, যারা 'দিন-মজুরদের শোষণ করে'।

তারপর:

'পশুপাখি, মৎস্য ও শস্য সংরক্ষণের জন্য যে বিধিনিষেধের প্রয়োজন, তাছাড়া অন্য সর্ববিষয়ে শিকার ও মাছ ধরার নিরঙ্কুশ অধিকার।'

কথাটা শুনতে খুব জনপ্রিয়, কিন্তু বাক্যটির প্রথমাংশ শেষাংশকে নাকচ করে দিয়েছে। কৃষক পরিবার প্রতি কটি খরগোস, পাখি বা মাছ আজও গ্রামাঞ্চলে আছে? প্রত্যেক কৃষককে বছরে **একটিমাত্র** দিন শিকার ও মাছ ধরার অধিকার দিলে যত দরকার তার চেয়ে বেশি বলে মনে হয় কি?

'আইনগত ও প্রথাগত সুদের হার হ্রাস'

— সুতরাং, নতুন তেজারতি আইন, গত দুহাজার বছর ধরে যে পুলিসী ব্যবস্থা সর্বদেশে সর্বকালে ব্যর্থ হয়েছে তাকে আর একবার চালু করার প্রচেষ্টা। ছোট কৃষক যদি এমন অবস্থায় পড়ে যখন মহাজনের শরণাপন্ন হওয়াই তার কাছে কম বিপদ, তখন মহাজন তেজারতি আইন বাঁচিয়েই তার অস্থিমজ্জা শুষে নেবার উপায় ঠিক বার করে নেবে। এর দ্বারা বড়জোর ছোট কৃষককে প্রবোধ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার কোনো উপকার এতে হবে না; বরং, সবচেয়ে প্রয়োজনের সময় ঋণ পেতে তার আরও অসুবিধারই সৃষ্টি করবে।

'বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং পড়তা খরচায় ঔষধ পাওয়ার ব্যবস্থা'

— এটা আর যাই হোক, কেবল কৃষককে রক্ষা করার কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নয়, জার্মান কর্মসূচি এর চেয়ে অগ্রসর, সেখানে ঔষধও বিনামূল্যে দাবি করা হয়েছে।

'যেসব সংরক্ষিত সৈনিকদের সামরিক কাজে ডাকা হয়েছে তাদের পরিবারদের জন্য ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা'

— জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ায় এই ব্যবস্থা খুবই অ-সন্তোষজনকভাবে হলেও বর্তমান, তাছাড়া এটাও কেবল কৃষকদের দাবি নয়।

'জমির জন্য সার, চাষের যন্ত্রপাতি ও উৎপন্ন মাল পরিবহণের মূল্য হ্রাস'

— মোটামুটিভাবে জার্মানিতে চালু রয়েছে এবং রয়েছে প্রধানত... বড় বড় ভূস্বামীদেরই স্বার্থে।

'জমির উন্নতিসাধন এবং কৃষি উৎপাদন বিকাশের উদ্দেশ্যে পূর্তকর্মের একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনার জন্য অবিলম্ব প্রস্তুতি-কাজ' —

এতে সবকিছুই অনিশ্চিত ও মনোরম প্রতিশ্রুতির জগতে থেকে যায় এবং এতেও সর্বোপরি বড় বড় ভূসম্পত্তিরই স্বার্থসাধন হয়।

সংক্ষেপে, মুখবন্ধে প্রদর্শিত প্রচণ্ড তত্ত্বগত প্রচেষ্টার পর, ফরাসী শ্রমিক পার্টি কোন পন্থায় ছোট কৃষককে তার ছোট জোতের অধিকারে টিকিয়ে রাখবে বলে আশা করে, যে অধিকারের ধ্বংস কর্মসূচিরই ভাষায় অনিবার্য — সেকথা তাদের নতুন কৃষি-সংক্রান্ত কর্মসূচির ব্যবহারিক প্রস্তাবের পরও আরও বেশি অস্পষ্ট রয়ে গেল।

২

একটি বিষয়ে আমাদের ফরাসী কমরেডরা সম্পূর্ণ ঠিক: — ফ্রান্সে ছোট কৃষকদের **ইচ্ছার বিরুদ্ধে** কোনো স্থায়ী বিপ্লবী রূপান্তর সম্ভব নয়। তবে আমার মতে, কৃষকদের প্রভাবাধীনে আনাই যদি তাঁদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে তাঁরা ঠিক জায়গাটিতে হাত দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

তাঁরা অবিলম্বে, এমন কি সম্ভবত আগামী সাধারণ নির্বাচনে ছোট কৃষকদের নিজের পক্ষে টানতে চান বলে মনে হয়। অত্যন্ত বিপজ্জনক সব সাধারণ প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং তার সমর্থনে আরও বিপজ্জনক সব তত্ত্বগত যুক্তি খাড়া করেই মাত্র তাঁরা এ কাজে সফল হবার আশা করতে পারেন। তার পরে যখন ভালো করে বিচার করা হয় তখন ধরা পড়ে যে, এই সাধারণ প্রতিশ্রুতিগুলি পরস্পর-বিরোধী (যে-ব্যবস্থার ধ্বংস নিজেরাই অনিবার্য বলে ঘোষণা করেছেন তাকেই টিকিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি) এবং যেসব ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সেগুলি হয় ব্যবহারিকভাবে নিতান্তই নিষ্ফল (তেজারতি আইন), নয়তো তা সাধারণভাবেই শ্রমিকদের দাবি, অথবা এমন দাবি যাতে

বড় বড় ভূস্বামীরাও উপকৃত হয়, কিংবা শেষত, এমন দাবি, ছোট কৃষকের স্বার্থসাধনে যার কোনোদিক থেকেই বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। ফলে, কর্মসূচির প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক অংশ দ্বারা তার ভ্রান্ত প্রথমাংশ আপনা থেকেই সংশোধিত হয় এবং মুখবন্ধের আপাত ভয়াবহ বাগাড়ম্বর বাস্তবে নিরীহ ব্যবস্থায় পরিণত হয়।

কথাটা গোড়াতেই স্পষ্ট বলে নেওয়া যাক: ছোট কৃষকদের সমগ্র অর্থনৈতিক অবস্থা, তাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং তাদের বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রা প্রণালী থেকে যে কুসংস্কার উদ্ভূত হয় যাতে ইন্ধন জোগায় বুর্জোয়া সংবাদপত্র আর বড় বড় ভূস্বামীরা, তাতে ছোট কৃষককে অবিলম্বে পক্ষে টানা সম্ভব কেবল এমন সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে যা রক্ষা করা যাবে না বলে আমরা নিজেরাই জানি। অর্থাৎ, যত অর্থনৈতিক শক্তির ঝাপটা তাদের উপর আসছে কেবল তা থেকেই সর্বদা তাদের সম্পত্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলে চলবে না। বর্তমানে তাদের উপর যেসব বোঝা চেপে আছে তা থেকেও মুক্ত করার: ইজারাদারকে স্বাধীন মালিকে পরিণত করার, বন্ধকী দায়ের ভারে মুমূর্ষু মালিককে ঋণ থেকে মুক্ত করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও আমাদের দিতে হবে। তা করতে পারলেও আমরা আবার সেইখানেই ফিরে যাব যেখান থেকে ঐ বর্তমান অবস্থার পুনরাবর্তন আবার শুরু হতে বাধ্য। কৃষককে মুক্ত করতে আমরা পারব না, একটা সাময়িক রেহাই দেব শুধু।

কিন্তু আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা গেল না বলে আগামীকাল আবার যাকে হারাতে হবে, সেই কৃষককে আজ রাতারাতি পক্ষে আনায় আমাদের কোনো স্বার্থ নেই। যে-ছোট কারিগর চিরস্থায়ীভাবে মালিক হতে পারলে খুশী হয় তাকে পার্টিতে এনে যতটা লাভ, যে কৃষক আশা করে যে আমরা তার ক্ষুদ্র জোতের সম্পত্তি চিরস্থায়ী করে দেব তাকে পার্টিতে এনে তার চেয়ে বেশি কোনো লাভ নেই। এ সব লোকের জায়গা সেমেটিক-বিরোধীদের [anti-Semites] মধ্যে। তাদের কাছেই এরা যাক এবং তারাই এদের ছোট ছোট গৃহস্থালীকে পুনরুদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি দিক। এই সব ফাঁকা কথার প্রকৃত মূল্য কী এবং সেমেটিক-বিরোধী স্বর্গ থেকে কোন সুরঝঙ্কার নেমে আসে সে শিক্ষা একবার পেলে, তখন এরা ক্রমেই বুঝবে যে, আমরা, যারা অনেক কম প্রতিশ্রুতি দিই এবং মুক্তির অন্য পথ খুঁজি, সেই আমরা শেষ

পর্যন্ত অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। আমাদের দেশের মতো তীব্র সেমেটিক-বিরোধী বাগাড়ম্বর-বৃত্তি থাকলে ফরাসীরা কখনই নান্তের ভুল করতেন না।

ছোট কৃষকদের সম্বন্ধে তাহলে আমাদের মনোভাব কী হবে? ক্ষমতা দখলের সময় তাদের প্রতি কী ধরনের ব্যবহার করা উচিত?

প্রথমেই বলা দরকার, ফরাসী কর্মসূচিতে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে যে, ছোট কৃষকদের অনিবার্য ধ্বংস আমরা আগে থেকেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কোনো হস্তক্ষেপ দ্বারা তাকে ত্বরান্বিত করা আমাদের ব্রত নয়।

দ্বিতীয়ত, এ কথাও সমান স্পষ্ট যে, আমরা যখন রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করব তখন ছোট কৃষকদের জোর করে উৎখাত (ক্ষতিপূরণসহ বা বিনা ক্ষতিপূরণে) করার কথা আমরা চিন্তায়ও স্থান দেব না, কিন্তু বড় বড় ভূস্বামীদের ক্ষেত্রে সেই পথই আমাদের নিতে হবে। ছোট কৃষকদের সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য হল, প্রথমত, তাদের ব্যক্তিগত উৎপাদন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সমবায়ী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা, জবরদস্তি করে নয়, উদাহরণ দেখিয়ে, এবং এই উদ্দেশ্যে সামাজিক সাহায্যের প্রস্তাব করে। তখন নিশ্চয় ছোট কৃষককে তার ভবিষ্যৎ সুবিধা দেখিয়ে দেবার প্রচুর সুযোগ আমরা পাব, যে সুবিধা এমন কি আজই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠার কথা।

ডেনিশ সমাজতন্ত্রীদের দেশে প্রকৃত শহর বলতে একটিই — কোপেনহেগেন, তাই সেই শহরের বাইরে তাঁদের প্রচার প্রায় একমাত্র কৃষকদের উপর নির্ভরশীল। তাঁরা প্রায় ২০ বছর আগে এই ধরনের পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। এক-একটি গ্রাম বা প্যারিশ-এর কৃষকরা — ডেনমার্কে অনেক বড় বড় ব্যক্তিগত গৃহস্থালী আছে — তাদের সমস্ত জমি মিলিত চাষের জন্য একত্র করে একটি একক বৃহৎ খামার গড়ে তুলবে এবং যে যত জমি, অর্থ বা শ্রম দিয়েছে, আয় সেই অনুপাতে ভাগ হবে। ডেনমার্কে ছোট ভূসম্পত্তির ভূমিকা খুবই গৌণ। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন কৃষিপ্রধান কোনো অঞ্চলে এই ধারণাকে কাজে লাগালে দেখা যাবে যে, সব একত্র করে মোট জমিতে বৃহদায়তন পদ্ধতিতে চাষ করলে এযাবৎ নিযুক্ত শ্রমশক্তির একটা অংশ বাড়তি হয়ে পড়বে। এই ধরনের শ্রম বাঁচানোই হচ্ছে বৃহদায়তন পদ্ধতিতে চাষের অন্যতম প্রধান সুবিধা। এই শ্রমশক্তি নিয়োগ করার দুটি পথ হতে পারে। হয়, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বড় বড় ভূসম্পত্তি থেকে অতিরিক্ত জমি

নিয়ে কৃষক সমবায়ের হাতে দেওয়া, নয়, এই কৃষকদের আনুষঙ্গিক বৃত্তি হিসেবে শিল্পে প্রবৃত্ত হওয়ার উপায় ও সম্ভাবনা জোগানো, মুখ্যত ও যতদূর সম্ভব তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য। উভয় ক্ষেত্রেই তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং সেই সঙ্গে সমাজের কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষে এতটা প্রভাব নিশ্চিত করা যাবে যাতে এই সব কৃষক সমবায়কে উচ্চতর পর্যায়ে রূপান্তরিত করা এবং সমগ্রভাবে সমবায় ও ব্যক্তিগতভাবে তাদের সভ্যদের দায়িত্ব ও অধিকার গোটা যৌথের অন্যান্য বিভাগের দায়িত্ব ও অধিকারের সমপর্যায়ে আনা সম্ভব হয়। নির্দিষ্ট এক-একটি ক্ষেত্রে কার্যত সেটা কীভাবে করা যাবে তা নির্ভর করবে প্রতিটি ক্ষেত্রের বিশিষ্ট পরিবেশ এবং কোন অবস্থায় আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করছি তারই উপর। সুতরাং, এই সমবায়গুলিকে আরও কিছু সুবিধা দেওয়া হয়তো বা সম্ভব হতে পারবে, যেমন জাতীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা তাদের সমস্ত বন্ধকী ঋণের দায় গ্রহণ এবং সেই সঙ্গে সুদের হারের প্রভূত হ্রাস; বৃহদায়তন উৎপাদনের জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে অগ্রিম দাদন (এই দাদন যে প্রধানত অর্থেই দিতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, যন্ত্রপাতি, কৃত্রিম সার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবেও দেওয়া চলতে পারে) এবং অন্যান্য সুবিধা।

প্রধান কথা কৃষকদের এইটে বোঝানো যে, তাদের ঘরবাড়ি এবং জমিকে বাঁচাতে, রক্ষা করতে আমরা পারি কেবল সমবায়ী পদ্ধতিতে পরিচালিত সমবায়ী সম্পত্তিতে তাদের রূপান্তরিত করেই। ব্যক্তিগত মালিকানার শর্তাধীন ব্যক্তিগত চাষ-প্রথাই কৃষককে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ব্যক্তিগত কাজের পদ্ধতি আঁকড়ে থাকতে চাইলে সে অনিবার্যভাবেই ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত হবে, তাদের সাবেকী উৎপাদন-পদ্ধতি পুঁজিবাদী বৃহদায়তন উৎপাদনের দ্বারা স্থানচ্যুত হবে। এই হচ্ছে আসল ব্যাপার। এই পরিস্থিতিতে আমরা কৃষকদের সামনে উপস্থিত হচ্ছি এবং তারা নিজেরাই যাতে পুঁজিপতিদের জন্য নয়, নিজেদেরই সকলের জন্য বৃহদায়তন পদ্ধতিতে উৎপাদন শুরু করতে পারে তার সুযোগ খুলে দিচ্ছি। এতে যে কৃষকেরই স্বার্থ রক্ষিত হবে, এই যে তাদের উদ্ধারের একমাত্র পথ, একথা তাদের বোঝানো কি সত্যিই অসম্ভব?

পুঁজিবাদী উৎপাদনের সর্বশক্তিমত্তার কবল থেকে ছোট জোতের

মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ বাঁচিয়ে রাখব এমন প্রতিশ্রুতি তাকে আজ বা ভবিষ্যতে কখনও আমরা দিতে পারি না। এইটুকু প্রতিশ্রুতি কেবল দিতে পারি যে, তাদের সম্পত্তি-সম্পর্কে আমরা জোর করে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো হস্তক্ষেপ করব না। তাছাড়াও, এই দাবি আমরা সমর্থন করতে পারি যে, ছোট কৃষকের বিরুদ্ধে পুঁজিপতি ও বড় বড় ভূস্বামীর সংগ্রামে যেন এখন থেকে যতদূর সম্ভব কম অসাধু পন্থা গৃহীত হয় এবং বর্তমানে যে খোলাখুলি দস্যুতা ও বঞ্চনা প্রায়ই ঘটে তা যেন যতদূর সম্ভব বন্ধ হয়। অবশ্য ব্যতিক্রমমূলক দু-একটা ক্ষেত্রেই আমাদের দাবি ফলপ্রসূ হবে। বিকশিত পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিতে কোথায় সততার শেষ আর বঞ্চনার শুরু সেকথা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু দেশের কর্তৃপক্ষ বঞ্চিতের পক্ষে, না বঞ্চকের পক্ষে, এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। আমরা অবশ্যই দ্বিধাহীনভাবে ছোট কৃষকের পক্ষে; তার অবস্থা আরও সহনীয় করার জন্য, সে মনস্থির করলে তার সমবায়ে পেঁছবার সর্বপ্রকার সুবিধা করে দিতে, এমন কি সে যদি তখনও এবিষয়ে মনস্থির করতে না পেরে থাকে তাহলে বেশ দীর্ঘকাল যাতে সে তার ছোট জমিটুকুতে টিকে থেকে আরও ভাবার সময় পায়, তার জন্য আমরা যথাসম্ভব সব কিছুই করব। নিজ শ্রমে জীবিকা নির্বাহ করে যে ছোট কৃষক তাকে আমরা আমাদেরই একজন মনে করি বলেই শুধু নয়, পার্টির প্রত্যক্ষ স্বার্থেও একাজ আমরা করি। যত বেশি সংখ্যক কৃষককে আমরা প্রলেতারীয় শ্রেণীতে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারব, তারা কৃষক থাকতে থাকতেই আমাদের পক্ষে টেনে আনতে পারব, ততই দ্রুত এবং সহজে সামাজিক রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হবে। কবে পুঁজিবাদী উৎপাদন সর্বত্র বিকশিত হয়ে তার চূড়ান্ত ফল প্রসব করবে, কবে শেষ কারিগর এবং শেষ ছোট কৃষকটি পর্যন্ত পুঁজিবাদী বৃহৎ উৎপাদনের শিকার হবে, সে পর্যন্ত এই রূপান্তর স্থগিত রেখে আমাদের কোনো লাভ নেই। কৃষকের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে এই কাজে যে বৈষয়িক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, সেটা পুঁজিবাদী অর্থনীতির নজরে অর্থের অপচয় মাত্র হলেও চমৎকার অর্থ বিনিয়োগ, কেননা এর ফলে সামাজিক পুনর্গঠনের সাধারণ খরচে হয়তো দশগুণ সাশ্রয় হবে। সুতরাং, এই অর্থে, কৃষকদের সঙ্গে অতি উদার ব্যবহার আমরা করতে পারি।

এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা বা এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থিত করার স্থান এটা নয়, এখানে আমরা কেবল সাধারণ নীতি নিয়েই আলোচনা করতে পারি।

অতএব, আমরা ছোট জোত চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে চাই, এরকম ধারণাটুকুও সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তাতে পার্টি বা ছোট কৃষকের যত ক্ষতি হবে তেমন আর কিছুতে নয়। এর অর্থ কৃষকের মুক্তির পথে সরাসরি বাধা সৃষ্টি করা এবং পার্টিকে সেমেটিক-বিরোধী দাঙ্গাবাজদের পর্যায়ে টেনে নামানো। বরঞ্চ, আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে ছোট কৃষকদের বার বার এই কথাই পরিষ্কার করে বলা উচিত যে, পুঁজিবাদ যতদিন কর্তৃত্ব করবে ততদিন তাদের কোনোই আশা নেই, তাদের ছোট ছোট জোতগুলিকে ছোট জোত হিসেবেই তাদের জন্য বাঁচিয়ে রাখা নিতান্তই অসম্ভব, রেলগাড়ি যেমন করে ঠেলাগাড়ি গুঁড়িয়ে দেয়, তেমনি করেই পুঁজিবাদী বৃহৎ উৎপাদন-ব্যবস্থাও সুনিশ্চিতভাবে তাদের অক্ষম, অচল হয়ে যাওয়া ক্ষুদে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চূর্ণ করে দেবে। এ কাজ করলে আমরা অর্থনৈতিক বিকাশের অনিবার্য গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলব এবং সে বিকাশ ছোট কৃষকদের কাছে আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণে ব্যর্থ হবে না।

প্রসঙ্গত, নান্ত কর্মসূচির রচয়িতারাও যে মূলত আমার সঙ্গে একমত, এ বিশ্বাস প্রকাশ না করে আমি এই বিষয়ে আলোচনা শেষ করতে পারি না। যেসব জমি আজ ছোট ছোট জোতে বিভক্ত সেটাও যে শেষ পর্যন্ত সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হতে বাধ্য, এটা না বোঝার মতো অন্তর্দৃষ্টিহীন তাঁরা নন। তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেন যে, ছোট জোতের মালিকানার অবলুপ্তি সুনিশ্চিত। লাফার্গ রচিত জাতীয় পরিষদের যে রিপোর্ট নান্ত কংগ্রেসে উপস্থিত করা হয় তাতেও এই মতের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। বর্তমান বছরের ১৮ অক্টোবর সংখ্যায় বার্লিন *Sozialdemokrat* (১১৮) পত্রিকায় এই বিবরণী জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। নান্ত কর্মসূচির বিভিন্ন কথার পরস্পর-বিরোধিতা থেকেই বোঝা যায় যে, রচয়িতারা আসলে যা বলেছেন সেটা ঠিক তাঁরা বলতে চান নি। তাই তাঁদের আসল কথা যদি না বুঝে বক্তব্যগুলির অপব্যবহার করা হয়, যা সত্যিই ঘটেছে, তবে সেটা তাঁদের নিজেদেরই দোষ। সে যাই হোক, এই কর্মসূচিটিকে তাঁদের আরও ব্যাখ্যা

করতে হবে এবং আগামী ফরাসী কংগ্রেসে এর আগাগোড়া সংশোধন করতে হবে।

এবার অপেক্ষাকৃত বড় কৃষকদের প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রধানত উত্তরাধিকারের ভাগাভাগি, সেই সঙ্গে ঋণগ্রস্ততা এবং বাধ্য হয়ে জমি বিক্রির ফলে এসব ক্ষেত্রে ছোট জোতের কৃষক থেকে শুরু করে পৈতৃক সম্পত্তি অটুট রেখেছে এবং বাড়িয়েছে এমন বড় কৃষক ভূস্বামী পর্যন্ত একাধিক অন্তর্বর্তী পর্যায় দেখা যায়। যেসব জায়গায় মাঝারি কৃষক বাস করে ছোট কৃষকদের মধ্যে, সেখানে তার স্বার্থ ও চিন্তাধারা প্রতিবেশীদের থেকে খুব বেশি পৃথক হবে না; নিজ অভিজ্ঞতা থেকেই সে জানে যে, তার মতো কত জন ইতিপূর্বে ছোট কৃষকের পর্যায়ে নেমে গেছে। কিন্তু যেখানে মাঝারি কৃষক ও বড় কৃষকেরই প্রাধান্য এবং খামারের কাজে সাধারণত পুরুষ ও স্ত্রী কৃষি-মজুরের প্রয়োজন হয়, সেসব জায়গায় অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম। বলা বাহুল্য, শ্রমিক পার্টিকে সর্বাগ্রে মজুরি-শ্রমিক, অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী কৃষি-মজুর এবং দিন-মজুরদের হয়ে লড়াই করতে হবে। তাই শ্রমিকদের মজুরি-দাসত্ব বজায় থাকবে এই মর্মে কৃষকদের কাছে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে কোনোক্রমেই চলতে পারে না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ বড় ও মাঝারি কৃষকেরা যতদিন বড় ও মাঝারি কৃষক হিসেবেই থাকছে, ততদিন মজুরি-শ্রমিক ছাড়া তারা চালাতে পারে না। সুতরাং, ছোট জোতের কৃষককে চিরদিনই ছোট জোতের কৃষক হিসেবে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া যদি আমাদের পক্ষে নির্বুদ্ধিতা হয়, তাহলে বড় ও মাঝারি কৃষকদের সেরকম কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল।

এক্ষেত্রেও শহরের হস্তশিল্পীদের মধ্যে আমরা অনুরূপ পরিস্থিতি দেখতে পাই। এরা কৃষকদের চেয়েও দুস্থ সেকথা ঠিক, কিন্তু এদের মধ্যেও এখনও এমন কিছু লোক আছে যারা তাদের শিক্ষানবিস ছাড়াও জোগাড়ে নিয়োগ করে, কিংবা তাদের শিক্ষানবিসরাই জোগাড়ের কাজ করে। এই সব মালিক-কারিগরদের মধ্যে যারা মালিক-কারিগর রূপেই নিজেদের অস্তিত্ব চিরদিন বজায় রাখতে চায় তারা সেমেটিক-বিরোধীদের সঙ্গেই গিয়ে মিলুক, একদিন তারা বুঝবে যে, সেখানেও তাদের কোনো সুরাহা

হবে না। বাকি যারা বুঝেছে যে, তাদের উৎপাদন-পদ্ধতির ধ্বংস অনিবার্য তারা আমাদের পক্ষে চলে আসছে, এবং শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে সমস্ত শ্রমিকদের ভাগ্যে যা আছে তারই অংশীদার হতে তারা রাজী। বড় ও মাঝারি কৃষকদের পক্ষেও এই একই কথা প্রযোজ্য। তাদের চেয়ে তাদের স্ত্রী-পুরুষ কৃষি-মজুর ও দিন-মজুরদের ব্যাপারেই আমাদের ঔৎসুক্য অনেক বেশি সে কথা না বললেই চলে। এই কৃষকেরা যদি চায় যে, তাদের উদ্যোগগুলির অব্যাহত অস্তিত্ব নিশ্চিত হোক, তবে সে প্রতিশ্রুতি দেবার কোনো উপায় আমাদের নেই। সেক্ষেত্রে তাদের সেমেটিক-বিরোধী, কৃষক সংঘ বা ঐ ধরনের যেসব দল সব কিছুরই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং কোনো প্রতিশ্রুতিই না-রেখে আনন্দ পায়, তাদের মধ্যেই স্থান করে নিতে হবে। অর্থনীতির দিক থেকে আমরা স্থির জানি যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ও বিদেশ থেকে সস্তায় আমদানী করা খাদ্যশস্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বড় ও মাঝারি কৃষককেও ঠিক একইভাবে অনিবার্যভাবেই হার স্বীকার করতেই হবে। এই সব কৃষকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঋণভার এবং সর্বক্ষেত্রে তাদের কৃষির প্রকট অবনতির লক্ষণ থেকেই একথা প্রমাণ হচ্ছে। এ অবনতির বিরুদ্ধে এক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন জোত একত্র করে সমবায়-সমিতি গড়ার সুপারিশ ছাড়া আর কিছুই আমরা করতে পারি না; এই সব সমবায়-সমিতিতে মজুরি-শ্রমের শোষণ ক্রমেই লোপ পাবে, বৃহৎ জাতীয় উৎপাদন-সমবায়ের শাখায় এগুলির ক্রমিক রূপান্তর ঘটানো যাবে, যেখানে প্রতিটি শাখা সমান দায়িত্ব ও অধিকার ভোগ করবে। এই কৃষকেরা যদি তাদের বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতির ধ্বংসের অনিবার্যতার কথা হৃদয়ঙ্গম করে ও তার থেকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত টানে, তাহলে তারা আমাদের পক্ষে চলে আসবে এবং তখন সেই নতুন উৎপাদন-পদ্ধতিতে তাদের উৎক্রমণ সুগম করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে তাদের সাহায্য করা হবে আমাদের কর্তব্য। অন্যথায়, তাদের ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে আমরা মনোনিবেশ করব তাদের মজুরি-শ্রমিকদের দিকে, তাদের মধ্যে আমরা সাড়া নিশ্চয়ই পাব। খুব সম্ভবত, এক্ষেত্রেও আমরা বলপূর্বক উৎখাত এড়াতে পারব, কিন্তু এই ভরসা রাখতে পারব যে, ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক বিকাশ এই সব নিরেট মাথাতেও সুবুদ্ধি জাগাবে।

একমাত্র বড় বড় ভূসম্পত্তির বেলাতেই সমস্যাটা অত্যন্ত সরল। এখানে নগ্ন পুঁজিবাদী উৎপাদন নিয়েই আমাদের কারবার, সুতরাং, কোনো কুণ্ঠায় সংযত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে আমাদের সামনে রয়েছে গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত এবং আমাদের কর্তব্যও সুস্পষ্ট। আমাদের পার্টি রাষ্ট্র-ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ঠিক শিল্প-মালিকদেরই মতো বড় বড় ভূসম্পত্তির মালিকদেরও উৎখাত করতে হবে। এই উৎখাত করার দরুন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কি না তা অনেক পরিমাণে আমাদের উপর নির্ভর করবে না, কোন অবস্থায় আমরা ক্ষমতা পাই এবং বিশেষ করে এই ভদ্রলোকেরা, বড় বড় ভূস্বামীরা কী ব্যবহার করে তারই উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করবে। কোনো ক্ষেত্রেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া চলবে না, একথা আমরা মোটেই ভাবি না। মার্কস আমায় বলেছিলেন (এবং কত বার!) যে, তাঁর মতে এদের গোটা দলটাকে কিনে ফেলতে পারলেই আমরা সবচেয়ে সস্তায় পার পাব। কিন্তু এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় তা নয়। এইভাবে যেসব বৃহৎ মহাল সমাজের হাতে ফিরে আসবে সেগুলি সেখানকার কর্মরত গ্রামীণ মজুরদের হাতে তুলে দিতে হবে এবং সমবায়-সমিতিতে এদের সংগঠিত করতে হবে। ঐসব জমি তাদের দেওয়া হবে সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীনে তাদের ব্যবহার ও উপযোগের জন্য। সে জমিতে তাদের ইজারার শর্ত কী ধরনের হবে সে সম্পর্কে এখনই কিছু বলা যায় না। আর যাই হোক, পুঁজিবাদী উদ্যোগকে সামাজিক উদ্যোগে রূপান্তরিত করার প্রস্তুতি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হয়ে আছে এবং ঠিক মিঃ ক্রুপ বা মিঃ ফন শ্টুমের কারখানার মতোই রাতারাতি সে রূপান্তর কার্যকর করা যাবে। এবং শেষ যে ছোট জোতের কৃষকদের তখনও আপত্তি থাকবে, সে এবং খুব সম্ভব কিছু বড় কৃষকও এই সব কৃষি সমবায়ের উদাহরণ দেখে সমবায়-পন্থায় বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা বুঝতে পারবে।

এইভাবে শিল্প-শ্রমিকদেরই মতো গ্রামীণ প্রলেতারীয়দের সামনেও আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দিতে পারি এবং তখন এল্ব্ নদীর পূর্বতীরের প্রাশিয়ার গ্রামীণ শ্রমিককে পক্ষে আনা কেবলমাত্র সময়ের এবং তাও অল্প সময়ের ব্যাপার হতে বাধ্য। কিন্তু এল্ব্-এর পূর্বাঞ্চলের গ্রামীণ শ্রমিকদের একবার পেলে সারা জার্মানি জুড়ে নতুন

হাওয়া বইতে শুরু করবে। প্রুশীয় য়ুংকারদের প্রাধান্যের এবং সেই হেতু জার্মানিতে প্রাশিয়ার বিশিষ্ট প্রভুত্বের ভিত্তি হচ্ছে এল্ব্-এর পূর্বাঞ্চলের গ্রামীণ শ্রমিকদের কার্যত অর্ধ-ভূমিদাসত্ব। এল্ব্-এর পূর্বতীরের এই য়ুংকাররাই আমলাতন্ত্র ও সামরিক অফিসার মণ্ডলীর বিশেষ রূপের প্রুশীয় চরিত্র গড়ে তুলেছে এবং বাঁচিয়ে রাখছে — ঋণের দায়ে, দারিদ্র্যের চাপে এই য়ুংকাররা ক্রমেই আরও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং রাষ্ট্রের ও অপরের ঘাড় ভেঙে পরগাছাসুলভ জীবন কাটাচ্ছে, এবং সেই কারণেই যে প্রাধান্য ভোগ করছে তাকে আরও আঁকড়ে ধরছে। এদেরই ঔদ্ধত্য, সংকীর্ণচেতনা এবং অহংকার প্রুশীয় জাতির জার্মান রাইখকে (১১৯), — বর্তমানে জাতীয় ঐক্য সাধনের একমাত্র রূপ হিসেবে এই রাইখকে অনিবার্য বলে মেনে নিয়েও দেশের অভ্যন্তরে এতটা ঘৃণার বস্তু এবং এত বিস্ময়কর জয়লাভ সত্ত্বেও বিদেশে এত কম সম্মানভাজন করে তুলেছে। সাতটি পুরাতন প্রুশীয় প্রদেশের অটুট এলাকায়, অর্থাৎ সমস্ত রাইখের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ব্যাপী এই এলাকায় ভূসম্পত্তি এদেরই হাতে এবং এখানে ভূসম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আসে সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষমতা — এই হচ্ছে য়ুংকারদের ক্ষমতার ভিত্তি। এবং কেবল ভূসম্পত্তিই নয়, এদের বীট-চিনি শোধনাগার এবং মদ তৈরির কারখানা মারফৎ এ অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পও এদেরই হাতে। বাকি জার্মানির বড় বড় ভূস্বামী বা শিল্পপতিরা কেউই এমন সুবিধাজনক অবস্থায় নেই, তাদের কারোরই এমন সংহত রাজত্ব নেই। তারা উভয়েই এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে, তাছাড়া পরস্পরের সঙ্গে এবং চারিদিকের অন্যান্য সামাজিক উপাদানের সঙ্গে তারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের জন্য প্রতিযোগিতা করে চলছে। কিন্তু প্রুশীয় য়ুংকারদের এই প্রাধান্যের অর্থনৈতিক ভিত ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছে। সমস্তরকম রাষ্ট্রীয় সাহায্য (এবং দ্বিতীয় ফ্রিডরিখের সময় থেকে প্রতিটি য়ুংকার বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ থাকেই) সত্ত্বেও এখানেও ঋণভার এবং দারিদ্র্য অপ্রতিরোধ্যভাবে বেড়ে চলেছে। আইন ও দেশাচারের দ্বারা পবিত্রকৃত এক কার্যত আধা-ভূমিদাস-প্রথা এবং তারই ফলে গ্রামীণ শ্রমিককে নিরংকুশ শোষণের সম্ভাবনা — কেবল এরই জোরে নিমজ্জমান য়ুংকাররা আজও কোনোরকমে ভেসে আছে। এই শ্রমিকদের মধ্যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক

মতবাদের বীজ বপন করুন, উদ্দীপিত করে নিজেদের অধিকারের জন্য সংগ্রামে সংহতি দিন, অমনি য়ুঙ্কারদের গরিমা শেষ হয়ে যাবে। সারা ইউরোপের ক্ষেত্রে রুশ জারতন্ত্র যার প্রতীক, জার্মানির ক্ষেত্রে সেই একই বর্বরতা ও লুণ্ঠনপরতার প্রতীকরূপ মহা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিটা বুদ্বুদের মতো ফেটে যাবে। প্রুশীয় সেনাবাহিনীর 'বাছাই দলগুলি' সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক হয়ে উঠবে, তার ফলে শক্তি-বিন্যাসে এমন একটা পরিবর্তন ঘটবে যার মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকবে গোটা একটা ওলটপালটের সম্ভাবনা। এই কারণেই পশ্চিম জার্মানির ছোট কৃষক তথা দক্ষিণ জার্মানির মাঝারি কৃষকদের চেয়ে এল্‌ব্‌-এর পূর্বতীরের গ্রামীণ প্রলেতারীয়কে পক্ষে টানতে পারার গুরুত্ব অনেক বেশি। আমাদের চূড়ান্ত লড়াই এইখানে, এই এল্‌ব্‌-এর পূর্বতীরের প্রাশিয়াতেই লড়তে হবে এবং ঠিক সেই কারণেই সরকার ও য়ুঙ্কারতন্ত্র উভয়েই এই অঞ্চলে আমাদের প্রবেশ বন্ধ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। এবং যে ভয় দেখানো হচ্ছে সে অনুযায়ী পার্টির বিস্তার বন্ধ করার জন্য নতুন দমনমূলক ব্যবস্থা যদি অবলম্বন করা হয়, তাহলে তার প্রধান লক্ষ্য হবে এল্‌ব্‌-এর পূর্বতীরের গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতকে আমাদের প্রচার থেকে রক্ষা করা। আমাদের অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না। এসব সত্ত্বেও তাদের আমরা পক্ষে টেনে আনবই।

১৮৯৪-এর ১৫ ও ২২
নভেম্বরের মধ্যে লিখিত

Die Neue Zeit পত্রিকার
১৮৯৪-১৮৯৫-এর ১০ম সংখ্যায়
প্রকাশিত

স্বাক্ষর: **ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস**

জার্মান থেকে ইংরেজি
অনুবাদের ভাষান্তর

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

পত্রাবলী

বার্লিনে কনরাড শ্‌মিড্‌ট সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ৫ অগস্ট, ১৮৯০

...মরিৎস ভির্থ নামক সেই অশুভ জীবটির লেখা পাউল বার্টের বইয়ের (১২০) একটি সমালোচনা ভিয়েনার *Deutsche Worte* (১২১) পত্রিকায় পড়লাম এবং এই সমালোচনা পড়ে বইটি সম্পর্কেও আমার মনে একটা খারাপ ধারণা হয়ে গেল। বইখানি আমায় দেখতে হবে, কিন্তু ক্ষুদে মরিৎস একথা যদি বার্ট থেকে সঠিকভাবেই উদ্ধৃত করে থাকেন যে, মার্কসের রচনাবলীতে অস্তিত্বের বৈষয়িক অবস্থার উপর দর্শন ইত্যাদির নির্ভরশীলতার একমাত্র দৃষ্টান্ত তিনি যা পেয়েছেন সেটা এই যে, দেকার্ত প্রাণীদের যন্ত্র বলে ঘোষণা করেছেন, তাহলে এই ধরনের কথা যে লোক লিখতে পারে তার জন্য আমি দুঃখিত। এই ব্যক্তি যদি এখনও দেখতে পেয়ে না থাকেন যে, অস্তিত্বের বৈষয়িক শর্ত primum agens* হলেও তাতে তার উপর ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রগুলির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে আটকায় না, যদিও সে প্রতিক্রিয়ার ফলটা গৌণ, তাহলে তিনি যা নিয়ে লিখছেন সেই বিষয়টিই কিছু বুঝতে পারেন নি। অবশ্য, আমি পূর্বেই বলেছি এটা হল আমার পরের মুখে ঝাল খাওয়া, এবং ক্ষুদে মরিৎস এক বিপজ্জনক বন্ধু। ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার এ রকম বন্ধু আজকাল অনেক, যাদের কাছে এটা ইতিহাস না পড়ার একটা অজুহাত সৃষ্টি করে দিয়েছে। ঠিক যেমন অষ্টম দশকের শেষদিকের ফরাসী 'মার্কসবাদীদের' সম্পর্কে মার্কস বলতেন, 'আমি যতটুকু জানি তা হল এই যে, আমি মার্কসবাদী নই।'

---

* আদিকারণ। — সম্পাঃ

ভবিষ্যৎ সমাজে উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন কী রূপ হবে, সম্পন্ন কাজের পরিমাণ অনুযায়ী হবে, না অন্য কোনরূপ হবে, এ নিয়ে *Volks-Tribüne* (১২২) পত্রিকায় একটি আলোচনা হয়েছে। ন্যায় সম্পর্কিত কতকগুলি ভাবাদর্শগত বুলির পাল্টা হিসাবে অত্যন্ত 'বস্তুবাদীভাবেই' প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একথা কারও মনে হয় নি যে, শেষ পর্যন্ত তো বণ্টনের পদ্ধতি মূলত নির্ভর করে বণ্টন করার মতো জিনিস **কী পরিমাণ** আছে তার উপর এবং উৎপাদনের ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিমাণেরও অবশ্যই পরিবর্তন হয়, যার ফলে বণ্টনের পদ্ধতিরও পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু যারা এই আলোচনায় যোগ দিয়েছিল তাদের কারও মনে হয় নি যে, 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ' অবিরাম পরিবর্তনশীল ও অগ্রগতিশীল, মনে হয়েছে যেন তা চিরকালের মতো স্থির নির্দিষ্ট একটি ব্যাপার এবং সেই জন্যই সেখানে চিরদিনের মতো স্থির নির্দিষ্ট একটি বণ্টন-ব্যবস্থা থাকবে। অবশ্য, যেটুকু যুক্তিযুক্তভাবে করা যায় তা হচ্ছে এই যে, ১) **শুরুতে** বণ্টনের পদ্ধতি কী হবে তা নির্ধারণের চেষ্টা এবং ২) পরবর্তী বিকাশ কীভাবে চলবে তার **সাধারণ ঝোঁকটি** নির্ধারণের চেষ্টা। কিন্তু এ সম্পর্কে একটি কথাও সারা বিতর্কের মধ্যে চোখে পড়ল না।

সাধারণভাবে 'বস্তুবাদী' কথাটি জার্মানির বহু তরুণ লেখকের কাছে এমন একটা বুলিতে পর্যবসিত হয়েছে যে, আর কিছু অধ্যয়ন না করেই যা খুশী তাতেই তাঁরা এই লেবেল এঁটে দিচ্ছেন, অর্থাৎ এই লেবেল এঁটে দিয়ে ভাবছেন, সমস্যা মিটে গেল। কিন্তু ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা সেটা হল সর্বোপরি অধ্যয়নের দিকদর্শন মাত্র, হেগেলপন্থা ধরনে ছক নির্মাণের হাতল নয়। সমস্ত ইতিহাসকে নতুনভাবে অধ্যয়ন করতে হবে, সমাজের বিভিন্ন গঠনরূপ থেকে তাদের অনুযায়ী রাজনৈতিক, দেওয়ানি আইনগত, নন্দনতাত্ত্বিক, দার্শনিক, ধর্মীয় ইত্যাদি ধ্যানধারণা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসার আগে ঐ গঠনরূপগুলির অস্তিত্বের অবস্থা বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে এখানে বিশেষ কিছু করা হয় নি, কারণ খুব কম লোকই গুরুত্বসহকারে এ কাজে হাত দিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণ সাহায্য আমাদের দরকার, ক্ষেত্র বিশাল, এবং যদি কেউ গুরুত্বসহকারে কাজ করে তাহলে সে প্রচুর সাফল্য লাভ করতে পারে

ও খ্যাতিমান হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তা না করে বহু তরুণ জার্মান শুধু ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বুলিটি ব্যবহার করছেন (**সব কিছুই** তো বুলিতে পরিণত করা যায়) এই জন্য, যাতে ইতিহাস সম্পর্কে নিজেদের যে আপেক্ষিকভাবে সামান্য জ্ঞান আছে তা দিয়ে (অর্থনৈতিক ইতিহাসের তো এখনও শৈশবাবস্থা!) যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি একটি ফিটফাট ব্যবস্থা তৈরি করা যায়, এবং তারপর নিজেদের তারা বিরাট একটা কিছু বলে মনে করে। তারপর বার্টের মতো কেউ এসে মূল বস্তুটিকেই আক্রমণ করে বসবে, যা তার মহলে মাত্র একটা বুলিতে পর্যবসিত করা হয়েছে।

এ সব কিছুই অবশ্য ঠিক হয়ে যাবে। জার্মানিতে এখন অনেক কিছু সহ্য করার মতো যথেষ্ট শক্তি আমাদের আছে। সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইন আমাদের পক্ষে অন্যতম একটা মস্ত কাজ করে দিয়েছে এই যে, সমাজতন্ত্রের ছোপ লাগা জার্মান ছাত্রের অনধিকারচর্চার হাত থেকে তা আমাদের মুক্তি দিয়েছিল। জার্মান ছাত্রটি আবার নিজেকে বড় গলায় জাহির করছেন, কিন্তু তাঁকে হজম করার মতো শক্তি আমরা এখন রাখি। আপনি, যিনি সত্যিই কিছু করেছেন, নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, পার্টির মধ্যে এসেছেন এমন তরুণ লেখকদের ক'জনই বা অর্থশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস, বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির ইতিহাস, সমাজের গঠনরূপের ইতিহাস অধ্যয়ন করার কষ্ট করেন! ক'জন বা মাউরারের নামটুকু ছাড়া আর কিছু জানেন? এখানে সাংবাদিকের ঔদ্ধত্যেই সব কিছু জয় করা চাই, এবং ফলও তেমনই ফলছে। প্রায়ই মনে হয়, এই ভদ্রলোকদের ধারণা, শ্রমিকদের বেলায় সবকিছুই চলে। এই ভদ্রলোকেরা যদি জানতেন, কীভাবে মার্কস তাঁর সবচেয়ে ভালো জিনিসও শ্রমিকদের পক্ষে যথেষ্ট ভালো বলে মনে করতেন না এবং সবচেয়ে ভালো ছাড়া অন্য কিছু শ্রমিকদের দেওয়াকে কীভাবে মার্কস অপরাধ বলে মনে করতেন!..

জার্মান থেকে ইংরেজি
অনুবাদের ভাষান্তর

ব্রেস্‌লাউ-তে অট্টো ফন বোয়েনিগ্‌ক্‌ সমীপে এঙ্গেলস

ফোকস্টোন, ডোভারের কাছে
২১ অগস্ট, ১৮৯০

...আপনার জিজ্ঞাসার জবাব আমি দিতে পারি শুধু সংক্ষেপে ও সাধারণভাবেই, কারণ প্রথম প্রশ্নটির ব্যাপারে আমাকে তা না হলে একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখতে হবে।

১। আমার মতে, তথাকথিত 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ' পরিবর্তনাতীত কিছু নয়। অন্য সমস্ত সামাজিক গঠনবিন্যাসের মতো, তাকেও কল্পনা করা উচিত নিরন্তর প্রবাহ ও পরিবর্তনের এক অবস্থার মধ্যে। বর্তমান ব্যবস্থা থেকে তার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটা স্বভাবতই রয়েছে উৎপাদনের সমস্ত উপায়ের উপরে জাতির সাধারণ মালিকানার ভিত্তিতে সংগঠিত উৎপাদনের মধ্যে। এই পুনর্বিন্যাস আগামীকাল শুরু করা, কিন্তু তা ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন করা, আমার রীতিমতো সম্ভব বলে মনে হয়। আমাদের শ্রমিকরা যে তা করতে সক্ষম তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের অজস্র উৎপাদক ও উপভোক্তা সমবায় থেকে, পুলিস যখন সেগুলিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করে না-দেয় তখন যেগুলি বুর্জোয়া স্টক কোম্পানিগুলির মতোই সমান ভালো এবং তাদের চাইতে অনেক বেশি সততার সঙ্গে পরিচালিত। সমাজতন্ত্রী-বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে আমাদের শ্রমিকরা তাদের বিজয়দীপ্ত সংগ্রামে যে রাজনৈতিক পরিপক্বতার চমকপ্রদ সাক্ষ্য উপস্থিত করেছে তার পরে আপনি জার্মানির জনসাধারণের অজ্ঞতার কথা কী করে বলতে পারেন, আমি তা বুঝতে পারছি না। আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের পিঠ-চাপড়ানি আর হঠকারী বক্তৃতাবাজি আরও বড় বাধা বলে আমার মনে হয়। আমাদের এখনও কৃৎকুশলী, কৃষি-অর্থনীতিবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, রসায়নবিশারদ, স্থপতি প্রভৃতিদের দরকার আছে একথা সত্যি, কিন্তু সবচেয়ে খারাপ অবস্থাও যদি হয় তাহলে আমরা সব সময়েই তাদের কিনতে পারি ঠিক যেমন পুঁজিপতিরা তাদের কেনে, আর তাদের মধ্যেকার কিছু বিশ্বাসঘাতকের ক্ষেত্রে যদি কঠোর দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয় — কারণ কিছু বিশ্বাসঘাতক নিশ্চয়ই থাকবে — তাহলে আমাদের সঙ্গে যথার্থ আচরণ করাটাকে তারা নিজেদের পক্ষেই

সুবিধাজনক বলে মনে করবে। কিন্তু এই সমস্ত বিশেষজ্ঞ ছাড়া — যাদের মধ্যে আমি স্কুল-শিক্ষকদেরও ধরছি — অন্য 'বুদ্ধিজীবীদের' বাদ দিয়েই আমরা খুবই ভালোভাবে চালাতে পারি। যেমন, পার্টির মধ্যে পণ্ডিতবর্গ ও ছাত্রদের বর্তমান সমাগম রীতিমতো ক্ষতিকর হতে পারে, যদি না এই ভদ্রলোকদের উপযুক্তভাবে সংযত করে রাখা হয়।

এল্‌ব্‌-এর পূর্বতীরের যুঙ্কার ভূসম্পত্তিগুলিকে উপযুক্ত কৃৎকৌশলগত ব্যবস্থাপনাধীনে সহজেই বর্তমানের দিন-মজুর ও খেতমজুরদের কাছে লীজ দিয়ে দেওয়া যায়, তারা এই সব ভূসম্পত্তিতে কাজ করবে যুক্তভাবে। যদি কোনো গোলমাল ঘটে, তাহলে দায়ী হবে একমাত্র যুঙ্কাররাই, যারা বিদ্যমান সমস্ত স্কুল-সংক্রান্ত আইনকানুন লঙ্ঘন করে মানুষকে পশুর মতো করে তুলেছে।

সবচেয়ে বড় বাধা হল ছোট চাষী আর নাছোড়বান্দা অতি-চালাক বুদ্ধিজীবীরা, যারা সব কিছু যত কম বোঝে তত বেশি জানে বলে মনে করে।

জনসাধারণের মধ্যে আমাদের যথেষ্ট সংখ্যক অনুগামী হয়ে গেলে বড় বড় শিল্প ও বৃহদায়তন ভূসম্পত্তির খামারগুলি দ্রুত সামাজীকীকরণ করা যায়, অবশ্য যদি আমাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে। বাকিটা, আগে হোক বা পরে হোক, অচিরেই হবে। আর বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থায় আমরা সব কিছু আমাদের মতো করে করতে পারব।

একই রকম অন্তর্দৃষ্টি না-থাকার কথা আপনি বলেছেন। সেটা আছে — কিন্তু তা বুদ্ধিজীবীদের তরফে, যারা এসেছে অভিজাততন্ত্র ও বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে এবং যারা ঘুণাক্ষরেও বোঝে না শ্রমিকদের কাছ থেকে তাদের এখনও কত কিছু শেখার আছে...

জার্মান থেকে ইংরেজি
অনুবাদের ভাষান্তর

কনিগস্‌বার্গে ইয়োসেফ ব্লক সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ২১[-২২] সেপ্টেম্বর, ১৮৯০

...ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা অনুসারে বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনই হচ্ছে ইতিহাসে **শেষ পর্যন্ত** নির্ধারক বস্তু। এর বেশি কিছু মার্কস বা আমি কখনও বলি নি। অতএব, কেউ যদি তাকে বিকৃত করে এই দাঁড় করায় যে, অর্থনৈতিক ব্যাপারই হচ্ছে **একমাত্র** নির্ধারক বস্তু, তাহলে সে প্রতিপাদ্যটিকে একটি অর্থহীন, অমূর্ত, নির্বোধ উক্তিতে পরিণত করে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হল ভিত্তি, কিন্তু উপরিকাঠামোর বিভিন্ন বস্তু যেমন, শ্রেণী-সংগ্রামের রাজনৈতিক রূপগুলি এবং তার ফলাফল: সাফল্যমণ্ডিত সংগ্রামের পর বিজয়ী শ্রেণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইত্যাদি, বিচার-ব্যবস্থা, এমন কি যোগদানকারীদের মস্তিষ্কে এই সমস্ত বাস্তব সংগ্রামের প্রতিফলন, রাজনৈতিক আইনগত, দার্শনিক তত্ত্বাবলী, ধর্মীয় মতামত এবং ক্রমে সেগুলির আপ্তবাক্যে পরিণতি, এসবও ঐতিহাসিক সংগ্রামগুলির গতিকে প্রভাবিত করে এবং বহুক্ষেত্রে তাদের **রূপ** নির্ধারণে প্রধান হয়ে ওঠে। এদের সকলের একটি পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রয়েছে, যেখানে অসংখ্য আকস্মিকতার মধ্যে (অর্থাৎ এমন সব বস্তু ও ঘটনার মধ্যে, যাদের অন্তঃসম্পর্ক এত ক্ষীণ কিম্বা এত প্রমাণাসাধ্য যে তা অবিদ্যমান, অথবা উপেক্ষণীয় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে) অর্থনৈতিক আন্দোলন শেষ পর্যন্ত আবশ্যিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। অন্যথায় পছন্দ মতো ইতিহাসের যেকোনো আমল সম্পর্কে তত্ত্ব প্রয়োগ করা প্রথম ডিগ্রীর সরল সমীকরণের সমাধানের চেয়েও সহজ হত।

আমরা নিজেরাই আমাদের ইতিহাস সৃষ্টি করি, কিন্তু সৃষ্টি করি সর্বাগ্রে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট কতকগুলি পূর্বস্থিতি ও অবস্থার মধ্যে। এদের মধ্যে অর্থনৈতিক পূর্বস্থিতি ও অবস্থাই শেষ পর্যন্ত নির্ধারক হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি, এমন কি মানবমনকে আচ্ছন্ন করে থাকে যে ঐতিহ্য, তাও একটা ভূমিকা গ্রহণ করে, যদিও সে ভূমিকা নির্ধারক নয়। প্রুশীয় রাষ্ট্রও ঐতিহাসিক ও শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক কারণ থেকেই উদ্ভূত ও বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু খামোকা পাণ্ডিত্য জাহির করার ইচ্ছা না

থাকলে একথা কিছুতেই বলা যায় না যে, উত্তর জার্মানির বহু ছোট ছোট রাষ্ট্রের মধ্যে ব্রাণ্ডেন্‌বুর্গই যে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের অর্থনীতিগত, ভাষাগত এবং, এমন কি রিফর্মেশনের (১২৩) পর, ধর্মগত পার্থক্যের প্রতীকরূপে একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল তা অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দ্বারাই বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়েছিল, এবং তার পেছনে আর কোনো উপাদান ছিল না (যথা, সর্বোপরি, প্রাশিয়া দখলে থাকায় পোল্যাণ্ডের সঙ্গে ব্রাণ্ডেন্‌বুর্গের জড়িয়ে পড়া এবং কাজে কাজেই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া, যা অস্ট্রীয় রাজবংশগত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায়ও চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছিল)। জার্মানির অতীতের ও বর্তমানের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব, অথবা সেই উত্তর জার্মানির ব্যঞ্জনধ্বনির অভিশ্রুতির উদ্ভব যা সুদেতিক পর্বতমালা থেকে তাউনাস পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড় দ্বারা গঠিত ভৌগোলিক বিভাগপ্রাচীরকে আরও বিস্তৃত করে তুলে সারা জার্মানিব্যাপী একটি রীতিমতো ফাটল সৃষ্টি করেছিল, নিজেকে হাস্যকর করে না তুলে অর্থনীতি দ্বারা এসবের ব্যাখ্যা করতে যাওয়া খুবই মুশকিল।

দ্বিতীয়ত, ইতিহাস এমনভাবেই সৃষ্টি হয় যাতে চূড়ান্ত ফলাফল সর্বদা বহু ব্যক্তিগত ইচ্ছার সংঘাত থেকে উদ্ভূত হয় এবং এই ইচ্ছার প্রত্যেকটি আবার জীবনের বেশ কতকগুলি বিশেষ অবস্থার দ্বারা গঠিত। এইভাবে অসংখ্য পরস্পর ছেদনকারী শক্তি রয়েছে, রয়েছে শক্তির অসংখ্য সামন্তরিক ক্ষেত্রের ধারা এবং এদেরই মধ্যে থেকেই উদ্ভূত হয় একটি সাধারণ ফল — ঐতিহাসিক ঘটনা। একে আবার এমন একক একটি শক্তির সঞ্জাত ফল বলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে, যা সামগ্রিক হিসাবে **অচেতন** ও ইচ্ছাশক্তিহীনভাবে কাজ করে। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তি যা চায় অপর প্রত্যেক ব্যক্তি তাতে বাধা দেয় এবং ফলাফল দাঁড়ায় এমন কিছু যা কেউই চায় নি। এইভাবে অতীত ইতিহাস একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ারূপেই চলে এবং মূলত একই গতির নিয়মাবলীর অধীন। যদিও ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শারীরিক গঠন এবং বাইরের, শেষ পর্যন্ত, অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা (নিজের ব্যক্তিগত অবস্থা বা সাধারণভাবে সমাজের অবস্থা) প্রণোদিত হয় এবং নিজ নিজ ঈপ্সিত বস্তু লাভ করতে পারে না বরং

একটি যৌথ গড়ে একটি সাধারণ লব্ধিতে পরিণত হয়, তাই বলে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই করা চলে না যে, তাদের মূল্য শূন্য। বরঞ্চ লব্ধ ফলে প্রত্যেকটি ইচ্ছারই অবদান রয়েছে এবং সেই পরিমাণে সেগুলি তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

এই তত্ত্বটিকে অপরের মুখ থেকে না শুনে মূল উৎস থেকে অনুশীলন করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। সত্যই সেটা অনেক বেশি সোজা। মার্কস এমন কিছুই লেখেন নি, যার মধ্যে এ তত্ত্বের ভূমিকা নেই। কিন্তু, বিশেষ করে **'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার'*** এই তত্ত্বপ্রয়োগের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। 'পুঁজি' গ্রন্থের মধ্যেও এর বহু নিদর্শন রয়েছে। আমি আপনাকে আমার এই লেখাগুলিও পড়তে বলব: 'শ্রী ওগেন ড্যুরিং-এর বিজ্ঞানে বিপ্লব' এবং 'লুডভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান'**। সেখানে আমি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিশদতম বিবরণ যতটা বর্তমান বলে আমি জানি তা উল্লেখ করেছি।

তরুণেরা যে অনেক সময় অর্থনৈতিক দিকের উপর যতখানি উচিত তার চেয়ে বেশি জোর দিয়ে থাকেন, তজ্জন্য মার্কস ও আমি, আমরা নিজেরাই কিছুটা দায়ী। আমাদের প্রতিপক্ষীয়রা অস্বীকার করতেন বলেই তাঁদের বিপরীতে অর্থমূল নীতিটির উপর আমাদের জোর দিতে হয়েছিল। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দিকগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার মতো সময়, স্থান বা সুযোগ আমরা পাই নি। কিন্তু ইতিহাসের কোনো যুগকে উপস্থিত করার প্রশ্ন যখন এসেছে, অর্থাৎ বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রশ্ন যখন এসেছে, তখন অন্য কথা, এবং কোনো ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে নি। দুর্ভাগ্যক্রমে, অবশ্য প্রায়ই দেখা যায় যে, লোকে ভাবে, তারা একটি নতুন তত্ত্ব বুঝে ফেলেছে এবং ঐ তত্ত্বের প্রধান নীতিগুলি আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই, এমন কি অনেকসময় ভুলভাবে আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই, বিনাদ্বিধাসংকোচে তত্ত্বটিকে প্রয়োগ করতে তারা সক্ষম। হালে যাঁরা

---

* এই সংস্করণের ৪র্থ খণ্ডের ১২-১৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** এই সংস্করণের ১০ম খণ্ডের ১৩৬-১৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

'মার্কসবাদী' হয়েছেন তাঁদের অনেককেই আমি এই সমালোচনা থেকে রেহাই দিতে পারি না, কারণ এর দৌলতেও অতি আশ্চর্য রকমের আবর্জনা সৃষ্টি হয়েছে...

জার্মান থেকে ইংরেজি
অনুবাদের ভাষান্তর

বার্লিনে কনরাড শ্মিড্ট সমীপে এঙ্গেলস

লন্ডন, ২৭ অক্টোবর, ১৮৯০

প্রিয় শ্মিড্ট,

অবসর পাওয়ামাত্রই আপনার চিঠির জবাব দিতে বসেছি। আমার মনে হয় *Züricher Post*-এ (১২৪) চাকরি নেওয়াটাই আপনার পক্ষে খুব ভালো হবে। আপনি সেখানে অর্থনীতি সম্পর্কে অনেক কিছুই শিখতে পারবেন, বিশেষত যদি একথা মনে রাখেন যে, জুরিখ একটি তৃতীয় শ্রেণীর টাকার বাজার ও ফাটকাবাজার, অতএব এখানে যেসব ধারণা জন্মায় সেগুলি আবার দু দফা বা তিন দফা প্রতিফলনে ক্ষীণ কিম্বা ইচ্ছা করে বিকৃত। কিন্তু ব্যাপারটা কীভাবে চলে সে সম্পর্কে আপনি ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করবেন এবং লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা ইত্যাদির শেয়ার-বাজারের আনকোরা রিপোর্ট লক্ষ করে যেতে বাধ্য হবেন। এতে করে টাকা ও শেয়ার-বাজার রূপে প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাজার আপনার কাছে প্রকট হবে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রতিফলন ঠিক মানুষের চোখের প্রতিফলনের মতো — কনডেন্সিং-লেন্সের মধ্য দিয়ে যায় বলে প্রতিফলনগুলিকে সেখানে ঠিক উল্টো, অর্থাৎ মাথার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখা যায়। অভাব কেবলমাত্র স্নায়ুযন্ত্রটিরই, যা প্রতিফলনটিকে আবার সোজা করে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দেবে। শেয়ার-বাজারের মানুষ শিল্পের গতি ও বিশ্ববাজারকে শুধুমাত্র টাকার বাজার ও শেয়ার-বাজারের উল্টো প্রতিফলন রূপেই দেখতে পায়, তাই কার্য তার

কাছে কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পঞ্চম দশকেই ম্যাঞ্চেস্টারে আমি এ ব্যাপার লক্ষ করেছিলাম: শিল্পের গতি এবং তার পর্যায়ক্রমিক সর্বোচ্চতা ও সর্বনিম্নতা বোঝবার পক্ষে লন্ডনের শেয়ার-বাজারের রিপোর্টগর্নলি কোনো কাজেই আসত না, কারণ এই ভদ্রলোকেরা সব কিছর্ই টাকার বাজারের সংকট দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করতেন, অথচ সেগর্নলি সাধারণত হল তার লক্ষণ মাত্র। তখন লক্ষ্য ছিল শিল্প-সংকটগর্নলির মর্ল কারণ যে সাময়িক অতিউৎপাদন নয়, এইটেই প্রমাণ করা। ফলে একটা পক্ষপাতমর্লক ঝোঁকও দেখা দিত, যা থেকে আসত বিকৃতিসাধনের প্ররোচনা। এই লক্ষ্য এখন আর নেই, অন্তত আমাদের কাছে চিরদিনের মতো বিলর্প্ত হয়ে গেছে। তার উপর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, টাকার বাজারেরও নিজস্ব সংকট থাকতে পারে, যাতে শিল্পের প্রত্যক্ষ বিশৃঙ্খলার ভূমিকা গৌণ মাত্র অথবা তার কোনো ভূমিকাই নেই। এখানে, বিশেষ করে গত বিশ বছরের ইতিহাসে এখনও সন্ধান ও পরীক্ষা করার মতো অনেক কিছর্ আছে।

শ্রমবিভাগ যেখানে সামাজিক ভিত্তিতে আছে সেখানে বিভিন্ন শ্রমপ্রক্রিয়া পরস্পরের থেকে স্বাধীন হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত উৎপাদনই নির্ধারক বস্তু। কিন্তু যে মর্হর্তে খাস উৎপাদন থেকে উৎপন্নের বাণিজ্যটা স্বতন্ত্র হয়ে যায়, সেই মর্হর্ত থেকে সে তার নিজস্ব গতি অনর্সরণ করে চলে এবং সেই গতি সমগ্রভাবে উৎপাদনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং এই সাধারণ নির্ভরতার চৌহদ্দির মধ্যে তা আবার নিজস্ব কতকগর্নলি নিয়ম মেনে চলে, যা নতুন উপাদানটির চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। এই গতির কতকগর্নলি নিজস্ব পর্যায় আছে, তা আবার উৎপাদনের গতির উপরও পাল্টা প্রতিক্রিয়া ঘটায়। আমেরিকা আবিষ্কারের কারণ স্বর্ণলোলর্পতা, যা ইতিপর্বেই পোর্তুগীজদের আফ্রিকায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল (স্যোটবের লিখিত 'মহার্ঘ ধাতুর উৎপাদন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য), কারণ ১৪৫০ সাল থেকে ১৫৫০ সাল রৌপ্যের বিপর্ল দেশ জার্মানি চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের বিপর্লভাবে বিকশিত ইউরোপীয় শিল্প ও তদনর্যায়ী বাণিজ্যের বিনিময়-মাধ্যম জোগাতে পারে নি। ১৫০০ সাল থেকে ১৮০০ সাল অবধি পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজরা যে ভারত জয় করে তার লক্ষ্য ছিল ভারত **থেকে আমদানি** — সেখানে কিছর্ রপ্তানি করার কথা কেউ

স্বপ্নেও ভাবে নি। অথচ একমাত্র বাণিজ্যের স্বার্থে ঘটিত এই সব আবিষ্কার ও বিজয়ের কী বিপুল প্রতিক্রিয়াই না ঘটে শিল্পের উপর: বৃহদায়তন শিল্পের সৃষ্টি ও বিকাশ হয় কেবল এই সব দেশে **রপ্তানির** প্রয়োজন থেকে।

টাকার বাজারের বেলাতেও তাই। টাকার বাণিজ্য যেই পণ্যের বাণিজ্য থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন থেকেই উৎপাদন ও পণ্যবাণিজ্য কর্তৃক আরোপিত কতকগুলি শর্তাধীনে এবং সেই চৌহদ্দির মধ্যে, টাকার বাণিজ্যের একটা নিজস্ব বিকাশ ঘটতে থাকে, তার নিজস্ব প্রকৃতি কর্তৃক নির্দিষ্ট বিশেষ নিয়মাবলী ও পর্যায় দেখা দেয়। এর সঙ্গে যদি আরো যোগ করা যায় যে, টাকার বাণিজ্য কিছুটা বিকাশ লাভ করার পর সিকিউরিটির বাণিজ্যও তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে এবং সে সিকিউরিটিগুলো শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় বন্ড নয় শিল্প ও পরিবহণের স্টকও বটে, ফলে উৎপাদনের একাংশের উপর টাকার বাণিজ্য প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে, যদিও সামগ্রিক বিচারে উৎপাদনের দ্বারা সে নিজেই নিয়ন্ত্রিত,—তাহলে উৎপাদনের উপর টাকার বাণিজ্যের প্রতিক্রিয়া আরও জোরালো ও আরও জটিল হয়ে ওঠে। টাকার কারবারীরা রেলপথ, খনি, লোহা কারখানা, ইত্যাদির মালিক। এই উৎপাদন-উপায়গুলির দুইটি দিক দেখা দেয়: তাদের কাজ চালাতে হয় কখনো কখনো প্রত্যক্ষ উৎপাদনের স্বার্থে, কখনো আবার টাকার কারবারী শেয়ার-হোল্ডারদের প্রয়োজনে। এর সবচেয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে উত্তর আমেরিকার রেলপথগুলি। জনৈক জেই গুল্ড, অথবা ভ্যান্ডারবিল্ট প্রভৃতির মতো ব্যক্তির শেয়ার-বাজারী ক্রিয়াকলাপের উপর এদের পরিচালনার কাজ নির্ভর করে; আর সংশ্লিষ্ট রেলপথটি এবং যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে তার স্বার্থের সঙ্গে এই সব ক্রিয়াকলাপের কোনো সংশ্রবই নেই। এমন কি, এখানে, ইংলন্ডেও আমরা দশকের পর দশক ধরে বিভিন্ন রেল কোম্পানির মধ্যে নিজ নিজ এলাকার সীমানা নিয়ে সংঘর্ষ চলতে দেখেছি—যাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে উৎপাদন ও পরিবহণ-ব্যবস্থার স্বার্থে নয়, নিতান্তই সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য, টাকার কারবারী শেয়ার-হোল্ডারদের শেয়ার-বাজারী ক্রিয়াকলাপে সাহায্য করাই যার একমাত্র উদ্দেশ্য।

পণ্যবাণিজ্যের সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্ক এবং টাকার বাণিজ্যের সঙ্গে উভয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার ধারণার এই যে কিছু ইঙ্গিত দিলাম, এর

মধ্যেই সাধারণভাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে আপনার প্রশ্নগুলিরও মূলত জবাব দেওয়া হয়ে গেল। শ্রমবিভাগের দিক থেকে বিষয়টিকে বোঝা সবচেয়ে সহজ। সমাজে এমন কতকগুলি সাধারণ কাজের উদ্ভব হয়, যা ছাড়া তার চলে না। এই উদ্দেশ্যে যেসব লোক নিয়োগ করা হয় তারা **সমাজের অভ্যন্তরে** শ্রমবিভাগের একটি নতুন শাখা হয়ে দাঁড়ায়। এতে তাদের বিশেষ স্বার্থের সৃষ্টি হয়, যে স্বার্থ যাদের কাছ থেকে তারা ভারপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের স্বার্থ থেকেও স্বতন্ত্র; তারা শেষোক্তদের অধীনতা থেকে নিজেদের স্বাধীন করে নেয়—এবং এইভাবে রাষ্ট্র গড়ে উঠতে থাকে। তখন, পণ্যবাণিজ্যে ও পরে টাকার বাণিজ্যে যে প্রক্রিয়া চলে, অনুরূপ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। নতুন স্বাধীন শক্তিকে প্রধানত উৎপাদনের গতি-প্রকৃতিকে অনুসরণ করতে হয় বটে, তথাপি সে আবার তার অন্তর্নিহিত আপেক্ষিক স্বাধীনতা বলে, অর্থাৎ একবার প্রদত্ত ও পরে ক্রমশ বর্ধিত এই আপেক্ষিক স্বাধীনতা বলে উৎপাদনের অবস্থা ও গতি-প্রকৃতির উপর পাল্টা প্রতিক্রিয়া করে। এ হচ্ছে দুটি অসম শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া: এক দিকে, অর্থনৈতিক গতি এবং, অপরদিকে, নতুন রাজনৈতিক শক্তি, যা যতখানি সম্ভব স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করে এবং একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে যা নিজস্ব একটা গতিও লাভ করে। সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক গতিটা পথ করে নেয় বটে, কিন্তু তাকেও সইতে হয় সেই রাজনৈতিক গতির প্রতিক্রিয়া, যা সে নিজেই প্রতিষ্ঠিত ও আপেক্ষিক স্বাধীনতায় ভূষিত করেছে; সইতে হয়, এক দিকে, রাষ্ট্রশক্তির এবং, অন্য দিকে, যুগপৎ-সঞ্জাত বিরোধিতার প্রতিক্রিয়া। যেমন শিল্পের বাজারের গতি-প্রকৃতি প্রধানত এবং পূর্বোলিখিত সীমার মধ্যে টাকার বাজারে প্রতিফলিত হয়, অবশ্য **উল্টোভাবে** প্রতিফলিত হয়, ঠিক তেমনই বিভিন্ন যেসব শ্রেণী ইতিমধ্যেই বর্তমান ও ইতিমধ্যেই পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত, তাদের সংগ্রামটা সরকার ও বিরোধীশক্তির সংগ্রামের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু হয় তেমনি উল্টোভাবে, আর প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে, শ্রেণী-সংগ্রাম রূপে নয়, রাজনৈতিক নীতির জন্য সংগ্রাম রূপে এবং এতটা বিকৃত রূপে যে তাকে ধরতে আমাদের লেগেছে কয়েক হাজার বছর।

অর্থনৈতিক বিকাশের উপর রাষ্ট্রশক্তির প্রতিক্রিয়া তিন প্রকারের হতে

পারে। রাষ্ট্রশক্তি একই অভিমুখে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বিকাশ হয় আরও দ্রুত; অর্থনৈতিক বিকাশধারার বিপরীত দিকে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আজকাল প্রত্যেক বৃহৎ জাতির মধ্যে রাষ্ট্রশক্তি শেষ পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে; অথবা সেটা অর্থনৈতিক বিকাশের কয়েকটি পথ বন্ধ করে অন্য কয়েকটি পথে ঠেলে দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আগের দুটির একটিতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্থনৈতিক বিকাশের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করতে পারে এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি ও বৈষয়িক সম্পদের অপচয় ঘটাতে পারে।

এছাড়াও রয়েছে দেশজয় এবং অর্থনৈতিক সম্পদের পাশবিক ধ্বংসসাধন, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটা সমগ্র স্থানীয় বা জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশকে আগে ধ্বংস করে দিতে পারত। আজকাল, এই ধরনের ঘটনায় সাধারণত বিপরীত ফলই হয়ে থাকে, অন্তত বড় বড় জাতির মধ্যে। শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক দিক থেকে বিজিতই কখনো কখনো বিজেতা অপেক্ষা বেশি লাভবান হয়।

আইনের বেলাতেও ঠিক এই। যে মুহূর্তে বৃত্তিধারী আইনজীবী সৃষ্টি করার মতো নতুন শ্রমবিভাগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, অমনি আরেকটি নতুন ও স্বাধীন ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়; যা সাধারণভাবে উৎপাদন ও আদানপ্রদানের উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও এই দুটো ক্ষেত্রের উপর পাল্টা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির বিশেষ ক্ষমতা ধারণ করে। কোনো আধুনিক রাষ্ট্রে আইনকে যে কেবলমাত্র সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার উপযোগী এবং তার অভিব্যক্তি হতে হবে তাই নয়, তাকে **অভ্যন্তরীণভাবে সুসঙ্গতিপূর্ণ** একটা অভিব্যক্তিও হতে হবে, যা অন্তর্বিরোধের ফলে নিজের নাকচ করে দেয় না। এই লক্ষ্য লাভ করতে গিয়ে অর্থনৈতিক অবস্থার হুবহু প্রতিফলন ক্রমেই বেশি করে ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। সেটা আরও বেশি করে ঘটতে থাকে এই জন্য যে, আইনের বিধি-ব্যবস্থায় কোনো শ্রেণীর আধিপত্যের স্থূল, চরম ও নির্ভেজাল অভিব্যক্তি ঘটে কদাচিত, ঘটলে তাতে 'অধিকারের ধারণা'ই ক্ষুণ্ণ হত। এমন কি 'নেপোলিয়নের সংহিতাতে'ও (১২৫) ১৭৯২-১৭৯৬ সালের বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীর বিশুদ্ধ ও পূর্বাপর সঙ্গতিযুক্ত

অধিকারসম্পর্কিত ধারণা ইতিমধ্যেই নানাভাবে ভেজাল মিশ্রিত হয়েছে এবং যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাও প্রলেতারিয়েতের উদীয়মান শক্তির জন্য প্রতিদিনই নানাভাবে নরম করে তুলতে হয়েছে। এতে কিন্তু 'নেপোলিয়নের সংহিতার' পক্ষে সেইরকম সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থা হতে বাধছে না, যা দুনিয়ার প্রত্যেক অঞ্চলের প্রতিটি নতুন আইনবিধির ভিত্তিস্বরূপ। এইভাবে, 'অধিকারের বিকাশ' ধারা বহু পরিমাণে চলেছে কেবল এইভাবে যে, প্রথমে অর্থনৈতিক সম্পর্কাবলীকে আইনের নীতিতে প্রত্যক্ষ তর্জমার ফলে উদ্ভূত অন্তর্বিরোধগুলিকে দূর করে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস হচ্ছে এবং পরে পরবর্তী অর্থনৈতিক বিকাশের প্রভাবে ও চাপে এই ব্যবস্থার মধ্যে বারম্বার ভাঙন ও নতুন স্ববিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে। (এখানে আপাতত আমি শুধু দেওয়ানি আইনের কথাই বলছি।)

আইনের নীতিরূপে অর্থনৈতিক সম্পর্কাবলীর প্রতিফলনটাও উল্টোপাল্টা হতে বাধ্য। ক্রিয়ারত মানুষের অজ্ঞাতসারেই এই প্রক্রিয়া চলে; আইনবিদ মনে করে, সে পূর্বানুমিত প্রতিপাদ্যগুলি নিয়ে কাজ করছে, আসলে কিন্তু সেগুলি অর্থনৈতিক সম্পর্কাবলীর প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়। সেই জন্যই সব কিছুই একদম উল্টো হয়ে দাঁড়ায়। এবং আমার মনে হয় এটা খুবই স্পষ্ট যে, এই উল্টো অবস্থাটা যতদিন বোধগম্য না হচ্ছে ততদিন, তথাকথিত **মতাদর্শগত ধারণা** গড়ে তুলে নিজেই সে আবার অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর পাল্টা ক্রিয়া করে এবং কতকগুলি সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাকে সংশোধিতও করতে পারে। পরিবারের বিকাশের যদি একই পর্যায় ধরে নেওয়া হয়, তাহলে উত্তরাধিকার আইনের ভিত্তিটা অর্থনৈতিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা প্রমাণ করা শক্ত হবে যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংলন্ডে ইচ্ছাপত্র রচয়িতার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা এবং ফ্রান্সে তার উপর আরোপিত কঠোর বিধিনিষেধ, তার কারণ শুধু অর্থনৈতিক। দুইই অবশ্য আবার উল্টো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, কারণ এতে সম্পত্তি বণ্টন প্রভাবিত হয়।

ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি আরও ঊর্ধ্বচারী মতাদর্শগত ক্ষেত্রগুলির প্রসঙ্গে বলা চলে, এদের একটা প্রাগৈতিহাসিক অন্তর্বস্তু রয়েছে, আজকাল আমরা যাকে আজগুবি বলে থাকি, ঐতিহাসিক যুগ তাকে বিদ্যমান অবস্থায় পায়

এবং আত্মসাৎ করে। প্রকৃতি বিষয়ে, মানুষের নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে, ভূতপ্রেত, জাদুশক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে নানাপ্রকারের এই সব ভ্রান্ত ধারণার অর্থনৈতিক ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক। প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিম্ন অর্থনৈতিক বিকাশের পরিপূরণ ঘটেছে, এবং সেই সঙ্গে তার শর্ত, এমন কি কারণও মিলেছে প্রকৃতি-বিষয়ক এই ভ্রান্ত ধারণায়। এবং যদিও প্রকৃতি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের প্রধান চালিকা-শক্তি ছিল এবং ক্রমেই বেশি করে হয়ে উঠছে অর্থনৈতিক প্রয়োজন, তথাপি এই সব কিছু আদিম আজগুবি ধারণার মূলে অর্থনৈতিক কারণ খুঁজতে যাওয়া হবে পণ্ডিতমূর্খের কাজ। বিজ্ঞানের ইতিহাস হচ্ছে ক্রমাগত এই আজগুবির অপসারণ বা তার স্থানে নতুন এবং পূর্বাপেক্ষা কম আজগুবিকে স্থাপন করার ইতিহাস। যারা এই কাজ করে তারা শ্রমবিভাগের বিশেষ ক্ষেত্রের লোক এবং তাদের ধারণা তারা একটি স্বাধীন ক্ষেত্রে কাজ করছে। যে পরিমাণে তারা সামাজিক শ্রমবিভাগের অভ্যন্তরে একটি স্বাধীন গোষ্ঠীরূপে থাকে, সেই পরিমাণে ভুলভ্রান্তিসহ তাদের কীর্তি সমাজের সমগ্র বিকাশের উপর, এমন কি তার অর্থনৈতিক বিকাশের উপরও প্রভাব হিসেবে পাল্টা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কিন্তু তাহলেও তারা নিজেরাই আবার অর্থনৈতিক বিকাশের প্রধান প্রভাবের অধীন। যেমন, দর্শনে, বুর্জোয়া যুগের ক্ষেত্রে একথা খুব সহজেই প্রমাণ করা যায়। হব্‌স ছিলেন প্রথম আধুনিক বস্তুবাদী (অষ্টাদশ শতকের অর্থে), কিন্তু যে যুগে সারা ইউরোপ জুড়ে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের আধিপত্য, এবং যে যুগে ইংলন্ডে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বনাম জনসাধারণের লড়াই শুরু হচ্ছে, সেই যুগে তিনি ছিলেন নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের অনুগামী। লক্‌ ছিলেন ধর্ম ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই ১৬৮৮ সালের শ্রেণী-আপসের (১২৬) সন্তান। ব্রিটিশ ডিইস্টরা (১২৭) এবং তাদের আরও সুসংগতিপূর্ণ উত্তরসাধক ফরাসী বস্তুবাদীরা ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রকৃত দার্শনিক; ফরাসী বস্তুবাদীরা এমন কি বুর্জোয়া বিপ্লবেরও দার্শনিক ছিলেন। কাণ্ট থেকে হেগেল পর্যন্ত সারা জার্মান দর্শন জুড়ে উঁকি দেয় জার্মান কূপমণ্ডূক, কখনও ইতিবাচকরূপে, কখনও নেতিবাচকরূপে। কিন্তু যেহেতু প্রত্যেক যুগের দর্শন শ্রমবিভাগের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র, সেই হেতু সে তার পূর্বগামীদের কাছ থেকে পাওয়া কতকগুলি নির্দিষ্ট চিন্তাবস্তুকে পূর্বস্থিতিরূপে গ্রহণ

করে যাত্রা শুরু করে। এই জন্যই অর্থনীতির দিক থেকে পশ্চাৎপদ দেশগুলিও দর্শনের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে: যেমন ইংলন্ডের সঙ্গে তুলনায় প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স — ইংলন্ডের দর্শনের উপরই ফরাসীরা নিজেদের দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, পরে ফ্রান্স ও ইংলন্ড উভয়ের তুলনায় জার্মানি। কিন্তু ফ্রান্স ও জার্মানি উভয় দেশেই তখন দর্শন ও সাহিত্যের সাধারণ স্ফুরণের মূলে ছিল একটা অর্থনৈতিক জোয়ার। শেষ পর্যন্ত এসব ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক বিকাশের আধিপত্য আমার কাছে সন্দেহাতীত; কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিশেষ ক্ষেত্রের দ্বারা আরোপিত অবস্থার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ: যেমন দর্শনের বেলায় পূর্বগামীদের হাত থেকে পাওয়া যেসকল দার্শনিক মালমসলা বিদ্যমান তার উপর অর্থনৈতিক প্রভাবগুলির (যা আবার সাধারণত রাজনীতি ইত্যাদির ছদ্মবেশেই মাত্র কাজ করে) প্রক্রিয়ার মধ্যে। এখানে অর্থনীতি নতুন কিছু সৃষ্টি করে না, বিদ্যমান রূপে প্রাপ্ত চিন্তা-উপকরণ কীভাবে পরিবর্তিত ও আরও বিকশিত হবে তার পথ নির্দিষ্ট করে, এবং তাও করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরোক্ষভাবে, কারণ রাজনৈতিক, আইনগত ও নৈতিক প্রতিফলনগুলিই দর্শনের উপর প্রধানতম প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে।

ধর্ম সম্পর্কে সবচেয়ে যেটা প্রয়োজনীয় তা আমি ফয়েরবাখ সম্পর্কিত শেষ অধ্যায়ে বলেছি*।

অতএব, বার্ট যদি ধরে নিয়ে থাকেন যে, অর্থনৈতিক আন্দোলনের উপর ঐ আন্দোলনের রাজনৈতিক এবং অন্যান্য যেকোনো প্রতিফলনের প্রতিক্রিয়া আমরা অস্বীকার করি, তাহলে তিনি বাতচক্রের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। তিনি যদি শুধু একবার মার্কসের **'আঠারোই ব্রুমেয়ার'**** বইখানার পাতায় চোখ বোলান তাহলেই বুঝতে পারবেন, রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ঘটনাবলী কী **বিশেষ** ভূমিকা পালন করেছে বইখানিতে প্রায় একান্তভাবে তাই আলোচিত হয়েছে, অবশ্য অর্থনৈতিক অবস্থার উপর তাদের **সাধারণ** নির্ভরশীলতার সীমার মধ্যে। কিম্বা দেখতে পারেন 'পুঁজি' গ্রন্থখানি,

* এই সংস্করণের ১০ম খন্ডের ১৩৯-১৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** এই সংস্করণের ৪র্থ খন্ডের ১২-১৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রমদিন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে অংশে, সেই অংশ। সেখানে দেখা যাবে আইন প্রণয়নের প্রতিক্রিয়া কত প্রভাবশালী, এবং আইন প্রণয়ন নিশ্চয়ই একটি রাজনৈতিক কাজ। অথবা, বুর্জোয়ার ইতিহাস সংক্রান্ত অংশ (চতুর্বিংশ অধ্যায়*)। রাজনৈতিক ক্ষমতা যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিহীন হয়, তবে কেন আমরা প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক একনায়কতন্ত্রের জন্য লড়াই করছি? বলও (অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তি) একটি অর্থনৈতিক শক্তি!

কিন্তু বইখানিকে সমালোচনা করার মতো সময় এখন আমার নেই। প্রথমে আমাকে তৃতীয় খণ্ডটি** প্রকাশ করতে হবে। তাছাড়া আমার ধারণা বার্নস্টাইনও বেশ ভালোভাবেই এর মোকাবিলা করতে পারবেন।

এই ভদ্রলোকদের যে বস্তুটির অভাব তা হচ্ছে দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁরা সর্বদাই শুধু এখানে কারণ ও ওখানে কার্য দেখতে পান। এ যে একটা শূন্যগর্ভ বিমূর্ততা, এই ধরনের আধিবিদ্যক প্রান্তিক বৈপরীত্য যে বাস্তব জগতে দেখা যায় কেবল বড় জোর সংকটকালেই এবং সমগ্র বিপুল প্রক্রিয়া যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রূপেই চলে—যদিও অত্যন্ত অসম শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কারণ অর্থনৈতিক গতিটাই সর্বাধিক শক্তিশালী, সর্বাধিক আদিম, সর্বাধিক নির্ধারক—এখানে যে সব কিছুই আপেক্ষিক এবং কিছুই পরম নয়, একথা তাঁরা বুঝতে পারেন না। তাঁদের কাছে হেগেল বলে কেউ যেন কখনো ছিলেন না...

জার্মান থেকে ইংরেজি
অনুবাদের ভাষান্তর

---

* এই সংস্করণের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১৪-১১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থ। — সম্পাঃ

বার্লিনে ফ্রানৎস্ মেরিং সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ১৪ জুলাই, ১৮৯৩

প্রিয় মিঃ মেরিং,

'লেসিং কিংবদন্তী' বইখানি দয়া করে আমাকে পাঠানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর এই প্রথম সুযোগ আজ আমার হল। বইখানির মাত্র একটা আনুষ্ঠানিক প্রাপ্তিস্বীকার জানাতে চাই নি, ঐ সঙ্গে বইখানি সম্বন্ধে, বইখানির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলার ইচ্ছা ছিল। তাই দেরি হল।

আমি শুরু করব শেষ থেকে, অর্থাৎ 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সংক্রান্ত' পরিশিষ্ট (১২৮) থেকে, যেখানে আপনি প্রধান প্রধান তথ্যগুলি চমৎকারভাবে এবং যেকোনো পক্ষপাতহীন মানুষকে নিঃসংশয় করার মতো করে সাজিয়ে দিয়েছেন। আপত্তি করার যেটুকু চোখে পড়ল তা এই যে, আপনি আমাকে আমার প্রাপ্যের বেশি কৃতিত্ব দিয়েছেন; এমন কি কালক্রমে আমি নিজেও যেসব কথা আবিষ্কার করতে পারতাম বলে ধরে নিই, তাহলেও মার্কস তাঁর দ্রুততর উপলব্ধি ও ব্যাপকতর দৃষ্টির সাহায্যে সে সবই অনেক আগে আবিষ্কার করেছিলেন। মার্কসের মতো ব্যক্তির সঙ্গে চল্লিশ বছর কাজ করার সৌভাগ্য যার হয়, তার যে স্বীকৃতি প্রাপ্য বলে মনে হতে পারে তা সাধারণত সে ঐ ব্যক্তির জীবদ্দশায় লাভ করে না। তারপর বৃহতের মৃত্যু হলে ক্ষুদ্র সহজেই প্রাপ্যের অতিরিক্ত পায়; আমার মনে হয় বর্তমানে আমার বেলাতেও ঠিক এই হচ্ছে; শেষ পর্যন্ত ইতিহাস এ সব কিছুই শুধরে দেবে, কিন্তু ততদিন আমি নিঃশব্দে পরপারে চলে যাব এবং কোনো কিছু সম্পর্কেই কিছু জানব না।

এছাড়া, আপনার লেখায় একটিমাত্র জিনিসের অভাব, যার উপর অবশ্য মার্কস ও আমি আমাদের লেখায় কখনও যথেষ্ট জোর দিই নি এবং সে ব্যাপারে আমরা সবাই সমানভাবে দোষী। অর্থাৎ, প্রথমে আমরা প্রধানত এই জোর দিয়েছিলাম এবং **বাধ্য হয়েই দিয়েছিলাম** যে, রাজনৈতিক, আইনগত ও অন্যান্য মতাদর্শগত ধারণা এবং এই সব ধারণার মাধ্যমে সংঘটিত কার্যাবলীর **উদ্ভব হয়েছে** মূল অর্থনৈতিক ঘটনাবলী থেকে। এই কাজ করতে গিয়ে বিষয়বস্তুর স্বার্থে আমরা রূপের দিকটা, অর্থাৎ যেভাবে ও যে

কায়দায় এই সব ধারণা ইত্যাদি আবির্ভূত হয় সেই দিকটা অবহেলা করেছিলাম। এতে আমাদের শত্রুদের পক্ষে ভুল বোঝানোর ও বিকৃতি সাধনের খুব একটা সুযোগ জুটে যায়। পাউল বার্ট তারই একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

ভাবাদর্শ এমন একটি প্রক্রিয়া যা তথাকথিত মনীষী যে সচেতনভাবে সম্পাদন করেন সে-কথা ঠিক, কিন্তু এ সচেতনতা ভ্রান্ত সচেতনতা। তাঁকে চালিত করে যে প্রকৃত প্রেরণাশক্তি তা তাঁর কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়, অন্যথায় তা ভাবাদর্শগত প্রক্রিয়াই হত না। তাই, তিনি মিথ্যা কিম্বা আপাতপ্রতীয়মান প্রেরণাশক্তিরই অস্তিত্ব কল্পনা করেন। যেহেতু এই প্রক্রিয়া হচ্ছে চিন্তার প্রক্রিয়া, সেই হেতু তিনি এর বিষয়বস্তু ও রূপ দুইই হয় নিজের নয় পূর্বগামীদের বিশুদ্ধ চিন্তা থেকে আহরণ করেন। তিনি কেবলমাত্র চিন্তা-উপকরণ নিয়েই কাজ করেন, যা তিনি পরীক্ষা না করেই চিন্তাফল বলে গ্রহণ করেন এবং চিন্তা থেকে স্বাধীন কোনো দূরতর উৎস আর অনুসন্ধান করে দেখেন না। প্রকৃতপক্ষে একে তিনি স্বাভাবিক বলেই ধরে নেন, কারণ সমস্ত কর্ম চিন্তার **মধ্যস্থতায়** সম্পন্ন হয় বলে, তিনি ধরে নেন সেটা শেষ পর্যন্ত চিন্তার **ভিত্তিতেই** ঘটছে।

যে ভাবপ্রবক্তা ইতিহাস নিয়ে কারবার করেন (ইতিহাস বলতে এখানে সোজাসুজি শুধু প্রকৃতির নয়, **সমাজের** সমস্ত ক্ষেত্রকেই বোঝাচ্ছে যেমন, রাজনৈতিক, আইনগত, দার্শনিক, ধর্মশাস্ত্রীয়), তিনি বিজ্ঞানের প্রতি ক্ষেত্রে এমন সব মালমশলা হাতে পান, যা পূর্বপুরুষদের চিন্তা থেকে স্বাধীনভাবে উদ্ভূত এবং যা একের পর এক এই সব পুরুষের মস্তিষ্কে নিজস্ব স্বাধীন বিকাশধারার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে এসেছে। একথা সত্য যে, কোনো একটি ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহির্ঘটনাবলীও এই বিকাশের উপর সহ-নির্ধারক প্রভাব বিস্তার করতে পারে, কিন্তু না বলেও ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, এই ঘটনাগুলি নিজেরাও একটি চিন্তা প্রক্রিয়ার ফলমাত্র; অতএব আমরা শুদ্ধ চিন্তার জগতেই রয়ে যাই, যে চিন্তা যেন সবচেয়ে বেয়াড়া ঘটনাগুলিকে পর্যন্ত বেমালুম হজম করে ফেলে।

পৃথক পৃথক প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-সংবিধান, আইন-ব্যবস্থা, ভাবাদর্শগত ধ্যানধারণার এক একটা স্বাধীন ইতিহাসের এই আপাতপ্রতীয়মানতাই

সর্বোপরি অধিকাংশ মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। লুথার ও কালভাঁ যদি সরকারী ক্যাথলিক ধর্ম 'পরাহত করে থাকেন', কিম্বা হেগেল যদি কাণ্ট ও ফিখতেকে 'পরাহত করে থাকেন', কিম্বা রুসো যদি তাঁর প্রজাতন্ত্রী 'সামাজিক চুক্তি' (১২৯) দিয়ে নিয়মতন্ত্রী মঁতেস্ক্যকে পরোক্ষে 'পরাহত করে থাকেন', তাহলে সে যেন এক প্রক্রিয়া যা ধর্মতত্ত্ব, দর্শন বা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়েই থাকছে, তা এই বিশেষ বিশেষ চিন্তাক্ষেত্রগুলির ইতিহাসে এক একটি স্তরেরই পরিচায়ক, এবং কখনও চিন্তাক্ষেত্রের বাইরে যায় না। এর সঙ্গে আবার পুঁজিবাদী উৎপাদনের চিরন্তনতা ও চূড়ান্ততার বুর্জোয়া ভ্রান্তি যুক্ত হয়, ফলে ফিজিওক্রাট ও অ্যাডাম স্মিথের হাতে বাণিজ্যপন্থীদের (১৩০) 'পরাভব' একান্তভাবে চিন্তার জয় বলেই ধরে নেওয়া হয়, চিন্তার মধ্যে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতিফলনরূপে নয়, সর্বদা এবং সর্বত্র বিদ্যমান বাস্তব অবস্থার নির্ভুল ও চূড়ান্ত উপলব্ধিরূপে। বলতে কি সিংহহৃদয় রিচার্ড এবং ফিলিপ অগস্টাস যদি ক্রুসেড যুদ্ধে (১৩১) জড়িয়ে না পড়ে স্বাধীন বাণিজ্য প্রবর্তন করতেন, তাহলে আমরা যেন পাঁচ-শো বছরের দুর্দশা ও মূঢ়তা থেকে রেহাই পেতাম।

আমার মনে হয় বিষয়টির এই যে দিকটিকে এখানে মাত্র উল্লেখ করে যাওয়া সম্ভব হল, সেটাকে আমরা যতটা অবহেলা করেছি তা অনুচিত। এ সেই পুরাতন কাহিনী — আধেয়ের স্বার্থে আধার প্রথমে সর্বদাই অবহেলিত হয়। ফের বলি, আমি নিজেও তাই করেছি, এবং সর্বদাই ভুল বুঝতে পেরেছি কেবল post festum*। অতএব, এর জন্য আপনাকে তিরস্কার মোটেই করছি না — বরং আপনার চেয়ে পুরাতন দোষী হিসেবে সে অধিকারও আমার নেই — তাহলেও আমি ভবিষ্যতের জন্য এই দিকটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

সেই সঙ্গে রয়েছে ভাবাদর্শীদের এই আজগুবি ধারণা: ইতিহাসে যাদের ভূমিকা রয়েছে সেই সব বিভিন্ন মতাদর্শক্ষেত্রের স্বাধীন ঐতিহাসিক বিকাশকে আমরা অস্বীকার করি বলে **ইতিহাসের উপর** তাদের কোনরূপ **প্রতিক্রিয়াকেও** আমরা বুঝি অস্বীকার করি। এর মূলে রয়েছে কারণ ও কার্য সম্পর্কে

* পরে। — সম্পাঃ

মাম্বলী অ-দ্বান্দ্বিক ধারণা, যেন তারা একান্তভাবেই বিপরীত মের্বস্থিত, তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সম্পূর্ণর্পে অবহেলা করা হয়। এই ভদ্রলোকেরা প্রায়ই ইচ্ছা করেই ভুলে যান যে, একবার যখন কোনো ঐতিহাসিক উপাদান অপরাপর এবং শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক কারণের ফলস্বর্প সৃষ্ট হয়ে যায়, তখন সেই উপাদানটি তার নিজের পরিবেশের উপর এবং এমন কি যেসব কারণ থেকে তার জন্ম সেগ্বলিরও উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্তস্বর্প, আপনার বইয়ের ৪৭৫ পৃষ্ঠায় প্বরোহিত সম্প্রদায় ও ধর্ম সম্পর্কে বার্টের বক্তব্য। এমন আশাতীত রকমের মাম্বলী ব্যক্তির সঙ্গে যেভাবে আপনি মোকাবিলা করেছেন তাতে আমি খ্বব খ্বশি হয়েছি। একেই আবার তারা লাইপজিগে ইতিহাসের অধ্যাপক বানিয়েছে! আগে সেখানে থাকতেন বৃদ্ধ ভাক্সম্বথ; সংকীর্ণমনা হলেও তথ্য সম্পর্কে তিনি খ্বব সজাগ ছিলেন, সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের লোক তিনি!

তাছাড়া, বইখানি সম্পর্কে আমার অভিমতর্পে আমি সেই কথারই প্বনর্বক্তি করতে পারি, যেকথা আমি *Neue Zeit* (১৩২) পত্রিকায় প্রবন্ধগ্বলি প্রকাশের সময় বলেছি: প্রুশীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে অন্য যেকোনো লেখার চেয়ে এ লেখা বহ্বগ্বণে ভালো। প্রকৃতপক্ষে একথাও বলতে পারি যে, বইখানি হচ্ছে একমাত্র ভালো বই যাতে সামান্যতম খ্বঁটিনাটি পর্যন্ত নিয়ে অধিকাংশ ব্যাপারের অন্তঃসম্পর্ককে নির্ভুলভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একমাত্র দ্বঃখ, বিসমার্ক পর্যন্ত সমগ্র বিকাশধারাকে আপনি অন্তর্ভুক্ত করেন নি এবং অজ্ঞাতসারেই আমার আশা হয় বারান্তরে আপনি এই কাজটি সম্পন্ন করবেন এবং ইলেক্টর ফ্রিডরিখ ভিলহেল্ম থেকে বৃদ্ধ ভিলহেল্ম* পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ ও সুসংগতিপূর্ণ চিত্র উপস্থিত করবেন। আপনি তো ইতিমধ্যেই আপনার প্রাথমিক অন্বসন্ধান শেষ করেছেন এবং প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে তা সমাপ্ত বলে ধরা যায়। প্বরনো নড়বড়ে দালান ভেঙে পড়ার আগেই যেকোনো ভাবে হোক কাজটি সেরে ফেলতে হবে। রাজতন্ত্রী-দেশপ্রেমিক কিংবদন্তীগ্বলির ভাঙন যদিও শ্রেণী-প্রভুত্ব গোপনকারী রাজতন্ত্রের বিলোপসাধনের পক্ষে সরাসরি একটা প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত নয় (কেননা

---

* প্রথম ভিলহেল্ম। — **সম্পাঃ**

জার্মানিতে একটি **বিশুদ্ধ,** বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র আবির্ভূত হবার আগেই ঘটনাস্রোত তাকে পিছু ফেলে এগিয়ে গেছে), তথাপি সে ভাঙন রাজতন্ত্র উচ্ছেদের পক্ষে অত্যন্ত কার্যকর হয়ে দাঁড়াবে।

তখন, জার্মানিকে যে সাধারণ দুর্গতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তার অংশ হিসেবে প্রাশিয়ার স্থানীয় ইতিহাসকে বিবৃত করারও আপনি আরও স্থান ও সুযোগ পাবেন। এই বিষয়টিতে আপনার মতের সঙ্গে কোনো কোনো স্থানে আমার অমিল রয়েছে, বিশেষত জার্মানির অঙ্গচ্ছেদের এবং ষোড়শ শতকে জার্মানিতে বুর্জোয়া বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে। আশা করছি, আগামী শীতকালেই আমি আমার 'কৃষকযুদ্ধ' বইখানির ঐতিহাসিক ভূমিকা নতুন করে লিখব, তখন আমি এই বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব। আমি যে আপনার বক্তব্য ভুল মনে করছি তা নয়, আমি শুধু তাদের পাশাপাশি অন্য বক্তব্যও রাখছি এবং কিছুটা অন্যরকমভাবে তাদের সাজাচ্ছি।

জার্মানির ইতিহাস এক নিরবচ্ছিন্ন দীনতার কাহিনী। এই ইতিহাস অনুশীলন করতে গিয়ে আমি বরাবরই দেখেছি, কেবলমাত্র পাল্টা ফরাসী ইতিহাস পর্বগুলির সঙ্গে তুলনার মাধ্যমেই একটি সঠিক মাত্রাজ্ঞান জন্মায়, কারণ সেখানে যা ঘটছে তা আমাদের দেশে যা ঘটছে তার ঠিক বিপরীত। যখন আমরা আমাদের চরম পতনের যুগের মধ্যে দিয়ে চলেছি, ঠিক তখনই সেখানে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের disjectis membris* থেকে একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানে প্রক্রিয়াটির সমগ্র গতিতে একটি দুর্লভ বিষয়নিষ্ঠ যৌক্তিকতা বর্তমান, আর আমাদের ক্ষেত্রে বিষণ্ণ বিশৃঙ্খলা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সেখানে মধ্যযুগে বিদেশীর হস্তক্ষেপ আসে ইংরেজ বিজেতাদের মধ্য দিয়ে, তারা হস্তক্ষেপ করে প্রভাঁস জাতিসত্তার স্বপক্ষে উত্তর ফরাসী জাতিসত্তার বিরুদ্ধে। ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধই একদিক দিয়ে ত্রিশ বছরের যুদ্ধ (১৩৩), এবং সে যুদ্ধের অবসান হল বিদেশী হানাদারদের উৎসাদনে এবং উত্তর কর্তৃক দক্ষিণের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে। তারপর এল কেন্দ্রীয় শক্তির সঙ্গে নিজের বৈদেশিক অধিকারগুলির সমর্থনপুষ্ট বার্গাণ্ডির

* বিচ্ছিন্ন অংশগুলি। — সম্পাঃ

সামন্ত রাজার* সংগ্রাম। সে গ্রহণ করল ব্রান্ডেন্‌বুর্গ — প্রাশিয়ার ভূমিকা। এই সংগ্রামে অবশ্য কেন্দ্রীয় শক্তি জয়ী হল এবং চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হল জাতীয় রাষ্ট্র। ঠিক সেই সময়ই আমাদের দেশে জাতীয় রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ল (পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের [১৩৪] অভ্যন্তরে 'জার্মান রাজ্যকে' যতটা জাতীয় রাষ্ট্র বলা চলে) এবং শুরু হল জার্মান ভূমির ব্যাপক লুণ্ঠন। এই তুলনা জার্মানদের পক্ষে অত্যন্ত হীনতাসূচক এবং সেই জন্যই আরও বেশি শিক্ষাপ্রদ; এবং যেহেতু আমাদের শ্রমিকেরা জার্মানিকে আবার ঐতিহাসিক আন্দোলনের পুরোভাগে স্থাপন করেছে, সেই হেতু অতীতের এই কলঙ্ককে পরিপাক করা আমাদের পক্ষে কিছুটা সহজ হয়েছে।

জার্মানির বিকাশের আরেকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে এই যে, সাম্রাজ্যের যে দুটো অংশ শেষ পর্যন্ত জার্মানিকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল তাদের কোনোটিই পুরোপুরি জার্মান ছিল না — দুইই ছিল বিজিত স্লাভ এলাকায় উপনিবেশ: অস্ট্রিয়া হল ব্যাভেরিয়ান উপনিবেশ, ব্রান্ডেন্‌বুর্গ হল স্যাক্সন উপনিবেশ। বিদেশী, অ-জার্মান অধিকারগুলির সমর্থনের উপর নির্ভর করেই তারা **আসল** জার্মানির অভ্যন্তরে ক্ষমতা অর্জন করেছিল: অস্ট্রিয়া নির্ভর করেছিল হাঙ্গেরীয় সমর্থনের উপর (বোহেমিয়ার কথা ছেড়েই দিচ্ছি) এবং ব্রান্ডেন্‌বুর্গ নির্ভর করেছিল প্রাশিয়ার সমর্থনের উপর। যে পশ্চিম সীমান্ত ছিল দারুণ বিপদের মধ্যে, সেখানে এধরনের কিছু ঘটে নি; উত্তর সীমান্তে দিনেমারদের হাত থেকে জার্মানিকে রক্ষা করার ভার দিনেমারদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং দক্ষিণ দিকে রক্ষা করার মতো বিশেষ কিছু ছিল না বলেই সীমান্তরক্ষী সুইজারল্যান্ডবাসীরা এমন কি জার্মানি থেকে নিজেদের ছিন্ন করে নিতেও সক্ষম হয়েছিল!

কিন্তু আমি নানাধরনের অতিরিক্ত আলোচনার মধ্যে গিয়ে পড়েছি। আপনার বই আমার মনকে কীভাবে নাড়া দিয়েছে, এই বাচালতা অন্তত তার প্রমাণ।

---

* বীর কার্ল। — সম্পাঃ

আরেকবার আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

ভবদীয়

ফ. এঙ্গেলস

জার্মান থেকে ইংরেজি
অনুবাদের ভাষান্তর

পিটার্সবুর্গে ন. ফ. দানিয়েলসন সমীপে এঙ্গেলস

লন্ডন, ১৭ অক্টোবর, ১৮৯৩

'রেখাচিত্রের' (১৩৫) কপিগুলির জন্য ধন্যবাদ। তিনখানি কপি আমি সমঝদার বন্ধুদের পাঠিয়ে দিয়েছি। দেখে খুশি হলাম, বইখানি খুবই চাঞ্চল্য এবং রীতিমতো উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে—করাই উচিত। যেসব রুশীদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, বইখানি তাঁদের মধ্যে প্রধান আলোচ্য বিষয়। এইতো গতকালই তাঁদের একজন* লিখেছেন: সেখানে, রাশিয়ায় 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের ভাগ্য' নিয়ে বিতর্ক চলেছে। বার্লিনের *Sozialpolitisches Centralblatt*** পত্রিকায় মিঃ প. স্ত্রুভে আপনার বই সম্পর্কে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন; এই একটি বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একমত যে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ কর্তৃক সৃষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থা, যে পদ্ধতিতে কৃষি-সম্পর্কে ১৮৬১ সালের পরিবর্তন (১৩৬) সাধিত হয়েছিল সেই পদ্ধতি এবং সাধারণভাবে ইউরোপের রাজনৈতিক অচলাবস্থা — রাশিয়ার পুঁজিবাদী বিকাশের বর্তমান স্তর এদেরই অনিবার্য পরিণতি বলেই, আমারও মনে হয়। কিন্তু যাকে তিনি বলেছেন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার হতাশাব্যঞ্জক ধারণা, তা খন্ডন করতে গিয়ে রাশিয়ার বর্তমান স্তরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্তরের সঙ্গে তুলনা করায়

---

* গোল্ডেনবের্গ। — সম্পাঃ

** প্রকাশনের তৃতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১ অক্টোবর, ১৮৯৩। [এঙ্গেলসের টীকা। — সম্পাঃ]

তিনি সুনিশ্চিতভাবে ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাশিয়াতেও আধুনিক পুঁজিবাদের কুফলগুলিকে সমান সহজে দূর করা যাবে। তিনি একেবারেই ভুলে গেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্ম থেকেই আধুনিক, বুর্জোয়া; তিনি ভুলে গেছেন যে, পুরোপুরি বুর্জোয়া সমাজ স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের কবল থেকে পালিয়ে যাওয়া পেটি বুর্জোয়া ও চাষীরাই তাকে প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু রাশিয়ায় আদিম সাম্যবাদী প্রকৃতির একটা ভিত রয়েছে, একটা সভ্যতাপূর্ব গোত্র-সংগঠন রয়েছে। তা ধ্বসে পড়ছে বটে, তবু এখনও পুঁজিবাদী বিপ্লব (যা প্রকৃত সমাজবিপ্লব) যার উপর দাঁড়িয়ে কাজ করছে, তার বনিয়াদ ও উপকরণ হয়ে রয়েছে। আমেরিকায় এক শতাব্দীরও বেশি হল মুদ্রা-অর্থনীতি পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এদিকে রাশিয়ায় প্রায় পুরোপুরিই স্বভাব-অর্থনীতি হল নিয়ম। অতএব, বোঝাই যায় যে, রাশিয়ার পরিবর্তন আমেরিকার চেয়ে অনেক বেশি হিংসাত্মক, অনেক বেশি ক্ষুরধার হবে এবং বহুগুণ বেশি দুর্গতির মধ্য দিয়ে আসবে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমার মনে হয় আপনি যতটা হতাশাব্যঞ্জক চিত্র তুলে ধরেছেন, ঘটনাবলী তা সমর্থন করে না। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সমাজের একটা ভয়ানক তোলপাড় ছাড়া এবং গোটাগুটি এক-একটা শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে অন্যান্য শ্রেণীতে রূপান্তর ছাড়া আদিম কৃষিভিত্তিক সাম্যবাদ থেকে পুঁজিবাদী শিল্পায়নে উত্তরণ সম্ভব নয়। এর ফলে অনিবার্যভাবেই কী বিপুল পরিমাণ দুর্গতি এবং মানবজীবন ও উৎপাদন-শক্তির অপচয় ঘটে, তা আমরা ক্ষুদ্রাকারে দেখেছি—পশ্চিম ইউরোপে। কিন্তু তার ফলে মোটেই একটা মহান ও অতিপ্রতিভাধর জাতি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় না। দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধি—যাতে আপনারা অভ্যস্ত—তা রুদ্ধ হতে পারে; বেপরোয়া অরণ্যবিনাশ ও সেই সঙ্গে জমিদার তথা কৃষকদের উচ্ছেদের ফলে উৎপাদন-শক্তির অপরিমেয় অপচয় ঘটাতে পারে, কিন্তু, যাই হোক না-কেন, দশ কোটির বেশি মানুষের একটি জাতি শেষ পর্যন্ত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ **বৃহৎ শিল্পের** একটা ভালো রকম অভ্যন্তরীণ বাজার হয়ে দাঁড়াবে এবং অন্যান্য দেশের মতো আপনাদের বেলাতেও ভারসাম্য ঘটবে—অবশ্য যদি পুঁজিবাদ পশ্চিম ইউরোপে সুদীর্ঘকাল টিকে থাকে।

আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন,

'ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর রাশিয়ার সামাজিক অবস্থা, অতীত ইতিহাস থেকে যে উৎপাদন-রূপ আমরা লাভ করেছি তার বিকাশের পক্ষে অনুকূল ছিল না।'

আমি আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলব, আদিম কৃষিভিত্তিক সাম্যবাদ থেকে উন্নততর সামাজিক রূপে বিকাশলাভ অন্য যেকোনো দেশের মতো রাশিয়াতেও সম্ভব নয়, যদি না নিদর্শন জোগাবার মতো ঐ উন্নততর রূপটি অন্য কোনো দেশে **ইতিপূর্বেই বিদ্যমান** থাকে। যেখানে ঐতিহাসিক কারণে সম্ভব সেখানে এই উন্নততর রূপটি যেহেতু পুঁজিবাদী উৎপাদন-রূপ ও তার সৃষ্ট সামাজিক দ্বৈতবিরোধের অনিবার্য পরিণতি, সেই জন্যই, কৃষিভিত্তিক গোষ্ঠী থেকে সরাসরি তার উদ্ভব হতে পারে না, যদি ইতিমধ্যেই কোথাও তার অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত না থেকে থাকে। যদি ১৮৬০-১৮৭০ সালে ইউরোপের পশ্চিমাংশ এই ধরনের রূপান্তরের পক্ষে পরিণত হয়ে থাকত, যদি ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে তখনই এই রূপান্তরণের কাজ শুরু হয়ে যেত, তাহলে তখন রুশীদের কর্তব্য হত তাদের যে গোষ্ঠী কমবেশি অটুটই ছিল তাকে অবলম্বন করে কী করা যায় সেটা দেখানো। কিন্তু পশ্চিমে রইল অচল অবস্থা, এ ধরনের কোনো রূপান্তরণের চেষ্টা সেখানে হল না এবং পুঁজিবাদ দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে বিকাশ লাভ করতে লাগল। তখন যেহেতু রাশিয়ার পক্ষে কেবল এই গত্যন্তর ছিল: হয় গোষ্ঠীকে (১৩৭) এমন এক উৎপাদন-রূপে গড়ে তোলা, যার সঙ্গে তার একাধিক ঐতিহাসিক স্তরের ব্যবধান এবং যার উপযোগী অবস্থা তখন এমন কি পশ্চিমেও পরিপক্ক নয়,—স্পষ্টতই এ কাজ অসম্ভব,—নয় পুঁজিবাদে বিকাশ লাভ করা, তাই শেষোক্ত পথ গ্রহণ ছাড়া তার কীই বা করার ছিল?

আর গোষ্ঠীর প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, তা ততদিনই সম্ভব যতদিন তার সদস্যদের মধ্যে ধনবৈষম্য নগণ্য থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে এই বৈষম্য বড় হয়ে ওঠে, যে মুহূর্তে তার সদস্যদের কেউ কেউ সমৃদ্ধতর সদস্যদের ঋণদাসে পরিণত হয়, সে মুহূর্ত থেকে গোষ্ঠী আর টিকতে পারে না। আপনাদের দেশের কুলাকেরা ও মিরোয়েদরা (১৩৮) যে নির্মমতার সঙ্গে গোষ্ঠীকে ধ্বংস করছে, সলোনের পূর্বে এথেন্সের কুলাকেরা ও মিরোয়েদরাও ঠিক

সেই নির্মমতার সঙ্গে এথেনীয় **গোত্র-সংগঠনকে** ধ্বংস করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস নিশ্চিত বলেই আমার আশঙ্কা। কিন্তু, অন্য দিকে, পুঁজিবাদ নতুন পরিপ্রেক্ষিত ও নতুন আশার সৃষ্টি করছে। চেয়ে দেখুন, পশ্চিমে সে কী করেছে ও করছে। আপনাদের মতো মহান জাতি যেকোনো সংকটই উত্তীর্ণ হবে। এমন কোনো বড় রকমের ঐতিহাসিক অকল্যাণ নেই, যার ক্ষতিপূরণের মতো একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া অনুপস্থিত। কেবলমাত্র modus operandi* পরিবর্তন হয়। ভবিতব্যই পূর্ণ হোক!..

· জার্মান থেকে ইংরেজি
অনুবাদের ভাষান্তর

ব্রেস্‌লাউতে ভল্‌টের বরাগিউস সমীপে এঙ্গেলস

লণ্ডন, ২৫ জানুয়ারি, ১৮৯৪

প্রিয় মহাশয়,

আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর এখানে দিলাম:

১। আমরা যাকে সমাজের বিকাশের নিয়ামক ভিত্তি বলে মনে করি সেই অর্থনৈতিক সম্পর্ক বলতে আমরা যা বুঝি তা হল, একটি নির্দিষ্ট সমাজে মানুষ যেভাবে ও যে পদ্ধতিতে তাদের জীবনধারণের উপায়গুলি উৎপন্ন করে এবং উৎপন্ন দ্রব্যগুলি নিজেদের মধ্যে বিনিময় করে (কারণ, শ্রম বিভাজনের অস্তিত্ব)। উৎপাদন ও পরিবহণের **সমগ্র কৃৎকৌশলটি** এখানে এইভাবে অন্তর্ভুক্ত। আমাদের ধারণা অনুযায়ী এই কৃৎকৌশল বিনিময়ের ধরন ও পদ্ধতিও নির্ধারণ করে এবং, তদুপরি, নির্ধারণ করে উৎপন্ন সামগ্রীর বণ্টনের ধরন ও পদ্ধতিকে এবং গোষ্ঠীপ্রধান সমাজের অবলুপ্তির পর, তার সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাজনকেও, এবং সেই হেতু প্রভুত্ব ও দাসত্বের সম্পর্ক ও সেগুলির সঙ্গে রাষ্ট্র, রাজনীতি, আইন প্রভৃতিকেও। অর্থনৈতিক সম্পর্কের

* কার্যপদ্ধতি। — সম্পাঃ

মধ্যে এছাড়াও অন্তর্ভুক্ত সেই **ভৌগোলিক বনিয়াদ** যার উপরে দাঁড়িয়ে সেগুলি কাজ করে, এবং অর্থনৈতিক বিকাশের পূর্বতন স্তরগুলির সেই সব অবশেষ যেগুলি প্রকৃতপক্ষে সেখান থেকে চলে এসেছে এবং টিকে আছে—প্রায়শই শুধু পরম্পরার মধ্যে দিয়ে অথবা vis inertiae*; এছাড়াও অবশ্য সমাজের এই ধরনটিকে ঘিরে-থাকা বাহ্যিক পরিবেশ।

আপনি যে কথা বলেছেন, কৃৎকৌশল যদি বিজ্ঞানের অবস্থার উপরে অনেকখানি নির্ভর করে, তাহলে বিজ্ঞানও কৃৎকৌশলের **অবস্থা** ও **চাহিদার** উপরে নির্ভর করে অনেক বেশি। সমাজের যদি একটি কৃৎকৌশলগত প্রয়োজন থাকে তবে তা বিজ্ঞানকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক বেশি। গোটা হাইড্রোস্ট্যাটিকস বিজ্ঞানেরই (তরিচেলি প্রমুখ) সৃষ্টি হয়েছিল ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইতালির পার্বত্য নির্ঝরগুলি নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন থেকে। বিদ্যুৎশক্তি সম্পর্কে যুক্তিসংগত যা কিছু আমরা জেনেছি তার কৃৎকৌশলগত প্রযোজ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার পরেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জার্মানিতে বিজ্ঞানের ইতিহাস এমনভাবে লেখার একটা রেওয়াজ হয়েছে যেন সেগুলি পড়েছে আকাশ থেকে।

২। অর্থনৈতিক শর্তগুলিকে আমরা এমন শর্ত বলে গণ্য করি যা শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিকাশকে শর্তাবদ্ধ করে। কিন্তু বর্ণ নিজেই একটা অর্থনৈতিক বিষয়। এখানে অবশ্য দুটি বিষয় উপেক্ষা করলে চলবে না:

ক) রাজনৈতিক, আইনগত, দার্শনিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক, শিল্পকলাগত প্রভৃতি বিকাশের ভিত্তি হল অর্থনৈতিক বিকাশ। কিন্তু এই সমস্তেরই প্রতিক্রিয়া হয় পরস্পরের উপরে এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরেও। এমন নয় যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই **একমাত্র সক্রিয় কারণ**, আর বাকি সব কিছু শুধু অক্রিয় ফল। বরং অর্থনৈতিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে একটা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকে, যা **শেষ পর্যন্ত** সবসময়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন, রাষ্ট্র প্রভাব বিস্তার করে রক্ষণমূলক শুল্কহার, অবাধ বাণিজ্য, ভালো অথবা মন্দ অর্থ-ব্যবস্থা দিয়ে; এবং এমন কি ১৬৪৮ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত জার্মানির শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত এবং প্রথমে অত্যধিক

---

* জাড্যবশে। — সম্পাঃ

ধার্মিকপনা (১৩৯) ও তারপরে ভাবপ্রবণতা এবং রাজন্য ও অভিজাতদের প্রতি গোলামসুলভ দাস্যভাবের মধ্যে অভিব্যক্ত জার্মান ফিলিস্টাইনের মারাত্মক অবসাদ আর অক্ষমতাও অর্থনৈতিক ফলবিহীন ছিল না। রোগারোগ্যের পথে সেটাই ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক এবং বৈপ্লবিক ও নেপোলিয়নীয় যুদ্ধগুলি এই পুরনো ব্যাধিকে যতদিন পর্যন্ত জটিল ব্যাধিতে পরিণত করে নি, ততদিন পর্যন্ত তা ঝেড়ে ফেলা যায় নি। তাই, লোকে এখানে-ওখানে সুবিধাজনকভাবে যেমনটি কল্পনা করে নেওয়ার চেষ্টা করে ব্যাপারটা তেমন নয় যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি একটা স্বতোৎসারিত ফল প্রসব করে। তা নয়। মানুষ নিজেরাই তাদের ইতিহাস সৃষ্টি করে, তবে তারা তা করে এক নির্দিষ্ট পরিবেশে, যে-পরিবেশ তাকে শর্তাবদ্ধ করে, এবং ইতিমধ্যেই বিদ্যমান প্রকৃত সম্পর্কের ভিত্তিতে, যার মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কই- রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সম্পর্কের দ্বারা তা যতই প্রভাবিত হোক না-কেন---শেষ পর্যন্ত নিয়ামক সম্পর্ক, সেটাই হয় সেগুলির ভিতরকার মূল সূত্র এবং একমাত্র সেটাই উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়।

খ) মানুষ নিজেরাই তাদের ইতিহাস সৃষ্টি করে, কিন্তু এখন পর্যন্ত এক যৌথ পরিকল্পনা অনুযায়ী, যৌথ ইচ্ছা নিয়ে নয় কিংবা এক নির্দিষ্ট গণ্ডিবদ্ধ বিশেষ সমাজেও নয়। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সংঘাত বাধে এবং সেই কারণেই এরূপ সমস্ত সমাজ **প্রয়োজন**-শাসিত, যার পরিপূরক ও চেহারার ধরন হল **আকস্মিক ব্যাপার।** যে প্রয়োজন সমস্ত আকস্মিক ব্যাপারের বিপরীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, তাও আবার শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রয়োজন। এখানেই তথাকথিত মহামানবদের কথা ওঠে। অমুক মানুষ এবং ঠিক সেই মানুষটিই যে এক বিশেষ দেশে এক বিশেষ সময়ে আবির্ভূত হয়, সেটা পুরোপুরি আকস্মিক। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে দেখুন, একটি প্রতিকল্পের জন্য দাবি উঠবে, এবং এই প্রতিকল্প পাওয়া যাবে, ভালো হোক মন্দ হোক শেষ পর্যন্ত তাকে পাওয়া যাবেই। নিজের যুদ্ধবিগ্রহে শ্রান্ত ফরাসী প্রজাতন্ত্র যাকে প্রয়োজনে পরিণত করেছিল সেই নেপোলিয়ন, ঠিক সেই বিশেষ কর্সিকানটিই যে সামরিক একনায়ক হলেন, সেটা আকস্মিক ঘটনা; কিন্তু একজন নেপোলিয়নের অভাব ঘটলে আরেকটি যে সেই স্থান পূর্ণ করত সেকথা প্রমাণ হয় এই ঘটনায় যে দরকার হলেই মানুষটিকে

সব সময়ে পাওয়া গেছে: সিজার, অগাস্টস, ক্রমওয়েল প্রভৃতি। মার্কস ইতিহাসের বস্তুবাদী তত্ত্ব আবিষ্কার করলেও, তিয়েরি, মিনিয়ে, গিজো এবং ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সমস্ত ইংরেজি ইতিহাসবেত্তাই এই কথার সাক্ষ্য যে তার জন্য অন্বেষা চলছিল, এবং মর্গান কর্তৃক একই তত্ত্বের আবিষ্কার একথাই প্রমাণ করে যে তার উপযুক্ত সময় হয়েছিল এবং তা আবিষ্কার করতেই হত।

ইতিহাসের অন্য সমস্ত আকস্মিক ব্যাপার, এবং আপাত-আকস্মিক ব্যাপারের ক্ষেত্রেও তাই। যে বিশেষ ক্ষেত্রটি নিয়ে আমরা অনুসন্ধান চালাচ্ছি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সেটিকে যত দূরে সরিয়ে নেওয়া হবে এবং যত বেশি তা বিশুদ্ধ বিমূর্ত মতাদর্শের ক্ষেত্রের কাছাকাছি আসবে ততই বেশি করে তার বিকাশের ক্ষেত্রে আকস্মিক ব্যাপারের পরিচয় পাব, তার বক্ররেখাটি তত বেশি সর্পিল হয়ে উঠবে। কিন্তু যদি বক্ররেখাটির গড় অক্ষরেখা আঁকেন তাহলে দেখতে পাবেন যে বিবেচনাধীন কালপর্বটি যত দীর্ঘ হবে এবং আলোচ্য ক্ষেত্রটি যত বিস্তৃত হবে, এই অক্ষরেখাটি তত বেশি করে অর্থনৈতিক বিকাশের অক্ষরেখার কাছাকাছি হয়ে দাঁড়াবে, তত বেশি করে তার সমান্তরাল হয়ে দাঁড়াবে।

জার্মানিতে সঠিক উপলব্ধির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল অর্থনৈতিক ইতিহাসবিষয়ক সাহিত্যের দায়িত্বহীন অবহেলা। স্কুলে ইতিহাস-বিষয়ে যেসব ধারণা মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় সেই অভ্যস্ত ধারণা থেকে নিজেকে মুক্ত করাই যে শুধু কঠিন কাজ তাই নয়, তা করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ হাতে নেওয়াও আরও কঠিন কাজ। যেমন, কেই বা অন্তত বৃদ্ধ গ. ফন গুলিখের রচনা পড়েছে, যার নিরস উপকরণ সংকলনে (১৪০) সব কিছু সত্ত্বেও অসংখ্য রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যার উপযোগী প্রচুর মালমশলা আছে!

বাকি বিষয় সম্পর্কে, 'অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার'* গ্রন্থে মার্কস যে সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, আমার মনে হয়, তাই আপনার প্রশ্ন সম্পর্কে আপনাকে বেশ ভালো তথ্য যোগাবে, কারণ সেটি একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত। আমার মনে হয়, আমিও 'অ্যান্টি-ড্যুরিং', প্রথম অংশ, অধ্যায় ৯-১১ ও দ্বিতীয় অংশ,

---

* এই সংস্করণের ৪র্থ খণ্ডের ১২-১৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

অধ্যায় ২-৪, তথা তৃতীয় অংশ, অধ্যায় ১-এ কিংবা ভূমিকায় এবং তাছাড়া 'ফয়েরবাখ'-এর* শেষাংশেও বেশির ভাগ বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছি।

দয়া করে উপরের প্রতিটি কথা অতিরিক্ত মাত্রায় খুঁটিয়ে ওজন করে দেখবেন না, তবে সাধারণ সম্পর্কটা মনে রাখবেন; আমি দুঃখিত যে, আপনাকে যা লিখছি, সেটা প্রকাশের জন্য লিখলে ঠিক যেভাবে লিখতে আমি বাধ্য হতাম সেরকম যথাযথভাবে লেখার সময় আমার নেই...

জার্মান থেকে ইংরেজি
অনুবাদের ভাষান্তর

বার্লিনে ভার্নার জম্বার্ট সমীপে এঙ্গেলস

লন্ডন, ১১ মার্চ, ১৮৯৫

প্রিয় মহাশয়,

আপনার গত মাসের ১৪ তারিখের লিপির জবাব দিতে গিয়ে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই মার্কস সম্পর্কে আপনার রচনাটি দয়া করে আমাকে পাঠানোর জন্য; ইতিমধ্যেই এটি আমি পরম কৌতূহলভরে *Archiv*-এ (১৪১) পড়েছিলাম, ডঃ হ. ব্রাউন কৃপা করে সেটি পাঠিয়েছিলেন, একটি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পুঁজি' সম্পর্কে এরূপ উপলব্ধি দেখতে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। মার্কসের ব্যাখ্যানকে আপনি যে-ভাষায় উপস্থিত করেছেন, স্বভাবতই আমি তার সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারি না। বিশেষ করে ৫৭৬ ও ৫৭৭ পৃষ্ঠায় মূল্যের ধারণার যে সংজ্ঞার্থ আপনি দিয়েছেন, আমার কাছে তা রীতিমতো সর্বব্যাপী বলে মনে হয়েছে: আমি একমাত্র সেই অর্থনৈতিক পর্যায়ের মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে সেগুলিকে সীমাবদ্ধ করে প্রথমে ঐতিহাসিকভাবে সেগুলিকে সীমিত করতে চাই, যে অর্থনৈতিক পর্যায়ে এখন পর্যন্ত মূল্য পরিজ্ঞাত এবং একমাত্র যেখানে পরিজ্ঞাত হতে

* এই সংস্করণের ১০ম খন্ডের ১৩৬-১৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

পারে, যথা সমাজের যেসব ধরনের মধ্যে **পণ্যসামগ্রী বিনিময়,** অথবা পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের অস্তিত্ব আছে। আদিম সাম্যবাদে মূল্য ছিল অপরিজ্ঞাত। এবং দ্বিতীয়ত আমার মনে হয় যে, ধারণাটি সংকীর্ণতর অর্থেও সংজ্ঞায়িত করা যায়। কিন্তু তাতে বহুদূর এগিয়ে যেতে হয়, মোটামুটি আপনি ঠিকই লিখেছেন।

তারপরে অবশ্য, ৫৮৬ পৃষ্ঠায় আপনি সরাসরি আমার উদ্দেশে আবেদন করেছেন, এবং যে খোশমেজাজে আমার মাথার উপরে একটি পিস্তল উদ্যত করে রেখেছেন তাতে আমার হাসি পেয়েছে। কিন্তু আপনার দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই, আমি আপনাকে 'বিপরীত বুঝিয়ে দেব না'। বিভিন্ন পুঁজিবাদী উদ্যোগে উৎপন্ন $\frac{m}{c} = \frac{m}{c+v}$ -এর বিভিন্ন রাশি থেকে মুনাফার সাধারণ ও সমান হার মার্কস যে যুক্তিসংগত পারম্পর্য দিয়ে বার করেছেন, একজন পুঁজিপতির মনে তা সম্পূর্ণরূপে অজানা। যেহেতু তার একটা ঐতিহাসিক সদৃশতা থাকে, অর্থাৎ যতদূর পর্যন্ত আমাদের মস্তিষ্কের বাইরে বাস্তবে তার অস্তিত্ব থাকে, তার প্রকাশ ঘটে যেমন এই ঘটনায় যে, মুনাফার হারের অতিরিক্ত, অথবা মোট উদ্বৃত্ত মূল্যে তার অংশের অতিরিক্ত যে উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজিপতি ক উৎপন্ন করে, তার একটা অংশ চলে যায় পুঁজিপতি খ-র পকেটে, তার উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন normaliter* লভ্যাংশের নিচে থাকে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ঘটে বিষয়গতভাবে, বস্তুনিচয়ের মধ্যে, অচেতনভাবে, এবং এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে উপযুক্ত উপলব্ধি অর্জন করার জন্য কতখানি কাজ প্রয়োজন হয়েছিল আমরা এখনই শুধু তা অনুমান করতে পারি। মুনাফার গড় হার স্থির করার জন্য এক একজন পুঁজিপতির **সচেতন** সহযোগিতা যদি দরকার হত, একজন পুঁজিপতি যদি **জানত** যে সে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন করে এবং কতখানি করে, এবং প্রায়শই তাকে তার উদ্বৃত্ত মূল্যের অংশ হস্তান্তরিত করে দিতে হয়, তাহলে উদ্বৃত্ত মূল্য ও মুনাফার মধ্যেকার সম্পর্কটা গোড়া থেকেই রীতিমতো স্পষ্ট হয়ে থাকত এবং পেটি না হোক, অ্যাডাম স্মিথ হয়তো ইতিমধ্যেই তা বর্ণনা করতেন।

---

* সাধারণত রীতিগত। — সম্পাঃ

মার্কসের অভিমত অনুযায়ী এখন পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাসই, বড় বড় ঘটনার ক্ষেত্রে, ঘটেছে অচেতনভাবে, অর্থাৎ ঘটনাবলী ও তার পরবর্তী পরিণাম অভীপ্সিত নয়; ইতিহাসে সাধারণ নটরা হয় আলাদা কিছু অর্জন করতে চেয়েছিল, না হয় যা তারা অর্জন করেছিল তার ফলে ঘটেছে রীতিমতো আলাদা অদৃশ্যপূর্ব পরিণতি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে: এক একজন পুঁজিপতি, প্রত্যেকে নিজের মতো করে, **সর্বাধিক** মুনাফার পিছনে ছোটে। বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্র আবিষ্কার করে যে, প্রত্যেকে যেখানে **অধিকতর** মুনাফার পিছনে ছোটে সেই প্রতিযোগিতার ফল হয় মুনাফার সাধারণ ও **সমান** হার, প্রত্যেকের জন্য মুনাফার প্রায় **সমান** অনুপাত। কিন্তু পুঁজিপতিরা কিংবা বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রীরা কেউই উপলব্ধি করে না যে এই প্রতিযোগিতার প্রকৃত লক্ষ্য হল মোট পুঁজির ভিত্তিতে হিসাব-করা মোট উদ্বৃত্ত মূল্যের সমরূপ আনুপাতিক বণ্টন।

কিন্তু বাস্তবে এই সমান-করণ কীভাবে সংঘটিত হয়েছে? বিষয়টি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, এ সম্পর্কে মার্কস নিজে বেশি কিছু বলেন নি। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি [Auffassungsweise] তো তত্ত্বকথা নয়, তা একটা পদ্ধতি। তৈরি কোনো আপ্তবাক্য তা যোগায় না, যোগায় অধিকতর গবেষণার মানদণ্ড এবং এই গবেষণার **জন্য** পদ্ধতি। সুতরাং, এখানে কিছু পরিমাণ কাজ করতে হবে, কারণ মার্কস তাঁর প্রথম খসড়ায় নিজে তা বিশদ করেন নি। প্রথমেই এখানে আমরা পাচ্ছি পৃষ্ঠা ১৫৩-১৫৬, ৩য় খণ্ড, ১-এর বক্তব্য, আপনার মূল্য বিষয়ক ধারণা উপস্থাপনের পক্ষেও যা গুরুত্বপূর্ণ এবং যা প্রমাণ করে যে ধারণাটিতে আপনি যতখানি আরোপ করেছেন তার চাইতে বেশি বাস্তবতা আছে অথবা ছিল। পণ্যসামগ্রী বিনিময় যখন শুরু হয়েছিল, উৎপন্ন দ্রব্য যখন ক্রমে ক্রমে পণ্যসামগ্রীতে পরিণত হয়েছিল তখন সেগুলি বিনিময় করা হত মোটামুটি **তাদের মূল্য অনুযায়ী**। দুটি বস্তুতে ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণই তাদের মূল্যের গুণগত তুলনায় একমাত্র মানদণ্ড যুগিয়েছিল। এইভাবে সেই সময়ে মূল্যের ছিল এক **প্রত্যক্ষ ও বাস্তব অস্তিত্ব**। আমরা জানি যে বিনিময়ের মধ্যে মূল্যের এই প্রত্যক্ষ রূপায়ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং এখন আর তা ঘটে না। এবং আমার মনে হয়, মধ্যবর্তী যে যোগসূত্রগুলি প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃত মূল্য থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রণালীর

মূল্যের দিকে যায় সেই যোগসূত্রগুলি, অন্তত সাধারণ রূপরেখায়, খুঁজে বার করা আপনার পক্ষে বিশেষ কঠিন হবে না; তা এত সম্পূর্ণভাবে গুপ্ত যে আমাদের অর্থনীতিবিদরা শান্তভাবে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে। এই সমস্ত প্রক্রিয়ার সত্যকার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যানের জন্য সত্যিই পুঙখানুপুঙখ গবেষণার প্রয়োজন, অথচ প্রতিদানে রীতিমতো সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এই ব্যাখ্যান হবে 'পুঁজি'-র (১৪২) অতি মূল্যবান সম্পূরণ।

সব শেষে, তৃতীয় খন্ডটিকে আমি আরও ভালো কিছু করতে পারতাম, এই কথা মনে করে আমার সম্পর্কে আপনি যে উচ্চ ধারণা তৈরি করেছেন তার জন্য আপনাকে আমার ধন্যবাদ জানাতেই হয়। আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না, আমি মনে করি মার্কসকে মার্কসের ভাষায় উপস্থিত করে আমি আমার কর্তব্য করেছি, এমন কি পাঠকের পক্ষে নিজের আরেকটু বেশি চিন্তা করার দরকার হবে এই ঝুঁকি নিয়েও...

জার্মান থেকে ইংরেজি
অনুবাদের ভাষান্তর

(১) 'ইতিহাসে বলপ্রয়োগের ভূমিকা' পুস্তিকাকারে এঙ্গেলস প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন; তাঁর 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশের তিনটি অধ্যায়ের পরিমার্জিত রূপ নিয়ে 'বলপ্রয়োগ তত্ত্ব' — এই একটি শিরোনামা থাকার কথা ছিল, আর বর্তমান রচনাটি হত চতুর্থ অধ্যায়। বিসমার্কের কর্মনীতির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ হিসেবে পুস্তিকাটি প্রকাশ করার অভিপ্রায় ছিল, তাতে ১৮৪৮ সালের পরবর্তী জার্মান ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দিয়ে অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যে পরস্পর-সম্পর্ক বিষয়ে 'অ্যান্টি-ড্যুরিং'য়ের তত্ত্বগত সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য দেখানো হত। এই অসমাপ্ত অধ্যায়টিতে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত জার্মানির ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জার্মানির একীকরণ যে-পথে অর্জন করা যেত তার এক সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং প্রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে 'উপর থেকে' যেভাবে তার একীকরণ হয়েছিল তার কারণ 'ইতিহাসের বলপ্রয়োগের ভূমিকা'-য় দেওয়া হয়েছে। সেই একীকরণ এইভাবে অগ্রসর হলেও তার প্রগতিশীল চরিত্র স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে এঙ্গেলস বিসমার্কের কর্মনীতির ঐতিহাসিক অদূরদর্শিতা ও বোনাপার্টবাদ উদ্‌ঘাটিত করেছেন, এই কর্মনীতি জার্মানিকে করে তুলেছিল এক পুলিসি রাষ্ট্র এবং যুঙ্কারদের শাসন ও সমরবাদ বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। নিজ স্বার্থ রক্ষায় অক্ষম ও সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলির চূড়ান্ত বিলুপ্তিসাধনে অক্ষম জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্থিরসংকল্পতা ও কাপুরুষতা এঙ্গেলস উদ্‌ঘাটিত করেছেন। জার্মানির শাসক শ্রেণীগুলির যে সমরপ্রিয় বৈদেশিক নীতি ১৮৭১ সালে ফ্রান্স লুণ্ঠন এবং অ্যালসেস ও লোরেন দখলের মধ্যে চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল এঙ্গেলস তারও তীব্র সমালোচনা করেছেন। জার্মান সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরিক পরিস্থিতি ও সেখানকার শ্রেণী-শক্তিগুলির বিন্যাস বিশ্লেষণ করে, সূচনালগ্ন থেকেই তার মধ্যে বিদ্যমান আভ্যন্তরিক বিরোধ, তার সমরবাদী ও আগ্রাসী প্রয়াসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে

এঙ্গেলস এই সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। এঙ্গেলসের রচনাটি সুস্পষ্টভাবে দেখায় যে জার্মানিতে একটিই মাত্র শ্রেণী — প্রলেতারিয়েত — সামগ্রিকভাবে জনগণের অকৃত্রিম জাতীয় স্বার্থের প্রতিভূর ভূমিকা দাবি করতে পারে। পৃঃ ৭

(২) ১৮১৪-১৮১৫ সালে অনুষ্ঠিত ভিয়েনা কংগ্রেসে ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের তিন শরিক, তথা অস্ট্রিয়া, ইংলণ্ড এবং জারতন্ত্রী রাশিয়া ইউরোপীয় মানচিত্রের এক নতুন রূপ দেয়; এর উদ্দেশ্য ছিল আইনসম্মতভাবে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সন্দেহ নেই যে এ উদ্দেশ্যটি ছিল জাতীয় ঐক্য আর জাতিসমূহের স্বাধীনতার পরিপন্থী। পৃঃ ৭

(৩) **ফেডারেল ডায়েট** (বুণ্ডেস্টাগ) — ৮ জুন, ১৮১৫ তারিখের ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে গঠিত জার্মান কনফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সংস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক-সার্বভৌম শাসনতন্ত্রবাদী জার্মান রাষ্ট্রগুলির ইউনিয়ন। এর সভা অনুষ্ঠিত হত ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মাইনে। এটি ছিল জার্মান সরকারগুলির প্রতিক্রিয়াশীল কর্মনীতি রূপায়ণের সহায়ক। ১৮৪৮-১৮৪৯ সালে কনফেডারেশন ভেঙে যাওয়ার পর ডায়েটের কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৮৫০ সালে জার্মান কনফেডারেশন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে আবার কাজ শুরু করে। ১৮৬৬-র অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধের সময়ে কনফেডারেশনের অস্তিত্ব চিরতরে শেষ হয়ে যায়। তার জায়গায় আসে উত্তর জার্মান কনফেডারেশন। পৃঃ ৮

(৪) **'উন্মাদ বছর'** ('das tolle Jahr') — প্রতিক্রিয়াশীল কোনো কোনো জার্মান লেখক ও ইতিহাসবেত্তা ১৮৪৮ সালটিকে এই নামেই অভিহিত করেছিলেন। ১৫০৯ সালের এরফুর্ট হাঙ্গামার বর্ণনা দিয়ে এই নামেরই একটি উপন্যাসে ল্যুডভিগ বেখস্টাইন কথাটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ১৮৩৩ সালে। পৃঃ ৯

(৫) ১৮৪৮ সালে কালিফোর্নিয়ায় ও ১৮৫১ সালে অস্ট্রেলিয়ায় নতুন স্বর্ণসঞ্চয় আবিষ্কারে বিশ্ব বাণিজ্যের উপরে যে-প্রভাব পড়েছিল, এখানে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ৯

(৬) ধর্মসংস্কারের (১২১ নং টীকা দ্রষ্টব্য) ৩০০তম বার্ষিকী ও ১৮১৩ সালের লাইপজিগ যুদ্ধের ৪র্থ বার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য ১৮ অক্টোবর, ১৮১৭ তারিখে জার্মান ছাত্র-সমিতিগুলি (বুরশেনশাফ্‌ট) **ভার্টবুর্গ উৎসবের** আয়োজন করেছিল। এই উৎসব পরিণত হয়েছিল মেটের্নিখের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের বিরুদ্ধে ও জার্মানির একীকরণের সপক্ষে এক ছাত্র-মিছিলে। পৃঃ ১১

(৭) **হামবাখ উৎসব** — ব্যাভেরীয় পেলট্‌নেটের হামবাখ প্রাসাদের কাছে ২৭ মে, ১৮৩২ তারিখে অনুষ্ঠিত জার্মান উদারপন্থী ও র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সংগঠিত এক রাজনৈতিক মিছিল। অংশগ্রহণকারীরা বুর্জোয়া অধিকার ও সাংবিধানিক সংস্কারের নামে জার্মান সার্বভৌমদের বিরুদ্ধে সমস্ত জার্মানের ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছিল। পৃঃ ১২

(৮) **ত্রিশ বছরের যুদ্ধ** (১৬১৮-১৬৪৮) — প্রটেস্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে সংগ্রামজনিত সারা-ইউরোপীয় যুদ্ধ। জার্মানি ছিল সেই যুদ্ধের প্রধান রণক্ষেত্র। লুণ্ঠনের ফলে তার প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল এবং যুধ্যমান পক্ষগুলির রাজ্যগ্রাসমূলক দাবির লক্ষ্য হয়েছিল সে। ১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফালিয়া শান্তি সন্ধি স্বাক্ষরে পর যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে, এই সন্ধির ফলে জার্মানির রাজনৈতিক বিভাগ পাকাপাকি হয়। পৃঃ ১৩

(৯) **টেশেন শান্তি** — এক দিকে অস্ট্রিয়া এবং অন্য দিকে প্রাশিয়া ও স্যাক্সনির মধ্যে ২৪ মে, ১৭৭৯ তারিখে টেশেনে স্বাক্ষরিত শান্তি সন্ধি। ব্যাভেরীয় উত্তরাধিকার নিয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটে এই সন্ধিতে (১৭৭৮-১৭৭৯)। এই সন্ধি অনুসারে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া ব্যাভেরিয়ার কিছুটা ভূখণ্ড দখল করে নেয়, আর স্যাক্সনি পায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ। রাশিয়া কাজ করেছিল মধ্যস্থ হিসেবে এবং ফ্রান্সের সঙ্গে মিলে সন্ধির নিশ্চিতিদাতা হিসেবে। পৃঃ ১৩

(১০) **ডেপুটিবৃন্দের সাম্রাজ্যিক কমিটি** — জার্মান জাতির পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এক কমিশন। অক্টোবর,১৮০১-এ রাইখস্টাগ এই কমিটি নির্বাচিত করে। ফ্রান্স ও রাশিয়ার প্রতিনিধিদের (এরা অক্টোবর, ১৮০১-এ নেপোলিয়নীয় ফ্রান্সের স্বার্থে রেনিশ জার্মানির ভূখণ্ড-সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এক গোপন কনভেনশন স্বাক্ষর করেছিল) চাপের ফলে কমিটি দীর্ঘ আলোচনার পর ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮০৩ তারিখে ১১২টি জার্মান রাষ্ট্র ভেঙে দেওয়া সম্পর্কে এবং তাদের সম্পত্তির একটা বড় অংশ ব্যাভেরিয়া, ভ্যুর্টেমবের্গ, বাডেন ও প্রাশিয়ার হাতে তুলে দেওয়া সম্পর্কে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

জার্মান জাতির পবিত্র রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ৯৬২ সালে। এর আওতায় ছিল জার্মানি এবং ইতালির কিছু অংশ। পরবর্তীকালে এই সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় ফ্রান্সের কিছু অঞ্চল, চেকিয়া, অস্ট্রিয়া এবং অন্য আরো কয়েকটি দেশ। গঠনের দিক থেকে সাম্রাজ্যটি কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্রের মতো ছিল না; এটি ছিল কিছু সামন্ত রাজ আর স্বাধীন শহরের নড়বড়ে এক যৌথ সংগঠন, যারা সম্রাটের ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ বলে মেনে নিয়েছিল। এই

সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ পায় ১৮০৬ সালে, যখন হ্যাপস্‌বুর্গেরা ফ্রান্সের কাছে পরাজিত হবার পর পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটের উপাধি পরিত্যাগ করতে হয়। পৃঃ ১৩

(১১) জার্মান রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ সংস্থা — **রাইখস্টাগে** জার্মান রেনিশ ভূখণ্ড-সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা ও সেই সিদ্ধান্ত অনুমোদনের কথা এখানে বলা হয়েছে (১০ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। ১৬৬৩ সাল থেকে রাইখস্টাগ আহূত হত রেগেনসবুর্গে। পৃঃ ১৩

(১২) **ক্রিমিয়ার যুদ্ধ** বা **১৮৫৩-১৮৫৬ সালের প্রাচ্যদেশের যুদ্ধ** — এটি হল এক দিকে তুরস্ক, ইংলন্ড, ফ্রান্স, সার্দিনিয়া রাজত্ব এবং অন্য দিকে রাশিয়ার মধ্যেকার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হয়। যুদ্ধ শেষ হয় ১৮৫৬ সালে প্যারিস শান্তি সন্ধি স্বাক্ষরের মাধ্যমে। এই সন্ধি অনুসারে রাশিয়া মোল্‌দাভীয় রাজ্যকে কিছু জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় আর কৃষ্ণ সাগরকে নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করা হয়, ইত্যাদি। পৃঃ ১৫

(১৩) রাশিয়া ও ফ্রান্স ৩ মার্চ, ১৮৫৯ তারিখে প্যারিসে যে গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল, এঙ্গেলস তার কথা উল্লেখ করেছেন; এই চুক্তি অনুযায়ী অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও সার্দিনিয়ার যুদ্ধ বাধলে রাশিয়া সদাশয় নিরপেক্ষতার অবস্থান রক্ষা করার কথা দেয়। ফ্রান্স তার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে কৃষ্ণ সাগরে রাশিয়ার সার্বভৌমত্ব সীমিত করে ১৮৫৬ সালের প্যারিস শান্তি সন্ধির ধারাগুলি সংশোধন করার প্রশ্ন সে তুলবে। পৃঃ ১৬

(১৪) এখানে ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর ফ্রান্সে লুই বোনাপার্টের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় কু দে'তার কথা বলা হচ্ছে, যার ফলে বোনাপার্টপন্থী দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের (১৮৫২-১৮৭০) অস্তিত্ব সূচিত হয়। পৃঃ ১৬

(১৫) এঙ্গেলস লুই বোনাপার্টের জীবনীর নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির কথা উল্লেখ করছেন — জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রয়াসে লুই বোনাপার্ট বিভিন্ন বিরোধী পার্টির, বিশেষত ইতালীয় কারবোনারির আস্থা লাভের চেষ্টা করেন, ১৮৩২ সালে তিনি সুইশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন; ৩০ অক্টোবর, ১৮৩৬ তারিখে দুটি গোলন্দাজ ব্যাটেলিয়নের সহায়তায় তিনি স্ত্রাসবুর্গে বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টা করেন; ১৮৪৮ সালে, ইংলন্ডে অবস্থানকালে লুই বোনাপার্ট ব্রিটিশ পুলিসবাহিনীর অসামরিক সংরক্ষিত অংশের সদস্য — বিশেষ কনস্টেবল

হন, ১০ এপ্রিল ১৮৪৮ তারিখে চার্টিস্ট বিক্ষোভমিছিল ভাঙতে এরা সাহায্য করেছিল। পৃঃ ১৬

(১৬) এঙ্গেলস যে 'জাতিসংক্রান্ত নীতি' কথাটি ব্যবহার করেছেন তাতে বোনাপার্টপন্থী দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের (১৮৫২-১৮৭০) শাসক শ্রেণীগুলির বৈদেশিক নীতির অন্যতম অন্তর্নিহিত মূলনীতি প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্যগ্রাসের দুরভিসন্ধি ও বৈদেশিক রাজনৈতিক অপপ্রয়াসের একটা মতাদর্শগত আবরণ হিসেবে বড় বড় রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণীগুলি তা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করত। জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতির সঙ্গে এর কোনোই মিল ছিল না, 'জাতিসংক্রান্ত নীতির' উদ্দেশ্য ছিল জাতিগত বিবাদে ইন্ধন যোগানো, জাতীয় আন্দোলনকে, বিশেষ করে ছোট ছোট জাতির জাতীয় আন্দোলনকে প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির প্রতিবিপ্লবী রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করা।

পৃঃ ১৭

(১৭) ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮০১ তারিখে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে সম্পাদিত **লুনেভিল শান্তি সন্ধিতে** নির্ধারিত ফ্রান্সের সীমানার কথা এখানে বলা হয়েছে। ফ্রান্সের সীমানার বিস্তৃতি, বিশেষ করে রাইন নদীর বামতীর, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ দখলকে শান্তি সন্ধিতে বিধিবদ্ধ করা হয়। পৃঃ ১৭

(১৮) প্যারিসে ফ্রান্স, ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, সার্দিনিয়া, প্রাশিয়া ও তুরস্কের প্রতিনিধিদের সম্মেলনের কথা এখানে বলা হয়েছে; এই সম্মেলনের শেষে ৩০ মার্চ, ১৮৫৬ তারিখে স্বাক্ষরিত হয় প্যারিস শান্তি সন্ধি, এবং অবসান হয় ক্রিমিয়ার যুদ্ধের (১৮৫৩-১৮৫৬)। পৃঃ ১৮

(১৯) এখানে **ইতালীয় যুদ্ধের** কথা বলা হচ্ছে। এ যুদ্ধ ঘটে ১৮৫৯ সালে এক দিকে অস্ট্রিয়া আর অন্য দিকে ফ্রান্স ও পিয়েমোঁর মধ্যে। এই যুদ্ধের জন্য দায়ী করা চলে তৃতীয় নেপোলিয়নকে, যিনি বুঝি বা ইতালির মুক্তির জন্য এ যুদ্ধ শুরু করেছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অন্য দেশের অঞ্চল দখল করা এবং ফ্রান্সে বোনাপার্ট সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করা। তবে ইতালিতে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বিপুল আকার দেখে ভীত হয়ে এবং সেখানকার রাজনৈতিক ফাটল বজায় রাখার প্রয়াসে তৃতীয় নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে এক শান্তি সন্ধি সমাপন করেন। যুদ্ধের ফল হিসেবে ফ্রান্স পায় স্যাভয় আর নীস্। লম্বার্দি সংযুক্ত হয় সার্দিনিয়ার সঙ্গে, ভেনিস থেকে যায় অস্ট্রিয়ার শাসনের আওতায়। পৃঃ ১৮

(২০) ১৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(২১) **১৭৯৫-এর বাসেল শান্তি** ছিল প্রাশিয়া ও ফরাসী প্রজাতন্ত্রের মধ্যে ৫ এপ্রিল তারিখে স্বাক্ষরিত এক পৃথক সন্ধি। এর দ্বারা প্রাশিয়া প্রথম ফরাসী-বিরোধী কোয়ালিশনে তার মিত্রদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। পৃঃ ১৯

(২২) অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও পিয়েমোঁর যুদ্ধের সময় প্রুশীয় বৈদেশিক মন্ত্রী ফন শ্লেইনিৎস ১৮৫৯ সালে প্রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য এই ভাষাতেই বর্ণনা করেছিলেন। এই নীতি ছিল যুধ্যমান কোনো পক্ষেই যোগ না-দেওয়া, অথচ নিরপেক্ষতা ঘোষণা করতেও সম্মত না-হওয়া। পৃঃ ১৯

(২৩) এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ১৮৫২ সালে স্থাপিত একটা বিরাট ফরাসী ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন — Société Générale du Crédit Mobilier-এর কথা। ব্যাঙ্কের আয়ের প্রধান উৎস ছিল সরকারী জামানত নিয়ে ফাটকাবাজি। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সরকারী মহলগুলির সঙ্গে Crédit Mobilier ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। ১৮৬৭ সালে এটি দেউলিয়া হয়ে যায় এবং ১৮৭১ সালে উঠে যায়। পৃঃ ১৯

(২৪) **রেনিশ কনফেডারেশন** ছিল প্রথম নেপোলিয়নের আশ্রিত দক্ষিণ ও পশ্চিম জার্মানির রাষ্ট্রগুলির একটি ইউনিয়ন, এটি গঠিত হয়েছিল জুলাই, ১৮০৬-তে। কনফেডারেশনের মধ্যে ছিল কুড়িটির বেশি রাষ্ট্র, এগুলি ছিল কার্যত ফ্রান্সের সামন্ত। নেপোলিয়নের বাহিনীর পরাজয়ের ফলে ১৮১৩ সালে এই কনফেডারেশন ভেঙে যায়। পৃঃ ২০

(২৫) এখানে প্রধানত ফরাসী সীমান্তের কাছে অবস্থিত জার্মান কনফেডারেশনের দুর্গগুলির কথা বলা হয়েছে (কনফেডারেশন সম্পর্কে ৩নং টীকা দ্রষ্টব্য)। এই দুর্গগুলির গ্যারিসনে ছিল কনফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলির ফৌজ, প্রধানত অস্ট্রীয় ও প্রুশীয় সৈন্য। পৃঃ ২২

(২৬) ভিয়েনায় ১৩ মার্চ, ১৮৪৮ তারিখে জনগণের অভ্যুত্থানে যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তার পরাজয়ের পর নভেম্বর, ১৮৪৮-এ গঠিত প্রিন্স শোয়ারৎসেনবের্গের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ২২

(২৭) **'রিয়্যালপলিটিক'** কথাটি ব্যবহার করা হত বিসমার্কের নীতি বর্ণনা করার জন্য; তাঁর সমসাময়িকেরা মনে করতেন এই নীতি সুবিবেচনাপ্রসূত। পৃঃ ২৩

(২৮) ডিসেম্বর, ১৭৪০-এ তৎকালীন অস্ট্রীয় শাসনাধীন সাইলেসিয়ার উপরে দ্বিতীয় ফ্রিডরিখের আক্রমণের কথা বলা হয়েছে। পৃঃ ২৩

(২৯) ১৪ অক্টোবর, ১৮০৬ তারিখে প্রুশীয় বাহিনী ফরাসী বাহিনীর হাতে একসঙ্গে পরাস্ত হয় দুটি যুদ্ধে — **ইয়েনা** ও **আউয়েরস্টেড্‌টে;** এর ফলে প্রুশীয় রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। পৃঃ ২৪

(৩০) *Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe* ('রাজনীতি, বাণিজ্য আর শিল্প-সংক্রান্ত রেনিশ গেজেট') —১৮৪২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৮৪৩ সালের মার্চ পর্যন্ত কলোনে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র। মার্কস ও এঙ্গেলস এই সংবাদপত্রে লিখতেন। ১৮৪২ সালের অক্টোবর থেকে মার্কস এর অন্যতম সম্পাদক হন। পৃঃ ২৫

(৩১) **ল্যান্ডভের** (Landwehr) — নেপোলিয়নের সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য জনগণের স্বেচ্ছাব্রতী বাহিনী হিসেবে ১৮১৩ সালে প্রাশিয়ায় গঠিত প্রুশীয় স্থলবাহিনীর অংশ। স্বেচ্ছাব্রতীদের বয়স অনুযায়ী একে ব্যবহার করা হত রণক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির জন্য অথবা গ্যারিসনে কাজের জন্য। পৃঃ ২৬

(৩২) **'কুলটুরকাম্‌ফ'** ('সংস্কৃতির জন্য সংগ্রাম') —১৯শ শতকের অষ্টম দশকে বিসমার্ক সরকার আইনসংক্রান্ত যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে, সেগুলিকে বুর্জোয়া উদারপন্থীরা এই নামে অভিহিত করে। এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় সুউচ্চ সংস্কৃতির ধ্বনি তুলে। নবম দশকে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মধ্যে মিলন ঘটানোর প্রয়াসে বিসমার্ক এই ব্যবস্থার অধিকাংশই প্রত্যাহার করে নেন। পৃঃ ২৬

(৩৩) **অঞ্চল-মণ্ডূক উদারপন্থী** — স্বশাসিত কতকগুলি ক্যাণ্টন নিয়ে গঠিত সুইশ আদল অনুসরণে এক ফেডারেলধর্মী রাষ্ট্রে জার্মানির রূপান্তরের পক্ষপাতী উদারপন্থীদের কথা বলতে গিয়ে এঙ্গেলস ব্যঙ্গচ্ছলে এই কথাটি ব্যবহার করেছেন। পৃঃ ২৭

(৩৪) **ভ্রোস্টে-ফিশারিং** — বিদ্রূপাত্মক জার্মান লোকগাথার অন্যতম চরিত্র। পৃঃ ২৭

(৩৫) **১৮৪৮ সালের ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি** ফ্রান্সে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হয়; এর ফলে লুই ফিলিপের জুলাই রাজত্বের অবসান ঘটে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বিজয়ের মাধ্যমেই শুরু হয় ১৮৪৮ সালের বিপ্লব।

১৮৪৮ সালের মার্চ মাসে জার্মান রাষ্ট্রগুলি ও অস্ট্রিয়ায় বৈপ্লবিক অভিযান শুরু হয়। পৃঃ ২৮

(৩৬) **জুন অভ্যুত্থান** — ১৮৪৮ সালের ২৩-২৬ জুন প্যারিসের শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ

অভ্যুত্থানের কথা বলা হচ্ছে। অতি নিষ্ঠুরভাবে এটিকে দমন করে ফরাসী বুর্জোয়ারা। এই অভ্যুত্থান হল প্রলেতারিয়েত এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ইতিহাসে প্রথম মহান গৃহযুদ্ধ। পৃঃ ২৮

(৩৭) নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৪৮-এ প্রাশিয়ায় ক্যু দে'তা ও তার পরে প্রতিক্রিয়ার কালপর্বের কথা এখানে বলা হয়েছে। পৃঃ ২৮

(৩৮) *Der Sozialdemokrat* ('সোশ্যাল-ডেমোক্রাট') — জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র, জার্মান ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা। সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮ পর্যন্ত জুরিখ থেকে এবং অক্টোবর, ১৮৮৮ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০ পর্যন্ত লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পৃঃ ২৯

(৩৯) ১৮৫৮ সালে অন্তর্বর্তীকালীন রাজপ্রতিনিধি প্রিন্স ভিলহেল্ম মানটুফেলের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে নরমপন্থী উদারপন্থীদের ক্ষমতায় তুলে আনেন; বুর্জোয়া পত্রিকা-জগৎ ভণ্ডামি করে এই নীতিকে অভিহিত করে 'নবযুগ' বলে। প্রকৃতপক্ষে ভিলহেল্মের কর্মনীতির একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রুশীয় রাজতন্ত্র ও যুঙ্কারদের অবস্থান সুদৃঢ় করা। 'নবযুগ' বিসমার্কের একনায়কতন্ত্রের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, তিনি ক্ষমতায় আসেন সেপ্টেম্বর ১৮৬২-তে। পৃঃ ২৯

(৪০) সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস-সংক্রান্ত বিলটি ল্যান্ডটাগের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অনুমোদন করতে অস্বীকার করলে ফেব্রুয়ারি ১৮৬০-এ প্রুশীয় সরকার ও ল্যান্ডটাগের বুর্জোয়া-উদারপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে তথাকথিত **সাংবিধানিক বিরোধ** বাধে। মার্চ, ১৮৬২-তে কক্ষের উদারপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ যখন সামরিক ব্যয় অনুমোদন করতে আবার অস্বীকার করে, সরকার তখন ল্যান্ডটাগ ভেঙে দেয় এবং ঘোষণা করে যে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেপ্টেম্বর, ১৮৬২-র শেষ দিকে গঠিত বিসমার্কের প্রতিবিপ্লবী মন্ত্রিসভা সেই বছরেরই অক্টোবর মাসে আবার ল্যান্ডটাগ ভেঙে দেয় এবং এক সামরিক সংস্কারকর্ম শুরু করে, ল্যান্ডটাগের অনুমোদন ছাড়াই এ জন্য অর্থ ব্যয় করে। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার বিজয়ের পর বিসমার্কের কাছে প্রুশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর আত্মসমর্পণের দরুন ১৮৬৬ সালে বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে। পৃঃ ২৯

(৪১) হেসেন-এর ইলেক্টরেটে অস্ট্রো-ব্যাভেরীয় ফৌজের প্রবেশের জবাবে প্রুশীয় সরকার নভেম্বর, ১৮৫০-এর গোড়ার দিকে **সৈন্য সমাবেশের** নির্দেশ দেয় এবং ইলেক্টরেটে তার ফৌজ পাঠায়। ৮ নভেম্বর তারিখে অস্ট্রো-ব্যাভেরীয় ও প্রুশীয় অগ্রবর্তী সৈন্যদলের মধ্যে ছোটখাট ধরনের এক সংঘর্ষ হয়, তাতে দেখা যায় যে প্রাশিয়ার সামরিক ব্যবস্থায় গুরুতর ত্রুটি আছে এবং তার

সেনাবাহিনীর সাজ-সরঞ্জাম অচল। ফলে প্রাশিয়া সামরিক তৎপরতা থেকে বিরত থাকতে ও অস্ট্রিয়ার কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। পৃঃ ৩০

(৪২) ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মাইনে অনুষ্ঠিত বুর্জোয়া উদারপন্থীদের কংগ্রেসে ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯ তারিখে গঠিত হয় **জাতীয় লীগ। লীগের** সংগঠকরা প্রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে অস্ট্রিয়া বাদে সমগ্র জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করার কর্তব্যভার গ্রহণ করেন। ১১ নভেম্বর, ১৮৬৭ তারিখে উত্তর জার্মান কনফেডারেশন চালু হওয়ার পর লীগ ঘোষণা করে যে সেটি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। পৃঃ ৩১

(৪৩) প্যারিসে ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত লুই বোনাপার্টের 'নেপোলিয়নীয় ধ্যানধারণা' গ্রন্থটির কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে (নেপোলিয়ন — লুই বোনাপার্ট, 'Des idées napoléoniennes')। পৃঃ ৩২

(৪৪) ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৩ তারিখে, পোল্যান্ডে জাতীয় মুক্তি-অভ্যুত্থানের সময়ে রাশিয়া ও প্রাশিয়া অভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে তাদের সৈন্যবাহিনীর সম্মিলিত তৎপরতার ব্যবস্থা করে এক কনভেনশন স্বাক্ষর করেছিল। কনভেনশনটি স্বাক্ষরিত হওয়া আগে প্রুশীয় সৈন্যদের পাঠানো হয়েছিল সীমান্তে, শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, যাতে অভ্যুত্থানকারীদের প্রাশিয়ায় অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যায়। পৃঃ ৩৫

(৪৫) ডেনমার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডারিকের মৃত্যুর পর অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ১৬ জানুয়ারি, ১৮৬৪ তারিখে দিনেমার সরকারের কাছে এক চরমপত্র পাঠিয়ে দাবি করে যে, শ্লেজভিগের ডেনমার্কে চরম অন্তর্ভুক্তির কথা ঘোষণা করে ১৮৬৩ সালের যে সংবিধান রয়েছে তা বাতিল বলে ঘোষণা করা হোক। দিনেমার সরকার যখন এই চরমপত্র মেনে নিতে অস্বীকার করে, তখন অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং জুলাই, ১৮৬৪-র মধ্যে দিনেমার ফৌজ পরাজিত হয়। ফ্রান্স ও রাশিয়া এই সংঘাত চলাকালীন অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার প্রতি সদাশয় নিরপেক্ষতা বজায় রাখে। ৩০ অক্টোবর, ১৮৬৪ তারিখে ভিয়েনায় স্বাক্ষরিত শান্তি সন্ধি অনুযায়ী প্রধানত অ-জার্মানদের বসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলি সমেত ডাচিগুলির ভূখণ্ডকে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুক্ত অধিকারভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়, আর ১৮৬৬-র অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধের পর তার সমগ্রটাই চলে আসে প্রাশিয়ার দখলে। পৃঃ ৩৬

(৪৬) রাশিয়া ও ডেনমার্কের প্রতিনিধিদের স্বাক্ষরিত ৫ জুন, ১৮৫১ তারিখের **ওয়ারশ প্রটোকল** এবং দিনেমার প্রতিনিধিদের সঙ্গে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, প্রাশিয়া ও সুইডেনের সম্মিলিতভাবে স্বাক্ষরিত ৮ মে, ১৮৫২ তারিখে

লণ্ডন প্রটোকলে শ্লেজভিগ ও হলস্টাইন ডাচি সহ দিনেমার রাজের অধিকৃত অঞ্চলগুলির অবিভাজ্যতার নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পৃঃ ৩৭

(৪৭) **মেক্সিকো অভিযান — ১৮৬২-১৮৬৭** সালে, প্রথম দিকে ব্রিটেন ও স্পেনের সঙ্গে যুক্তভাবে ফ্রান্সের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ; এর উদ্দেশ্য ছিল মেক্সিকোর বিপ্লব দমন এবং মেক্সিকোকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির উপনিবেশে পরিণত করা। মেক্সিকোর জনগণের বীরত্বপূর্ণ মুক্তি-সংগ্রামের ফলে হস্তক্ষেপকারীদের পরাজয় ঘটে, তারা ১৮৬৭ সালে মেক্সিকো থেকে তাদের ফৌজ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। পৃঃ ৩৮

(৪৮) ৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৪৯) প্রতিক্রিয়াশীল ইতিহাসবেত্তা ও লেখক হাইনরিখ লিও ১৮৫৩ সালে **'নবশক্তিদায়ক আনন্দময় যুদ্ধ'** কথাটি প্রবর্তন করেন, পরে তা একই সমরবাদী ও জাত্যভিমানী অর্থে ব্যবহৃত হত। পৃঃ ৩৯

(৫০) প্রুশীয় কর্তৃত্বাধীনে **উত্তর জার্মান কনফেডারেশন** ১৮৬৭ সালে গঠিত হয় বিসমার্কের প্রস্তাবক্রমে, তার অন্তর্ভুক্ত ছিল উত্তর ও মধ্য জার্মানির ১৯টি রাষ্ট্র ও ৩টি স্বাধীন নগর। এই কনফেডারেশন গঠন প্রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে জার্মানির একীকরণের দিকে একটা বড় পদক্ষেপ ছিল। জানুয়ারি, ১৮৭১-এ জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হওয়ায় কনফেডারেশনের অবসান ঘটে। পৃঃ ৩৯

(৫১) এখানে ১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। পৃঃ ৪০

(৫২) ১৮৬৬-র বসন্তকালে অস্ট্রিয়া ফেডারেল ডায়েটের (৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য) কাছে অভিযোগ করে যে প্রাশিয়া শ্লেজভিগ ও হলস্টাইন ডাচির যুক্ত প্রশাসন-সংক্রান্ত চুক্তি লঙ্ঘন করেছে; বিসমার্ক ডায়েটের সিদ্ধান্ত পালন করতে অস্বীকার করেন, অস্ট্রিয়ার পীড়াপীড়িতে ডায়েট প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে প্রাশিয়ার সাফল্যগুলির দরুন ডায়েট ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মাইন থেকে অগসবুর্গে উঠে যেতে বাধ্য হয়। ২৪ অগস্ট, ১৮৬৬ তারিখে ডায়েট নিজের অবলুপ্তি ঘোষণা করে। পৃঃ ৪০

(৫৩) সাংবিধানিক বিরোধের সময়ে বৈধ ক্ষমতা ছাড়াই যে অর্থব্যয় করা হয়েছিল তার দায়িত্ব থেকে সরকারকে নিষ্কৃতি দেওয়া সম্পর্কে বিসমার্কের উত্থাপিত একটি খসড়া আইন সেপ্টেম্বর, ১৮৬৬-তে প্রুশীয় প্রতিনিধি সভা গ্রহণ করে। (৪০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।) পৃঃ ৪৩

(৫৪) ৩ জ্বলাই, ১৮৬৬ তারিখে সাদোভা গ্রামের কাছে কনিগ্‌গ্রাৎসে অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধের নিয়ামক লড়াইয়ের কথা এখানে বলা হয়েছে। সাদোভার লড়াইয়ে অস্ট্রীয়দের বিরাট পরাজয় ঘটেছিল। পৃঃ ৪৩

(৫৫) **উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের সংবিধান** ১৭ এপ্রিল, ১৮৬৭ তারিখে কনফেডারেশনের সংবিধান-রচনাকার রাইখস্টাগে অনুমোদিত হয়। কনফেডারেশনে প্রাশিয়ার কার্যত আধিপত্য মজবুত হয়। প্রুশীয় রাজা কনফেডারেশনের প্রেসিডেণ্ট ও ফেডারেল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ঘোষিত হন; বৈদেশিক নীতির দায়িত্বও থাকে তাঁর হাতে। সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত কনফেডারেশনের রাইখস্টাগের বৈধানিক ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত ছিল: তার অনুমোদিত আইনগুলি বলবৎ হত প্রতিক্রিয়াশীল ফেডারেল পরিষদের অনুমোদন ও প্রেসিডেণ্টের অনুমোদনের পরেই। কনফেডারেশনের সংবিধান পরে জার্মান সাম্রাজ্যের সংবিধানের ভিত্তি হয়।

১৮৫০-এর সংবিধান অনুযায়ী প্রাশিয়ায় এক ঊর্ধ্বতন কক্ষ থেকে যায়, এটি গঠিত ছিল প্রধানত ভূম্যধিকারীদের (Herrenhaus) প্রতিনিধিদের নিয়ে, আর ল্যাণ্ডটাগের ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমিত — সমস্ত বৈধানিক উদ্যোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। মন্ত্রীদের নিযুক্ত করতেন রাজা এবং তাঁরা তাঁর কাছেই দায়ী থাকতেন। রাজদ্রোহের বিচার করার জন্য সরকারের বিশেষ আদালত গঠনের অধিকার ছিল। ১৮৭১ সালে জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হওয়ার পরেও ১৮৫০-এর সংবিধান প্রাশিয়ায় বলবৎ ছিল। পৃঃ ৪৩

(৫৬) *The Manchester Guardian* — ব্রিটিশ সংবাদপত্র, 'অবাধ বাণিজ্যের' পক্ষপাতীদের মুখপত্র, পরে লিবারেল পার্টির মুখপত্র হয়; ১৮২১ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে স্থাপিত। পৃঃ ৪৫

(৫৭) **কাস্টমস পার্লামেণ্ট** — ১৮৬৬-র যুদ্ধের পর ৮ জুলাই, ১৮৬৭ তারিখে প্রাশিয়া ও দক্ষিণ জার্মান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তি সন্ধির পরে পুনর্বিন্যস্ত কাস্টমস ইউনিয়নের পরিচালন-সংস্থা। পার্লামেণ্ট গঠিত হয়েছিল উত্তর জার্মান কনফেডারেশনের রাইখস্টাগের সদস্যবৃন্দ এবং দক্ষিণ জার্মান রাষ্ট্রগুলির বিশেষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে। এর একমাত্র কাজ ছিল বাণিজ্য ও শুল্ক নীতির প্রশ্ন বিবেচনা করা; ক্রমে ক্রমে এর ক্ষমতা বাড়িয়ে অন্যান্য, রাজনৈতিক বিষয় পর্যন্ত প্রসারিত করার জন্য বিসমার্ক যে-চেষ্টা করেন, দক্ষিণ জার্মানির প্রতিনিধিদের তরফ থেকে তা দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। পৃঃ ৪৫

(৫৮) মাইন নদী ছিল উত্তর জার্মান কনফেডারেশন ও দক্ষিণ জার্মান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সীমান্ত রেখা। পৃঃ ৪৫

(৫৯) ৫৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৬০) অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ৩ অক্টোবর, ১৮৬৬ তারিখে ভিয়েনায় স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি অনুযায়ী অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধে প্রাশিয়ার পক্ষে অংশগ্রহণকারী ইতালিকে ভেনিস ফিরিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু দক্ষিণ টিরোল ও ত্রিয়েস্ত দখলের দাবি পূরণ করা হয় নি। পৃঃ ৪৮

(৬১) প্যারিসস্থিত রাষ্ট্রদূত কাউন্ট আপোনিয়াই-র কাছে ৬ অগস্ট, ১৮৪৭ তারিখে প্রেরিত বার্তায় অস্ট্রীয় চ্যান্সেলার মেটেরনিখের এই উক্তির প্রসঙ্গোল্লেখ করা হয়েছে: 'ইতালি — একটা ভৌগোলিক ধারণা'। পরে তিনি জার্মানির ক্ষেত্রেও তা প্রয়োগ করেন। পৃঃ ৪৮

(৬২) লুক্সেমবুর্গ প্রশ্ন নিয়ে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, নেদার্ল্যান্ডস ও লুক্সেমবুর্গের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের **লণ্ডন সম্মেলন** অনুষ্ঠিত হয় ৭ থেকে ১১ মে, ১৮৬৭-তে। ১১ মে তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী লুক্সেমবুর্গ ডাচিকে (আগেকার মতোই, ডিউক উপাধিটির স্থায়ী অধিকারী থাকেন নেদার্ল্যান্ডসের রাজা) নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়। প্রাশিয়া অবিলম্বে লুক্সেমবুর্গ দুর্গ থেকে তার গ্যারিসন সরিয়ে নেওয়ার কথা দেয় এবং তৃতীয় নেপোলিয়নকে লুক্সেমবুর্গ দখলের দাবি পরিত্যাগ করতে হয়। পৃঃ ৪৮

(৬৩) **'বদমাশের দল'** প্রথমে ছিল ১৮শ শতকের অষ্টম দশকে ইয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সমিতির নাম, সদস্যদের দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য তা কুখ্যাতি অর্জন করেছিল; পরে 'বদমাশের দল' কথাটা যেকোনো দুর্বৃত্ত ও সন্দেহজনক লোকজনের দঙ্গলের সাধারণ নাম হয়ে গিয়েছিল। পৃঃ ৫০

(৬৪) **স্পিখার্ন** (লোরেন) ও **ভোর্থ** (অ্যালসেস)-এর লড়াইয়ে প্রুশীয় সৈন্যরা ৬ অগস্ট, ১৮৭০ তারিখে ফরাসীদের পরাস্ত করে। ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধে সবচেয়ে বড় লড়াইগুলির অন্যতম — সেদান এলাকার লড়াইয়ে ফরাসী বাহিনী ২ সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ তারিখে নতিস্বীকার করে এবং সম্রাটসহ বন্দী হয়। পৃঃ ৫১

(৬৫) **১৮৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর** জনগণ বিপ্লবের পথে নামে, যার ফলে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন (১৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য) এবং একই সঙ্গে প্রজাতন্ত্র আর

অস্থায়ী সরকারের গোড়াপত্তন ঘটে। তবে এ সরকার দেশদ্রোহিতা এবং বহিঃশত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিশ্বাসঘাতকতামূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।
পৃঃ ৫১

(৬৬) **য়ুংকার** — সংকীর্ণ অর্থে প্রাশিয়ার ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণী; ব্যাপক অর্থে — জার্মান ভূস্বামীদের শ্রেণী। পৃঃ ৫২

(৬৭) **ফ্রাঁ-তিরো** — ১৮৭০-১৮৭১-এর ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধের সময়ে প্রুশীয়দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ফরাসী গেরিলাদের এই নাম দেওয়া হয়েছিল। পৃঃ ৫২

(৬৮) **'লান্ডস্টার্ম সংবিধি'** — নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে ও দুই পাশে গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি গ্রহণ করবে এমন স্বেচ্ছাব্রতী বাহিনী গঠনের বন্দোবস্ত করে ২১ এপ্রিল, ১৮১৩ তারিখে প্রাশিয়ায় গৃহীত একটি আইন।
পৃঃ ৫২

(৬৯) *Kölnische Zeitung* ('কলোন সংবাদপত্র') — ১৮০২ সাল থেকে কলোনে প্রকাশিত জার্মান দৈনিক সংবাদপত্র। পৃঃ ৫৩

(৭০) ১৯ মার্চ তারিখে বার্লিনের অভ্যুত্থানকারী জনগণ প্রুশীয় রাজা চতুর্থ ফ্রিডরিখ ভিলহেল্মকে অলিন্দে এসে জনগণের সামনে দেখা দিতে এবং ১৮ মার্চ, ১৮৪৮ তারিখের গণ অভ্যুত্থানে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাঁদের মৃতদেহের সামনে তাঁর মাথা অনাবৃত করতে বাধ্য করেন। পৃঃ ৫৪

(৭১) জার্মান সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত স্ত্রাসবুর্গ ফরাসী সৈন্যরা চতুর্দশ লুইয়ের নির্দেশে ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৬৮১ তারিখে অধিকার করে নেয়। বিশপ ফ্যুরস্টেনবার্গের নেতৃত্বে নগরীর ক্যাথলিক পার্টি ফ্রান্সে অন্তর্ভুক্তিকে অভিনন্দন জানায় এবং ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যাতে না হয় সে জন্য সাহায্য করে।
পৃঃ ৫৫

(৭২) **'পুনর্মিলন কক্ষ'** চতুর্দশ লুই গঠন করেন ১৬৭৯ ও ১৬৮০ সালে; প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির জমির উপরে ফ্রান্সের দাবির যাথার্থ্য প্রমাণ করার জন্য আইনগত ও ঐতিহাসিক যুক্তি যোগানোর দায়িত্ব এর উপরে ন্যস্ত করা হয়েছিল; পরবর্তীকালে ফরাসী ফৌজ এই জমিগুলি দখল করে নেয়।
পৃঃ ৫৬

(৭৩) **'মার্সেইয়েজ'** — ১৮শ শতকের শেষ দিককার ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের বৈপ্লবিক গান। পৃঃ ৫৮

(৭৪) **কার্টেল** — জানুয়ারি, ১৮৮৭-তে বিসমার্ক রাইখস্টাগ ভেঙে দেওয়ার পরে গঠিত দুটি রক্ষণশীল পার্টি ('রক্ষণশীল' ও 'মুক্ত রক্ষণশীল') ও জাতীয় উদারপন্থীদের জোট। তারা বিসমার্ক সরকারকে সমর্থন করে। ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭-তে কার্টেল নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং রাইখস্টাগে অধিকার করে প্রাধান্যপূর্ণ স্থান (২২০টি আসন)। এই জোটের উপরে নির্ভর করে বিসমার্ক য়ুঙ্কার ও বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল আইন চালু করেন। কার্টেলের শরিকদের মধ্যে বিরোধ বৃদ্ধি এবং ১৮৯০-এর নির্বাচনে তার পরাজয়ের ফলে (তারা মাত্র ১৩২টি আসন পেয়েছিল) কার্টেল ভেঙে যায়। পৃঃ ৬৩

(৭৫) ভার্সাই প্রাসাদে ১৮ জানুয়ারি, ১৮৭১ তারিখে প্রুশীয় রাজা প্রথম ভিলহেল্মের জার্মান সম্রাট ঘোষিত হওয়ার কথা এঙ্গেলস এখানে উল্লেখ করছেন। পৃঃ ৬৪

(৭৬) এখানে ১৮৭৩ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের কথা বলা হচ্ছে। 'ব্যাপক ভাঙনের' মধ্য দিয়ে এ সংকট শুরু হয় জার্মানিতে, ১৮৭৩ সালের মে মাসে। দীর্ঘমেয়াদি সেই সংকটের এটি ছিল কেবল সূচনা মাত্র। এ সংকট চলে ৭০-এর বছরগুলির শেষ পর্যন্ত। পৃঃ ৬৬

(৭৭) **প্রগতিবাদীরা** — জুন, ১৮৬১-তে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রুশীয় বুর্জোয়া পার্টির সদস্যবৃন্দ। প্রগতিবাদী পার্টি ছিল প্রুশীয় কর্তৃত্বাধীনে জার্মানির একীকরণের পক্ষপাতী, এবং এক সারা-জার্মান পার্লামেণ্ট আহ্বান ও প্রতিনিধি সভার কাছে দায়ী এক উদারপন্থী মন্ত্রিসভা গঠনের ডাক দিয়েছিল। পৃঃ ৬৭

(৭৮) এখানে বেবেল ও লিব্‌ক্লেখ্‌টের নেতৃত্বে গঠিত **জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি** (আইজেনাখপন্থী) এবং **লাসালপন্থীদের নিখিল জার্মান শ্রমিক ইউনিয়নের** কথা বলা হচ্ছে।

১৮৭৫ সালের ২২-২৭ মে গোথা কংগ্রেসে জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের এই দুই ধারার মিলন ঘটে। মিলিত সেই পার্টির নাম হয়েছিল জার্মানির সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক পার্টি। পৃঃ ৬৮

(৭৯) **ডন্ কুইক্সোট** — পর্যটক নাইট, স্পেনের লেখক সেরভানতেসের উপন্যাস 'ডন্ কুইক্সোট'-এর নায়ক। পৃঃ ৭০

(৮০) উত্তর জার্মান কনফেডারেশনে অন্তর্ভুক্তি (নভেম্বর, ১৮৭০) সংক্রান্ত চুক্তিতে এবং জার্মান সাম্রাজ্যের সংবিধানে লিপিবদ্ধ ব্যাভেরিয়া ও ভ্যুর্টেমবের্গের

বিশেষ অধিকারের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ফেডারেল পরিষদে ব্যাভেরিয়া, ভ্যুর্টেমবের্গ ও স্যাক্সনির প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে এক বিশেষ কমিশন গঠিত হয়েছিল, তার ছিল ভেটো প্রয়োগের অধিকার। পৃঃ ৭১

(৮১) **শোফেনের আদালত** — জার্মান সাম্রাজ্যের নিম্নতর আদালত, এগুলি ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পর কতকগুলি জার্মান রাষ্ট্রে এবং ১৮৭১ সাল থেকে সারা জার্মানিতে প্রবর্তন করা হয়েছিল। তখন সেগুলি তৈরি হত রাজশক্তির একজন আধিকারিক ও দুজন শোফেনকে নিয়ে। জুরিদের সঙ্গে শোফেনদের তফাৎ ছিল এই যে তারা শুধু অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সম্পর্কেই সিদ্ধান্ত নিত না, বিচারকের সঙ্গে রায়ও দিতে পারত; একমাত্র আবাসিক ও সম্পত্তিগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই এই পদে কাজ করতে পারত। পৃঃ ৭৬

(৮২) এখানে **১৮৭২ সালের প্রুশীয় প্রশাসনিক সংস্কারের** কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে গ্রামাঞ্চলে উত্তরাধিকারযোগ্য সামন্ততান্ত্রিক ভূসম্পত্তির বিলোপ ঘটানো হয় এবং কিছুটা স্থানীয়-স্বশাসন প্রবর্তন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে অবশ্য য়ুঙ্কার-ভূস্বামীরা স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে তাদের ক্ষমতা বজায় রেখেছিল, তারা অধিকাংশ নির্বাচিত ও নিযুক্ত পদ রেখে দিয়েছিল নিজেদের হাতে, অথবা সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত তাদের নিজেদের লোকজন মারফৎ। পৃঃ ৭৭

(৮৩) এখানে ১৮৮৮ সালে রূপায়িত **ব্রিটেনের স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্কারের** কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই সংস্কার অনুযায়ী শেরিফের কাজ স্থানান্তরিত করা হয়েছিল কাউন্টিগুলিতে নির্বাচিত পরিষদের কাছে, তারাই কর সংগ্রহ, স্থানীয় বাজেট প্রভৃতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। পার্লামেণ্ট নির্বাচনের ভোটাধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিরা এবং ত্রিশ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে নারীরা কাউন্টি পরিষদ নির্বাচিত করত। পৃঃ ৭৮

(৮৪) **Helot** — প্রাচীন স্পার্টার ভূমিদাস, তারা ভূমির সঙ্গে বন্ধনে আবদ্ধ ছিল আর জমিদার, তথা স্পার্টানদের (প্রাচীন স্পার্টার পরিপূর্ণ অধিকারসম্পন্ন নাগরিক সম্প্রদায়) সেবা করতে বাধ্য ছিল। পৃঃ ৭৯

(৮৫) **আলট্রামনটানিজম** — ক্যাথলিক ধর্মমতে এক অতি-প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা, যার অভীষ্ট ছিল সব দেশের ধর্মীয় ও ধর্ম-বহির্ভূত বিষয়ে পোপের সীমাহীন প্রভাব। আলট্রামনটানিস্টদের (পোপের অপ্রতিহত ক্ষমতায় বিশ্বাসীদের) জয়ের ফলে ভাটিকান পোপের 'অভ্রান্ততার' মতবাদ গ্রহণ করে। পৃঃ ৮০

(৮৬) পোপ-শাসিত অঞ্চলে ২ অক্টোবর, ১৮৭০ তারিখে এক গণভোটের পর সেই অঞ্চল ইতালীয় রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্পূর্ণ হয় দেশের একীকরণ।

ভাটিকান ও লাটেরান প্রাসাদের এবং তাঁর শহরের বাইরের বাসভবনের গণ্ডীর ভিতরে ছাড়া পোপের সমস্ত ধর্ম-বহির্ভূত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। প্রতিবাদে পোপ নিজেকে 'ভাটিকানের বন্দী' বলে ঘোষণা করেন। পোপ ও ইতালি সরকারের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি হয় ১৯২৯ সালে। পৃঃ ৮০

(৮৭) **গোয়েল্‌ফরা** — হ্যানোভারের প্রাশিয়ায় অন্তর্ভুক্তির পর ১৮৬৬ সালে গঠিত হ্যানোভারের একটি পার্টি (হ্যানোভার সার্বভৌমদের প্রাচীন বংশ গোয়েল্‌ফ থেকে এই নামকরণ)। পার্টির লক্ষ্য ছিল হ্যানোভার রাজবংশের অধিকার পুনরুদ্ধার এবং জার্মান সাম্রাজ্যের ভিতরে হ্যানোভারের স্বায়ত্তশাসন।

পৃঃ ৮১

(৮৮) **'১৮৯১-এর খসড়া সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কর্মসূচির সমালোচনা'** রচনাটি সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে এবং জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বিপ্লবী, মার্কসবাদী কর্মসূচির জন্য এঙ্গেলসের আপসহীন সংগ্রামের একটি নিদর্শন। এটি লেখার অব্যবহিত কারণ ছিল পার্টির কার্যনির্বাহী সংস্থা প্রণীত জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির খসড়া কর্মসূচি, এটি এঙ্গেলসের কাছে পাঠানো হয়েছিল। নতুন কর্মসূচিটি এরফুর্ট কংগ্রেসে অনুমোদিত হয়ে ১৮৭৫ সালের গোথা কর্মসূচির স্থলে বলবৎ হওয়ার কথা ছিল। রাজনৈতিক দাবি সংবলিত যে-অংশে পুঁজিবাদের শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা-সংক্রান্ত সুবিধাবাদী চিন্তাকে টেনে নিয়ে চলার চেষ্টা করা হয়েছিল এঙ্গেলস তার কঠোর সমালোচনা করেন। খসড়ার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির সমালোচনা করে এঙ্গেলস এই রচনায় কতকগুলি মার্কসীয় নীতির বিকাশ ঘটান: প্রলেতারীয় আন্দোলনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য সংগ্রামের গুরুত্ব সম্পর্কে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বিভিন্ন পথ সম্পর্কে, প্রলেতারীয় রাষ্ট্র ও প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র সম্পর্কে। এঙ্গেলসের সমালোচনামূলক মন্তব্য এবং এঙ্গেলসের নির্বন্ধে একই সময়ে প্রকাশিত মার্কসের 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা খসড়া' (এই সংস্করণের ৯ম খণ্ড দ্রষ্টব্য) কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার ধারার উপরে ও তার বিশদীকরণের উপরে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এরফুর্টে ১৪ থেকে ২১ অক্টোবর, ১৮৯১ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জার্মানির **সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কংগ্রেসে** গৃহীত কর্মসূচি গোথা কর্মসূচির তুলনায় সামনের দিকে একটা বড় পদক্ষেপ ছিল; সংস্কারপন্থী লাসালীয় গোঁড়া মতবাদ থেকে তা মুক্ত হয়েছিল এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবিগুলি সূত্রায়িত হয়েছিল আরও স্পষ্টভাবে। পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পতন

ও সমাজতন্ত্রের দ্বারা তার স্থান গ্রহণ সংক্রান্ত প্রতিজ্ঞাকে কর্মসূচিতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিপাদন করা হয়েছিল এবং সুস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছিল যে সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরসাধনের উদ্দেশ্যে প্রলেতারিয়েতকে অবশ্যই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে হবে।

সেই সঙ্গে এরফুর্ট কর্মসূচির গুরুতর কিছু ত্রুটিও ছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের হাতিয়ার হিসেবে প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র সংক্রান্ত প্রতিজ্ঞাটির অনুপস্থিতি। এইভাবে, কর্মসূচির চূড়ান্ত বয়ান রচনার সময়ে এঙ্গেলসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটিই উপেক্ষা করা হয়েছিল।

এঙ্গেলসের '১৮৯১-এর খসড়া সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কর্মসূচির সমালোচনা' জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নেতৃত্ব দীর্ঘকাল প্রকাশ করেন নি; এটি প্রকাশিত হয় কেবল ১৯০১ সালে *Neue Zeit* পত্রিকায়।

পৃঃ ৮২

(৮৯) এখানে ১৮৭৫ সালের গোথা কর্মসূচির কথা হচ্ছে। পৃঃ ৮২

(৯০) **সমাজতন্ত্রী-বিরোধী জরুরী আইন** জার্মানিতে জারি করা হয়েছিল ১৮৭৮ সালের ২১ অক্টোবর। এই আইন বলে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সমস্ত সংগঠন, বড় বড় শ্রমিক সংগঠন, শ্রমিক সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়; সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য করা হয় বাজেয়াপ্ত, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের উপর চালান হয় নির্যাতন। বিপুল শ্রমিক আন্দোলনের চাপের ফলে এই আইন রদ করা হয় ১৮৯০ সালের ১ অক্টোবর। পৃঃ ৮৩

(৯১) ৫৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৯২) ৪০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৯৩) ১৮৭১ সালে জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বড় ও ছোট তরফের রয়েস ডিউকদের অধীনস্থ দুটি বামনাকৃতি 'সার্বভৌম' রাষ্ট্র — রয়েস-গ্রেইৎস ও রয়েস-গ্রেইৎস-শ্লেইৎস-লোবেনস্টাইন-এবের্সডর্ফকে এঙ্গেলস ব্যঙ্গচ্ছলে একটিমাত্র নামে যুক্ত করেছেন। পৃঃ ৮৮

(৯৪) **ম্যাঞ্চেস্টারবাদ** — শিল্প-বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের পরিচায়ক অর্থনৈতিক চিন্তার একটি ধারা। এই ধারার প্রবক্তারা — অবাধ বাণিজ্যপন্থীরা ছিল অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী এবং অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের সমস্ত হস্তক্ষেপের বিরোধী। দুজন সুতিবস্ত্র কারখানা-মালিক কবডেন ও ব্রাইটের নেতৃত্বে এদের কার্যকলাপের কেন্দ্র ছিল ম্যাঞ্চেস্টারে। সপ্তম দশকে অবাধ বাণিজ্যপন্থীরা ছিল উদারপন্থী পার্টির বামপন্থী অংশ। পৃঃ ৯০

(৯৫) ৮২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(৯৬) এখানে উল্লেখ করা হয়েছে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের একনায়কতন্ত্রের কথা, ১৭৯৯ সালের ১৮ ব্রুমেয়ার (৯ নভেম্বর) কু দে'তার ফলে তিনি নিজেকে প্রথম কনসাল বলে ঘোষণা করেন। ১০ অগস্ট, ১৭৯২ তারিখে ফ্রান্সে যে প্রজাতন্ত্রীয় ব্যবস্থা গঠিত হয়েছিল, এই সরকার তার স্থান গ্রহণ করে। ১৮০৪ সালে ফ্রান্সকে একটি সাম্রাজ্য বলে এবং নেপোলিয়নকে সরকারীভাবে তার সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয়। পৃঃ ৯২

(৯৭) নভেম্বর, ১৮৮০-তে হাভ্র কংগ্রেসে গৃহীত ফরাসী শ্রমিক পার্টির কর্মসূচির কথা এঙ্গেলস উল্লেখ করছেন। মে, ১৮৮০-তে অন্যতম ফরাসী সমাজতন্ত্রী নেতা জ. গেদ লন্ডনে এসে পেঁছিন, সেখানে মার্কস, এঙ্গেলস ও লাফার্গের সঙ্গে একত্রে তিনি খসড়া কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। কর্মসূচির তত্ত্বগত মুখবন্ধটি মার্কস মুখে বলে যান গেদ তা লিখে নেন। পৃঃ ৯৫

(৯৮) স্পেনের সোশ্যালিস্ট শ্রমিক পার্টির কর্মসূচি ১৮৮৮ সালে বার্সেলোনা কংগ্রেসে গৃহীত হয়। পৃঃ ৯৫

(৯৯) এখানে ১৮৪৬ সালের জুনে ইংলন্ডের পার্লামেন্ট কর্তৃক শস্য আইন রদ-সংক্রান্ত বিলের কথা বলা হচ্ছে। বিদেশ থেকে শস্য আমদানি সীমাবদ্ধ কিংবা নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রচিত তথাকথিত **শস্য আইন** ইংলন্ডে চালু হয়েছিল বড় জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য। অবাধ বাণিজ্যের স্লোগান নিয়ে যে-সমস্ত শিল্প-বুর্জোয়ারা শস্য আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছিল, ১৮৪৬ সালে এই বিল গৃহীত হবার ফলে তাদেরই বিজয় ঘোষিত হয়। পৃঃ ৯৮

(১০০) ট্রাক-সিসটেম নিষিদ্ধ করা বিল গৃহীত হয় ১৮৩১ সালে; কিন্তু বহু কারখানা-মালিক তা লঙ্ঘন করে।

শুধু বালক ও নারী-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দশ-ঘণ্টা শ্রমদিনের বিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত হয় ৮ জুন, ১৮৪৭ তারিখে। পৃঃ ৯৯

(১০১) **ছোট আয়ার্ল্যান্ড** ('Little Ireland') — ম্যাঞ্চেস্টারের দক্ষিণ শহরতলীর একটি মহল্লা, এখানে প্রধানত আইরিশ শ্রমিকদের বাস।

সেভেন ডায়াল্স ('Seven Dials') — লন্ডনের কেন্দ্রস্থলে শ্রমিকদের একটি মহল্লা। পৃঃ ১০১

(১০২) **কুটির প্রথা** অনুযায়ী কারখানা-মালিকরা শ্রমিকদের বাসস্থান যোগাত শৃঙ্খলিত করে রাখার মতো শর্তে। মজুরি থেকে ভাড়া কেটে নেওয়া হত। পৃঃ ১০২

(১০৩) এখানে ২২ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ পর্যন্ত পেনসিলভানিয়ায়

(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ১২,০০০-এর বেশি খনি-শ্রমিকদের ধর্মঘটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ব্লাস্ট ফার্নেস ও কোক ফার্নেসের শ্রমিকরা আরও বেশি মজুরি ও উন্নততর কাজের অবস্থা দাবি করে এবং কতকগুলি দাবি আদায়ে সফল হয়। পৃঃ ১০২

(১০৪) *The Commonweals* ('সাধারণ কল্যাণ') — ১৮৮৫ থেকে ১৮৯১ পর্যন্ত এবং ১৮৯৩ ও ১৮৯৪ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক; এটি ছিল সোশ্যালিস্ট লীগের মুখপত্র। ১৮৮৫ ও ১৮৮৬ সালে এঙ্গেলস এই পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। পৃঃ ১০৪

(১০৫) **জনগণের সনদ** — চার্টিস্টদের দাবিদাওয়া সম্বলিত এই সনদটি প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ সালের ৮ মে। (**চার্টিজম** — ১৮৩০-১৮৫০ সালে ইংলণ্ডে ব্রিটিশ প্রলেতারিয়েতদের প্রথম বৈপ্লবিক গণ আন্দোলন।) খসড়া আইন হিসেবে এই সনদটি পাশ করানোর প্রয়াসে পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়। এতে মোট ছয় দফা দাবি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল: সর্বজনীন ভোটাধিকার (একুশ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের পুরুষের ক্ষেত্রে), প্রতিবছর পার্লামেণ্টে ভোট-ব্যবস্থা, গোপন ভোটদান প্রথা, প্রতিটি ভোটদান কেন্দ্রের সমতা, পার্লামেণ্টে ডেপুটি পদপ্রার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তির শর্তের বিলোপসাধন, প্রতিনিধিদের পুরস্কৃত করা। জনগণের সনদ পাশ করার দাবি জানিয়ে যে-তিনবার চার্টিস্টরা পার্লামেণ্টে আবেদন জানান, তা যথাক্রমে ১৮৩৯, ১৮৪২ ও ১৮৪৯ সালে পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা হয়। পৃঃ ১০৪

(১০৬) এখানে জনগণের সনদ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টে আবেদনপত্র পেশ কারর জন্য ১৮৪৮ সালের ১০ এপ্রিল চার্টিস্টরা লণ্ডনে যে বিপুল শোভাযাত্রার আয়োজন করেন তার কথা বলা হচ্ছে; সংগঠকদের দোদুল্যমানতা ও দুর্বল মনোভাবের জন্য তা ব্যর্থ হয়। শোভাযাত্রার এই ব্যর্থতার ঘটনাটিকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি শ্রমিকদের উপর আক্রমণ ও চার্টিস্টদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগায়। পৃঃ ১০৫

(১০৭) এখানে ১৮৩১ সালে ব্রিটিশ কমন্স সভায় গৃহীত এবং ১৮৩২ সালের জুনে লর্ড সভায় চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত **ভোটাধিকার সংস্কার** বিলের কথা বলা হচ্ছে। এই সংস্কারের ফলে শিল্প-বুর্জোয়াদের পার্লামেণ্টে প্রবেশের পথ সুগম হয়। এই সংস্কারের সমর্থনে সংগ্রামের প্রধান শক্তি তথা প্রলেতারিয়েত আর পেটি বুর্জোয়ারা উদারপন্থী বুর্জোয়া কর্তৃক প্রতারিত হয়, ফলে তারা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। পৃঃ ১০৫

(১০৮) **১৮৬৭ সালে** শ্রমিক গণ আন্দোলনের চাপে ব্রিটেনে **দ্বিতীয় পার্লামেণ্টারি সংস্কার** সম্পন্ন হয়। এর ফলে ব্রিটেনে ভোটদাতার সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পায়; দক্ষ শ্রমিকদের নির্দিষ্ট অংশও ভোটাধিকার পায়।

১৮৮৪ সালে গ্রামাঞ্চলে গণ আন্দোলনের চাপে ব্রিটেনে **তৃতীয় পার্লামেণ্টারি সংস্কার** সম্পন্ন হয়। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে ভোটাধিকার দেওয়া হয় সেই সব শর্তে, যেগুলি ১৮৬৭ সালেই শহরের মানুষের জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল। সংস্কারের পরও জনসমষ্টির ব্যাপক অংশ, বিশেষত গ্রামীণ প্রলেতারিয়েত, শহরের গরিব ও নারীরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে। পৃঃ ১০৭

(১০৯) **ইস্ট এণ্ড** — লণ্ডনের একটি অঞ্চল। পৃঃ ১০৯

(১১০) **বৈজ্ঞানিক বিকাশসাধনের ব্রিটিশ সমিতি** ১৮৩১ সালে স্থাপিত হয় এবং বর্তমানেও তা টিকে রয়েছে; সমিতির বার্ষিক সভার মাল-মশলা প্রকাশিত হয় বিবরণীরূপে। পৃঃ ১১০

(১১১) ইতালির শ্রমজীবী জনগণের সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতাদের অনুরোধে এঙ্গেলস এই প্রবন্ধটি লেখেন; দেশের শ্রমজীবী জনগণের আন্দোলন যখন এক ব্যাপক আকার ধারণ করছে সেই সময়ে পার্টির কোন রণকৌশল গ্রহণ করা উচিত সে-বিষয়ে তাঁর অভিমত প্রকাশ করার জন্য তারা তাঁকে অনুরোধ করেছিল। ইতালিতে যে বিপ্লব পরিপক্ব হয়ে উঠছে তার বুর্জোয়া চরিত্রের উপরে জোর দিয়ে এঙ্গেলস বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এবং শ্রেণী হিসেবে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য সোশ্যালিস্টদের গ্রহণীয় রণকৌশল বর্ণনা করেছেন। পৃঃ ১১৬

(১১২) **'পরিবর্তিত'** প্রজাতন্ত্রী নামটি দেওয়া হয়েছিল ফ. কাভালোত্তির নেতৃত্বাধীন ইতালীয় র‍্যাডিক্যালদের। পেটি ও মাঝারি বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ প্রকাশ করে র‍্যাডিক্যালরা গণতান্ত্রিক অবস্থান গ্রহণ করেছিল এবং অনেকগুলি ক্ষেত্রে সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। পৃঃ ১১৭

(১১৩) *La Réforme* ('সংস্কার') — পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রী বিপ্লবী ও পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীদের মুখপত্র, ফরাসী দৈনিক সংবাদপত্র। ১৮৪৩ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত প্যারিসে প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১২০

(১১৪) ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৮ তারিখে গঠিত ফরাসী প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকারে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রী লেদ্রু-রলাঁ ও ফ্লকোঁ, পেটি বুর্জোয়া সোশ্যালিস্ট লুই ব্লাঁ-র অংশগ্রহণের কথা এখানে বলা হয়েছে। পৃঃ ১২০

(১১৫) এঙ্গেলসের **'ফ্রান্স ও জার্মানির কৃষক সমস্যা'** কৃষি-বিষয়ক প্রশ্নে একটি প্রধান মার্কসবাদী রচনা। এটি লেখার আশু কারণ ছিল ফলমার ও অন্য সুবিধাবাদীদের ১৮৯৪ সালে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের ফ্রাংকফুর্ট কংগ্রেসে খসড়া কৃষি-বিষয়ক কর্মসূচির আলোচনাকে ধনী কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর, ইত্যাদি সংক্রান্ত মার্কসবাদ-বিরোধী 'তত্ত্ব' চোরাপথে আমদানি করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার চেষ্টা। ১৮৯২ সালে মার্সাইয়ে গৃহীত ও ১৮৯৪ সালে নান্তে পরিবর্ধিত কৃষি-বিষয়ক কর্মসূচিতে মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে ও সুবিধাবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে ফরাসী সোশ্যালিস্টরা যে-ভুল করেছিল তা সংশোধন করার বাসনাও এঙ্গেলসকে এই রচনাটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে এঙ্গেলস কৃষকদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামনা-সামনি প্রলেতারীয় কর্মনীতির বিপ্লবী নীতি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতি কৃষকসমাজের মধ্যে মৈত্রীর ধারণাটিকে বিশদ করেছেন। পৃঃ ১২২

(১১৬) ১৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১১৭) **দেওয়ানি বিধিটি** (Code civil) গৃহীত হয় ১৮০৪ সালে প্রথম নেপোলিয়নের আমলে এবং ইতিহাসে তা 'নেপোলিয়ন সংহিতা' হিসেবে বিখ্যাত। পৃঃ ১২৮

(১১৮) *Sozialdemokrat* ('সোশ্যাল-ডেমোক্রাট') — জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১৮৯৪-১৮৯৫ সালে বার্লিনে প্রকাশিত হয়। পৃঃ ১৪৩

(১১৯) মধ্যযুগীয় জার্মান জাতির পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের (১০ নং টীকা দ্রষ্টব্য) নাম এঙ্গেলস পরিবর্তন করেছেন এই বিষয়টির উপরে জোর দেওয়ার জন্য যে জার্মানির একীকরণ কার্যকর হয়েছিল প্রুশীয় কর্তৃত্বাধীনে এবং তার সহগ ছিল জার্মান ভূমির প্রুশীয়করণ। পৃঃ ১৪৭

(১২০) যে বইটির কথা বলা হয়েছে সেটি হল ১৮৯০ সালে লাইপজিগে প্রকাশিত প. বার্টের 'Die Geschichtsphilosophie Hegels und der Hegelianer bis auf Marx und Hartmann' ('হেগেল এবং মার্কস ও হার্টমান অবধি হেগেলপন্থীদের ইতিহাসের দর্শন')। পৃঃ ১৪৯

(১২১) *Deutsche Worte* ('জার্মান বাণী') — অস্ট্রীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক পত্রিকা, ১৮৮১ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত ভিয়েনায় প্রকাশিত হয়।

ম. ভির্ট-এর 'সমকালীন জার্মানিতে হেগেল বিষয়ে দৌরাত্ম্য ও তাঁর নিগ্রহ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকার ১৮৯০ সালের ৫ম সংখ্যায়। পৃঃ ১৪৯

(১২২) *Berliner Volks-Tribüne* ('বার্লিন গণমঞ্চ') — সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সাপ্তাহিক পত্র; 'ইয়ং' নামধারী আধা-নৈরাজ্যবাদী গোষ্ঠীর দিকে ঝুঁকেছিল; প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৭ থেকে ১৮৯২ সালের মধ্যে।

'প্রত্যেককে সম্পূর্ণ শ্রমফল' বিষয়ে আলোচ্য নিবন্ধটি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৪ জুন ও ১২ জুলাই, ১৮৯০-এর মধ্যে। পৃঃ ১৫০

(১২৩) **রিফর্মেশন** (ধর্মসংস্কার) — ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে ব্যাপক সামাজিক গণ আন্দোলন; ১৬শ শতকে এতে জড়িত হয়েছিল জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ইংলন্ড, ফ্রান্স এবং অন্য আরো দেশ। যে-সমস্ত দেশে ধর্মসংস্কার জয়ী হয় সেখানে এর ধর্মীয় উত্তরাধিকার হিসেবে গড়ে ওঠে বহু নতুন তথাকথিত প্রটেস্ট্যান্ট চার্চ (ইংলন্ডে, স্কটল্যান্ডে, নেডারল্যান্ডসে, জার্মানির কিছু কিছু অঞ্চলে ও স্ক্যানডিনেভিয়ায়)। পৃঃ ১৫৫

(১২৪) *Züricher Post* ('জুরিখ পোস্ট') — ১৮৭৯-১৯৩৬ সালে জুরিখে প্রকাশিত গণতান্ত্রিক সংবাদপত্র। পৃঃ ১৫৭

(১২৫) এখানে **নেপোলিয়ন সংহিতা** বলতে এঙ্গেলস কেবল দেওয়ানি বিধিটিকেই (Code civil) (১১৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য) বোঝাচ্ছেন না, বরং ব্যাপক অর্থে তিনি ১৮০৪-১৮১০ সালে প্রথম নেপোলিয়নের আমলে গৃহীত পাঁচটি বিধি (দেওয়ানি, দেওয়ানি মোকদ্দমা, বাণিজ্যিক, ফৌজদারি ও ফৌজদারি মোকদ্দমা) সম্বলিত বুর্জোয়া আইনের সমগ্র পদ্ধতিটিকেই বোঝাতে চাইছেন। নেপোলিয়নের ফ্রান্স কর্তৃক অধিকৃত জার্মানির পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলগুলিতে এই বিধি জারি করা হয়েছিল আর ১৮১৫ সালে রেনিশ প্রদেশ প্রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর পর্যন্ত সে অঞ্চলে এই বিধি চালু ছিল। পৃঃ ১৬১

(১২৬) এখানে ইংলন্ডের **১৬৮৮ সালের রাষ্ট্রীয় কু দে'তার** কথা বলা হচ্ছে, যার ফলে ইংলন্ডে স্টুয়ার্ট বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে এবং ১৬৮৯ সালে অরেঞ্জের উইলিয়মের নেতৃত্বে সংবিধানসম্মত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ভূস্বামী অভিজাত সম্প্রদায় আর বৃহৎ বুর্জোয়াদের মাঝে একটি আপসস্বরূপ। পৃঃ ১৬৩

(১২৭) **ডিইজ্‌ম** — ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত অন্যতম মতধারা, যাতে ঈশ্বরকে জগতের

নিরাকার ও অতিজ্ঞানী আদি হেতু বলে ধরা হত, তবে তাতে বলা হত যে তিনি কখনই প্রকৃতি ও সমাজের জগতে হস্তক্ষেপ করেন না। পৃঃ ১৬৩

(১২৮) এখানে মেরিংয়ের 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সংক্রান্ত' নামক প্রবন্ধের কথা বলা হচ্ছে; এটি ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'লেসিং কিংবদন্তী'র' গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসেবে। পৃঃ ১৬৬

(১২৯) রুসোর তত্ত্বানুসারে আদিকালে মানুষ প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশে বসবাস করত, যেখানে সকলেই ছিল সমান। ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা দেওয়ার এবং সম্পত্তির ক্ষেত্রে অসমতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এই স্বাভাবিক পরিবেশ ছেড়ে নাগরিক অবস্থায় চলে আসে এবং এর ফলে সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রের, যা গড়ে উঠেছিল সামাজিক চুক্তির উপর ভিত্তি করে। তবে রুসোর তত্ত্বানুসারে বলা চলে যে, পরবর্তীকালে রাজনৈতিক অসমতা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক এই চুক্তি লঙ্ঘিত হয় এবং অন্যায়-অবিচারের নতুন এক অবস্থা সৃষ্টি হয়। এই অন্যায়-অবিচার বিলোপ করার ডাক দেয় উন্নত এক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, যা কিনা গড়ে ওঠে নতুন এক সামাজিক চুক্তির উপর ভিত্তি করে। পৃঃ ১৬৮

(১৩০) **বাণিজ্যপন্থা**—১৫-১৮শ শতকে ইউরোপের একাধিক দেশে ব্যবসায়ীদের স্বার্থে পরিচালিত অর্থনৈতিক রাজনীতি ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক মতধারার যৌথ পদ্ধতি। যে-সমস্ত রাষ্ট্র বাণিজ্যপন্থী মারকেন্টাইল পদ্ধতি সমর্থন করত সেখানে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু ছিল, যার কল্যাণে দেশে আমদানির তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ সর্বদাই বেশি ছিল। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই পরিচালিত হত দেশীয় শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতামূলক রাজনীতি।

ফিজিওক্রাট—১৮শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাণিজ্যপন্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত বুর্জোয়া ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের অন্যতম ধারা। বুর্জোয়া সম্পর্ক বিকাশের অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে তোলার উপযোগী অর্থনৈতিক কর্মনীতির সমর্থনে কাজ করত ফিজিওক্রাটরা; তারা পৃষ্ঠপোষকতাবাদের বিরোধিতা করত, কারখানায় শিল্প-বিভাগ সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করত, অবাধ বাণিজ্য আর প্রতিযোগিতার দাবি জানাত। পৃঃ ১৬৮

(১৩১) **ক্রুসেড যুদ্ধ** (ধর্ম যুদ্ধ)—১০৯৬-১২৭০ সালের প্রাচ্যাভিমুখী (সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, উত্তর আফ্রিকা) ঔপনিবেশিক অভিযান; এর উদ্যোক্তা ছিল পশ্চিম ইউরোপের সামন্ত রাজ আর ক্যাথলিক চার্চ। 'ঈশ্বরের সমাধি-স্থল'

আর 'পবিত্র ভূমি' (প্যালেস্টাইন) উদ্ধারের জন্য ধর্মীয় সংগ্রামের ধ্বনি তুলে বাস্তবে তারা তাদের অন্য দেশ অধিকারের উদ্দেশ্যকে ঢাকার প্রয়াস পেয়েছিল। পৃঃ ১৬৮

(১৩২) *Die Neue Zeit* ('নবযুগ') — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির তাত্ত্বিক পত্রিকা, ১৮৮৩ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত স্টুট্‌গার্টে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫-১৮৯৪ সালে এঙ্গেলস এই পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পৃঃ ১৬৯

(১৩৩) ৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৩৪) ১০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৩৫) ন. ফ. দানিয়েলসন-এর 'Sketches on our Post-Reform Social Economy' গ্রন্থের কথা এখানে বলা হয়েছে। বইটি ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। পৃঃ ১৭২

(১৩৬) ১৮৬১ সালে রাশিয়ায় ভূমিদাস-প্রথা লোপ পাবার পর সেখানে উদ্ভূত কৃষি-সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছে এখানে। পৃঃ ১৭২

(১৩৭) রাশিয়ার (ভূ) **গোষ্ঠী** — যৌথ কৃষি-ব্যবস্থার একটি রূপ, যার বিশেষত্ব ছিল অখন্ড বন আর গোচারণ ভূমি, অবশ্যকরণীয় একাধিক ফসলের চাষ। রুশ ভূ-গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্বটি হল একের জন্য সকলে দায়ী হওয়া ও সকলের জন্য একজনের দায়ী হওয়া (রাষ্ট্র ও জমিদারদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সঠিক সময়ে পুরো খাজনা দেওয়া আর নানান দায়িত্ব পালন করা — এ সমস্ত ব্যাপারেই কৃষকদের বাধ্যতামূলক যৌথ দায়িত্ব), নিয়মিতভাবে জমিকে পুনর্বণ্টন করা, জমি ছেড়ে পালানোর অধিকার না থাকা, জমি কেনাবেচার উপর নিষেধাজ্ঞা। পৃঃ ১৭৪

(১৩৮) **কুলাক** — গ্রামের গরিবদের শোষণকারী ধনী কৃষক।
মিরোয়েদ — পরাশ্রয়ী। পৃঃ ১৭৪

(১৩৯) **ধার্মিকপনা** — ১৭শ শতকের শেষে প্রটেস্ট্যান্টদের (বিশেষত জার্মান লুথারপন্থীদের) মাঝে উদ্ভূত ধর্মীয়-অতীন্দ্রিয়বাদী একটি ধারা। এটি চার্চের লোকদেখানো পূজার্চনা মানত না, বিশ্বাসের গভীরতাসাধনের ডাক দিয়েছিল, আমোদ-প্রমোদকে পাপকাজ হিসেবে ঘোষণা করেছিল।

ব্যাপক অর্থে — ধর্মীয়-অতীন্দ্রিয়বাদ একটি মনোভাব, আচরণ। পৃঃ ১৭৭

(১৪০) এঙ্গেলসের চিন্তায় রয়েছে গ. গ্যুলিখের নিম্নলিখিত বিশাল রচনাটি: 'Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus der bedeutendsten handeltreibenden Staaten unserer Zeit' ('আমাদের কালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক রাষ্ট্রগুলির — বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির ঐতিহাসিক বিবরণ'); ১৮৩০ থেকে ১৮৪৫ সালের মধ্যে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। পৃঃ ১৭৮

(১৪১) *Archiv für Sociale Gesetzgebung und Statistik* পত্রিকার ১৮৯৪ সালের ৭ম খণ্ডে প্রকাশিত জম্বার্টের 'Zur Kritik des ökonomischen Systems von Karl Marx' ('কার্ল মার্কসের অর্থনৈতিক মত বিচার') প্রবন্ধটির কথা বলা হয়েছে। পৃঃ ১৭৯

(১৪২) মে, ১৮৯৫-তে এঙ্গেলস লেখেন তাঁর '‘পুঁজি', তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট': 'মূল্য ও মুনাফার হারের নিয়ম' ও 'স্টক এক্সচেঞ্জ'। পৃঃ ১৮২

নামের সূচি

গ

ভ

শ

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবভ্‌স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union